ganesh

২য় বর্ষ। | শ্রাবণ, ১৩২০। | ১ম সংখ্যা।

পত্নীর গৌরব।

:

কালঞ্জর রাজ্যের প্রান্তভাগে নর্ম্মদা নদীর তীরে একটি ক্ষেতে একদিন বৈকালে কয়েকজন লোক কাজ করিতেছিল। ক্ষেত্রের একদিকে প্রায় নদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতল মুক্তভূমি ভরিয়া স্বর্ণাভ শস্যরাজি বায়ু হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছিল। অপর প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দিগন্তবিস্তৃত বনরাজি বন্ধুর-ভূমির উপরে স্তরে স্তরে তরঙ্গায়িত সজীব শ্যামলতায় শোভা পাইতেছিল। লোকগুলি ক্ষেতের সীমান্তস্থিত বনপ্রান্তের বৃক্ষ কাটিতে-ছিল। নিকটে দুই তিনটা বৃক্ষ পতিত ছিল। তার একটার গুঁড়ির উপরে বিশাল বলিষ্ঠ-দেহ পূর্ণবয়স্ক একজন অতি শ্রীমান্ যুবাপুরুষ বসিয়াছিলেন। একটি ছিন্ন শাখার গোড়ায় ঈষৎ হেলিয়া বসিয়া যুবক লোকদের কাজ দেখিতেছিলেন। যুবকের পদ-প্রান্তে একটা বৃহৎ গুণবদ্ধ ধনুক পড়িয়াছিল, এবং পার্শ্বে একটি ছিন্ন শাখার সঙ্গে বাণপূর্ণ একটা তূণীর ঝুলিতেছিল। যুবকের আয়ত উজ্জ্বল নেত্রে এবং সযত্নবিন্যস্ত ঘন গুম্ফরাজির নিম্নে অধর প্রান্তে একটু একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে হাসিতে যেন লোকগুলির কাজ-কর্ম্মের প্রতি ঈষৎ অবজ্ঞা মিশ্রিত বিদ্রূপের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। চারি পাঁচ জন লোক একটা অতি বৃহৎ বৃক্ষের গোড়ায় কুঠারের আঘাত করিতেছিল। আর কয়েকজন কুঠার লইয়া নিকটে বিশ্রাম করিতেছিল। কিছুকাল ঈষৎ স্মিত-নয়নে বিদ্রূপ ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া যুবক বলিলেন "শর্ব্বর! এইরূপ আঘাতে কতদিনে এই গাছ কাটিবে?"

শর্ব্বর সাশ্রু নয়নে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রভুর চরণে প্রণিপাত করিল। প্রভু শর্ব্বরকে স্নেহে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

২

ধনুকটি কাঁধে ফেলিয়া এবং শর পূর্ণ তূণীরটি পিঠে ঝুলাইয়া যুবক বন ভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন। এই বন্য অঞ্চলে নূতন বসতি স্থাপিত হইয়াছে। হিংস্র জন্তুর উৎপাতে মধ্যে মধ্যে অধিবাসীরা বিপন্ন হইত। যুবক মধ্যে মধ্যে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া বন্য জন্তু শীকার করিতেন। যুবকের নাম শরজিৎ, বয়স ত্রিশ বত্রিশ বৎসর হইবে। দশ বার বৎসর হইল এই অঞ্চলে বসতি স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথমে এদিকে বসতি স্থাপিত করেন, তাহাদের মধ্যে শরজিৎ অন্যতম।

বিস্তীর্ণ বন্য অঞ্চলের বৃহৎ এক একটী ভূমি-খণ্ড এক এক জনের অধিকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রত্যেকে ক্রমে অন্য স্থান হইতে লোক আনিয়া বন কাটিয়া বন ভূমিতে কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

যাঁহারা আসিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ বয়স্ক হইলেও শরজিৎই বলবীর্য্যে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বয়োকনিষ্ঠ হইলেও অপর সকলেই আপৎপাতে শরজিৎকেই আপনাদের প্রধান ভরসাস্থল বলিয়া মনে করিতেন। কোনরূপ রাষ্ট্রীয় উৎপাত উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষার জন্য শরজিতের নেতৃত্বাধীনেই সকলে অস্ত্রধারণ করিতেন। প্রধানতঃ শরজিতের চেষ্টাতেই এই হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল বন-ভূমি এখন প্রায় নিরাপদ হইয়া উঠিয়াছে। শরজিৎ তবুও মধ্যে মধ্যে বন্য জন্তুর অনুসন্ধানে বনভূমিতে প্রবেশ করিতেন। শীকারও যে না মিলিত, তা নয়।

শরজিৎ বন মধ্যে কতদূর যাইয়া দেখিলেন, একটী বৃহৎ ভালুক একটী যোদ্ধ-বেশধারী পুরুষকে জড়াইয়া অতিবলে আপন বক্ষে চাপিতেছে, আক্রান্ত যোদ্ধা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও ভালুকের ভীষণ আলিঙ্গন পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার অস্ত্র ও বাহুদ্বয় এমন ভাবে ভালুকটি চাপিয়া রাখিয়াছে যে মুক্তিলাভের তেমন একটা চেষ্টাও তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছে।

বনে প্রবেশ করিয়াই শরজিৎ ধনুকে শর যোজনা করিয়্যাছিলেন। এখন এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিবামাত্র সতর্ক লক্ষ্য করিয়া তিনি ভালুকের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। আক্রান্ত পুরুষকে বাঁচাইয়া নিক্ষিপ্ত শর ভাল্লুকের পার্শ্ব

দেশ দিয়া হৃদপিণ্ড বিদ্ধ করিল। দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ যোদ্ধবেশধারীকে লইয়াই সে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। শরজিৎ দ্রুত নিকটে গিয়া মৃত ভালুকের কঠোর-লগ্ন বাহু-পাশ হইতে কষ্টে এই অপরিচিত যোদ্ধবেশধারী পুরুষকে মুক্ত করিলেন।

যোদ্ধবেশী পুরুষ কহিলেন, "কে তুমি যুবক, এই বিজনবনে এমন আসন্ন মৃত্যু হইতে আমাকে রক্ষা করিলে ? দেবতা তোমার মঙ্গল করুন।"

শরজিৎ কহিলেন "আপনার শরীরে ত বেশী আঘাত লাগে নাই ? ইস ? এই যে ঘাড়ের কাছ দিয়া রক্ত পড়িতেছে। পিঠের উপরেও যে নখ বিঁধিয়াছে চলুন মহাশয়, নদী বেশী দূরে নয়। আপনার ক্ষত সব ধুইয়া ঔষধের প্রলেপ দিয়া দিব।"

"চল। তুমি কে ? তুমি কি এই অঞ্চলের অধিবাসী ?"

"হাঁ ? আপনি কে মহাশয় ? কোথা হইতে আসিতেছেন ?

"আমি কালঞ্জর রাজ্যের সামান্য একজন সেনানী মাত্র। এই বনের ওধারে মন্দারক নামে যে ক্ষুদ্র নগর আছে, সেখানকার গড়ে সম্প্রতি আসিয়াছি। এই বনে আজ শীকার করিতে আসিয়াছিলাম।"

"আপনি যোদ্ধা, হাতেও অস্ত্র আছে। ভালুক কি প্রকারে আপনাকে ধরিল ?"

"অতর্কিতভাবে গাছের উপর হইতে ভালুকটা লাফাইয়া আমার উপরে পড়ে। সহসা এমন ভাবে আমাকে জড়াইয়া ধরিল যে কোনও মতে নড়িবার বা অস্ত্রধরিবার সামর্থ্য রহিল না।"

শরজিৎ উত্তর করিলেন, "হাঁ, সেইরূপই আমি দেখিয়াছিলাম বটে। আপনার নাম কি, সেনানী মহাশয় ?"

সেনানী শরজিতের মুখ পানে চাহিলেন। সেনানী প্রবীন বয়স্ক। ললাটে গণ্ডের নিম্নে ও অধর প্রান্তে যে সব রেখা পড়িয়াছে, তাহারদিকে লক্ষ্য করিয়া চাহিলে বয়োক্রম প্রায় পঞ্চাশ বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু মুখ মণ্ডলের স্বাভাবিক দীপ্ত সৌন্দর্য্যে, আয়ত নেত্রের মধুরোজ্জ্বল দৃষ্টিতে, দেহ গঠনের তেজোবীর্য্য-ব্যঞ্জক সৌষ্ঠবে এখনও পূর্ণ যৌবনের মাধ্যহ্ন ভাস্কর শ্রীতে অপরাহ্নের ম্লানতা তেমন আসিয়া পড়ে নাই সেনানীর এরূপ দৃষ্টি-ভঙ্গীতে শরজিৎ যেন কিছু সঙ্কোচ বোধ করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। সেনানী একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ ?

শরজিৎ কহিলেন" হাঁ যদি মহাশয়ের আপত্তি না থাকে—"

"আমার নাম সুরদাস।"

"আপনি ক্ষত্রিয়?"

হাঁ।"

"আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমিও ক্ষত্রিয়।"

"তোমার মঙ্গল হউক।

আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।"

উভয়ে বন ভূমি অতিক্রম করিয়া ক্ষেতের নিকটে আসিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। শঙ্কর, গণদাস প্রভৃতি লোকজন যাহারা কাজ করিতেছিল, তাহারা গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল। তাহারা সম্ভ্রমে উভয়কে অভিবাদন করিল। শরজিৎ সংক্ষেপে শঙ্করকে অবস্থা বুঝাইয়া কহিলেন "তুমি এখনই আমার গৃহে গিয়া তোমাদের ঠাকুরাণীকে এই সংবাদ দাও। ইঁহার ক্ষতস্থান ধুইয়া ইঁহাকে লইয়া আমি এখনই ফিরিতেছি। তিনি যেন বিলম্ব না করিয়া প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া রাখেন।"

শঙ্কর ছুটিয়া গৃহে গেল। কয়েকজন তাহার পশ্চাতে গেল। দুতিন জন, যদি প্রভুর কোন প্রয়োজন হয়, এই ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গে নদীতীর পর্য্যন্ত গেল।

সুরদাস কহিলেন, "এই লোকজন কারা?"

শরজিৎ উত্তর করিলেন, "ইহারা আমার লোকজন। এই ক্ষেত আমার, এই বনও আমার। ক্ষেতের চাষবাসে, আর বন কাটিয়া নূতন ক্ষেত প্রস্তুত করিতে ইহারা আমার সহায়তা করে।"

"কৃষিই তবে তোমার বৃত্তি?"

"আজ্ঞে, তাই বটে"।

সুরদাস কহিলেন, "তুমি তেজস্বী ও বীর্য্যবান ক্ষত্রিয় যুবক। অস্ত্র বিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছ দেখিলাম। তুমি যেরূপে আমাকে বাঁচাইয়া ভালুকটির পার্শ্বে শর বিদ্ধ করিলে, এরূপ অল্প লোকই পারে। তুমি যুদ্ধ না করিয়া কৃষি কার্য্য কেন কর?"

শরজিৎ একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "এ অঞ্চলে কোন উপদ্রব উপস্থিত হইলে, আমরা সকলেই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকি। সর্ব্বদা ত সেরূপ প্রয়োজন হয় না। কার সঙ্গে যুদ্ধ করিব?"

"তুমি বীর, যুদ্ধই তোমার যোগ্য বৃত্তি। কেন রাজসৈন্যভুক্ত হও না? তোমার বীরত্বের পরিচয় পাইলেই রাজা তোমাকে সেনানায়কের পদে বরণ করিবেন।"

শরজিৎ কহিলেন, "কেন অনর্থক নরহত্যার বৃত্তি গ্রহণ করিব? তার চেয়ে কৃষি বৃত্তি অনেক ভাল। লোক না মারিয়া লোকের আহারের সংস্থান করিতেছি। এই বন্য অঞ্চল প্রায় জনশূন্য ছিল। আমরা নূতন বসতি স্থাপন করিয়াছি। রাজার নিয়োগে কেবল নরহত্যায় শক্তি ক্ষয় না করিয়া, ইহাতেই বোধ হয় রাজার রাজ্যের বেশী শ্রী বৃদ্ধি করিতেছি।"

সুরদাস কহিলেন, "রাজসৈন্য অনর্থক নরহত্যা করে না। রাজার শত্রু নাশ করিয়া রাজ্যের শান্তি রক্ষা করে। শত্রু বিনাশে, দুর্বৃত্তের দমনে রাজ্যে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত না থাকে, প্রজা যদি নিরাপদ না হয়, তবে কৃষি বল, শিল্প বল, বাণিজ্য বল, কিছুরই চেষ্টা সফল হয় না।

শরজিৎ কহিলেন, "সে কথা সত্য। তবে শত্রুর আক্রমণ, দুর্বৃত্তের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি যে কোন রাষ্ট্রীয় উৎপাত উপস্থিত হউক, তাহা দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। পূর্ব্বেও করিয়াছি, এখনও ঐরূপ কোন উৎপাত হইলে এ বাহুতে যে শক্তি আছে, রাজসেবাতেই তাহা নিয়োজিত হইবে। কিন্তু তার জন্য যুদ্ধই জীবনের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। যুদ্ধ যাহাদের বৃত্তি, যুদ্ধ বিনা আর কোন কার্য্যই তাহারা করিতে পারে না। দেশ রক্ষার প্রয়োজন না হইলে, বিদেশ আক্রমণেও তাহারা রাজার ইচ্ছামত প্রেরিত হইতে পারে। সেখানে যুদ্ধে যে নরহত্যা, জনপদ ধ্বংস করিতে হয়, তাহা ধর্ম্ম বিরোধী বলিয়াই মনে হয়।"

সুরদাস কহিলেন, "কালঞ্জর রাজ এ পর্য্যন্ত রাজ্য রক্ষার্থেই যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। বিদেশ-আক্রমণ কখনও করেন নাই। সেরূপ তাঁহার অভিপ্রায় আছে বলিয়াও জানি না। বিদেশী ম্লেচ্ছশত্রু তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াছিল। আজ প্রায় কুড়ি বৎসর হইল, তিনি রাজ্য উদ্ধার করিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবত রাজ্যে নিষ্কণ্টক শান্তি রহিয়াছে। ম্লেচ্ছ কিম্বা অন্য শত্রু রাজ্য আক্রমণ করে নাই। রাজ্যের মধ্যেও বিশেষ কোন উপদ্রব নাই। কিন্তু কই, কালঞ্জর রাজ ত বাহিরের কোন রাজ্য আক্রমণ করিতে সৈন্য প্রেরণ করেন নাই?"

"না, তা করেন নাই বটে। এ অবস্থায় সেনানায়কের পদে অনর্থক নিষ্কর্মা বসিয়া না থাকিয়া যে বিজন অঞ্চলে জনপল্লী স্থাপিত করিতেছি, দেশবাসীর আহার শস্য উৎপাদন করিতেছি, ইহাতে কি আমার যে টুকু শক্তি আছে, তাহা দিয়া রাজ্যের মঙ্গল সাধনই করিতেছি না?"

"তাহা করিতেছ বটে। তবে তোমার মত বীর সেননী যত অধিক হয়, রাজ্যের ভবিষ্যৎ শান্তির সম্ভাবনা তত বেশী অক্ষুণ্ণ থাকে। আচ্ছা, রাজা যদি তোমাকে কোন সেনানীর পদ দিতে চান, তবে কি তাহা গ্রহণ করিবে?"

শরজিৎ উত্তর করিলেন, "রাজাদেশ অলঙ্ঘনীয়। তিনি আদেশ করিলে গ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু তাহাতে আমি সুখী হইব না। মনে হইবে বিধাতা যে শক্তি দিয়াছিলেন, তাহা বৃথা গেল। স্বেচ্ছায় এই যে বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছি, ইহাতেই বড় সুখে আছি, জীবনের একটা সার্থকতায় তৃপ্তি পাইতেছি। যদি ইহা বাধ্য হইয়া কখনও ত্যাগ করিতে হয়, অপনাকে যারপর নাই দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে করিব।"

সুরদাস কহিলেন, "সে ভয় তোমার নাই। কালঞ্জররাজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রজাকে তাহার অনভিমতে কোন কার্য্যে বাধ্য করেন না।"

শরজিৎ কহিলেন, "এই যে নদীর তীরে আসিয়াছি। আসুন নীচেয় নামিয়া আপনার ক্ষত সব ভাল করিয়া ধুইয়া দিই। তারপর গৃহে চলুন,—সেখানে ঔষধের প্রলেপ দিব। যে কয় দিন ক্ষত শুষ্ক না হয়, শরীর সুস্থ না হয়, এই দীনের কুটীরেই থাকিবেন। আমার স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষায় আশা করি আপনি শীঘ্রই সুস্থ হইবেন।"

"চল।"

উভয়ে তীরের উপর হইতে নীচে জল স্রোতের নিকটে নামিলেন।

৩

নদীর জলে ক্ষত ধৌত করিয়া শরজিৎ সুরদাসকে লইয়া গৃহে আসিলেন। পল্লীর প্রান্ত ভাগে নদীর তীরে তিন দিকে বাগান এবং সম্মুখে একখানি ছোট ময়দানে পরিবেষ্টিত কয়েকখানি অতি সৌষ্ঠবে নির্ম্মিত কুটীর লইয়া শরজিতের গৃহ। গৃহের নিকটেই পল্লীর বাহিরের দিকে শরজিতের ভৃত্যগণের কুটীর। গৃহের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবা মাত্র একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালক ও তিন বৎসরের বালিকা ছুটিয়া আসিয়া 'বাবা বাবা' বলিয়া শরজিৎকে

জড়াইয়া ধরিল। শরজিৎ দুই বাহুতে দুই জনকে জড়াইয়া কোলে তুলিয়া চুম্বন করিলেন।

বালক কহিল, "ও কে বাবা?"

সুরদাস স্নেহভরে কহিলেন, "আমি তোমার দাদা। দাদার কোলে আস্‌বে, ভাই?"

বালক সুরদাসের কোলে ঝাপাইয়া পড়িল, "আমিও দাদার কোলে যাব" বলিয়া বালিকাও পিতার কোল হইতে নামিয়া সুরদাসকে জড়াইয়া ধরিল। সুরদাস তাহাকেও কোলে তুলিয়া নিয়া স্নেহে উভয়ের মুখচুম্বন করিলেন।

উভয়ে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুটীরমধ্যে একটী যুবতী একটী শিশু কোলে করিয়া বসিয়াছিল। কাছে একটী খলে সদ্য প্রস্তুত গাছড়ার প্রলেপ ছিল। যুবতী শিশুটীকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু শিশুর সহসা ঘুমাইবার মত কোনরূপ লক্ষণ ছিল না। সে মাতার মুখপানে চাহিয়া হাসিতেছিল, হা হু করিতেছিল, আর হাত পা ছুড়িতেছিল। শরজিৎ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র শিশুটি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে উচ্চকণ্ঠে আঁ ওঁ শব্দ করিতে লাগিল; আর বড় জোরে হাত পা ছুড়িতে লাগিল। শরজিৎ শিশুটীকে কোলে তুলিয়া নিলেন।

সুরদাস যুবতীকে দেখিয়া স্তব্ধভাবে নির্ণিমেষ-নয়নে তাহারদিকে চাহিয়া রহিলেন। রাজোদ্যানে অতি যত্নে লালিত অপূর্ব্ব শোভা সৌরভময় প্রস্ফুটিত কুসুমবৎ এই যুবতী আপনার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে এই নির্জ্জন অঞ্চলের গ্রাম্য কুটীরখানি যেন আলো করিয়া বসিয়া আছে। আহা এ মূর্ত্তি যে রাজ-প্রাসাদের আলোকরূপা রাজরাজেশ্বরীর,— কুটীর-বাসিনী গৃহস্থবধূর নয়! বীর হইলেও যুবক গৃহস্থ সন্তান, পৃথিবীশ্বরের মুকুটমণি এ অতুল রত্ন কোথায় পাইল। বিস্ময় বিস্ফারিত মুগ্ধনেত্রে সুরদাস যুবতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের ভাবে বোধ হইল, কেবল বিস্ময়বিহ্বলতা নয়, যেন আরও কত কি তাঁহার মনে হইতেছিল।

যুবতী উঠিয়া লজ্জাবনতমুখে সম্ভ্রমে একটু পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল।

শরজিৎ কহিলেন, "শান্তা, ইনিই সেই আহুত অতিথি। ইনি ক্ষত্রিয়, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ; ইঁহাকে প্রণাম কর।"

শান্তা ভূমিষ্ঠ হইয়া সুরদাসকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। সুরদাস আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "তুমি কে মা?"

শান্তা লজ্জায় মুখ নত করিল। আরক্ত মুখে বড় মৃদু মধুর একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। শরজিৎ কহিলেন, "ইনি আমার স্ত্রী।"

"হ্যাঁ,—তাইত বটে! তোমারই স্ত্রী ইনি। তা—ইনি কা'র কন্যা?"

শরজিৎ কহিলেন, "ইঁহার পিতামাতার পরিচয় পাই নাই। এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শৈশব হইতে ইঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনিই ইঁহাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দেন।"

"সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন?"

"তিনি জীবিত নাই।"

"কোথায় ছিলেন?"

"মন্দারকনগর হইতে ৪।৫ ক্রোশ দূরে নর্ম্মদাতীরে কোন গ্রামে তিনি বাস করিতেন। সেখানে শাকম্ভরী দেবীর একটী মন্দির আছে; সেই মন্দিরে দেবীর পূজক ছিলেন।—মহাশয়! আপনি বসুন, আপনার ক্ষতের জন্য ঐ প্রলেপ প্রস্তুত। প্রলেপটা লাগাইয়া দিই; তার পর কিছু আহার করিয়া বিশ্রাম করুন। নতুবা,—বহু রক্ত ক্ষয় হইয়াছে, বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন।"

শান্তা চৌকির উপর বিছানা পাতিয়া তাহার উপরে বড় একটী বালিশ রাখিয়া দিল। সুরদাস বসিলেন। শরজিৎ তাঁহার কাঁধে—পিঠে ও বাহুতে—যে সব স্থানে ক্ষত হইয়াছিল, প্রলেপ দিয়া দিল। শান্তা কিছু উষ্ণ দুগ্ধ, ফল ও গৃহে প্রস্তুত মোদক আনিয়া সম্মুখে রাখিল। সুরদাস যারপর নাই ক্ষুধিত ও ক্লান্ত হইয়াছিলেন। আহার ও পানে অনেকটা সুস্থ হইলেন। কিছু কাল অন্যমনস্ক ভাবে শান্তার পানে চাহিয়া থাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তোমার পিতামাতার কথা কিছু স্মরণ হয় কি?"

শান্তা উত্তর করিল, "পিতার কথা কিছুই স্মরণ হয় না। মাকে একটু একটু মনে পড়ে।"

"তোমরা কোথায় ছিলে?"

"তাত জানি না।"

সুরদাস শরজিতের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বাবা, আমার এই কৌতূহলের জন্য কিছু মনে করিও না। এই কন্যাটিকে দেখিয়া অবধি আমার কেবলই মনে হইতেছে, কোথায় যেন ইঁহাকে দেখিয়াছি। এই জন্য এত

কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। সেই ব্রাহ্মণ ইঁহাকে কোথায় পাইয়াছিলেন, জান কি?"

"শুনিয়াছি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিবার সময় কোন পর্ব্বতগুহায় ব্রাহ্মণ ইঁহাকে পাইয়াছিলেন।"

"পর্ব্বতগুহায় কি শিশুকন্যা একা ছিল?"

"না, ইহার রুগ্ন মাতা সেই গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। দৈবাৎ ব্রাহ্মণের সঙ্গে সেখানে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।"

"মাতার পরিচয় কি ব্রাহ্মণ পান নাই?"

"না। ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছি, মাতা মৃত্যু কালে কন্যাটিকে তাঁহার হাতে দিয়া বলেন, 'ঠাকুর, আপনি দয়া করিয়া কন্যাটিকে রক্ষা করুন। এটি ক্ষত্রিয় কন্যা। যদি বাঁচে কোন সচ্চরিত্র বীরপ্রকৃতি ক্ষত্রিয় কুমারের হস্তে ইহাকে দান করিবেন। তাহা হইলেই আমার ইহ জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে'।"

"মাতা আর কোন পরিচয় দেন নি?"

"ব্রাহ্মণ ত সেরূপ কিছু বলেন নাই।"

"এ কতদিনের ঘটনা হইবে?"

"২০।২১ বৎসর পূর্ব্বে যে ম্লেচ্ছ-বিপ্লব ঘটে, তার অল্প পরেই নাকি ব্রাহ্মণ পর্ব্বত গুহায় ইঁহার মাতার সন্ধান পান। বহু ক্ষত্রিয় যোদ্ধা তখন নিহত হন, বহু ক্ষত্রিয় পরিবার গৃহহীন হইয়া পর্ব্বতে, অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহার মাতাও বোধ হয় তখনকার কোন বিপন্ন ক্ষত্রিয়ের গৃহিণী ছিলেন।"

"তাহাই হইবে" এই বলিয়া সুরদাস নীরব হইলেন। কেমন বিষণ্ণ, কেমন অন্যমনস্ক, কেমন চিন্তান্বিত ভাবে তিনি বালিশে হেলিয়া বসিয়া রহিলেন। আর কোন কথা কহিলেন না। বহুক্ষণ গেল। রাত্রির আহার্য্য প্রস্তুত হইল। শান্তা আহার সামগ্রী লইয়া আসিল। শূরজিৎ অতিথিকে লইয়া আহার করিলেন। আহারের সময়েও সুরদাস কোন কথা কহিলেন না। কেবল মধ্যে মধ্যে শান্তার মুখের দিকে আন্মনা ভাবে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। আহার হইলে শান্তা পৃথক কুটীরে সুরদাসের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। সুরদাস নীরবে গিয়া শয়ন করিলেন।

৪

ঔষধের গুণে সুরদাসের ক্ষতে কোনরূপ বিষ ক্রিয়া হইল না। রাত্রিতে একটু জ্বর হইয়াছিল। শান্তা আরও কয়েকরূপ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইল। এ অঞ্চলে সদাসর্ব্বদা চিকিৎসক মিলিবার সম্ভাবনা ছিল না। প্রতিপালক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট শান্তা কিছু ভেষজতত্ত্ব শিখিয়াছিল। ব্যারাম পীড়া বড় বেশী কিছু হইত না। সুন্দর নদীর তীরে, মুক্ত আকাশ তলে, নির্ম্মল জলে, নির্ম্মল বায়ুতে, প্রচুর পরিশুদ্ধ খাদ্যে, মনের আনন্দে প্রধানতঃ দেহ চালনায় সকলের সময়াতিপাত হইত। এ অবস্থায় রোগ-পীড়া বড় কাছেও আসিতে পারে না। শীকারে কেহ আহত হইলে, বা অন্য কিছু সামান্য অসুখ কখনও কাহারও হইলে শান্তাই প্রায়তঃ ঔষধ দিত। শান্তার নিপুণ চিকিৎসা এবং সস্নেহ শুশ্রূষার গুণে সুরদাস দু তিন দিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরের আহার ও বিশ্রামের পর শরজিৎ লোকজন লইয়া ক্ষেতের কাজ-কর্ম্মে গিয়াছেন। শান্তা একখানি পুঁথি লইয়া পড়িতেছে। এই সময়ে অন্য কাজ কর্ম্ম না থাকায় শান্তা কিছু পড়িত। সুরদাস আসিয়া শান্তার কাছে বসিলেন। শান্তার হাতে পুঁথি দেখিয়া সুরদাস কহিলেন, "তুমি কি পড়িতে পার মা?"

শান্তা একটু লজ্জা পাইয়া পুঁথি সরাইয়া রাখিল।

সুরদাস কহিলেন, "লজ্জা কি মা? তুমি পড় না। কোথায় তুমি পড়িতে শিখিয়াছ?"

"দাদামহাশয়ের কাছে।"

'দাদামহাশয়!'

"যে পূজক ব্রাহ্মণ আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি দাদামহাশয় বলিয়া ডাকিতাম।"

"তোমার পিতামাতার পরিচয় কি তুমি কিছুই জান না, মা?"

এ দুই দিন সুরদাস এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই। সে দিনকার অত প্রশ্নে শান্তা বড় কুণ্ঠিত হইয়াছিল। আজ আবার সুরদাসের কৌতুহলের নূতন উদ্দীপনার লক্ষণ দেখিয়া সে মনে মনে কেমন যেন একটা অশান্তি বোধ করিল। সুরদাস আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণের নিকট তোমার মাতা কি কোন পরিচয় দেন নাই?"

শান্তা উত্তর করিল, "ব্রাহ্মণ ত সেরূপ কিছু বলেন নাই।"

সুরদাস কহিলেন, "তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার কি মনে হইতেছে জান মা?"

"কি?"

"বোধ হয় তোমার মাতাকে আমি চিনিতাম।"

শান্তার মনে এবার অননুভূতপূর্ব্ব কেমন একটা তীব্র কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। সে আগ্রহে কহিল, "তাঁহাকে আপনি চিনিতেন, কে তবে তিনি ছিলেন? আপনি তাঁর কে?"

"নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না। আহা, যদি ব্রাহ্মণ জীবিত থাকিতেন, তবে বোধ হয় তোমার ঠিক পরিচয় জানিতে পারিতাম।"

"ব্রাহ্মণ ত জীবিত নাই।" "না, দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি আর এজগতে নাই বটে। হায় যদি একথাটিও জানিতে পারিতাম, তোমার আকৃতি তোমার মাতার আকৃতিরই অনুরূপ তাহা হইলেও—"

"ব্রাহ্মণের কাছে শুনিয়াছিলাম আমি দেখিতে আমার মাতার মতনই।"

সুরদাস কিয়ৎকাল শান্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল, একটু পরে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার মাতার কোন নিদর্শন তোমার নিকট আছে? মৃত্যুকালে তাঁহার অঙ্গে কি কোন অলঙ্কার ছিল না?—এমন কিছুই ছিলনা যা তোমার জন্য তিনি ব্রাহ্মণের কাছে দিয়া যান?"

"সামান্য কয়েকখানি অলঙ্কার ছিল,—আর তার মধ্যে একটী অঙ্গুরীয় ছিল, তাই তিনি ব্রাহ্মণকে দেন। আমার বিবাহের সময় ব্রাহ্মণ সেগুলি আমাকে দিয়াছিলেন।"

"কোথায়, কোথায় মা সেগুলি আছে?"

"আমার পেটিকায় তুলিয়া রাখিয়াছি। মাতার পরিচয় পাইলাম না,—তাঁর চিহ্নও পাছে নষ্ট হইয়া যায়, তাই ব্যবহার না করিয়া যত্নে সে গুলি তুলিয়া রাখিয়াছি।"

"সেগুলি আমায় দেখাওনা মা!"

শান্তা পেটিকা খুলিয়া একটী কৌটা বাহির করিল। কৌটার মধ্যে সামান্য দু চারি খানি অলঙ্কার, বহুমূল্য রত্নখচিত, আর একটী অঙ্গুরীয় ছিল।

সুরদাস অলঙ্কারগুলির দিকে একবার চাহিলেন। তার মধ্য হইতে অঙ্গুরীয়কটি তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুরীয়কটি হীরকখচিত, বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে শোভিত। সুরদাসের নয়ন অশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠিল। গদগদ-কণ্ঠে তিনি কহিলেন।

"এখন আমি নিঃসন্দেহ। মা তোমায় আমি চিনিয়াছি।"

"কে তবে আমি? কে আমার পিতা মাতা?—"

"তুমি—তুমি মা,—এই অভাগারই কন্যা। রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে তোমায় ও তোমার মাতাকে হারাই। এজীবনে তোমাদের সন্ধান পাইব, সেরূপ আশাও কখনও করি নাই। তোমার মাতা স্বর্গে গিয়াছেন,—কিন্তু আজ তোমাকে পাইয়াই আমার হারাণ সর্ব্বস্ব পাইলাম। এস, এস মা আমার বুকে এস। একদিন শিশু তোমাকে বুকে ধরিয়া কৃতার্থ হইতাম, আজ বহুদিনের পর আবার আসিয়া আমার বুক জুড়াও।"

অশ্রু প্লাবিত নয়নে উন্মত্তের ন্যায় বাহুবিস্তার করিয়া সুরদাস শান্তাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। পিতার স্কন্ধে অশ্রুসিক্ত বদন রাখিয়া শান্তা থর থর কাঁপিতে লাগিল।

প্রথম বারের উচ্ছ্বাসের আবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে শান্তা ধীরে ধীরে পিতার বাহুবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া নিল। সাশ্রু নয়নে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া শান্তা পদমূলে ভূমিতে লুটাইয়া পিতাকে প্রণাম করিল। পিতা দুই হাতে শান্তাকে ধরিয়া তুলিয়া গদ গদ কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।

সুরদাস কিছুকাল নীরবে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন,

"তুমি কে জান মা?"

"আপনার কন্যা।"

সুরদাস স্নেহপূর্ণ ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তুমি রাজকন্যা!"

"আমি তোমার পিতা,—আমিই কলিঙ্গরাজ ত্রৈলোক্যবর্ম্ম।"

শান্তা চমকিয়া উঠিল, কয়েক পদ পশ্চাতে সরিয়া স্তম্ভিত ভাবে ঈষৎ স্ফুরিত বদনে বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে রাজার পানে চাহিয়া দাড়াইয়া রহিল।

সহসা গৃহমধ্যে বিনামেঘে অশনি সম্পাত হইলেও শান্তা বোধ হয় অধিকতর স্তম্ভিত হইত না।

রাজা কহিলেন "হ্যাঁ মা, তুমি আমারই কন্যা। কাশীরাজকন্যা পুষ্পবতী তোমার জননী ছিলেন। সয়ম্বরে সমাগত বহুরাজার মধ্যে তিনি এই হতভাগ্যকে বরণ করেন। বহুবৎসর তাঁহাকে হারাইয়াছি, কিন্তু তাঁর মোহন স্মৃতি এখনও ভুলিতে পারি নাই। তাঁর ভুবনমোহিনী রাজ-রাজেশ্বরী মুর্ত্তি আমার প্রাণ ভরিয়া এখনও জাগ্রত আছে। প্রথমে তোমাকে দেখিয়া তোমার মাতা বলিয়াই আমার ভ্রম হইয়াছিল। যখন তাঁহাকে হারাই তিনি ঠিক তোমারই মত ছিলেন। শেষে মনে হইল, তুমি যদি আমার সেই প্রাণের ধন হারাণ কন্যা মণিকুণ্ডলা হও। তাই সেদিন অত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। মা তুমি আমার প্রথম সন্তান। পরে আরও সন্তান লাভ করিয়াছি, কিন্তু তোমা অপেক্ষা প্রিয় আর কেহ হয় নাই। তোমাকে বুকে ধরিয়া যে তৃপ্তি লাভ করিতাম, সে তৃপ্তি আর কাহাকেও দিয়া পাই নাই। তোমাকে হারাইয়া অবধি যে ব্যথা হৃদয়ে বহিয়াছি,—সে কথা—তোমার মাতাকে হারাইয়াও বুঝি পাই নাই। কি শুভক্ষণে এই বনে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কি শুভক্ষণেই বন্য ভাল্লুকের হাতে পড়িয়াছিলাম, সেই সূত্রে বিধাতা আজ বহুকালের হারানিধি আমায় মিলাইয়া দিয়াছেন।"

শান্তা নীরবে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। কোনও উত্তর করিল না। উত্তর করিবার মত কোন শক্তিও তার ছিল না,— কোন কথাও তার মুখে যোগাইল না।

রাজা কহিলেন, "কোন কথা কহিতেছ না কেন মা? আমার কথা কি বাতুলের প্রলাপ মনে করিতেছ?"

শান্তা উত্তর করিল, "মার্জ্জনা করুন মহারাজ! এরূপ ঘটনা কখনও মনে করি নাই; স্বপ্নেও কখন ভাবিনাই। কি কহিব, আমার কি কহিবার আছে, তাও জানিনা। পিতা কখনও চিনি নাই, মাতার স্মৃতিও চিত্তে লুপ্ত প্রায়। আজ মাতার পরিচয় পাইলাম, পিতার চরণদর্শন লাভ হইল, কিন্তু—"

"কিন্তু কি মা?"

"কিন্তু তবু কেন তেমন সুখী হইতে পারিতেছি না। আপনি আমার পিতা, যদি রাজা না হইয়া আমাদেরই মত কোন গৃহস্থ হইতেন,—তবে—তবে বোধ হয় আজ অনেক বেশী সুখী হইতাম। আপনি রাজ্যেশ্বর আমি

গৃহস্থবধূ। পিতা-কন্যার সম্বন্ধ আমাদের মধ্যে,—যেন একটা অসাধ্য অসম্ভব সংযোগের মত মনে হইতেছে।"

রাজা উত্তর করিলেন, "কেন মা ওরূপ মনে করিতেছ? পিতা কন্যার সম্বন্ধ কি অসাধ্য, অসম্ভব সংযোগ হইতে পারে? আজ তুমি গৃহস্থ বধূ বটে, কিন্তু রাজবংশে তোমার জন্ম, কাশ্মীর রাজের দৌহিত্রী তুমি, কালঞ্জর রাজের দুহিতা তুমি,—কেন তুমি আপনাকে এত হীন মনে করিতেছ?

শান্তা ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—

"মহারাজ, আপনি ভুল বুঝিতেছেন। গৃহস্থ বধূ বলিয়া আমি আপনাকে হীন কখনও মনে করি নাই, আজও করিতেছি না। বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমি পরম সৌভাগ্যবতী,—ইহার বড় সৌভাগ্য, ইহার উপর গৌরব আমি জানি না, জানিবার কি ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার নাই। তবু রাজপদ, রাজগৌরব একরূপ,—আমাদের অবস্থা অন্যরূপ। এ দুইয়ে তেমন যেন মিল হয় না। আজ আপনাকে পাইয়া ধন্য হইয়াছি,—কিন্তু নিজেকে রাজকন্যা বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না,—রাজকন্যার পরিচয়ে নিজেকে তেমন সুখীও বোধ করিতে পারিতেছি না। আপনি আমার পিতা,—রাজার মত নয়, আমারই পিতার মত, যেভাবে এখানে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই মধ্যে মধ্যে আপনার সাক্ষাৎ পাইব, স্নেহ পাইব, চরণসেবার অধিকার পাইব, আজ এই ভরসা দয়া করিয়া আমায় দিন, আমি কৃতার্থ হই, আমার প্রাণ শান্ত হউক।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "তাও কি হয় মা? তুমি আমার কন্যা, বিধাতার প্রথমদান, আমার বড় স্নেহের, বড় আদরের, বড় গৌরবের ধন তুমি। রাজপরিবারে রাজার প্রথম কন্যার স্থান অতি উচ্চে। এখন অবধি তোমার যোগ্য পদগৌরবে তুমি থাকিবে।"

শান্তা উত্তর করিল, "মহারাজ, আপনি দেশের রাজা, ধর্ম্মরক্ষক আজ একি আদেশ করিতেছেন? আমি নারী, আমার স্বামী রহিয়াছেন। রাজার ঘরে জন্মিলেও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হওয়াই নারীজীবনের সার ধর্ম্ম। আজ সেই ধর্ম্ম কি প্রকারে আমি ত্যাগ করিব? পিতা হইয়া কন্যাকে আপনি কি ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিতে বলিবেন? রাজার অপত্যও রাজার প্রজা,—রাজা হইয়া কন্যাস্নেহে আপনি কি প্রজার ধর্ম্ম পালনে বাদী হইবেন?"

রাজা কহিলেন, "মা, ধর্ম্ম কেন তোমাকে লঙ্ঘন করিতে হইবে?

শরজিৎ ক্ষত্রিয়-সন্তান—তেজস্বী মহাপ্রাণ—বীর। দেবতার কৃপায় যোগ্যপাত্রে তুমি সমর্পিত হইয়াছ। যদি আমার রাজ সংসারে তুমি প্রতিপালিত হইতে, শরজিৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জামাতা আমি কামনা করিতাম না। শরজিৎ হইতে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইবার অধিকার আমার নাই, এরূপ ধর্ম্মবিরোধী কল্পনাও আমার মনে হয় নাই। আমার রাজধানীতে তুমি ও শরজিৎ উভয়েই রাজকন্যা রাজ-জামাতার যোগ্য সম্মানে, যোগ্য পদগৌরবে থাকিবে।"

শান্তা একটু নীরবে থাকিয়া কহিল, "মহারাজ, আপনার জামাতা যথার্থই তেজস্বী, মহাপ্রাণ বীর। তাঁহার দাসী হইয়া যে সুখে, যে গৌরবে আছি, রাজচক্রবর্ত্তীর মহিষীর পদও তার চেয়ে অধিক সুখের, অধিক গৌরবের বলিয়া আমি মনে করি না। তিনি পুরুষ, আমি নারী, তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী, তিনি প্রভু, আমি দাসী, তিনি বড়, আমি ছোট, তিনি প্রতিপালক আমি প্রতিপালিতা, তিনি আশ্রয়, আমি আশ্রিতা, তিনি রক্ষক, আমি তাঁরি রক্ষিতা। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর এই সম্বন্ধই স্বাভাবিক সম্বন্ধ। ইহাতেই নারী জীবনের সকল সুখ, সকল সম্মান, সকল গৌরব। আজ যদি এই সম্বন্ধ বিপরীত হইয়া যায়, যদি তিনি জানিতে পারেন,—আমি রাজকন্যা, বংশ-গৌরবে, পদগৌরবে, ঐশ্বর্য্য গৌরবে, তাঁহার অপেক্ষা অনেক উপরে ;—যদি তিনি অনুভব করেন, তাঁর সকল সম্মান, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল গৌরব তাঁর রাজকন্যা পত্নী হইতে আসিতেছে, তবে যে ভাবে, যে চক্ষে তিনি এখন আমাকে দেখিতেছেন, সে ভাবে সে চক্ষে আর আমাকে দেখিতে পারিবেন না। আমি যতই বিনয়ে তাঁর সেবা করি, একটু কুণ্ঠিতভাবে তিনি আমার কাছে থাকিবেনই। না মহারাজ, কোন বিষয়ে তাঁর অপেক্ষা বড় হইয়া তাঁর মর্য্যাদার হানি আমি করিতে পারিব না। নিজেও কখনও তাহাতে আমি সুখী হইব না। লতার মত যে বৃক্ষের আশ্রয়ে থাকিয়া নিজকে ভাগ্যবতী মনে করিতেছি, কোনও ভাবে সেই বৃক্ষকে নিজের আশ্রিত করিয়া আমার সুখ-সম্মানের হানি বই বৃদ্ধি হইবে না। আর তিনি তেজস্বী পুরুষ, স্বাধীন গৃহস্থ জীবনে তিনি আপনাকে যেরূপ সুখী ও সম্মানিত মনে করেন, রাজপ্রাসাদজীবী রাজ-জামাতা হইয়া সেইরূপ সুখ সম্মান কখনও তিনি অনুভব করিবেন না। না মহারাজ, তাঁহাকে ছোট করিয়া, তাঁহাকে অসুখী করিয়া, তাঁহার মর্য্যাদার হানি করিয়া আমি কোন সুখ শান্তি অনুভব

করিব না। মার্জ্জনা করুন মহারাজ, কন্যার ধর্ম্ম, কন্যার সুখ শান্তি, যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই দয়া অধিনীকে করুন।

রাজা মুগ্ধচিত্তে কন্যার কথাগুলি শুনিলেন। এমন কন্যার পিতৃত্বে আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইল, নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "ভাল তাহাই হইবে মা! তোমার এইরূপ মতি, এই সংকল্প রাজকন্যারই যোগ্য। ঐশ্বর্য্য গৌরবের প্রলোভনে তোমার দেবহৃদয় আমি কলুষিত করিতে চাই না। যেখানে, যে অবস্থাতেই তুমি থাক, আপনমহত্ত্বে তুমি ধর্ম্মের নিকট, দেবতার নিকট পৃথিবীশ্বরী অপেক্ষাও অনেক অধিক গৌরবে থাকিবে। তোমার পিতা আমি, তোমার দেবদুর্লভ মহিমায় আপনাকে মহিমান্বিত মনে করিব। কিন্তু একটী কথা আমার আছে।"

"কি মহারাজ!"

"কেন মা, তুমি আমাকে বারবার মহারাজ বলিয়া প্রাণে ব্যথা দিতেছ। আমি পিতা,—তোমার কাছে আমি তোমার পিতা,—রাজা নই। নিঃসঙ্কোচে, মমতার টানে আমায় পিতা বলিয়া ডাক,—'পিতা' বলিয়া কাছে নেও, রাজা বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিও না।"

শান্তা লজ্জাবনত আরক্তবদনে বলিল "কি কথা পিতা।"

রাজা উত্তর করিলেন, "শূরজিৎ বিপদে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। সে মহাপ্রাণ বীর—শক্তিমান্ পুরুষ, আমার বহু গুণ-সম্পন্ন প্রজা। যোগ্য পুরস্কারে ইহাকে যোগ্য সম্মানে ভূষিত করা আমার একটি প্রধান কর্ত্তব্য; আর এরূপ প্রকার সহায়তা লাভে রাজাও বহু প্রকারে উপকৃত হইতে পারে। ইহাতে বোধ হয় তোমার কোনরূপ আপত্তির কারণ হইতে পারে না।"

শান্তা উত্তর করিল, "আপনগুণে তিনি যদি কোন উচ্চপদ, উচ্চ সম্মান লাভ করেন, আমি তাহাতে কৃতার্থ হইব। আমার এইমাত্র প্রার্থনা তিনি যে আপনার জামাতা একথা তিনি যেন কখনও না জানিতে পারেন। তাহা হইলে এ সম্মান তিনি আপনার যোগ্যতার পুরস্কার বলিয়া মনে করিবেন না, আমিও তাহাতে আনন্দ কি গৌরব বোধ করিব না। তবে মধ্যে মধ্যে আপনার চরণ দর্শনের অধিকার যেন পাই। বিধাতার কৃপায় আমাদের মধ্যে পূর্ব্বেই যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

রাজকন্যা মণিকুণ্ডলার কথা বিস্মৃত হউন. আপনার নব পরিচিতা গৃহস্থ বধূ শান্তা বলিয়াই আমাকে জানিবেন। অসম্পর্কিতারূপেও আপনার স্নেহ-ভাগিনী বলিয়া আপনাকে পিতৃ সম্বোধনে আমার অধিকার থাকিবে।"

রাজা কহিলেন, "তাহাতেই আমি তৃপ্ত ও ধন্য হইব।"

:

সন্ধ্যার সময় শরজিৎ ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা শরজিৎ ও শান্তাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, শিশুদিগকে স্নেহ-চুম্বন দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কয়েক দিন পরে কোন রাজকর্ম্মচারী আসিয়া আদেশ জানাইল, শরজিৎ অবিলম্বে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। যারপরনাই বিস্ময়ে শরজিৎ শান্তাকে এই সম্বাদ জানাইলেন। শান্তা একটু হাসিয়া কহিল, "বেশ ত, রাজ দর্শন করিয়া আইস। রাজধানী হইতে আমার জন্য কিছু ভাল জিনিস লইয়া আসিও।"

যথা সময়ে শরজিৎ রাজধানী হইতে ফিরিলেন। শান্তা কহিল, "কি সম্বাদ? রাজা তোমাকে ডাকিয়াছিলেন কেন?"

শরজিৎ কহিল, "শান্তা, তুমি জান, রাজ-সেনানীর পরিচয়ে সেই যে আহত অতিথি আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি কে?"

"কে তিনি?"

"তিনিই রাজা।"

"তিনিই রাজা!"

"হাঁ, তিনিই রাজা।"

"তিনি তোমাকে কি বলিলেন? কেন ডাকিয়াছিলেন?"

"আমাতে কি শক্তি তিনি দেখিয়াছিলেন, তিনিই জানেন। এই প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব তিনি আমাকে দিয়াছেন।"

শান্তা কহিলেন, "তবে কি এই গৃহস্থালী, এই চাষবাস, এই পল্লীস্থাপন, এ সব ছাড়িয়া দিবে?"

"এ সব কেন ছাড়িব? এই পদে থাকিয়া, এই প্রদেশে কৃষি বিস্তার, বহু পল্লী স্থাপন, নগর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কত লোক-হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠানের সুযোগই বরং এখন পাইব।"

শান্তা কহিল, "তা রাজধানী হইতে আমার জন্য ভালবস্তু কি আনিলে?"

"এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তার সহধর্ম্মিণীর পদ আনিয়াছি। আর ভাল বস্তু কি চাও, শান্তা?"

শান্তা স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া সাশ্রু নয়নে বড় মধুর একটু হাসিয়া দুই বাহুতে স্বামীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিল। শরজিৎ আবেশভরে দৃঢ় আলিঙ্গনে শান্তাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। শিশু পুত্র-কন্যা দুটি কাছেই ছিল। তারা হাসিয়া ছুটিয়া আসিয়া পরস্পর আলিঙ্গন-বদ্ধ পিতামাতাকে জড়াইয়া ধরিল।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

জাতি রক্ষা

সদাশিব দত্ত আফিসের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া বসিয়া পড়িল। বসিয়া বসিয়া সে শয়ন করিল, শয়ন করিতে না করিতেই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। যেমন নিদ্রাকর্ষণ, অমনি নাসিকা ধ্বনি। সদাশিবের বন্ধু উপেন্দ্রমোহন রায় সদাশিবের সঙ্গেই গঙ্গাকূলে সান্ধ্য ভ্রমণে গিয়াছিল। বন্ধুর তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া উপেন্দ্রমোহন না হাসিয়া আর থাকিতে পারিল না। সে অট্টহাসির তুমুল শব্দে অবশ্য সদাশিবের নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিল না। গভীর নাসিকা ধ্বনি করিয়া সদাশিব নিদ্রা যাইতে লাগিল। উপেন্দ্রমোহন "নির্জ্জীব" বন্ধুকে "সজীব" করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে চিমটিটা আসটা কাটিতে লাগিল, কখন কখন বা একটা-আধটা বিরাশী সিকার ওজনে 'ধাক্কা-ধুক্কি'ও মারিতে লাগিল; কিন্তু সদাশিবের নিদ্রাঘোর কিছুতেই ছুটিল না। সে ধাক্কা বা চিমটি খাইয়া এক-আধ্‌বার "আঃ-উঃ" করিল, এক-আধ্‌বার পাশ ফিরিল—তাহার পরে আবার নিদ্রা। বিরক্ত হইয়া উপেন্দ্রমোহন একটু এদিক-ওদিক বেড়াইল। কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ও শ্রান্ত উপেন্দ্রমোহনের আর একা বেড়াইতেও তেমন ইচ্ছা হইল না। উপেন্দ্র মনে মনে ভাবিল—"বাড়ী চলিয়া যাই"। এমন করিয়া আর থাকিতে পারা যায় না। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ভাবিল—"সদাশিব নিদ্রিত, তাহাকে একা ফেলিয়া রাখিয়াই বা যাই কেমন করিয়া?" নিরুপায়

উপেন্দ্রমোহন বিরক্ত হইয়া অবশেষে নিদ্রিত বন্ধুর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে গীত গাহিতে লাগিল। উপেন্দ্রমোহন সুকণ্ঠ ও গীত-বাদ্য বিশারদ। বাদ্য আর গঙ্গাতটে জুটিবে কোথায়? হস্তে তাল দিতে দিতে উপেন্দ্রমোহন প্রথমে অস্ফুট স্বরে গাহিতে লাগিল—সে স্বর লজ্জা-বিজড়িত যেন শিক্ষা-নবীসের সঙ্গীতালাপ গাহিতে গাহিতে পরে সে লজ্জা টুটিয়া গেল। উপেন্দ্রমোহনের স্বর ক্রমে 'তারার ধৈবতে' উঠিল। ইমনের সহিত কল্যাণ মিশ্রিত করিয়া উপেন্দ্রমোহন তখন গাহিতেছে—

জয় শিব শঙ্কর হর দিগম্বর
প্রসীদ পরমেশ্বর ;
পিণাকী ত্র্যম্বক ত্রৈলোক পালন
মহেশ গঙ্গাধর।

অসন বসনহীন বৃষভ বাহন
বিভূতি মণ্ডিত ফণীন্দ্র ভূষণ,
শ্মশানচারী ভব ভয়হারী
ভূতনাথ যোগেশ্বর
অধমে তারয় তারাপতি মহেশ্বর ॥

সে স্বর-লহরীতে আকৃষ্ট হইয়া বিস্তর লোক সেস্থানে সমবেত হইল। উপেন্দ্রমোহনের বাহ্য জ্ঞান নাই। সে এক মনে উদ্‌ভ্রান্ত পরাণে গাহিয়াই যাইতেছে—"প্রসীদ পরমেশ্বর"। উপেন্দ্রমোহনের ভাব-সমাধি দেখিয়া কেহ আর বড় তাহার নিকটে উপবেশন করিল না। সকলেই একটু দূরে দূরে উপবিষ্ট হইল। সমাধিস্থের সমাধি ভঙ্গ করিতে কাহারও বড় আর প্রবৃত্তি হইল না। যখন সে সঙ্গীত থামিল তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে—চন্দ্রকিরণে স্নাত পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, দিক দিগান্তরে সে সঙ্গীতালাপের প্রতিধ্বনি তখনও পর্য্যন্ত রহিয়া রহিয়া যেন উত্থিত হইতেছে। যে সে প্রতিধ্বনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল, যাহার কাণের ভিতর দিয়া সে ধ্বনি মরমে পশিল, সে বুঝিল সাধকের সাধনা ব্যর্থ হইবার নহে।

সঙ্গীত শেষ করিয়া উপেন্দ্রমোহন, নিদ্রামগ্ন সদাশিবের হস্তপদ ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল "ওরে হতভাগা উঠ্‌বি না, রাত হ'ল যে!" অনেক টানাটানি হানাহানির পর সদাশিব "এঁ্যা উঁ" করিয়া অবশেষে উঠিয়া বসিল

এবং চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, "কত রাত হে। তা' হ'ল ভাল। বাড়ীতে জবাব দিবার একটু সুবিধা হ'বে।"

উপেন্দ্রমোহন হাসিতে হাসিতে বলিল—

"কিহে, এখন ঘুমের ঘোর আছে নাকি? কি বক্‌ছ?"

"না ভুল বকিনি ভাই! তবে বেসুরো হতে পারে—কিন্তু ভুল নয়।"

"ব্যাপারটা কি? গিন্নির সঙ্গে বচসা টচসা হয়েছে নাকি? বাড়ী যাবার নামটা নেই, রকমটা কি, তা' বল দেখি।"

"আমার যে রকম ভাই, তা'র আর ফের নাই। কিম্বা খুব আছে। অথবা ফেরও আছে, ঘোরও আছে। বুঝলে? ইন্দু খুব মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে যে। সেই জন্যে গিন্নি ত রোজই তাড়া যাচ্চেন। কিন্তু ভাই করি কি?"

"হাঁহে, সত্যিই ত ইন্দুর বিয়ের তুমি কচ্চ কি? মেয়েত বেশ বড় হয়ে উঠেছে।"

"যা'ক, এইবার বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করতে হ'ল দেখ্‌ছি। যখন ঘরে বাইরে তাড়া আরম্ভ হয়েছে, তখন আর সংসার করি কেমন ক'রে বল? ছি বন্ধু। আমি গরীব ব'লে তুমি পর্যান্ত বিগড়ে গেলে!"

"তুমি বল্‌ছ কি সদাশিব?"

"ধেড়ে মেয়ের গরীব বাপে যা' বলে। একটা পয়সার সংস্থান নেই, তা'র উপর সাত সাতটা মেয়ে। অর্থাভাবে সংসার চালাতে পারি না, দু পাঁচ হাজার খরচ ক'রে মেয়ের বিয়ে দি কেমন ক'রে বল দেখি? তাও একটা-আধটা নয়—সাত সাতটা।"

"হুঁ, তোমার দুঃখের কারণ আছে বটে। কিন্তু তা'র উপরে আর হাত কি বল ভাই? মেয়ে হয়েছে, বিয়ে দিতেই হ'বে। তা'র জন্যে আমার কাছে কিম্বা তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর কাছে হাত পা ছুঁড়ে আর লাভ কি? মেয়ের বিয়ে ত তা'তে বন্ধ থাকবে না।"

"তবে এইবারে চুরী বাটপাড়ি করি—ত' না হলে ত বিয়ের টাকার যোগাড় হ'বে না। আর না হয় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করি—সব আপদ চুকে যা'বে।"

"সমাজের এখন যে রকম অবস্থা; তা'তে এমনি ইচ্ছাই হয় বটে। ছেলের বাপ যা'রা, এখনকার কালে তাদেরই বিশের সুবিধা। বাবুরা

সভা-সমিতি ক'রে ত সব করলেন। বরং ছেলের বাজারে আরও আগুণ ধরে গেছে। আগে বরং দু-চার হাজার দিয়ে পার পাওয়া যেত। এখন তা'র উপর ঘর সাজাবার জন্য চেয়ার, টেবিল, আল্‌মারি, আল্‌না নাগাদ্‌ নস্যির ডিবে, চখের চসমাখানি পর্য্যন্ত দিতে হয়। ছ্যা, ছ্যা—ছেলের বাপ গুলো বিয়েয় ঘেন্না ধরিয়ে দিলে।

"দেখ অপি, আমরা যদি একটা কাজ করতে পারি, তা' হলে এ আগুণে জল পড়ে। কিন্তু তা' কি কেউ করবে।"

"এর মধ্যে আবার কি উপায় ঠাউরে ফেল্লে হে, শুনিই না।"

"দেখ, এই মেয়ের বাপেরা যদি একমত হয়ে স্থির করে যে তা'রা মেয়ের বিয়ে আর দিবে না, ছেলের বাপেরা তখন কি করে—তা' হলে একবার দেখা যায়। ছেলেরা তখন নিজেরাই এসে হয়ত মেয়ের বাপের পা জড়িয়ে ধরে। তখন পাত্রপক্ষের দশ হাজার বিশ হাজার টাকা একবার বেরিয়ে যায়। কি বলব, আমার তেমন বক্তৃতা ফক্তৃতা দিবার ক্ষমতা নেই, তা' থাক্‌লে এই কথা নিয়ে একবার আগুণ ছুটিয়ে দিতেম।"

"কন্যাদায় মানুষকে এমনই পাগল ক'রে তুলে বটে। যা'ক ও সব বৃথা কথার আন্দোলনে কোন ফলই নেই। হাঁদুর বিয়ের কথা তুমি তোমার দাদাকে লিখে পাঠাও। তাঁ'র ত টাকা আছে, হাঁদুর বিবাহে তিনি কি কিছু দিবেন না?"

"দিতেন যদি দাদার ঘাড়ে দাদার স্ত্রীরূপিণী পেত্নীটি আর দাদার শ্বশুররূপী অপরূপ জানোয়ারটা না থাক্‌ত। দাদা এখন নেহাত পর হয়ে গেছেন। তিনি আমার সংসারের কোন কথাতেই থাকতে চান্‌ না—কিম্বা তাঁ'র 'আপনার জন' তাঁকে থাক্‌তে দেয় না। অতএব সেখানে কোন চেষ্টা চরিত্র বৃথা।"

"তবে উপায়?"

"নিরুপায়।—হয় সংসার ছেড়ে আমায় পালাতে হ'বে, না হয় ছানা-গুলোকে গঙ্গার জলে ডুবুতে হ'বে। কি উপায় আর করব! উপায়ের মধ্যে ত ভদ্রাসন বাড়ীর আড়াই কাঠা জমী। তা'রও ভাগ আছে। আমি কি উপায় করব—তুমিই না হয় বাৎলে দাও।"

"দিব। পাত্র স্থির হয়েছে?"

"টাকার ঝন্‌ঝনানি থাক্‌লে তা'র অভাব কি?'

"জেঠামী রেখে সোজা কথায় বল—কারো সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা হয়েছে?"

"হয়েছে—তিন হাজার টাকা চায়। আমি পাই কোথা বল?"

"ছেলে কেমন, ঘর কেমন?"

"তা' চলন সই।"

"বেশ, সেইখানেই ঠিক কর।"

"টাকা?"

"আমি আমার স্ত্রীর গহনা বেচে দিব।"

উপেন্দ্রমোহন আর সে স্থানে দাঁড়াইল না—তীরবেগে চলিয়া গেল। সদাশিব কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ সে স্থানে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিল পরে ধীরে ধীরে আপন গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। গহনা বেচে দিব—কথাটা সদাশিবের হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিতে লাগিল।

২

সদাশিবের কন্যা "হাঁদি" ওরফে শ্রীমতী রাধারাণীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। অলঙ্কার, দানসামগ্রী ও নগদ বিদায় লইয়া পাত্রপক্ষকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা দিতে হইবে। তাহা ভিন্ন "ঘর-খরচ" আছে।

স্ত্রীর অলঙ্কার ও অন্যান্য কিছু সামগ্রী বিক্রয় করিয়া উপেন্দ্রমোহন দুই সহস্র সাত শত মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছে। অবশিষ্ট টাকা সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া উপেন্দ্রমোহন একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। সদাশিব বিস্তর চেষ্টা করিয়া চারিশত টাকা সংগ্রহ করিল। কিন্তু এখনও ত বাকী অনেক। উপেন্দ্রমোহন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল ভেবে আর কি হ'বে। নিরুপায়ের উপায় ভগবান।

পরোপকারী বলিয়া উপেন্দ্রমোহনের একটা খ্যাতি ছিল। সেই খ্যাতি বলেই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, ঘৃত ময়দা সন্দেশ প্রভৃতি উপেন্দ্রমোহন ধারে পাইল। স্বর্ণকারের দোকানে অলঙ্কারের মজুরী গণ্ডাও বাকী রহিল। এইরূপ ব্যবস্থায় বিবাহের ব্যাপারটা এক প্রকার সুবিধার অবস্থায় খাড়া করা হইল। পাত্র পক্ষকে পাঁচ শত টাকা দিয়া নগদ বিদায় করিতে হইবে—সেইখানেই একটু গোল বাধিল। তবে উপেন্দ্রমোহনের হস্তে এখনও নগদ সাড়ে তিন শত টাকা আছে। সেই জন্যই তাহার একটু ভরসা হইল। বাকী টাকা মাত্র দেড়শত। উপেন্দ্রমোহন ভাবিল—"তাহাও যোগাড় হইয়া যাইবে।"

বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, লগ্ন স্থির হইয়াছে। বরপক্ষ গাত্র হরিদ্রার তত্ত্ব পাঠাইয়াছেন—সে তত্ত্বে লোক আসিয়াছে—প্রায় চল্লিশ জন। লোক বিদায় করিতে চল্লিশ টাকা খরচ হইয়া গেল। অন্যান্য দুই একটা অত্যাবশ্যকীয় খরচেও প্রায় ষাইট্ টাকা গেল। উপেন্দ্র মোহন দেখিল আড়াই শত টাকার অভাব হইতেছে। সে তখন ভাবিতেছে, টাকাটা কোন না কোন প্রকারে জুটিয়া যাইবে।

আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া বাদা-ভাণ্ড সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বর আসিল। বিবাহ—গোধূলি লগ্নে: বিবাহ বাটীতে গোলযোগ পড়িয়া গেল। "আসুন, আসুন, বসুন, বসুন, তামাক দেরে, ওরে শঙ্করা, ও ঠাকুর, ওহে গৌরহরি" প্রভৃতি শব্দে বিবাহ বাটী মুখরিত হইয়া উঠিল। সুসজ্জিত বরযাত্রীরা মুরুব্বীয়ানা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল,—দান সামগ্রী দেখিতে লাগিল, বিবাহের পত্র, পড়িতে লাগিল। অন্তঃপুরে মহিলা মজলিসেও 'সোরগোল' উঠিতে লাগিল। আর বালক বালিকাগণের আজ আনন্দের আর সীমা নাই। সদাশিবের বাটী বিবাহোৎসবে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। নিরানন্দ কেবল সদাশিব ও উপেন্দ্রমোহন। তাহারা "আড়াইশত" টাকার চিন্তাতেই মুহ্যমান।

সভাস্থ ভদ্র মহোদয়গণের অনুমতি লইয়া বরকে বিবাহসভা হইতে উঠিতে হইল। "বর" যখন "আলপনা" দেওয়া পিঁড়ির উপর উঠিতে যায় তখন বরকর্ত্তা সদাশিবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বেহাই টাকাটা কম্ কম্ ঠেক্‌ছে নয়?" সদাশিব মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে কহিল "আজ্ঞে কিছু কম্ আছে বটে—সেটা—এঁ সেটা যদি—"

বরকর্ত্তা "বর"কে কি ইঙ্গিত করিল। "বর" পিছাইয়া দাঁড়াইল।

বরকর্ত্তা সদাশিবের প্রতি ভ্রূকুটী করিয়া কহিল——"সেটা যদি কি?"

উপেন্দ্রমোহন এতক্ষণ স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়াইয়াছিল। বরকর্ত্তার ভ্রূকুটী দেখিয়া সে বরকর্ত্তার নিকটে আসিয়া বিনয় সহকারে কহিল—"মহাশয় কিছু টাকা কম্ আছে, সেটা আমরা দুই পাঁচ দিনের ভিতর আপনার কাছে হাজির করিব।"

"হুঁ—কত কম্?"

"আজ্ঞে আড়াই শত।"

"ভাল, সে টাকা যখন দিতে পার্ব্বেন, তখন আমি পুত্রের বিবাহ দিব।

আয় নরু আয়।" বরের নাম নরেন্দ্র। নরেন্দ্র পিতৃসঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। বিবাহ বাটীতে একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল উঠিল। অন্তঃপুরে মহিলাগণ ক্রন্দন করিয়া উঠিল। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সদাশিব বিবাহ সভায় সংজ্ঞা শূন্য হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া গেল।

উপেন্দ্রমোহন গললগ্নীকৃতবাসে বরকর্ত্তাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিল, অনেক সাধ্য সাধনা করিল, আড়াই শত টাকার এক খানা খত পর্য্যন্ত লিখিয়া দিতে চাহিল। কিন্তু বরকর্ত্তা কিছুতেই বিবাহ কার্য্যে সম্মতিদান করিল না। সে বলিতে লাগিল—"আমি হ্যাণ্ডনোটের ব্যবসায় করিতে আসি নাই যে ভদ্রলোকের নিকট হইতে হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইব।" বরকর্ত্তা অনেক যুক্তির অবতারণা করিল। সে সকলকে বুঝাইয়া দিল, যখন আরম্ভেই এই গোলযোগ, তখন শেষে যে কি দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব এরূপ স্থানে পুত্রের বিবাহ দেওয়া কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে।

বিবাহ সভায় নানা প্রকারের লোক - সুতরাং নানা প্রকারের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। যাহারা সদাশিবের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিল, তাহাদের সহিত অনেক বরযাত্রীর ও বরকর্ত্তার তর্ক বিতর্ক হইল সে তর্ক বিতর্ক ক্রমে অপ্রিয়ভাবে পরিণত হইল। তাহার ফলে বরপক্ষ "বর" উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। বিবাহ বাটীতে তুমুল কলরব উত্থিত হইল। পল্লীবাসিগণ সে কলরবে যোগদান করিল।

সকলে বলিতে লাগিল—কন্যা লগ্ন ভ্রষ্টা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। এখন যেমন করিয়া পার, অন্য একটী পাত্রের সন্ধান কর। নতুবা কন্যার ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট হইবে।

কিন্তু পাত্র তখন পাওয়া যায় কোথায়? উপেন্দ্রমোহন তখন বলিতে লাগিল—"হায় এ সময়ে আমার যদি একটা কানা খোঁড়া ছেলেও থাকিত তা হলে আমি সদাশিবের জাত রক্ষা করিতে পারিতাম।" উপেন্দ্রমোহনের বন্ধুত্ব ও মহত্ত্ব দেখিয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী বিস্মিত হইল।

যখন এই সকল ব্যাপার চলিতেছে, তখন একটী মাধুরী-মণ্ডিত সুন্দর যুবক—অথবা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান একটী সুন্দর বালক উপেন্দ্রমোহনের নিকটে আসিয়া কহিল—"মহাশয়, যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয় বা জাতি রক্ষা হয়, আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।" উপেন্দ্র-

মোহন তাহার দিকে একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিল, তাহার পর সে যুবকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "তুমি নরাকারে দেবতা"। স্তব্ধ জনমণ্ডলী আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল।

রাধারাণীর সহিত প্রভাতকুমারের বিবাহ হইয়া গেল। প্রভাতকুমার কুলীন কায়স্থ, ধনবান, রূপবান বিদ্বান। প্রভাতকুমার দেখিল তাহার বিবাহিতা স্ত্রী রূপসী নহে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা—তবে মুখশ্রী মন্দ নহে। তাহাতে প্রভাতকুমার ক্ষুণ্ণ হইল না। সে মনে মনে ভাবিল "যাহা ধর্ম্মসাধনের উপায় তাহা আবার সুন্দর অসুন্দর কি? আর সৌন্দর্য্য মনে। সৌন্দর্য্য উপলব্ধির সহিত লালসার পূতিগন্ধ কেন থাকিবে।

এইরূপ দার্শনিক বিচার করিয়া প্রভাতকুমার রাধারাণীকে ধর্ম্মপত্নী রূপে গ্রহণ করিল। সে বিবাহে সদাশিব কিম্বা উপেন্দ্রমোহনের একটী কপর্দ্দকও খরচ হইল না। সদাশিব, উপেন্দ্রমোহন, রাধারাণী ও রাধারাণীর মাতার চক্ষে কৃতজ্ঞতার অশ্রু দেখিয়া প্রভাতকুমার বলিল—"এই উপহারই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আজ যে আনন্দ আমি পাইয়াছি ও যে আনন্দ আপনাদের দান করিতে পারিয়াছি, তাহার তুলনায় স্বর্ণ রৌপ্য কত ক্ষুদ্র। আমি সে ক্ষুদ্র উপহারের প্রয়াসী নহি।"

সকলে বিস্মিত নেত্রে প্রভাতকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রভাতকুমার উপেন্দ্রমোহনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—"দেখুন, গঙ্গাতীরে যে দিন আপনাদের কথোপকথন হয়, সে রাত্রিতেও আমি সে স্থানে উপস্থিত ছিলাম আর আজ বিবাহ সভায় বরযাত্রীরূপে এ স্থানে আসিয়াছিলাম। তাহাতে বুঝিলাম নরাকারে দেবতা আপনি—আমি আপনার অনুগত শিষ্য মাত্র।"

উপেন্দ্রমোহন গদগদ স্বরে প্রভাত কুমারকে বলিল—"তুমি অতুলনীয়।"

প্রভাতকুমার গম্ভীরভাবে বলিল—"আর আপনি তুলনার অতীত"

বর ও কন্যা লইতে পরদিন প্রভাতকুমারের পিতৃদেব আসিলেন। তিনি বলিলেন—"প্রভাত বেশ করেছে, হিন্দু হয়ে হিন্দুর জাত রেখেছে।"

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

ছবির দাম

এবার শিমলা চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রভাতকুমারের একখানি চিত্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। ইহা প্রভাতকুমারের মত নবীন চিত্রকরের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নহে। তাহার উপর ছবিখানি যখন উচ্চদরে বিক্রীত হইল, তখন প্রভাতকুমারের আর আনন্দের সীমা রহিল না। প্রভাত-কুমারের অবস্থা তত ভাল ছিল না, সেই টাকার অধিকাংশ মাতার হস্তে দিয়া প্রভাতকুমার অনেক দিনের সাধ মিটাইবার আশায় অজন্তা ও ইলোরের গুহা-চিত্র দেখিতে বাহির হইয়া পড়িল।

শীতের অন্ধকার, কনকনে রাত্রের মধ্যে ছুটিতে ছুটিতে পুনা নাসিকের মেল হঠাৎ একটি ছোট ষ্টেসনের কাছে আসিয়া থামিয়া গেল। মেল কখনও সে ষ্টেসনে থামে না, হঠাৎ অনেকক্ষণ থামিতে দেখিয়া বিশেষ কৌতুহলী দু'-একজন লোক সেই শীতের রাত্রির জড়তা ত্যাগ করিয়া ষ্টেশনের লোকজনকে প্রশ্নের উপর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু সন্তোষ জনক উত্তর কেহই পাইল না; কিন্তু ভয়ানক সংবাদটা বেশীক্ষণ কিছুতেই চাপা রহিল না। অগ্রবর্ত্তী ষ্টেশনের খুব নিকটে একটা ভীষণ ট্রেণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে, লাইন ঠিক করিতে অন্ততঃ পক্ষে খুব কম বার ঘণ্টা লাগিবে। এই সংবাদ স্বল্পক্ষণের মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

গাড়ীতে আর বাঙ্গালী যাত্রী কেহ ছিল না। কেবল মাত্র এক প্রভাত-কুমার। গাড়ী বার তের ঘণ্টা ষ্টেশনে থাকিবে শুনিয়া অনেকের মুখে বিষাদের চিহ্ন খুব স্পষ্ট দেখা গেল; কিন্তু প্রভাতকুমারকে যেন এ সংবাদে অনেকটা আহ্লাদিত বোধ হইল। প্রভাতকুমারের ইচ্ছা এই সুযোগে এই দেশটা একবার দেখিয়া লয়।

পূর্ব্বদিক ক্রমশঃ লাল হইতে আরম্ভ হইল। প্রভাতের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সেই ঈষৎ স্পষ্ট, ঈষৎ অস্পষ্ট আলোকে সেই সুন্দর পাহাড়ের দৃশ্য আরও সুন্দর দেখাইতে লাগিল। প্রভাতকুমার তখনই সেই স্থানে নামিয়া সহরের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল।

সে স্থানের দৃশ্য দেখিয়া প্রভাতকুমার মুগ্ধ হইল। দুইপার্শ্বে সবুজ পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাহাড়ের উপর হইতে ঝরণার জল ঝরিয়া পড়িয়া সর্পাকারে বহিয়া আসিতেছে, পাহাড়ের গায়ে খাদ কাটিয়া

পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। রাস্তা বড়ই সঙ্কীর্ণ দুইখানি ছোট টম্‌টম্ অনেক কষ্টে এক সঙ্গে যাওয়া আসা করিতে পারে। রাস্তার বামদিকে পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; আর দক্ষিণ দিকে নাবাল জমী অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে পার্শ্বের নাবাল জমী এত নিম্নে যে রাস্তার কিনারায় দাঁড়াইয়া নীচের দিকে চাহিলে মাথা ঘুরিয়া যায়।

প্রভাতকুমার ভাবী চিত্রের একখানা প্রচ্ছদ পট কল্পনা করিতে করিতে যাইতেছিল। এমন সময় দূর হইতে একখানা টমটম খুব জোরে সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিতে পাইল। টমটম খানিকে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রভাতকুমার পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া দাড়াইল। দেখিল টমটম খানি একটি রমণী একা বসিয়া চালাইতেছে। রমণী মহারাষ্ট্র জাতীয়া, যুবতী, বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিতা. দেখিলেই বড় ঘরের স্ত্রীলোক বলিয়া মনে হয়। প্রভাতকুমার ভাবিয়াছিল রমণী চলিয়া যাইবে, সেইজন্য রাস্তার একপার্শ্বে সরিয়া দাড়াইয়াছিল; কিন্তু রমণী তাহাকে দেখিয়া গাড়ী থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে রেলের যাত্রী বলিয়া মনে হইতেছে। সকালের ডাউন ট্রেন খানা এসেছে কি? আজ এই ট্রেন খানার অসম্ভব দেরী হইতেছে।"

প্রভাতকুমার বলিল, "আমি আপ ট্রেনের যাত্রী; সকালের ডাউন গাড়ীতে এবং আর একখানা মাল গাড়ীতে ভয়ানক সংঘর্ষ হয়ে গেছে। বোধ হয় আটদশ মাইলের দূরে এ কাণ্ড ঘটেছে।"

একথা শুনিয়া আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় রমণীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া রহিল, যেন সে কথাটা সে পুরো বিশ্বাস করিতে পারিল না। শুষ্ক কণ্ঠে প্রভাতকুমারকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ঠিক জানেন কি সংঘর্ষ হয়েছে?"

প্রভাতকুমার বলিল "সেই জন্যই আমাদের গাড়ী এখনও এই ষ্টেশনে আটকাইয়া আছে; বোধ হয় এখনও বার তের ঘণ্টা থাকিবে।

রমণী এই কথা শুনিয়া আর কোনও কথা না বলিয়া ষ্টেশনের দিকে টমটম ছুটাইয়া চলিয়া গেল। ভয়ের চিহ্ন তাহার মুখে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল।

টমটমখানি চলিয়া গেলে প্রভাতকুমার আবার সহরের দিকে [illegible] আরম্ভ করিল।

অল্পক্ষণ পরে সেই পথ দিয়া টমটমখানি আবার ফিরিয়া আসিল। এবার

রমণীর মুখে আর সে বিষাদের চিহ্ন নাই ; আনন্দে উৎফুল্ল। প্রভাতকুমারকে দেখিয়া আবার গাড়ী থামাইল। প্রভাতকুমারের নিকট হইতে সেই ভয়ানক দুর্ঘটনার কথা সর্ব্বাগ্রে শুনিয়াছিল, তাহার নিকট তাহার মনের উৎকণ্ঠা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ভাবিল তাহাকে এ সংবাদ সর্ব্বাগ্রে দেওয়া দরকার, হয়ত সেই জন্য গাড়ী থামাইয়া প্রভাতকুমারকে বলিল "ঐ যে ডাউন গাড়ীর সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়েছে ঐ গাড়ীতে আমার বাবা ও ভাইএর আসবার কথা ছিল, কিন্তু কার্য্য গতিকে ঐ গাড়ীতে তাঁরা উঠেন নাই। ষ্টেশনে এই মাত্র টেলিগ্রাম পেলাম, তাঁরা কাল আসবেন। ভগবান আজ তাঁদের রক্ষা করেছেন।"

এই কথা বলিয়া রমণী গাড়ীখানা চালাইতে উদ্যত হইয়া ঘোড়াকে চাবুক মারিল এক ঘা চাবুক খাইয়া ঘোড়াটি যাই চলিতে যাইবে, অমনি তাহার পদ-স্খলন হইল, সে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল ; তারপর লম্বা ওভার কোট পরা প্রভাত কুমারকে দেখিয়াই হউক, আর বহুনিম্নের সমতল ভূমির দিকে চাহিয়াই হউক, ঘোড়াটি বড় ভয় পাইল। ভয়ে সামনের পা দুটি উপরে তুলিয়া ছুটিতে ছুটিতে পর্ব্বতের কিনারার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রভাতকুমার রমণীর আসন্ন বিপদ বুঝিল। আর কালবিলম্ব না করিয়া ঘোড়াটির মুখের লাগাম সবলে টানিয়া ধরিল। ইহাতে ঘোড়াটি আর অগ্রসর হইতে পারিল না বটে, কিন্তু আপনাকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত খুব জোর করিতে লাগিল। প্রভাতকুমার তাহাকে প্রাণপণবলে টানিয়া ধরিয়া তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার বোধ হইতে লাগিল যে তাহার হাত দুটি বুঝি দেহ হইতে ছিন্ন হইয়া গেল। ঘোড়াটি তখন পর্ব্বতের কিনারাতে আসিয়া পড়িয়াছে আর এক পা পিছাইলে নিশ্চয় মৃত্যু। পর্ব্বতের গায়ে গড়াইয়া কোথায় চলিয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই।

রমণী ইচ্ছা করিলেই তখন টমটম হইতে নামিয়া আপনার প্রাণ বিপদ-হীন করিতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে প্রভাতকুমারের বিপদ ও তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। উপর হইতে ঘোড়াটির মুখের লাগাম একটু ঢিলা পড়িলেই টমটম সুদ্ধ প্রভাতকুমারের উপর আসিয়া পড়িবে। প্রভাতকুমারের সাধ্য কি যে তাহার গতি রোধ করে।

সেই বিপদের মাঝে রমণী অসম্ভব ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া লাগাম টানিয়া টমটমে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে এইরূপ দুই দিক হইতে টানাটানিতে ঘোড়াটির জিব কাটিয়া খানিকটা রক্ত বাহির হইল; মুহূর্ত্তের জন্য ঘোড়াটি শান্ত হইল। প্রভাতকুমার সেই অবসরে ঘোড়াটির মুখ টানিয়া রাস্তার দিকে ফিরাইয়া দিল। সমগ্র বিপদ কাটিয়া গেল।

রমণীর সুন্দর অধরে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার একটা নম্র হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রমণী ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেল। যতদূর দেখা যায় প্রভাতকুমার একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সহরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

প্রভাতকুমার সহরের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিল, তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রভাতকুমারকে একটি সরাইতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল সে স্থানে সে বেলা খাওয়া দাওয়া করিয়া সুস্থ হইয়া বিকালে সহর দেখিতে বাহির হইল। তথায় নানা প্রকার কারুকার্য্যযুক্ত অনেকগুলি মন্দির ছিল। প্রভাতকুমার সে সকলগুলির সৌন্দর্য্য দেখিয়া এত বিভোর হইয়া গেল যে সকালের সেই বিপদের কথা, সন্ধ্যার সময়ে গাড়িতে ফিরিবার কথা, একবারেই ভুলিয়া গেল। সে ফিরিয়া আসিয়া গাড়িতে যাইবার যখন উদ্যোগ করিতে লাগিল তখন খবর পাইল যে প্রায় আধঘণ্টা পূর্ব্বে গাড়িখানি ষ্টেসন ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। অগত্যা প্রভাতকুমারকে সে রাত্রে সেই স্থানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিতে হইল।

সারাদিন সহরের এ দিক ও দিক ঘুরিয়া প্রভাতকুমার বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সন্ধ্যা হইতেই শুইয়া পড়িল। সে স্থানের পাহাড়ের মনোরম সৌন্দর্য্য ও মন্দিরের প্রাচীন শিল্পকলার চিত্র-পদ্ধতি তখন প্রভাত কুমারের মনের অনেকাংশ অধিকার করিয়াছিল। সে সময়ে সে সেই সকল সৌন্দর্য্য মিশাইয়া একখানি নূতন দৃশ্যপটের কথা ভাবিতেছিল। সেইকথা ভাবিতে ভাবিতে প্রভাতকুমার তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল; এতক্ষণ সে কথাটা মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুপ্তাবস্থায় মনের ভিতর দিয়া বায়স্কোপের মত দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন করিতে করিতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। অবশেষে যেন অন্য দৃশ্য—রেল টমটম পাহাড় উপত্যকা কোথায়

মিশাইয়া গেল, কেবল মাত্র রমণীর সুন্দর মুখাবয়ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সুস্পষ্ট ভাবে মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। প্রভাত কুমারের তন্দ্রা হঠাৎ তখন একবার ভাঙ্গিয়া গেল। তখন যেন রমণীর মুখের প্রত্যেক রেখাটি, অতিক্ষুদ্র বক্ররেখাগুলি পর্য্যন্ত, প্রত্যেক বর্ণসম্পাত ছবির মত চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রভাতকুমার দৈবপ্রেরণায় সেই দুর্লভ ঘটনাটি পরিত্যাগ করিল না। তখনই ট্রাঙ্ক হইতে ছবি আঁকিবার সমস্ত সরঞ্জাম বাহির করিয়া একখানি সুন্দর স্কেচ্ করিতে আরম্ভ করিল। স্কেচ্ করিতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগিল না। রং দিবার নিমিত্ত তাহাকে চারি-দিনের জন্য রাখিয়া দিল।

৩

চিত্রকরের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন প্রতিপাদ্য বিষয়টি চোখের সামনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাকে তুলিকা ও রং-এর সাহায্যে ফুটাইয়া তোলা খুবই সহজ। তখন না করিলে অন্য সময়ে হাজার চেষ্টাতেও তাহা অসম্ভব। প্রভাতকুমার দৈবশক্তির এই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া ছবিখানি শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই রহিয়া গেল। দুই তিন দিন ধরিয়া অনবরত খাটিয়া একখানা সুন্দর ছবি প্রস্তুত করিল। পাহাড়ের একটি ঝরণার পার্শ্বে একটি রমণীমূর্ত্তি আপনার মনে বসিয়া আছে এইরূপ ছবির কল্পনা করিল। রমণীকে বাঙ্গালীধরণের কাপড় পরাইল; নাম দিল "নির্ঝরিণী।"

তাহার পর ছবিখানিকে তখ্নরের একটি ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিল।

৪

সমস্তদিনে সেই সরাইয়ে সে দেশের অনেক লোক যাতায়াত করিত, সরাইএর বড় ঘরখানিতে একখানি নূতন ছবি টাঙ্গান দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়া ছবিখানিকে একবার করিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিল। কেহ কেহ বা এটা কোন্ দেশের রমণী, কে আঁকিয়াছে ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বাঙ্গালী এত সুন্দর ছবি আঁকিতে পারে দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হইল।

প্রভাতকুমার তখন নাই। বাজার হইতে কিছু জিনিষপত্র কিনিতে গিয়াছে, সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইবে, এমন সময়ে কতকগুলি লোক ছবিখানি দেখিতেছিল। তাহাদের মধ্যে দেখিতে

দেখিতে একজন বলিল ছবির রমণীর মুখখানি অনেকটা মুখলরাওএর কন্যা তারা বাইএর মতন না?" তখন উপস্থিত সকলেরই চোখে যেন নূতন দৃষ্টি-শক্তি ফুটিয়া উঠিল, সকলেই এবার দেখিতে পাইল এটি মুখলরাওয়ের কন্যার ছবি, বাঙ্গালী কাপড় পরাইলে কি হইবে, ঠিক স্পষ্টই তাহাকে চেনা যাই-তেছে। এটা যে তারাবাইএর ছবি তাহাতে আর কোন ভুল নাই।

ক্রমশঃ এ সংবাদ তারাবাইএর ভ্রাতা গণেশলালের কাণে আসিয়া পৌঁছিল।

প্রকাশ্য স্থানে তাঁহার ভগিনীর ছবি বাঙ্গালী ধরণের কাপড় পরাইয়া টাঙ্গাইয়া রাখা ধনী, গর্ব্বিত গণেশলালের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল, সে তখনই ঘোড়ায় চড়িয়া সরাইএর দিকে ছুটিল।

গণেশলাল যখন ছবির সাম্‌নে আসিয়া ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ ছবিখানি কার?"—তখন তত্ত্বরদার ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "এ ছবিখানি এক বাঙ্গালী বাবুর,—তিনি এখন এখানে নাই।"

গণেশলাল তখন ছবিখানি দেওয়াল হইতে খুলিয়া লইয়া বলিল "এই ছবিখানি আমি লইয়া চলিলাম, সে বাঙ্গালী বাবুকে বলিও, যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

গণেশলাল ছবিখানি জোর করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। তত্ত্বরদার তার সেই অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া কিছু বলিতে সাহস করিল না।

প্রভাতকুমার ফিরিয়া আসিয়া তত্ত্বরদারের মুখে সব শুনিল। তাহার জীবনের একখানি শ্রেষ্ঠ ছবি, সেই রমণীর ভ্রাতা জোর করিয়া লইয়া গিয়াছে, ইহাতে তাহার মনে বড়ই কষ্ট হইল। তখন সে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মুখলরাওএর বাড়ীরদিকে ছুটিল।

পাহাড়ের পথে যাইলে, গাড়ী বা ঘোড়ার পথের চেয়ে ঢের আগে পৌঁছান যায়। প্রভাতকুমার তাড়াতাড়ি পাহাড়ের পথ ধরিয়া ছুটিল।

প্রভাতকুমার যখন গণেশলালের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল তখনও গণেশ-লাল ফিরে নাই। সে গাড়ীর পথ দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছিল, মাঝে ঘোড়াটিও একবার লাফালাফি আরম্ভ করিয়াছিল, সেজন্য দেরি হইয়া গেল।

মুখলরাওএর বাড়ীর সম্মুখে একটি দারবান বসিয়াছিল, তাহার নিকট প্রভাতকুমার শুনিল গণেশলাল তখনও ফিরে নাই, শীঘ্রই আসিতে পারে

তখন সে মুধলরাওএর সহিত দেখা করিতে চাহিল, দারবানটি বাহিরের বসিবার ঘরটি খুলিয়া দিয়া প্রভাতকুমারকে বসিতে বলিয়া, বৃদ্ধ মুধলরাওকে ডাকিতে উপরে গেল।

প্রভাতকুমার সেই বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, চারিদিকে নানা আস-বাবে পরিপাটি করিয়া ঘরটি সুন্দর করিয়া সাজান। উপরে বড় বড় খান কয়েক ছবি টাঙ্গান রহিয়াছে। সেই ছবিগুলির দিকে দেখিতে দেখিতে একখানি ছবি তাহার চক্ষে বড় সুন্দর বোধ হইল। প্রভাতকুমার আত্মহারা হইয়া সে ছবিখানির দিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। স্বতই তখন প্রভাত কুমারের মনে হইতে লাগিল এত সুন্দর একখানি ছবি যদি আমার থাকিত, তবে এইরূপ চিত্র-পদ্ধতির ন্যায় একখানি সুন্দর ছবি আমি আঁকিতে পারিতাম। সে ছবিখানির দিকে প্রভাতকুমার যতই দেখিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, যদি সে এই ছবিখানি উঠাইয়া লইয়া যায়, তাহাতেই বা তাহার দোষ কি? গণেশলালও তাহার একখানি ছবি জোর করিয়া উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছে। সে যদি ইহাতে দোষী হয়, তাহা হইলে তাহার মত সমান দোষী। গণেশলাল যখন তাহার ছবিখানি ফিরাইয়া দিবে, এ ছবিখানিও সে তখন তাহাকে ফিরাইয়া দিবে। প্রভাত কুমার আর কিছু ভাবিবার সময় পাইল না, সে তখন একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সেই ছবিখানি খুলিয়া লইয়া তম্বুরের দিকে ছুটিল।

বৃদ্ধ মুধলরাও তখন সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন, প্রভাতকুমারকে ছবি-খানি লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিতে পাইলেন।

গণেশলাল সে ছবিখানি লইয়া একেবারে ভগ্নির নিকটে গেল। ভগ্নিকে সে ছবিখানি দেখাইয়া তাহাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিল—"এত বড় সম্ভ্রান্ত ও ধনীর কন্যা হইয়া সে কি না সামান্য একজন বাঙ্গালীর নিকট বসিয়া ছবি আঁকাইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর কি ঘৃণিত কাজ হইতে পারে। এতই যদি তাহার ছবি আঁকাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল তবে সে ঘরে বসিয়া ভাল ভাল চিত্রকর আনাইয়া তাহার ছবি আঁকাইয়া লইতে পারিত। গণেশলালকে এ কথা একবার পূর্ব্বে বলিলেই ত হইত।" তারাবাই যত বলিল যে সে কাহারও কাছে বসিয়া ছবি আঁকায় নাই, গণেশলাল কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিল না। এত সুন্দরভাবে মুখ মিলাইয়া কাহারও ছবি এরূপ হঠাৎ মিলিয়া যাওয়া বা যে কোন চিত্রকরের পক্ষে একবার দেখিয়া আঁকা অসম্ভব। অন্ততঃ

তাহার নিকট কিছুদিন ছবিখানি আঁকাইবার জন্য তাহাকে যাইতে হইয়াছে।

তারাবাই যতই ইহা অস্বীকার করিতে লাগিল, গণেশলাল ততই রাগিয়া উঠিতে লাগিল। সে ছবিখানি তারাবাই হাতে লইয়া দেখিতেছিল, গণেশ-লাল শেষে এত রাগিয়া উঠিল যে সেই ছবিখানি তারাবাইএর হাত হইতে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারাবাই বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

এত সুন্দর ছবিখানার এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া তারাবাই আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

গণেশলাল বাহিরে চলিয়া আসিল। তাহাদের বাহিরের বসিবার ঘরের 'ধসর সন্ধ্যা' ছবিখানি দেখিতে না পাইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিল যে তিনি একটী বাঙ্গালী বাবুকে একখানি ছবি ঘর হইতে লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন, তবে সেটি তাঁহাদের ছবি কি সেই বাবুটির ছবি তার খোঁজ তিনি লন নাই।

গনেশলাল তাহা শুনিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল; তখনই পুলিশ লইয়া সেই তণ্ডুরে গিয়া বামালসুদ্ধ প্রভাতকুমারকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া চলিল।

২

আজ প্রভাতকুমারের বিচারের দিন। সহায় সম্পত্তিহীন প্রভাতকুমার কয় দিন হাজতবাসে রুগ্ন ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পুলিশ প্রহরীসহ কাট গড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। বিচারক একবার প্রভাতকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোন উকীল দিবে কিনা?" তাহা শুনিয়া প্রভাতকুমারের বুক অশ্রুজলে ধৌত হইতে লাগিল কোন জবাব দিতে পারিল না, একবার করুণ নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল যদি কোন উকিল দয়াপরবশ হইয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু কে বিদেশী এক-জন বাঙ্গালী যুবকের জন্য আপনার স্বদেশীয় ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী মুধল-রাওএর বিরুদ্ধে বিনা পয়সায় দণ্ডায়মান হইবে। দু একজন জুনিয়ার উকিল এক আধবার পুলিশ রিপোর্ট লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছিল কিন্তু রিপোর্টে বামাল সুদ্ধ গ্রেপ্তারের কথা দেখিয়া সকলে পিছাইয়া গেল।

সাক্ষ্য আরম্ভ হয় হয় এমন সময় সেখানকার একজন শ্রেষ্ঠ উকিল

দৌড়িয়া আসিয়া বিচারকের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে "তিনি এই মাত্র এই আসামীর পক্ষ-সমর্থনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন, আসামী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।"

প্রভাতকুমারের চোখের সম্মুখ দিয়া যেন স্বপ্নের মত কতকগুলি ঘটনা পরে পরে ঘটিয়া যাইতে লাগিল। প্রভাতকুমার চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; যেন এ সকল কিছুই সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

পুলিশের সাক্ষ্য গৃহিত হইতে আরম্ভ হইলে, প্রভাতকুমারের উকিল কাহাকেও কিছু মাত্র জেরা করিল না—স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর পুলিশের সব সাক্ষ্য যখন শেষ হইয়া গেল, আসামীর কেহ সাক্ষ্য আছেন কিনা, বিচারক যখন জিজ্ঞাসা করিলেন তখন আসামীর উকিল উঠিয়া বলিলেন "আমার একজন সাক্ষ্য আছেন তাঁহার দ্বারাই আসামী যে নির্দ্দোষী তাহা প্রমাণ হইয়া যাইবে। কে এ সাক্ষ্য জানিবার জন্য সকলেই কৌতূহলী হইয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ক্ষণকালের মধ্যে তারাবাই সাক্ষ্যর মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইল। গনেশ-লাল তাহাকে সাক্ষ্যের মঞ্চে উঠিতে দেখিয়া, তাহার দিকে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতে গেল। পুলিশ প্রহরী গণেশলালকে টানিয়া আনিয়া বসাইয়া দিল।

তারাবাই ধীর ও সংযত কণ্ঠে স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া হলফ গ্রহণ করিয়া বলিল যে "প্রভাতকুমার সে ছবিখানি চুরি করে নাই, তারাবাই নিজে সে ছবিখানি প্রভাতকুমারকে আঁকিবার জন্য দিয়াছিল। প্রভাতকুমার গণেশলালের বিনা অনুমতিতে তারাবাইএর এক খানি সুন্দর প্রতিকৃতি আঁকিয়া দিয়া-ছিল বলিয়া গণেশলাল তাহার উপর ক্রোধপরবশ হইয়া এই মিথ্যা মোকর্দ্দমা আনিয়াছে। তারাবাই "নিঝরিণীর" ছেঁড়া টুকরা গুলি এক এক করিয়া বিচারককে দেখাইয়া বলিল, প্রভাতকুমার তাহার এই ছবিখানি তণ্ডুরে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া গণেশলালের ভারি রাগ হইয়াছে। তণ্ডুরদার ও আরও দু একজন তারাবাইএর এই কথায় সাক্ষ্যদিল যে তাহারা তণ্ডুর হইতে গনেশলালকে এই ছবিখানি উঠাইয়া লইয়া আসিতে দেখিয়াছে।"

মহা ক্রোধে ঠোঁটের উপর দাঁতদিয়া চাপিয়াধরায় গণেশলালের ঠোঁট কাটিয়া তখন রক্ত বাহির হইয়াছিল।

বিচারক প্রভাতকুমারকে নির্দ্দোষী বলিয়া খালাস দিলেন।

পিতা ও ভ্রাতা উভয়ে ফিরিবার অগ্রেই তারাবাই বাড়ী ফিরিয়াছিল উভয়ের ক্রোধবর্ষণের নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। গণেশলাল আসিয়া ভগিনীর নিকট গিয়া এরূপভাবে তাহাদের মিথ্যাবাদী প্রস্তুত করিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিল। তারাবাই তাহার আর কোনো জবাব দিল না, দৃঢ় স্বরে বলিল "আমার খুসি।"

গণেশলাল বলিল "তাহা হইলে তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে থাকা অসম্ভব।"

"তা বেশ" বলিয়া তারাবাই পিতার নিকট গেল।

তারাবাইএর সেরূপ দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া গণেশলাল আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

তারাবাই পিতার নিকট গিয়া তাহার মৃতমাতার প্রদত্ত সমস্ত অর্থ যাহা তাহার নামে—সমস্ত পিতার নিকট হইতে চাহিল, বলিল "এখন সে সাবালিকা হইয়াছে, সে সেই অর্থ লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারে।"

কন্যার এই অভূতপূর্ব্ব প্রার্থনা শুনিয়া বৃদ্ধ মুধলরাও আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। কন্যার ব্যবহারে তিনি ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন—কন্যা তাহার নিজ প্রাপ্য টাকা চাহিয়া লইতেছে, তিনি তাহাতে বাধা দিবার কে? এই ভাবিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সন্তান-স্নেহ ভুলিয়া রুষ্ট পিতা কোনো কথা না বলিয়া চেক বহিখানি বাহির করিয়া একখানি চেক লিখিয়া দিলেন। তারাবাই সে স্থান হইতে নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল,—পিতা পুত্রীতে আর কোন কথা হইল না।

প্রভাতকুমার তগুরে ফিরিয়া আসিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল মুহূর্ত্তের ভুলে সে কি গুরুতরই না পাপ করিতে বসিয়াছিল—উঃ—কি ভয়ানক বিপদ হইতে সে রক্ষা পাইয়াছে। তাহার পর তাহার রক্ষয়ত্রী তারাবাইএর কথা স্মরণ করিয়া তাহার চোখদুটি জলে ভরিয়া আসিল। সেই টম্‌টম্‌ হইতে সেই রমণীকে সে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল বলিয়া আজ রমণী তাহার উদ্ধারকর্ত্তাকে নিজের মান সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া মিথ্যা কথা বলিয়া রক্ষা করিতে আসিয়াছিল। আজ বোধ হয়, সে তাহার পিতা ও ভ্রাতার নিকট হইতে যথেষ্ট শাস্তি পাইতেছে, কিন্তু প্রভাতকুমার

সাহায্যহীন দুর্ব্বল—সে কি করিবে। তবু একবার ভাবিল কলিকাতায় ফিরিবার পূর্ব্বে তাহার সহিত একবার দেখা করিয়া যাইবে দুটো ধন্যবাদের কথাও বলিয়া আসিবে, কিন্তু তাহার যাইতে পা উঠিল না, বড় ভয় করিতে লাগিল—পাছে আবার একটা নূতন বিপদ হয়, এখান হইতে একেবারে কলিকাতায় রওয়ানা হওয়াই ভাল।

প্রভাতকুমার সেই দিনই কলিকাতায় রওনা হইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। পথে বাহির হইয়া দেখিল, তারাবাই তঞ্জুরের দিকে আসিতেছে প্রভাতকুমার দাঁড়াইয়া গেল। তারাবাই নিকটে আসিয়া প্রভাতকুমারকে একটি খামে মোড়া চিঠি দিল।

প্রভাতকুমার তখন তাহাকে কি বলিবে ঠিক করিতে পারিল না।

"আপনার 'নির্ঝরিণী' ছবি বড় সুন্দর হইয়াছে, আমি তাহা কিনিয়া লইয়াছি এই নিন তাহার দাম।" বলিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তারাবাই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

প্রভাতকুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারাবাই চলিয়া গেলে সেই চিঠিখানি খুলিয়া দেখিল তাহাতে একখানি পাঁচ হাজার টাকার নোট রহিয়াছে।

প্রভাতকুমার এবার সাহস করিয়া সেই নোটখানি ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত মুধলরাওএর বাড়ীর দিকে ছুটিল। তাহারা প্রভাতকুমারকে তাহাদের বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিল এবং তারাবাই বলিয়া এখানে কেহই থাকে না বলিল।

প্রভাতকুমার অবশেষে কলিকাতায় ফিরিল।

৬

ইহার পর প্রায় বার বৎসর কাটিয়া গেছে। চিত্রকর প্রভাতকুমারের যশ চারিদিকে এখন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার অঙ্কিত ছবির নকলে বিলাতী ছাপা ছবি প্রায় সকল স্থানেই পাওয়া যায়।

একদিন প্রভাতকুমার আর একখানি নূতন ছবির রং যোজনা ঠিক করিতেছে এমন সময় একটি টেলিগ্রাম আসিল, খুলিয়া দেখিল বোম্বাই বিধবা আশ্রম হইতে আসিতেছে, তাহাকে একটি আসন্ন-মৃতের অনুরোধ রক্ষার্থ সেখানে যত শীঘ্র সম্ভব যাইতে বলিয়াছে। প্রভাতকুমার সেই রাত্রেই বোম্বাই রওয়ানা হইল।

প্রভাতকুমার আসিয়া বিধবা-আশ্রমের কর্ত্রীর সহিত দেখা করিল। দেখিল তাঁহার মুখ অশ্রুভারাক্রান্ত সকলে মৃদুস্বরে কথা বার্ত্তা কহিতেছেন।

প্রভাতকুমারকে আসিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন যে আপনার আসা নিষ্ফল হইল, আর দু' ঘণ্টা পূর্ব্বে আসিতে পারিলে হয় ত দেখিতে পাইতেন। বছর দশ বার হ'ল তারাবাই বলিয়া একজন স্ত্রীলোক আমাদের আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তিনি বিধবা কি সধবা আমাদের বলেন নাই; তিনি আমাদের কার্য্যে যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন, তিনি নিজ ব্যয়ে কতকগুলি বিধবাদের থাকিবার ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এরূপ ভাবে সেবাব্রতে আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে সেরূপ আমরা আর কাহাকেও কখন দেখি নাই। দিন কয়েক হইল তাহার সামান্য জ্বর হইয়াছিল। অসুখ ক্রমে বাড়িল ডাক্তার আসিয়া বলিলেন তাঁহার এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া শক্ত। তখনো;কিন্তু তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল। তিনি আপনাকে আসিবার জন্য আমাদের টেলিগ্রাম করিতে বলিলেন এবং আপনি আসিবার পূর্ব্বে যদি তাঁহার মৃত্যু হয় তবে আপনাকে এই বাক্সটি দিতে বলিয়া গিয়াছেন।"

এই বলিয়া একটি বড় বাক্স প্রভাতকুমারের হাতে দিলেন।

প্রভাতকুমার সেই বাক্সটি খুলিয়া দেখিল উপরেই কতকগুলি নোট্ রহিয়াছে গুণিয়া দেখিল ৫০০০০্ টাকা। তাহার পর একটি মকমলের ঢাকা তুলিয়া দেখিল তাহার সেই বারো বৎসর পূর্ব্বের অঙ্কিত 'নির্ঝরিণী' ছবিখানির সমস্ত টুকরা সযত্নে রক্ষিত আছে।

প্রভাতকুমার মৃতদেহের সৎকার করিয়া কলিকাতায় ফিরিল। আসিবার সময় "তারাশ্রম" নামে আর একটি বিধবাদিগের আশ্রম প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সেই ৫০০০০্ টাকা আশ্রম কর্ত্রীর হাতে দিয়া আসিল।

তাহার পর ঘরে ফিরিয়া "নির্ঝরিণীর" ছিন্ন টুকরাগুলি সাজাইয়া আর একখানি তাহার প্রতিলিপি আঁকিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বহু চেষ্টাতেও আর সেরূপ একখানি ছবি করিতে পারিল না।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

লক্ষ্য ভ্রষ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অরুণ যখন ইংরাজী স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র—প্রতিবেসী-কন্যা লেখা একদিন হঠাৎ তাহার নয়নপথের পথিক হইল। যদি সত্য কথা বলিতে হয়, কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে স্বভাবতঃ দৃষ্টিটাই কিছু চঞ্চল ও উজ্জ্বল থাকে। অরুণের দৃষ্টিতেও ক্ষুদ্র বালিকা লেখা সৌন্দর্য্য—প্রতিমারূপে প্রতীয়মান হইল। দেখা, আলাপ, একত্রে খেলা, সঙ্গ প্রভৃতি কারণে তাহাদের মধ্যে আকর্ষণটা উভয়তঃ প্রবল হইল! তাহাদের মধ্যে প্রেম জন্মিল বা জন্মিতে পারে কি না,—জানি না, কিন্তু তাহারা পরস্পরের বন্ধু হইয়াছিল। সে বন্ধুত্বে বৈচিত্র কিছুমাত্র ছিল না। অরুণ গাছে উঠিয়া ফল্‌সা পাড়িত; নদী বক্ষে সাঁতারিয়া পদ্ম তুলিয়া লেখার কবরীতে পরাইয়া দিত। পাখীর ছানা ধরিয়া অরুণ গাছ হইতে পড়িয়া গেলে—লেখা পাতার রস দিয়া ছিন্ন স্থানে লেপন করিয়া দিত; বাড়ী হইতে আমচুর, কুলচুর চুরি করিয়া আনিয়া পুকুরধারে বসিয়া খাইত। এমন কি মাঝে মাঝে দুজনেই স্কুল পলাইয়া রেল লাইনে বসিয়া থকিত। যদি এই সময়টা সুখের বলেন, ত বাল্যকাল তাহাদের সুখেই কাটিয়াছিল। পরে যখন অরুণ সহরে কালেজে পড়িতে গেল—লেখা বুঝিল, জীবনের সুখ অতটুকু ফুরাইল। প্রবাসে অরুণ কালেজের পাঠের পর সময় পাইলেই লেখাকে পত্র লিখিত। সে সকল পত্রে 'হা হুতাশের' অন্ত নাই; 'আক্ষেপ-বিক্ষেপের' সীমা নাই; 'প্রাণ যায়, আমি যাই' এর শেষ নাই। নভেল অধীত বালক অনেক সময় এমন লিখিত যে নিজেই তার মানে বুঝিত না। যা'হোক, ইহা ব্যতীত তাহারা আর কিছু করিল না। উভয়েই বাঁচিয়া রহিল।

যদি আমি বলি, পাত্র ও পাত্রীপক্ষ উভয়েই তাহাদের বিবাহে রাজী; তবে হয় ত আমার পাঠক পাঠিকাগণ একটু হতাশ হইবেন। কিন্তু সত্যই, অরুণচন্দ্রের পিতা গ্রামের ধনী জমিদার মহেন্দ্রবাবু স্বয়ং এই অনুপম-রূপ-গুণ সম্পন্না, সুলক্ষণা বালিকাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিবার জন্য লেখার পিতা শশীবাবুকে অনুরোধ করিলেন। তবে অরুণ বি, এ, পাশ করিলে বিবাহ হইবে। এই যুবা ও বালিকা সকলের অলক্ষ্যে এক স্বপ্নের আলোকে উৎফুল্ল

হইয়া উঠিল। ভবিষ্যতটা মধুময় কল্পনা করিয়া লইল। শুধু তাহারা কেন,—সকলেই আনন্দিত হইল। তাহারা অনেক দিন হইতে অরুণের পাশে লেখাকে, আলোর পাশে ছায়া; নিদ্রার সঙ্গে স্বপ্ন; হরের পাশে গৌরীর মত দেখিয়া আসিতেছিল।

কিন্তু বিবাহ হইল না। অরুণ বি, এ, পাশ করিয়াই ষ্টেট্ স্কলারশিপ পাইয়া বিলাত যাইতে আদিষ্ট হইল। মহেন্দ্রবাবু অমত করিলেন না। পুত্রকে বিলাত পাঠাইতে মনন করিলেন। এই সময় শশীবাবু একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"অরুণ ত বিলাত চলিল, লেখার বিবাহের কি?" জমিদারবাবু হস্তস্থিত গড়্‌কার মুখনলটা দন্তে চাপিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"তার আর কি—ঘুরে আসুক না।" শশীবাবু দ্বিরুক্তি করিলেন না।

অরুণ বুঝিল—স্বপ্নে দেবী দর্শন জাগ্রতের উদাহরণ নয়। লেখাকে যে হারাইতে হইবে, সে ইঙ্গিতে বুঝিয়াছিল। কথা প্রসঙ্গে যখন পিতার কর্ণে পৌঁছিল, অরুণ শুনিল, তাহার পিতা শশীবাবুকে আশ্বাস দিয়াছেন—"বিবাহ হইবে।" তখন আর সে অবিশ্বাস করিল না। লেখা শুনিল—অরুণ শিক্ষার্থে বিলাত যাইতেছে। বিলাত সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল—সেও ইচ্ছা করিলে অরুণের সঙ্গে যাইতে পারিবে। ইহার আরো একটা কারণ ছিল, সে অরুণের একখানা গানের বইয়ে "বিলাত দেশটা মাটির"—রূপ বর্ণনা পড়িয়াছিল; এখন শুনিল—বিলেত গেলে জাত যায় ও মেয়ে মানুষের যাওয়া হ'তেই পারে না, তখন একটা অব্যক্ত যাতনা, একটা অজ্ঞাত বেদনা, অসীম হতাশা তাহাকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কেন যে তাহাদের প্রতি বিধাতা বিরূপ, সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অরুণের কি না গেলেই নয়! তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটা উষ্ণ প্রবাহ ছুটিল; সে ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

আজ অরুণ রওনা হইবে। গ্রামে একটা মহাকোলাহল; লোকের মুখ হাসিভরা, দুঃখ ভরা। সকলেই ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। শুধু একটা ঘরের ভিতর একজন কিশোরী অবশভাবে পড়িয়া চিন্তামগ্ন ছিল। তার কত ভাবনা। 'অরুণ বিলাত যাইবে—এই বৈকালে। সে একবার দু'টো মুখের কথায় বিদায় নিয়ে যেতে পার্লে না? আজ দু'দিন ধরে অপেক্ষায় রয়েছি —কৈ সে ত একবার এসে ডাকলে না। এত উদাসীন, এত নিষ্ঠুর কি সে? ভালো, সে যেন এলো না, আমিই বা গেলাম কৈ? ছিঃ ছিঃ, আমার যাওয়া কি ভালো দেখায়? লোকে যে আমায় দেখে হাসবে। পাড়ার

ছেলে মেয়ে গুলো যে আমার দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসবে! আমার যাওয়া হয় না। অরুণ! অরুণ! কেন তুমি এসে একবার ডাকলে না; তেমনি—তেমনি মধুর স্নেহ ভরা সুরে ডাকলে না—'লেখা'!

"লেখা"—

হঠাৎ তাহার আকুল কর্ণকুহরে সুধাস্বর বর্ষিত হইল—"লেখা"—; চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল। আবেগভরে সে দ্বার পথে উপস্থিত হইয়া দেখিল—অরুণ! নিশ্চল ভাবে লেখা অরুণের হাত ধরিয়া দাঁড়াইল।

"আজ আমি যাচ্ছি, জানো বোধ হয়?"

"জানি।"

"সেখানে আমায় কিছু দিন থাকতেই হবে"

"কত দিন?"

"তা ঠিক বলতে পারি না। আর যত দিন থাকি না কেন—তুমি আমায় মনে রাখবে ত?"

লেখার বড় অভিমান হইল। সেই অরুণের এই কথা! যাহার কাছে থাকিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে নাই প্রবাসী তাকে মাঝে মাঝে স্মরণ করিবে কিরূপে? যে সর্ব্বদা তার স্মরণপথের জাগ্রত পথিক—তাহাকে মনে রাখিবে কিনা—কিরূপ প্রশ্ন? অন্য সময় হইলে সে একচোট খুব ঝগড়া করিত; কাঁদিয়া ইয়ুফ্রেটিস্ বহাইয়া দিত কিন্তু এখন ত আর তা হয় না। সুতরাং সে চুপ করিয়া রহিল। অরুণ জিজ্ঞাসিলেন—"কি! কথা কচ্ছ না যে?" লেখা তবু নীরব।

অরুণ। লেখা আমায় চিঠি লিখ্‌বে?

লেখা। তুমি যদি আগে লেখো ত।

অরুণ। আর একটা কথা; লেখা, যদি আমার সেখানে বেশী দিন থাকতে হয়—তার মধ্যে তোমার বিয়ে হোয়ে যায়?

লেখা। হোয়ে যায়?—

অরুণ। হ্যাঁ?

লেখা। "তা—তা!" সে শিহরিয়া—সে চিন্তা ত্যাগ করিল। "তুমি শীঘ্র ফেরবার চেষ্টা কোরো।"

অরুণ। "কেন, পাছে বিয়ে হয়ে যায়?"

লজ্জিত ভাবে, ভূমিতলন্যস্ত নেত্রে, একটু উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—তা

কেন? তুমি থাকলে বেশ হয়। দেশের সকল লোক তোমার সুখ্যাতি করে; চারিদিকে তোমার প্রশংসাবাদ শুন্তে পাই—আমার হৃদয়"—হঠাৎ সে চুপ করিল। বুঝিল, আবেগভরে সে লজ্জাহীনতার পরিচয় দিতেছিল।

অরুণ জিজ্ঞাসিল—বল, কি বলছিলে?

"ও কিছু না।"

"না বল।"

"—আমার হৃদয় গৌরবে স্ফীত হয়ে উঠে।"

"এ কথা সত্য, লেখা?"

"তুমি কখনো লেখাকে মিথ্যা কহিতে দেখেছো?"

"মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদের সহায় হৌন।"

ভৃত্য আসিয়া ডাকিল। অরুণ লেখার হাত দুটি ধরিয়া সস্নেহে কহিল—"আসি লেখা।"

জড়িত ও ক্ষীণ কণ্ঠে লেখা উত্তর দিল—"এসো"। সে নত হইয়া প্রণাম করিল। অরুণও লেখার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

লেখা অনিমিষ নয়নে পথের পানে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল—"চলে গেল!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যাঁহারা এতক্ষণ আমাদের প্রতি বিরক্ত হইতেছিলেন—নিশ্চয়ই এখন সন্তুষ্ট হইবেন। কেন না—বিবাহ হইল না। অধিকন্তু শশীশেখর বাবু কন্যার বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের স্বামী স্ত্রীতে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু শশী বাবু বুঝাইয়া দিলেন—"বড় লোক মহেন্দ্র বাবুর কথায় বিশ্বাস কি? বিলেত যাবার আগে কি বিয়েটা দিতে পাত্তো না? 'দেবো না'—মৎলব। ছেলে বিলাত হতে এলে কত দর বাড়বে,—রাজার বাড়ীতে বিয়ে হ'বে—এই ইচ্ছা, বুঝলে?" গৃহিণী আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। লেখাও শুনিল তার বিয়ে। সে কাঁপিয়া উঠিল। বিবাহ! কার সঙ্গে? সে কি অবিবাহিতা? কিন্তু সে যে নিরুপায়। বাঙ্গালীর মেয়ে ত এখনো বাপ মার কাছে মুখ ফুটিয়া তার পূর্ব্ব ভালোবাসার কথা বলতে শিখে নাই। সে লুকাইয়া ভাবিল। আপনার মনে আপনি গুমরাইতে

লাগিল। এমন কেহ নাই যে তার কথা শুনিবে? আকাশে চাঁদ আছে—সে শুধু হাসিতেই জানে নদীতে জল আছে—সে কেবল কলধ্বনি করিতেই জানে। পাড়ায় লোক আছে—বিবাহে লুচি সন্দেশ খাইতেই মজবুত।

লেখা যখন দেখিল—বিবাহ ব্যতীত উপায় নাই,—সে প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই সময়ে সে একবার নিভৃত কক্ষে বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ভাবিল যদি অরুণ এখনই আসিয়া পড়ে?—

অরুণ আসিল না। লেখা তাহাকে পত্র লিখিল। তার মর্ম্ম এইরূপ :—

"অরুণ,

আজ আমার সুখ দুঃখে তোমার কিছু আসিয়া যাইবে না; কেন না, তুমি আজ এ সকল আবিলতার বাহিরে। শোন—আমার বিবাহ। বিবাহ অন্যের কাছে—আমার মরণ! লোকে বলে যিনি এক্ষণে আমার স্বামী হইবেন তিনি রূপে গুণে অতুলনীয়। হায় রূপ গুণ! বিবাহ আমায় করিতেই হইবে। পরশ্ব বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। যখন তুমি এ পত্র পাইবে, অরুণ, সেই লেখা অন্যের হইবে। তাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিও।

—লেখা"—

* * * *

তখনো গৃহদ্বারে দীপ জ্বলিতেছিল। কক্ষে কক্ষে রমণীগণের কলহাস্য ধ্বনিত হইতেছিল হঠাৎ বাসর ঘর হইতে সংবাদ আসিল—পাত্রের দাস্ত হইতেছে। আবার! আবার! শশীশেখর বাবু চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। আবার!

ঐ—ঐ—শেষ! ঐ ক্রন্দন ধ্বনি! এ কি পৈশাচিক লীলা! গীতমুখর সুখের বাসরে এ কি দানবী লীলা! করুণ ও কাতর আর্ত্তনাদ নৈশ গগন ধ্বনিত করিতে লাগিল। লেখা বুঝিল—হতভাগ্য স্বামীর জীবন-লীলা সমাপ্ত হইয়াছে। সে অলস ভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িল।

রাত্রি প্রভাত প্রায়। বরযাত্রিগণ শবদেহ বহন করিয়া শ্মশানযাত্রী হইয়া চলিয়া গেল। শশীবাবু প্রাঙ্গণে বসিয়া রহিলেন। বৃদ্ধের চক্ষুতে জল নাই; ক্রন্দন নাই; তিনি নীরব। গৃহিণীর ক্রন্দন গ্রামময় এ সংবাদ প্রচার করিয়া দিতে লাগিল। এই সময়ে গ্রামবাসী রমণীগণ অনুকম্পা পরায়ণ হইয়া লেখাকে সান্ত্বনা দান করিতে বাসর-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—আশ্চর্য্য! উজ্জ্বল আলোক-দীপ্ত কক্ষে শয্যায় পড়িয়া লেখা

অকাতরে নিদ্রামগ্ন। সেই প্রস্ফুটিত দেহলতার উপর যেন স্বর্গের আভা পড়িয়াছে। তাহার রূপের প্রভায় কক্ষ উজ্জ্বলিত। শয্যার উপর কে যেন শরতের শুভ্র জোছনা পাতিয়া দিয়াছে। প্রতিবেশীনিরা পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময় করিয়া প্রস্থান করিল।

* * * * *

বেজওয়াটারে ছাত্র নিবাসের একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া মিঃ মিত্র একাকী পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। এই সময়ে দাসী আসিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া কয়েকখানা চিঠি মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া গেল। ডাক ভারতের।

শিরোনামাগুলি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ প্রফুল্ল-চিত্তে একখানা খাম উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন। প্রফুল্লিত মুখমণ্ডল নিবীড় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। অরুণ আর একখানা চিঠি খুলিলেন। সেখানি তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী মায়ার লিখিত। মায়া লিখিয়াছে। "—* ··*—* অভাগিনী লেখা বিবাহ বাসরেই স্বামী হারাইয়াছে। —*—" অরুণ আর একবার মায়ার চিঠি ও লেখার চিঠি পড়িলেন—"বিবাহ অন্যের কাছে—আমার মরণ!" কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি সোফায় শুইয়া পড়িলেন। দাসী প্রাতরাশের আয়োজন হইয়াছে বলিয়া গেল, কিন্তু অরুণ সে কথা শুনিতে পান নাই··উঠিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পলকমাত্রে গীতমুখর আলোকিত সভাস্থল ঘন তামসপূর্ণ শ্মশানে পরিণত হইতে দেখা যায়—শুধু রঙ্গমঞ্চে। আমাদের সংসার-রঙ্গমঞ্চেও তদ্রূপ অভাবনীয় ও দ্রুত পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। সুখের বাসর, সে সুখ-রজনী অবসান হইবার পূর্ব্বেই লেখা বৈধব্যকে আলিঙ্গন করিল। বৈধব্যের নিয়ম, আচার, সব সে মানিল না। তার পিতা মাতাও একমাত্র বালিকা দুহিতাকে সে সকল কষ্টে অভ্যস্ত করিতে পারিলেন না। সুতরাং লেখা হাতের বেলোয়ারী চুড়ি ফেলিল না। কালাপাড় ও সূক্ষ্ম কাপড় পরা ত্যাগ করিল না। সুগন্ধি তৈলদ্বারা কেশবাস করিতে ছাড়িল না। এক কথায় সে সধবাবেশে বিধবা হইয়া রহিল। যদিও লেখা কচিৎ বাটীর বাহির হইত,

তথাপি পাড়ার সূক্ষ্মদৃষ্টিশালিনী রমণীগণের অনুসন্ধিৎসুদৃষ্টি তাহার উপর প্রবলতর ভাবে পড়িয়াছিল। ধর্ম্মপরায়ণা রমণীগণ দুঃখ করিয়া বলিলেন—"ধর্ম্ম লোপ পেলো। কলি—ঘোর কলি। এত কি আর পৃথিবীর সহ্য হয়?" কিন্তু আমরা দেখি সহিষ্ণু ধরিত্রীর সহ্যগুণ অনেক · যদি তা না থাকিত ঐ সকল রমণীগণের ভারেই পৃথিবী ভেঙ্গে পড়তো।

লেখার অদৃষ্টে সুখ ভগবান লিখেন নাই। সে যে পথে যায়, সেখানেই বিপদ! লোকে যখন নানারূপ অপবাদ কলঙ্ক রটনা করিতে লাগিল - লেখার জননী একদিন ধীরে ধীরে সংসার ত্যাগ করিলেন। লেখা জননীর শিয়রে বসিয়া কাঁদিল। মৃত্যু-কালে জননী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"মা, ধর্ম্মে তোমার মতি হোক।"

লেখা সবলে পিতাকে জড়াইয়া ধরিল।

*   *   *   *   *

লেখার বিরুদ্ধে যে সকল তীব্র সমালোচনা হইত, তাহার মর্ম্ম এইরূপ।— "বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে না হওয়ায় অরুণের সঙ্গে ওর আসনাই, কেহ বলিত 'রোসনাই' হইয়াছে। কি ডাকে বিলেতে চিঠি যায়। চিঠির ভিতর অকথ্য সম্ভাষণ। বিরুদ্ধ আলাপন।" লেখার পিতাও সব শুনিলেন! তিনি তাহা বিশ্বাস করিলেন না। আর যাহাই হোক লেখা কুচরিত্রা নয়। ইদানীং লেখাও সে সকল কথায় কান দিত না। সে আপনমনে গৃহকার্য্যাদি করিত। সন্ধ্যাকালে ছাদে বসিয়া আকাশের গায়ে তারার খেলা দেখিত; কখনো কখনো উদাস ভাবে কি ভাবিত। কতরাত্রি সে এমনি ভাবে বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া দিয়াছে। আপনার জীবনের অতীত পৃষ্ঠা সকল আলোচনা করিয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছে।

এই রকম ভাবে কিছুদিন কাটিলে পর লেখা শুনিল অরুণ শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছে। আন্তরিক আহ্লাদিত হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকদের বিষবাণে ম্রিয়মান হইয়া গেল। ক্রমে কথাটা এত প্রকাশ হইয়া পড়িল, যে একদিন জমিদার মহেন্দ্র বাবুর কন্যা, অরুণের ভগ্নী মায়া সমস্ত জানিবার জন্য লেখাকে ডাকিয়া পাঠাইল।

পাল্কী করিয়া লেখা আসিল। রাস্তায় ইতরভদ্র সকলের দৃষ্টি পাল্কীর ছিদ্রপথে পতিত হইল। লেখা তাহাতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইল না।

লেখা মায়ার কক্ষে প্রবেশ করিলে, মায়া তাহাকে সাদরে পার্শ্বে বসাইয়া

নানা কথার পর জিজ্ঞাসিল—"লেখা, গাঁ-ময় একটা ঢি ঢি পড়ে গেছে, শুনেছিস্ ?"

উদাসভাবে লেখা বলিল—"কি ?"

মায়া মনে মনে বলিল—"সত্যই তুই পাপিয়সী !" প্রকাশ্যে কহিল—"শুনিস নি ? তুই বিধবা হোয়ে সধবার আচার ব্যবহারে থাকিস - গ্রাম শুদ্ধ লোক কত কথা রটায়।"

"রটাক্। আপনি চেঁচিয়ে তারা আপনি থামবে। সধবা বিধবার আচার ব্যবহারে তফাৎ কেন মায়া ? যখন পৃথিবীতে আসে, কেহ সধবা কেহ বিধবা হোয়ে আসে না। যে যেমন ভাবে থাকতে ভালোবাসে,—তার পক্ষে তাই আচার ব্যবহার। আর আমার অপবাদে কা'রো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

"না থাকলে বলতাম না। তুই শুনেছিস বোধ হয় যে তারা আমার দাদার নামেও অপবাদ দিতে ছাড়ে না।"

"শুনেছি।"

"তবে দেখ্, এতে আমাদের ক্ষতি আছে। লোকে যে সকল কলঙ্ক রটায়, তার মূলে কি একটুও সত্যি নেই ?"

"আছে।"

"কি ?"

"যতটা রটে—কতকটা সত্য বটে !"

"আর তুই পাপ !- সে কথা নিজ মুখে স্বীকার কচ্ছিস ?"

"তায় দোষ কি মায়া ?"

"তুই বিধবা।"

"কি আসে যায় বোন্। আমি ভালোবাসি। সে আজ প্রথম দিন নয়। বিবাহ ত আমার ক' ঘণ্টার সম্বন্ধ ? যে দিন আমি পৃথিবী চিন্তে পেরেছি, সেই দিন থেকে যাকে ভালোবাসি,—একবার অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় কোরে তা' কি ভুলা যায় ! মনে পড়ে না মায়া তুই কতদিন বলেছিস্—"লেখা, তুই দাদাকে বড় ভালোবাসিস্ না ?"

মায়া অনেকক্ষণ তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল—সেই লেখা ! সরলতার আধার, সেই প্রেম-ঢল-ঢল কোমল আনন ! "ভগবান এ কি শাস্তি তার ?"

মায়া বলিল—"হিন্দুর ঘরে, হিন্দুর মেয়ের মুখে ও কথা উচ্চারণ করাও মহাপাপ। কেন জেনে শুনে এ পাপ বাসনা হৃদয়ে স্থান দিস্? এ দুরাকাঙ্খা ছাড়্। আমাদের শাস্ত্রে বিবাহিতা নারীর জীবনে-মরণে স্বামীই সব—চিন্তা, ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন।"

লেখা হাসিয়া বলিল—"কিন্তু আমার শাস্ত্র ভিন্ন। যদি ভুলতে পার্তাম মায়া—" সে আর বলিতে পারিল না। অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি মায়ার স্কন্ধের উপর ঢলিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিয়া উঠিল—"মায়া, মন কখনো শূন্য থাকে না। একটা আদর্শ, একটা চিন্তা—তাকে অধিকার কোরে থাকেই। আমার হৃদয়ও একটা জীবন্ত আদর্শ, একটা সত্য চিন্তা ভিতরে লুকিয়ে রেখেছে। তা' ভিন্ন আমার যে কিছুই নাই।—সব শূন্য! ধূ ধূ কচ্ছে।—এ চিন্তা ছাড়বো—যে দিন মর্ব্ব।"

"তবে এই কলঙ্ক ভার মাথায় নিয়ে—এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে। জগতের লোক ঘৃণা কর্ব্বে। দাদা জানতে পার্লে—তিনিও ঘৃণা কর্ব্বেন।"

"দুঃখ কি? যা হ'বার—তা' হ'বেই। আমি তার জন্য ভাবি না। সে জন্য কা'রো কাছে কখনো কিছু বলি নাই। আজ তোকে—সব বল্লাম। তুই আমায় ঘৃণা করিস না—বোন্। তুই সব জানলি—পারিস ত লেখাকে ক্ষমা করিস্।" লেখা ধীরে ধীরে কক্ষত্যাগ করিল। মায়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। লেখাকে সে বড় ভালো-বাসিত। লেখার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সে ভগবানের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিল—"প্রভু! ও'কে সুমতি দাও, ধর্ম্মের পথ দেখিয়ে দাও।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অরুণ ফিরিয়া আসিয়াছে। বিলাতী রীতি-নীতির ভার স্কন্ধে লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। আসিয়াই সে অনেকের মুখে শুনিল, লেখার স্বভাব চরিত্র কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছে।

অরুণ সকল কথা শুনিয়া একদিন সন্ধ্যায় লেখাদের বাটীতে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ শশী বাবু তখন গৃহে ছিলেন না। অরুণ ডাকাডাকি করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া লেখা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই সে অবগুণ্ঠন টানিয়া সরিয়া গেল। অরুণ নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—"লেখা, কেমন আছো?"

"ভালো আছি।"

জানি না মানুষ যাহাকে ভালোবাসে;—যাহার অদর্শনে অস্থির হয়;—তাহাকে কত তিরস্কার, অনুযোগ করিবার কল্পনা করিয়া থাকে, তাহাকে নিকটে পাইলে কেন নির্ব্বাক হইয়া যায়! সে সময় কথা কহে,—বড় ছোট, অসংলগ্ন—স্বর অতি ক্ষীণ! লেখা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"ভালো আছি—তুমি ভালো ছিলে?"

"ভালো যা, তা ত তোমার কাছে রেখে গিয়েছিলাম।"

লেখা সপ্রশ্নদৃষ্টিতে অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অরুণ বলিল—"মনে পড়ে লেখা, সেই ছেলেবেলাকার কথা?"

"পড়ে।"

"মনে পড়ে, সেই বাল্যকাল? সেই ভালোবাসা?—পড়ে?"

"পড়ে।"

"যা ছিল—তা কি হতে পারে না?"—লেখা নিরুত্তর।

"লেখা, তবে আমাদের জীবন বিফলে ব'য়ে যাবে? তবে কি সে সব কথা আমাদের মনে দুঃস্বপ্নের মত ভেসে আসবে? আমাদের জীবন কি একটা অভিসম্পাত?"

অরুণ আরো নিকটে আসিয়া লেখার হস্তধারণ করিলেন—প্রেমভরা কণ্ঠে বলিলেন—"লেখা।"

লেখা কোনো উত্তর দিতে পারিল না। তাহার শরীরের সঙ্গে জিহ্বাও অবশ হইয়া আসিতেছিল। সে চুপ করিয়া ভূমিতলন্যস্ত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

অরুণ ডাকিলেন—"লেখা!"

লেখার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া যাইতেছিল। দূরে কোন্ স্বপ্নের দেশে; মায়ার রাজত্বে! সে তাহার সমস্ত শক্তি রসনায় একীভূত করিয়া বলিল—"কি?"

অরুণ বলিতে লাগিলেন—"লেখা, জীবনটা শুধু দীর্ঘনিশ্বাস বহন কোরে কাটাবে। কেন—কি দুঃখে? আমরা ধর্ম্ম মানি না; সমাজ মানি না—কিছু না। আর ভালোবাসার মন্ত্র মানুষের গণ্ডীর বাহিরে। আমি তোমার জন্ম সব পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি। আর বোধ হয়—যা' শুনেছি যদি সত্য

হয়—" বাধা দিয়া লেখা জিজ্ঞাসিল—"কি শুনেছো?" "তুমি—তুমিও আমায় ভালোবাসো - এখনো।"

"মিথ্যা—কথা।"

"অপলাপ কর কেন? এ মিথ্যা নয়—সত্য কথা। সকলেই এ কথা বলে। যদিই মিথ্যা হয়—তা'দের সে কথা আজ সত্যে পরিণত হোক। লেখা, প্রাণাধিকে!"—স্বর সুরাবিজড়িত।

লেখা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—"ওকি? যাও তুমি এখান হোতে, আমায় ছেড়ে দাও,—যাও।"

"কবে উত্তর পাবো লেখা?"

"জানি না; আমায় ভাবতে দাও। যাও—"

"আসি তবে, লেখা—প্রিয়তমে—" অরুণ প্রস্থান করিল।

লেখা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। শুক্লপক্ষের কৌমুদীস্নাত, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর শুভ্র নির্ম্মল দৃশ্য;—শীকরস্নিগ্ধ, মৃদুমন্দসমীরণসন্তাড়িত আমোদিনী রজনীর এ মাধুরী তাহার চক্ষে বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সে প্রকৃতির এ হাস্যময়ীমূর্ত্তি দেখিল। পরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে আপনার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

* * * * *

সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। গাছে গাছে পাখী ডাকিয়া উঠিতেছে। গ্রাম্যবধূগণ কলসী কক্ষে নদী অভিমুখে চলিয়াছে। অরুণও এই সময়ে প্রভাত-বায়ু সেবনার্থ নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে দূরে চড়ার উপর একটা শ্বেত পদার্থ দেখিয়া কৌতুহলান্বিত হইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটস্থ হইয়া, দেখিবামাত্র তিনি উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

—"লেখা! লেখা! একি কর্‌লে তুমি?"

গ্রাম্যবধূগণ আসিয়া দেখিল—কলঙ্কমুক্ত সুন্দরী শুভ্রবেশে নদীসৈকতে পড়িয়া আছে।—শুভ্র, শান্ত, নির্ম্মল!

অরুণ সেই সিক্ত, বালুকা-লিপ্ত দেহলতা জড়াইয়া ধরিলেন।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

নরাধম।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মৃত্যুমুখে।

"মিথ্যা কথা!"

একটী সুপুরুষ গুজরাটী যুবক একটা প্রকোষ্ঠ মধ্যে দ্বারে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "মিথ্যা কথা"—ইনি ডাক্তার গোকুল দাস।

"না গো মহাশয়, না—মিথ্যা কথা নহে।"

একটী বিংশ বর্ষীয়া পরম রূপবতী রমণী, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্লেষপূর্ণ স্বরে এই কথা বলিল।

উভয়ের মুখেই দারুণ দৃঢ়তা বিরাজ করিতেছে। তথাপি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—রমণীর ভয়ে ডাক্তার ভীত হইয়াছেন; অনেক কষ্টে নিজের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতেছেন। কোন কারণে তিনি এই রমণীর হাতে পড়িয়াছেন।

রমণী লাঙ্গুলাবমৃষ্ঠা সর্পিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিল, "মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী খুনী।"

নিমেষের জন্য গোকুলদাসের ওষ্ঠ কম্পিত হইল। তিনি এবার রুদ্ধ প্রায় কণ্ঠে বলিলেন, "মিথ্যা কথা।"

রমণী মৃদু হাস্য করিয়া বলিল "এই পর্য্যন্ত! তোমার আর কিছু বলিবার নাই—বটে—উপরে যে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পড়িয়া আছে,তাহাকে তুমি হত্যা করিয়াছ,—অস্বীকার করিও না,—আমি সকলই জানি। তুমি ভাবিয়াছিলে যে আমি ঘুমাইয়াই আছি, আঃ বিশ্বাসঘাতক! সে আত্মহত্যা করিয়াছে দেখাইবার জন্য তুমি তাহার মুখে কারবলিক এসিড্ ঢালিয়া দিয়াছিলে, তাহার মুঠার ভিতরে জোর করিয়া শিশিটা রাখিয়াছিলে—"

"মরিয়াছে?"

"ওঃ তাহা হইলে এটা মিথ্যা কথা নহে।"

"মরিয়াছে?"

"হাঁ গো-হাঁ—আমি কি বলিতেছি মরে নাই? মরিয়াছে, তোমার হাতেই

মরিয়াছে; আর তুমিই তাহাকে হত্যা করিয়াছ,—আমি সকলই জানি, আমি কিছু আর অন্ধ নই। তোমার মত লোকের সঙ্গে থাকিলে সকলেরই চক্ষু ফুটে,—আমি খারাপ—এখন খুব খারাপ হইয়াছি স্বীকার করি, তবে তোমার মত তত খারাপ হই নাই, আমি কাহাকেও হত্যা করি নাই।"

"তুমি কি করিতে চাও!"

ডাক্তার গোকুল দাসের গলার স্বর এতই গাঢ় হইয়াছে যে তাঁহার স্বর বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। স্পষ্টতঃ লোকটা ভয়ে অর্দ্ধমৃত হইয়াছে।

রমণী বলিল, "কি করিব না করিব, তাহা সম্পূর্ণ তোমার উপর নির্ভর করিতেছে।"

"বল শুনি।"

"যাহা বলিব তাহা তোমাকে করিতেই হইবে।"

"শীঘ্র বল—"

রমণী কহিল—"হাঁ, প্রথম হইতেই বলিতেছি—তুমি এই নরোত্তম দাসের স্ত্রী মুন্নাবাঈর জার। নরোত্তম তোমাকে বন্ধু ভাবিয়া, ডাক্তার ভাবিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, আর তুমি গোপনে গোপনে তাহার স্ত্রীকে কুপথগামিনী করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। নরোত্তম তাহার কিছুই জানেন না, স্ত্রীকে সতীলক্ষ্মী ভাবিয়া তাহার মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হইয়া, নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রহিয়াছেন।"

"তাহার পর—বল।"

ডাক্তার ইতিমধ্যে অনেকটা আত্মসংযম করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহার মুখে শ্লেষপূর্ণ মৃদু হাসি দেখা দিয়াছে, তাহা দেখিয়া রমণী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "দুরাত্মা, আবার হাসিতেছ—লজ্জা করে না ঘৃণা হয় না!"

এবার সত্য সত্যই ডাক্তার হাসিল;—সে পৈশাচিক হাসি।

রমণী গর্জ্জিয়া বলিল, "পাপাত্মা গোকুল দাস, ভাবিয়াছ আমার হাত হইতে তুমি রক্ষা পাইবে? কখনই না!"

"তাহার—পর?"

"এইবার আমার কথা—এক বৎসর পূর্ব্বে আমি পবিত্র দেবী স্বরূপিণী ছিলাম, তুমিই, পাপাত্মা, আমায় ভুলাইয়া, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে;—আজ আমি তোমাকে যাহা বলিব, তাহাই তোমাকে করিতে হইবে—"

নরোত্তম দাস জিনাবাই ও ডাক্তার গোকুল দাস—নরাধম

"তাহার পর—বল—"

"আবার বলিতেছি। আমি জানি—আমার কাছে প্রমাণ আছে, তুমিই রাক্ষস মন্নুবাঈকে বিষ দিয়া হত্যা করিয়াছ—আমি চাই—আমার গর্ভে তোমারই যে সন্তান আছে, তাহারই জন্য চাই—তুমি আজই আমাকে বিবাহ করিবে, বিবাহের পর আমি আর তোমার মুখ দেখিব না,—এমন নরাধমের মুখ দেখিলে পাপ হয়,—তুমি আজই রাত্রে আমাকে বিবাহ করিবে।"

গোকুল দাসের ওষ্ঠ হইতে ধীরে ধীরে হাসি বিলীন হইয়া গিয়াছিল; সে জানিত, এ স্ত্রীলোক যাহা বলিবে, তাহাই করিবে—তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

গোকুল দাসকে নীরব থাকিতে দেখিয়া রমণী তীব্র কণ্ঠে বলিল, "আর তাহা যদি না কর, তাহা হইলে কালিই সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিব—তোমার ফাঁসি হইবে—হওয়াই উচিত।"

ডাক্তার নীরবে তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল, সে কিরূপে এই বিপদ হইতে মুক্তি পাইবে, মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতেছিল।

রমণী বলিল, "কেবল কথায় হঁা বলিলে আমি ছাড়িতেছি না,—এই টেবিলের উপর কাগজ কলম আছে—লিখিয়া দাও যে আজই তুমি আমাকে বিবাহ করিবে।—আমি যাহা যাহা বলি, তাহাই লিখিতে হইবে—নতুবা—" এই বলিয়া রমণী টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল। এই সুবিধা—ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র শিকার দেখিলে তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য যেরূপ লম্ফ দেয়, ডাক্তারও সেইরূপ রমণীর উপর পতিত হইল। দুই হস্তে রমণীর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া অসুর বলে তাহাকে ঘুরাইয়া গৃহপ্রাচীরে লইয়া ফেলিল এবং তাহার শরীরে যত বল ছিল তাহা প্রয়োগ করিয়া রমণীর কণ্ঠ দুই হস্তে পেষণ করিতে লাগিল।

রমণীও প্রাণপণে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা পাইল,—চীৎকার করিতে গিয়া পারিল না,—ক্রমে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল, কপালের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল,—ক্রমে সে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল।

তখন গোকুল দাস তাহাকে ভূমে নিক্ষিপ্ত করিল—কোন শব্দ নাই, নিঃশব্দে এই ভয়াবহ কার্য্য সংঘটিত হইতে লাগিল, ক্রমে রমণীর জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল। গোকুল দাসের মুখে হাসি দেখা দিল; এ রমণী তাহার বিরুদ্ধে এ জীবনে আর কিছু করিতে পারিবে না।

সহসা কে বজ্র-গম্ভীরস্বরে বলিল।—"এখনও নিরস্ত হও, নতুবা গুলি করিলাম।"

"এ কার কণ্ঠ স্বর?" ডাক্তার রমণীকে ছাড়িয়া সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, রমণীর মুখ হইতে এক অস্ফুট শব্দ নির্গত হইল,—এবং সে একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিত্রাণ।

নরোত্তম দাস স্ত্রী মন্নুবাঈকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন। তাহার মৃত্যুতে তিনি শোকে একেবারে অবসন্ন প্রায় হইলেন.—সে যদি জন্মের মত তাহাকে ছাড়িয়া গেল, তবে তাঁহার বাঁচিয়া থাকিয়া ফল কি?—তাহার সহিত মিলিত হওয়াই কর্ত্তব্য।—তিনি উন্মত্ত প্রায় হইয়া নিজ গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অধীর ভাবে পরিক্রমণ করিতেছিলেন।

সহসা একটা দেরাজ টানিয়া খুলিলেন,—দেরাজের ভিতর হইতে একটা পিস্তল বাহির করিলেন,—পিস্তল মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুড়িতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল, হয়তো আমার এরূপ মৃত্যুতে অপরে বিপদে পড়িবে,—ভাবিবে আমাকে অন্য কেহ খুন করিয়াছে,—না আমার জন্য অপরে বিপদে পড়িবে কেন?

তিনি পিস্তলটা পকেটে লইয়া নীরবে বসিবার ঘরে আসিলেন, এবং কাগজ কলম লইয়া লিখিলেন,—

"আমার স্ত্রীর মৃত্যুতে আমার জীবন একান্ত ভারবহ মনে হইতেছে,—এই জন্য আমি আমার প্রিয়তমা মন্নুর সহিত মিলিতে চলিলাম। আমি নিজের ইচ্ছায় পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করিতেছি—কেহ পাছে আমার মৃত্যুর জন্য বিপদে পড়ে, সেই জন্য লিখিয়া যাইতেছি।

নরোত্তম দাস।"

এইরূপ লিখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—কয়েক বার পাদচারন করিয়া পিস্তল তুলিয়া বলিলেন—"ভগবান—আমাকে ক্ষমা করিও—

তিনি পিস্তল ছুড়িতে উদ্যত হইলেন,—সহসা এই সময়ে দরজা একটু খুলিয়া গেল; কে বলিল "এই দিকে এস—তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

অপরে তাহার কীর্ত্তি দেখিবে,—এই ভয়ে নরোত্তম দাস সত্বর এক পর্দ্দার আড়ালে লুকাইলেন, ভাবিলেন যে হউক চলিয়া গেলে তার পর আত্মহত্যা করিবেন।

গৃহ মধ্যে নিঃশব্দে একটী স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল,—নরোত্তম দাস তাহাকে দেখিয়া চিনিলেন, সে তাঁহার স্ত্রীর শিক্ষয়িত্রী—জিনাবাঈ।

তাহার পশ্চাতে আসিল,—একটী পুরুষ, নরোত্তম দাস তাহাকে চিনিলেন—সে তাঁহার প্রিয়বন্ধু—ডাক্তার গোকুল দাস। উভয়ে কেহই নরোত্তম দাসকে দেখিতে পাইল না।

জিনাবাঈ বলিল, "আমার কাছে আসিতে ভয় হয়?"

ডাক্তার বলিল, "ভয় হয় না,—অবিশ্বাস হয়—আমি ব্যস্ত আছি—কি বলিতে চাও, শীঘ্র বল।"

জিনাবাঈ মৃদু স্বরে বলিল, "মন্নুবাঈ মরিয়াছে।"

"এই কথা বলিবার জন্য আমাকে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছ?"

"না—"

"তবে কি?"

"বোধ হয় তুমি শুনিতে চাও যে মন্নু বাঈ কিসে মরিয়াছে।"

"সকলেই তাহা জানে।"

"তুমি যে বিষ তাহার মুখে লাগাইয়া দিয়াছিলে—যাহার শীশি তাহার হাতে রাখিয়াছিলে, তাহাতে সে মরে নাই—তুমি গোপনে তাহাকে যে বিষ দিয়াছিলে,—তাহাতেই সে মরিয়াছে।"

"নির্লজ্জ—কেবল ঈর্ষা আর বিদ্বেষ লইয়াই আছ।"

এই বলিয়া ডাক্তার দ্বার খুলিয়া প্রস্থানোদ্যত ভাবে ফিরিলেন, তখন জিনাবাঈ বলিল, "চল, পথে বাহির হইলেই তোমাকে খুনী বলিয়া ধরাইয়া দিব।"

ডাক্তার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; জিনাবাঈ হাসিল।—

ডাক্তার আত্মসংযম করিয়া বলিল, "তুমি কি বলিতে চাও?"

জিনাবাঈ অতি গম্ভীরভাবে কহিল, "মহাশয়, আমি এই বলিতে চাই যে, মহাশয়ই মন্নুবাঈকে খুন করিয়াছেন।"

"মিথ্যা কথা।"

তাহার পর যাহা হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বলিয়াছি।

জিনাবাঈ খুন হয় দেখিয়া নরোত্তম দাস পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া ছিলেন,—তিনি তাহাদের সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন।

যে স্ত্রীকে তিনি দেবী বলিয়া জানিতেন—যাহার জন্য তিনি একটু পূর্ব্বে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন,—সে কুলটা—তাঁহারই বিশ্বস্ত বন্ধু গোকুলদাসের উপভোগ্য ছিল!—কি ভয়ানক! সে সময়ে নরোত্তম দাসের মনের অবস্থা বর্ণনাতীত,—মৃতদেহের মুখ অপেক্ষাও তাহার মুখ পাংশু বর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

তখন জিনাবাঈ মূর্চ্ছিতা হইয়া গৃহতলে পড়িয়াছিল।

নরোত্তম দাস জিনাবাঈকে পিস্তল নির্দ্দেশে দেখাইয়া ডাক্তারকে বলিলেন "ইহাকে আগে দেখ।"

এমনই ভাবে ও স্বরে নরোত্তম দাস এই কথা বলিলেন যে ডাক্তার চমকিত হইয়া ফিরিল, ক্ষণেকের জন্য নরোত্তমদাসের দিকে চাহিল,—তাঁহার মুখ, তাঁহার চক্ষু দেখিয়া ভয়ে ডাক্তার সত্বর জিনাবাঈএর মূর্চ্ছা ভঙ্গের জন্য তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। নরোত্তম দাসের হাতে পিস্তল,—তিনি সেই পিস্তল ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া ধরিয়াছিলেন।—

"জল—"

সেই ভয়ঙ্কর স্বর,—নরোত্তম দাস পিস্তল নির্দ্দেশে গৃহপার্শ্বস্থিত কুজা গেলাস দেখাইয়া দিলেন। ডাক্তার সত্বর উঠিয়া গিয়া জল আনিয়া—জিনার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল।—

কিয়ৎক্ষণ পরে জিনাবাঈ চক্ষুরুন্মিলন করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল। "আমি কোথায়?"

নরোত্তম বলিলেন, "ভয় নাই—আমি সৌভাগ্যক্রমে উপস্থিত না হইলে তোমার—যাহাই হউক—মোটের উপর আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি।"

তাঁহার স্বরে চমকিত হইয়া জিনাবাঈ—কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল,—কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না,—এক খানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, সে কি বলিতে যাইতেছিল,—কিন্তু নরোত্তম দাস তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকেরা চিরকাল বাচাল হয়,—উপস্থিত আমার স্ত্রীলোকের রসিকতা শুনিবার সময় নাই—ঐ খানে চুপ করিয়া বসিয়া থাক।"

জিনাবাঈ নরোত্তম দাসের কঠোর স্বরে ভীতা হইয়া কোন কথা কহিতে সাহস করিল না।

নরোত্তম দাস ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আমি এই ঘরে একখানা পত্র লিখিতে আসিয়াছিলাম,—আমি স্ত্রীর জন্য আত্মহত্যা করিব স্থির করিয়া, এই পত্র লিখিয়া রাখিয়া যাইতেছিলাম,—পাছে আমার মৃত্যুর জন্য অপরে বিপদে পড়ে।—আমি তোমাদের কথোপকথন শুনিতে আসি নাই,—তবে তোমাদের কথা শুনিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছে, আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়াছে—যে স্বামী, যে স্ত্রীকে যত বিশ্বাস করে, সে তত কুলটা হয়, —আর কাহার সঙ্গে—স্বামীর অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে! তবে এইরূপ দুরাত্মাকে এ প্রদেশে খুন করিলে তাহার ফাঁসি হয়—ইহাই আইন।"

নরোত্তম কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন—"তবে উপস্থিত ব্যাপারে স্বামীর ফাঁসি হইবে না—পুলিশকে ইহার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না।—যে হেতু এ ব্যাপারে স্বামী দুরাত্মাকে খুন করিয়া নিজেও আত্মহত্যা করিবে। সে পূর্ব্বে আত্মহত্যা করা স্থির করিয়াছিল, ভগবান তাহাকে ঘটনা চক্রে ফেলিয়া দুরাত্মার দণ্ড দিতেছেন—এই মাত্র।"

নরোত্তম দাসের গাম্ভীর্য্যে,—তাঁহার নিদারুণ ভাবে—তাঁহার অবিচলিত বাক্যে গোকুল দাস ও জিনাবাঈ উভয়েই যেন পাষাণ মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহাদের শিরায় শিরায় যেন হিমানি-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল।

নরোত্তম দাস ডাক্তারকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার গোকুলদাস এম, ডি মহাশয়,—অবগত হউন, আপনি জীবিত অবস্থায় এ গৃহ হইতে যাইতে পারিতেছেন না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নারী-দানবী।

ডাক্তারের মুখ মৃতের ন্যায় বিকৃত হইয়াছে—তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়াছে।—তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

জিনাবাঈর মুখেও কথা নাই। পবনান্দোলিত লতার ন্যায় তাহার দেহ-লতা ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে।

নরোত্তম দাস তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার অনিষ্ট আমি করিব না। তুমি আমার অনিষ্ট কর নাই,—আমাদের দুই জনের ইহলীলা শেষ হইলে তুমি এখান হইতে গিয়া যাহা তোমার কর্ত্তব্য তাহা করিও—এই পাপাত্মা তোমারও সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সুতরাং তোমার সম্মুখে এ সমুচিত দণ্ড

পাইলে তুমি নিশ্চিতই দুঃখিত হইবে না।" পরে ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। "বন্ধুবর! তুমি আমার স্ত্রীকে কুলটা করিয়াও নিরস্ত হও নাই, তাহাকে বিষ দিয়া হত্যা করিয়াছ; সে বিশ্বাস করিয়া ঔষধ বলিয়া তোমার হাত হইতে বিষপান করিয়াছে,—তোমার উপযুক্ত দণ্ড এ পৃথিবীতে যাহা আছে, তাহা আমি স্বহস্তে এখনই প্রদান করিতেছি—কিন্তু তোমার উপযুক্ত দণ্ড এখানে নাই, তাহা তোমার মৃত্যুর পর অন্যত্র হইবে। এখন প্রস্তুত হও।"

নরোত্তম দাস ডাক্তারের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উদ্যত করিলেন।

জিনাবাঈএর চরিত্র যাহাই হউক না কেন, সে স্ত্রীলোক, সে আর থাকিতে পারিল না, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "না—না—না ··আপনি এমন কাজ করিবেন না"

বিস্মিত হইয়া নরোত্তম পিস্তল নামাইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ডাক্তার গোকুল দাস-- তোমাকে কুকুর শৃগালের মত মারাই কর্ত্তব্য,- কিন্তু আমি সেরূপ মারিব না। দশ বার তোমাকে ভগবান্‌কে ডাকিতে সময় দিব, দশবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে তোমাকে গুলি করিব—প্রস্তুত হও।"

নরোত্তম দাস কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার ডাক্তারের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উদ্যত করিয়া বলিলেন "এক।"

ডাক্তার নীরব।

"দুই।"—

ডাক্তার নীরব।

"তিন।"

এবার ডাক্তার কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দয়া কর—দয়া কর—"

"চার।"

"ক্ষমা—ক্ষমা---"

"পাঁচ—"

সহসা জিনাবাঈ ছুটিয়া আসিয়া নরোত্তমের পদ প্রান্তে পড়িল। বলিল, "আমি মারা যাইব—আমি কি অপরাধ করিয়াছি—"

"ছয়।"

ডাক্তার কাঁপিতেছে।

জিনাবাঈ বলিল, "আমাকে সন্দেহ করিবে—এই দুই খুন—"

"সাত—"

"—আমি কি করিয়াছি, বিনা অপরাধে ফাঁসি যাইব।" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

"আট।"

জীনাবাঈ কাঁদিয়া বলিল,—"এই কি ধর্ম্ম ?"

"নয়—"

বলিয়া নরোত্তম, ধীরে ধীরে জীনাবাঈকে বলিলেন "আমার জন্য কেহ বিন্দুমাত্র বিপদে পড়ে ইহা আমি ইচ্ছা করি না।—হাঁ—তুমি আমাদের মৃত দেহের নিকট থাকিলে বিপদে পড়িতে পার—এ কথা সত্য। ভাল, আমি আমার পূর্ব্ব পত্রের নিম্নে লিখিয়া যাইতেছি যে আমি এই দুরাত্মাকে হত্যা করিয়া নিজে আত্মহত্যা করিলাম।"

জিনাবাঈ বলিল, "আপনি—আপনি—আম্যাকে রক্ষা করিলেন।"

নরোত্তম দাস বাম হস্তে পিস্তলটা ডাক্তারের দিকে লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্তে পত্র খানা টানিয়া সম্মুখে আনিলেন,এবং কলম তুলিয়া লইলেন।

এই সময়ে ডাক্তারের সহিত জিনাবাঈএর একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল।

নরোত্তম লিখিবার জন্য মস্তক অবনত করিবামাত্র নিমেষ মধ্যে জিনা বাঈ নিজের পরিহিত সাটী খুলিয়া ফেলিল,—নিমেষ মধ্যে তাহা নরোত্তমের মস্তকে মুখে নিক্ষেপ করিয়া সবলে দুই দিক হইতে টানিয়া তাহাকে ভূমি-সাৎ করিল। নিমেষ মধ্যে লম্ফ দিয়া গোকুল দাস নরোত্তমদাসের কণ্ঠদেশ দুই হস্তে চাপিয়া ধরিল—আরও জোরে—আরও জোরে—আসুরিক বিক্রমে সে উন্মত্তের ন্যায় নরোত্তম দাসের গলা দুই হস্তে পেষণ করিতে লাগিল,—ক্রমে নরোত্তমের দেহ শিথিল হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

তখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিনাবাঈ জিজ্ঞাসা করিল, "হইয়াছে।"

গোকুল দাস নরোত্তমকে ছাড়িয়া দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল—হুঁ।"

তখন ক্ষণেকে উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, কিয়ৎক্ষণ পরে জিনা বাঈ বলিল "এখন ?"

ডাক্তার বলিল, "এখন,—যত শীঘ্র হয় আমাকে এ বাড়ী হইতে যাইতে হইবে।"

"আর আমি ?"

"তুমি নিজের ঘরে গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাক।"

"আর এই !"

"এইরূপই থাক্,—ওর নিজের চিঠিতেই সকলে জানিবে যে, ও আত্ম-হত্যা করিয়াছে।"

"আর গলার দাগ ?"

"ঠিক কথা! এটা আমি মনে করি নাই—এস ইহাকে এই খাটের

ছুত্রির সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়া দিই, তাহা হইলে সকলেই ভাবিবে, গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে—এস—ধর—”

জিনাবাঈ এই ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে সহসা অগ্রসর হইল না,—নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

গোকুল রুষ্ট হইয়া বলিল “আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলে দুই জনেই মরিব।”

জিনাবাঈ কোন কথা না কহিয়া নরোত্তম দাসের দুই পা ধরিল,—ডাক্তার তাহার মস্তক ধরিল, উভয়ে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া দিল।

তখন কাপড় পরিয়া জিনাবাঈ বলিল, “তুমি সাবধানে বাহির হইয়া যাও,—আমি ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইব।”

ডাক্তার বলিল—“খুব ভালকথা,—সকলে ভাবিবে আত্মহত্যা করিবার জন্যই এ দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, আজ রাত্রে খোঁজ পড়িবে না,—কাল সকালে খোঁজ হইবে,—ততক্ষণে কেহ আমাদের আর সন্দেহ করিবে না। ”

গোকুল দাস সত্বর দরজা একটু খুলিয়া বাহিরে দেখিল, কেহ নাই। তৎক্ষণাৎ মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইল,—তখন জিনাবাঈ ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নিঃশব্দে জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লাশের অন্তর্দ্ধান।

নরোত্তম দাস জানিতেন তাহার স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার হাতে বিষের শিশি ছিল,—তাহাই তাহার মৃত্যুর পরেই তিনি পুলিশে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

বৈকালে মুন্নাবাঈএর মৃত্যু হয়,—সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে যাহা বলিয়াছি তাহা সংঘটিত হয়। রাত্রি দশটার সময়ে ইনস্পেকটর অনুসন্ধানে আসিলেন।

নরোত্তমদাস আমেদাবাদের একজন বণিক, তাঁহার আদিমনিবাস গুজরাটে, আমেদাবাদ সহরে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আসিয়াছিলেন, একটী ক্ষুদ্র বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী ও তিনি বাস করিতেন,—তাঁহার পুত্র কন্যা কিছুই হয় নাই।

তাঁহার বাড়ীতে একটীমাত্র দাসী ছিল,—বাহিরে একজন দ্বারবান ছিল। মন্নুবাঈ স্বয়ংই রন্ধনাদি করিতেন।—তবে সঙ্গিনী ও শিক্ষয়িত্রী রূপে থাকিবার জন্য নরোত্তম দাস জিনাবাঈকে গৃহে রাখিয়া ছিলেন।

ইনস্পেক্টর আসিয়া দেখিলেন, বাড়ীতে দাসী ব্যতীত আর কেহ নাই,—শুনিলেন নরোত্তমদাসের কোন সংবাদ নাই,—জিনাবাঈ পীড়িতা হইয়া শয্যাগতা হইয়া পড়িয়া আছে,--দ্বারবান নরোত্তম দাসের আত্মীয় বন্ধুগণকে তাহার স্ত্রী বিয়োগের সংবাদ দিতে গিয়াছে।

ইনস্পেক্টর নরোত্তম দাসকে বেশ জানিতেন, তিনি ডাক্তার গোকুল দাসকে চিনিতেন,—ইহাদের উভয়ের মধ্যে যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল,--তাহাও তিনি জানিতেন।--ডাক্তারের বাড়ীও অধিক দূর নহে। সেই জন্য তিনি ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিবার জন্য এক জন কনেষ্টবলকে পাঠাইয়া দিলেন।

তিনি দাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরোত্তমদাস কোথায় গিয়াছেন, কিছু বলিতে পার?"

"না—কেমন করিয়া বলিব--তাঁহার বসিবার ঘর ভিতর হইতে বন্ধ—"

"বটে—তাহা হইলে হয় তো সেই ঘরে ঘুমাইয়া আছেন। সে কোন ঘর?"

দাসী দেখাইয়া দিলে, ইনস্পেক্টর সবলে পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন,—কিন্তু ভিতর হইতে কেহ উত্তর দিল না। তখন তাঁহার মনে হইল—"স্ত্রীর মৃত্যুতে এ লোকটাও আত্মহত্যা করিল না তো?"

তিনি দাসীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "নরোত্তম দাস তাহার স্ত্রীকে খুব ভাল বাসতেন—না?"

"খুব—এমন আর দেখিনা।"

"বটে—তাহার মৃত্যু হইলে কিছু বলিয়াছিলেন কি?"

"হাঁ,—"আর আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি।"

"হইয়াছে বুঝিয়াছি"

কিন্তু তিনি অন্য কাহাকেও সম্মুখে না পাইলে দরজা ভাঙ্গিবার আজ্ঞা দিতে পারিলেন না, ডাক্তার গোকুলদাসের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গোকুলদাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনস্পেক্টর তাহাকে বলিলেন, "আপনি তো নরোত্তমদাস সাহেবের বিশেষ বন্ধু ছিলেন।"

"হাঁ তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।"

"তিনি বাড়ী নাই, অথচ তাঁহার বসিবার ঘর ভিতর হইতে বন্ধ রহিয়াছে; অনেক ঠেলাঠেলি করিয়াছি, কেহ উত্তর দেয় নাই; আপনি কি মনে করেন, স্ত্রীর শোকে তিনিও আত্মহত্যা করিতে পারেন?"

ডাক্তার ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "হাঁ আশ্চর্য্য নহে, তিনি স্ত্রীকে বড়ই ভাল বাসিতেন।" "তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন, তিনি এই ঘরে আছেন, আত্মহত্যা করিয়াছেন?"

"তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব ?"

"আমি সেভাবে আপনাকে বলি নাই, কিছু মনে করিবেন না।"

"না—মনে কি করিব।"

"এখন এ দরজা ভাঙ্গাই উচিত।"

"আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করিবেন।"

ইনস্পেক্টর কনেষ্টবলগণকে দরজা ভাঙ্গিতে আজ্ঞা দিলেন।

কনেষ্টবলগণ বড় বড় লৌহ মুদ্গর আনিয়া সবলে আঘাত করিতে লাগিল ; দেখিতে দেখিতে দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

গৃহমধ্যে অন্ধকার,—ইহার ভিতর যে কেহ আছে, তাহা বোধ হইল না। সকলেই দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া গৃহমধ্যে উঁকি মারিতে লাগিলেন।

ইনেস্পেক্টর আলো আনিতে বলিলেন ; শীঘ্রই আলো আসিল, তখন সকলে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া তাহাদের সর্ব্ব পশ্চাতে স্পন্দিত হৃদয়ে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এরূপ আত্মসংযমের ক্ষমতা, এরূপ দুরাত্মা ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না।

ডাক্তার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার বোধ হইল যেন, তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, সে একখানা চেয়ার দৃঢ়রূপে ধরিয়া অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহমধ্যে কেহ নাই—যেখানকার দ্রব্য সেইখানেই সব আছে—একটা কুটাও কেহ নাড়ে নাই,—তবে সেটা সেখানে নাই। কোথায় গেল ?

যেখানে গোকুল দাস ও জিনাবাঈ—নরোত্তমের মৃতদেহ ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন,—সেখানে সে মৃতদেহ নাই।

নরোত্তমদাসের মৃতদেহ অন্তর্হিত হইয়াছে, কে লইয়া গিয়াছে—কোথায় গিয়াছে, তাহার কোন চিহ্ন নাই।

সকলেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, ডাক্তারও আসিল,—এই ব্যাপারে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইব না।

কে দেহ লইল ?—দেহ কোথায় অন্তর্হিত হইল ? হয় ত জিনাবাঈ এ সম্বন্ধে কিছু জানে, ডাক্তার তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। দাসীর নিকট শুনিল, সে পীড়িতা হইয়া শয্যায় পড়িয়া আছে। সে পীড়িতা, তাহাকে দেখা উচিত, তিনি ডাক্তার,—এরূপ দু একটা কথা বলিয়া গোকুল-দাস ইন্‌স্পেক্টরের অনুমতি লইয়া জিনাবাঈর শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

একি! জিনাবাঈএর ভয়ানক জ্বর হইয়াছে! আবার সম্পূর্ণ বিকারও দেখা দিয়াছে,—সে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে—দাঁত কড়মড় করিয়া নানা প্রলাপ বকিতেছে,—তাহার নেত্রদ্বয় নিষ্প্রভ। শূন্যদৃষ্টিতে জিনাবাঈ গৃহের চারিদিকে চাহিতেছে। ডাক্তারের দিকেও চাহিল; সেইরূপ শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া ডাক্তারকে চিনিতে পারিল না।

তাহার এই অবস্থা দেখিয়া গোকুলদাস মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইল; মনে মনে বলিল, "স্ত্রীলোক লইয়া কাজ করিতে গেলে এইরূপ গোলযোগেই পড়িতে হয়, স্ত্রীলোকগুলা কি নির্ব্বোধ। এই চিটিখানাতে স্পষ্টই সকলে জানিতে পারিত যে, নরোত্তমদাস নিজেই গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে, তাহা নয়, এই অপদার্থ স্ত্রীলোকটা ভয়ে কোন রকমে মৃতদেহটা কোথায় সরাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার পর সেই উত্তেজনায় এই জ্বরে পড়িয়াছে। কি আপদেই পড়িলাম,—তবে এইটা ভাল—পুলিশ আর ইহাকে নাড়াচাড়া করিয়া কিছু জানিতে পারিবে না! কিন্তু একটা ভয়, বিকারের মুখে সে কিছু না বলিয়া ফেলে; যাহাতে ইহার কাছে কেহ না আসিতে পারে তাহা করিতে হইবে।"

ডাক্তার নিম্নতলে যেখানে ইনস্পেক্টর ছিলেন, তথায় আসিলেন,—এই সময়ে নরোত্তমদাসের আত্মীয় স্বজন কেহ কেহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সরকারি ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়ায় তিনিও আসিয়াছিলেন।

জিনাবাঈ ঘরে অজ্ঞান, তাহার নিকটে উপস্থিত কোন সংবাদ পাইবারই উপায় ছিল না। দাসী যাহা জানিত বলিল। দ্বারবান সর্ব্বদা বাহিরে থাকিত, বাড়ীর ভিতরের কথা সে কিছুই বলিতে পারিল না।

সরকারি ডাক্তার মুন্নাবাঈর দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি রোগের যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় ইনি বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।" আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে ইনস্পেক্টর আর মুন্নাবাঈর দেহ কাটাকুটির জন্য পাঠাইলেন না,—সৎকারের অনুমতি দিলেন।

সকলেই জানিল—মুন্নাবাঈ—আত্মহত্যা করিয়াছে; আর নরোত্তমদাস স্ত্রীর শোকে বিবাগী হইয়া গিয়াছেন।

ইনস্পেক্টর ও অপর সকলে বিদায় লইলে, ডাক্তার হাপ ছাড়িয়া বাচিলেন; গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। মাথায় আগুণ জ্বলিতেছিল; এ জগতে পাপীর ন্যায় দুঃখী কে?—

ডাক্তারের দৃঢ়বিশ্বাস যে জিনাবাঈ-ই নরোত্তমের মৃতদেহ কোনখানে

লুকাইয়াছে, কিন্তু উদ্দেশ্য কি?—নরোত্তমের স্বহস্ত লিখিত পত্র ছিল, সকলেই জানিত—সে আত্মহত্যা করিয়াছে।

ডাক্তার আপন মনে বলিলেন, "জিনাবাঈ সাধারণ স্ত্রীলোক নহে। একটু পূর্ব্বে নরোত্তম দাস তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু সে সেজন্য বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা মনে না করিয়া তাহাকে খুন করিতে আমার সাহায্য করিয়াছিল,—নিশ্চয়ই জিনার গুরুতর কোন উদ্দেশ্য আছে। নিশ্চয়ই সে ইহাতে আমাকে আরও তাহার করকবলিত করিতে চাহে—নতুবা সে এ কাজ কখনই করিত না। যতদিন এই রাক্ষসী জীবিত থাকিবে, ততদিন আমি নিশ্চিন্ত বা নিরাপদ হইতে পারিব না।"

সমস্ত রাত্রি ডাক্তার একবার নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিতে পারিল না, সমস্ত রাত্রি শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। চারিদিকে বিভীষিকা দেখিতে লাগিল,—জিনবাঈ—জিন্নাবাঈ—জিনাবাঈই তাহার সর্ব্বনাশ করিবে! সে কতবার ভাবিল, সে আমার কি করিতে পারে! তাহাকে আমার ভয় কি—তাহার জ্বরবিকার হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই এই রোগেই মরিবে—তাহার রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই, আশা নাই।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া, প্রাতে গোকুলদাস তাহার বসিবার ঘরে আসিল, সেখানে এক খানা শ্লেট ঝুলিত, কেহ তাহাকে ডাকিতে আসিলে তাহার অনুপস্থিতে এই শ্লেটে লিখিয়া যাইত,—সহসা ডাক্তারের দৃষ্টি সেই শ্লেটের উপর পড়িল, হঠাৎ সম্মুখে সর্প দেখিলে যেরূপ হয় তাহারও সেই ভাব হইল সে ভীতি বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিল। শ্লেটে লিখিত রহিয়াছে—

"নরোত্তম দাস—সদর গেট।"

ডাক্তার ভৃত্যকে ডাকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে লিখিয়া গিয়াছে?"

ভৃত্য বলিল, "আপনি ঘুমাইতেছিলেন, যিনি আসিয়াছিলেন—তিনি বলিলেন, "উঠিলেই আমাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিও।"

"কে তিনি—কি নাম?"

"তাহা জানি না—লিখিয়া গিয়াছেন।"

ডাক্তারের মুখ হইতে একটা বিস্ময়-সূচক আর্ত্তনাদ নির্গত হইতেছিল, সে অতিকষ্টে তাহা কণ্ঠে রোধ করিল। 'তবে কি মৃত নরোত্তমদাস ফিরিয়া আসিয়াছে! ইহা কি সম্ভব? তাহাকে কি দণ্ড দিতে আসিয়াছে!'

পাপীর বিভীষিকা চারিদিকে। ক্রমশঃ
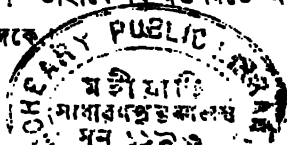
শ্রীপাঁচকড়ি দে।

গল্পলহরী

২য় বর্ষ | ভাদ্র ১৩২০ | ২য় সংখ্যা

শোণিত-তর্পণ।

আমেদনগরের সন্নিকটে একটী ভগ্নাবশেষ উদ্যান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীকে দমনে রাখিবার জন্য মহাপরাক্রান্ত ঔরঙ্গজীব বাদসাহ বৎসরের অধিকাংশ কাল দিল্লীতে না থাকিয়া আমেদনগরে বাস করিতেন। আজ পর্য্যন্তও আমেদনগরের নিকট তাঁহার ক্ষুদ্র কবর দৃষ্টিগোচর হয়। যে উদ্যানের কথা বলিলাম, ঐ উদ্যান ঔরঙ্গজীব বাদসাহের জনৈক বেগমের বাসভূমি ছিল। ঐ উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী ভগ্নাবশেষ "ফোয়ারা" এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

যে উদ্যান এক্ষণে ব্যাঘ্রাদির আবাসস্থল হইয়াছে, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা ইন্দ্রের-নন্দন-কানন অপেক্ষাও সুন্দর ও মনোহর ছিল,—যে "ফোয়ারা" এক্ষণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বিষাদে কাঁদিতেছে, ঐ "ফোয়ারা" একদিন গোলাপজল উদ্গীরণ করিত। যে অট্টালিকা এক্ষণে ভগ্নস্তূপ মাত্র, এক সময়ে ঐ অট্টালিকা বিলাস-ভূমির আবাসস্থল ছিল। যেখানে এক্ষণে দিবসে শৃগাল রব করিতেছে, এক সময়ে সেইখানে অপ্সরীবিনিন্দিতা রমণীগণ সঙ্গীত-বাদ্যে মন মাতাইয়া তুলিত।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যখন ঔরঙ্গজীব আমেদনগরে বাস করিতেন, যখন এই উদ্যান বিলাস সাগরে ভাসিত, সেই সময়ে একদিন সন্ধ্যার ঠিক প্রাক্কালে উদ্যানের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একটী মনোহর নিকুঞ্জ মধ্যে একটী যুবক একমনে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। যুবকের বয়স পঁচিশের কিছু উপর; শরীরে যথেষ্ট বল আছে; বেশ উচ্চবংশীয় মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায়; কোমরে কেবল একখানি ক্ষুদ্র

ছুরিকা মাত্র। হিন্দুবীর কোন্ সাহসে ঔরঙ্গজীবের বেগম মহলে প্রবেশ করিয়াছেন ?

কিয়ৎক্ষণ পরে অলঙ্কারের মধুর শব্দ শ্রুত হইল; সহসা চতুর্দ্দিক আলো করিয়া একটী ষোড়শী যুবতী ধীরে ধীরে সেই নিকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবক চমকিত হইয়া উঠিয়া রমণীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া সুন্দরী কহিলেন, "পুরন্দর, আমি অস্পৃশ্য, আমাকে ছুঁইও না।" পুরন্দর সে কথা না শুনিয়া যুবতীর গণ্ডে পাগলের ন্যায় শত সহস্র চুম্বন করিলেন; উভয়েরই গণ্ড বহিয়া অবিরতধারে নয়নাশ্রু ঝরিল। পুরন্দর বলিলেন, "ফুল,—শরীর অপবিত্র হইয়াছে, কিন্তু হৃদয়তো হয় নাই! তোমার হৃদয় আমার; শরীর তো কখনও দেখি নাই,—চাহি নাই! আজ তোমারি অনুরোধে সে শরীর হইতে হৃদয় বিচ্ছিন্ন করিতে আসিয়াছি!" পুরন্দরের হৃদয়ে মস্তক রাখিয়া ফুল কাঁদিতেছিল, পুরন্দরও কাঁদিতেছিলেন। এইরূপে নীরবে দুইজনে কতক্ষণ কাঁদিলেন, তাহা দুইজনের কেহই জানিতে পারেন নাই। ফুল প্রথম কথা কহিল, তখন আর তাহার চক্ষে জল নাই;—বলিল, "এ অপবত্রি দেহ আর রাখিব না স্থির করিয়াছি। যদি এ হৃদয় আমার হইত, তাহা হইলে এতদিন ইহাকে এ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতাম; কিন্তু পুরন্দর, যখন আমি ছেলে মানুষ, তখন হইতেই এ হৃদয় তোমার,—এ শরীরও তোমার;—বলপূর্ব্বক মহাপাতকী এ শরীরকে কলঙ্কিত করিয়াছে, এ শরীর আর রাখিব না। তোমাকে ডাকিয়া বিপদের মুখে আনিয়াছি,—আর বিলম্ব কেন?" পুরন্দর ধীরে ধীরে কটিবন্ধ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিলেন, বলিলেন, "মায়া দয়া সকল বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি, মরিয়া দুই জনে মিলিব। তবু যে—।" ফুল একটু বিষাদপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, "ছি! তুমি আমাকে নরক-যন্ত্রণা হইতে স্বর্গে লইয়া যাইতে ভয় পাইতেছ!" পুরন্দর ফুলকে হৃদয়ে লইয়া অসংখ্য চুম্বন করিয়া বিকৃত স্বরে কহিলেন, "তবে আর বিলম্ব কেন?" ফুল হৃদয় পাতিয়া দিল, শাণিত ছুরিকা উঠিল। এক মুহূর্ত্তেই ফুল অপেক্ষাও কোমল ফুলের হৃদয়ে ছুরিকা আমূল বিদ্ধ হইত, কিন্তু তাহা হইল না।

নিকুঞ্জ পার্শ্ব হইতে একজন মহা বলবান কৃষ্ণকায় খোজা এ ঘটনা দেখিতেছিল। যুবককে ছুরিকা তুলিতে দেখিয়া সে সত্বর আসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে যুবকের হস্ত ধরিল; উভয়ে চমকিত হইয়া ফিরিলেন। সহসা ফুলের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। সিংহিনীর ন্যায় ফুল খোজার দিকে ফিরিলেন, বলিলেন,—"মসরুর, জান আমি কে?"

খোজা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, "আপনি বেগম সাহ।" ফুল বলিল, "আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি এই মুহূর্ত্তেই এই যুবকের হস্ত ত্যাগ কর,—ইনি আমার আত্মীয়।" অবিচলিত ভাবে খোজা কহিল, "বেগম সাহেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া এই কাফেরের হস্ত ত্যাগ করিলাম; কিন্তু যে বেগম সাহেবের প্রাণ নাশে উদ্যত হইয়াছিল, বাদসাহের হুকুম ভিন্ন তাহাকে ছাড়িতে পারি না।" "তবে পার বন্দী কর," এই বলিয়া ফুল দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া সজোরে ভূমিতে পদাঘাত করিলেন, অমনি দেখিতে দেখিতে পুরন্দর যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থান তাঁহার পদ নিম্নে নামিয়া গেল,—দেখিতে দেখিতে পুরন্দর মৃত্তিকা নিম্নে অন্তর্ধান হইলেন; দেখিতে দেখিতে আবার যেরূপ স্থান সেইরূপ হইল। তখন ফুল মন্দগমনে নিকুঞ্জ হইতে সিংহিনীর ন্যায় বাহির হইলেন; বাহিরে আসিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "যদি ইচ্ছা হয়, এ সংবাদ বাদসাহকে দিও!"

খোজা দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়াছিল। মনে মনে বলিল, "সে সাধ আর নাই। একটা বালিকা আমাকে ঠকাইল! স্বয়ং পয়গম্বর স্ত্রীলোকের নিকট ঠকিয়াছিলেন, আমি কোন ছার! যাহা হউক কাফেরকে ধরিতে হইবে।" এই ভাবিয়া খোজা মসরুর বংশী ধ্বনি করিল, অমনি আর দুইজন খোজা আসিয়া তাহাকে সেলাম করিল। মসরুর কহিল, "তোমরা বোধ হয় জান এখান হইতে একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে?" একজন খোজা কহিল, "আছে, বাদসাহের শয়ন-গৃহ হইতে নগর পর্য্যন্ত একটা পথ মাটীর নীচে দিয়া গিয়াছে।" মসরুর বলিল, "সত্বর যাও, এই সুড়ঙ্গ দিয়া একজন মাহাট্টা গিয়াছে, তাহাকে ধরিতে হইবে।" তাহারা দ্রুত পদে চলিয়া গেল। তখন মসরুরও ভাবিতে ভাবিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

২

ফুল ও পুরন্দরের কিছু পরিচয় দিব। আমেদনগরের পাঁচ ক্রোশ দূরে দেবীগাঁও নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী ছিল; এক্ষণে ইহার কোন চিহ্ন নাই। এই পল্লীতে নারায়ণরাও নামে একজন মধ্যবিৎ লোক বাস করিতেন; পুরন্দর তাহারই একমাত্র সন্তান। ঐ গ্রামে একটী বিধবা রমণী বাস করিত, ফুল তাঁহারই কন্যা। লোকে বলিত এই বিধবা কোন রাজপুত রাজার মহিষী। সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না, বোধ হয় ফুলের অলোকসামান্য রূপ ও রাজরাজেশ্বরী ভাব দেখিয়াই লোকে এ জনরব রটাইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে ফুল ও পুরন্দর এক

সঙ্গে থাকিত, কারণ পুরন্দরদিগের বাটীর পার্শ্বেই ফুলের মাতা বাস করিতেন। যখন ফুল প্রায় ষোড়শ বর্ষে পড়িল, তখন পুরন্দরের পিতা পুরন্দরকে ফুলের সহিত বিবাহ দিলেন। বিবাহের কয়েক দিন পরেই ফুলের মাতার প্রাণবিয়োগ হইল;—প্রেমময় দুইটী হৃদয় যেন পরস্পরের জন্যই জন্মিয়াছিল ও যাহা এই দিন কয়েক মাত্র একত্রিত হইয়াছিল, সেই দুইটী হৃদয় আবার বিচ্ছিন্ন হইল। বিবাহের ঠিক একমাস পরে, একদিন ঔরঙ্গজীব বাদসহ শিকারে আসিয়া দেবীগাওয়ে ফুলকে দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম জারি হইল। শিবাজী ভিন্ন তখন ভারতবর্ষে এমন কোন লোক ছিল না যে বাদসাহের হুকুম অমান্য করে;—সুতরাং ফুল অবাধে বেগম মহলে প্রেরিত হইল। সেখানে ফুল বেগমরূপে মনোহর বিলাসপূর্ণ হর্ম্ম্যে বাস করিতে লাগিল।

ফুল একমাস মতিবাগ নামক উদ্যানে বাস করিল। সেই শত্রুপুরেও সে একটী সখী পাইয়াছিল। এটা একটা বাঁদী, সকলে ইহাকে জুমেলা বলিয়া ডাকিত। ফুল জুমেলার সাহায্যে পুরন্দরকে একখানি পত্র পাঠাইল এবং ঐ পত্রে তাহার অবস্থা বর্ণনা করিয়া, তৎপরে সেইখানে আসিয়া তাহার প্রাণনাশ করিতে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিল। সে লিখিয়াছিল, "যদি আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা থাকে, তবে আইস দুইজনে এক সঙ্গে মরি। মরিলে আর এ পাপ পৃথিবীতে থাকিতে হইবে না, স্বর্গে গিয়া দুইজনে সুখে থাকিব। এ নরক হইতে উদ্ধারের যখন অন্য উপায় নাই, তখন আইস, তোমার শাণিত ছুরিকা আমার হৃদয়ে বসাইয়া আমায় বাচাও।" পুরন্দর তেজস্বী মার্হাট্টা,—নিজ স্ত্রীকে পাপপঙ্কে মগ্ন হইতে দেওয়া অপেক্ষা তাহার প্রাণ নষ্ট করা ভাল বিবেচনা করিয়া ফুলের সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। জুমেলার বুদ্ধি কৌশলে অজ্ঞাতসারে তিনি বেগমমহলে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন।

৩

সহসা মৃত্তিকানিম্নে অন্ধকারময় গহ্বরে পতিত হইয়া পুরন্দর স্তম্ভীত হইলেন। এত শীঘ্র এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, তিনি ব্যাপার কি ভাল বুঝিতে পারিলেন না, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন;—কিন্তু তাঁহার অধিক্ষণ ভাবিতে হইল না; একটী কোমল হস্ত তাঁহার পৃষ্ঠস্পর্শ করিল,—তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" যেন স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর হইল, "যুবক, সত্বর পলায়ন কর, নিকটে শত্রু আছে। বেগমের একান্ত অনুরোধ, সত্বর পালাও। অন্য কথা জিজ্ঞাসা

করিও না। যদি বাচিতে পার ফুলের সহিত দেখা হইবে। পালা ও সুড়ঙ্গ মুখে সুসজ্জিত অশ্ব আছে।” স্বর ক্রমে অন্ধকারে মিশিয়া গেল; পুরন্দর অন্য উপায় নাই দেখিয়া পলায়নই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া অন্ধকারে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সুড়ঙ্গ মুখে আসিতে অনেক বিলম্ব হইল; কিন্তু বাহির হইয়া দেখিলেন, একটী অশ্ব সত্য সত্যই নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। লম্ফ দিয়া আরোহণ করিয়া তিনি অশ্ব ছুটাইলেন।

কিছুদুর যাইয়া তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহাকে দুই জন অশ্বারোহী অনুসরণ করিতেছে। অশ্বকে আরও বেগে ছুটাইলেন, কিন্তু তিনি যেমন একটী পথ ফিরিবেন, অমনি প্রবল বেগে দুইটী তীর আসিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বিদ্ধ হইল। তিনি সে দুঃসহ যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া অশ্বকে পুনঃ পুনঃ পদতাড়না করিতে লাগিলেন। তথাচ দেখিলেন যে, তাঁহার পশ্চাতস্থ অশ্বারোহীদ্বয় ক্রমেই নিকটস্থ হইতেছে। তিনি লম্ফ দিয়া অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে নিম্নে অবতীর্ণ হইলেন; অশ্বকে কশাঘাত করিলেন; অশ্ব প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল; তিনি অন্ধকারে এক গৃহপার্শ্বে লুকাইলেন। দেখিতে দেখিতে পশ্চাতস্থ অশ্বারোহীদ্বয় আসিয়া পড়িল। সম্মুখস্থ অশ্বে যুবক আছেন ভাবিয়া তাহারা সেই অশ্বের অনুসরণ করিল। ক্রমে ক্রমে অশ্বের পদ শব্দ বাতাসে মিশিয়া গেল।

যখন চতুর্দ্দিক নীরব হইল, তখন যুবক বাহির হইলেন। এ কোথায় আসিয়াছেন, কত রাত্রি হইয়াছে, ইহার কিছুই তাঁহার দেখিবার এতক্ষণ সময় হয় নাই। এখন দেখিলেন; আমেদনগরের একটী জনশূন্য স্থানে তিনি আসিয়াছেন, রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। যুবক তখন সবলে বাহু হইতে তীরদ্বয় তুলিলেন। তীরের সহিত তীর বেগে রক্ত ছুটিল। নিজ উষ্ণীষবস্ত্র দিয়া বাহু বন্ধন করিলেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে রক্তে তাঁহার বস্ত্রাদি ভিজিয়া গেল। পুরন্দর গৃহে যাইতে মনস্থ করিয়া অগ্রসর হইলেন, কিন্তু অধিক দুর যাইতে পারিলেন না,—রক্তপাতে শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন; তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, তিনি পড়িতে পড়িতে অতি কষ্টে একটী পথ পার্শ্বস্থ গৃহসোপানে বসিলেন। বসিবামাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

৪

যখন পুরন্দর সংজ্ঞা লাভ করিলেন, তখন তাহার বোধ হইল, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। এক সুবৃহৎ গৃহে তিনি হস্ত পদ দৃঢ় রজ্জুতে আবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া

আছেন। গৃহে শত শত স্বর্ণদীপে সুগন্ধি তৈল পুড়িতেছে; সেই গন্ধে গৃহ মাতাইয়া তুলিয়াছে; পুষ্পহার স্তম্ভে স্তম্ভে জড়িত; পুষ্প নির্ম্মিত সুবৃহৎ পাখা উপরে দুলিতেছে। সম্মুখে স্বর্ণসিংহাসনের উপর দিল্লীশ্বর—পার্শ্বে তাঁহারই ফুল। বাদসাহের সম্মুখে দ্বাদশ জন মনোমোহিনী রমণী সঙ্গীত ও নৃত্য করিতেছে। তিনি বন্ধন ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল। এই সকল দেখিয়া তাঁহার ক্ষত হইতে আবার প্রবল বেগে শোণিত নির্গত হইল, তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইলেন।

পুরন্দরের যখন পুনরায় সংজ্ঞালাভ হইল, তখন তিনি দেখিলেন যে, তিনি বাদসাহের সিংহাসনের নিকট আনিত হইয়াছেন। তাঁহার নিকট চারিজন খোজা শাণিত ছুরিকা হস্তে দণ্ডায়মান আছে; গীত বাদ্য বন্ধ হইয়াছে, রমণীগণ সারি দিয়া বাদসাহের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছে। এতক্ষণে তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার বিচার উপস্থিত। যুবকের সরলতাপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া কঠোরপ্রাণ ঔরঙ্গজীবের হৃদয়ও একটু নরম হইয়াছিল, নতুবা এতক্ষণ বহুপূর্ব্বে তাঁহাকে যমপুরে বাস করিতে হইত। ঔরঙ্গজীব কহিলেন, "যুবক তোমার অতিশয় সাহস; যে বেগমমহলে পক্ষী পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না, তুমি সেই স্থানে প্রবেশ করিয়াছিলে। যদি তুমি কাহার নিকট আসিয়াছিলে বল, তাহা হইলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি।" পুরন্দরের পক্ষে ইহা বলা অসম্ভব,—তিনি সে দিন মরিতেই আসিয়াছিলেন; সুতরাং মৃত্যুভয়ে তিনি ভীত ছিলেন না। তিনি ইহাও বেশ জানিতেন যে, তিনি মরিলে ফুলও মরিবে। আর এ বিশ্বাসও তাঁহার ছিল যে, মরলে তাঁহারা দুইজনে স্বর্গে মিলিবেন। এই সকল কারণে পুরন্দর কহিলেন, "বাদসাহ, অপরাধ করিয়াছি, প্রাণদণ্ড হইবে, প্রাণদণ্ড করুন; কিন্তু কিছুতেই কাহার নিকট আসিয়াছিলাম বলিব না।" বাদসাহের সম্মুখে এরূপ কথা কেহ কখন বলিতে সাহস করে নাই। ঔরঙ্গজীবের মুখ লোহিত বর্ণ হইল। তিনি খোজাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "এখনি এই পামরের প্রাণ নাশ কর। এ মহলে যে যে বাস করে সকলেই এখানে দাঁড়াইয়া আছে।" ফিরিয়া বলিলেন, "কোন বাঁদীর প্রণয়ার্থে এ যুবক এখানে আসিয়াছিল?" কেহই উত্তর করিল না। তখন আরঙ্গজীব আরও রাগত হইয়া উঠিলেন। রাগ হইলে আরঙ্গজীবের জ্ঞান থাকিত না;—আজ্ঞা করিলেন, "এইখানেই এই পামরকে নাশ কর, তাহার প্রণয়ী দেখিয়া সুখী হউক।" আজ্ঞা মাত্র চারিখানি শাণিত ছুরিকা উঠিল; বিদ্যুতের মত চমকিল; তৎপরে একটী হৃদয় বিদারক চীৎকারে গৃহ উদ্যান ও

আকাশ কম্পিত হইয়া উঠিল। বাদসাহ স্বয়ং অসি হস্তে সিংহাসন হইতে লম্ফ দিয়া নিম্নে নামিলেন।

নামিয়া যাহা দেখিলেন সে অতি লোমহর্ষণ, হৃদয় বিদারক দৃশ্য; দেখিলেন ফুল স্বয়ং গিয়া সেই শাণিত ছুরিকার সম্মুখে হৃদয় পাতিয়া দিয়াছে। দুইখানি ছুরি তাহার হৃদয়ে আমুল বিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও পুরন্দর বাঁচে নাই, আর দুইখানি পুরন্দরের হৃদয়েও বিদ্ধ হইয়াছে। বাদসাহ যথার্থ ফুলকে একটু ভালবাসিতেন, দুঃখে কহিলেন, "ফুল, করিলে কি?" ফুল বাদসাহের দিকে চাহিয়া কহিল, "সম্রাট—স্বামীকে বুক দিয়া স্ত্রীর রক্ষা করা উচিত, তাহাই করিয়াছি। এই কয়েকটী কথা মুমূর্ষু পুরন্দরের কর্ণে গেল। তাঁহার বাকশক্তি রহিত হইয়াছিল তথাচ এই কয়েকটী কথায় যেন তাঁহার শরীরে বল আসিল; তিনি অতি কষ্টে মস্তক ফুলের মুখের নিকট লইয়া তাহার গণ্ডে চুম্বন করিলেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*

বাদসাহের পাষাণ প্রাণও এ দৃশ্যে দ্রবীভূত হইল। তিনি আজ্ঞা করিলেন, "সাত দিবস আমেদনগরের সকল লোকে শোক চিহ্ন ধারণ করুক। এই প্রাসাদের সম্মুখে ইহাদের দুইজনকে একত্রে কবর দাও। ঐ কবরের উপর অদ্যই শ্বেত পাথরের এক ফোয়ারা নির্ম্মাণ কর। ঐ ফোয়ারা যেন দিবারাত্রি গোলাপ জল বর্ষণ করে; আর ঐ কবরের নিম্নে ইহাদের স্বর্গীয় প্রণয়ের স্মারক-লিপি স্বরূপ একটী শ্লোক লিখাও। দিল্লীশ্বরের আজ্ঞায় এক দিবসে নগর হইয়াছে; এ সামান্য কার্য্য হইবে আশ্চর্য্য কি? পর দিবস সন্ধ্যাকালে ফুল ও পুরন্দরের কবরের উপরস্থ ফোয়ারা গোলাপজল বর্ষণ করিতে লাগিল। বাদসাহ আসিয়া স্বয়ং একটী গোলাপ বৃক্ষ কবরের পার্শ্বে রোপণ করিলেন। প্রায় তিন শত বেগম ও তাঁহাদের প্রায় দেড় সহস্র বাঁদী ও সহচরী সেই সময়ে এক একটী পুষ্প হার সেই কবরের উপর স্থাপন করিলেন। বাদসাহ বলিলেন, "শ্লোক পাঠ কর, কে রচনা করিয়াছে?" একজন কহিল সাহানসাহ বেগম সাহেবের বাঁদী জুমেলা লিখিয়াছে।" বাদসাহ জুমেলাকে পাঠ করিতে আজ্ঞা করিলেন, জুমেলা পড়িল;—

ঝরিয়া যাইবে যদি জানিতাম ফুল।
কে বল ছিঁড়িত ইহা করি মহা ভুল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

———

নরাধম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাপীর হৃদয়।

বহুক্ষণ গোকুলদাস পদচারণ করিল। তবে কি যথার্থই নরোত্তম দাস জীবিত আছে,—তবে কি তাহার জীবনের শেষ হইয়াছে,—তবে কি সে সময় থাকিতে পলাইবে?

বহুক্ষণ ধরিয়া গোকুলদাস ভাবিল,—সে সহজে ভয় পাইবার লোক নহে, অবশেষে নরোত্তমদাসের বাড়ী যাওয়াই স্থির করিল। ভয় পাইলে বিপদ বৃদ্ধি পায়,—বিপদে সাহস অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

স্পন্দিত হৃদয়ে গোকুলদাস নরোত্তমদাসের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল,—সেখানে আর এক নরোত্তমদাসকে দেখিতে পাইল,—তখন সে অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিল,—হৃদয়ে বল দেখা দিল।

ইনি নরোত্তমদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বোধ হয় সকলেই জানেন গুজরাট প্রদেশে সকলেই পিতার নাম নিজের নামের সহিত যুক্ত করিয়া থাকেন। ইহার নাম জগন্নাথ, আর যিনি হত হইয়াছেন, তাঁহার নাম রঘুনাথ—ইঁহাদের পিতার নাম নরোত্তমদাস, তাহাই একজন রঘুনাথ নরোত্তম দাস অপরে জগন্নাথ নরোত্তম দাস—সুতরাং উভয়েই নরোত্তম দাস।

মিথ্যা এত ভয় পাইয়াছিল বলিয়া গোকুলদাস মনে মনে লজ্জিত হইল,—এই অভিনব নরোত্তমদাসকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনি আমাকে আসিতে বলিয়াছিলেন?"

"হাঁ, শুনিলাম আপনি দাদার বিশেষ বন্ধু। এখন ব্যাপার কি? দাদা কোথায়,—আমার ভ্রাতৃ-জায়া আত্মহত্যা করিলেন কেন?"

ডাক্তার উত্তর করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, "আমি দাদার কাগজ-পত্র সব দেখিয়াছি,—তাহা হইতে দাদার কি হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—

তিনিও কি আত্মহত্যা করিলেন নাকি? তিনিও কি মারা গিয়াছেন,—না জীবিত?"

ডাক্তার ঘাড় নাড়িলেন,—ইহাতে হাঁ না দুই বুঝাইতে পারে। গোকুলদাস সহসা কিছু বলিতে নারাজ। তাহার কথা কহিবার বিশেষ আবশ্যকও কিছু হইল না,—এই অভিনব নরোত্তমদাস নিজেই বাক্যে পরিপূর্ণ—তিনি বলিলেন, "দাদার বাক্সে তাঁহার উইল পাইলাম,—আপনি বোধ হয় জানেন,—আপনি আর আমি তাঁহার একজিকিউটার।"

ডাক্তার ইহা জানিতেন না,—তবে জানিতেন যে, তাহার উপর নরোত্তম দাসের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল।

জগন্নাথ নরোত্তম দাস বলিলেন, "তিনি তাঁহার সবই তাঁহার স্ত্রীকে দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর তঁ দি যদি না থাকে,—তবে আমরা দুইজনে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি পাইব। দাদার স্ত্রী মারা গিয়াছেন, যদি দাদাও মারা গিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সবই আমাদের হইয়াছে।"

এতক্ষণ গোকুলদাসের মুখে কথা ফুটিল। সে এতই বিস্মিত হইয়াছিল যে, তাহার মুখে কথা সরিতেছিল না; এইবার সে বলিল, "এখন আমাদের কি করা উচিত?"

"দাদাকে খুঁজিয়া বাহির করা—"

"খুঁজিয়া বাহির করা?"

"হাঁ—মৃত কিম্বা জীবিত, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, তাহাকে আমি বিশেষ পুরস্কার দিব, এইজন্য এ কাজে আমি পুলিশ নিযুক্ত করিতেছি না,—একজন আমার পরিচিত গোয়েন্দা আছে তাহাকে নিযুক্ত করিব—সে শৃগাল অপেক্ষাও ধূর্ত্ত—সে পারে না এমন কাজই নাই—"

"তবে সে—"

"আইন বাঁচাইয়া সে সব করিয়া থাকে। জুয়াচুরি, বদমাইসি, জাল জালিয়াতি, প্রয়োজন মত সে সব করিয়া থাকে, কেবল এইটুকু দেখে যে জেলে যাইতে না হয়—"

"তাহা হইলে আপনি এই রকম ভয়ানক লোককে নিযুক্ত—"

মধ্যপথে বাধা দিয়া জগন্নাথ কহিলেন, "হাঁ চোর ধরিতে হইলে চোরকে সে কাজে নিযুক্ত করাই বিহিত—কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হয়—একবার আমি

তাহাই করিয়াছিলাম, এক জনকে সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, সে আমার সব লইয়া অন্তর্দ্ধান হয়, এখন সাত বৎসর জেলে আছে।"

"এই লোককে কি—"

"হাঁ—এই লোককে সেই ধরাইয়া দিয়াছিল,—তবে তার একটা মহৎ দোষ আছে, অপরাধীকে ধরিয়া যদি তার কাছে কিছু গুপ্ত প্রাপ্য ঘটে, তখনই তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, যাকে সে লোক জেলে দিয়াছে, তার কাছে আদায়ের চেষ্টায় ছিল—কিন্তু কিছু পায় নাই, কাজেই জেল। হাঁ এখনই সে পৌছিবে—তাহাকে সংবাদ দিয়াছি—এই সে আসিয়াছে।"

ডাক্তার চমকিত হইল, পূর্ব্ব হইতে ইহা জানিতে পারিলে সে সাবধান হইতে পারিত, কিন্তু এখন আর সময় নাই। এই লোক নিশ্চয়ই তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবে, ডাক্তার অতিকষ্টে আত্মসংযম করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল।

এই সময়ে ভৃত্য এক ব্যক্তিকে তথায় লইয়া আসিল,—ইহার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর, জাতিতে মারাঠী, দেখিলেই অতি চতুর লোক বলিয়া বোধ হয়।

জগন্নাথ বলিলেন "এই আমার সেই লোক—নাম ক্ষণ্ডেরাও—কার্য্যে ধুরন্ধর"।

ক্ষণ্ডেরাও মৃদু হাস্য করিয়া বসিলেন। জগন্নাথ বলিলেন, "রাও, এবার তোমাকে একটা গুরুতর কাজের ভার দিতেছি।"

ক্ষণ্ডেরাও হাসিয়া বলিলেন, "সেবারকার মত।"

"না তাহাপেক্ষাও গুরুতর, জীবন মরণের কথা।"

ক্ষাণ্ডেরাওএর মুখ হইতে হাসি অন্তর্হিত হইল, তিনি গম্ভীর হইয়া বসিলেন। বসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "সব বলুন।"

"কাল আমার ভ্রাতৃজায়া :এ বাড়ীতে মারা গিয়াছেন।"

"কিসে ?"

"বিষে।"

রাও মস্তক কণ্ডুয়ন করিলেন। জগন্নাথ বলিলেন, "আত্মহত্যা,—বিষ লইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তোমার তদন্তের আবশ্যক নাই—কাল রাত্রি হইতে আমার দাদা নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তিনি জীবিত থাকুন আর মৃতই হউন,—আমরা তাঁহাকে চাই।"

"জীবিত কিম্বা মৃত—ইহার অর্থ ?"

"স্ত্রীর শোকে তিনি পাগলের মত হইয়াছিলেন;—সুতরাং আত্মহত্যা অসম্ভব নহে।"

"তাহার পর।"

"একটা ঘর ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। পুলিশ দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে দেখা গেল গৃহ-মধ্যে কেহ নাই।"

"ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিল কে?"

"জানি না—আমি আজ কেবল এখানে পৌঁছিয়াছি।"

"তাহা হইলে আপনি নিজে কিছু জানেন না,—সবই শোনা কথা।"

"এই ডাক্তার আপনাকে বলিবেন—"

"ডাক্তারতো কিছু বলিতেছেন না—" বলিয়া ক্যাণ্ডেরাও ডাক্তারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে ডাক্তার মহাশয়, আপনি এখানে উপস্থিত ছিলেন?"

গোকুলদাস বলিল, "আমি যাহা জানি, সকলই আপনাকে বলিতে প্রস্তুত আছি।"

রাও পকেট হইতে এক নোট বই বাহির করিয়া বলিলেন, "আমি প্রশ্ন করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উত্তর দিলে কার্য্য সংক্ষেপ হইবে।"

গোকুলদাসের হৃদয় কম্পিত হইল, সে অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া বলিল, "জিজ্ঞাসা করুন।"

"আপনি কখন নরোত্তমদাসকে সব শেষে দেখিয়াছিলেন?"

কি ভয়ানক প্রশ্ন! গোকুলদাসের আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল, ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—রাও তাহা লক্ষ্য করিলেন।

অবশেষে ডাক্তার বলিল, "কাল বৈকালে!"

"তাহা হইলে কাল বৈকালে আপনি এ বাড়ীতে আসিয়াছিলেন,—তাহার পর রাত্রি কালে আর আসিয়াছিলেন কি? প্রত্যহ রাত্রিতে তাঁহার নিকটে আসিতেন কি? কখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন?"

"না—শুনিলাম, তিনি শয়ন করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আর বিরক্ত করি নাই—"

"যখন দরজা ভাঙ্গা হয়,—তখন আপনি উপস্থিত ছিলেন?"

"হাঁ—পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর আমাকে ডাকিয়া পাঠান।"

"আপনি মনে করিয়াছিলেন যে, এই ঘরের ভিতরে নরোত্তমদাস আত্মহত্যা করিয়া মরিয়া পড়িয়া আছেন?"

"হাঁ—আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল বটে।"

"অথচ আপনি ইহাকে বলিয়াছেন, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।"

ডাক্তার একটু বিচলিত হইয়া উঠিল,—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাও ইহাও লক্ষ্য করিলেন।

ডাক্তার বলিল, "ঘরের মধ্যে তাহাকে না দেখিয়া এইরূপ মনে হইয়াছিল।"

"আপনার সঙ্গে তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।"

"হাঁ—এত বন্ধুত্ব ছিল যে, তিনি তাহার উইলে আমাকে একজিকিউটার করিয়া গিয়াছেন।"

"উইলের কথা তুলিয়া ভালই করিলেন। ইহাতে আসল কথায় আসিলাম,—কেহ কেহ এরূপ গোলযোগ ঘটিলে এই সকল ব্যাপারের ভিতর কোন না কোন স্ত্রীলোক আছে ভাবিয়া তাহারই সন্ধানে নিযুক্ত হয়,—আমি তাহা করি না, আমি উদ্দেশ্য—উদ্দেশ্যের অনুসরণ করি।"

"আমি আপনার কথা ঠিক বুঝিলাম না।"

"প্রথম—আমাকে দেখিতে হইবে ইহার মৃত্যুতে লাভ কাহার?"

"আমি আর ইনি মৃত ব্যক্তির একজিকিউটার।"

"কিসে জানিলেন—তিনি মৃত? আপনি কি ঠিক জানেন তিনি মরিয়াছেন?"

"আমি—আমি—না—আমি কিরূপে জানিব!"

"হাঁ—তাহা সত্য—আপনি আর ইনি মৃত-ব্যক্তির একজিকিউটার নিযুক্ত হইয়াছেন, আর তাহার মৃত্যুতে——"

এবার জগন্নাথ কথা কহিলেন, "দাদার স্ত্রী মারা গিয়াছেন,—দাদা যদি মারা গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্পত্তি আমরা দুইজনে পাইব।" ক্ষণ-পরে তিনি আরও বলিলেন, "এখন উদ্দেশ্য ধরিয়া যদি বিবেচনা করিতে হয়, তাহা হইলে সন্দেহ আমাদের দুইজনের উপরই পড়িতেছে; আমি এখানে আদৌ ছিলাম না,—সুতরাং তোমার সন্দেহ—ডাক্তারকে লইয়া,—কেমন নয়?"

রাও হাসিতে লাগিলেন। গোকুলদাস তাহার রসিকতা বুঝিল না,—জগন্নাথের কথায় ডাক্তার চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল,—কিন্তু অতি কষ্টে সে নিজ স্বাভাবিক ভাব বজায় করিল,—তবুও রাও তাহার এ ভাব লক্ষ্য করিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "ও কথা—কথাই নহে। আমাদের দৃষ্টি অন্যত্র নিক্ষেপ করিতে হইবে। তাঁহার অবস্থা কিরূপ ছিল?"

"খুব ভাল।"

"তাহা হইলে আপনারা দুইজনে বেশ কিছু পাইতেছেন।"

"না—তিনি আত্মহত্যা করেন নাই।"

"কেন?"

"কোন সূত্রে ইহা জানিতে পারিয়াছি।"

গোকুলদাস কম্পিত হৃদয়ে ভাবিল, "সূত্রের কথা কি বলে? এই লোকটা কি কোন সূত্র ধরিতে পারিয়াছে নাকি,—এ কি জানিতে পারিয়াছে,—না— অসম্ভব,—আমি অনর্থক ভয় পাইতেছি।"

এই সময়ে দাসী পান লইয়া আসিল। রাও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কতদিন এ এখানে আছে?"

জগন্নাথ বলিল,—অনেক দিন আছে—তিন চার বৎসর আগে যখন আমি দাদার এখানে আসিয়াছিলাম, তখনও এ ছিল।"

ক্যাণ্ডেরাও বলিল "ইহার সহিত পরে কথা কহিব,—এখন যে ঘরটা বন্ধ ছিল, সেটা আমি একবার দেখিতে চাই।"

"এস।"

"না—আমি একা দেখিতে চাই,—এ সকল বিষয়ে আমি একাই কার্য্য করিতে ভালবাসি।"

"যাহা ভাল বুঝ, কর।"

সাহসা রাও ডাক্তারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে বিষ খাইয়া ইঁহার ভ্রাতৃজায়া আত্মহত্যা করিয়াছেন?"

ডাক্তার ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আপনি নরোত্তমদাসের নিরুদ্দেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন।"

ক্যাণ্ডেরাও বলিল,—"হাঁ—সেই জন্যই নিযুক্ত হইলাম,—তবে এ বিষের ব্যাপারও দেখিতে হইবে।"

জগন্নাথ বলিলেন,—"তাহা হইলে তুমি কি মনে কর যে, আমার ভ্রাতৃজায়ার আত্মহত্যার সহিত দাদার নিরুদ্দেশ হওয়ার কোন সম্বন্ধ আছে?"

"এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।"

গোকুলদাসের হৃদয় জড়ীভূত হইল,—তাহার চিন্তা-শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল।

জগন্নাথ বলিলেন, "যাহা ভাল বোঝ কর,—তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে,—আমার দাদাকে সন্ধান করিয়া বাহির কর,—আমি তোমায় হাজার টাকা পুরস্কার দিব।"

"তাহা হইলে আমার পুরস্কার পাইবার আশা নাই।"

"কেন—সে কি?"

"আমি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আমার এ পুরস্কার পাইবার বিন্দুমাত্র আশ নাই।"

"সে কি? তাহা হইলে তুমি কি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না?"

"হাঁ—এইরূপই মনে হয়।"

"তাহা হইলে তুমি মনে কর,—তিনি—তিনি আর বাঁচিয়া নাই!"

"এই রকমই মনে করিতেছি—সেই জন্য এ কড়ারে—তাহা হইলে—"

"তাহা হইলে কি কড়ার, বল।"

"আমি তাহার খুনীকে ধরিতে পারিলে আমাকে এই পুরস্কারটা দিবেন।"

"খুনী—খুনী—সে কি!"

ডাক্তার মহা বিচলিত হইল। জগন্নাথ আবার বলিলেন, "খুনী—সে কি—তাঁহাকে কেহ খুন করিয়াছে?"

"হাঁ—ইহাই আমি মনে করি।"

"তাহা হইলে তুমি মনে কর যে, তুমি সেই দুরাত্মাকে ধরিতে পারিবে?"

"নিশ্চিত, আমার হাত এড়াইতে পারিবে না।"

"আমি তাহা হইলে তোমাকে দু হাজার টাকা পুরস্কার দিব।"

ডাক্তারের বোধ হইল, তাহার কানে কানে ক্যাণ্ডেরাও যেন বারংবার বলিতেছে, "ডাক্তার এস—তোমার দাম দু হাজার টাকা!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তদন্ত।

অনন্তর ক্যাণ্ডেরাও একা উঠিয়া, পুলিস যে গৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়াছিল, তাহা দেখিতে গেলেন। গৃহ যেরূপ ছিল, সেইরূপই আছে। রাত্রে পুলিশ চলিয়া যাইবার পর এ গৃহে আর কেহ প্রবেশ করে নাই।

ক্যাণ্ডেরাও বহুক্ষণ এই গৃহ বিশেষরূপে পর্য্যাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত জানালা দরজা ভাল করিয়া দেখিলেন; গৃহ মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য ছিল, তাহাও এক একটী করিয়া পরীক্ষা করিলেন,—গৃহতলও লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা তিনি গৃহটী বিশেষ করিয়া দেখিয়া গৃহ-মধ্যস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া পকেট হইতে দেশলাই ও চুরুট বাহির করিলেন। এবং চুরুট ধরাইয়া নীরবে বসিয়া টানিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন,—"এই ঘরে চারিটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোক আসিয়াছিল; তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাইয়াছি। ইহাদের দুইজন জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল,—তাহার চিহ্ন আছে,—তাহারা কিরূপে বাহির হইয়া গিয়াছে,—তাহা জানা যায় নাই,—আর দুইজন—দুইজন কেন স্ত্রীলোকটী, সুতরাং তিনজন দরজা দিয়া বাহির হইয়াছিল, তবে ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিল কে? যাহারা জানালা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে—এরূপ দরজা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্য কি? গৃহ মধ্যে কিছুই ছিল না, তবে কি পলাইয়া যাইবার সময় পাইবার জন্য;—ঠিক বলা যায় না। তবে কেবল ইহাই নহে,—এই গৃহ মধ্যে দুইটা কিম্বা তিনটা লোকে বেশ এক দফা মল্ল যুদ্ধ হইয়াছিল, অথচ গৃহে কোন দ্রব্যাদি ভাঙ্গে নাই বা স্থানচ্যুত হয় নাই—দেখিতেছি এ যুদ্ধ ইহারা খুব সাবধানে করিয়াছিল,—আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যতীত অন্যে ইহার কিছুই জানিতে পারিবে না। তাহার পর আর একটা বিষয়—স্পষ্ট চিহ্ন রহিয়াছে—একটা কি দ্রব্য কেহ টানিয়া জানালা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল,—এই দ্রব্য কঠিন নহে,—নরম—কঠিন দ্রব্য টানিয়া লইয়া গেলে অন্যরূপ দাগ পড়িত। এ দ্রব্যটা কি? এখন নিশ্চিত বলা যায় না।"

তিনি আবার কিয়ৎক্ষণ নীরবে ধূম পান করিতে লাগিলেন। ক্ষণ পরে বলিলেন, "ডাক্তারের উপর আমার সন্দেহ প্রায় ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে তবে লোকটা যে ভাল নহে,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ক্যাণ্ডেরাওয়ের আর কোন ক্ষমতা থাকুক আর না থাকুক,—লোক চিনিবার ক্ষমতা খুব আছে। তবে এই গৃহে চারিটী পুরুষ—একটী স্ত্রীলোক ছিল, ইহাদের মধ্যে কি ডাক্তার ছিল,—একটা লোকের আবার একটা আঙ্গুল নাই—কেবল চারিটা আঙ্গুল,—বিছনার চাদরে তাহার হাতের দাগ পড়িয়াছে—চারটী আঙ্গুল,—ভদ্রলোকের হাত নয়, খুব অপরিষ্কার হাত এখন এই পর্য্যন্ত—একবার দাসীকে দেখা যাক্।"

এই বলিয়া তিনি সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন। দাসীকে ডাকিলেন,—সে আসিলে তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী এক গৃহে লইয়া গিয়া বসিলেন, বলিলেন, "বসো।"

দাসী যুবতী না হইলেও প্রৌঢ়া নহে, বেশ সুরসিকা! রাও তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দাসীকে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিতে দেখিয়া বলিলেন,—"ক্ষতি কি? তোমার সঙ্গে দুটো একটা কথা আছে—তোমার নামটী কি?"

"সে কি গো?"

"বলই না—নাম বলিতে দোষ কি।"

"আমার নাম হেনা।"

"বাঃ! বেশ সুন্দর নাম।—তুমিও সুন্দর!"

"সেকি—আপনি কি বলেন!"

"তোমায় দেখিয়াই আমি ভুলিয়াছি—তোমার কেহ আছে?"

—আমার আবার কে থাকবে!"

"তবে তোমাকে বিবাহ করিবার এক দিন আমার আশা থাকিল—এত দিন মনের মত লোক পাই নাই বলিয়া বিবাহ করি নাই।"

"আপনি কি করেন?"

"এই ধরি——"

"ধরি! ধরি কি? কি ধরেন?"

"এই মানুষ।"

"মানুষ! মনের মানুষ নাকি?"

"পেলে ছাড়িনা—তবে আমি গোয়েন্দা।"

"অনেক টাকা পান?"

"মন্দ নয়। উপস্থিত এক দিনেই দু'হাজার টাকা রোজগার করিতে পারি।"

"তবে করিতেছেন না কেন?"

"তুমি আমার সহায় হইলেই হয়।"

"আমি?"

"হাঁ—তুমি—আমি তোমাকে পাইলেই এ দু'হাজার পাই—তোমাকে তাহা হইলে অৰ্দ্ধেক দিই।"

"হাজার টাকা!"

"ইচ্ছা করলে সবই তোমার।"

"আমাকে কি করিতে বলেন?"

"বাঃ বেশ সুন্দর নাম— তুমিও সুন্দর"—নবাধন

K. V. SEYNE & BROS.

"তোমার মত চালাক স্ত্রীলোক আমার সহায় হইলে এ রহস্য ভেদ করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে না।"

"এই কর্ত্তার নিরুদ্দেশ।"

"হাঁ, কখন তিনি চলিয়া গিয়াছেন?"

"কাল রাত্রে,—তিনি সন্ধ্যার সময়ে বলিলেন,—তিনি তাঁহার ঘরে থাকিবেন, কেহ যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে; কিন্তু তিনি তাঁহার শোবার ঘরে যান নাই,—আমি একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়াছিলাম,—কেহই ঘরে ছিল না।

"ঐ ঘরটায় কাল তোমাদের কেহ আসে নাই?"

"আমাদের লোক—সে কি—আমাদের কোন লোক নাই।"

"আচ্ছা—এই জিনাবাই কাল সন্ধ্যার পর কোথায় ছিল?"

"নীচে—"

"এখন?"

"এখন জ্বর হওয়ায় উপরে পড়িয়া আছে।"

"বটে—কাল এই ব্যাপারেই তাহার একেবারে জ্বর আসিয়া গিয়াছে?"

দাসী গোয়েন্দার এ কথার ভাব বুঝিল, ভীত হইয়া বলিল, "আপনি কি বলেন, জিনাবাই কিছু করেছে?"

"না—হেনা,—আমি এ কথা বলি না। বিশেষ প্রমাণ না পাইলে আমি, কাহাকেও সন্দেহ করি না—তবে তোমায়—আমায় কথা—বলি, তুমি কাহাকেও সন্দেহ কর?"

"সন্দেহ?—কি বল?"

"নরোত্তমদাসের কি হইয়াছে, মনে কর।"

"ভগবান্ জানেন।"

"আচ্ছা হেনা, এই বাটীতে যাহারা আছে—যাহারা আসে, তাহাদের মধ্যে কে খুব নির্দ্দয় নৃশংস কাজ করিতে পারে বলিয়া তোমার বোধ হয়?"

"আমি তাহা জানি না।"

"এই মনে কর ডাক্তার—"

"ডাক্তার—হাঁ—ও সব পারে।"

রাও গম্ভীর হইলেন—হেনার পার্শ্বে সরিয়া বসিয়া বলিলেন, "হেনা, ঠিক বলিয়াছ, আমি তাহাকে দেখা পর্য্যন্তই তাহার উপর আমার কেমন একটা অভক্তি হইয়াছে।"

"আমিও তাহাই মনে করি। ঠাকুরাণী যে কেন ওকে ভালবাসিতেন, তাহা জানি না।"

"ওঃ—তাহা হইলে মুন্নাবাই—ডাক্তারকে ভালবাসিতেন!"

"ভালবাসিতেন! দুই জনে গলায় গলায় ভাব। যখনই কর্ত্তা বাটী না থাকিতেন, তখনই ডাক্তারটা আসিত।"

"বটে?—তবে ডাক্তারও মুন্নাবাইকে ভালবাসিত।"

"তবে আর গলায় গলায় ভাব বল্‌ছি কেন,—হেনার চোখে ধূলি দেওয়া সহজ নয়,—আমি সে পাত্রীই নই—আমার নাম হেনা।"

"ডাক্তারের সঙ্গে নরোত্তমদাসেরও খুব ভাব ছিল।"

"যত গিন্নির সঙ্গে ছিল, তত নয়।"

"গিন্নির সঙ্গে কেমন ছিল, সব প্রকাশ করে বলই না শুনি—বলি এই তোমায় আমায় কথা, দোষ কি?"

হেনা বলিল, "এই—দুই জনে খুব ঘনিষ্টতা ছিল,—এক দিন হঠাৎ গিন্নির ঘরে গিয়া দেখি, ডাক্তার গিন্নির পাশে বসিয়া আছে,—গিন্নি বলিতেছেন, 'না—এমন ভাবে আমি আর থাকিব না, তিনি আমাকে দেবী স্বরূপিনী মনে করেন,—প্রাণের সহিত ভালবাসেন,—তিনি স্বামী, আমি তাঁহার কাছে সব বলিয়া তাঁহার পায় কাঁদিয়া পড়িব। ডাক্তার ক্রোধে বলিল, 'তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিবে।' গিন্নি বলিলেন, 'তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ।' এই সময়ে ডাক্তার আমাকে দেখিতে পাইল, আমাকে দেখিয়া এমনই মুখ করিল যে, আমার ভয় হইল।—সেদিন রাত্রে গিন্নি আমাকে এক টাকা বক্‌সিশ দিলেন। আমি তেমন মেয়ে নই।"

"না—তা হেনা তুমি নও।"

"আমি ডাক্তারকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না।"

"কেন হেনা?"

"কেন—আগে সে আমার অনেক খোসামোদ করিয়াছিল—এমন—বদ্‌মাইশ—"

"যাক সে কথা—তাহা হইলে মুন্নাবাঈতে আর ডাক্তারে খুব প্রণয় ছিল?" নরোত্তমদাস এ কথা জানিতেন?"

"আহা—তিনি দেবতা মানুষ—তাঁহার মত লোক হয় না,—তিনি গিন্নিকে প্রণের সঙ্গে ভালবাসিতেন, গিন্নি যে লুকাইয়া এ কাজ করেন, তাহা তিনি একবারও ভাবেন নাই।"

"তাহা হইলে মুন্নাবাঈ নিজেই বিষ খাইয়াছিল।"

"হাঁ—এই জন্যই-কুকাজ করিলে—এমনই হয়। পাছে কোন দিন সব প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে বিষ খাইয়া মরিয়াছেন—অন্য দিকে বড় ভাল ছিলেন। আমাকে ভারি ভালবাসিতেন—আদর করিতেন, অমন মনিব আর হইবে না।"

"আচ্ছা—হেনা, আজ এই পর্য্যন্ত। অনেকক্ষণ তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া বড়ই সুখে কাটাইলাম।—তুমি আমায় ভুলিয়া যাইবে নাতো, হেনা !"

হেনা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "আপনি বলেন কি !"

"আবার দেখা করিব।"

এই বলিয়া ক্ষাণ্ডেরাও বিদায় হইলেন, তিনি জগন্নাথ ও ডাক্তারের সঙ্গে আর দেখা করিলেন না। নিঃশব্দে বাটীর বাহির হইয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তস্করদ্বয়।

ক্ষাণ্ডেরাও প্রস্থান করিলে তিনি কোথায় যান দেখিবার জন্য হেনা দ্বারের নিকট আসিল, কিন্তু ক্ষাণ্ডেরাও অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন, তাঁহাকে সে আর দেখিতে পাইল না।

হেনা ফিরিতেছিল,—এই সময়ে পথের অপর পার্শ্ব হইতে কে শিশ দিল,—হেনা চমকিত হইয়া ফিরিল।—সে দেখিল, একটী যুবক হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকিতেছে '—

যুবক জাতিতে গুজরাটী,—বয়স পঁচিশ বৎসর হইবে। ইহার নাম লালদাস বলিয়া জনিও।

হেনা নিকটে আসিলে,—লালদাস তাহাকে এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া বলিল, "তাহা হইলে গিন্নি মারা গেলেন।"

হেনা কহিল, "হাঁ—কাল রাতে—বিষ খাইয়াছিলেন।"

"আহা অত গহনা এখন কে আর পরিবে।"

"আর কে পরিবে—সবই বাক্সে আছে।"

"বাক্স সিন্দুকে থাকে ?"

"হাঁ। সব সময়ই—"

এ কথা যে আজ প্রথম হেনার সহিত তাহার হইয়াছে তাহা নহে; দামোদর অনেক বার হেনাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে—লালদাস অন্যান্য দুই চারিটা কথা কহিয়া বলিল, "কাল এখানে ছিলাম না,—এই মাত্র ফিরিলাম।"

"তাই তোমায় কাল দেখিতে পাই নাই।"

"হাঁ—এখন যাই—কাল আবার দেখা করিব।"

লালদাস তথা হইতে প্রস্থান করিয়া একটা ক্ষুদ্র গলির ভিতরে প্রবেশ করিল,—কিয়ৎদুর গিয়া একটা জঘন্য ভাঙ্গাবাড়ীর দ্বারে আসিয়া ধীরে ধীরে ধাক্কা দিল।—

একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক দ্বার খুলিয়া দিল। বলিল, "ঈস্, তুমি!"

লালদাস গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দামোদর কোথায়?"

"বাড়ীতে আছ—ঐ ঘরে যাও।"

লালদাস পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিল;—

স্ত্রীলোকটী সাবধানে দরজা বন্ধ করিল।—

দামোদর বলিষ্ট মাড়োয়ারী;—তাহার একখানি ছাওনী ওয়ালা গরুর গাড়ী ছিল, ইহা ভাড়া দেওয়া তাহার ব্যবসা।—দরিদ্র লোকের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে এই গাড়ী ভাড়া লইত।—

কিন্তু দামোদর কেবল এই ব্যবসা করিত না। তাহার পরম বন্ধু লালদাসের সহিত আর এক গুপ্ত ব্যবসা চালাইত।—অধিক রাত্রি না হইলে তাহাদের এ ব্যবসা চলিত না।—

উভয়ে গরুর গাড়ী লইয়া অনেক রাত্রিতে বাহির হইত,—সুবিধা মত লোকের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া যাহা পারিত সংগ্রহ করিয়া এই গাড়ীজাত করিত, তৎপরে সে সোয়রি লইয়া গৃহে ফিরিতেছে এই ভাবে চলিয়া আসিত।—গরু দুইটীকে এমনই খাওয়াইত যে, তাহারা কোনরূপ শব্দ করিত না;—উভয়ে কোন নিভৃত স্থানে গাড়ী রাখিয়া প্রস্থান করিলে, গরু দুইটী গাড়ী লইয়া তথায় নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিত।

নরোত্তমদাসের কি আছে না আছে, তিনি ও তাঁহার স্ত্রী, টাকা কড়ি গহনা পত্র কোথায় রাখেন, লালদাস হেনার সহিত আলাপ করিয়া সকলই জানিয়া লইয়াছিল।—একদিন উভয়ে নরোত্তম দাসের বাড়ীতে প্রবেশ করিবে, বরাবরই

অভিসন্ধি করিয়া রাখিয়াছিল। যে দিন মুন্নাবাঈ মারা যায়, সেই দিন লালদাস আসিয়া বলিল, "আজ ভারি সুবিধা!"

দামোদর বলিল, "কিসে?"

"আজ নরোত্তম দাসের স্ত্রী মুন্নাবাঈ মারা গিয়াছে।"

"কখন?"

"এই মাত্র।—আজ ভারি সুবিধা।"

"আজই তবে—"

"হাঁ।—আজ তাহারা—ব্যস্ত থাকিবে—বাড়ীতে গোল থাকিবে—আজ পিছন দিক্‌কার জানালা দিয়া বাটীর ভিতরে গিয়া কাজ সারিতে হইবে—অনেক টাকা—অনেক টাকা।—"

"তবে আজই।—"

"বেশী রাতে নয়,—তাহারা সন্ধ্যার সময় সকলেই মুন্নাবাঈর সৎকার করিতে যাইবে—সেই সুবিধা।"

এই বন্দোবস্তই স্থির থাকিল।—রাত্রি আটটা বাজিতে না বাজিতে লালদাস আর দামোদর দুই জনে গাড়ী লইয়া বাহির হইল।—তাহারা নরোত্তম দাসের বাটীর সম্মুখ দিয়া গাড়ী লইয়া তাঁহার বাটীর পশ্চাদ্ভাগে ক্ষুদ্র গলির ভিতর গাড়ী আনিল,—উভয়ে জানিত যে, এ দিকে কেহ তাহাদের কার্য্যে ব্যাঘাত দিতে আসিবে না—।

উভয়ে কান পাতিয়া বহুক্ষণ শুনিল, নরোত্তমের বাড়ীতে কোন দিকে কোন সাড়া শব্দ নাই—নীরব নিস্তব্ধ—।

এই দিকে একটী ক্ষুদ্র স্নানের ঘর ছিল, ঐ ঘরে একটী জানালা গলির দিকে, একটু চেষ্টা করিলে ঐ জানালা অনায়াসে খুলিতে পারা যাইত। লালদাস ও দামোদর গাড়ী তথায় রাখিয়া নিঃশব্দে জানালা খুলিল, এবং ধীরে ধীরে সেই জানালা দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল।—

তাহারা যেখানে আসিল, সেটী স্নানাগার—একদিকে একটা বড় পিপে—অপর দিকে স্নানের সমস্ত সরঞ্জাম রহিয়াছে।—

তাহারা নিঃশব্দে দ্বারটী খুলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কাহার পদ শব্দ শুনিতে পাইয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।—তবে বুঝি ধরা পড়িল,—দামোদরের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু লালদাস সাহস হারাইল না।—দামোদরকে নিস্তব্ধ থাকিবার

জন্য তাহার হাত সবলে চাপিয়া ধরিল।—পরে সে একটু অগ্রসর হইয়া অতি নিঃশব্দে দরজাটা অল্প খুলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে কে আসিয়াছে দেখিতে চেষ্টা পাইল,—দেখিল, পিস্তল হস্তে দাঁড়াইয়া স্বয়ং নরোত্তম দাস।

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

অদৃষ্ট।

সে দিন খুব বর্ষা, সন্ধ্যার সময় অবিশ্রান্ত বারিপাতের মধ্যেও স্ফুর্ত্তিপ্রিয় চারি পাঁচ জন যুবক ক্লাবে জুটিয়া এক টেবিলে বসিয়া তাস খেলিতেছে ও যৌবন-সুলভ হাসি-তামাসায় সে ঘরটাকে সরগরম রাখিয়াছে। যুবকদের মধ্যে একজন বলিল দেখ ভাই, আমাদের শাম কি ক'রে যে এই বাবুগিরি ও বড়লোকী চাল চালাচ্ছে তাহা বোঝা যায় না, কোত্থেকে যে ওর টাকা মাঝে মাঝে আসে তাও কাউকে ভাঙ্গে না, অথচ সব স্ফুর্ত্তিতে সমভাবে যোগ দেয় ও খরচ করে। অপর যুবক এই কথায় অত্যন্ত কৌতুহলপ্রিয় হইয়া শামকে এই সমস্যা পূরণের জন্য ধরিয়া বসিল। শাম বাদলার দিনে অন্যান্য দিনাপেক্ষা একটু বেশী হুইস্কী পান করিয়াছিল, তাই মদিরালস নয়নে সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল যে, নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কেউ সেথায় নাই; তখন বলিল "তবে আমার অবস্থা শোন। আমার এক ধনবান বৃদ্ধ মাতুল আছে, সে বেচারার আর কেউ নাই, কিন্তু তিনি অত্যন্ত কৃপণ। প্রথম প্রথম আমি ট্রাম দুর্ঘটনা হয়ে হাত পা ভেঙ্গে ফেলেছি, কিম্বা কাজ নাই, বেকার অবস্থায় আছি ইত্যাদি নানা অজুহাতে কিছু কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টা করি; কিন্তু বড় একটা সফলকাম হতুম না; তারপর বৃদ্ধের মনের কোথায় দুর্ব্বলতা তাহা কোন সুযোগে জানিয়া লইয়া সেই উপায়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। মামা, যৌবনের প্রায় শেষসীমা অতিবাহিত হইলে সংসারী হইয়া সুখী হইবার অভিলাষে বিবাহ করেন; কিন্তু অদৃষ্ট তাঁর

বিরোধী, তাই আমার মাতুলানী সন্তান প্রসবকালীন মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ শোকে মামা আমার, একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়েন ও তারপর তাঁর বন্ধুদের শত চেষ্টায়ও আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই।"

শামের বন্ধু অমনি বলিয়া উঠিল যে, "তাতে তোমার লাভালাভ কি?" শাম বলিল "একটু ধৈর্য্য ধর, আগে সবটাই শোন না, তারপর যত পার ব'লো। আমি সে সময় সহানুভূতি জানাবার জন্য মামার কাছে যাই ও মামা কোন একটী সুখী পরিবার দেখলেই, তাদের সুখ-কল্পনা করে কত আনন্দ পান তা ক্রমশঃ বুঝতে পারলুম ও কানাডা হ'তে অষ্ট্রেলিয়ায় ফিরে এসে কিছুদিন পরে আমি মামাকে চিঠি লিখলুম যে আমার বিবাহ,—মামা বিবাহে যৌতুক স্বরূপ আমায় ১০০০৲ টাকা পাঠিয়ে দিলেন, ও সেই অবধি আমার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নিয়মিত ভাবে আর্থিক সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তারপরই ক্রমশঃ বৎসর বৎসর আমার একটী করে সন্তান হচ্ছে, এ সংবাদ মামাকে পাঠিয়ে চারিটী ছেলের জন্য অতিরিক্ত খরচও আদায় করেছি।

একথা শুনেই শামের বন্ধুরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ও বলিল "ভাল শাম, তোমার বিবাহ হ'ল না, অথচ চারিটী ছেলে হ'ল কি করে?" হ্যা ভাই, "তোমাদের কাছে আমি অবিবাহিত, কিন্তু যদি তোমরা কানাডায় যাও ত অন্ততঃ একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে হৃদয়স্পর্শী আমার পারিবাহিক কাহিনী, গৃহস্থালী-নিপুণা আমার স্ত্রীর কথা, সন্তানদের অবস্থা শুনিয়া স্তম্ভীত হইবে। কি করি পয়সার জন্য এই অভিনব উপায় আবিষ্কার করিতে হইয়াছে।

শামের বন্ধু বলিল, কিন্তু ভাই এ জুয়াচুরী তোমার একদিন না একদিন ধরা ত পড়িবে! শাম বলিল তা কোন রকমে সম্ভব নয়, কারণ বৃদ্ধ কানাডায় থাকে, আমার এখানে কি অবস্থা তা তাঁর জানবার কোনও সম্ভব নাই।

২

এই কথা বার্ত্তার কিছুদিন পরে, একদিন সন্ধ্যায় শাম ক্লাবে আসিলে দেখা গেল যে তার মুখখানি বিষাদ-কালিমামাখা ও সে যেন কি এক চিন্তায় বিভোর। শামের অন্তরঙ্গ বন্ধু জ্যাক এর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শাম বলিল "ভাই সেদিন ঠাট্টা করে যে ভয়ের কথা বলেছিলে, আজ সেই ভয়ের কারণ প্রকৃতই উপস্থিত হইয়াছে, এবার আমি মারা গেলাম। জ্যাক বলিল "কি ব্যাপার ভেঙ্গে বল, তোমার সব কথাই হেয়ালিপূর্ণ, বুঝিয়ে না বল্লে বোঝা দুষ্কর।" শাম বলিল "জানি না কেন, আমার মাতুল হঠাৎ এখানে আসিতেছেন, তিনি লিখিয়াছেন

যে আমি আগামী বুধবারে তোমার ওখানে যাইব ও তোমার ছেলে মেয়েদের দেখিয়া আসিয়া আমার বিষয় সম্পত্তির একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করিব মানস করিয়াছি। তা হলেই বুঝ্‌তে পারছ, আমার কি বিপদ। এতদিন বুড়োকে যে কাহিনী লিখে ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায় করিয়াছি তা ত প্রকাশ হয়ে পড়বেই, খরচ সব বন্ধ হয়ে, ভবিষ্যতে উইলে আমার অদৃষ্টে যে শূন্য পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নাই; কি করি বল ভাই?"

জ্যাক বলিল "সত্যই ভাই তোমার মত অবিবাহিত যুবকের এখন একসঙ্গে স্ত্রী ও চারিটী সন্তান লাভ ৫।৬ দিনের মধ্যে কি করে জোটে। তোমার মামা বড় অল্প দিনের নোটিশ দিয়াছেন?" শাম বলিল "ভাল বুদ্ধিমান তুমি দেখতে পাই হে, বলি ৬ মাসের নোটিশ দিলেও কি আমার পক্ষে স্ত্রী ও চারিটী ছেলে লাভ করা সম্ভবপর হয়?" শামের কষ্ট দেখে জ্যাকের প্রাণেও আঘাত লাগিল। বহু গবেষণা ও চিন্তার পর সহসা জ্যাক যেন ঘোর তিমিরে একটা ক্ষীণ আলো দেখিতে পাইল ও আগ্রহ সহকারে বলিয়া উঠিল "শাম, তোমার প্রিয়বন্ধু শামুয়েলের ত আট নয়টী ছেলে, তুমি কেন ভাই সামুয়েলকে সব কথা খুলে লিখে ঘণ্টা কয়েকের জন্য তার স্ত্রী ও চারিটী ছেলেকে ধার চাওনা! ব'লো যে কয়দিন তোমার মামা এখানে থাকিবেন, সে কয়দিন তারা তোমার স্ত্রী ও ছেলে বলে পরিচিত হবে মাত্র, তোমার মামা চলে গেলে, তারা ফিরে যাবে। স্বামীর বন্ধুর এ সামান্য উপকারের জন্য মিসেস সামুয়েল এ অভিনয় টুকু করিতে বোধ হয় কুণ্ঠিত হবেন না। উপরন্তু সামুয়েলের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ, তুমি না হয় এ উপকারের জন্য তার ছেলে দের হাতে শ'খানেক টাকা দিও। সব কথা প্রকারান্তরে সামুয়েলকে জানাইলে সে এ বিষয়ে সম্মত হবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" শাম বলিল, "কিন্তু লোকে জান্‌লে আমায় যে পরে এর জন্য পাগল করে তুলবে।" জ্যাক বলিল, "তুমিত আচ্ছা গাধা দেখতে পাই, তুমি আগে হতেই রটিয়ে দাও যে আগামী বুধবার তোমার জনৈক বন্ধু ও তার ছেলেদের খাওয়াবে, আর তোমার ল্যাণ্ডলেডী ত একটী বদ্ধ কালা, সুতরাং কারো কাছে কোনরূপ ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনা দেখি না।"

যতই ভাবিতে লাগিল ততই এ মন্ত্রণাটি শামের বড়ই হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বোধ হইল ও দুদিন পরে সে জ্যাককে সংবাদ দিল যে সব ঠিক ঠাক। সে দিন যে সময় তার মামার আসবার কথা আছে, তার ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্বের ট্রেনে তার বন্ধুর স্ত্রী চারিটী ছোট ছেলে লইয়া আসিবে, তবে রাস্তা খরচাদি বাবত সামুয়েল

১০০৲ টাকা চাহিয়াছে। জ্যাক বলিল তুমি টাকার জন্য এখনও ইতস্ততঃ করছো, এখনি পাঠিয়ে দাও। শাম সেই দিনই টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডার ক'রে সামুয়েলকে টাকা পাঠালে ও কবে, কোন্ সময় তার মামা আসিবেন বোলে দিলে, আর মামাকে লিখ্‌লে যে তার স্ত্রী ও ছেলেরা তিনি আসছেন শুনে কত সুখী ও তাদের যতদূর সাধ্য তাঁকে তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা করবার প্রয়াস পাবে। ল্যাণ্ড লেডী মিসেস রবিনসনকে শাম ইসারা করিয়া ও খুব উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া জানাইল যে তার এক ধনবান মাতুল বুধবার বৈকালে তার কাছে আসিবেন ও থাকিবেন; তাঁর অভ্যর্থনা ও খাওয়া দাওয়ার যেন কোন ত্রুটী না হয়। মিসেস রবিনসন সুপাচিকা, তাই শাম ভাল ভাল ডিস মামার জন্য রন্ধন করিতে বলিয়া দিলেন।

বুধবার দ্বিপ্রহরে যে ট্রেনে মিসেস সামুয়েলের আসিবার কথা, তাহার অপেক্ষায় শাম ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিল, ট্রেন আসিল কিন্তু তাঁর বন্ধুর স্ত্রী বা ছেলেরা কেউ নামিল না, দুই ঘণ্টা পরে আর একটা ট্রেন সেই দিক হইতে আসিল তাতেও কেউ এলো না দেখে ও ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে আর কোন ট্রেন নাই শুনে শাম একবারে হতাশ হইয়া পড়িল, তার সম্মুখে যে কি বিপদ তা যেন কতক উপলব্ধি করিতে পারিয়া সে পলাইয়া যাইবে কি না ভাবিতে লাগিল এমন সময় শামুয়েলের নিকট হইতে এক টেলিগ্রাফ আসিল যে তার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রটীর হঠাৎ ভয়ানক ব্যারাম হওয়ায় তার স্ত্রীর যাওয়া হইল না। শাম বুঝিল যে বন্ধু সময় বুঝিয়া টাকাটাও ফাঁকি দিল, কোন উপকারও করিল না, তখন নিজের ও জ্যাকের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে দিতে গৃহাভিমুখে চলিল, কিন্তু সেখানে গিয়া মামাকে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে যে মিসেস রবিনসন, তার মামার পার্শ্বে বসিয়া ও ছেলে ৩টী টেবিলের অপর পার্শ্বে; এবং সকলেই সান্ধ্য ভোজন করিতেছেন ও তার মামার বদন আনন্দ বিস্ফুরিত ও তিনি কত আগ্রহে ও উৎসুকে মিসেস রবিনসন ও তার ছেলেদের সঙ্গে গল্প ক'রে যাচ্ছেন।

শামের ঘোর হতাশার মধ্যে মামার এই পানানন্দ দেখিয়া তার একটু স্ফুর্ত্তি হইল ও ঘরে ঢুকিয়া তার আসিতে বিলম্ব হওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই তার মামা বেঞ্জামিন বলিয়া উঠিলেন "শাম তুমি ত বেশ লোক হে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? ভাগগিস তোমার এমন লক্ষ্মী স্ত্রী ছিল, তাই আমায় অপরিচিত স্থানেও অপরিচিতের মধ্যে আসিয়াও কোন রকম কষ্ট পাইতে হয় নাই। আমি তোমার স্ত্রীর সদ্ব্যবহারে ও অভ্যর্থনায় ও তোমার ছেলেদের সঙ্গে

খেলা করিয়া এই এক ঘণ্টা বড় আনন্দে কাটাইয়াছি, তোমার পরিবারিক সুখ দেখে আমার বড় আনন্দ হয়েছে।

শাম ত একবারে অবাক, কিন্তু সে মূহুর্ত্তের মধ্যে তাঁর মামার ভ্রম বুঝিয়া লইল ও অকুল পাথারে যে ভগবান একটা উপায় করিয়া দিয়াছেন বুঝিয়া ভগবানকে মনে মনে শত শত ধন্যবাদ দিল। মিসেস রবিনসন বদ্ধ কালা বলিয়া মিষ্টার বেঞ্জামিন তাকে যা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহাতেই ঘাড় নাড়িয়া বেঞ্জামিনের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে যে সে শামের স্ত্রী ও ছেলেগুলি তাদের সন্তান। শামের একবার বড় ইচ্ছা হইল যে মামার এ ভ্রম দূর করে ও নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চায়, তাতে তার অদৃষ্টে যা হয়; কিন্তু পরক্ষণেই মামার অতুল সম্পত্তির লোভ এ কার্য্যে বাধা দিল, শাম ভাবিল ঘটনার স্রোত যে দিকে বহিয়াছে, চলুক, যেমন যেমন দাঁড়ায় তেমনি তেমনি করা যাইবে। মিষ্টার বেঞ্জামিন বলিলেন দ্যাখ শাম তুমি যে সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধ হইয়া একটা অকর্ম্মণ্য যুবতীকে বিবাহ কর নাই এতে আমি বড় সুখী, তোমার স্বভাব চরিত্র দেখে আমার বিশ্বাস ছিল যে তুমি ঐ রকম একটা পাগলামী করবেই করবে, কিন্তু তা কর নাই দেখে আমি বড় আনন্দিত হয়েছি। শাম, রগড় মন্দ হচ্ছে না দেখে উত্তরে শুধু একটী "হুঁ" বলিল। মিষ্টার বেঞ্জামিন নিজের খেয়ালে বিভোর হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, সুন্দরী স্ত্রী নানা কারণে বাঞ্ছনীয় নয়, প্রথমতঃ স্বামীর মনে স্ত্রীর জন্য একটু শান্তি হয় না, কাহাকেও একটু ঘনিষ্ট ভাবে স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে বা গল্প করিতে দেখিলে সন্দেহ জাগিয়া উঠে, সুন্দরী স্ত্রীরা প্রায়ই সৌখিন হয়, ও নিজেদের সৌন্দর্য্য লইয়া ও তাহার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াসে নিশিদিন ব্যস্ত থাকে, তারা সুপাচিকা বা সুগৃহিণী কখনও হয় না। শাম যে এই সৌন্দর্য্যহীনা প্রৌঢ় রমণীকে বিবাহ করিয়াছে—তাতে শামের গভীর বুদ্ধি মত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, প্রথমতঃ এ স্ত্রীতে অপরের কোন লোভ হবার সম্ভবনা নাই, মিসেস শাম বধিরা সুতরাং যুবতী রমণীদের ন্যায় বাজে গল্পে ও পরনিন্দায় সে সময় কাটাইবে না বরঞ্চ সেই সময়টা গৃহ কার্য্যে নিয়োজিত করিবে আর প্রৌঢ়াবস্থায় সখ কমিয়া যায় সুতরাং মিতব্যয় করিয়া মিসেস শাম টাকা জমাইতে পারিবে।

শাম দেখিল, ব্যাপার মন্দ হচ্ছে না, সে তখন ভাবিতেছিল বাড়ীতে এমন উপায় থাকিতে কেন সে একশ টাকা বাজে নষ্ট করিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মিসেস রবিনসন সুপাচিকা, বিশেষতঃ শামের একজন ধনবান আত্মীয় আসিতেছেন শুনিয়া ও শামের আদেশ মত তাঁর জন্য অনেক

সুখাদ্য তৈয়ারী করিয়াছিল, তাহা খাইয়া ও ল্যাণ্ডলেডীর অন্যান্য সুবন্দোবস্ত দেখিয়া মিষ্টার বেঞ্জামিন একবারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন; তিনি বলিলেন শাম এ রকম রমণী হাজারে একটী পাওয়া যায়, ইঁহার বন্দোবস্তে তোমার কখনও পয়সা বাজে নষ্ট হইবে না। মামার ভ্রম যত ঘনাইতেছে শাম তত উৎফুল্ল, কিন্তু যখন রাত্রে খাবার জন্য ছেলেদের লইয়া সকলে টেবিলে উপবেশন করিল তখন মিষ্টার বেঞ্জামিন এক, দুই, তিন গুনিয়া আর একটী ছেলে, যার জন্য সেদিন তিনি ১৫০৲ টাকা পাঠাইয়াছিলেন সে কোথায় শামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শাম বুঝিল এবার ধরা পড়িলাম, কিন্তু তার প্রত্যুৎপন্ন মতি অতি প্রখরা সে ক্ষণকাল অপেক্ষা না করিয়াই কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিল কি বল্‌বো মামা হঠাৎ কলেরা হয়ে আজ প্রায় ১৫।২০ দিন সে মারা গিয়েছে, তুমি আস্‌ছো শুনে আর সে খবর দিই নাই। বৃদ্ধ, আহা বাছারে বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল ও শামের স্ত্রীকে এ কষ্টে সহানুভূতি জানান হয় নাই মনে করিয়া উচ্চৈস্বরে বলিল মা তোমার এ সন্তান বিয়োগের কথা শুনে আমি বড় মর্ম্মপীড়িত হইলাম। মিসেস রবিনসন মনে করিল যে তার মৃতস্বামীর কথা বৃদ্ধ বলিলেন; সে তাই বুঝিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ও তার স্বামী কেমন ছিল তাহারই ব্যাখ্যান আরম্ভ করিল। মিষ্টার বেঞ্জামিন এর কিছু বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু শাম বলিল যে তার স্ত্রী ঐ ছেলেটীকে বড় ভালবাসিত। শোকে এমন আবল তাবল বকিতেছে, বলিয়া কোন রকমে এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইল।

আহারান্তে মিষ্টার বেঞ্জামিন শামের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে বলিলেন ড্যাগ শাম, তোমার এই সুখের সংসার দেখিয়া আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে যে কানাডার সব সম্পত্তি বিক্রয় করে এসে তোমাদের কাছে জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাই। শাম দেখিল কি বিপদ, অমনি বলিয়া উঠিল, মামা এমন কাজটী করিবেন না এখানকার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ, আর এ বাড়ীতে ভয়ানক অসুবিধা, সব ঘরে জল পড়ে এখানে থাকলে আপনার শরীর একবারে মাটী হয়ে যাবে।

মিষ্টার বেঞ্জামিন বল্লেন, বে না এখন থাকবোনা তবে আমার যদি শেষ অবস্থায় এ রকম ইচ্ছা হয় তাই বলে রাখছি, কিন্তু ড্যাগ শাম একটা কথা এই প্রসঙ্গে না বলে পারছি না, তোমার এখানে সব দেখে শুনে আমি বড় সুখী, তোমার স্ত্রীর ও ছেলেগুলির ব্যবহারে ও আদর আপ্যায়নে আমি আমার সব শোক ভুলে গেছি—কিন্তু তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার অনুরাগের অভাব দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তোমার স্ত্রী সু-রূপা নন; সুতরাং তুমি তাকে প্রাণভরে

ভাল না বাসতে পার, কিন্তু সেটা তোমার ব্যবহারে তাকে জানতে দেওয়া উচিত হয় না। জানতে পারলেই ক্রমশঃ তোমার এ সুখের সংসার ভেঙ্গে যাবে। শাম, নীরবে একবার হুঁ বলিল। বেঞ্জামিন তখন তাঁর স্ত্রীকে কত ভালবাসিতেন, আদর করতেন বোলে এক ফোঁটা চখের জল ফেল্‌লেন ও শামকে তার স্বভাব সংশোধনের জন্ত অনুরোধ করিলেন। এর পর হতে শাম মামার সামনে মিসেস রবিনসনের সঙ্গে যতদূর সম্ভব স্বামী স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করতে লাগলো। সময় সময়

প্রিয়া আমার, জীবন সঙ্গিনী আমার, ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণ অনুচ্চস্বরে বলিত যাহাতে মিসেস রবিনসন কিম্বা তার ছেলেরা কেহ না বুঝিতে পারে, অথচ তাঁর মামা শুনতে পান, কিন্তু এমন সতর্কতা সত্তেও মিসেস রবিনসনের বড় ছেলেটী মাঝে মাঝে বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে শামের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

শামের সব চেয়ে বিপদ হল, মিষ্টার বেঞ্জামিনের কাছে মিসেস রবিনসনের মৃত স্বামীর চরিত্র বিষয়ে গল্পকরা,—মিষ্টার রবিনসন বড় মদ্যপায়ী ও অমিত ব্যয়ী ছিলেন ও সেই সব প্রসঙ্গের এক এক দিনের ঘটনা মিসেস রবিনসন, শামের মাতুলের নিকট গল্প করিতেন কিন্তু গল্পটী এমন ভাবে হইত যে মিষ্টার বেঞ্জামিন মনে করিতেন শামের সম্বন্ধে ঐ সব বলা হইতেছে—ও শামকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে সেই মৃত মাহাত্মা রবিনসনের সব দোষ, ও আবর্জ্জনাগুলি

চোরের, চুরি করতে গিয়ে মার খাওয়ার মত নীরবে নিজস্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে লাগিল, তবে এখন যে সে শোধরাইয়াছে একথা তার মাতুলকে বোঝাইবার

জন্য বহুবার বিফল প্রয়াস করিল। সব কথা শুনিয়া মিষ্টার বেঞ্জামিন বলিলেন স্যাথ শাম তুমি যে এমন স্ত্রী-রত্ন লাভ করিয়াছ তাহার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দাও, কারণ তাহার অভাবে তোমার হাতে পয়সা কখনও থাকিবে না। শাম তাড়াতাড়ি বলিল, না মামা, আর সে ভয় নাই, তুমি দেখোনা এক পয়সা আর আমারদ্বারা অপব্যয়িত হবে না। মিষ্টার বেঞ্জামিনের কিন্তু একথায় মন ভিজিল না ও মিসেস রবিনসনের মিতব্যয়িতা ও বুদ্ধিমত্তার উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিল। এর পরই বৃদ্ধ বলিলেন তা স্যাথ শাম আমি আজই ফিরে যাব, তোমার এই সুখের সংসার দেখে আমি বড় আনন্দিত হয়েছি, বিশেষ তোমার স্ত্রীর ব্যবহারে আমি বড় সুখী হয়েছি, আমার বিশ্বাস তার হাতে পয়সা থাকলে, তোমার অর্থের জন্য কখনও কষ্ট হইবে না। আমি ফিরে গিয়েই আমার শেষ উইল সম্পাদন করবো, সেজন্য গোটা কতক খবরের দরকার, এই প্রথম কবে তোমাদের বিবাহ হয়েছে। শাম দেখিল এমন শক্ত প্রশ্নের উত্তর ইতি পূর্ব্বে তাকে এখনও দিতে হয় নাই। একটা দিন বলতে গিয়ে দেখলে যে সেদিন তাদের বিয়ে হলে বড় ছেলেটার জন্ম তার ৫ বৎসর পূর্ব্বে হয়ে যায়, আর বড় ছেলেটার জন্মের দিক দেখে সময় বলতে গেলে বিবাহের সময়, তার নিজের বয়স ১৩।১৪ এর বেশী হয় না, বেচারা শাম একবারে বড় ছেলের দিকে চায়

আর একবার মামার মুখপানে চায়, মামা কিন্তু অন্য রকম ভেবে বল্লেন বুঝেছি শাম তোমাদের বিবাহিত জীবন এত সুখে কাটছে যে কবে তোমাদের বিবাহ

হয়েছে তা ভুলে গিয়েছ যা হউক মিসেস শামকে তিনি খুব জোরে বল্লেন যে একবার তোমাদের বিবাহের সার্টিফিকেট খানা দ্যাখাও ত! শামের ত বিবাহ এখনও হয় নাই সুতরাং সার্টিফিকেটে কি আছে কি থাকে বেচারা জান্‌তো না সুতরাং সে কোন বিপদের আশঙ্কা করে নাই; কিন্তু যখন বৃদ্ধ সার্টিফিকেট পত্রে নাম আলফ্রেড রবিনসন দেখিলেন; তখন শামকে জিজ্ঞাসা করিলেন একি শাম আলফ্রেড রবিনসন কে? শাম মুহূর্ত্তে বিপদ বুঝিয়া বলিল, মামা বিবাহের সময় আমার বাজারে এত দেনা যে আমার নাম ভাঁড়াইয়া বিবাহ করিতে হইয়াছিল; বৃদ্ধ এ কথা শুনিয়া চটিয়া উঠিলেন ও বলিলেন বুঝিয়াছি, তোমার মতলব তুমি তোমার স্ত্রীকে সময়ে ফাঁকি দিয়া পালাইতে চাও। শাম বলিল না মামা, এ কথা কখনও আমার মনে হয় না, দেন্‌দারের ভয়ে এমন কাজ করেছি। মিষ্টার বেঞ্জামিন বলিলেন কিন্তু এ নামে বিবাহের সার্টিফিকেট থাকিলে ভবিষ্যতে আমার বিষয় লইয়া গোল হইতে পারে, অতএব তোমার প্রকৃত নামে তোমাদের আর একবার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে এই বলিয়া

তিনি উচ্চৈস্বরে মিসেস রবিনসনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তার শামের সহিত পুনর্ব্বার প্রকাশ্যভাবে বিবাহ করিতে আপত্তি আছে কি না, মিসেস রবিনসন সব কথাটা ভাল শুনিতে পাইল না, তবে একে বিবাহ করিবে কি না স্বধু এই প্রশ্নটী বুঝিল ও মনের আনন্দে জিজ্ঞাসা করিল যে আমিত রাজী হইতে পারি কিন্তু—শামকে দেখাইয়া বলিল ও রাজি হইবে কেন! বৃদ্ধ বলিলেন সে ভার আমার, তুমি সে জন্য ভেবো না, তোমার অমত নাই ত? আনন্দে মিসেস রবিনসন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাইল ও বেচারা শাম ভয়ে ভয়ে তাহারও মত আছে জ্ঞাপন করিল। অমনি মিসেস রবিনসন ছুটিয়া গিয়া শামের গলা ধরিয়া চুম্বন করিল, পাঠক পাঠিকা আপনারা একবার বেচারা শামের অবস্থা ভাবুন; পঞ্চাশৎ বর্ষীয়া কুরূপা কোন রমণী যদি ত্রিশ বর্ষীয় রূপবান কোন যুবককে, (যার রমণীর প্রতি কোন ভালবাসা বা প্রেম নাই) প্রণয় সম্ভাসে চুম্বন করে, তবে তার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা যেরূপ হয়, আমাদের শামেরও তাহাই হইল, কিন্তু কোন কথা বলিবার উপায় নাই, মানসিক বৃত্তি বা ঘৃণা মুখে কি কথায় জানাইবার সাধ্য নাই, তাই নীরবে এ লাঞ্ছনা সে ভোগ করিল, কিন্তু এ দৃশ্য দেখিয়া বৃদ্ধের আনন্দের অবধি নাই, তিনি বলিলেন ছাথ শাম বৌমা প্রকৃত নামে তোমার বিবাহ হইবে জানিয়া আজ কত সুখী নাম ভাঁড়িয়ে এমন করে বিবাহ করার জন্য সে বড় মর্ম্মাহতা ছিল।

মিষ্টার বেঞ্জামিন যাত্রার সব উদ্যোগ করিয়া লইয়া মিসেস রবিনসনের হাত ধরিয়া বিদায় কালীন বলিলেন, বৌমা তোমাদের এই আনন্দ মিলন দেখিয়া আমি বড় সুখে চলিলাম, আশাকরি তুমি ও শাম অতি শীঘ্রই তোমাদের প্রকৃত পরিচয়ে বিবাহিত হইবে ও আমায় সংবাদ দিবে, এই বলিয়া বৃদ্ধ বালক বালিকাদের স্নেহ চুম্বন দিয়া এবং শাম ও তার স্ত্রীর সহিত সস্নেহ কর মর্দ্দন করিয়া চলিয়া গেলেন।

* * * * * *

কিছু দিন পরেই মিসেস রবিনসন বিবাহ যুক্তি ভঙ্গ করার জন্য—শামের নামে আদালতে নালিশ রুজু করিলেন ও গ্রামে একটা এ বিষয় লইয়া খুব আন্দোলন চলিতে লাগিল, কারণ মিসেস রবিনসন শামের মামা মিষ্টার বেঞ্জামিনকে তার মকোদ্দমার প্রধান সাক্ষী বলিয়া শমন করিয়াছিল। যখন কিন্তু মকদ্দমা উঠিল তখন বৃদ্ধ এ জগতের অধিকারের বহির্ভুত হইয়াছেন, মিসেস রবিনসনের মকোদ্দমার তেমন সুবিধা মত সাক্ষী সাবুদ সে দিতে পারিল না; তখন জজ বলিলেন, যে স্ত্রীলোকটী বদ্ধ কালা, কি শুনিতে কি শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে নইলে এই রূপবান

ত্রিংশবর্ষীয় যুবক কি এই দরিদ্রা প্রৌঢ়া কুৎসিতা ও বর্ষিয়সী রমণীর পাণি গ্রহণের প্রয়াসী হইবে, এই বলিয়া মকোদ্দমাটী ডিসমিস করিলেন। শামের তখন আনন্দ দেখে কে, প্রথমতঃ সে যে মিসেস রবিনসনের কবল হইতে এ ভাবে রক্ষা পাইবে এ আশা তার হয় নাই। সে জানিত তার মামা তার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিবেন, দ্বিতীয়তঃ মামা তার ম'রে গেছেন সুতরাং এবার সে তাঁর ধনে ধনবান হইয়া মনোমত পাত্রীকে বিবাহ করিবে; কারণ জজ রায়ে শাম যে একেবারে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভাবে নির্দ্দোষী তাহা লিখিয়াছেন। শাম অনতিবিলম্বে দেশে গিয়া মামার উকিল বাড়ী গেলেন ও যখন উইল পাঠ করিলেন তখন তিনি এক বারে আকাশ হইতে পড়িলেন। বৃদ্ধ উইলে লিখিয়াছেন "সে তাঁর ভাগনে শাম বড় মদ্যপায়ী ও অমিতব্যয়ী ছিল, কিন্তু তার স্ত্রী এলিজার গুণে সে এখন অনেক শোধরাইয়াছে সম্প্রতি অপরিমিত অর্থ হাতে পাইলে আবার সে খারাপ পথে যাইতে পারে এই আশঙ্কায় আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি আমার স্নেহের ও আদরের ভাগিনে শামের স্ত্রী এলিজা ও তার তিন সন্তানকে দিয়া গেলাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস শাম ইহাতে সুখী বই অসুখী হইবে না।" শাম মস্তকে হাত দিয়া "হা অদৃষ্ট" বলিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল।

পাঠক, পাঠিকা এ মকোদ্দমার শেষ বিচার আপনারাই করুণ, যদি আইনে বলে যে মিসেস রবিনসন যখন শামের বিবাহিত স্ত্রী নন তখন মিষ্টার বেঞ্জামিনের উইলের মর্ম্মানুসারে তিনি বা তাঁর ছেলেরা তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না, তা হলে আপনারা ভাল ভাল ব্যারিষ্টার উকিল দিয়া শামের মকোদ্দমাটা করিয়া দিন; কারণ বেচারার আর পয়সা নাই, আর যে উপায়ে পয়সা আসিত তাহাও বন্ধ হইয়াছে। আর যদি বলেন যে যখন মামার উইলে স্পষ্ট এলিজা ও তার ছেলেদের নামে সম্পত্তি লেখা আছে তখন তাহারই সম্পত্তি পাবে ও শামকে বাধ্য হয়ে মিসেস রবিনসনকে বিবাহ করতে হবে; তা হলে পাঠিকা মহোদয়াদের ভিতরে যারা একটু ভাল মেয়ে সাজাতে জানেন, তাঁরা যদি দয়া করে মিসেস রবিনসনকে সাজ-পোষাক রুজ-পেণ্ট ইত্যাদি দিয়া শামের মনে ধরিয়ে বিবাহ দিতে পারেন তবে বৌ ভাতে তাঁদের একটা খুব ভোজ দেওয়া হবে। লেখক ছুটোর একটাও পারবে না, তাই গরীব এইখানে বিদায় হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

নিয়তী।

১

সকাল বেলায় মাধুরী বসিয়া পড়িতেছিল,—এমন সময় তাহার দাদা আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মাধুরী বলিয়া উঠিল, "দাদা, আজ আমার পড়া বলে দেবে না?" দাদা বলিলেন, "হ্যাঁ। কিন্তু আগে আমায় একটা পদ্য বল দেখি।"

তখন অতি মিষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে মাধুরী বলিতে আরম্ভ করিল :—

জয় জয় জয় জয় জগদীশ,—
গাহিব তোমারি জয় ;—
তোমারি মহিমা, ফলে ফুলে হেরি
তুমি যে করুণা—

সহসা বাহিরে একটা গোল উঠিল, মাধুরী কবিতা বলিতে বলিতে থামিল। তাহার দাদা চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই ঘরের মধ্যে ১০।১২ জন কনষ্টেবল ও একজন ইন্স্পেক্টর প্রবেশ করিল। একজন মাধুরীর দাদাকে দেখাইয়া বলিল "ইঁহারই নাম ললিত।" অমনি দুইজন কনেষ্টবল আসিয়া ললিতকে ধরিল। গোলযোগে ললিতের পিতা ও অপর সকলে ব্যস্ত হইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন;—বাটীর ভিতরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। মাধুরী প্রথম কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু যখন সে দেখিল যে তাহার দাদার হাতে হাতকড়ি দিয়া তাহারা লইয়া চলিল, তখন সে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার কোলে পড়িয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ললিতের চক্ষু দিয়া জল বহিল, তিনি ভগ্নীকে কোলে করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বাটীর ভিতর হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি চারিদিক আলোড়িত করিয়া উঠিল। পাহারাওয়ালারা জোর করিয়া ললিতকে মাধুরীর নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

২

গঙ্গার ধারে আনন্দ নগর নামে একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে রত্নেশ্বর রায় বড়লোক ও জমিদার। তাঁহার দৌরাত্ম্যে চারিদিকের লোক জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামের করুণা কুমার বসু নামক এক ব্যক্তির উপর তাঁহার রাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। করুণা বাবুর অপরাধের মধ্যে, তিনি একটী ভাল চাকুরী

করিয়া কিছু টাকা করিয়াছিলেন; আর সকলে যেমন জমিদার মহাশয়কে ভয় ও মান্য করিত তিনি তাহা করিতেন না। তিনি রত্নেশ্বর রায়কে জমিদার বলিয়া স্বীকারও করিতেন না।

রত্নেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র অমরেন্দ্র রায় প্রকৃত জমিদার ছিলেন। তিনি একটী পাঁচ বৎসরের পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার জননী ও স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মরিবার সময় তিনি রত্নেশ্বরের হস্তেই পুত্র ও জমিদারী দিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পরে গ্রামে রটিল, জমিদারের পুত্র সুরেন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। রত্নেশ্বরও সকলকে তাহাই বলিলেন; কিন্তু যে কারণেই হউক, অনেকে জানিল সুরেন্দ্র মরেন নাই, তবে বাটীতেও আর নাই। সেই অবধি রত্নেশ্বরই জমিদার!

ললিত ও মাধুরী করুণাবাবুর পুত্র ও কন্যা। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে ললিতকুমার কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষা করিতেছিলেন তাঁহার বয়স তখন ১৭ বৎসর। মাধুরীর বয়স তখন নয় বৎসরের অধিক নহে। ললিত গ্রীষ্মের ছুটীতে বাটী আসিয়াছিলেন।

যখন পুলিশ আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল, তখন তিনি যে কি করিয়াছেন, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বাটীতে ভগিনী, জননী ও অন্যান্য সকলে কাঁদিতেছেন; ইহাই শুনিতে শুনিতে তিনি থানায় আসিলেন।

৩

থানায় আসিয়া জানিলেন যে তিনি খুন করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রামে চারুচন্দ্র মিত্র নামে তাঁহারই একটী সমবয়স্ক বন্ধুকে কয়েক দিন হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কয় বৎসর হইতে চারু কোথা হইতে আসিয়া সেই গ্রামে বাস করিতেছিলেন। চারু বড় গরীব, করুণা বাবুর বাটীতেই তিনি প্রত্যহই আহার করিতেন; তবে তাঁহার শয়নের স্থানের স্থিরতা ছিল না। হঠাৎ এক দিন আর চারুকে পাওয়া গেল না। ললিত জানিতেন না, কিন্তু পুলিশ কোন গতিকে সন্ধান পাইল; যে চারু খুন হইয়াছে ও ললিতই তাঁহাকে খুন করিয়াছে। পুলিশের মোকর্দ্দমা সাজাইয়া সাক্ষী জুটাইতে বিলম্ব হইল না। ললিত দোষী হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি দেখিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকে সাক্ষ্য দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ললিতকে দায়রায় পাঠাইলেন, তথায়ও ললিতের বিরুদ্ধে অনেকে সাক্ষ্য দিল। তাঁহার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মকর্দ্দমা চালাইলেন;

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—ললিত দোষী প্রমাণ হইলেন ও যাবৎ জীবনের জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইলেন!

যে দিন ললিত প্রিয় ভগিনী মাধুরীকে পড়াইতে ছিলেন, সেই দিন হইতে তিন মাস যাইতে না যাইতে এক দিন প্রাতে ললিত দ্বীপান্তরে যাইবার জন্য জাহাজে উঠিলেন। যাইবার দিন তাঁহার ক্ষুদ্র ভগিনী ও পিতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। ললিত পিতার চরণ ধূলি লইলেন; তাহার পর ভগিনীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "মাধুরী, আমায় কি তোমরা সব ভুলে যাবে?" বসু মহাশয়ের চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে ছিল, মাধুরী উচ্চৈস্বরে কাঁদিতেছিল, ললিতের চক্ষু জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল।

প্রহরীরা ললিতকে লইয়া জাহাজে তুলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বসু মহাশয় ও মাধুরী গৃহে ফিরিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে ললিত জন্মের মত পিতা, মাতা, ভগিনী, স্বজন, স্বদেশ সকলই ছাড়িয়া গেলেন।

৪

এক দিন সন্ধ্যার সময় বসু মহাশয় একাকী বসিয়া ভাবিতেছিলেন; সহসা মাধুরী আসিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা—দাদাকে তারা কোথায় নিয়ে গেছে?" বসু মহাশয় ধীরে ধীরে কন্যাকে কোল হইতে নামাইয়া, বলিলেন, "মাধুরী, খেলা করগে।" মাধুরী সে কথা শুনিল না, আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দাদাকে তারা কোথায় নিয়ে গেল?" তখন তিনি বহু কষ্টে বলিলেন, "আণ্ডামান দ্বীপে."

"সে কোথায়?"

"এখন যাও খেলা করগে।"

"বাবা, আমি আণ্ডামান দ্বীপে যেতে পারিনে? দাদা সেখানে কি ক'চ্ছে?"

করুণা বাবুর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল তিনি কোন কথা কহিলেন না। মাধুরী পিতার মুখের দিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তুমি কাঁদছ?" করুণা বাবু বলিলেন, "কই না মা, কাঁদবো কেন! তুমি খেলা করগে।"

মাধুরী দুই পদ যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল," দ্বীপ কি বাবা?"

করুণা বাবু অতি কষ্টে হৃদয়কে দমন করিয়া বলিলেন, "যার চারিদিকে সাগর, তাহাকেই দ্বীপ বলে।"

' দ্বীপের চারিদিকে জল, তবে দাদা কেমন করে আসবে?"

"মাধুরী, মা, এখন যাও, অন্য সময় সব বলিব।"

তখন ধীরে ধীরে মাধুরী পিতার নিকট হইতে প্রস্থান করিল, বসু মহাশয়ও আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া উঠিলেন। এই সময় মাধুরী আবার ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি সত্বর চক্ষুর জল মুছিয়া ফেলিলেন। মাধুরী আসিয়া বলিল, "বাবা সুবোধ বাবু আসছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি আমায় বল্লেন, যে তিনি দাদাকে এনে দেবেন। বাবা,—সত্যি?" এই সময় সুবোধ সেই স্থানে আসিলেন। সুবোধ ললিতের একজন বড় বন্ধু। মাধুরী সুবোধের হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কই—দাদাকে আন্‌বে চল।" এবার বসু মহাশয় আর থাকিতে পারিলেন না উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন,—সুবোধও কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন থাকিয়া থাকিয়া মাধুরীও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বাবার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা, তবে বুঝি দাদা আর আসবে না?"

৫

একটী ভাঙ্গা বাটীর ভিতরে একটী অন্ধকার গৃহে একটী যুবক বসিয়া ভাবিতেছিলেন। আনন্দ নগরের বাহিরে জঙ্গলের ভিতরে এই ভাঙ্গা বাড়ী। বাড়ীতে ভুত আছে বলিয়া দিনেই কেহ এই বাড়ীতে যাইত না। এই বাটীর মধ্যে কতকগুলি ঘর প্রায় মাটীর নীচে;—এই সকল ঘরের একটী ঘরের মধ্যে যুবক বসিয়া একমনে ভাবিতেছিলেন। তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর, কিন্তু ঘরের মধ্যে আলো নাই বলিলেই হয়; কয়েকটী ছিদ্র ভিন্ন, ইহার দ্বার বা জানালা কিছুই নাই। একটী দ্বার ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহাও সম্প্রতি গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যুবক ভাবিতেছিলেন,—সহসা তাঁহার কর্ণে একটা শব্দ প্রবেশ করিল। তিনি চমকিত হইয়া উৎসুক নয়নে সেই দিকে চাহিলেন;—দেখিলেন যেদিকে একটী ক্ষুদ্র নিতান্ত অপরিসর নর্দ্দমার মত পথ আছে, উহার ভিতর দিয়া অতি কষ্টে একটী ক্ষুদ্র বালিকা শুইয়া পড়িয়া বুকে হাঁটিয়া আসিতেছে। সে বহু কষ্টে আসিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইল, "অমনি যুবক বলিয়া উঠিলে," 'আজ এত দেরি হল কেন?' সে বলিল, "কই,—দেরিতো হয় নি, ঠিক সময়েই তো এসেছি।" তাহাকে হাপাইতে দেখিয়া যুবক বলিলেন, "আহা, তোমার ঐ খান দিয়া আস্‌তে না জানি কত কষ্ট হয়?" বালিকা সে কথায় কোনই উত্তর দিল না; একটা দড়ি কোমরে বাঁধিয়া আনিয়াছিল তাহাই টানিতে লাগিল। দড়ির সহিত নর্দ্দামার ভিতর দিয়া জল

শুদ্ধ একটা বোতল এবং একটা থলির ভিতর রুটী, আলুভাজা, মাছভাজা ইত্যাদি আসিল। খাদ্য দ্রব্য দেখিয়া যুবকের চক্ষু দিয়া একরূপ অনৈসর্গিক তেজ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"তুমি না থাকিলে, তুমি এমন করে রোজ আমার জন্য খাবার না আনিলে, এতদিনে আমি মরিয়া যাইতাম।" বালিকা কোন উত্তর দিল না; সে সেইখানে হাটু গাড়িয়া বসিয়া খাদ্য দ্রব্য সকল ধীরে ধীরে যুবকের মুখে তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে আরম্ভ করিল। যুবক এতই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন যে তিনি একটীও কথা কহিলেন না। যখন তাঁহার খাওয়া শেষ হইল তখন বালিকা তাঁহাকে জল খাওয়াইল,—তৎপরে সে দড়িতে পূর্ব্বরূপে বোতল ও থলি বাঁধিল, পরে সেই দড়ি কোমরে বাঁধিয়া সে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করিল; তখন যুবক কহিলেন, 'আমাকে কবে এখন থেকে বার করবে?' বালিকা বলিল, "তাঁরা ব'লেছেন, আর দিন কতক পরে।" যুবক আবার ব্যাকুল-স্বরে কহিলেন, "তুমি এত শীঘ্র কেন যাচ্চো? আমি আর একলা থাকতে পারি না। এমন করে আর থক্‌লে আমি পাগল হব। তুমি একটু আমার সঙ্গে কথা কও।" বালিকা বলিল, "তাঁরা এখানে দেরি করিতে বারণ করে দিয়েছেন।" যুবক হতাশ হইলেন; তিনি ব্যাকুলভাবে বালিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এদিকে বালিকাও পূর্ব্বরূপ বুকে হাঁটিয়া হাঁটিয়া সেই ক্ষুদ্র পথ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

বালিকা বাহির হইয়া আসিল, তৎপরে দড়ি টানিয়া বোতল ও থলি বাহির করিল। নিকটে একটী যুবক দাঁড়াইয়া লুক্কাইত ভাবে এই সকল দেখিতেছিলেন তিনি বালিকাকে সত্বর আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বলিকাও হরিণীর ন্যায় লম্ফে যুবকের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তৎপরে তাঁহারা দুই জনে সেই ভগ্ন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গ্রামের দিকে চলিলেন।

যুবক কোন কথা কহিলেন না; দুইজনে নীরবে আসিয়া গ্রামে পৌছিলেন। বালিকা—মাধুরী, যুবক—সুবোধ।

৬

আর যাঁহাকে আমরা অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ দেখিলাম, আর যাঁহাকে প্রত্যহ মাধুরী যাইয়া খাওয়াইয়া আসিতেছে—সে চারুচন্দ্র। যিনি হত হইয়াছেন বলিয়া ললিত আণ্ডামান দ্বীপে বসিয়া স্বদেশ ও স্বজনের জন্য কাঁদিতেছেন,—তিনি হত হন নাই। তিনি এই গর্ত্তের মধ্যে আবদ্ধ আছেন। মাধুরী কেমন করিয়া চারুর সন্ধান পাইল তাহাই এক্ষণে আমরা বলিব।

ললিত দ্বীপান্তরীত হইলে সুবোধ আনন্দ নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি ললিতের মোকর্দ্দমার আদ্যোপান্ত শুনিয়াছিলেন। ললিত তাঁহার বড় বন্ধু ; তিনি চারুকে হত্যা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, চারু নিশ্চয়ই মরে নাই, মোকর্দ্দমার সময় তাঁহারা তাঁহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু কোনই সন্ধান পান নাই। তবুও তাঁহার মন যেন বলিতে লাগিল, যে চারু মরে নাই। তিনি এই বিষয়ে আরও একবার সন্ধানের জন্য আনন্দ নগরে উপস্থিত হইলেন ভাঙ্গা বাড়ীটার উপর তাঁহার কেমন একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল ; তিনি প্রত্যহই ঐ বাড়ীর দিকে বেড়াইতে যাইতেন। একদিন বৈকালে তিনি ঐ বাড়ীর নিকট বেড়াইতেছেন,—সহসা তাঁহার কর্ণে ক্রন্দনধ্বনির ন্যায় একরূপ বিকট ধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া যেথান হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই স্থানে আসিলেন। দেখিলেন শব্দ মাটীর নীচে হইতে উঠিতেছে। সেই স্থানে দুই একটী ছিদ্র আছে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া কিছুই দেখা যায় না। তিনি ডাকিলেন,—শব্দ করিলেন, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। তিনি সেই গৃহের দ্বার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও দ্বার দেখিতে পাইলেন না ; তবে দেখিলেন, এক পার্শ্বে একটী নর্দ্দমার মত পথ আছে, ক্ষুদ্র বালক বা বালিকা হইলে ইহার ভিতর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেও করিতে পারে। তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে ইহার ভিতরই কেহ আছে। তিনি সে দিবস বাটী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন যে এ ঘরে কে আছে তাহা দেখিতেই হইবে।

পর দিবস প্রাতে তিনি মাধুরীকে ডাকিলেন ; সে নিকটে আসিলে, বলিলেন "মাধুরী তোমার দাদাকে দেখিবে ?"

"কই—কই ?"

"একটী কাজ আছে। তোমার দাদাকে কেন তারা নিয়ে গেছে জান ?"

"না, তারা কি দাদাকে আর নিয়ে আস্‌বে না ?"

"আসবে। তোমার ও পাড়ার চারুর কথা মনে পড়ে ?"

"হাঁ,—সেই তিনি ?"

তোমার দাদা তাঁকে মেরে ফেলেছেন বলে তোমার দাদাকে তারা নিয়ে গেছে, বুঝতে পাচ্চো ?"

মাধুরী ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' বলিল। সুবোধ বলিলেন, "এখন যদি সেই চারুকে পাওয়া যায়, তা হ'লে তারা তোমার দাদাকে ছেড়ে দিতে পারে।"

"তিনি কোথা আছেন।"

"তিনি এইখানেই আছেন।"

"তবে কেন তিনি দাদাকে আন্‌ছেন না?"

"তিনি যেখানে আছেন, সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে আস্‌তে পারেন না। তাঁকে আটকে রেখেছে।"

"তা হলে কি হবে!"

"তিনি যেখানে আছেন, সেখানে তুমি ভিন্ন আর কেউ যেতে পারে না। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবে? সেখানে একটা অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, পারবে, ভয় করবে না?"

"দাদা ফিরে আস্‌বে?"

"হাঁ, যদি চারুকে তুমি দেখে আস্‌তে পার, তবে তোমার দাদা ফিরে আস্‌বে।"

"তা হ'লে আমি তার ভিতরে যাব,—চল।"

"আচ্ছা, বৈকালে তোমায় ডেকে নিয়ে যাব; এখন নয়।"

বৈকালে সুবোধ মাধুরীকে লইয়া সেই ভাঙ্গা বাটীতে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে আসিয়া মাধুরীকে সেই গর্ত্ত দেখাইলেন। মাধুরী একাকিনী ভিতরে যাইতে ভীতা হইল, বলিল, "তুমি এস।"

"আমি তো ও পথে যেতে পারিব না, তোমায় একালা যাইতে হইবে।"

মাধুরী যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সুবোধ হতাশ হইলেন। মাধুরীকে এরূপ বিপদে তিনি ইচ্ছা করিয়া ফেলিতে চাহেন না; কিন্তু উপায় নাই। ইহার ভিতর কি আছে, কে জানে? মাধুরী কহিল, "দাদাকে পাব?—এর ভিতরে যদি যাই, তবে দাদাকে পাব?" সুবোধ বলিলেন "হাঁ।" বিদ্যুৎবেগে মাধুরী নিজ কাপড় কোমরে জড়াইয়া লইল, শুইয়া পড়িয়া সে ধীরে ধীরে সেই গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুবোধ কম্পিত হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতবার তাহাকে তাঁহার বারণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল,—কিন্তু উপায় নাই।

তিনি, পাঁচ মিনিট, ১০ মিনিট, ১৫ মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলেন, মাধুরী ফিরিল না। তখন তিনি অস্থির হইলেন, "হায় আমি কি করিলাম! একে এনে শেষে এর ভিতর মারিলাম!" তাঁহার অসহ্য হইল,—তিনি পাগলের ন্যায় ডাকিতে লাগিলেন, "মাধুরী, মাধুরী মাধুরী।" তাঁহার ধ্বনি সেই ভগ্নগৃহে প্রতিধ্বনিত হইয়া দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়িল।

৭

দাদার জন্য মাধুরী সেই ক্ষুদ্র গর্ত্ত দিয়া বুকে হাটিয়া হাটিয়া যাইয়া একটী ঘরে প্রবেশ করিল। প্রথম অন্ধকারে সে কিছুই দেখিতে পাইল না। সে মানুষের গলার শব্দ শুনিয়া কতক সাহস পাইল। চারু তাহাকে দেখিয়া বলিতে ছিলেন, "আপনি কে? আপনি কোন দেবী,—আমার উপর সদয় হইয়া দেখা দিলেন? আপনি যেই হউন আমায় রক্ষা করুন, আমায় ক্ষমা করুন।" মাধুরী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "আমি মাধুরী।" "আমার দাদা আসবেন তাই তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছি।"

"আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না! তুমি আমায় রক্ষা কর!"

"তুমি কে?"

"আমি চারু, আমাকে আটকে রেখেছে।"

"তবে যাই। এখন যাই?"

"না না,—না না, আমায় ফেলে যেও না। আর ও জল, ও চিড়ে খেতে পারি না। তারা যখন আমাকে বন্ধ করে যায়, তখন এক জালা জল, আর এক জালা চিঁড়ে দিয়ে গিয়েছিল, আমি আর ও পোকা শুদ্ধ জল খেতে পারি না। আমায় কিছু খাওয়াইয়া বাঁচাও।"

"কাল খাবার নিয়ে আসবো, এখন আমি যাই?"

"একটু দাঁড়াও, আমি তোমায় দেখি; কত দিন আমি মানুষ দেখিনি, কথা শুনিনি।" মাধুরী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল; কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল "এখন যাই?" চারু কোন কথা কহিল না তখন মাধুরীর ভয় হইল, সে অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে পাইল না কেবল দেখিল,—চারুর চক্ষু দুইটী, তারার ন্যায় জ্বলিতেছে।

যখন সুবোধ ডাকিয়া হতাশ হইতে ছিলেন, ঠিক সেই সময় ধূলায় ধূসরিত হইয়া মাধুরী গর্ত্ত হইতে বাহির হইল। সুবোধ সত্বর যাইয়া তাহার হাত ধরিলেন বলিলেন "কি দেখিলে?"

"চারুবাবুকে দেখিলাম।"

"শীঘ্র এস," এই বলিয়া সুবোধ মাধুরীর হাত ধরিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। বাড়ীতে আসিয়া তাঁহারা দুইজনে বন্ধু মহাশয়ের নিকট সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া করুণা বাবু বলিলেন, "এখানে সকলেই রত্নেশ্বর রায়ের পয়সা খায়, এখানে কিছুই হবে না। আমি কালই জেলায় যাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সকল কথা

"কাল খাবার নিয়ে আমাকে এখন ক'রে দাও"—নিয়ন্তা

K. V. SEYNE & BROS.

বলিব। সুবোধ তুমি বাবা, তত দিন এখানে থাক।' মাধুরী বলিল, "কাল আবার আমার সেখানে যেতে হবে।"

"কেন ?"

"তাঁর কিছু খাবার নেই।"

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি এত দিন কি খেয়ে আছেন, জিজ্ঞাসা করেছিলে।

"তিনি বল্লেন,—তাঁকে যে দিন বন্ধ করে, সে দিন তারা তাঁর ঘরে এক জালা জল, আর এক জালা চিঁড়ে দিয়ে গিয়েছিল, এখন সে জলে পোকা হয়েছে।"

বসু মহাশয় ও সুবোধ উভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন ; কিন্তু কেহই কোন কথা কহিলেন না। বসু মহাশয়ের অবস্থা এক্ষণে নিতান্ত মন্দ, তিনি সেই রাত্রেই পদব্রজে জেলায় যাত্রা করিলেন।

৮

গভীর নীল সাগর তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে। যতদূর দেখা যায় কেবলই জল। সেই জলে সোনা ছড়াইয়া সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছেন। সমুদ্রের ধারে এক খানি প্রস্তরের উপর বসিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আছেন,—ললিত। তিনি সূর্য্যাস্ত দেখিতে ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতেছিল। আজ ঠিক তিন মাস তিনি এই স্থানে আসিয়াছেন।

এই সময় পশ্চাৎ হইতে একজন আসিয়া বলিল, "আবার কাঁদিতেছ ?" যে এই কথা কহিল, সেও ললিতের সমবয়স্ক একটী যুবক ; ললিত ফিরিয়া বলিলেন, "ভাই, সক্ করিয়া কি কাঁদি ? কান্না যে আপনিই আসে !

"স্বপ্ন যদি বিশ্বাস কর, আমি ভাই কাল স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন তুমি দেশে যাইবে। ললিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; বলিলেন যে আশা বৃথা,—যতদিন বাঁচিব সেই আশায় আশায়ই বাঁচিব।"

সহসা উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিলেন। এই সময় সহসা বিদ্যুৎ আলোকে চারিদিক আলোকিত হইল, তৎপরে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া মেঘগর্জ্জন। পূর্ব্বদিকে আকাশ মেঘে ঢাকিয়াছে ; বৃষ্টি বা ঝড় এখনই আসিবে। উভয়েই সত্বর উঠিলেন ; দুই জনে সত্বর পদে গৃহে আসিলেন। যত শীঘ্র সম্ভব উভয়ে আহার করিলেন ; তৎপরে যুবক ললিতকে কহিলেন, "ললিত, তুমি যদি বাড়ী যাও, আমার মাকে ব'ল—আমি ভাল আছি।" ললিত কোন কথা কহিলেন না।

যুবক ও ললিত একত্রে এক কুটীরে শয়ন করিতেন। সকালে ললিতের বোধ

হইল যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজিয়া গিয়াছে, শরীরে ঠাণ্ডা লাগায় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তিনি উঠিয়া বসিলেন। তখনও ঘরের ভিতর অন্ধকার; তিনি অন্ধকারে দেখিলেন যে তাঁহার পার্শ্বে যুবক শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

কিসে কাপড় ভিজিল দেখিবার জন্য তিনি উঠিয়া আলো জ্বালিলেন। আলো জ্বালিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি দেখিলেন যে তাঁহার কাপড়, তাঁহার হস্ত, তাঁহার শরীর রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে। বিছানা রক্তে লাল, যুবকের গলা কাটা, বিছানার উপর এক খানা বড় ছুরিও পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি এই ভয়ানক ব্যাপার সম্মুখে দেখিয়া মুর্চ্ছিত হইবার মত হইলেন; কিন্তু সহসা তাঁহার মনে কি হইল, তিনি একেবারে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। তখন বাহিরে প্রায় পরিস্কার হইয়াছে। তাঁহাকে এইরূপ রক্তাক্ত দেখিয়া পুলিশ অনতিবিলম্বে তাঁহাকে ধৃত করিল; তৎক্ষণাৎ তিনি সাহেবের সম্মুখে নীত হইলেন; তাঁহার হাতে হাতকড়ি ও পায় শিকল দেওয়া হইল, তিনি জেলে প্রেরিত হইলেন।

এদিকে তাঁহার ঘর অনুসন্ধান হইল,—সকলেই তথায় যুবকের গলা কাটা দেহ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিল। সকলেই ভাবিল, ললিতই যুবককে খুন করিয়াছেন। তিনি যে খুন করেন নাই, ইহার প্রমাণ তিনি কিছুই দিতে পারিলেন না। তাঁহার বিচার হইল; তিনি দোষী প্রমাণিত হইলেন, তাঁহার ফাঁসিরও হুকুম হইল।

কলিকাতার হাইকোর্ট অনুমতি না দিলে ফাঁসি হইতে পারে না; এই জন্য অনুমতির জন্য কলিকাতায় পত্র গেল। ললিত হাত পা শিকলে আবদ্ধ জেলে থাকিলেন।

৯

যে দিন ললিতের পিতা কলিকাতায় আসিয়া পুত্রের খালাসের চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই দিন আণ্ডামান দ্বীপে ললিতের ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল। বন্ধু মহাশয় জেলায় আসিয়া অনেক কষ্টে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে চারুর কথা জানাইলেন, তিনি চারুকে মুক্ত করিয়া আনিবার জন্য পুলিসকে হুকুম দিলেন; পুলিস যাইয়া চারুকে সেই ঘর হইতে বাহির করিল। সকলেই তাঁহাকে চারু বলিয়া চিনিল।

চারু ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আসিয়া বলিলেন যে, প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে এক দিন তিনি রাত্রে মাঠের মধ্যে দিয়া আসিতেছেন, এমন সময় অন্ধকারে ছয় সাত জন লোক আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার হাত মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। তৎপরে তাঁহারা তাঁহাকে আনিয়া সেই ঘরে আবদ্ধ করিয়া—সেই ঘরের দ্বার গাঁথিয়া দিয়া গেল

তিনি তাহাদের কাহাকেও সেই রাত্রে চিনিতে পারেন নাই; এখনও বোধ হয় চিনিতে পারিবেন না।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিসকে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়া জজ সাহেবকে সকল কথা লিখিলেন। তিনি সকল কথা লিখিয়া ললিতের খালাসের জন্য হাইকোর্টে লিখিলেন।

বসু মহাশয়, সুবোধ ও চারুচন্দ্র, তিন জনেই এই বিষয়ের জন্য কলিকাতায় আসিলেন। বসু মহাশয়ের শেষ যাহা কিছু ছিল, সকল বিক্রয় করিয়া একজন ব্যারিষ্টার দিলেন। কয়েক দিন পরে ললিতের মোকর্দ্দমা উঠিল। জজ সাহেব সকল শুনিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের জন্য বিশেষ দুঃখিত হইলাম। ললিত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী প্রমাণ হইলেন সত্য, কিন্তু তিনি আণ্ডামান "" একটী খুন করিয়াছেন, সেই খুনের জন্য তাঁহার সেখানে ফাঁসির আজ্ঞা বাহাল রাখিয়াছি। যদিও পূর্ব্বের দোষের জন্য আমরা তাঁহাকে খালাস দিতে বাধ্য কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার উদ্ধার নাই।" সকলে বাহির হইয়া আসিলেন। বসু মহাশয় চলিতেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কোন জ্ঞানই ছিল না।

তাঁহারা বাটী ফিরিয়া আসিলেন। দ্বারে মাধুরী দাঁড়াইয়া তাঁহাদের অপেক্ষা করিতেছিল; পিতাকে দেখিয়া সে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবা,- দাদা কই?" বসু মহাশয় এ কথা সহ্য করিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। বাড়ীর ভিতর হইতেও হৃদয় বিদারক ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল। মাধুরী একবার সকলের মুখের দিকে চাহিল, তৎপরে সেও কাঁদিয়া উঠিল।

ক্রমে সকলে ললিতের ফাঁসির কথা শুনিল। বসু মহাশয় নিতান্ত গরিব হইয়া পড়িয়াছিলেন, টাকা উপার্জ্জনের ক্ষমতাও আর তাহার এক্ষণে ছিল না। তাঁহার একমাত্র পুত্রের শোক তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ ই অসহ্য হইয়াছিল।

ললিতের মাতা পুত্রের ফাঁসির কথা শুনিয়া সম্পূর্ণ উন্মত্তা হইলেন। তাঁহার বিকট হাসি তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যাইত।

মাধুরী দশ বৎসর বয়স্কা বালিকা মাত্র। মাধুরী বাড়ীতে একাকিনী, এ দিকে রুগ্ন শয্যায়—পিতা। মাতা—পাগলিনী।

যথা সময়ে ললিতের ফাঁসির হুকুম হাইকোর্ট হইতে আণ্ডামানে উপস্থিত হইল। ফাঁসির দিনও ধার্য্য হইল। দেখিতে দেখিতে সে দিনও আসিল। অতি প্রত্যুষে ললিতকে কারাগার হইতে বাহির করা হইল। বেলা ৭ টার সময় ফাঁসি হইবে। জেলের সম্মুখে এক মঞ্চের উপর ফাঁসিকাষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছে।

তাহার সম্মুখে বন্দুক স্কন্ধে সিপাহিগণ লাইন দিয়া দাঁড়াইয়াছে, কয়েকজন সাহেবও সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোক জমিয়াছে, এতদ্ব্যতীত জেল হইতে সমস্ত কয়েদীকে আনিয়া সার দিয়া দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

চারিদিকে প্রহরী, মধ্যে ললিত,—ধীরে ধীরে ফাঁসি কাষ্ঠের দিকে আসিতেছেন;—তাঁহার মূর্ত্তি গম্ভীর, তাঁহাকে ললিত বলিয়া আর চিনিতে পারা যায় না।

প্রহরীরা তাহাকে মঞ্চের উপর তুলিল; তাঁহার মাথায় একটা লাল টুপি পরাইয়া দিল, তৎপরে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কিছু বলিবার আছে? যদি থাকে, বলিতে পার।" ললিত এ কথাও শুনিতে পাইলেন না। তিনি কোন কথা কহিলেন না। ললিতের গলায় দড়ী লাগান হইল; আর এক মুহূর্ত্ত,—মাধুরী, তোমার আদরের দাদা যায়! এখন তুমি কোথায়? এখন কে আর দাদাকে আসিয়া সেই মধুর কথা শুনাইবে!—আর এক মিনিট। ললিত একবার আকাশের দিকে চাহিয়া চক্ষু মুদিলেন।

এই সময় ভিড়ের ভিতর দিয়া বায়ুবেগে একজন অশ্বারোহী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তৎপরে গগন বিদীর্ণ করিয়া একটা গোল উঠিল।

১০

ললিতের দ্বীপান্তর যাইবার পর ছয় মাস হইয়া গিয়াছে। করুণা বাবু পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী—তিনি আর উঠিতে পারেন না।

এক দিন সন্ধ্যার সময় করুণা বাবু শুইয়া আছেন, ঘরের পার্শ্বে একটা প্রদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে;—তিনি সেই প্রদীপের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটী বাটীতে দুধ লইয়া মাধুরী ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইল; ধীরে ধীরে বিছনার নিকট বসিল; তৎপরে বাটীটী এক পার্শ্বে রাখিয়া পিতার পার্শ্বে বসিয়া ডাকিল, "বাবা!" বসু মহাশয় চমকিত হইয়া কন্যার দিকে চাহিলেন; মাধুরী কহিল, "বাবা, দুধ এনেছি, খাও।" বসু মহাশয় কন্যার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "মাধুরী, এ দুধ তুমি পেলে কোথা?" মাধুরী কোন উত্তর দেয় না দেখিয়া তিনি কহিলেন, "আমি তোমার বাপ; আমাকে মিথ্যা কথা ব'লো না। মিথ্যা কথা বলার চেয়ে আর পাপ নাই। আমি ললিতকে বাঁচাইতে যাইয়া আমার যা কিছু ছিল, সবই খরচ করিয়াছি; আমাদের তো আর কিছু নাই। তুমি আমাকে সকল কথা না বলিলে এ দুধ আমি খাব না!"

"আমার বালা ৪০৲ টাকায় বেচেছি ;—তাতেই এই কয় মাস চ'ল্লো।"

বসু মহাশয় বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "তোর গহনা যে আমি ললিতকে বাঁচাইতেও নষ্ট করি নি!" মাধুরী চক্ষুজল রাখিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার চক্ষুজল মুছাইতে গেল ;—বসু মহাশয় দেখিলেন, তাহার দক্ষিণ হস্ত সমস্তই পুড়িয়া গিয়াছে ; তিনি তাহা দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন, "একি ?"

"কাল গরম তেল প'ড়ে পুড়ে গেছে।"

বসু মহাশয় আবার কাঁদিয়া উঠিলেন ; বলিলেন,

"কে কবে এমন কচি মেয়েকে এমন ক'রে রাঁধায় ?"

"বাবা, আমার তো বেশী লাগেনি!" বসু মহাশয় বালিসে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ; মাধুরী কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "বাবা খাও, রাত হ'লে তোমার কষ্ট হবে।"

কিছুক্ষণ পরে বসু মহাশয় কতক স্থির হইয়া দুগ্ধ পান করিলেন। মাধুরী পিতাকে জল খাওয়াইল, তাঁহার মুখ ধোয়াইয়া দিল, তৎপরে পার্শ্বে বসিয়া বাতাস দিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া বসু মহাশয় কহিলেন ;

মাধুরী আমি আর বেশী দিন বাঁচ্‌ব না।"

মাধুরী কাঁদিয়া পিতার গলা জড়াইয়া বলিল, "বাবা, বাবা, আবার সেই কথা! আমায় কোথায় কার কাছে রেখে যাবে ?"

কিয়ৎক্ষণ আবার নীরবে থাকিয়া—বসু মহাশয় ধীরে ধীরে বলিলেন, "দয়াময়ী মা, বালিকা থাকিল,—একে দেখিও।"

এই সময় বিকট হাস্যে চারিদিক আলোড়িত হইল। পিতা ও কন্যা উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিলেন। মাধুরী দেখিল,—তাহার পাগলিনী মা উচ্চ হাস্য করিতে করিতে আসিতেছেন, ঘরের ভিতর আসিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "লল্‌তে ছোঁড়ার ফাঁসি হয়ে গেল। ছোঁড়া নেহাত ছেলে মানুষ।"

মাধুরী ছুটিয়া মায়ের নিকট গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, তখন তিনি হাসিতে হাসিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

১১

ইহার পর আবার এক মাস কাটিয়া গেল। এক দিন সকাল বেলা চারু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাধুরী,—এখনও নাইতে যাও নি ?"

মাধুরী বলিল, "এই যাই।"

"তোমার বাবা আজ কেমন আছেন?"

"বাবা,—সেই রকমই আছেন।"

"তোমার নোলক কি হ'ল?"

মাধুরী একটু কি ভাবিল; তার পর বলিল' "সে আর নেই, সে দিন সেটা বামুন পিসিকে দিয়ে এক টাকা এনেছি।"

"তুমি একে একে তোমার সমস্ত গহনা গুলি বেচিলে; শেষ নোলকটী ছিল, তাহাও দেখিতেছি বেচিয়াছ। আমায় বলিলে না কেন? আমি তোমাকে সেটার জন্য অন্ততঃ দশ টাকা দিতাম। কিম্বা কোন খানে বেচিয়া আনিয়া দিতাম। ২০ টাকার জিনিষ তুমি একটাকায় বেচ; আর বেচই বা কেন? আমি তোমাকে এত করে ব'লচি, আমার কাছে গোটাকতক টাকা ধার ক'রেই নাও না। মাধুরী তুমি আমায় পর ভাব?" মাধুরী একটু ভাবিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "বাবা বলেছিলেন ধার কর্ত্তে নেই।"

"খুব দরকার প'ড়লে ক'ল্লে ক্ষতি কি?"

"খুব দরকার তো এখনও পড়েনি;—আর গহনা রেখে কি হবে? বাবা কষ্ট পাবেন, মা খেতে পাবেন না, আর আমার গহনা থেকে কি হবে? গহনা থাকিতে ধার করিব কেন?"

"আজ কি রাঁধিবে?"

এবার মাধুরীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল। দিবারাত্রি খাটিয়া খাটিয়া তাহার আর সে রূপ নাই, তাহার রং কাল হইয়া গিয়াছে, তাহার চুলে তেল না পড়ায় এক্ষণে জটা হইয়া তাহার স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে গড়াইয়া পড়িতেছে; তাহার মুখে সে হাসি নাই, তাহার পরিবর্ত্তে তথায় এক দুঃখের ছায়া পড়িয়াছে। "কি রাঁধিবে?" জিজ্ঞাসা করায় মাধুরী চক্ষের জল রাখিতে পারিল না; আজ তাহার রাঁধিবার কিছুই ছিল না। তাহার কষ্টের জন্য সে ভাবিত না। আহারের জন্য পিতা মাতার যে কষ্ট হইতেছে ও হইবে, এই জন্যই সে ব্যাকুলা। মাধুরী আজিকার অবস্থাও চারুকে বলিল না; একটু ভাবিয়া বলিল, "বাবা আজ ডুমুরের ঝোল খেতে চেয়েছেন, তাই রাঁধিব।"

"আচ্ছা, তুমি নাইতে যাও, আমি ডুমুর আনিতেছি।"

পরের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করা মাধুরী অন্যায় ভাবিল, কিন্তু চারুকে

মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও পারিল না। সে মুখ তুলিল, তাহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয় এক মুহূর্ত্তের জন্য চারুর চখে পড়িল; চারু দেখিলেন সে চোক জলে পূর্ণ।

স্নান করিয়া মাধুরী বাড়ী আসিল। আসিয়া দেখিল,—তাহাদের বাড়ীর দ্বারে চারু বসিয়া আছেন; তাঁহার পার্শ্বে চ্যাঙ্গারিতে চাল, ডাল, লবণ, তৈল, ঘৃত ইত্যাদি অনেক দ্রব্য। সে সেই সকল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিল; চারু বলিলেন "মাধুরী। কয়মাস আর আমি তোমাদের এখানে খাই নাই তোমাদের তেমন সময় নাই বলিয়া খাইতাম না। কিন্তু জানই তো, আমার খাবার জায়গা নাই, খাবার জন্য বড় কষ্ট পাচ্ছি।

"তা খাও নাই কেন? এখন থেকে খেও।"

"তুমি বোধ হয় জান না,—জমিদারের বাড়ী আমার ১০৲ টাকা মাহিনার একটা চাকুরী হয়েছে। আজ মাহিনা পাইয়াছি; তাই এ সব কিনে নিয়ে এসেছি, মাধুরী এতে কিছু মনে কর না,—আমি কি তোমাদের পর? তুমি যদি এগুলি নিতে অমত কর, তবে আমি জানিব তুমি আমায় পর ভাব। যদি আমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা থাকে :—"

মাধুরীর চক্ষে জল আসিল, সে তাহা রাখিতে পারিল না, জল গড়াইয়া গালে পড়িল, সে অঞ্চলে চক্ষুজল মুছিয়া বলিল, "আমি আমার জন্য ভাবিনে;—মার বড় কষ্ট হয়, বাবা;—" মাধুরী কাঁদিয়া ফেলিল। তখন চারু তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নিকটে আনিলেন; তাহার চক্ষুজল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমি থাকৃতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না;—ললিত নেই, আমি তো আছি। তোমার বাবার খেয়ে আমি মানুষ বলিলে হয়, তিনি কি আমারও বাবা নন? ভয় কি? আমি দশ টাকা পাচ্ছি, তাতেই আমাদের এক রকম চ'লবে। তবু আমাকে এতদিন কিছু বল নাই, কত জিজ্ঞাসা ক'রেছি তবুও বলনি; তা হ'লে আমি এতদিন কিছু করিতে পারিতাম।" এই বলিয়া চারু মাধুরীকে নিকটে বসাইলেন, তাহার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন থেকে আমায় সব কথা বল্‌বে? বল,—বল্‌বো।" মাধুরী ঘাড় নাড়িল, চারু তাহা শুনিলেন না; তখন বলিল, "বল্‌বো।"

"বেলা হয়েছে যাও রাঁধগে।" সে তখন ধীরে ধীরে কহিল,—আমারও একটা চাকরী হয়,—তা হলে আরও কিছু পাওয়া যায়। আমাকে কেহ রেখে ২।৩৲ টাকা দেয় না? আমি তাদের সব কাজ কর্ম্ম করবো। তা হ'লে তুমি দশ টাকা পাচ্ছো, আমি যদি তিন টাকা পাই,—আর রাত্রে আমি মাসে দু'টাকার

সুতো কাটতে পারবো,—তা হলে আমাদের ১৫ টাকা হবে ; তা হলে আর আমাদের কোন কষ্ট হবে না। আমাকে কেউ রাখে না ?"

বালিকার বালসুলভ হিসাব, আশা ও ইচ্ছা দেখিয়া চারু চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—কিন্তু তাহা তিনি মাধুরীকে দেখিতে দিলেন না। বলিলেন "আচ্ছা —দেখি।"

১২

মাধুরী কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া এক মনে সূতা কটিতে ছিল। সেই সময় চারু আসিয়া সেই স্থানে বসিলেন ; বলিলেন,—"মাধুরী একটা শুভ সংবাদ আছে।" মাধুরী দুই হস্তে মস্তকের জটা, মুখ ও ঘাড় হইতে সরাইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "কি ?"

"আমার মাহিনা বেড়েছে।"

"এঁ্যা, কবে ?—আমায় এতদিন বলনি কেন ?"

"কেবল আজ বেড়েছে।"

"জমিদারকে সকলে যত খারাপ বলে, তিনি তবে তত খারাপ লোক নন।"

"তিনি ঠিক সেই রকম বা তার চেয়েও বেশী খারাপ লোক ; কিন্তু সেই জমিদার আর নাই। তুমি কি কিছু শুননি ?"

"না।"

"আগেকার জমিদারের ছেলে সুরেশ বাবু ফিরে এসেছেন। তিনি মরেন নাই ; তাঁর মা ছিল না, এক বুড়ী অনেক কালের ঝিই তাঁকে মানুষ করে। যখন সুরেন্দ্রের বাপ মরিলেন, তখন জমিদারি রত্নেশ্বরের হাতে আসিল, তখন কোন গতিকে সেই ঝি জানিতে পারিল যে, রত্নেশ্বর জমিদারীর লোভে সুরেন্দ্রকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করিতেছে। এই জান্তে পেরেই সেই ছেলেকে নিয়ে সে এক দিন রাত্রে বাড়ী ছেড়ে পলায়। পর দিন ছেলে পাওয়া যায় না, রত্নেশ্বর রটাইল সুরেন্দ্র মরিয়াছে ; সেই পর্য্যন্ত রত্নেশ্বরই জমিদার।"

"তারপর ?"

"তারপরে—বুড়ী সেই ছেলে নিয়ে তার এক বোনের বাড়ী গিয়ে থাকে। সেখানে সুরেন্দ্র ক্রমে ১৮ বৎসরের হন—বুড় ঝি তাঁকে তার সাধ্য মত লেখা পড়া শিখায়,—সুরেন্দ্র নাকি বড় ভাল ছেলে,— নিজের যত্নেই তিনি নাকি অনেক শিখিলেন। তাঁর ১৮ বৎসর বয়সের সময় বুড় ঝির বড় ব্যাম হল,—তখন সে সুরেন্দ্রকে তার সকল কথা খুলে বল্লে। তারপর সেই মৃত্যু শয্যায় তাঁকে

প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল যে, যেমন করে হয় সুরেন্দ্র আনন্দনগরে গিয়া নিজ জমিদারী গ্রহণ করবে। বুড় ঝি মরবার পর সুরেন্দ্র নাকি এই গ্রামে এসে লুকাইয়া থাকিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি নাকি তাঁহার পিতার সময়ের লোকদিগের সহিত গোপনে দেখা করিতে লাগিলেন? সকলেই তাঁহাকে চিনিতে পারিল।—রত্নেশ্বরকে কেহই দেখিতে পারিত না, এক্ষণে সুরেন্দ্রকে পাইয়া তাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হল। এই রকমে প্রায় ২।৩ বৎসর ধরে সুরেন্দ্র নিজের পুরাতন চাকরদের সঙ্গে দেখা ক'রে ক'রে সকলকে হাত কল্লেন; তারপর একদিন দুপ্রহর রাত্রে প্রায় এক শ লোক নিয়ে নিঃশব্দে জমিদার বাড়ী গেলেন। রত্নেশ্বর ঘুমাইতেছিল। সে তখন আর উপায় নাই দেখিয়া জমিদারী ছাড়িয়া দিতে রাজি হইল। সে যখন দেখিল যে তারই লোক সকল তার দিকে নাই, তখন সে হতাশ হয়ে সেই রাত্রেই লিখিয়া দিল যে তুমিই সুরেন্দ্র;—এক্ষণে তুমি আসিয়াছ, তোমার জমিদারী তুমি লও। সুরেন্দ্র তাঁহাকে আর কোন দণ্ড দিলেন না, বরং টাকা কড়ি দিয়ে কাশী পাঠিয়ে দিলেন। পরশু রত্নেশ্বর কাশী গেছে, পরশু থেকে সুরেন্দ্র বাবু জমিদার হয়েছেন।

"তারপর?"

"তারপর তিনি আমাকে দেখে বল্লেন, তোমার আজ থেকে ৩০৲ টাকা মাহিনা হল।"

"তাঁর এখন বয়স কত?"

"এই আমার বয়সী।—আরও একটা শুভ সংবাদ আছে।"

"কি?"

"তিনি এর আগেই বে ক'রেছিলেন; এখন তাঁর স্ত্রীকে লেখা পড়া শিখাবার জন্ম তিনি একজন লোক খুজিতেছেন। আমি তোমার কথা বলায়, তিনি তোমাকে রাখতে সম্মত হ'য়েছেন।—তোমাকে তিনি দশ টাকা মাহিনা দিবেন; তাঁর স্ত্রীকে পড়াতে পারবে?"

"তিনি একেবারে লেখা পড়া জানেন না?"

"না।"

"যা জানি তাই তাঁকে শিখাব।"

"তবে তুমি রাজি আছ?"

"তা আর জিজ্ঞাসা কচ্ছো কেন?"

এই সময়ে ঘরের ভিতরে কে ডাকিল, "মাধুরী!" মাধুরী সত্বর উঠিয়া বলিল। "বাবা ডাক্‌চেন—যাই—বাবাকে সব বল্‌বো?"

"বলো—তাতে ক্ষতি কি?"

১৩

পর দিবস দুই প্রহরের সময় পাল্কী লইয়া চারু মাধুরীদিগের বাটী উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমে করুণা বাবুর নিকট গেলেন; তিনি বলিলেন, "মাধুরীর কাছে সকল শুনিয়াছি, তুমি যা ভাল বিবেচনা কর,—কর। তখন চারু তাহার নিকটে গেলেন;—"বলিলেন চল পাল্কি এসেছে,—আজ থেকেই জমিদার বাড়ী তোমার কাজ হ'ল।" মাধুরী সত্বর একখানি পরিস্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া বাহির হইয়া আসিল। সে পাল্কিতে উঠিতেছিল, চারু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "একটা কথা বলি শোন।" মাধুরী আসিল, চারু তাহাকে এক পার্শ্বে লইয়া যাইয়া বলিলেন, "একটা কথা বলিব,—ব্যস্ত বা অধীর হইলেও যেন তাহার বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল, সে কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। তখন চারু বলিলেন, "তোমার দাদা মরেন নি। তিনি খালাস হ'য়েছেন। তিনি,—ওকি?" মাধুরী এমন ব্যাকুল ভাবে চারুর দিকে চাহিল সে চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি?—তুমি যদি এরূপ কর তবে এ কথা তোমার বাবাকে কে বলিবে? তাঁহাকে যদি হঠাৎ বলা হয়, তবে তাঁর হয় তো ব্যাম বাড়িতে পারে!"

"দাদা কি এসেছেন?"

"হাঁ।"

"কোথা?"

"দেখা পাবে এখন, তিনি আসবেন।—এখন চল।" তখন ধীরে ধীরে মাধুরী পাল্কিতে চড়িল,—সঙ্গে সঙ্গে চারু চলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে পাল্কি জমিদার বাড়ীর বৃহৎ দ্বারে পৌছিল। দ্বারবানগণ উঠিয়া দাঁড়াইল, দাস দাসীগণ সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, চারু আসিয়া মাধুরীর হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইলেন। তখন তিনি সেইরূপ হাত ধরিয়া মাধুরীকে লইয়া সুন্দর সোপানাবলী দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। দেখিয়া শুনিয়া মাধুরীর মাথা ঘুরিতেছি, সে যে চারুর হাত ধরিয়া যাইতেছে তাহা জানিতে পারে নাই, নতুবা সে কখনই এত লোকের সম্মুখ দিয়া চারুর হাত ধরিয়া যাইত না। তথায় বিস্তর লোক সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চারু মাধুরীর হাত ধরিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। মাধুরী মস্তক অবনত করিয়াছিল, সে চারি দিকের কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। অবশেষে চারু বলিলেন, "ইনিই আজ থেকে তোমাদের জমিদার!" তাহার পর মাধুরীর মুখ দক্ষিণ হস্তে তুলিয়া বলিলেন, মাধুরী এ সকলই তোমার। আমিই অভাগা সুরেন্দ্রনাথ। তুমি

সুরেন্দ্রকে না খাওয়াইলে, না যত্ন করিলে, গর্ত্তের ভিতরে গিয়া তাহার মুখে জল না দিলে, সে এতদিন অনেক কাল মরিয়া যাইত। এই সবই তোমার।—আগে তোমাকে সকল কথা বলি নাই বলিয়া ক্ষমা করিও; এখন এস।"—কলের পুত্তলির ন্যায় মাধুরী চলিল।

তখন চারু,—এখন আমাদের চারুকে সুরেন্দ্র বলাই উচিত,—পার্শ্বস্থ একটা দরজা খুলিয়া বলিলেন, "যাও, ঐ ঘরে একজন লোক তোমার অপেক্ষা ক'চ্চেন।" মাধুরী মস্তক তুলিল, দেখিল সম্মুখে একখানি কোচের উপর বসিয়া,—ললিত।

তখন সে ছুটিয়া গিয়া দাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদা—দাদা,—এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?"

তখন ভাই বোনে চক্ষের জলে পরস্পরের হৃদয় ভাসাইয়া দিল।

১৪

ললিত যদিও আপনাকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যুবককে হত্যাও করেন নাই; যুবক নিজেই আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। ললিত তাঁহার সঙ্গে শয়ন করেন, তিনি আত্মহত্যা করিলে লোকে হয় তো ললিতকে সন্দেহ করিতে পারে, হয় তো তিনি বিপদে পড়িতেও পারেন, এই ভাবিয়া যুবক তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বদিবস নিম্নলিখিত পত্রখানি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট ডাকে প্রেরণ করেন।

"মহাত্মন্,

আমি যে কারণেই হউক আমার স্ত্রীকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছিলাম,—কিন্তু আপনাদের আশ্চর্য্য বিচারে আমার ফাঁসি হইল না, আমি দ্বীপান্তরে আসিলাম। কিন্তু স্ত্রীহত্যা করিয়া আর আমার জীবনের আশা নাই; তাই আমি স্ব ইচ্ছায় আত্মহত্যা করিতেছি। ললিতকুমার বসু নামক কয়েদী আমার সঙ্গে থাকেন ও শয়ন করেন; পাছে কেহ তাঁহাকে সন্দেহ করে এই জন্য এ পত্র আপনাকে লিখিলাম। আমাকে কেহ খুন করে নাই,—আমি স্ব ইচ্ছায় আত্মহত্যা করিলাম, নিবেদন ইতি।

আপনার অনুগত দাস

বসন্তকুমার দত্ত।

আণ্ডামান হইতে ডাক লইয়া জাহাজ ১৫ দিবস অন্তর কলিকাতায় আইসে। এই জন্য ললিতের ফাঁসির অনুমতি প্রার্থনা পত্র ও যুবকের পত্র একই জাহাজে এক সঙ্গে কলিকাতায় চলিল। ফাঁসির অনুমতি পত্র,—দরকারী পত্র, সুতরাং তাহাই অগ্রে খুলা হইল।—যথা নিয়মে ও যথা সময়ে ললিতের ফাঁসির হুকুম

বাহাল রহিল, এবং সে অনুমতি পত্র সেই দিনকার জাহাজেই আণ্ডামানে চলিল। যুবকের পত্র প্রধান বিচারক মহাশয় খুলিলেন না, তত প্রয়োজনীয় পত্র নহে বিবেচনা করিয়া বাক্সে রাখিয়া দিলেন। বাক্সসহ পত্র তাঁহার বাটী গেল,—তথায় রাত্রে জজ সাহেব পত্র পড়িয়া অবাক। তৎক্ষণাৎ তিনি ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলেন যে "এই পত্র আপনাকে পাঠাই, যদি পত্র মৃতব্যক্তির যথার্থই হয়, তবে ললিতকুমারের ফাঁসি বন্ধ রাখিবেন। পরে বিশেষ পত্র যাইতেছে।" আণ্ডামানের শাসন কর্ত্তাকে এই পত্র লিখিয়া জজসাহেব তৎক্ষণাৎ জাহাজে লোক পাঠাইলেন। লোক আসিয়া সংবাদ দিল, "জাহাজ চলিয়া গিয়াছে।" তখন জজ সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; বলিলেন, "সেখানে টেলিগ্রাফও নাই!" তৎপরে চাকরকে পত্র ডাকে দিয়া আসিতে আজ্ঞা করিলেন।

ললিতের সৌভাগ্যক্রমে অণ্ডামান দ্বীপের গভর্ণর সে সময়ে পীড়িত ছিলেন সুতরাং অনুমতি সত্বেও ললিতের ফাঁসি হইতে বিলম্ব হইল। এইরূপে প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল। যে দিন ললিতের ফাঁসির দিন, সেই দিন রাত্রে জজের পত্র আসিল;—অতি প্রত্যুষে গভর্ণর সাহেব সে পত্র পাইলেন, অমনি একজন অশ্বারোহীকে ফাঁসি বন্ধ রাখিবার জন্য পাঠাইলেন। অশ্বারোহী আসিল, ফাঁসি স্থগিত থাকিল, ললিত আবার কারাগারে আসিলেন।

দুই মাস পরে কলিকাতা হইতে ললিতের খালাসের পত্র আসিল;—তখন তিনি স্বদেশের দিকে চলিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথমে সুবোধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন,—যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি দুঃখিত হইলেন। সুবোধ বৎসরাবধি পীড়িত হইয়া শয্যাগত, তাহাকে দেখিলে আর চিনিতে পারা যায় না। তিনি এমনি হইয়াছেন যে ললিত দেখা করিতে গেলে, তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন না।

তখন ললিত নিজের বাড়ীর দিকে চলিলেন। দূর হইতে নিজগ্রাম,—দূর হইতে নিজ ক্ষুদ্র বাড়ী দেখিয়া ললিতের মনে কি হইয়াছিল, তাহা ললিতই জানেন, অন্য কেহ তাহা বুঝিতে পারিবে না।

গ্রামে প্রবেশ করিতে এক জন পশ্চাৎ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বলিল, "তুমি ভূত, না জ্যেন্ত মানুষ?" ললিত ফিরিয়া দেখিলেন,—চারুচন্দ্র। তখন ললিত ও চারু সেই খানে এক বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া অনেক কথা কহিলেন। প্রথমে ললিত তাঁহার খালাসের বিবরণ বলিলেন; তাহার পর চারুও নিজের কোন কথা গোপন করিলেন না। তিনি কেমন করিয়া জমিদারী পাইয়াছেন,

তাহাও বলিলেন। তাহার পর বলিলেন, "এখনও মাধুরী এ সব জানে না; তাকে বলি নাই, কারণ আছে।" ললিত কহিলেন, "বাবার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।" কিন্তু চারু বলিলেন, "হঠাৎ দেখা কল্লে ভালর পরিবর্ত্তে মন্দ হ'তে পারে; দিন কত অপেক্ষা কর।" তখন দুইজনে গ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন; ললিত লুক্কাইত ভাবে জমিদার বাড়ী বাস করিতে লাগিলেন।

তাহার পর ক্রমে সকল কথা বসু মহাশয়কে জানান হইল; একদিন ললিত আসিয়া পিতার চরণ-ধূলী মস্তকে লইলেন। পরে মার কাছে গেলেন,—পাগলিনী মা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ললিত নিকটে গেলে, "আমাকে ছুঁস্‌নে, আমাকে ছুঁস্‌নে," বলিয়া চীৎকার করিয়া ছুটীয়া পলাইলেন। ললিত কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া আসিয়া চারুর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া বলিলেন, "ভাই, কি হবে?"

"ভয় কি ভাই, যিনি এত ক'ল্লেন, তিনিই সব ক'রবেন।"

চিকিৎসার জন্য জনক জননীকে লইয়া মাধুরী ও চারুর সহিত তিনি কলিকাতায় আসিলেন।

তাহার পর কি হইল? তার পর আমরা এই পর্য্যন্ত জানি, যে করুণা বাবু ভাল হইয়াছিলেন। ললিতের মাতা মাধুরীকে সাজাইয়া গোজাইয়া চারুর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। ললিত ও সুবোধ দুই জনে পিঁড়ি ধরিয়া মাধুরীকে লইয়া বিবহ স্থলে বসাইয়াছিলেন।

কাহার সঙ্গে মাধুরীর বিবাহ হইল? লোকে বলে চারুর সঙ্গে,—আমরা জানি তাহা নয়। মাধুরীর বিবাহ হইয়াছিল,—আনন্দ নগরের জমিদার,—রায় সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সঙ্গে।

সম্পূর্ণ।

পরিণাম।

১

লক্ষ্মীপুরের জমিদার পুত্র সুবোধচন্দ্র, বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় কোন পাদরী পরিচালিত কলেজে যখন এম-এ পড়িতেছিল, সেই সময় একদিন সংবাদ পত্রে একটী আকস্মিক সংবাদ প্রচারিত হইয়া সমগ্র গ্রামবাসীকে যুগপৎ চকিত ও স্তম্ভিত করিয়া তুলিল।

বৈষ্ণব বংশোদ্ভব কায়স্থ জমীদার, পরম নিষ্ঠাবান তারিণচরণ ঘোষের শিক্ষিত পুত্র সুবোধচন্দ্র যে অকস্মাৎ এরূপ হঠকারিতার কর্ম্ম করিয়া বসিবে, একথা শত্রু মিত্র কাহারও প্রথমতঃ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না! যাহার শিরায় শিরায় বংশপরম্পরাক্রমে প্রেমময় বৈষ্ণবধর্ম্মের বীজ নিহিত রহিয়াছে, যাহার শৈশব ও কৈশোরের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানের পূতপরিবেষ্টনের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার সহসা কুলাগত চিরাচরিত ধর্ম্মাচরণ, অবর্ব্বাচীনের ন্যায় এইরূপে হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবাক্য অতিক্রম পূর্ব্বক 'ভয়াবহ পরধর্ম্মের' অনির্দ্দিষ্ট আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ, প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লইতে গ্রামবাসীগণের কিছু সময় অতিবাহিত হইয়া গেল।

ইহার পর আর কোনও সন্দেহ রহিল না যে, সুবোধ চন্দ্র 'অন্তিমকালে ভব-সিন্ধু পারের, লুব্ধ আশায়, যীশুখ্রীষ্ট-পরিচালিত তরণীর শরণাপন্ন হইয়াছে এবং জন্মদাতা পিতা তরণীচরণের পরিবর্ত্তে, অজ্ঞাত কুলশীল পৃথিবীর অপর প্রান্ত-বাসী পাদ্রী ব্ল্যাকী, তাহার 'ধর্ম্মপিতা' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তারিণীচরণ, সংবাদ পাইবামাত্র অবিলম্বে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। মেসে সুবোধচন্দ্রের নির্দ্দিষ্ট কুলুপ বন্ধ কক্ষের নিকট আসিয়া জানিলেন, সুবোধচন্দ্র কয়েকমাস অবধি অত্যল্প কালমাত্র তথায় অবস্থান করিত এবং আজ চারি পাঁচ দিন অবধি একবারেই সে মেসে পদার্পণ করে নাই।

প্রৌঢ় তারিণীচরণ, তথনও হৃদয়ে বল বান্ধিয়া আহ্নিকাদি সমাপনান্তে, সুবোধচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইবার আশায় কলেজ অভিমুখে ছুটিলেন। কলেজের দ্বারবান, বৈষ্ণব তারিণীচরণের তিলকাঙ্কিত অঙ্গ দেখিয়া, তাঁহার প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যব-হারের পরিবর্ত্তে কর্কশ বাক্যবর্ষণ দ্বারা বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিল। বহু অনুনয় বিনয়ের পর, দ্বারবানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবের নিকট যখন শুনিলেন যে সত্য সত্যই তাঁহার পুত্র সুবোধচন্দ্র, স্ব ইচ্ছায় পবিত্র খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছে এবং সম্প্রতি তাঁহার মত সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকা ছাপ-লাঞ্ছিত, অর্দ্ধনগ্ন দেহ বিশিষ্ট ঘনান্ধকারে পতিত পৌত্তলিক জীবের সহিত সাক্ষাতের কোনরূপ আশা নাই, তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া হতবুদ্ধির মত একেবারে বসিয়া পড়িলেন।

তারিণীচরণের পলকহীন দৃষ্টি ও ব্যাকুবদন দেখিয়া কলেজের ছাত্রবৃন্দ, তাহার আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করিয়া জনতা সহকারে বেষ্টন পূর্ব্বক প্রশ্নের পর প্রশ্ন দ্বারা অস্থির করিয়া ফেলিল। সে সময় তারিণীচরণের জ্ঞান বুদ্ধি স্থানচ্যুত হইয়া

কোথায় কোন দূরে ছুটিয়া গিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। শূন্য মনে, করুণ দৃষ্টে ছাত্র বৃন্দের প্রতি নিরিক্ষণ করিয়া, কিছুক্ষণ পরে শিরে করাঘাত করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

গর্ব্বোদ্ধত যৌবনোন্মত্ত ছাত্রবৃন্দের, গভীরভাবে নিমগ্ন, সন্তপ্ত জনকের মর্ম্ম ব্যথা অনুভব করিবার শক্তি বা অবসর কোথায়? নিত্য উল্লসিত-প্রাণ যুবক বৃন্দের স্ফুর্ত্তিপূর্ণ হৃদয়ে সমবেদনার পুণ্যরেখা অঙ্কিত হইতে না হইতেই ক্ষণেই তাহা বিলীন হইয়া গেল।

২

ললসা-পূর্ণ প্রমত্ত-যৌবনের স্বপ্নময় দিনগুলি অতিবাহিত করিয়া তারিণীচরণ যখন প্রৌঢ়সীমায় পদক্ষেপের জন্য অগ্রসর, সেই সময় তাঁহার সুখের হাট ভাঙ্গিয়া গেল—তাঁহার পতিরতা ভার্য্যা, তিনটী অপোগণ্ড শিশু-সন্তান রাখিয়া সংসারের মায়া বন্ধন ছিন্ন করতঃ চলিয়া গেলেন।

অশৌচান্ত হইবার পূর্ব্বেই কত স্বার্থপর বন্ধু, পুনরায় দারপরিগ্রহের পরামর্শ দিয়া অর্থলাভের সুখময় কল্পনা করিতে লাগিল; কত অনূঢ়া বয়স্থা কন্যার পিতা নিঃস্বার্থতার ভাণ করিয়া তাঁহার বিচ্ছিন্ন সংসার পুনঃ সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তারিণীচরণের বয়স, বংশমর্য্যাদা ও বিপুল বিষয় সম্পদে, এই কয় দিন তাঁহার পক্ষে বিষম যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিল—দলে দলে কন্যাদায় গ্রস্থ অভিভাবকগণ তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

তারিণীচরণ কিন্তু দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহের পরিবর্ত্তে পতিগতপ্রাণা সহধর্ম্মিনীর সুখময় পুণ্য-স্মৃতি অনুলেপনে দগ্ধ হৃদয় শীতল করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যে পত্নী, জীবন যাত্রার প্রারম্ভ হইতে নিত্য সঙ্গিনীরূপে সুখ দুঃখে সমভাগিনী হইয়া সংসারে এতাদৃশ ক্রমোন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি ভিন্ন অপর কোন নারী এত দিনে, তাঁহাদের সেই যুগ্ম-চেষ্টায় প্রতিষ্টিত সংসারে অধিষ্ঠাত্রিরূপে বিরাজ করিবে, এ কল্পনা তিনি তিলার্দ্ধের জন্যও মনে স্থান দিলেন না। পত্নী-স্মৃতির পুণ্য-প্রভাবে তাঁহার শূন্য হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পিতার যত্ন ও আদর, অমৃতময় মাতৃস্নেহের দ্বারা পরিপুষ্ট হওয়ায় তাঁহার অন্তরে অপর কোন প্রবৃত্তির লীলা করিবার স্থান রহিল না। বর্দ্ধিত স্নেহে এবং অত্যধিক আদর ও যত্নে পুত্রগণের লালন পালন ভার একক গ্রহণ করিয়া তিনি যখন অনন্য মনে ধর্ম্মাচরণে দিনপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কন্যাদায়গ্রস্থ অভিভাবকগণ নিতান্ত হতাশ হৃদয়ে একে একে অন্তর্ধান হইল।

তারিণীচরণের পুত্রত্রয় এখন তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইলেও, তিনি প্রকাশ্যে তাহাদিগকে অত্যধিক আদর ও যত্ন দ্বারা কোন গর্হিত আচরণের প্রশ্রয় দান করেন নাই। সুতরাং মাতৃহীন শিশুর স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য ও চপলতা তাহারা কোন কালেই প্রকাশ করিয়া গৃহস্থ কাহারও বা প্রতিবেশীগণের বিরক্তি উৎপাদন করে নাই।

পিতৃ শাসনের গুণে তাহারা অসৎসঙ্গ বা দুষ্ট সংশ্রব একেবারে পরিহার করিয়া বিদ্যা শিক্ষায় দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। এবং দেখিতে দেখিতে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতার বৈষয়িক কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কনিষ্ঠ পুত্র সুবোধচন্দ্র, সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও মেধাবী। তারিণীচরণ, তিন পুত্রকে সমচক্ষে দেখিবার চেষ্টা করিলেও সুবোধচন্দ্রের প্রতি তাঁহার পক্ষ পাতিত্ব অলক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। এ দোষ কি তাঁহার একক? প্রতিবেশী মাত্রেই সুবোধচন্দ্রের মিষ্ট ব্যবহার, অধ্যয়নে একগ্রতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দর্শনে স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে সুবোধচন্দ্র প্রত্যেকের হৃদয়ে তাহার ভবিষ্য-জীবনের সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া ছিল। সুবোধচন্দ্র প্রতিভাবলে স্বীয় বংশ ও দেশ সমধিক গৌরবান্বিত করিবে—সকলেই মনে মনে এ আকাঙ্খার সুখময় কল্পনা করিতে দ্বিধা বোধ করিত না।

তারিনীচরণের গৃহে 'বার মাসে তের পার্ব্বণ।' তিনি নিজে অতিশয় ধর্ম্ম-প্রাণ —সুতরাং, কুলদেবতাগণের পূজা অনুষ্ঠানাদি যথাযোগ্য সমারোহ সহকারে সুসম্পন্ন হইত। প্রত্যুত, হিন্দু ধর্ম্মানুষ্ঠানের এই সকল ব্যাপারে, বিপত্নীক তারিনীচরণের প্রতিকার্য্যে সমাধিক একাগ্রতা ও একনিষ্ঠ ভাব পরিব্যক্ত হইয়া তাঁহার যাবতীয় আচরণ অপূর্ব্ব মহিমা মণ্ডিত হইয়া উঠিত। অধ্যয়ন রত সুবোধ চন্দ্র, এই সকল ব্যাপারে প্রবিষ্ট হইবার অধিকারে আপাততঃ বঞ্চিত রহিলেও, তাহার হৃদয় মধ্যে অলক্ষ্যে ধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইয়া অঙ্কুরিত হইবার সময় ও সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল।

তারিনীচরণ, সুবোধ চন্দ্রের অধ্যয়ন প্রতি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেও তাহার পরিবর্দ্ধমান বুভুক্ষু চিত্ত বৃত্তির বর্দ্ধিষ্ণু ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে তাদৃশ মনোযোগী হন নাই, কি জানি, বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলে অধ্যয়নের ক্ষতি হয়, এই অমূলক আশঙ্কায় তিনি সুবোধচন্দ্রকে হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন ব্যাপারেরই আলোচনা করিতে অবসর প্রদান করেন নাই।

এ দিকে কিন্তু সুবোধ চন্দ্রের মনে যখন ধর্ম্ম ভাব প্রবুদ্ধ হইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল, যখন তাহার হৃদয়ের বৃত্তিনিচয় স্ফুটতর হইয়া প্রেম ও ভালবাসার মুগ্ধ মধুর তাড়নায় দিনে দিনে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় নিরাশ্রয় যুবক সুবোধচন্দ্র, নিমজ্জমান ব্যক্তির ক্ষীণতম তৃণাশ্রয়ের ন্যায় সম্মুখে যাহা পাইল, তাহারই প্রতি অযথা আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

সুবোধচন্দ্রের কলেজে, নির্দ্দিষ্ট অতিরিক্ত সময়ে প্রত্যহই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইত। সুবোধচন্দ্র, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম আলোচনার অধিবেশনে কলেজ-জীবনের বিগত চারি বৎসর মধ্যে একদিনও উপস্থিত ছিল না। এখন তাহার ধর্ম্মের স্পৃহা বলবতী হওয়ায় কৌতূহল নিবৃত্তি জন্য দুই একদিন করিয়া এই অধিবেশনে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। দুই চারি দিনে কোন ধর্ম্মের গূঢ়-রহস্য বোধগম্য করা অসম্ভব—তাই সুবোধচন্দ্র, বাঙ্গালী খ্রীষ্টান অধ্যাপকের উৎসাহপূর্ণ অনর্গল ইংরাজী বক্তৃতার মোহে আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ক কতকগুলি সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তাঁহার বাসায় যাতায়াত আরম্ভ করিল।

তথায় অধ্যাপকের সপ্তদশ বর্ষীয়া সুশিক্ষিতা, বিধবা বিদ্যা-নিপুণা, হাব-ভাব কুশলা, রূপবতী উদ্ভিন্ন-যৌবনা কন্যার ভদ্রব্যবহারে সুবোধচন্দ্র অতিশয় প্রলুব্ধ হইয়া পড়িল—সুতরাং তাহার যাতায়াতের মাত্রাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অধ্যাপক মহাশয়, সুশ্রী ও সম্পন্ন, শিক্ষিত যুবককে কবলস্থ করিয়া কন্যাদায় হইতে নিস্কৃতি পাইবার আশায়, ইহাদের বিশ্রম্ভালাপে বাধা না দিয়া উত্তরোত্তর প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন।

যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার যুবতী তনয়ার প্রেমে যুবক সুবোধ চন্দ্র, নিরাশ্রয় ভাবে নিমগ্ন হইয়াছে—তাহার আর মুক্ত হইয়া পলাইবার আশা নাই, তখন তিনি সুবোধচন্দ্রের সহিত তাঁহার তনয়ার বিশ্রম্ভালাপ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং সুবোধচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সে যদি অচিরে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবেই তাহার তনয়ার সহিত সাক্ষাৎ হবে, এমন কি অচিরে পরিণয় পর্য্যন্ত সম্ভব,—অন্যথা তাঁহার বাটীতে তাহার প্রবেশ নিষেধ। অধ্যাপকের একমাত্র কন্যা। তিনি সুবোধচন্দ্রের মত পাত্র পাইলে তাহার বিলাতে শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়-ভার বহন করিতেও প্রস্তুত—এ কথাও সুবোধচন্দ্রের ইতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের সৌকর্য্যার্থে কহিয়া দিতে বিস্মৃত হইলেন না।

এত লোভে, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া আত্ম সম্বরণ করা সহজ নহে। ধর্ম্মের ক্ষুধা ও প্রেমের পিপাসা যুগপৎ নিবারণ করিবার জন্য সুবোধচন্দ্র খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

লক্ষ্মীপুর গ্রামটি ক্ষুদ্র হইলেও দলাদলির প্রবল উত্তেজনায় সদাই উত্তেজিত এবং হিংসা দ্বেষাদির বিষম বিষে অতিশয় জর্জ্জরিত। ঘোষ বংশীয় জমীদারগণের দুই প্রধান শরিক দুই দলের দলপতি। তারিনীচরণের অধিনায়কত্বে, তাঁহার দলটিই সমধিক পরিপুষ্ট হইলেও, অপর পক্ষ এই সুযোগে মাথা নাড়া দিয়া বিষম গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলিতে ত্রুটি করিল না।

কুট-বুদ্ধি তারিনীচরণ, নানাবিধ জল্পনা কল্পনার পর একটি উপায় স্থির করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রথম সন্তানের অন্নাসন উপলক্ষে তিনি যাবতীয় কুটুম্ববর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া পংক্তি ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। ইতি মধ্যে, সুবোধচন্দ্রকে কোনরূপে উদ্ধার করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণের যাবতীয় ব্যাপার একবারে মিথ্যা ও দুষ্ট লোকের রটনা মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে এবং আবশ্যক হইলে, তাহার বিরুদ্ধে এই অযথা সংবাদ রটনার জন্য রীতি মত প্রায়শ্চিত্ত করিতেও কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

কিন্তু এখন তাঁহার চির পরাজিত বিপক্ষদল, সুদসহ তাহাদের চিরসঞ্চিত মনের জ্বালা মিটাইয়া লইল—তাহারা জ্ঞাতিগণের গৃহে গৃহে প্রত্যেককেই, জাতিচ্যুত পুত্রের পিতা তারিনীচরণের গৃহে পদার্পণ করিতে বিশেষ রূপে নিষেধ করিয়া দিল। দরিদ্র কুটুম্ববর্গ, অনর্থক ঝঞ্ঝাট ও দৌরাত্মের আশঙ্কায় 'মৌনই শ্রেয়ঃ কল্প' ভাবিয়া নানা অছিলায় তারিনীচরণের গৃহে অন্নাসন উৎসবে যোগদান করিল না—তাঁহার বিপুল আয়োজন পণ্ড হইয়া গেল।

ইহাতেও তারিনীচরণ ততদুর ভগ্নোদ্যম হইলেন না। তাঁহার এখনও যথেষ্ট আশা, সুবোধচন্দ্র দ্বারায় যদি তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ব্যাপার অস্বীকার করাইতে পারেন, তাহা হইলে, লব্ধ-প্রতীষ্ঠ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে অর্থবলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া যে কোন উপায়ে হউক, উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন। কিন্তু সুবোধচন্দ্রও তাঁহার সে আশায় বাদ সাধিল—মন্ত্র-মুগ্ধ ও কুহক গ্রস্ত সুবোধচন্দ্র, তারিনীচরণের অনুনয় বিনয়, তাড়না তিরস্কার কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ করিল না। আসন্ন প্রেমের লুব্ধ আশায় সে তাহার আলোক প্রাপ্তির কথা অস্বীকার করিতে কোন মতেই রাজি হইল না।

অতঃপর উপায়ান্তর না দেখিয়া তারিণীচরণ হতাশ হৃদয়ে ক্ষুণ্ণমনে এতদ্বিষয়ক সর্ব্ববিধ চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দুই পুত্র এবং স্বধর্ম্মে রহিলে সুবোধের পত্নী মনিমালিনীকে সমভাবে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি উইল করিয়া দিলেন। বিধর্ম্মী সুবোধ চন্দ্রের পৈত্রিক সূচ্যাগ্র ভূমি বা কপর্দ্দকমাত্রও প্রাপ্তির আর কোনরূপ আশা রহিল না।

সুবোধচন্দ্রের শ্বশুর সংবাদ পাইয়া প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান জন্য কলিকাতা আসিলে, অধ্যাপক মহাশয় যখন জানিতে পারিলেন যে সুবোধচন্দ্র অকৃতদার নহে, তখন তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণ ও ম্রিয়মান হইলেন এবং মনে মনে নিজকে হটকারিতার জন্য শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া সুবোধচন্দ্রের সকল আশা ভরসায় জলাঞ্জলী দিয়া তাহার তনয়ার বিবাহ অপরের সহিত দিলেন।

নব অনুরাগের মোহ আবরণ ধীরে ধীরে অপসারিত হইলে, সুবোধচন্দ্রের একক জীবন বড়ই দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিল। ভগ্নহৃদয়ে সুবোধচন্দ্র খ্রীষ্টান সমাজে প্রাণ ভরিয়া মিশিবার সুযোগ পাইল না। এদিকে অর্থাভাবে দিন দিন পীড়িত হইতে লাগিল—অগত্যা স্বল্প বেতনে কোন মিসন স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কোনমতে উদর পূর্ণের ব্যবস্থা করিতে হইল।

চিত্ত বিক্ষোভের প্রচণ্ড আলোড়নে বিধ্বস্ত সুবোধচন্দ্র, এখন একক। নিশিদিন দাহ-যন্ত্রনা অনুভব করিয়া জীবনকে ভার বোধ করিতে লাগিল।

৫

বহু বর্ষ অতীত হইয়াছে। এক দিন প্রাবৃট্ সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রান্তর মধ্যে সিক্ত বস্ত্র, কম্পিত কলেবর ঝটিকা তাড়িত একজন ভদ্রবেশী বৃদ্ধ বেহার প্রদেশের একটী ক্ষুদ্র বাঙ্গালা গৃহের দীপালোকের ক্ষীণ-রশ্মী দেখিয়া আশ্রয় জন্য সমীপস্থ হইল।

বাঙ্গালা গৃহে মাত্র দুইটি কক্ষ;—একটীর দ্বার রুদ্ধ, অপরটীর মুক্ত। শেষোক্ত কক্ষে একটি যুবতী অনুচ্চকণ্ঠে ভগবানের প্রার্থনা-মূলক সঙ্গীত গাহিতেছিল। এই দারুণ দুর্য্যোগের সময়, নির্জ্জন প্রান্তরে অতিথির আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিয়া যুবতী অভ্যাগতের সন্ধান লইবার জন্য অবিলম্বে বাহিরে আসিল এবং কক্ষ মধ্যে স্থান দান করিয়া তাহার যথাবশ্যক পরিচর্য্যা করিতে উদ্যত হইল।

বৃদ্ধ পদব্রজে তীর্থ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে অদূরবর্ত্তী ষ্টেশনে রাত্রে ট্রেন ধরিবার উদ্দেশ্যে আসিবার সময় ঝড় বৃষ্টিতে অতি মাত্রায় কাতর হইয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আর ক্রোশার্দ্ধ মাত্র পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই তিনি ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন—এখন সামান্যক্ষণ মাত্র শুষ্ক গৃহে আশ্রয় পাইয়াই বৃদ্ধ পরম কৃতার্থ হইয়াছে—তাহার অপর কোনরূপ পরিচর্য্যা গ্রহণের আবশ্যক নাই। তাই বৃদ্ধ অতি বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া যুবতীর অতিথি সেবার আগ্রহ প্রশমিত করিল।

যে কক্ষে যুবতী বসিয়া গান গাহিতেছিল, সে কক্ষটির আসবাব অতি সাধারণ ও একেবারে বাহ্যাড়ম্বর হীন। কিছুক্ষণ পর যুবতী কক্ষান্তরে চলিয়া গেলে প্রাচীর বিলম্বিত একখানি ফটো-চিত্র দেখিয়া বৃদ্ধ সাগ্রহে তাহার নিকটস্থ হইল।

চিত্রখানি দেখিবামাত্র, বৃদ্ধের কি জানি, কত দিনের বেদনাকর বিলুপ্ত-স্মৃতি হঠাৎ জাগ্রত হইয়া তাহার চিত্তকে দারুণ চঞ্চল করিয়া তুলিল। কক্ষস্থ দীপালোক উজ্জ্বলতর করিয়া অভিনিবেশ সহকারে চিত্রাঙ্কিত যুবকের মুখাবয়ব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলি যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, ততই সে পূর্ব্ব-স্মৃতি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিয়া উত্তরোত্তর চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ স্থির নেত্রে চিত্র প্রতি চাহিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে আকাশ পাতাল কত কথাই যে ভাবিল' তাহার নির্দ্ধারণ অসম্ভব।

ইতি মধ্যে যুবতী সেই কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, চিত্রার্পিত নেত্র বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিল না। কিছুক্ষণ পরে, একাগ্র চিত্তে বৃদ্ধের চিত্রদর্শন ব্যাপারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যুবতী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"আপনি এক মনে স্থির নেত্রে ছবিখানিতে এমন কি দেখিতেছেন?"

বৃদ্ধ—"মা, ছবিখানি দেখিয়া আমার———"

এই কথা বলিতে না বলিতে বৃদ্ধের নয়ন যুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

যুবতী—"আপনি অত উতলা হইবেন না—স্থির হউন, স্থির হউন। চিত্রের সহিত কি আপনার কোন পরলোকগত পুত্র বা নিকটাত্মীয়ের সৌশাদৃশ্য দেখিয়া বিহ্বল হইয়াছেন?"

বৃদ্ধ—হাঁ, মা,—পুত্রাপেক্ষা প্রিয়তম ভাবিয়া আমার প্রভুর মাতৃহীন শিশুকে প্রতিপালন করিয়া, অকালে তাহার সঙ্গ-সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। আহা, তাহার কি অঙ্গ কান্তি, কি সৎস্বভাব, কি মেধাই না ছিল। তাহাকে হারাইয়া আমার প্রভু অল্পকাল পরেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমি এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ সেই মাতৃহীন বালকের প্রতি স্নেহ ও মমতা, আজিও বহন করিয়া আসিতেছি— আহা, সে স্নেহ, সে মমতা কি এই হাড় কয়খান থাকিতে ভুলিতে পারিব?"

এই বলিয়া বৃদ্ধ পুনরায় অস্থির হইয়া পড়িল। এই সময় ক্ষীণ বামাকণ্ঠে, যুবতীকে কক্ষান্তর হইতে আহ্বান করিল। যুবতী তথায় উপস্থিত হইলে তাহার মাতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"তুমি অপরিচিত আগন্তুকের সহিত এত কি কথা কহিতেছ! তোমার পিতা ইহা জানিবার জন্য কৌতুহলী হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

যুবতী পিতার প্রতি চাহিয়া কহিল—'বাবা, আমার ঘরে আপনার ছেলেবেলার যে ছবিখানা টাঙ্গান আছে, আগন্তুক বৃদ্ধ তাহা দেখিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে—সেই জন্য তাহাকে একটু আশ্বস্ত করিতেছিলাম। আপনার চেহারার সহিত বৃদ্ধের নাকি কোন পুত্রাধিক প্রিয় নিকটাত্মীয়ের সৌসাদৃশ্য আছে।"

যুবতীর পিতা নিরুত্তর। তাহার মাতা, স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিয়া আগন্তুক বৃদ্ধকে তথায় আহ্বান করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

সেই কক্ষ মধ্যে, এক চিররুগ্ন কঙ্কালসার ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শায়িত এবং পদ প্রান্তে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী সতী, পতির পদ সেবায় রত রহিয়াছেন। বৃদ্ধ আসিয়া শয্যাপার্শে আসন গ্রহণ কালে যুবতী বলিল—

"আপনি একক রহিলে অতিশয় শোক বিহ্বল হইতেছেন—ক্ষণেকের জন্য আসিয়া, অশ্রুপাত মঙ্গলজনক নহে; তাই পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া মাতা আপনাকে এখানে আহ্বান করিয়াছেন।"

মাতা অনুচ্চস্বরে কন্যাকে বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে বলিলে, বৃদ্ধ স্বভাব সুলভ বাচালতার জন্য বিবিধ আবান্তর কথার অবতারণা করিয়া অবশেষে বলিল—

"আমি লক্ষ্মীপুরের বড় তরফের জমীদার বাবুদের আজ পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকাল নায়েবের কার্য্য করিতেছি—মা, এখনও এই হাড় কয়খান যতদিন রহিবে ততদিন আর আমার নিস্তার নাই। আমি তাহাদের তিন পুরুষের কর্ম্মচারী।"

এই কথা শুনিবা মাত্র, রুগ্ন ব্যক্তির চক্ষু বহিয়া অজস্র অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। পত্নী ও কন্যা, তাঁহাকে হঠাৎ এরূপ উত্তেজিত হইতে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাঁহার অশ্রু-প্রবাহের প্রবল ধারার বিরাম নাই। বৃদ্ধ স্তম্ভিত; পত্নী ও কন্যা ত্রস্ত ও ভীত। বহুক্ষণ পরে, অতি কষ্টে ক্ষীণ স্বরে শয্যাশায়ী রুগ্নব্যক্তি কহিলেন—

'নায়েব খুড়া—আ-প-নি—; ভা—ল—' এই কয়টি কথা শুনিবা মাত্রই বৃদ্ধ একবারে ভূতলে পতিত হইয়া উচ্চৈশ্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। যুবতী মহা বিড়ম্বনা বুঝিয়া কিয়ৎকাল পর বৃদ্ধকে কক্ষান্তরে লইয়া গেল। যাইবার সময় বৃদ্ধ বলিতে লাগিল, 'বাবা সুবোধচন্দ্র, এ-কি-করিয়াছ? তোমার সেই সোনার অঙ্গ তার কি এই পরিণাম! এতক্ষণ তোমার সেই কৈশোর মুর্ত্তির নধর গঠন দেখিয়া ত ভাল ছিলাম—বাবা—এ-কি-করিয়াছ? হা অদৃষ্ট! পুত্রহীন আমি—পরের ছেলে মানুষ করিয়া আমার অদৃষ্টে এত যন্ত্রণা!

বৃদ্ধকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য যুবতী আপন কক্ষে রাখিয়া নানাবিধ কথোপকথনের অবতারণা করিল। পরিশেষে কথা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিল—

'বাবা, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর, তাঁহার প্রতি খ্রীষ্টীয় সমাজের আর আদৌ মমতা বা যত্ন রহিল না। তাঁহাকে উদরান্নের জন্য সমান্য বেতনে মিশন স্কুলে জঙ্গলময় সুদূর মফঃস্বল পল্লীতে সামান্য বেতনে শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করিতে হইল।

'কিছু দিন অতিবাহিত হইলে পর মাতা বয়ঃপ্রাপ্ত হন। তখন তিনি শ্বশুর দত্ত বিপুল বিষয় বৈভবের মমতা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সহচারিণী হইবার জন্য বিষম ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। আমার পিতামহ ও মাতামহ উভয়েই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই—এ সকল কথা ত আপনি সবিশেষ জানেন। মাতা আসিয়া সম্মিলিত হইলে পিতার আয় বাড়িল না—কিন্তু ব্যয় বাড়িয়া উঠিল। কিছুদিন পর আমি আসিয়া উপস্থিত হইলাম—আমার শিক্ষার ব্যয়ভার আবার অতিরিক্ত চাপিয়া পড়িল।

'মাতা এখনও পূর্ণ হিন্দু আচার প্রতিপালন করেন। তিনি কখনও খ্রীষ্টান সংস্রবে আমাকে মিশিতে দেন নাই। আমি বয়স্থা হইলেও এখনও অবিবাহিতা রহিয়াছি। আমার সূচী শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যাদির সামান্য অর্থে অতি কষ্টে এখন আমাদের সংসার খরচ চলিতেছে। পিতা দীর্ঘকাল ব্যাধি গ্রস্থ থাকায় কর্ম্মচ্যুৎ হইয়াছেন।

'আমি পিতার কখনও প্রফুল্ল মুখ দেখিতে পাই নাই। তিনি সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক এবং অত্যন্ত ম্রিয়মান—সর্ব্বদাই একক থাকেন এবং কি যেন দারুণ অনুতাপে দগ্ধ হইয়া নিয়তই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা, তাঁহার প্রতিকথায় ও কার্য্যে চিরকাল লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।

'মা আমার, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পিতার সেবা পরিচর্য্যায় রত আছেন। এখন আমরা একবারে কপর্দ্দকহীন—পিতার চিকিৎসার জন্য ঔষধ ক্রয় করিবার বা চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবার কোনরূপ সংস্থান নাই। এদিকে পিতা আমার দিন দিন ক্ষয় হইতেছেন—আমরা প্রতি পলেই তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি—ইহা বুঝিয়াই মাতা আমার, পিতার চরণ ধরিয়া অনন্যমনে দিবানিশি বসিয়া আছেন। আমাদের অদৃষ্টে যে—'

এই কথা বলিতে বলিতে যুবতীর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। এই নিদারুণ বিষাদ কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে বৃদ্ধের হৃদয়ও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে বাধা দিয়া বলিল—

মা—আর না—সব বুঝিয়াছি—আমি এখানে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিব না—এখনই চলিলাম, যথেষ্ট অর্থ সহ বড়বাবুকে সঙ্গে লইয়া আমি অচিরেই

এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। লক্ষ্মীপুরের জমিদার পুত্রের অর্থাভাবে চিকিৎসা হইবে না—এ কলঙ্ক রাখিবার কি স্থান আছে? আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও তোমাদের এতদিন কোন সন্ধান করিতে পারি নাই। মা,—এতদিন আমা-দিগকে কেন কোন সংবাদ দাও নাই।'

এই বলিয়া বৃদ্ধ সুবোধচন্দ্রের নিকট বিদায় গ্রহণ জন্য তাঁহার কক্ষে পুনরায় গমন করিল।

প্রবেশ করিয়া দেখিল,—সতীর নিশি জাগরণ-ক্লিষ্ট রুক্ষকেশ-মস্তক নিদ্রাবশে স্বামীর চরণতলে লুটাইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে—আর সুবোধচন্দ্রের গণ্ডবাহী অশ্রু-প্রবাহের উৎস নিঃশেষিত হইয়া অক্ষি-পল্লব চিরতরে নিশ্চল হইয়াছে।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

রঙ্গ-বারিধি।

১ম তরঙ্গ

"গোড়ু বাবা!"

রামধন, কৃষ্ণধন তন্তুবায়ের একমাত্র সাধনের ধন নীলমণি। কৃষ্ণধন পুণ্যময়, স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী দেবগণের প্রসাদে জীবনধন রামধন লাভে মানব জন্ম সার্থক মনে করিলেন। পুত্র-রত্নের অজ্ঞান তিমির দূরীকরণ মানসে জনক অজস্র অর্থ ব্যয় করিলেন। কিন্তু আশা মরীচিকায় মুগ্ধ কৃষ্ণধন তন্তুবায় স্বল্পকাল মধ্যেই স্পষ্ট বুঝিলেন, যে তাঁহার সুখের হাট ভাঙ্গিয়াছে, তাঁহার প্রাণের ধন রামধন, কুসঙ্গীর রঙ্গ-সাগরে অবসন্ন হইয়া বর্ত্তমানে খাবি খাইতেছেন। রামধন মদ্য মাংস খাইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে পঞ্চমকারের একজন নবীন সাধকের স্থলাভি-ষিক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক পঞ্চমকার সাধনের উচ্চস্তরে আরোহণের পূর্ব্বেই রামধনের মর্ম্মপীড়িত হতভাগ্য পিতা নিয়তির আদেশ পালনে অসমর্থ হইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন, রামধনের সাধনের পথ বিঘ্নশূন্য হইল।

একদিন সে, শৌণ্ডিকালয় বাসিনী সুরাদেবীর একটু অতিরিক্ত ভাবে অর্চ্চনা করিয়া রাজপথ অতিক্রম কালে, জনৈক শান্তিরক্ষককে তাহার অভিমুখে অগমনে উদ্যত দেখিয়া পুর্ব্বকালীন শ্রীঘর বাসের সুখচিত্র গুলি মানস পটে অঙ্কিত দেখিতে লাগিল। এই চিত্র দৃষ্টে সে তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার্থ বিচিত্র পন্থা আবিষ্কার করিল।

স্বীয় মস্তক উত্তরীয় বসনাবৃত করিয়া, সম্মুখভাগে দক্ষিণ হস্তখানি বিস্তৃত করত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সে আর মানুষ নাই, সে জড় পদার্থ ধাতু পাত্র 'গাড়ুতে' পরিণত হইয়াছে; সুতরাং তাহার আর কোনও রূপ বিপদাশঙ্কা নাই। কিছুক্ষণ পরে শান্তিরক্ষক প্রভু আসিয়া রামধনকে এইরূপ অদ্ভুত অবস্থায় উপবিষ্ট দর্শনে, "তোম্ কোন্ হ্যায়রে" বলিয়া ডাক হাঁক আরম্ভ করিল। রামধন তখন ধাতুপাত্র, সুতরাং বাক্যব্যয়ের পাত্র নহে, এই হেতু সে জড় পদার্থের নীরবতা ধর্ম্মই প্রতিপালন করিল। রামধনের এইরূপ ব্যবহারে শান্তিরক্ষক প্রভুর ধৈর্য্য সীমাতিক্রম করণে বাধ্য হইল। তিনি স্বীয় পদ্ম-হস্ত স্থিত রুল নামক অভিহিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত স্থূল যষ্টি খানির সাহায্যে রামধনের সুপ্রশস্ত পৃষ্টখানির পরিচয় গ্রহণ করিলেন। গাড়ুরূপী রামধন শান্তিরক্ষকের হস্তস্থিত কৃষ্টবর্ণ খর্ব্বকায় যষ্টিখানির সহিত পরিচিত হইবা মাত্র, "ঢং" রবে ধাতুপাত্রের মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিল। ইহাতে শান্তিরক্ষকের ক্রোধের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল; তিনি এবার রামধনের শীর্ষদেশে হস্তস্থিত যষ্টিখানি বেশ একটু সজোরে সঞ্চালন করিলেন, গাড়ুরূপী রামধন এবার মিহি "টুং" রবে, শ্রেষ্ঠাঙ্গ মস্তকের কোমলতা সপ্রমাণ করিল। কিন্তু কি করিবে? সে যে জড়পদার্থ, বাক্‌শক্তি রহিত—সুতরাং নিরুপায়। এবারও রামধনকে বাক্য কথনে বিরত দেখিয়া শান্তিরক্ষক এক পদাঘাতে তাহাকে পথপার্শ্বস্থ পয়োনালীর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। রামধন গড়াইতে গড়াইতে পয়োনালী মধ্যে পড়িয়া "বগ্ বগ্" রবে স্বীয় গর্ভস্থ জল নির্গমের পরিচয় প্রদান করিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে অন্তরের হাঁসি অধরে চাপিয়া শান্তিরক্ষক কৃত্রিম ক্রোধভরে রামধনকে অর্দ্ধচন্দ্র সহযোগে পয়োনালী হইতে উত্তোলন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "শালা লোক, তোম কোন্ হ্যায়রে, আবি বাত বলিয়ে।" রামধন তখন রসনাবিজড়িত কণ্ঠে বলিল—"কেন বাবা জ্বালাতন কর্চ্ছ, আমি আর সে রামধন নাই, বর্ত্তমানে—

"গাড়ু—বাবা—"

শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য্য।

কারমাইকেল প্রেস, ১৭৯ নং [illegible] বসাক কর্ত্তৃক মুদ্রিত
২৯ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট [illegible] কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গল্পলহরী

২য় বর্ষ | আশ্বিন ১৩২০ | ৩য় সংখ্যা

ভেক ভঙ্গা।

সুরথলাল কলিকাতায় কোন ছাত্রনিবাসে থাকিয়া এম, এ, পড়িত। তাহার এক মামাতো ভাই বিভূতিভূষণ বহরমপুরে ওকালতী করিতেন। বিভূতিভূষণের স্ত্রী,—সুরথের বৌদি বিনোদিনীর বিশেষ অনুরোধে, এবার বড় দিনের ছুটীতে সুরথকে বহরমপুরে আসিতে হইয়াছে।

আহারের পর সুরথ রৌদ্রে আরামে বসিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছে, সুরথ বড় বেশী পান খাইত। বিনোদিনী কাছে বসিয়া পান সাজিতে সাজিতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,

"হাঁ ঠাকুর পো, বিয়ে করবে ?"

'বিয়ে ক'রব ! কি সর্ব্বনাশ !"

"বিয়ে করাটা এমন কি সর্ব্বনাশের কথা হ'ল ঠাকুরপো ? একটা বউ ঘরে এলেই কি সে তোমার যথা সর্ব্বস্ব উড়িয়ে, পুড়িয়ে, ছারে খারে দিবে ?"

সুরথ কহিল, "আহা, তা কে বলছে ? তুমি কি বিভূদার ঘরে এসে তাঁর যথা সর্ব্বস্ব উড়িয়ে পুড়িয়ে ছারে খারে দিচ্ছ ?"

"সেটা তোমার দাদাকে সুধোও না কেন

"সুধোব আর কি ? দেখতেই কি পাচ্ছনা ; বরং তুমি এসে অবধি দাদার বাড় বাড়ন্তই হ'য়েছে।"

"তবে তোমার সর্ব্বনাশ হবে কিসে ?" "আহা, বৌদি, বলি সর্ব্বনাশ কথাটা কি একেবারে ওর মৌলিক অর্থে কেউ ব্যবহার ক'রে থাকে ? ঘরে আগুন,

ভরাডুবি থেকে আরম্ভ করে, সামান্য এক গ্লাস জল ঢেলে পড়া পর্য্যন্ত যা কিছু ঘটে, তাতেই ত আমরা সর্ব্বনাশ ব'লে চেঁচিয়ে উঠি।"

"তা বউ এলে সে তোমার ঘরে আগুন দেবে, না ভরা ডোবাবে, না গায় মাথায় জলের গেলাসটাই ঢেলে দেবে? কোনটার ভয় ক'চ্চো।"

"স্থাখ দিকি আবার, কথা গুলো একেবারে মৌলিক অর্থ ধ'রে নিচ্চ।— অচ্ছা, যখন তোমার বিয়ে হয়েছিল, মুখ দেখে সবাই বলত, আহা, বউএর কেমন চাঁদপানা মুখখানা, তাতে কি আমরা এই বুঝেছিলুম যে তোমার মুখখানা থালার মত গোলগাল আর চ্যাপ্টা, আর চাঁদের কলঙ্কর মত তায় দুই গালভরা মেচ্‌তে পড়া।

"কই কে কবে ঐ কথা ব'লে আমার রূপের ব্যাখ্যানা করেছিল?"

"ব'লেছে বই কি? ঢের বলেছে। এখন কথায় ঠেকে স্বীকার কচ্চো না।

বিনোদিনী কহিল, "তা যদি কেউ বলেই থাকে, সে তুলনাই করেছে, মুখখানিকে চাঁদপানাই বলেছে, চাঁদ ত আর বলে নাই।"

স্থরথ উত্তর করিল "তা আমিই কি আর বলেছি, যে বউ এসে ঘরে আগুন দেবে, কি গায়ে জলের গেলাস ঢেলে দেবে? আমিও ও গুলো তুলনার ছলেই বলেছি।"

"কিসের তুলনা?"

"কিসের তুলনা! ও গুলোর সঙ্গে যে অবস্থার তুলনা হতে পারে।"

"সেত পারে, ক্ষতির তুলনা।"

"তবে তাই।"

বিনোদিনী কহিল, "হ্যা ঠাকুরপো, ছোট্ট একটী সাদাসিদে মেয়ে মানুষ, পেটে দুটি খেয়ে, দাসীর মত তোমার ঘরে খাটবে,—এতে তোমার এমনই কি ক্ষতি হবে? মাইনে সমেত খোরপোষ দিয়ে চাকর চাকরাণীও ত তোমাদের ঘরে তোমরা রেখেছ?

স্থরথ হাসিয়া কহিল, "তা বউদি যা বলেছ, ঠিক। স্ত্রী ঘরে আসাটা ঠিক একটা ক্ষতির সঙ্গে তুলনা করা যায় না।"

"তবে বে করবে না কেন?"

"বে করবো না কেন?—তার কারণ বে করবো না।"

বিনোদিনী উত্তর করিল, "এটা কি রকম কথা হল, ঠাকুরপো। তোমরা নাকি ইংরেজিতে স্থায় শাস্ত্র পড়েছ,—তা কার্য্য আর কারণ কি এক হয়?"

"কি সর্ব্বনাশ। তুমি যে ন্যায় শাস্ত্র না পড়েও পাকা একজন ন্যায়বাগীশের মতই কথা বলছো?

বিনোদিনী কহিল, "বলি এটাও কি তোমাদের একটা সর্ব্বনাশের কথা হ'ল! মেয়ে মানুষ আমরা, যদি এতটুকু বুদ্ধি রাখিই, তবে তোমাদের ঘরে আগুণ লাগ্‌বে, না ভরাডুববে, না একটা জলের গেলাসই মাথায় ঢেলে পড়বে।"

সুরথ কহিল, "বউদি, আমি হারমানচি,—ন্যায় শাস্ত্র পড়ে থাকি আর নাই করে থাকি, তর্কে দেখ্‌ছি, তোমার সঙ্গে পারব না। পড় আর না পড় সকল ন্যায় শাস্ত্র মাথায় নিয়ে তুমি জন্মেছ। পণ্ডিত মশাইরা তর্কশাস্ত্রে বাগবিতণ্ডার কথা বলে থাকেন। তা বাগে বল আর বিতণ্ডায় বল, বড় বড় ন্যায় কচ কচি পণ্ডিতরাও তোমার কাছে হেরে যাবেন,—আমিত ছার।

বিনোদিনী উত্তর করিল, "তা সুধু মুখের কথায় হার মানলে ছাড়ব না, আগে বুঝিয়ে দেও, কেন বে করবে না, বে ক'ল্লে তোমার কি ক্ষতি হবে, তবে ছাড়্‌ব। নইলে বে কত্তে হবে।"

"এইত বড় মুস্কিলে ফেল্লে বৌদি, সে যে অনেক কথা।"

"তা কথাত এ পর্য্যন্ত কম হ'ল না? না হয়, আরও কিছু হ'ক।"

"এত সব বাজে কথা গেল।"

"তা এখন তবে কাজের কথা হ'ক। বাজে কথায় যদি এত সময় গেল, কাজের কথায় না হয় কিছু যাক্।"

সুরথ কহিল, "বৌদি, এখন খেয়ে উঠে, শীতের দিনে দুপুরে রোদে বসেছি, এখন হাল্‌কা বাজে কথাই বেশ। ভারী কাজের কথা কি এখন ভাল লাগ্‌বে?"

"তা আমার খুব ভাল লাগ্‌বে।"

"আমার ত লাগ্‌বে না।"

বিনোদিনী উত্তর করিল, "পুরুষ মানুষ তুমি, এত লেখা পড়া শিখেছ"—আবার দেশের কত কাজ করবে বলে বড়াই ক'রে থাক। তা খেয়ে উঠে, রৌদ্রে ব'সেছ ব'লে দুটো কাজের কথাও কইতে পারবে না? তা জীবন ভ'রে, জীবন দিয়ে, অক্লান্ত শ্রমে এত কাজ ক'র্‌বে কি ক'রে! মেয়ে মানুষ ব'লে যত শ্রদ্ধা কর আমাদের, কথার ত কথাই নাই,—কোনও কাজ আমরা আরামের জন্য রেখে দিই না।—এই ত পান সাজ্‌ছি,—এ হ'লেই এখন গিয়ে পিঠে ক'র্ত্তে ধ'সব।"

"তা তাই তবে যাও না।"

"তা, সে আমার ঢের সময় আছে, পেটের ভাত হজম হ'লেত পিঠে খাবে ? তুমি বল,—বাজে কথায় ফাঁকি দিয়ে এড়াতে পারবে না।"

"বৌদি, তবে নেহাৎ ছাড়বে না।"

"না।"

সুরথ কহিল, "আমি বে ক'রব না, এইটে স্থির ক'রেছি।"

"ওগো, সে ত হ'ল ন্যায়শাস্ত্র হিসাবে কার্য্য। তা'ত গোড়া থেকেই শুনছি।—এখন তার কারণটা কি, তাই না জানতে চাই।"

"তবে শোন। অর্থনীতি-শাস্ত্র কাকে বলে জান ?"

"না। উনি যা অর্থ রোজগার ক'রে এনে দেন,—তাই দিয়ে সংসার চালাই,—কিছু জমাই,—আর তার হিসাব পত্রটাও রাখি। তা তার যে আবার কি নীতি আছে, শাস্ত্র আছে, তাত জানি না।"

"কোন ব্যক্তি বিশেষের অর্থ, তার খরচ পত্রের হিসেব কিতেব, এসব নিয়ে অর্থনীতি-শাস্ত্র তৈরী হয় নাই।"

"তবে কাদের অর্থ নিয়ে সে শাস্ত্র তৈরী হ'য়েছে।"

"সমস্ত দেশের, দেশের সমগ্র জনসমাজের অর্থ নিয়ে।"

"তা দেশটা,—সমস্ত জনসমাজটা কি ভিন্ন ভিন্ন যতগুলো জন আছে, তার বাইরে একটা কিছু ?"

সুরথ উত্তর করিল, "না, তাহা অবশ্য হ'তে পারে না। তা সমস্ত জনসমাজের স্বার্থ, আর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির স্বার্থ ত পরস্পর বিরোধী হ'তে পারে ?"

বিনোদিনী কহিল, "তা কতক কতক— কিছু কালের জন্য পারে বই কি ? একেবারে পুরো পুরো ভাবে চিরদিনের জন্য বোধ হয় পারে না। দেশের অনেক লোক যদি হাভাতে হ'য়ে পড়ে,—দুই চার জন রাশি রাশি অর্থ আগ্‌লে ব'সে থাক্‌তে পারে কি ? পেটের জ্বালায় পাঁচ জনে লুটে পুটে নেবে না ?"

সুরথ বিস্মিতভাবে কহিল, "বৌদি, তোমার দেখ্‌ছি ন্যায়ের মত অর্থনীতিও বেশ মাথায় আছে।"

বিনোদিনী কহিল, "তা মাথায় যা থাকে, তা আছে। ম'লে পরে বরং মাথাটা কেটে কুটে দেখো,—কি আছে না আছে। কোনও শাস্ত্র সেখানে

পাও, যত্ন করে রেখে দিও। তা বের কথায় অর্থনীতি এল কিসে? অর্থনীতি শাস্ত্র কি বলেছে কেউ বিয়ে করো না।"

"না, ঠিক তা নয়। তবে বিলেতে ম্যাল্‌থাস্‌ বলে খুব বড় একজন অর্থনীতি শাস্ত্রকার আছেন তিনি বলেন, বেশী বিয়ে ক'ল্লে দেশে দারিদ্র্য বাড়ে।"

"তা, তোমাকে বেশী বে কত্তে কে বল্‌ছে? সবে একটী মাত্র বে করবে বইত নয়। আমি কি পাগল হয়েছি যে তোমার ঘরে সতীনের কোন্দল সৃষ্টি করব?"

সুরথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিনোদিনী কহিল, ওকি হাস্‌লে যে ঠাকুর পো।"

সুরথ হাসিতে হাসিতে কহিল, "বৌদি, এত বুদ্ধি রেখেও এই কথাটায় ঠকলে; বেশীর কি সেই মানে?"

"বেশীর ত সেই মনেই বরাবর জানা ছিল।"

"অবশ্য বেশীর সে মানেও আছে বটে। তবে আমি কি আর সেই মানেতে বলেছি?"

বিনোদিনী কহিল, "তা আমিত আর তোমার অন্তর্যামী নই যে তোমার মনে কি গুঢ় মানে আছে. তা জানতে পাব।—তা সে গুঢ় মানেটা তবে খুলেই বল।"

সুরথ কহিল, "বেশীর এখানে মানে হ'ল একজনের বেশী বিয়ে নয়, দেশের লোকের বিয়ে। অর্থাৎ দেশের লোক যদি সব কেবলই বিয়ে করে, তবে দারিদ্র্য বাড়ে।"

"তা দেশের লোকের কি আর কাজ নেই, যে কেবলই বিয়ে করবে!"

'কি আপদ। বৌদি তুমি যে ভারি জ্বালালে দেখছি। আমি তা বল্‌চিনি। আমার বক্তব্য এই যে, দেশের লোকের মধ্যে প্রায় সকলে বা অধিকাংশ লোক যদি বিবাহ করে তবে দেশের দারিদ্র্য বাড়ে।"

"কিসে?'

"তাতে লোক সংখ্যা বাড়বে?"

"কো'নে ত আর বিদেশ থেকে আস্‌ছে না। বাপের ঘরের মেয়ে কেবল স্বামীর ঘরে বদল হয়ে যাবে। দেশের লোক সংখ্যা ত সমান সমানই রইল, বাড়ল কসে?"

"আহা বিয়ের পর কেবল জোড়ায় জোড়ায় স্বামী স্ত্রী মাত্র ত আর থাকে না ? এক এক জোড়ায় যে ক জোড়া ক'রে ছেলে পিলে হয়।

"তা যারা হবে, তারা যে কেবল বসেই খাবে, এমন কথাত আর নেই ? তারাও ত কাজ করবে—কাজ বেশী হ'লে থাবারও বেশী হবে।"

"কাজের যায়গা ত চাই।"

"দেশের মাটী কি সব এরই মধ্যে ফুরিয়ে গ্যাছে ?"

"মাটীত আর অফুরন্ত খাবার দেবে না ? তার ত সীমা আছে ?"

"তার ঢের দেরী আছে এখন। তার জন্যে তোমার আজই কৌমার্য্য অবলম্বন কর্‌বার তাড়া ত কিছু দেখতে পাই না।"

"কথা হ'চ্ছে এই বৌদি, যে পৃথিবী কত খাবার যোগাতে পারেন, তার একটা সীমা আছে, কিন্তু সকলেই যদি যখন খুসী বিবাহ করে, তবে ছেলে পিলে যে হবে, লোক যে কত বাড়বে তার একটা সীমা নাই।"

"সে বিধাতার বুঝ বিধাতা বুঝ্‌বেন। পৃথিবী তাঁর, মানুষ তাঁর, মানুষের খাবার ভার তাঁর। একটার যা সীমা আছে, সেই মাপে আর একটার সীমাও তিনিই ঠিক ক'রে দেবেন।

সুরথ উত্তর করিল, "সে আর তিনি ভাল মানুষটীর মত দিচ্চেন কই ? অবিবেচনায় মানুষ মেলাই বিয়ে করে, মেলাই ছেলে পিলে হ'য়ে অতিরিক্ত লোক বাড়ে, —আর দুর্ভিক্ষ্য মহামারী, যুদ্ধ বিগ্রহ এই সব উৎপাৎ উপস্থিত হয়ে লোক ক্ষয় ক'রে, এ দিককার সীমাটা কতক ঠিক রাখে।"

বিনোদিনী কহিল, ওটার সঙ্গে এটার যে কি এমন সম্বন্ধ আছে, তাত দেখতে পাই না। বিয়ে ক'ল্লে ছেলে পিলে হ'য়ে থাকে বটে,—তা কোন মেয়ে মানুষ যে অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি প্রসব করে দুর্ভিক্ষ্য ঘটিয়েছে, রোগের বীজাণু পেটে ধ'রে মহামারী এনেছে, কি মূর্ত্তিমান ঢাল তরোয়াল ধরা রাজাদের রাজ্যলোভ কোথাও কারো পেটে হ'য়েছে, এমন ত শুনি নাই।"

সুরথ কহিল, "বৌদি, তোমার যুক্তি এখন ন্যায় শাস্ত্রের সীমা ছেড়ে যাচ্ছে। ও সব কি আর কারো পেটে কখনও হবার অপেক্ষা রাখে ? তোমার বিধাতার এই সব বিধানেই প্রয়োজন মত পৃথিবীর ভারটা এই ভাবে লঘু হ'য়ে থাকে।"

"তবে লোকে যে থা বন্ধ করে দিলে আর এ সব উৎপাত ঘ'টবে না ?"

"সেটা বলা শক্ত। তবে পৃথিবী কত খাবার দিতে পারেন, এটা হিসেব ক'রে ত তার উপর আরও ভার চাপনের পথে যাওয়া উচিত ?"

"তা লোক হিসেবে পৃথিবী আর কত খাবার দিতে পারেন না পারেন, তার কি হিসেব কিতেব সব হ'য়ে গ্যাছে।"

"এর হিসেব করাত বড় সোজা নয়, বৌদি ?"

"তবে সেটা না বুঝেই আগে বে থা বন্ধ করে সন্ন্যাসী হবে ?"

"সারা পৃথিবীর হিসেব না রাখি, আমাদের দেশ যে খুব গরীব, লোক খেতে পাচ্চে না, তাত দেখতে পাচ্চি।"

"বলি সেটা কি দেশের মাটীতে আর খাবার নাই তার জন্যে, না তোমরা সব গতর শোগা হ'য়েছ, মাটি খুঁড়ে দেখবে না, তার জন্যে !"

"যার জন্যে হ'ক, দারিদ্র ত হ'য়েছে ? বে থা বন্ধ হ'য়ে লোক কম্‌লে কিছু সুসার হবে বই কি ?"

"এত ভারী উপায় ঠাওরালে ? খাবার আছে কি না, খুঁজে দেখবে না,—বে থা বন্ধ করে,—এক পুরুষেই দেশটাকে শ্মশান করে ফেল্‌বে।"

"সবাই ত আর বেথা বন্ধ করবে না। দেশ শ্মশান হবে কেন ?"

"তবে তুমি একা সন্ন্যাসী হ'য়ে দেশের কত সুসার কর্‌বে ? তোমার কটী ছেলে পুলে হ'লেই তারা কি দেশের সব হাঁড়ীর ভাত খেয়ে ফুরুবে ? আর কারো জন্যে কিছু রাখবে না !"

সুরথ উত্তর করিল, "আমার একার কার্য্যে আর কত এগোবে ? তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অনেকের যা করা উচিত বলে আমি বুঝেছি, তার দৃষ্টান্ত মাত্র আমি দেখাতে চাই।"

"যা করা উচিত, ক'চ্চো কই ? করা উচিত ত খাবার খোজা, নতুন নতুন কাজ কর্ম্মে যাতে দেশের লোকের অভাব ঘোচে, সুখ স্বচ্ছন্দে তারা থাক্‌তে পারে, তারই ব্যবস্থা করা। তা না এক বাই হ'য়েছে কেউ বে ক'রোনা, কেউ বে ক'রোনা,—সংসার সৃষ্টি সব ছারেখারে দিয়ে তবে এ পৃথিবী থেকে বিদেয় হও। বিধাতা তোমাদের ওই ম্যাল্‌থাসের, আর তার চেলা বেলাদের যা বুদ্ধি বিধান করেছেন,—তার কাছে দুর্ভিক্ষ বল, মহামারী বল, যুদ্ধ বিগ্রহ বল,—কোন ছার সব্।"

সুরথ হাসিয়া উত্তর করিল, "ম্যাল্‌থাস্ ত আর এ পৃথিবীতে নেই বৌদি,—নইলে তোমার সঙ্গে একবার তর্কের লড়ায়ে লাগিয়ে দিতুম !"

"তিনি ত নেই,—তাঁর ভূত যে তোমাদের ঘাড়ে ঘাড়ে চেপে রয়েছে। তা তেমন ওঝা এসে কেউ সাম্‌নে দাঁড়াক্ দেখি ভূত নাবে কি না ?"

"তা তোমার হাতে কি এমন ওঝা কেউ আছে? একবার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেখ না?"

বিনোদিনী কহিল, "দ্যাখ ঠাকুরপো,—ও সব পাগলামী ছাড়। বে থা কর,—বড় ভাল একটী মেয়ে তোমার জন্য আমি ঠাউরে রেখেছি।"

সুরথ উত্তর করিল, "বৌদি, এখন তর্কে লোভ দেখাচ্ছ? সন্দেশ যদি খাবনা ত খাবই না,—তা সে পাড়াগাঁয়ের দুর্গমোণ্ডাই হ'ক্ আর কল্‌কেতার ভীম নাগেরই হ'ক্।"

"তর্কে ও হারিনি,—লোভ ও দেখাচ্ছি না। বে আজ না কর, কাল কর্‌বেই যতই লম্বা লম্বা কথা কও,—তাই একটী গরীবের উপকারের জন্য আজ কর্ত্তে বল্‌ছি আর সেটা যে কেবল সেই গরীবেরই উপকার হবে, তা'ও নয়। আজ তার যা উপকার হবে,—কালে তার চেয়ে তোমার অনেক বেশী উপকার হবে। টাকা থাকে না ঠাকুরপো, যে মানুষটি ঘরে আন তাই থাকে। তা অমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবে না।"

সুরথ কহিল, "বৌদি, আমি যে টাকার বিবেচনায় কোন গরীবের মেয়ে বে ক'রবো না, তাত বলিনি,—বে মোটেই কর্‌বো না, তাই না বল্‌ছি।"

"কেন কর্‌বে না? ও সব ত পাগলামোর কথা বইত নয়?"

"তুমিই না পাগলামো বল্‌ছ বৌদি, আমার যে এর চাইতে সত্যিকার আর কিছু আপাততঃ নাই।"

"ও সব যাই হোক ঠাকুরপো, সব তোমার বাজে কথা। তুমি বিয়ে না কল্লেই দেশের দারিদ্র্য দূর হবে, এ কি পাগলেও কখন মনে করে?"

"ঠিক ও কথাটি ত আমি বলচিনি বৌদি, ওটা পাগলামো কথা বই কি? তবে ম্যাল্‌থাস বলেন, অধিক বিবাহ দারিদ্র্যের কারণ; আমাদের দেশ দরিদ্র, সুতরাং বিবাহ তার কারণ হবেই।"

বিনোদিনী উত্তর করিল, কলেরায় লোক মরে, তোমার দিদিমা ম'রেছেন,—সুতরাং তিনি কলেরাতেই মরেছেন। কিন্তু জল জ্যান্ত মানুষটা সকলের সামনে যে জ্বর বিকারে ম'রে গেলেন,—তাত তুমিও জান।"

"তা কলেরায়ও ত তিনি ম'ত্তে পাত্তেন।"

"মরেন নি ত তাতে?"

"তা যাই হোক সেটা যেমন পরীক্ষা হ'য়ে গ্যাছে, এটাত আর তেমন পরীক্ষা হয়নি; আমি বিশ্বাস করি, অন্য সব দেশের দারিদ্র্যেরমত ওটাই আমাদের দারিদ্র্যের

এক মাত্র না হ'ক একটা প্রধান কারণ। তাই শিক্ষিত যুবকদের অন্ততঃ বিবাহ না করে দৃষ্টান্ত দেখান উচিত।"

"তা কতজন তোমরা এমন দৃষ্টান্ত দেখাবে স্থির করেছ।"

"আপাততঃ আমি একাই।"

"তা তুমি কি কপালে ছাপ মেরে, ঢোল পিটিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে, সহরে সহরে ঘুরে বেড়াবে, আর সবাইকে ডেকে ডেকে বল্‌বে,—ওগো, তোমরা দেখ গো দেখ, দেশ বড় গরীব,—তাই আমি বিয়ে করিনি। যদি দেশের ধন-সম্পদ বাড়াতে চাও, আমার মত সন্ন্যাসী হয়ে সবাই পথে পথে ঢ্যাটরা পিটিয়ে ঘুরে বেড়াও।

"হা বউদি,—দৃষ্টান্ত কি অম্‌নি করেই দেখাতে হয়?"

"নইলে দেখবেই বা কে? দেশটাকে যদি তাড়াতাড়ি ওঠাতে চাও, তবে এই দৃষ্টান্ত সমেত নীতিটা যত শীঘ্র প্রচারিত হবে, ততই ভাল নয়?"

ঝি আসিয়া কহিল, "মা গয়লা ছানা নিয়ে এসেছে।"

বিনোদিনী কহিল, "তা রাখ না, দু সের মেপে রাখ। ক্ষীরটা হয়েছে?"

"হা, এই ত হল?"

"তা, দু সের ছানা নিয়ে যাও,—ক্ষীরটা নাবাওগে। আমি এই এলুম।"

ঝি চলিয়া গেল। সুরথ কহিল, "তা যাওনা বৌদি, পিঠেটা করে ফেলনা। বড্ড ক্ষিদে পেয়ে উঠছে।"

"তা যাচ্ছি, ভয় নেই আর। তা শোন ঠাকুরপো, বাজে কথায়ই সময় গেল, কাজের কথা হল না। যে মেয়েটির কথা ব'লছিলুম।"

"দোহাই বৌদি, আর মেয়ে টেয়েতে কাজ নাই। বাকী বেলাটুকু একটু রেহাই দেও।"

"কি জ্বালা গো! বলি আস্ত একটা মেয়ে ত আর এখনই তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্চি না? এত ভয় কেন? ভুতের ভয় যাদের বেশী,—তারাও ত ভুতের কথা শোনে? মেয়েটাকে নেও না নেও; তার কথাটাই না হয় শোন?"

"বল তবে, তোমার হাত থেকে নিস্তার ত আর নেই।"

বিনোদিনী কহিল, "মেয়েটির বাপ বড় ভাল লোক ছিলেন,—মার ত কথাই নেই। বাপের কাছেই এতদিন ছিল, অনেক যত্নে তিনি মেয়েটিকে লেখা পড়া শিখিয়ে তৈরী করেছেন। বল্‌তে কি ঠাকুরপো অমন মেয়ে আর হয় না। যে ঘরে নেবে তার ঘর আলো ত করবেই, তা সেটাও কিছু নয়—অমন মন, রাজার ঘরেও অমন রত্ন মেলে না—মুনির তপোবনেও অমন সরল মিষ্টি

স্বভাব বুঝি হয় না। তা বড় দুঃখে পড়েছে এখন। বাপ মরে গেছেন, টাকাকড়ি কিছু নেই। শ্বশুর কুলে এক দেবর আছেন, তাঁর অবস্থা ভাল নয়; বাপের বাড়ীতে ভাইরাই এখন প্রধান আশ্রয়। তা ভাইদেরও অবস্থা তেমন ভাল নয়, কোনও মতে খেয়ে পরে আছে। বাড়ন্ত মেয়ে, ১৪।১৫ বছর বয়স হ'ল,—লোকে নিন্দে কচ্চে—বে আর হচ্চে না। মেয়ে যেমন হ'ক, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা না'হলে ত আর ভাল বর মিল্‌বে না? আর এই পোড়ার মুখো ছেলে গুলোই বা কি? বাপ মা সংসারী লোক,—বুড়ো হয়ে উঠেছে,—তারা টাকার বিবেচনাটাই সবচেয়ে বড় মনে কত্তেও পারেন। তা তোরা ত লেখা পড়া শিখেছিস্,—প্রথম বয়স,—মনটায় এখনও সাংসারিক হিসেব কিতেব ঢোকেনি, তোরাও কি মানুষ হবিনি,—কেবল টাকার কথাই ভাববি! এম্‌নি ত বাপ মার সব বাধ্য কত! তা এ বেলায় একটা কথাও কেউ বল্‌বে না। ঠাকুরপো দেশের দুঃখ যদি কিছু দূর কত্তে চাও, ও সব বাজে বিলিতী ধুয়ো ছেড়ে, যা সত্যিকার দুঃখ, নিত্যিকার ঘরে ঘরের দুঃখ, সেই দিকে একটু দৃষ্টি দেও। কত লক্ষ্মী মেয়েকে টাকার অভাবে বাপ মা জলে আগুনে ফেলে দিচ্ছে,—দৃষ্টান্ত যদি কিছু দেখাতে চাও, এই রকম কোন দুঃখী বাপ মায়ের লক্ষ্মী মেয়েকে বিয়ে করে দৃষ্টান্ত দেখাও।"

কথা গুলি সুরথের মনে লাগিল। সে কহিল, "কে এ মেয়েটি বৌদি।"

বিনোদিনী উত্তর করিল, আমার পিস্‌তুত বোন্‌। তা আমার পিস্‌তুত বোন বলেই যে বল্‌ছি তা নয়, তুমিও ত আমার পিস্‌তুত ঠাকুর পো, মায়ের পেটের ভাইএর মতই তোমায় ভালবাসি। ঘর সংসার করে যদি সুখী হতে চাও, একে নিয়ে সত্যি বড় সুখী হবে। তুমিও আমার বড় আপন, এও আমার বড় আপন, দুজনেই দুজনে যোগ্য তাই আমার এত সাধ যে তোমরা দুজনে এক হও। কি বল ঠাকুর পো, বিয়ে করবে!

সুরথ একটু ভাবিয়া বলিল, "বৌদি, অনেকদিনের সংকল্প যা করে একদিনের এক কথায়, এক মুহূর্ত্তের ভাবের উচ্ছ্বাসে, তা ত্যাগ করা যায় না। তবে মেয়েটীর কথা শুনে আমার বড় দুঃখ হচ্চে,—তোমার এত আগ্রহ উপেক্ষা কত্তে হচ্চে, তাতে আরও দুঃখ হচ্চে। তবে আমি এ ভার নিচ্চি, এর জন্য একটা যোগ্য বর আমি জুটিয়ে দেব, এক পয়সাও তাকে দিতে হবে না।

বিনোদিনী কহিল, "তোমাকে জানি ঠাকুরপো, তুমিই আবাগী মেয়েটাকে পায়ের কোণে একটু স্থান দিলে বড় সুখী হতুম।"

"আমার চাইতে অনেক ভাল, অনেক বড় কেউ যদি তাকে মাথার উপরে স্থান দেয়, তবে সুখী হবে না ?"

"তোমায় জানি ঠাকুর পো, তোমায় বড় ভালবাসি—তোমার পায়ের কোণও অচেনা আর কারো মাথার তালুর চাইতে যে বেশী আকজ্ঞার ব'লে মনে হয় না !"

নূতন নূতন সবাই ত অজানা থাকে—চেনা হ'লে ত তবে পুরোণ হয়। আমিও ত আর চিরদিন জানা ছিলুম না,—একেও জানবে, এও পুরোণ হবে, একেও ভালবাস্‌বে,—বরং বোনাই ব'লে আমার চাইতে বেশীই।"

"কে এ ঠাকুর পো ?"

"আগে নাম বলব না। তার মতটা আগে নিয়েই নি।"

"যদি না পার ?"

"পারব বলেই ত ভরসা হয়।"

"ভরসা—হয়। তা ভরসাটা যদি ফস্‌কেই যায় ?"

"যাবার কথা নয়—যদিই যায়————"

"তবে তুমি নিজে বিয়ে কর্‌বে ?"

"কি সর্ব্বনাশ। অত বড় কথাটা কি এখনই বলে ফেল্‌তে পারি। তাহ'লে ত এখনই তোমার ঘটকালী সার্থক হত।"

"তবে কি হবে তখন।"

"আমি বল্লুম না, এই মেয়ের একটী খুব ভাল সম্বন্ধ আমি স্থির ক'রে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

আচ্ছা আপাততঃ তবে রইলুম। কিন্তু ভরসা যেমন দিলে, যদি আর কোথাও না পার,—জোর করে হাতে হাত বেঁধে দেব, বলে রাখলুম কিন্তু।"

"সে যখন কার কথা তখন বোঝা যাবে,—যাও যাও—তুমি পিঠেটা করে ফেল গে। আমি একটু ঘুরে আসি।

সুরথ উঠিয়া একটা লম্বা হাই তুলিল। বাটা হইতে ৪।৫টা পান লইয়া একেবারে মুখে পুরিল। তার পরে ঘরে গিয়া জামা, শাল ও ছড়ি লইয়া বাহিরে গেল। বিনোদিনী বাটাটি তুলিয়া রাখিয়া পাকশালায় গিয়া পিঠা প্রস্তুত করিতে বসিল।

২

সুরথ কলিকাতায় ফিরিয়া তাহার বাল্য বন্ধু সুখময়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। কলিকাতায় সুখময়ের পিতার কারবার ছিল। বি, এ, পরীক্ষায় পাশ হইবার পরেই তাহার পিতা তাহাকে নিজের কারবারে তাঁহার সহকারীর পদে নিযুক্ত করেন। অল্পদিনের মধ্যেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় সুখময়ের উপরেই কারবারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ভার পড়িল। পিতার মৃত্যুর পরেও বিশেষ দক্ষতা সহকারে সুখময় কার্য্য চালাইতেছিল। কারবারও পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছিল। সুখময় এখনও অবিবাহিত। সুরথ স্থির করিয়াছিল, সুখময়ের সঙ্গেই বৌদির পিস্‌তুত বোন্‌টির বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া দিবে। সুখময় সহৃদয়, উদার স্বভাব যুবক ও তার অবস্থাও ভাল। বিবাহে সে অর্থ লোভ করিবে না, সৎকুলজাতা সুচরিত্রা সুন্দরী সুযোগ্য বয়স্কা কন্যা পাইলেই সন্তুষ্ট হইবে, এরূপ ভরসা সুরথের ছিল।

সুরথ কহিল, "হ্যা সুখো, তুমি বিয়ে করবে?"

সুখোময় উত্তর করিল "বিয়ে কর্‌বো না? ভদ্রলোকের ছেলে বিয়ে করে গেরস্ত হবনা, কি একটা লক্ষীছাড়া ভবঘুরের মত পথে পথে বেড়াব?"

সুরথ কহিল, "বিয়ে না কল্লেই কি সবাই লক্ষীছাড়া ভবঘুরেই হবে।"

সুখময় কহিল "তবে কি হবে? আর কি তবে তারা কর্‌বে?"

"কেন বিয়ে করে গেরস্থালী করা বই কি আর পৃথিবীতে কোন কাজই নেই।"

"থাক্‌বে না কেন। তবে বিয়ে করে গেরস্ত হয়ে পৃথিবীর আর কোন কাজটা করা যায় না,—তাত্‌ দেখতে পাই না।—এই পৃথিবীর ইতিহাসে বড় বড় লোক, যারা বড় বড় কাজ করে গ্যাছেন, তাদের মধ্যে বিয়ে করেন নি এমন ক'জন পাবে।"

সুরথ কহিল "সে কথা এখন থাক্‌। ও পুরোণ তর্ক নূতন করে তুলে কাজ নেই। কাজের কথা হক—তা তুমিত বে করবেই।"

"করব বই কি। ম্যাল্‌থাসের মন্ত্র-শিষ্য হয়ে ত আর আমি তোমাদের দারিদ্র্যহর কৌমার্য্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিনি। দেশের দারিদ্র্য মুক্তির পথটা ওদিকে মোটে দেখতেই পাইনা। ভদ্রলোকের ছেলে, যে যা করে গেরস্ত হব, সমাজে একজন সামাজিক হব, সন্তানের এ ন্যায্য আকাঙ্ক্ষায় ভারত মাতা যে বাদিনী হবেন, তাত কখনও মনে হয় না। এদিকে হিন্দুর ছেলে,—পিতৃঋণটাও শোধবার চেষ্টা কত্তে হবে।—আর ঐ ভারত মাতার কথা—তা যদি ভাল ভাল

বেশ তেজাল মানুষের মত কতকগুলো ছেলে মেয়ে তাকে দিয়ে যেতে পারি, —তবে বেশই তাকেই দিয়ে গেলুম বলতে হবে। তিনি সে দান আদর করেই নেবেন, অভিশাপে দূরে ফেলে দেবেন না।"

সুরথ কহিল, আরে ছ্যাঃ। তোর কি একটু লজ্জা নেই, বিয়ের নাম হতে না হতে আগেই ছেলের আহ্লাদে আট খানা।

সুখময় উত্তর করিল, "তা বিবাহের কথাই যদি ভাবছি, তবে বিবাহের শ্রেষ্ঠফল, বিবাহিত জীবনের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি, যে পিতৃবংশধারা বর্ত্তমানে আমাতে বাহিত হচ্ছে, সেই বংশধারা পৃথিবীতে স্থায়ী রাখবার প্রধান উপায় যে সন্তান তার কথাই বা কেননা ভাবব ; যে তা ভাবে না, তারই বিবাহ ভোগ লালসার অবলম্বন মাত্র,—জীবনের একটা বড় ধর্ম্ম সাধন নহে।"

"যাক্ তবে বিবাহটা কর্‌বেই।

"করব করব, করব, কতবার বল্‌তে হবে।

"তবে একটি মেয়েকে বিবাহ কর না।"

"তা মেয়ে ছাড়া যে কোন পুরুষ বিবাহ করব এমন একটা অসম্ভব কল্পনাও ত কখনও মনে ওঠেনি দাদা।

"আহা! পুরুষকে কে বিবাহ কত্তে বল্‌ছে? বলি কোন মেয়ে বিশেষকে ত বিবাহ কর্‌বে?"

"মেয়ে বিশেষ ছাড়া কি কোন অবিশেষ মেয়েত্বরূপ সাধারণ গুণকে বিবাহ কর্‌বো?"

কি আপদ! বলি একটা ভাল মেয়ে আছে, তাকে বিবাহ কর না!"

"তা ভাল ছাড়া মন্দ মেয়ে বিবাহ কর্‌ব, এমন কথাত বলিনি।"

"কোন ভাল মেয়ে ঠাউরেছ?"

"না, ঠাওরাইনি, এখনও মা খুজছেন,—এই পর্য্যন্ত।"

"তবে আমি একটি ঠাউরেছি,—আর খোজা খুজিতে কাজ কি? এইটিকে বিবাহ কর না?"

"সেটি কে? প্রকাশ করে বল।"

"বল্‌বার অবসর দিচ্চ কই? আমি ত বল্‌তেই এসেছি।"

"তা বল না? এত কি কাজ মাথায় চাপিয়ে দিছি, যে অবসরই পাচ্ছ না।"

"কাজের চাইতে কথার জঞ্জালই যে তোমার অনেক বেশী।"

"আচ্ছা তবে এই জঞ্জাল সাফ করে দিলুম,—এখন বল।"

সুরথ তখন তার বৌদির মুখে যেমন শুনিয়া ছিল, সকল বলিল। সে যে কি অবস্থায় সম্বন্ধ জুটাইয়া দিবার ভার লইয়া আসিয়াছিল,—তাও বলিল।

সুখময় শুনিয়া কহিল, "সুরথ পাগলামী ছাড়,—এই মেয়েটাকে তুইই বিয়ে করে ফেল্। এমন সাধা হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেলিসনে। এ বাতিক থাক্‌বে না,—শেষে পস্তাবি।"

সুরথ উত্তর করিল, "ও সব কথা থাক্। বৌদির অমন শক্ত তর্কজাল যদি এড়িয়েছি,—তবে তোর এক কথাতেই যে ভুলে যাব,—তা কিছুতেই হচ্ছে না।"

"আচ্ছা, এক কথায় না হয়, দশ কথাই শুনিয়ে দিচ্ছি এখন। তাতেও কি হবে না?"

"দশ কথাতেও হবে না। মিছে আর কথা বাড়ান কেন। তুই বিয়ে ত কর্‌বিই,—তা মেয়ে যদি ভাল, তবে এতে তোর আপত্তি কি।"

সুখময় কহিল, "না আপত্তি কিছুই নাই। তবে তোর মুখের সাম্‌নে থেকে অমন গ্রাসটা কেড়ে নেব, তাই ভাবছি।"

"সেটা বাজে ভাবনা। গ্রাসটা বৌদি মুখের কাছে ধরেছিল বটে,—কিন্তু, আমার নোলার জল পড়েনি। মুখ ফিরিয়েই এসেছি। মুখে নেবার যদি ইচ্ছে হ'ত, নিয়েই ফেলতুম, তোর কাছে আস্‌তুম না।"

"আচ্ছা তবে গ্রাসটা আমিই না হয় খাব। তা শেষে পস্তাবি না ত?"

"এই দেখ, পাগল আর কি, কেমন তবে রাজি।"

"আচ্ছা রাজিই।"

"মাকে বলতে হবেনা ত?"

"বল্‌তে হবে বইকি? তবে তিনি আমি যা বলব তাতেই খুসি হবেন। তিনি এমন পাগল হয়ে আছেন সে রাস্তার একটা মেয়ে কুড়িয়ে এনে দিলেও তাকে মাথায় তুলে নেবেন।"

"আচ্ছা, তবে মেয়ে দেখ্‌তে একেবারে ঠিক করে ফেল।"

"দেখবার এমন দরকার আছে কি? তোর বৌদির সার্টিফিকেট কি যথেষ্ট নয়?"

"আমি ত যথেষ্টই মনে করি। তবু দেখা একবার ভাল।"

"দরকার এমন দেখি না। মা বলেন ত দেখা যাবে।"

"তবে বৌদিকে লিখে দিঁ।"

"তা দিতে পার।"

"শেষ একটী কথা বলে ফেলাই ভাল। টাকাকড়ি কিন্তু এক পয়সারও পাবে না।

সুরথ উত্তর করিল, "ঈশ্বরেচ্ছায় পয়সা কড়ির এমন অভাব নাই। শ্বশুর কুলের রক্ত শোষণ না করেও স্ত্রীকে প্রতিপালন কত্তে পারব। বিবাহের জন্ম ভাল একটী গেরস্তের মেয়েই চাই,—রাজকন্যা সহ অর্দ্ধেক রাজত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করি না।"

"আচ্ছা বেশ কথা, মরদের মতই বাত এবার বলেছ। তবে আসি আজ, বৌদিকে আজই লিখে দিই, এখনও ডাকের সময় আছে।"

সুরথ চলিয়া গেল। সুখময় নিজের কাজকর্ম্ম লইয়া বসিল।

৩

মাঘী সপ্তমীতে গঙ্গাস্নানের এবার বড় যোগ; সুরথের এক বিধবা বৃদ্ধা পিসি কলিকাতায় গঙ্গাস্নানে আসিলেন। যদি তীর্থে আসিয়াছেন, তবে আদি গঙ্গায়, মার পদপ্রান্তেই তিনি থাকিবেন এইরূপ বাসনা প্রকাশ করায় সুরথ কালীঘাটে পিসির জন্য বাসা ভাড়া করিল। পিসির সঙ্গে তাঁহাদের বৃদ্ধা পুরোহিত পিসি এবং একটী ভৃত্য মাত্র আসিয়া ছিল; সুতরাং পিসির অভি-ভাবক হইয়া সুরথকেও কালীঘাটে গিয়া কিছুদিন থাকিতে হইল।

যে বাড়ীতে সুরথ পিসির জন্ম বাসা ভাড়া করিয়াছিল, সেই বাড়ীরই পাশে ছোট একটি বাড়ীতে একটি ভদ্র পরিবার বাস করিতেন। মধ্যে মাত্র একটি সরু গলি ব্যবধান ছিল। দুই বাড়ীর সাম্‌না সাম্‌নি জানালা খুলিলে বেশ আস্তে আস্তেই কথাবার্ত্তা বলা যাইত। সে বাড়ীর মেয়েরা প্রায়ই সুরথের পিসি ও তাঁহার সঙ্গিনী বৃদ্ধ পুরোহিত পিসির সঙ্গে আলাপ করিতেন। পাশের ঘর হইতে সুরথ মধ্যে মধ্যে একটি বড় মধুর কণ্ঠস্বর শুনিত,—সুরথের মনে হইত যে কণ্ঠের প্রতি শব্দে যেন অতি মধুর সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিতেছে। মুগ্ধ চিত্তে সুরথ সেই সঙ্গীতের ঝঙ্কার শুনিত,—অননুভূতপূর্ব্ব কি এক আনন্দের উচ্ছ্বাস সেই স্বর-সঙ্গীতের ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, সুরথের দেহ ময় কাঁপিয়া কাঁপিয়া ছুটিত। কণ্ঠস্বরে বয়সও বুঝি কিছু অনুমান করা যায়, সুরথের মনে হইত এই মধুর ঝঙ্কৃত সরল কমনীয় সঙ্গীত-স্বরের অধিকারিনী কোমল বয়স্কা তরুণী মাত্র,—বয়সাধিক্যের প্রশস্ততার কোন আভাস সে কণ্ঠস্বরে সে কখনও পাইত না।

সুরথের বড় জ্বালা হইল। সর্ব্বদা সেই কণ্ঠ-স্বর তাহার কাণে বাজিত, চারিধারে বায়ুতে সেই কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি অবিরত যেন নাচিত, ঝঙ্কারিত—নাচিয়া নাচিয়া মধুর হিল্লোলে যেন সকল দিক হইতে আসিয়া তাহাকে সকল দিকে ঘিরিয়া স্পর্শ করিত, আহা সে কি স্পর্শ! তাতে কি মাধুরী, কি মদিরা কি পুলক প্রবাহ—কি আনন্দ বিহ্বলতা। অশরীরী কে যেন—কি যেন, স্বর্গ সুধাময় নন্দন সুরভি, মন্দার স্পর্শ—থাকিয়া থাকিয়া মধুর আলিঙ্গনে তাহাকে বিভোর করিয়া ফেলিত!

হায়! হায়! কি ক্ষণেই সে কালীঘাটে আসিয়া বাসা লইয়াছিল। আসিতে আসিতেই কেন বৃদ্ধা পিসীর গঙ্গা প্রাপ্তি হ'ল না! দেশ-হিতার্থে সে কৌমার্য্য অবলম্বনে কৃতসংকল্প, আজ কিনা কোন অদৃষ্টা, অপরি-চিতার কণ্ঠস্বরেই সে এমন পাগল হইল। ছি ছি ছি! ধিক তাহাকে। আর তার বৌদি——ছি ছি ছি! তিনি শুনিলেই বা কি বলিবেন। তাঁহার সেই বিদ্রূপবাণ, শ্রুতিসুখ হইলেও বড় তীক্ষ্ণ—কি করিয়া অবিরত তার খোচা সহিবে। কিন্তু সহস্র ধিক্কারে, কি কোন চিন্তায়, কি ভয়ে কোন ফল হইল না। সেই অমৃতোপম স্বরজালে সুরথ আরও দৃঢ়ভাবে জড়িত হইতে লাগিল।

এক দিন বাহিরের কোন কার্য্য হইতে ফিরিয়াই সুরথ পিসির ঘরে প্রবেশ করিল। পিসি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সম্মুখে পাশের বাড়ীর জানালা হইতে সেই অমৃতময় ঝঙ্কার, মধুময় স্বর-লহরী উঠিতেছিল! সুরথের পদ-শব্দ পাইয়া পিসি ফিরিলেন অন্তরাল দূর হইল। সম্মুখে পাশের বাড়ীর গবাক্ষে ——হায়! হায়! সুরথ এ কি দেখিল! এ যে সেই স্বর মাধুরীরই জীবন্ত মুর্ত্তি! এ কি মূর্ত্তি——এ কি, মুখে কি হাসি! সুরথ এমন ত আর কোথাও কখনও দেখে নাই!

চকিতনেত্রে মুহূর্ত্ত মাত্র সুরথের দিকে চাহিয়া বালিকা নব বিকশিত যৌবনোৎ-ফুল্ল অপূর্ব্ব রূপময়ী, মধুর হাসিনী বালিকা মূর্ত্তি সরিয়া গেল। অচঞ্চল স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতি চপলার মত বালিকা সরিয়া গেল,—মধুর লহরে একটা দীপ্ত সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ যেন আসিয়া সুরথের অঙ্গে কি এক পুলকের আবেশ ঢালিয়া দিল, কম্পিত, রোমাঞ্চিত, আবেশে অবশ দেহে সুরথ গবাক্ষ পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পিসি ফিরিয়া কহিলেন, "কি বাবা কি দেখছো? ওখানে ত কেউ নাই!"

সুরথ কথঞ্চিৎ আত্ম-সম্বরণ করিয়া কহিল, "কে ও মেয়েটি পিসিমা?"

"ও, ও বাড়ীর মেয়ে?"

"ও কাদের বাড়ী ?"

"ঠাকুরটীর নাম যাদব রায়,—এখানে চাকুরী করেন ?"

"তাঁর মেয়ে ও।"

"না, তার ভাইঝি, মেয়েটির বাপ নাই।"

"ওর নাম কি ?"

"টুনু বলে ডাকে—আসল নাম—কি ব'লছিল যেন—হাঁ শোভা—বড় বেশ মেয়েটি, যেমন মিষ্টি কথা,—তেমনি দেখতে। আর বড় নরম স্বভাব। ওর মাও বড় ভাল মেয়ে, আমায় আজ ব'লছিল, গঙ্গা স্নানের যাবার সময় আমায় রোজ নিয়ে যাবে! তা'হলে আর তোর রোজ হাঙ্গামা কত্তে হবে না।"

"তা বেশ ত,—যেও।"

এত দিন তবু শুধু অশরীরী কণ্ঠস্বর ছিল,—তার আক্রমণ যতই প্রবল হউক, তবু সহিবার মত ছিল। এখন সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারিনী স্বয়ং সশরীরে রণাঙ্গণে অবতীর্ণা। এত দিন এক মাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারই মুক্ত ছিল, এখন দর্শনেন্দ্রিয়ের বৃহৎ দ্বারও মুক্ত হইয়া প্রশস্ত পথ খুলিয়া দিল,—সুরথ বেচারীর হৃদয়-দুর্গ এখন রক্ষা পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। ম্যাল্‌থাসের যুক্তির ব্যূহবন্ধন দ্রুতবেগে শিথিল ও ছিন্ন ভিন্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সুরথ ম্যাল্‌থাসের বই খানি আনিয়া আবার ভাল করিয়া পড়িল। নূতন অর্থ, নূতন ভাবে সেগুলি সুরথের নিকট প্রতীতি হইতে লাগিল। সুরথ বুঝিল ম্যাল্‌থাস যাহা কিছু বলিয়াছেন, বিলাতের বর্ত্তমান সমাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থায় উক্ত দেশীয় শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের পক্ষেই যে সব যুক্তি খাটিতে পারে,—ভারতের সম্পন্ন ভদ্র গৃহস্থ সন্তানের পক্ষে সেগুলির বিশেষ সার্থকতা নাই।

কিন্তু সে যে এত দিন কত দম্ভে, কত লোকের কাছে নিজের সংকল্প ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে। আজ যে সংকল্প ত্যাগ করিলে লোকে কি বলিবে? সুখময় হাসিবে;—বৌদি ত আস্ত রাখিবেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কি জীবনটাকে মাটি করিয়া ফেলিবে? ওই কণ্ঠস্বর, ওই রূপ, আহা সব যে তার জীবনের সঙ্গে অছেদ্য বন্ধনে জড়াইয়া গিয়াছে। না হয় সুখময় হাসিবে,—বৌদি বিদ্রুপ করিবেন,—সে আর কত টুকু কষ্ট? এ বন্ধন ছিন্ন করা যে দেহ হইতে জীবনটাকে ছিন্ন করার মত হইবে! একটু হাসির ভয়ে, দুটা কাটা কাটা কথার ভয়ে,—জীবনটাকে কি এমন করিয়া বলী দেওয়া যায়?

কিন্তু এ বালিকাই বা কে? ইহার সঙ্গে বিবাহ সম্ভব কিনা? সুরথ কৌশলে পিসির দ্বারা অনুসন্ধানে জানিল, বালিকা তাহারই সবর্ণা,—কিন্তু সগোত্রা নহে; বিবাহে কোন বাধা নাই।

কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব কি করিয়া উপস্থিত করে—। সুরথের পিতা নাই,—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া নিজে কি প্রকারে—নিজের বিবাহ সম্বন্ধে স্থির করে? তাঁহাকেই বা মনের আকাঙ্খা জানায় কি প্রকারে?

সহসা অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনায় আকাঙ্খিত সুযোগ উপস্থিত হইল। সুরথের পিসির সহসা কঠিন সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইল। পিসির সন্তানাদি ছিল না, সুরথ জ্যেষ্ঠ সহোদর কিশোরলালকে এবং পিসির দেবর পুত্র যোগেশ বাবুকে তারে সংবাদ দিল। উভয়ে যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে তাঁহাদের আগমন পর্য্যন্ত উপায় কি?

সুরথ একা,—শরীরও কিছু অসুস্থ ছিল। সঙ্গিনী ব্রাহ্মণীকে পিসি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে দিতে চাহিলেন না। যদি গঙ্গাতীরে মায়ের পায়ে স্বর্গ লাভের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে,—ব্রাহ্মণীর সেবা গ্রহণ করিয়া পাতক সঞ্চয়ে সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইতে পিসি কোনও মতে সম্মত হইলেন না। ভৃত্যটি রোগীর শুশ্রূষায় পরিপক্ক নহে। ব্রাহ্মণীর মুখে এই অবস্থা শুনিয়া পাশের বাড়ীর সেই বালিকার সহৃদয়া বিধবাজননী কমলা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া বৃদ্ধার শুশ্রূষা করিতে আসিলেন। জননীর সঙ্গে বালিকাও আসিল। সে স্বভাবতঃই বড় কোমল হৃদয়া,—রোগীর শুশ্রূষায় তার বড় আনন্দ ও আগ্রহ ছিল। মাতা ও কন্যা উভয়ে অনন্তকর্ম্মা হইয়া বৃদ্ধার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইতি মধ্যে কিশোর বাবু ও যোগেশ বাবুও আসিলেন। তাঁহাদের আপত্তি সত্ত্বেও কমলা বৃদ্ধার শুশ্রূষার ভার ত্যাগ করিলেন না। হাজার হইলেও ইঁহারা পুরুষ মানুষ ত! রোগীর শুশ্রূষা—বিশেষতঃ রোগী যখন নারী,—তখন তাহার শুশ্রূষা নারীতে যেমন পারিবে, পুরুষে কি তেমন পারে? তাঁহাদের ত কোন অসুবিধা হইতেছে না? কেন ইঁহারা আপত্তি করিতেছেন? কমলার আগ্রহ দেখিয়া ইঁহারা আর আপত্তি করিলেন না।

বৃদ্ধার আকাঙ্খা পূর্ণ হইল না। মা এ যাত্রা তাঁহাকে পায়ে স্থান দিলেন না। আরও কত পাপের ভোগ আছে,—কে জানে? এমন সৌভাগ্য কি তাঁহার মত দুর্ভাগিনীর হইতে পারে? সুচিকিৎসায় এবং কমলা ও শোভার শুশ্রূষাগুণে তিনি সারিয়া উঠিলেন।

শোভা মেয়েটিকে কিশোর বাবুর বড় ভাল লাগিল। ভ্রাতার পাগলামোতে তিনি বড় ক্ষুণ্ণ ছিলেন। পিসির ব্যারামের সময় শোভার প্রতি ভ্রাতার ভাব দেখিয়া তাঁহার কেমন মনে হইল, এই কন্যাটির সঙ্গে সম্বন্ধ করিলে ভ্রাতা বিবাহে আপত্তি নাও করিতে পারে। আর যদি এমন কন্যাকে ও বিবাহ না করিতে চায়, তবে হতভাগা—নিতান্তই হতভাগা।

শোভার খুল্লতাত যাদব বাবুর সঙ্গেও আলাপ হইল। তিনি জানিলেন, দারিদ্র্য হেতু শোভার বিবাহের জন্য যাদব বাবু বিপন্ন; আর সুরথের সঙ্গে বিবাহেও কোন অলঙ্ঘ্য বাধা ছিল না।

তিনি একদিন সুরথের নিকট কথাটা উঠাইলেন। সুরথ লজ্জানত আরক্ত বদনে নীরবে বসিয়া রহিল। পূর্ব্বের ন্যায় একেবারেই নির্লজ্জ ভাবে আপত্তি জানাইল না। ভ্রাতার একটু আশা হইল। তিনি কহিলেন, "তবে কি বল? তোমার ত এক আজগুবী ধূয়া আছে, মত না হইলে আর যাদব বাবুর কাছে কথা তুল্‌তে পারি না? ভদ্রলোকের কাছে অনর্থক অপদস্থ হ'তে আর ইচ্ছা নাই।—তবে কি চুপ করেই যাব,—না—"

সুরথ পূর্ব্ববৎ অবনত মুখে কহিল, "আমি আর কি বলব,—আপনাদের যেরূপ ইচ্ছা হয়, ক'র্‌বেন"

"বলি শেষে ত গোলটোল কিছু ক'র্‌বে না?"

"না।'

"তবে ঠিক ক'রে ফেলি।"

"আচ্ছা।"

ভ্রাতা মুখ চাপিয়া একটু হাসিলেন। সুরথ উঠিয়া অন্যত্র গেল।

কিশোর বাবু সেই দিনই যাদব বাবুর নিকট প্রস্তাব তুলিলেন। যাদব বাবু আগ্রহে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। কমলা শুনিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন।

৪

ওদিকে সুরথের পত্র পাইয়া বিনোদিনী, স্বামী বিভূতিভূষণকে তাহার পিস্‌তুত ভগ্নীর জন্য সুরথের নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধের কথা জানাইল। বিভূতি বাবু শ্বশুরকে সংবাদ দিলেন।

তিনি বহরমপুরে আসিলেন। সুখময়কে তিনি জানিতেন, তাহাকে লিখিলেন শ্বশুরকে লইয়া তিনি সত্বর কলিকাতায় যাইতেছেন। সুখময় উত্তরে জানাইল, বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে তাহাকে সম্প্রতি বহরমপুরে যাইতে হইবে,—সেইখানেই সাক্ষাৎ

ও কথাবার্ত্তা হইবে। তাঁহাদের আর কষ্ট করিয়া কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজন নাই। যথা সময়ে সুখময় বহরমপুরে গেল। সেখানেই ভাবী মামাশ্বশুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে,—সম্বন্ধ স্থির করিয়া সুখময় কলিকাতায় আসিল। কন্যা দেখা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া জানাইল।

সুস্থ ও সবল হইয়া দেবর পুত্রের সঙ্গে পিসি নিজগৃহে ফিরিয়াছেন। ভ্রাতাও কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গিয়াছেন। সুরথও কালী ঘাট হইতে কলিকাতার মেসে ফিরিয়া আসিয়াছে। কলিকাতায় ফিরিয়া সুরথের সঙ্গে সুখময়ের সাক্ষাৎ হইল।

সুরথ জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর, সম্বন্ধের কতদূর কি হ'ল।"

সুখময় উত্তর করিল, "আর দূরটুর কিছু নেই, এইত বহরমপুর গিয়ে সব ঠিক ক'রে এলুম। বিভুদার শ্বশুর, সেই মেয়ের মামাও এসেছিলেন।"

"তা বেশ হয়েছে,—বেশ হয়েছে—বাঁচাগেল, বৌদির কাছে মুখটা তবে থাক্‌ল। তা আমার মত হতভাগার চাইতে, তোমার হাতে পড়ে মেয়েটি অনেক বেশী সুখে থাক্‌বে। বৌদিও বোধহয় খুব খুসী হয়েছেন।"

"অখুসীর কোন লক্ষণ দেখলুম না। তা এখনও বোঝ ভায়া,—সময় আছে,—যদি তুমি মেয়েটিকে চাও, ছেড়ে দিতে পারি। বৌদি তাতে আরও বেশী খুসী হবেন।

সুরথ কহিল, "না না আর তায় কাজ নেই। যা হয়েছে,—বেশ হয়েছে। তবে আমারও একটা সংবাদ আছে,—শুন্‌লে কি বল্‌বে জানি না।"

"কি কোথাও কারও প্রেমে পড়েছ নাকি। ম্যাল্‌থাসের ভূত ঘাড় থেকে নেমেছে।

সুরথ একটু হাসিয়া কহিল, "বড় শক্ত ওঝার হাতে পড়ে তাকে নাম্‌তে হ'য়েছে।"

সুখময় আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া সুরথের পিঠে গোটাকত খুব জোরে জোরে চাপড় দিয়া কহিল, বটে! বটে! বটে! তবে পথে এস ভায়া। ব্যাপার টা তবে খুলে বল দেখি, একটু শুনি। এমন ওঝা কোথায় মিল্‌ল?"

সুরথ কালীঘাটের ঘটনা সব বলিল। সুখময় কহিল, "তা বেশ, বেশ, বেশ, বেশ—হয়েছে। বাহাদুর ওঝা বটে! একেবারে মধুরে মধুর। তবে এ মাধুর্য্যের অধিকারিণী কে? নামটা শুন্‌তে পাইনা।"

"নাম শোভা।"

কি সুন্দর !—ভূতের গুজা

"শোভা! বাপের নাম কি?"

"বিপিনচন্দ্র রায়।"

"বাড়ী?"

"মুকুন্দপুর!'

"কার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা স্থির হ'ল। মেয়ের অভিভাবক কে?"

"তার কাকা যাদবচন্দ্র রায়। তিনি কালীঘাটে থাকেন; আলীপুরে চাকুরী করেন।'

সুখময় সহসা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সুরথ কহিল, "ওকি ও! হাসলে যে।"

সুখময় হাসিতেই লাগিল। অনেকক্ষণ হাসিল। হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সুরথ যারপর নাই বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। হাসির বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সুরথ কহিল—কিহে, অত হাস্‌ছ কেন। হঠাৎ কি হল।

সুখময় কষ্টে হাসি চাপিতে চাপিতে কহিল "না এমন কিছু নয়, তবে ঠিক ঐ মেয়ের সঙ্গেই আমিও আমার সম্বন্ধ করে এলুম। ওই শোভা তোমার বৌদির পিসতুত বোন্।'

"অ্যা!"

অতি বিস্ফারিত নেত্রে, অর্দ্ধ বিস্ফারিত বদনে এই একটী মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিবর্ণ মুখে সুরথ সুখময়ের দিকে চাহিল।

সুখময়ের বুকভরিয়া, মুখ ফাটিয়া আবার প্রচণ্ড হাসির বেগ ছুটিল। আবার তেমনই সে হাসিল, কাসিল, কাঁদিল, হাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। একটু সামলাইয়া কহিল, "এ যে একই তিলোত্তমা,—এখন কি তবে সুন্দ উপসুন্দের লড়াই হবে, দাদা!"

"না না তা কেন,—তা কেন,—তা—তা—এ ———

"এ তা—তা—না না র কাজ নয় ভায়া, এখন কি হবে বল,—এক তিলোত্তমা, আর দুই সুন্দ উপ সুন্দ। তবে ডুয়েলের একটা ব্যবস্থা করা যাক।

"এটা কি ক'রে সম্ভব হ'ল, তুমি বোধ হয় ভুল করেছ। এক নামে কি দুজন থাকে না।"

"ভুল আমি কিছুই করিনি। তুমিই গোড়াতে বেজায় ভুল ক'রে ফেলেছ। একেবারে সাফ বৌদিকে জবাব না দিয়ে, আগে মেয়েটির কণ্ঠস্বর শোনবার যদি একটু ব্যবস্থা করে নিতে, তবে আর এ গোল হত না।"

"কিন্তু এমনটা কি করে হল,—এ যে অসম্ভব বলে মনে হচ্চে।"

"কিছুই অসম্ভব নয়। দেখা যাচ্চে কন্যার দুই অভিবাবক, মাতুল ও খুল্লতাত; কন্যা উভয় স্থানেই অবস্থান করে থাকেন, কেনই বা না করবেন। আমার সম্বন্ধের কর্ত্তা হয়েছেন মাতুল,—আর তোমার হয়েছেন খুল্লতাত। দৈবযোগে কন্যার বর্ত্তমান অবস্থান ঘটেছে খুল্লতাত গৃহে,—সঙ্গে সঙ্গে পিসির কালীঘাটে আগমন, কাজেই বাসা গ্রহণ—আর তোমারও অমনি প্রেমে পতন—স্কন্ধস্থিত ভূত ছাড়ন। এর মধ্যে অসম্ভব কি অলৌকিক ত কিছুই দেখতে পাচ্চিনা। বেশ ঘটনা পরম্পরায় স্বাভাবিক সংযোগই দেখা যাচ্চে। খবর নিয়ে দেখ, কন্যার মাতুল গৃহে এবং খুল্লতাত গৃহে ঠিক এমনি সমস্যা উপস্থিত। তোমার বৌদির ঘরেও তথৈবচ হয়েছে—কি হবে হবে হয়েছে।"

সুরথ আর কি বলিবে। বড় ক্লেশকর, দ্বিধা-বিস্তার বিষণ্ণ বিশুষ্ক মুখে বসিয়া রহিল।

সুখময় মুচকি মুচকি হাসিয়া কহিল, এখন কি হবে ভায়া,—ডুয়েল করবে! তবে ব্যাপারটা আজকাল বড় বে আইনী। আর এক কাজ করা যাক—কি বল।—লটারি করে একজনে বিষ খেয়ে মরি। তার বিফল চেষ্টাটা দণ্ডনীয় বটে, কিন্তু সফল সিদ্ধিতে কোন দণ্ড নাই।"

সুরথ সহসা ঘড়ি দেখিয়া কহিল, ওহো! অমার বড় একটা কাজ আছে। এখনই যেতে হবে, আসি তবে।"

সুরথকে সুখময় ধরিয়া বসাইল, "আহা পালাচ্চ কেন; ব'সনা, একটা ব্যবস্থা করেই যাও। ইস্, এই মাঘের শীতেও ঘেমে জল হ'য়ে যাচ্চ।"

সুরথ কহিল "ব্যবস্থা আর কি।—তুমিই বিবাহ করবে। তাই উচিত।—আমি—আসি—"

"তুমি সন্ন্যাসী হয়ে তীর্থে তীর্থে তার মধুর নাম ভজনা করে বেড়াবে, কেমন নয়? তা বিয়ের নিমন্ত্রণটা খেয়ে যাবে না?"

সুরথ বড় কাতর দৃষ্টিতে সুখময়ের পানে চাহিয়া কহিল, "সুখময়, মাপ কর ভাই। আমার বড় কাজ আছে।"

"কাজটা ত ঘরে দরজা বন্ধ করে, শয্যায় শয়ন, আর নির্জ্জনে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন। তা সে ব্যবস্থা না হয় এইখানেই করে দিচ্চি। মনের অবস্থা ভাল নয়, দেহও তদ্বৎ। পথে হঠাৎ মূর্চ্ছা গিয়ে শেষে গাড়ী চাপা পড়ে মরবে; আর আমাদের বিবাহিত জীবনটা দারুণ অভিশপ্ত হ'য়ে থাকবে। তাও কি হয়।"

সুরথ অগত্যা বসিল। সুখময় পুনরায় কহিল, "তা ধর আমি যদি স্বেচ্ছায় সত্ত্ব ত্যাগ করি,—তবে কি হয়।"

সুরথ চমকিয়া সুখময়ের দিকে চাহিয়া কহিল "সেকি বলছ সুখময়। ছি ছি! তাও কি হয়।"

"কেন হবে না!"

"আমার কথায় তুমি গিয়ে সম্বন্ধ ক'রেছ।"

"সেত মুখের কথায় ক'রেছিলুম, এখন মনের কথায় ছেড়ে দিচ্চি।"

"আমার মনের কথাও ইহা নয়।'

"উপর মনের না হক, ভিতর মনের ত বটে। সেইটেই যে সকলের বড়। ঢের পাগলামো করেছ দাদা, আর কাজ নেই। আমি এখনও বাঁশীও শুনিনি, চোখেও দেখিনি, অশরীরী স্বরই বল, আর শরীরী রূপই বল, কিছুরই সঙ্গে প্রেমে পড়িনি। বিবাহের আগে ওটা না হওয়াই ভাল,—পরেও যথেষ্ট প্রেমের অবসর হয়। আর সেটা বেশ নির্ভাবনায় চলে,—শীতে আর গলদঘর্ম্ম হ'তে হয় না। তা আমি মারা যাবনা, সন্ন্যাসীও হব না। বিবাহ প্রয়োজন, তা যে কোন কুমারী হলেই চল্‌বে। দেশে কিছু তার অভাব নাই। দেখে শুনে একটা ব্যবস্থা করে নেব। প্রেমের যদি কিছু বীজ থাকে,—বিবাহের মঙ্গল-বারি সেচনে পরেও তা বেশ গজাবে। সে জন্য ভাবনা কি, তাড়া তাড়িও কিছু নেই।"

সুরথ কোন কথা কহিল না। সুখময় কহিল "তবে কি মৌনং সম্মতি লক্ষণম্।"

সুরথ আরক্তমুখে ঈষৎস্মিত সাশ্রুনয়নে সুখময়ের দিকে চাহিল। সুখময় কহিল "হ্যাঁ—এইত চাউনির মত চাউনি!—হায়! হায়! বিবাহের পূর্ব্বে প্রেমও হবে না,—অমন চাউনিটিও এ চ'খে কখনও ফুট্‌বে না।

সুরথ কহিল, "একটা কথা তবে আমার রাখতে হ'বে।"

"কি বল।'

"এক সঙ্গেই দুজনের বে হবে।"

সুখময় উত্তর করিল, "কি রকম, কন্যাটিকে কি দুজনে ভাগ করে না নিলেই হবে না। একটা ভুল না হয় হয়েই গ্যাছে, তার জন্য কি এখন দ্বি-পাণ্ডব ঘটিত একটা নূতন মহাভারত সৃষ্টি করে হবে।"

ওহে, তা কে বল্‌ছে। তাও কি হয়। আমি বলছি কি, একটী মেয়ে ছাখ, এক দিনেই দুজনের বিয়ে হক। তোমায় ফেলে আমি বিয়ে করব না।

"আমায় ফেলে যদি প্রেমে পড়্‌তে পেরেছ,—বিয়ে করে সেটা পাকিয়ে নিতে পার্‌বে না?"

'সেটা যা হবার তা ত হয়ে গ্যাছেই, ঠাট্টা যত পার কর, আর কি করব; তা এখন যেটা বল্‌ছি, তার উপায় কর।

"আমিত স্ত্রীর অভাবে এমন কাতর হইনি,—তবে তোমার অনুরোধে সত্বর বিবাহিত হতেও কোন আপত্তি নাই। তবে একটী কন্যা তুমিই দেখে দেওনা, তবে দেখো—এটিরও মধুর-ঝঙ্কৃত কণ্ঠস্বর যেন কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে না গো।'

সেটা কি আর দুবার করেও হয়।

প্রেম-প্রবণতা যাদের বেশী, তাহাদের সহস্রবারও অমন হতে পারে, হয়েও থাকে।'

"তবে তুমি নিজেই দেখ না।'

"না না দাদা, তুমিই দেখ। যদি এমন কিছু ঘটে তাতে এখন তোমার বই আমার ক্ষতি এমন কিছু নাই। তুমিই দোটানায় পড়ে মারা যাবে। আমি কিছু আর কন্যার অভাবে অবিবাহিত থাকবো না। না হয়, তোমার বৌদিকেই বল না,—তার আর ভগ্নী টগ্নী যদি কেহ থাকে, তবে তাই বেশ হবে। তাঁকে ব'লো,—আমার রম্ভা তিলোত্তমার প্রয়োজন নাই,—চলন সইতেই চল্‌বে।

"আচ্ছা তাই তবে লেখা যাক্‌।"

সুরথ বিনোদিনীকে লিখিল। বিনোদিনীর বিবাহ যোগ্যা একটী মামাত ভগ্নী ছিল, তাহারই সঙ্গে সে সুখময়ের সম্বন্ধ স্থির করিল।

বর দ্বয়ের ইচ্ছামত কলিকাতাতেই, এক বাড়ীতে, এক তারিখে, এক লগ্নে উভয়ের বিবাহ হইল।

বাসরে বিনোদিনীর হস্তে সুরথের যে লাঞ্ছনা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা আর নিষ্প্রয়োজন। পাঠকবর্গ তাহার ভাব, পরিমাণ, তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

আকর্ষণ।

[জাপানী গল্প]

১

প্রভাতারুণের প্রথম রশ্মি সবে মাত্র পৃথিবীকে চুম্বন করিয়াছে। তরঙ্গায়িত সমুদ্রের অনন্ত নীল বারিরাশির উপর সেই লোহিতাভা মিশিয়া, দূরে—বহুদূরে কোন ছায়াময় স্বপ্ন-লোকে চলিয়া গিয়াছে। তীরে কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়। তাহারই একটির উপর দাঁড়াইয়া মিনা সাগ্রহ দৃষ্টিতে সেই লাল ছায়ালোকের পানে চাহিয়াছিল।

সমুদ্রসলিলে প্রতিভাত সূর্য্যের রক্তাভা যুবতীর মুখ রঞ্জিত করিয়াছিল। শীকর-সিক্ত প্রভাত বায়ু তাহার অলক দাম নাচাইতে ছিল।

সমুদ্রের মধ্যে দূরে কতকগুলি ডিঙ্গি কৃষ্ণবিন্দুর মত দেখাইতে ছিল, ক্রমে সেগুলি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। একখানি ছোট ডিঙ্গি অন্য গুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া অতি দ্রুত আসিয়া তীরে ভিড়িল। যুবতীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। এক সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক লম্ফ দিয়া নামিয়া ডিঙ্গি খানিকে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিল। তারপর দ্রুত আসিয়া যুবতীর কর চুম্বন করিল।

ডিঙ্গিতে কতকগুলি সদ্যোধৃত মাছ ও একখানি জাল ছিল।

যুবকের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মসিক্ত। যুবতী হস্তস্থিত রুমালে যুবকের মুখ মুছাইয়া বলিল—"এখনো তোমার দৌর্ব্বল্য যায় নাই, বড় পরিশ্রম হয়েছে—একটু বিশ্রাম কর।"

দুইজনে সেইখানে বসিল।

কেহই দেখিল না যে, তাহাদের অজ্ঞাতসারে আর এক ব্যক্তি পর্ব্বত পার্শ্বে লুকাইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার হস্ত সহসা মুষ্টিবদ্ধ হইল, চক্ষু একবার জ্বলিয়া উঠিল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, দন্তে অধর দংশন করিল; তারপর সেখান হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইল।

২

সমুদ্র তীরে দরিদ্র ধীবর পল্লী—চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর ধীবরের বাস। পুরুষেরা সমুদ্রে মাছ ধরে, ছোট খাট ক্ষেত্রে তরি তরকারিটা চাষ করে, আর অবসর কালে সমুদ্রকূলে মুক্ত বাতাসে ব্যায়াম করিয়া, প্রকৃতির প্রিয় সন্তানের ন্যায়,

দিন দিন সুগঠিত স্বাস্থ্য সম্পন্ন হয়। স্ত্রীলোকেরা দৈনন্দিন সাংসারিক কার্য্য সমাপ্য করিয়া, মাছ ধরায়, ফুল বাগানে, চাষের ক্ষেতে পুরুষদের সহায়তা করে। মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে কুসুম স্তবকের ন্যায় তাহাদের সৌন্দর্য্যের প্রভায় গ্রাম খানিকে আলোকময়, হাস্যময় করিয়া রাখে।

দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্রের মধ্যেও সন্তোষ—অভাবের ক্রোড়েও শান্তি বিরাজ করে।

মিনার পিতা ধীবর পল্লীর মধ্যে একটু সম্পন্ন গোছের গৃহস্থ। তাঁহার চারি পাঁচ খানি ডিঙ্গি ছিল, তাহাতে পাঁচ সাত জন ধীবর তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিত।

পিতৃ মাতৃহীন অনাথ অসহায় ওয়াচা যখন তাঁহার দ্বারে আসিয়া আশ্রয় চাহিল, তখন তাহার বয়স দ্বাদশ বৎসর। বালকের দুঃখে, ও তাহার পুরুষ-জনোচিত অঙ্গ-সৌষ্টব দর্শনে, অপুত্রক মিনার পিতার মন টলিল—তিনি ওয়াচাকে বাটীতে স্থান দিলেন। মিনা খেলার সঙ্গী পাইল।

একবৃন্তে যুগল কুসুমের মত—একত্রে আহার, একত্রে ভ্রমণ—একত্রে শিক্ষা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুজনে দুজনার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

একদিন কর্ম্মাবসানে, ফুটন্ত জ্যোৎস্নার কোলে সাগর বেলায় বসিয়া মিনা সহসা দেখিল—তাহার পার্শ্বোপবিষ্ট ওয়াচার মুখে, কোন অজ্ঞাত স্বপ্নরাজ্যের অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে; ওয়াচা দেখিল—অসীম জগত সসীম হইয়া কিশোরীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত—তাহার একমাত্র চিরঈপ্সিত—চির আরামের আনন্দ নিকেতন।

সংসার ভুলিয়া, জগত ভুলিয়া দুইজনে আলিঙ্গন বদ্ধ হইল।

৩

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রিয়দর্শন ওয়াচার গুণ-মুগ্ধ সমগ্র ধীবর পল্লীবাসীর সুখ্যাতি, ও আপনাদের পুত্রাধিক স্নেহ সত্ত্বেও মিনার পিতা মাতা কখনও ভাবেন নাই, যে ভৃত্যের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। ওয়াচা সুপাত্র হইলেও—অনাথ, অসহায় ভৃত্য মাত্র। সুতরাং ওয়াচো যখন মিনার পানি প্রার্থনায় তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল, তাঁহারা সাদরে তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

মিনার পিতার অন্যান্য ভৃত্যবর্গের সহিত অতি প্রত্যুষে উঠিয়া, ওয়াচা তাহার ক্ষুদ্র ডিঙ্গিখানি লইয়া মাছ ধরিতে যায়। মিনা তাহার অপেক্ষায় পাহাড়ের উপর বসিয়া থাকে। মাছ ধরিয়া তীরে ফিরিলে, মিনা গিয়া মছে বাছে, জাল

ঝাড়ে, প্রতি কার্য্যে ওয়াচার সহায়তা করে। এইরূপে প্রত্যহ কাটে। মাছ ধরার কঠোর পরিশ্রম, মিনার সহায়তায়, ওয়াচার নিকট আনন্দময় ক্রীড়ায় পরিণত হয়। তারপর সেই মাছ বিক্রয় করিয়া দু'জনে যখন ভবিষ্যৎ সুখের ছবি আঁকিতে আঁকিতে গৃহে ফিরিয়া যায়, তখন এই বৃহৎ কর্ম্ম-ম্লান জগৎ তাহাদের নিকটে শিশুর আনন্দময় খেলাঘরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে।

ওয়াহো ধনীর সন্তান। অনুগ্রহলিপ্সু চাটুকারদের মুখে আপনার রূপ গুণের প্রশংসা শুনিয়া তাহার মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, সে ইচ্ছা করিলেই—যে কোন সুন্দরীর মনোহরণে সমর্থ। তাই যখন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া মিনা, তাহার চক্ষের উপর, হাসিতে হাসিতে ওয়াচার হাত ধরিয়া মাছ ধরিতে চলিয়া গেল, তখন তাহার আত্ম গৌরবে আঘাত লাগিল—দীন ভৃত্য তাহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী? তাহার চক্ষু রক্তাভ হইল, দন্তে অধর স্পৃষ্ট হইল! ভাল, সে ওয়াচাকে দেখিয়া লইবে!

ওয়াচারই যেন সকল অপরাধ!

মিনার পিতা তাহার প্রস্তাবে যখন সম্মতি জ্ঞাপন করিল, তখন তাহার আর বিলম্ব সহিল না। ওয়াচার প্রণয়-গর্ব্ব-দৃপ্ত মস্তক ধুলায় লুণ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য সে আপনিই সেই সংবাদ বহন করিয়া লইয়া চলিল।

সমুদ্র তীরে ওয়াচা মাছ ধরিয়া জাল শুকাইতে ছিল, হাস্যমুখী মিনা মাছ গুলি বাছিয়া বাছিয়া বিক্রয়োপযোগী পাত্রে সাজাইতে ছিল। ওয়াহো সেইখানে উপস্থিত হইয়া পিতার অভিমত মিনাকে শুনাইয়া দিল। মিনা ভৃত্যের সহিত ভৃত্যজনোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আত্ম সম্মান লাঘব করিতেছে, সুতরাং তাহাকে এখনিই উহা হইতে বিরত হইয়া গৃহে ফিরিতে হইবে—এইরূপ ওয়াহোর অভিপ্রায়।

ওয়াচার মুখ কালিমাঙ্কিত হইল, শ্লথ মুষ্টি হইতে জাল খানি পড়িয়া গেল, সে ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে চক্ষু ফিরাইল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছিল।

মিনার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে ওয়াহোকে কহিল "ধনী বা গরীব, যে রমণী বিলাস বা মর্য্যাদা বশে আপন হস্তে নিজ গৃহ কর্ম্ম হইতে বিরতা হয়, তাহারা আমাদের ঘৃণার্হ! জাপানবাসীকে বোধ হয় এ কথা বুঝইতে হইবে না। আর পিতার অভিমত যখন তাঁর নিজ মুখে শুনিব—তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমার যথেষ্ট উপকরণ প্রস্তুত থাকিবে জানিও। উপস্থিত এখানে

অন্তকার্য্য না থাকিলে, তুমি আপন কারখানায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভৃত্যবর্গের উপর "নিজ প্রভুত্ব জাহির করিতে পার।"

ওয়াচার হস্ত স্খলিত জাল তুলিয়া ওয়াচার হাতে দিয়া, মিনা তাহার সহিত জাল শুকাইতে প্রবৃত্ত হইল।

অপমানিত ওয়াহোর চক্ষুদ্বয় পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠিল, সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে চলিয়া গেল।

কিরূপে ওয়াচাকে সরাইবে ওয়াহোর মনে কেবল সেই চিন্তাই জাগিতেছিল।

৪

মাতা যখন কন্যার হৃদয় জানিলেন, তাঁহার অত্যন্ত ভাবনা হইল। তিনি আপন পতীকে ভালরূপ জানিতেন; তিনি যখন ওয়াহোকে কন্যাদান করিতে বাক্যবদ্ধ হইয়াছেন, তখন তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করা যে দুঃসাধ্য তা তাঁহার অবিদিত ছিল না। এ দিকে একমাত্র স্নেহের পুত্তলি নয়নানন্দ তনয়াকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরের হস্তে দিয়া কোন প্রাণে তাহাকে চিরদুঃখিনী করিবেন? ও দিকে তিনি অপুত্রক, ওয়াচা নিজ গুণে তাঁহার অন্তরে পুত্রের আসন পূর্ণ করিয়া বসিয়াছিল। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া অন্যের হস্তে কন্যা দান করিতেও প্রাণ চাহে না--উপায় কি?

অনেক ভাবিয়া চিন্তায় স্থির হইল যে, ওয়াচা যদি কোন উপায়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে হয়ত কর্ত্তার মত ফিরিতেও পারে।

ওয়াচা আনন্দের সহিত সম্মত হইল—সে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিবে। ওয়াচার নিকট সমগ্র জগৎ এক দিকে, আর মিনা অন্য দিকে। তাহাকে পাইতে সে কি না করিতে পারে? ঐকান্তিক চেষ্টা ও অধ্যাবসায়ের বলে মানুষ অঘটন ঘটাইতেছে, সে আর সামান্য অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে না?

চেষ্টা করিয়া ওয়াচা এক কারখানায় রাত্রে কার্য্য জুটাইয়া লইল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে অল্পমাত্র বিশ্রাম করিয়া, সন্ধ্যার পরে ওয়াচা তাহার নূতন কর্ম্মে যাইত। অর্দ্ধ রাত্রি অতিবাহিত হইলে শ্লথ অবসন্ন দেহে ওয়াচা যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, মিনার জাগরিত করুণ আঁখি দুটি তাহার শরীরের সমস্ত অবসাদ বিদূরিত করিয়া দিয়া, তাহার দেহে নব জীবনের নবীন উদ্যম আনিয়া দিত। সামান্য দুই এক ঘণ্টা সুখ নিদ্রায় সবল হইয়া, পুনরায় অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ওয়াচা প্রাত্যহিক মাছধরা কার্য্যে গমন করিত।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

ওয়াচার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় জাগরিতা মিনা, এক দিন শেষ রাত্রে সভয়ে দেখিল—কতকগুলি লোক ওয়াচার মূর্চ্ছিত দেহ বহন করিয়া আনিয়া দিয়া গেল, শুনিল—ওয়াচাকে শুঁড়িখানায় এই অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

ওয়াচার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, রক্তে পরিধেয় সিক্ত। সর্ব্বাঙ্গ হইতে তীব্র মদিরার গন্ধ ছুটিতেছে।

বহনকারীদের কথায় মিনার বড় বিশ্বাস হইল না। সে কাহাকেও ডাকিল না, কষ্টে সৃষ্টে ওয়াচাকে কোন রকমে কোলে করিয়া ঘরে নিয়া শোয়াইয়া দিয়া, সুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

সুশ্রূষা করিতে গিয়া মিনা দেখিল, ওয়াচার মুখের মধ্যে মদের গন্ধ নাই। তাহার মনে ঘোর সন্দেহ হইল—ষড়যন্ত্রের ফল নয় ত! হঠাৎ ওয়াহোর কথা মনে পড়িয়া তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

সত্বর পিতা মাতাকে জাগাইয়া মিনা সমস্ত ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিল। তাঁহারা আসিয়া ওয়াচার অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

প্রাতঃকালে ওয়াহো আসিয়া অভিযোগ করিল। কারখানা বন্ধ করিয়া রাত্রে সে যখন গৃহে ফিরিতেছিল, পথি মধ্যে ওয়াচার সহিত সাক্ষাৎ হয়। ওয়াচা পানোন্মত্ত। ভর্ৎসনা করিলে, ওয়াচা কতকগুলি মদ্যপ লম্পট ডাকিয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। সে কোন রকমে পলাইয়া রক্ষা পাইয়াছে।

মিনার পিতা তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ওয়াচার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। হৃত-চৈতন্য ওয়াচার অবস্থা দেখিয়া সে তাহার অপরাধ বিস্মৃত হইল, ঈশ্বরের নিকট তাহার আরোগ্য প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইল।

যাইবার কালে ওয়াহোর বক্র নয়নের কোণে ঈষৎ আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার অধর প্রান্তে বুঝি বা একটু সাফল্যের হাসি দেখা দিয়াছিল।

অবশ্য মিনার পিতা মাতা কেহই ওয়াহোর কথায় বিশ্বাস করিলেন না, বরং তাঁহাদের মনে প্রবল সন্দেহ উপস্থিত হইল। গৃহিণী স্পষ্টাক্ষরেই বলিলেন "এ ওয়াহোর কাজ।"

কন্যার ছল ছল কাতর মুখখানির পানে চাহিয়া পিতার মন টলিল। ওয়াচার অবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন, ওয়াহোর উপর ঘৃণা আসিল। প্রতিজ্ঞা

করিলেন—"ভগবান ওয়াচাকে আরাম করুণ, আগামী পূর্ণিমায় ওয়াচার করে কন্যা সম্প্রদান করিবেন।"

তখন ধীরে ধীরে রুষ-জাপানের যুদ্ধ ধোঁয়াইয়া উঠিতেছিল ?

৭

যাহাকে ভালবাসি, তাহার শুশ্রূষা লাভের আশায়, অনেক সময় পীড়া স্পৃহনীয় হয়। মিনার প্রাণঢালা সেবা, যত্ন ও ভালবাসায় ওয়াচা সত্বরই আরোগ্য লাভ করিল। মিনার শুষ্ক ওষ্ঠে মধুর হাসিতে যৌবনাভা নবজীবনে জাগিয়া উঠিল।

ওয়াচা আরোগ্য লাভ করিলেও সম্পূর্ণ বল পায় নাই। এরূপ কর্ম্মহীন সারাবেলা আলস্যে যাপন করা তাহার পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। সে মিনার সহিত সমুদ্র তীরে ভ্রমণ আরম্ভ করিল।

আগামী পৌর্ণমাসীতে তাহাদের বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত বল লাভ করিলেই সে সখ করিয়া একদিন মাছ ধরিতে গেল, মিনা পাহাড়ের উপর তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

মাছ ধরিয়া তীরে প্রত্যাগমন করিয়া ওয়াচা যখন ডিঙ্গি টানিয়া তুলিল, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া গিয়াছে; মিনা আদর করিয়া হস্তস্থিত রুমালে তাহার মুখ মুছাইয়া দিল। দুইজনে তখন পাহাড়ের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে, নবোদিত সূর্য্যের রক্তিমাভায় রঞ্জিত সাগরের পানে চাহিয়া, সমাগত ভাবী মিলনের অশেষ সুখের ছবি কল্পনা করিতে লাগিল।

কিছু দূরে শৈল-অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ওয়াহো তীক্ষ্ণ নয়নে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিল। ওয়াহোর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, দন্তে অধর দংশন করিল, তৎপরে ধীরে ধীরে সেখান হইতে অপসৃত হইল।

কেহই ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিল না। পাঠক পূর্ব্বেই জানিয়াছেন।

সেই দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেশের প্রধান ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র আসিল—বলিষ্ঠ যুবক ওয়াচাকে স্বদেশ রক্ষার্থে যুদ্ধে গমন করিতে হইবে!

৮

দেশময় যুদ্ধের অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বালক, যুবা, পৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেরই বদনে এক অদম্য নবীন উৎসাহের ভাতি—নয়নে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার চিহ্ন প্রকটিত। দলে দলে যুবক ও প্রৌঢ় সম্প্রদায় স্বদেশ রক্ষার্থে বদ্ধ পরিকর হইয়া, স্বেচ্ছায় সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে চলিল।

দ্বিতীয়ার দিন সন্ধ্যার সময়ে সাগর-সৈকতে বসিয়া ওয়াচা বলিল—

"মিনা রাত্রিটুকু মাত্র ব্যবধান। কে জানে—হয়তো বা এ জীবনে আর—আর তোমাকে দেখিতে পাইবনা। এক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু মিনার অজ্ঞাত সারে ওয়াচার নয়ন প্রান্তে মিশাইল।

ওরূপ ভাবিও না, মনে নৈরাশ্য আসিবে। দেশের কল্যাণে যুদ্ধে যাইতেছ, তাই আমি হাসিমুখে তোমাকে বিদায় দিতেছি। আমার মনে একান্ত বিশ্বাস—আগত পূর্ণিমায় আমাদের বিবাহ কেহই রোধ করিতে পারিবে না। আমি বিজয়ী বীরের কণ্ঠে বরমাল্য পরাইয়া যে আনন্দ, যে গৌরব লাভ করিব, তাহার তুলনায় সমগ্র জগতের ঐশ্বর্য্য সম্পদও আমার নিকট ম্রিয়মাণ।

ওয়াচার অগোচরে মিনাও এক ফোঁটা চক্ষের জল মুছিল।

* * * * * * *

মিনাদের গৃহ প্রাঙ্গণে ছোট একটি পুষ্প বাটিকা,—ওয়াচা ও মিনার স্বহস্ত রচিত। ওয়াচা চলিয়া গিয়াছে। মিনা প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত, সেই উদ্যানে বসিয়া পথ চাহিয়া থাকে। তাহার মন যুদ্ধ ক্ষেত্রে ওয়াচার চতুঃপার্শ্বে কল্যাণ বর্ষণ করে।

আজি পূর্ণিমা। তৃতীয়ার অতি প্রত্যূষে ওয়াচা চলিয়া গিয়াছে। একে একে এতগুলি দিন গেল—ওয়াচা ফিরিল না। আজি সে নিশ্চয় ফিরিবে। মিনার মনে—কে জানে কেন—দৃঢ় প্রতীতি, আজি ওয়াচা ফিরিবে। যত রাত্রি হউক, যেমন করিয়া হউক, আ'জ ওয়াচা নিশ্চিত আসিবেই আসিবে।

৯

বৈকাল হইতেই আজি মিনা তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া বাগানে গিয়া বসিল।—আ'জ ওয়াচা আসিবে!

তাহাদের স্বহস্ত রচিত পুষ্প বাটিকার মধ্যে আজি অতীতের সহস্র স্মৃতি মূর্ত্তিমতী হইয়া মিনাকে বেষ্টন করিল। ওই গাছটা ওয়াচা কারখানা হইতে আনিয়াছে, এই কেয়ারীটা করিতে কাচখণ্ডে ওয়াচার হাত কাটিয়া গিয়াছিল, ওই ডালটা ওয়াচা সেদিন ছুঁাটিয়া দিয়াছে—মিনার মন ওয়াচাময় হইয়া উঠিল!

আর দেরী নাই—ওয়াচা এই আসে! মিনা দ্রুত উঠিয়া পুষ্প চয়নে প্রবৃত্ত হইল। ওয়াচাকে উপহার দিবে। ওই না পদ শব্দ? বুঝি ওয়াচা আসিতেছে। শীঘ্র—শীঘ্র—আরও ফুল চাই, এই কয়টায় কি হইবে? ওই—আলো—ওই

পদ শব্দ নিকটবর্ত্তী হইতেছে—ওই—ওই ওয়াচা আসিতেছে। এস—এস প্রিয়তম এস,—এস চিরবাঞ্ছিত! এস—এস বিজয়ী বীর! আজি কতদিন তুমি দূরে গিয়াছ! না—না—এই যে তুমি আমার অন্তর আলো করিয়া আছ! এই যে—! এই যে—আমার পার্শ্বে! এই যে—সম্মুখে! এই যে—আমার চারি দিকে! এই যে—চক্ষের উপর রহিয়াছ! দাসীর পুষ্পোপহার গ্রহণ কর। মিনা জগত ভুলিল—সংসার ভুলিল, অতীত ভুলিল—বর্ত্তমান ভুলিল—স্থান কাল ভুলিল!——ওয়াচাময়ী—ওয়াচায় ডুবিল!

আকর্ষণে ভগবান আসেন—মানুষ আসিবে বিচিত্র কি?

গভীর রাত্রি—নগ্ন জ্যোৎস্নার অনাবিল সুষমায় ভুবন বিভাষিত। পুষ্প সম্ভার লইয়া, হস্ত প্রসারণ করিয়া মিনা ওয়াচাকে দিতে গেল।

ধীরে—ধীরে—অতি ধীর গম্ভীর পাদক্ষেপে ওয়াচা উদ্যান দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল!

প্রসারিত হস্তে মিনা ওয়াচাকে হৃদয়ে ধরিতে অগ্রসর হইল। দুই পদ গিয়াই সহসা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তারপর চীৎকার করিয়া মিনা মূর্চ্ছিতা হইল।

ওয়াচার হৃদয়ে গুলির বিষম আঘাত। ক্ষত স্থান হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইতেছিল।

* * * * * * *

প্রাতে ওয়াহোর পত্র আসিল। গত রাত্রিতে দ্বি প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, শত্রুর গুলিতে ওয়াচা প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী।

নন্দাশ্রম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এ কে ?

তস্কর দ্বয় বুঝিল, এবার তাহাদের এই শেষ। নিশ্চয়ই নরোত্তম দাস কোনও রূপে জানিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়াছে,—সেজন্ত পিস্তল লইয়া তাহাদের গুলি করিতে আসিয়াছেন। ভয়ে তাহাদের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল।

লালদাস দেখিল, নরোত্তম দাস সহসা লাফাইয়া একখানা পর্দ্দার অন্তরালে লুকাইলেন, তাঁহার এই কার্য্যে তাহারা বিস্মিত হইল,—ভাবিল, তাহা হইলে নরোত্তম তাহাদিগকে দেখিতে পায় নাই।

তাহারা পলাইবে কি না কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল,—এই সময়ে দেখিল সেই গৃহ মধ্যে একটী স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ প্রবেশ করিল,—ইহাদের দুইজনকেই ইহারা চিনিত। দেখিল, একজন ডাক্তার, স্ত্রীলোকটী জিনাবাঈ।

তাহারা উভয়ের কথা শুনিল, তাহারা দেখিল, সহসা ডাক্তারা জিনাবাঈর গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে,—তাহাদের চোখের উপরে খুন হয়,—কিন্তু তাহারা কি করিবে,—তাহাদের কিছুই করিবার উপায় নাই,—তাহারা একটু শব্দ মাত্র করিলে বিপদে পড়িবে।

সহসা এই সময় নরত্তম দাস পিস্তল হস্তে বাহির হইয়া আসিলেন। ডাক্তার জিনাবাঈকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার পর যে লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল,—তাহাও তাহারা দেখিল, দেখিয়া স্তম্ভীত হইয়া জড়ীভূতবৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা জিনাবাঈকে সেই স্নানাগারের দিকে আসিতে দেখিয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল,—তবে তো এখনই ধরা পড়িবে—এ অবস্থায় ইহারা তাহাদের দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই প্রাণে পর্য্যন্ত মারিবে। দামোদর মূর্চ্ছিত

প্রায় হইল। লালদাস তাহার কানে কানে বলিল, "বাঁচিতে চাও ত শীঘ্র এই পিপার ভিতরে লুকাও।"

বিপদে বুদ্ধি আপনি আসে। দামোদর তৎক্ষণাৎ পিপার ভিতরে প্রবেশ করিল,—তাহার সঙ্গে সঙ্গে লালদাসও লাফাইয়া পড়িল। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে তাহারা ধরা পড়িত,—কারণ তাহারা পিপার মধ্যে লুকাইতে না লুকাইতে জিনাবাঈ সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল—সে কোন দিকে চাহিল না; সত্বর জানালা খুলিয়া, জানালা দিয়া বাহির হইল।

জানালা হইতে একটু দূরে গরুর গাড়ী খানা দাঁড়াইয়া ছিল,—জিনাবাঈ তাহা দেখিয়াও দেখিল না; সে তীব্র বেগে গলি হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

বহুক্ষণ লালদাস ও দামোদর পিপার ভিতরে রহিল; যখন আর কোন দিকে কোন শব্দ নাই,—তখন লালদাস বলিল, "এস।"

দামোদর বলিল, "চল পালাই—আর এক মিনিট আমি এখানে থাকিব না। দেখে শুনে আমার হাত পা পেটের ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে!"

"কিছু করিতে হইবে না,—আমি সে উদ্দেশ্য ছাড়িয়া দিয়াছি।"

"তবে চল পালাই—আর এখানে থাকে?"

"দাঁড়াও ভয় নাই—ও দিককার দরজা বন্ধ করিয়া জিনাবাঈ এ দিক দিয়া পলাইয়াছে,—এ দিকে আর কেহই আসিতে পারিবে না। এই ঘরে এস।"

"বাপ—প্রাণ থাকিতে নয়—"

"ভয় নাই—"

"থাকুক আর নাই থাকুক—আমি আর ও ঘরে যাইতে পারিব না।"

"ভয় নাই—একেবারে চিরকালের মত আমরা বড় লোক হইয়া যাইব।"

"কিসে?"

"পরে বলিব—এখন আমার সঙ্গে আস্‌বে কি না?"

"লালদাস তুমি জান; ভাল মন্দ সব কাজেই আমি তোমার সঙ্গে আছি।"

"তবে এস—যাও গাড়ীখানা জানালার কাছে লইয়া রাখ।"

"গাড়ীতে কি লইবে?"

"দেখিতে পাইবে—আমি জানালা দিয়া এটা গলাইয়া দিলে, তুমি ও দিক হইতে ধরিয়া গাড়ীর ভিতর রাখিবে।"

"কি সেটা?—গাড়ীতে কি লইতে চাও?"

"মরা মানুষ—লোক।"

দামোদর চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল, ক্ষিপ্র হস্তে লালদাস তাহার মুখ চাপিয়া না ধরিলে, অনর্থ ঘটিয়াছিল আর কি ?

লালদাস তাহার সঙ্গীর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল,--কিন্তু সে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিল, "আমি কতবার বলিব যে, কোন ভয় নাই, এটাকে লইয়া যাইতে পারিলে আমরা চিরকালের মত বড় লোক হইয়া যাইব—তুমি তোমার দামোদরনীকে লইয়া রাজার হালে থাকিতে পারিবে—আর এ সব করিতে হইবে না—কেমন রাজি আছ ?"

দামোদর কোন কথা কহিল না, লালদাস বলিল, "এখানে আর বেশীক্ষণ থাকিলে মারা যাইতে হইবে—শীঘ্র বল।"

"তুমি যাহা বল—কিন্তু কেমন করিয়া ওটা ছুইব ?"

"অত মেয়ে মানুষের মত হইলে বড় লোক হওয়া যায় না—শীঘ্র বহির হইয়া যাও, আমি ওটাকে জানালা দিয়া বাহির করিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া জোর করিয়া লালদাস সঙ্গীকে জানালা দিয়া বাহির করিয়া দিল। তাহার পর সে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে আসিয়া নিমেষ মধ্যে নরোত্তম দাসের মৃতদেহ তুলিয়া লইল। জানালার নিকট আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "ধর।" এই বলিয়া সে জানালা দিয়া নরোত্তমের দেহটা গলাইয়া দিল। দামোদর একটু ইতস্ততঃ করিয়া, লালদাসের ভয়ে বুকে সাহস বাঁধিয়া দেহটা ধরিল ; তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে লালদাস বাহির হইয়া আসিল। তখন উভয়ে ধরা ধরি করিয়া সেই মৃতদেহ গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করাইল, এবং গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল।

কিয়ৎদুর আসিলে দামোদর কম্পিত স্বরে বলিল, "এখন কি করিবে—এটাকে কোথায় লইয়া যাইবে ?"

"ভয় নাই,—সহরের বাহিরে যে পড়োবাড়ীটা আছে,—ভূতের ভয়ে সে দিকে কেহ যায় না,—সেইখানে ওটাকে রাখিব।"

"তাহার পর ?"

"তাহার পর—সব কথা পরে বলিব, এখন ব্যস্ত হইও না।"

"লালদাস ! আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে—আমি—আমি—"

"এখন আর কোন ভয় নাই—আর আমাদের কে পায় ? আমরা বড়লোক হইয়াছি।"

"কি রকমে বল ?"

"এ কিরূপে মরিয়াছে,— তাহা তুমি দেখিয়াছ ?"

"দেখি নাই, তবে আর দেখিলাম কি ?"

"যে এ কাজ করিল, সে কে জান ?"

"খুব জানি,—ডাক্তার গোকুলদাস ?"

"বড়লোক—অনেক টাকা আছে ?"

"তাহাতে কি ?"

"ওরা যে রকম ভাবে ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া ইহার গলায় দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া দিয়াছিল,—তাহাতে লোকে কি ভাবিত ?"

"এ আত্মহত্যা করিয়াছে।"

"ঠিক কথা, তাহা হইলে ডাক্তারের কোন ভয় থাকিত না।"

"তাহা ঠিক, তবে এটা সেখানে নাই জানিয়া ডাক্তারের কি ভয় হইবে ?"

"ভয়—আমাকে আর তোমাকে এই দুই মহাপ্রভুকে।"

"কেন ?"

"কেন ? মনে কর, এই লোক যদি সব কথা বলে, তাহা হইলে ডাক্তার কোথায় থাকিবে।"

"লাসে কেমন করিয়া কথা কহিবে।"

"মনে কর এ মরে নাই।"

দামোদর গাড়ীর উপরই লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "সে কি।"

লালদাস হাসিয়া বলিল; "আমি বলিয়াছি মনে কর। ও কথা না কহিলেও আমরাতো কথা কহিতে জানি। আমাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য ডাক্তার কি না করিবে!"

"লালদাস, তোমার কথা শুনিয়া আমার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে।"

"আমরা অনায়াসেই ডাক্তারের কাছ থেকে দু-দশহাজার টাকা আদায় করিতে পারিব—এক—এক জনে পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা—এখন বুঝলে।"

এখন দামোদর বেশ বুঝিয়াছিল, আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, সে কোন কথা কহিতে পারিল না।—

লালদাস বলিল, "ডাক্তার ভাবিবে, এটা বাঁচিয়া আছে—তাহাতেই সে আমাদের মুঠার ভিতরে আসিবে। এটাকে পড়ো বাড়ীতে রাখিব। পাঁচ সাত দিনে এটা পচিয়া যাইবে, তখন এটা কে, কেহই চিনিতে পারিবে না, কেবল ইহার কাপড় চোপড়, তাহা আমরা পুড়াইয়া ফেলিব।"

দামোদর কেবল মাত্র বলিল, "বন্ধু হে! তোমার মত যদি আমার এমত বুদ্ধি থাকিত।"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে তাহারা সেই পড়ো বাড়ীর নিকট আসিয়া গাড়ী রাখিল। লাফাইয়া লালদাস গাড়ী হইতে নামিয়া বলিল, কেহ নাই—অন্ধকারও খুব। আমাদের কেহ দেখিতে পাইবে না। এস আর দেরি করিও না।"

তাহারা ধরা ধরি করিয়া লাসটা গাড়ী হইতে বাহির করিল। এবং সেটাকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

এক ব্যক্তি সেই বাটীতে ছিল,—সে গাড়ীর শব্দ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিতে ছিল, কিন্তু দুই ব্যক্তি কি ধরাধরি করিয়া লইয়া—বাড়ীর ভিতরে আসিতেছে দেখিয়া সে সত্বর এক দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইল—সভয়ে বলিল,—"এ কি ইহারা কি আনিতেছে—" অন্ধকারে সে ভাল দেখিতে পাইল না।

এদিকে তস্করদ্বয় বাড়ীর পশ্চাদিকস্থ এক গৃহে সেই লাসটা আনিল। তথায় লাসটাকে রাখিয়া সত্বর তাহারা বাড়ী হইতে বাহির হয়ে গেল। লোকটা নিঃশব্দে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল। দ্বারে আসিয়া দেখিল, গরুর গাড়ী খানা দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে।—

তখন সেই ব্যক্তি অন্ধকার গৃহ মধ্যে ফিরিয়া গেল। যে গৃহে তাহারা লাস রাখিয়া গিয়াছিল, সেই গৃহে আসিল।—দেখিল, কি একটা পড়িয়া আছে—।

অন্ধকারে সেটা কি দেখিতে না পাইয়া সেই ব্যক্তি তাহার উপর হস্ত স্থাপন করিয়া সভয়ে পশ্চাৎ পদ হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি ভয়ানক! আমি কি এ জীবনে কখনও মৃতের হাত এড়াইতে পারিব না!"

নবম পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ

সে রাত্রে প্রাগুক্ত তস্করদ্বয় যত শীঘ্র সম্ভব বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। "কাল সব কথা হইবে" বলিয়া লালদাস দ্রুত পদে নিজ গৃহের দিকে প্রস্থান করিল,—দামোদরও সত্বর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে দিন সমস্ত রাত্রি লালদাস ভাবিল,—পর দিবস প্রাতে সে দামোদরের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।—এবং দরজা বন্ধ করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল

লালদাস বলিল, "এইবার তোমায় একটা কাজ করিতে হইবে।"

"আমায়!"

"হাঁ—ডাক্তার আমায় ভালরকম চেনে, তোমায় মোটেই চেনে না,—তাহার পর তোমার গাড়ীর ব্যবসা আছে।"

"আমায় কি করিতে হইবে?"

"বলিতেছি শোন; যা বলি, ঠিক সেই রকম ডাক্তারকে বলিতে হইবে।"

"ডাক্তারকে!"

"হাঁ—মেয়ে মানুষ হইলে বড় লোক হওয়া যায় না।—"

"হাঁ—বল কি করিতে হইবে। "এইতো পুরুষ মানুষের মত কথা!—তুমি ডাক্তারকে বলিবে—ঠিক আমি যেমন তোমাকে বলিতেছি,—তুমিও ঠিক তেমনই ডাক্তারকে সব বলিবে।"

"বল, কি বলিব।"

"এই;—আমি এক সোয়ারি নামাইয়া রাত্রে বাড়ী ফিরিতেছিলাম,—এই সময়ে একজন লোক একটা ছোট গলির ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর।" আমি গাড়ী আনাইলাম, তাহার গলায় দাগ দেখিয়া বুঝিলাম, কে ইহাকে গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছিল; আমার দয়া হইল, আমি বলিলাম, "গাড়ীতে উঠিয়া বসো, লোকটা তখনই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, বলিল, 'আমায় কোন খানে লুকাইয়া রাখ। লোকটা ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।"

"আমাকে এই সব কথা বলিতে হইবে?"

"হাঁ। তাহার পর গাড়ী চলিতে চলিতে সেই লোকটি আমাকে বলিল যে, ডাক্তার গোকুল দাস তাহার বাড়ীতেই তাহার গলা টিপিয়া মারিতেছিল। আর সে আত্মহত্যা করিয়াছে, লোককে ইহা দেখাইবার জন্য তাহার গলায় দড়ী দিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া দিয়াছিল—ব্যস্ এই কথায়ই ডাক্তার চন্দ্র কাবু হইয়া পড়িবে।"

"যদি সে আমাকে খুনী বলিয়া ধরাইয়া দেয়?"

"ভয় নাই—সে তাহা করিবে না। যাক তাহার পর তুমি সেই লোকটাকে এক জায়গায় আনিয়া লুকাইয়া রাখিলে, তাহার কথায় একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিলে।—সেই ডাক্তার বলিল, এই লোকটা আর দুই তিন ঘণ্টার বেশী বাঁচিবে না। ইহা শুনিয়া সেই লোক তখনই তোমাকে কালি কলম আনিতে বলিল।

তাহাতে সে ডাক্তারের সমস্ত কথা লিখিয়া, সেই পত্র লইয়া হাকিমের কাছে যাইতে বলিল, তাহার পর সে মরিয়া গেল।"

"বেশ বুঝিলাম, তাহার পর?"

"তাহার পর তুমি ভাবিলে,—তুমি গাড়ীর লোক,—কাহারও অনিষ্ট করিতে চাহ না, ডাক্তার যদি কোন বন্দোবস্ত করে, তাহা হইলে আর সেই পত্র হাকিমকে দাও না। অনর্থক এক জনের অনিষ্ট করিবে কেন? বুঝ্‌লে!"

"বুঝিয়াছি, সে কত দিতে চাহে, তাহাই দেখা।"

"হাঁ—এই কথা। যখন সে বলিবে যে, কত চাও, তখন তুমি স্পষ্ট বলিবে, তোমার এক সঙ্গী আছে, তাহাকে ডাকিয়া আনি। তাহার সম্মুখেই সমস্ত বন্দোবস্ত হইবে।

আসল কথা, টাকা কড়ির সময় লালদাস উপস্থিত থাকিতে চাহে,—সে এ বিষয় কাহাকেই বিশ্বাস করে না, দামোদরকেও নহে। সে বলিল, "ডাক্তারের অনেক টাকা আছে—দশ হাজার টাকার কম নয়।"

"তুমি মনে কর, সে এত টাকা দিতে রাজি হবে?"

"না হয়—ফাঁসী যাবে। তুমি বলিবে, তবে আমি সেই লোকের পত্র লইয়া হাকিমের কাছে যাই।"

"এটা একটা কথা বটে!"

"পাকা কথা—প্রাণ বাঁচাতে খুব শীঘ্রই দশ হাজার টাকা দেবে—ভয় নাই।"

"লালদাস! যথার্থই তোর বুদ্ধি আছে।"

"আর দেরি করা নয়। আজই—এখনই যাও—।"

"একটু ভাল কাপড় চোপড়—"

"হাঁ, একটু ভাল কাপড় পরা চাই—"শীঘ্রই প'রে নাও।"

"দেখি, কি আছে।"

"না হয় কিনিতে হইবে।"

দামোদর উঠিয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার কাপড় জামা পরিয়া আসিল, বলিল "কেমন ইহাতে—?"

"বেশ চলিবে।"

"তবে এখনই রওনা হই?"

"হাঁ—এখনই।"

উভয়ে বহির্গত হইল। লালদাস ডাক্তারের বাড়ীর নিকট আসিয়া বলিল। "যাও—এখন আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।"

দামোদর অগ্রসর হইল। লালদাস দেখিল সে ডাক্তরের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তখন সে উদ্বিগ্ন চিত্তে নিকটে এক স্থানে তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বাক্স বন্দী।

ডাক্তার গোকুল দাস বাড়ীতে ছিলেন। নিজ গৃহে একাকী বসিয়া ছিলেন। ভৃত্য আসিয়া বলিল, "একজন রোগী দেখা করিতে চায়।"

ডাক্তার বলিলেন, এইখানে পাঠাইয়া দাও।"

দামোদর আসিয়া ডাক্তারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। গোকুলদাস তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বসো—কি রোগ?"

দামোদর মস্তক কুণ্ডয়ন করিয়া বলিল, "রোগ—হাঁ—রোগ—তবে বেশী কিছু নয়,—তবে আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

ডাক্তার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, রোগী জানিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিয়াছি, নতুবা এখন আমি তোমাকে বিরক্ত করিতে দিতাম না।"

"তবে—তবে—আপনার সঙ্গে দরকার আছে—বিশেষ কথা আছে—"

"বল, শীঘ্র—আমার অন্য কাজ আছে।"

"আমি আপনার কাছে আসিয়াছি—"

"তাহা তো স্বচক্ষে দেখিতেছি—কি দরকার, শীঘ্র বল, আমার সময় নাই।"

দামোদর প্রায় সকল কথাই ভুলিয়া গেল; লালদাস তাহাকে যাহা কিছু শিখাইয়াছিল, তাহা তাহার কিছুই মনে নাই।"

ডাক্তার ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি মাতাল, না একটা প্রকাণ্ড গাধা? কিছু বলিবার থাকে, শীঘ্র বল—আমার সময় মূল্যবান।"

গাধা ও মাতাল বলায় দামোদরের হৃদয়ে তেজ দেখা দিল, এইবার সে বুকে সাহস বাঁধিল; তাহার পর বলিল, "আপনি যাহাকে—এই নরোত্তম দাসকে—খুন করিতে চেষ্টা পাইয়া ছিলেন, সেই জন্য আসিয়াছি।"

ডাক্তার সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল, মস্তকের কেশগুলি সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ সঘনে কাঁপিতে লাগিল।

দামোদরের অবস্থাও তদ্রূপ। তাহারও ভয়ে আপাদ মস্তক কম্পিত হইতেছিল—

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ডাক্তার প্রথম কথা কহিল, ধীরে ধীরে বলিল, "নরোত্তম দাস—"

তাহার কণ্ঠ রোধ হইল, সে আর কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্ম-সংযম করিয়া বলিল,—"নরোত্তম দাস, তাহার বিষয় কি জান !"

দামোদর ইতিমধ্যেই অনেকটা সাহস বক্ষোমধ্যে সত্বর আনিয়া ফেলিয়াছিল; বলিল, "যাহা তিনি নিজে আমার বলিয়া ছিলেন, তাহাই জানি।"

এ কথায়—ডাক্তার প্রকৃতই ভীত ও বিস্মিত হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে চাহিল, এবং ধীরে ধীরে বলিল, "তিনি তোমায় বলিয়াছিলেন কখন !'

"যে রাত্রে আপনি তাঁহাকে গলা টিপিয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

ডাক্তারের কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেল—তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।—

সুবিধা পাইয়া দামোদর তাহার গল্প আরম্ভ করিল। বলিল, "ডাক্তার,—সে দিন রাত্রে আমি আমার গাড়ী লইয়া বাটীতে ফিরিতে ছিলাম, এই সময়ে একজন লোক ছুটিয়া আসিয়া বলিল আমায় রক্ষা কর—"

দামোদর যাহা—লালদাসের নিকট শিখিয়াছিল, তাহাই ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল; ক্রমে ডাক্তারের মুখ আরও শুকাইয়া আসিতে লাগিল। তবে কি যথার্থই নরোত্তম দাস মরে নাই? ইহাই সম্ভব—না হইলে তাহার মৃত দেহ কোথায় গেল?"

দামোদর তাহার সমস্ত গল্পটাই বলিল।—সে মিথ্যা বলিতেছে, না সত্য বলিতেছে—তাহা বিবেচনা করিবার ক্ষমতা তখন ডাক্তারের ছিল না,—সমস্তই তাহার সত্য বলিয়া বোধ হইল।—

অবশেষে দামোদর বলিল, "আমি হাকিমের কাছে যাই নাই, বরাবর আপনার কাছেই আসিয়াছি।"

এতক্ষণে ডাক্তার কথা কহিতে পারিল, দামোদরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেন !"

"এই, ডাক্তার মশাই—আমি গরীব মানুষ বটে, কিন্তু আমি কাহারও অনিষ্ট করিতে চাহি না, তাহাই আমি আপনার কাছে আসিয়াছিলাম।"

"আমার কাছে কেন?"

গোকুলদাস মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিল, এই লোক তাহার নিকট কি জন্য আসিয়াছে, তথাপি সে কথা মনে মনে গোপন করিয়া বলিল।

"ডাক্তার মশাই আমি গরীব মানুষ—"

"হাঁ, তাহা আমি দেখিতেছি।"

"এই জন্য ভাবিলাম হয়তো আপনি যাহাতে, আমি হাকিমের কাছে নরোত্তম দাসের পত্র লইয়া না যাই, তার একটা বন্দোবস্ত করিবেন!"

ডাক্তার ইহার উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে কি করা উচিত মনে মনে স্থির করিয়া লইল, সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি একাই আসিয়াছ?"

"হাঁ, বলিলাম না ডাক্তার মশাই,—আমি বরাবর তাহার কাছ থেকে আসিয়াছি।—এ কথা কাহাকেও বলি নাই।"

ডাক্তার একবার অলক্ষিতভাবে দরজা জানালা দেখিয়া লইল। বলিল "তাহার পর।"

"তাহার পর আর কি বলিব? আমি গরীব মানুষ—আমার এমন ইচ্ছা নয় যে কাহারও অনিষ্ট হয়—সেই জন্য আমি আপনার কাছেই আসিয়াছি।"

ডাক্তার উঠিলেন,—চাবির গোছাটা লইলেন, একটা সিন্দুকের কাছে গিয়া দামোদরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বোধ হইতেছে, তুমি এ কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ না করিবার জন্য কিছু চাও, এই তো? কত চাও, এ বিষয়ে কিছু মনঃস্থির করিয়াছ?"

"হা মশাই খুব স্থির করিয়াছি।"

"কি শুনি।"

"দশ হাজার টাকা।"

এ কথা শুনিয়া ডাক্তার এত বিস্মিত হইল যে, তাহার হাত হইতে চাবির গোছা সশব্দে গৃহতলে পড়িয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ডাক্তার বলিল "দশ—হাজার টাকা!"

গোকুল দাস দামোদরের নিকটস্থ হইয়া তাহার মুখটা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "এ কত টাকা, তোমার তাহা কিছু জ্ঞান আছে!"

"হাঁ ডাক্তার মশাই, জ্ঞান একটু আদটু আছে।"

ডাক্তার ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন,

"তাহা হইলে তুমি দশ হাজার টাকা চাও?"

"হাঁ— এক পয়সাও কম নয়।"

"কিন্তু এত টাকা কেউ কি সব সময়ে বাড়ীতে রাখে?"

"কাল দিতে পারেন—বা তিন চার দিনের মধ্যে দিতে পারেন, এই কয় দিন আমি হাকিমের কাছেও যাইব না—কাহাকে এ কথা বলিব না।"

"আর যদি না দিতে চাই?"

"তাহা হইলে আমি হাকিমের কাছে যাইব, সেখানে পত্র খানা দিলে তোমার কি হইবে, তাহা তুমি বেশ জান!"

ডাক্তারের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, হৃদয়টা যেন এক নিমিষে জড়ীভূত হইল, অশেষ চেষ্টায়ও তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।—

দামোদর বলিল, "ডাক্তার, আপনি জানেন, তাহা হইলে আপনাকে নিশ্চিতই ফাঁসি কাঠে ঝুলিতে হইবে।"

ডাক্তার আবার কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিল। সে যাহাতে সময় পায়, কেবলই তাহার চেষ্টা পাইতেছিল, কিরূপে তাহার এই পরম শত্রুকে সরাইবে, তাহাই মনে মনে ভাবিতে ছিল! গোকুল দাস সহজ লোক নহে।—

সে বলিল, "তোমার কথা সত্য কিরূপে জানিব?"

"না হইলে এত কথা আমি জানিলাম কেমন করিয়া? নরোত্তম দাসের পত্র এখনও আমার কাছে আছে, তাহার হাতের লেখা ঢের লোকে চেনে। সে চিঠি হাকিমের হাতে পড়িলে আপনার দশা কি হইবে, তাহাতো আপনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন, এখন যাহা ভাল হয়—"

"তুমি কি কাজ কর?"

"বলিলাম তো—এক খানা গরুর গাড়ী আছে, সেইটা ভাড়া দিয়া একরূপে চলে। আমি গরীব মানুষ।"

ডাক্তার গৃহ মধ্যে পদচালন করিতেছিল, এ বিপদে কর্ত্তব্য নিরূপণ দুঃসাধ্য হইতেছিল। তবে ইহা স্থির—এই লোকটা জীবিত থাকিতে সে কখনও জীবনে শান্তি পাইবে না। সহসা ডাক্তার বলিল, "তুমি তাহা হইলে কিছুই কম লইবে না?"

"দামোদর বলিল, এক পয়সা নয়।"

"তবে তোমাকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।"

"তাহাতে খুব রাজি আছি।"

"হাঁ– ভাল কথা মনে পড়িয়াছে—এখনই একটা রোগী আমার কাছে আসিবে, তুমি এই পাশের ঘরে একটু অপেক্ষা কর।"

"তাহা করিতেছি।"

টাকা পাইবার লোভে দামোদর অন্য সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, টাকা লইবার সময় লালদাসকে ডাকিবার কথা, তাহাও সে ভুলিয়া গেল। সে ডাক্তারের কথা মত উঠিল, এবং তাহার সহিত পার্শ্ববর্ত্তী একটা প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। ডাক্তারের ডাক্তার খানা, নানাবিধ বোতলে, নানাবিধ আরক রহিয়াছে। ডাক্তার একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া দামোদরকে বলিল, "তুমি এইখানে বসো। যত শীঘ্র পারি, আমি রোগীকে বিদায় করিয়া দিয়া তোমাকে টাকা দিয়া বিদায় করিব।"

দামোদর নিঃসন্দেহে চেয়ারে বসিল।—গৃহের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ, তাহার পর শার্সী আঁটা, কোন ছিদ্র হইতে বাহিরের বাতাস আসিবার উপায় নাই। যাইবার সময় ডাক্তার ক্ষিপ্রহস্তে একটা বড় বোতলের ছিপি খুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল, তাহার পর সে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাতে চাবি লাগাইয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সমস্ত গৃহটী কি এক উগ্রগন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, দামোদর লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দুই হস্তে তাহার নিজের মাথাটা চাপিয়া ধরিল,—তাহার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল, তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।—সে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল।—

গৃহের দরজা জানালা এমনই সুদৃঢ় ভাবে বন্ধ ছিল যে, তাহার চীৎকারধ্বনি বাহিরের কেহই শুনিতে পাইল না।—

দামোদর টলিতে টলিতে দ্বারে আসিয়া পাগলের ন্যায় দরজায় আঘাত করিতে লাগিল, নিদারুণ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "ডাক্তার, দোহাই তোমার—আমায় ছেড়ে দাও,—আমি টাকা চাহি না, আমি আর তোমার এখানে কখনও আসিব না। দোহাই—প্রাণ যায়, দম বন্ধ হয়—আমায় ছেড়ে দাও, আমি মরি, আমি মরি—প্রাণ গেল উঃ বাপরে!"

কাল উহার ব্যবস্থা করা যাইবে।—নরাধম।

কেহ উত্তর দিল না,—কেহ দরজা খুলিল না, দামোদর অবসন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল, তাহার মুখ দিয়া রক্ত ছুটিল, তাহার চক্ষুদ্বয় কপালে উঠিল,—ক্রমে সে সজ্ঞাহীন হইল। তাহার দশ হাজার টাকা পাইবার আশা এ জীবনের মত শেষ হইল।

ডাক্তার বাহির হইতে সুকৌশলে সেই ঘরের একটী জানালা খুলিয়া দিল। নাসিকায় রুমাল চাপিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বোতলটীর ছিপি আঁটিয়া দিল, ক্ষিপ্রহস্তে আর একটী বোতলের ছিপি খুলিয়া দিয়া আবার বাহির হইয়া আসিল।—

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দামোদরের দেহটা টানিয়া আনিয়া একটা কাঠের বাক্সের ভিতরে পুরিতে পুরিতে বলিল, "রাত্রে ইহার ব্যবস্থা করা যাইবে।"

কার্য্যশেষে গৃহের জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া, যেন কিছু হয় নাই, এই ভাবে বাহিরে আসিয়া বসিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

কল্পনা।

সাহাজাদার আজ্ঞায় বাঁদী সুরাপাত্র লইয়া একটি কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে দ্বারমুক্ত করিয়া ভিতরে চাহিল—কক্ষমধ্যে এক রাজপুত বেশধারী যুবক অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। বাঁদী উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত কক্ষে চিন্তামগ্ন যুবকের কমনীয়, রমণীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যেন তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে দেখিতে লাগিল। তারপর কি ভাবিয়া সুরাপাত্র বাহিরে রাখিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল— "মহাশয়।" যুবক তাহার আগমন লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে শঙ্কিত হইয়া

উঠিয়া বসিলেন। বাঁদী সসম্ভ্রমে কুর্ণিস করিল। যুবক তাঁহার নিজ প্রথানত প্রত্যাভিবাদন করিলেন। বাঁদী কহিল—"মহাশয়, সম্রাট-নন্দিনী সাহাজাদী গোলেনা সাহেবার বাঁদী আমি। তাঁহারই আদেশে আপনার বিশ্রাম সময়ে ব্যাঘাত জন্মাইতে আসিয়াছি। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

বঙ্কিম দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া যুবক দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"কি কর্ত্তব্য বলিতে পার।"

বাঁদী বলিল—আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতে হইবে। ব্যস্ত হইলে চলিবে না।"

"বল!"

বাঁদী নিকটস্থ অপর আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিল—"আপনি জানেনবোধ হয় যে কেন আপনি বন্দী!"

"না, সে সুযোগ পাই নাই। অপ্রত্যাশিত ভাবে ও সম্ভবতঃ বিনাপরাধেই আমি বন্দী হইয়াছি। কাহার আজ্ঞায় তাও জানি না।"

"শুনুন—আমি বলি। কিছুদিন পূর্ব্বে এক রাত্রে মোগল রাজপুতে যুদ্ধ বাধে। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ অসীম বিক্রমে সম্রাট সৈন্য পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া মোগলদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। সেই সময় রমণী-শিবির লুণ্ঠন করিতে আপনি আমাদের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন—মনে আছে?"

"বলিয়া যাও।"

"সে সময়, যদিও ঠিক উপযুক্ত নয়, তথাপি আপনার বীরমূর্ত্তি ও বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তার পর, ঠিক বৎসরকাল পূর্ব্বে আরাম বাগানের পূর্ব্বদিকে এক অরণ্যপথে আমরা অশ্বপৃষ্ঠে নগরাভিমুখে আসিতেছিলাম; হঠাৎ এক বন্যবরাহ আমাদের আক্রমণ করে। তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর প্রেরিত বীরপুরুষ আমাদের রক্ষা করেন। আমার যদি না ভুল হইয়া থাকে, আপনিই সেই বীরপুরুষ। তখন আমরা ভয়ার্ত্ত ও ব্যাকুল ছিলাম বলিয়াই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে সক্ষম হই নাই। আপনি আমাদের খুব অভদ্র ভেবেছিলেন?"

"কৃতজ্ঞতা লাভের আশায় আমি কিছুই করি নাই। ক্ষুদ্র শক্তিতে, ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি মাত্র!"

বাঁদী উজ্জ্বল দৃষ্টিতে যুবকের মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"কর্ত্তব্য! বেশ —আমাদেরও ত একটা কর্ত্তব্য আছে। আপনার অনেক সন্ধান করা হইয়া-

ছিল, পাওয়া যায় নাই। কাল সন্ধ্যায় আপনি রাজপথ দিয়া ফিরিতে ছিলেন—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া যুবক ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"এমনই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্ব্বার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করিয়াছ। বোধ হয়, তুমিই সেই বালিকা, যাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম?"

"না মহাশয়, এই যে আগে বলিলাম। আমি তাঁর বাঁদী। তিনিই আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, জানাইতে যে আপনি বন্দী নহেন; রাজ-অতিথি, আপনি তাঁর যে উপকার করিয়াছিলেন, তার প্রতিদান অসম্ভব, তথাপি সাহাজাদী সাধ্যমত আপনাকে পুরস্কৃত করিবেন।"

"যদি বিনাদোষে বন্দী হইয়া থাকি, মুক্তি দিলেই কৃতার্থ হইব। সেই পুরস্কার।"

"তাও কি হয়! সাহাজাদী তাঁহার ধনভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন অন্বেষণ করিতেছেন।"

"তোমার সাহাজাদী দত্ত ধনরত্নে আমি পদাঘাত করি।"—বলিয়া যুবক ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"চুপ—চুপ করুন। আপনি কি বলিতেছেন বুঝিতে পারিতেছেন না। যাহা একজন সামান্য নগন্য প্রজার পক্ষে মহামূল্য সম্মান, আপনি তার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতেছেন; উপরন্তু ইহাতে রাজকুমারীরও সম্মান রক্ষিত হইতেছে না।"

যুবক অপ্রতিভ ভাবে কহিলেন—"চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম, মার্জ্জনা করিও। আর কি বলবে বল?"

"আপনি হিন্দু, রাজপুত?

"হাঁ" অলক্ষ্যে তাঁহার কটি-বিলম্বিত অসি বাজিয়া উঠিল।

"যদি আপত্য না থাকে—আপনার নাম!

"কমলাপতি সিংহ।"

"নিবাস?"

"যোধপুর।"

"মহারাজ যশোবন্ত সিংহের রাজ্যে।" সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল—বড় সুখের ও গৌরবের রাজ্য মাড়বার। আমি কিছুদিন সেখানে বাস করিয়া-

ছিলাম। সে সময়ের কথা এখনো কিছু কিছু মনে আছে। আমাদের স্বদেশপ্রাণা মহারাণী, কুমার ও শিশু রাজকুমারী অরুণা—

যুবক বিস্মিত হইলেন। তিনি মহারাজ যশোবন্ত সিংহের প্রজা; তাঁহার অধীনস্থ সেনাদলের একজন নায়ক তিনি—তিনিই এত সংবাদ অবগত নহেন। জিজ্ঞাসিলেন—তুমি কিরূপে এত সংবাদ অবগত হইলে?"

"সে অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা। তবে যা ভুলি নাই, এ জীবনে ভুলিতে পার্ব্ব না, মনের আবেগে সে টুকু বলে ফেল্লাম। যাক্, কথায় কথায় আমরা সীমা লঙ্ঘন করিতেছি। শুনুন, সাহাজাদা আপনাকে রাজ-অতিথি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং অতিথি সৎকারের ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন।"

"অসীম অনুগ্রহ—সাহাজাদীর।"

২

"অনুগ্রহ নয়—যৎ-সামান্য প্রতিদান।" বাহির হইতে কে এই কথা বলিয়া উঠিল। উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন।

তৎক্ষণাৎ পার্শ্বদ্বার খুলিয়া গেল। বাঁদী নতজানু হইয়া অভিবাদন করিল।

এক বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভা, উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী যুবতী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন; মহার্ঘ বেশভূষায় ভূষিতা, হাস্যময়ী ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি।

আগন্তুক রমণী বাঁদীকে সস্নেহে আপন বাহুপাশে বন্ধন করিয়া কমলাপতির পানে চাহিলেন।

কমলাপতি, সৌন্দর্য্য বিহ্বল হইয়াছিলেন। যেন কোন সংজ্ঞা ছিল না! এক্ষণে লজ্জিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যে রমণী প্রবেশ করিলেন, ইনিই সম্রাট ঔরংজীবের ভগ্নী সাহাজাদী গোলেনা, ইতিহাস পাঠকের নিকট তিনি প্রসিদ্ধা ছিলেন না! এবং সম্রাটের অন্য দুই ভগ্নীর মত, তিনি বিদুষী ও রাজকার্য্যে পারদর্শী ছিলেন না। আমরা এ ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছি বলিয়া সেই সকল পাঠক পাঠিকার বিরক্তিভাজন হইতে পারি, কিন্তু গল্প—গল্প! ইতিহাস নহে।

সাহাজাদী অতি স্নিগ্ধ ও মধুর কণ্ঠে বলিলেন—"বন্দী!" বাঁদী কাণে কাণে কি বলিয়া দিল, সাহজাদী পুনরায় বলিলেন—কমলাপতি, তুমি আমার প্রাণদাতা। বাদসাহ নন্দিনীর জীবনের মূল্য নিতান্ত অল্প নয়। তোমার সে মূল্যের কোনো পুরস্কার এ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। এখন সুযোগ পাইয়াছি, পাছে তুমি অস্বীকৃত হও, তাই একটু উগ্র ব্যবহার করা হইয়াছে। সে দোষ মাপ

করিও।—বলিয়া গোলেনা চঞ্চল চক্ষের চতুর চাহনী কমলাপতির মুখের উপর স্থাপিত করিল। কমলাপতি মস্তিষ্কে দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছিলেন। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না।

সাহাজাদীর ইঙ্গিতে বাঁদী বাহির হইয়া গিয়াছিল। কমলাপতিকে নীরব দেখিয়া সাহাজাদী কম্পিত পদে অগ্রসর হইয়া কমলাপতির হস্তধারণ করিলেন। কমলাপতি শিহরিয়া উঠিলেন; ত্রস্তভাবে সাহাজাদীর হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন—এ কি সাহাজাদী?"

গোলেনা সুরাবিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন আশ্চর্য্য হ'চ্ছো।—কেন? বলিয়াছি, তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই। আজ এক বৎসরকাল আমি তোমার ঐ মোহনমূর্ত্তি মনের মধ্যে বসাইয়া রাখিয়াছি। প্রতি পল, প্রতি মুহূর্ত্ত আশায় ও নৈরাশ্যে তোমার কথা ভাবিয়া কতই কষ্ট পাইয়াছি—তা কি তুমি বলিলে বিশ্বাস করিবে? স্বয়ং ভারত সম্রাট সাজাহানের দুহিতা হিন্দুর প্রেমাকাঙ্খী, এ কথা ভাবিয়া আমিই আশ্চর্য্য হইয়াছি। কিন্তু কি করিব, আমার সর্ব্বস্ব, আমি এক দিকে রাখিয়া অন্যদিকে তোমায় মূর্ত্তিমান দেবতারূপে স্থাপন করিয়াছি। বল কমলাপতি, আমার সে অসীম উন্মুখ প্রেম কি শুধু হতাশার বাতাসে মিশিয়ে যাইবে? বল, তবে কি আমার এ কুসুমবাসিত তরুণ হৃদয় মুকুলেই ঝরিয়া যাইবে?"

যদি বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইত বা হঠাৎ পৃথিবী জলপ্লাবিত হইত, কমলাপতি এত বিস্ময়ান্বিত হইতেন না। তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা উচ্চারিত হইল না।

"কমলাপতি! প্রথম দিন, যখন রাত্রে তুমি আমার শিবির লুণ্ঠন কর্ত্তে এসেছিলে, সশস্ত্র, যোদ্ধৃবেশে, রক্তপতকা হাতে করে, আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে, আবার কি ভেবে অনুচরদের ফিরে যেতে বল, সে দিন শুধু তোমার উচ্চ অন্তঃকরণের আর রূপের প্রশংসা করিয়াছিলাম মাত্র! কিন্তু বীর! উদার নির্ভীক কমলাপতি! তুমি জান্তে যে আমি তোমাদের শত্রুকন্যা, তথাপি তুমি আমার জীবনরক্ষা কর্ত্তে কুণ্ঠিত হও নাই, তখন তোমার মহত্ত্ব বুঝেছিলাম। সেই নিবীড় অরণ্যমধ্যে সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে, ধূসরছায়া বেষ্টিত ম্লান আলোকে, রক্তাক্ত তুমি আমার সম্মুখ দিয়ে তোমার অশ্ব ছুটিয়ে দিয়েছিলে, সে মুহূর্ত্ত আমার জীবনের একটা স্মরণীয় মুহূর্ত্ত। আমি একটা অপূর্ব্ব মধুর, একটা নূতন সুখস্পর্শ অনুভব করিলাম। কমলাপতি! হৃদয়েশ্বর, আমার কথা কি তুমি বাতুলের প্রলাপ বলে মনে কর্চ্ছ? তোমার শপথ, একটি কথাও মিথ্যা নহে। আমি আমার যা' কিছু তোমার জন্য

উৎসর্গ করিয়াছি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"—গোলেনা দুই হস্তে কমলাপতির গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল। কমলাপতি ব্যাকুলভাবে কক্ষের দ্বারে দ্বারে ছুটিয়া বেড়াইলেন। দ্বার রুদ্ধ। সাহাজাদী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। কমলাপতি অকৃতকার্য্য হইয়া হতাশভাবে গবাক্ষের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন পশ্চাদ্বার খুলিয়া গেল।

মধুর হাসি, কমলকণ্ঠের সুললিত গান, অফুরন্ত নাচ, পরিপূর্ণ সুরাপাত্র,—রঙ্গ মহালের বিচিত্র শোভা খুলিল। বিচিত্র কক্ষ, বিচিত্র আলোকে ঝলসিয়া উঠিল, রূপের আগুণে ঘৃতাহুতি পড়িল। কমলাপতি বিস্মিত, স্তম্ভীত, নির্ব্বাক, নিশ্চল!

৩

"তবে আমার যাণ্ঞা নিষ্ফল?"

"সম্পূর্ণ!"

"কি—?"

"সাহাজাদী! অধম হিন্দু, রাজপুত, সে দিল্লীশ্বরের কন্যার প্রেমের পাত্র হইবার স্পর্দ্ধা রাখে না।"

"তোমার ভয় হচ্ছে? ভয়ের কোনো কারণ নাই। আমাদের এ প্রণয় কেউ জান্তে পার্ব্বে না। জাহানারা, রৌশনারা থাক্‌লেও গোলেনার প্রতাপ এ রাজ-প্রাসাদে অক্ষুণ্ণ। তুমি স্বীকৃত হও।"

"নতজানু হইয়া ভিক্ষা চাহিতেছি, সাহাজাদী, ও পাপ ইচ্ছা ত্যাগ করুণ। রাজপুত আমি, আপনার প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পারি না।"

শোন—এখনও অসম্মত? জানো, আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা। আদেশই যথেষ্ট। তবু যে তোমার মত চেয়েছি, সে তোমায় ভালোবাসি বলে। শোন তুমি—সম্মত হও। চিরদিন ভালোবাসবো। এমনি আদর করে রাখবো।"

গর্ব্বিত কণ্ঠে কমলাপতি কহিলেন "মাপ কর্ব্বেন, সাহাজাদী! রাজপুত জীবনের ভয়ে বিবেক জলাঞ্জলি দিতে পারে না। জীবন তার কাছে অতি তুচ্ছ। প্রাণের ভয়ে সে বিজাতীয়, বিধর্ম্মী ললনার—"

"সাবধানে কথা কও।"

"কিসের জন্য সাহাজাদী? জানো না কি ভয় জিনিষটা রাজপুত জাতির হৃদয়ে স্থান পায় না। তুমি ফিরে যাও!—যাও।"

সাহাজাদী উচ্চ ও বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন "ফিরে যাবো! কিন্তু শোন, এখনও বল্‌ছি তুমি আমার হও।"

"দুশ্চারিত্রা, স্বেচ্ছাচারিণী রমণী, তোমার মুখদর্শন করাও মহাপাপ!"

সাহাজাদী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—এত দূর স্পর্দ্ধা!—কাফের। এর প্রতিফল পাবে—অক্ষরে অক্ষরে! এতদিন যে স্নেহ ভালোবাসা তোমার জন্য সঞ্চিত রেখেছিলাম, আজ হৃদয় হতে সমূলে তা উৎপাটিত করে, সে স্থানে হিংসা প্রতিহিংসাতে পূর্ণ করিলাম। তুমি আমার জীবনদাতা বলে বিন্দুমাত্রও অনুকম্পা প্রদর্শন কর্ব্ব না। যে জিহ্বা আমার অপমান করেছে, সেই জিহ্বা কুকুরকে দিয়া খাওয়াইব। জীয়ন্তে তোমায় কবর দিব।—"সাহাজাদী সদর্পে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

কমলাপতি মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইলেন। নিজ কটিদেশে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন—কোষ শূন্য—অসি নাই! বুঝিলেন যথার্থই তিনি বন্দী।

অতি অল্পক্ষণ পরে সেই বাঁদী একখানি দীর্ঘ তরবারি হস্তে কক্ষে উপস্থিত হইল। একে কমলাপতির মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ ছিল না! তার উপর অপহৃত অসি বাঁদীর হস্তে দেখিয়া তিনি উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন। স্থান, কাল, পাত্র কিছুই ভাবিলেন না। বাঁদীকে আক্রমণ করিয়া অসি কাড়িয়া লইয়া, তাহা কোষবদ্ধ করিলেন।

বাঁদী ধীরভাবে ডাকিল—কমলাপতি!"

"দূর হও। তোমার সাহাজাদীকে বলিও ইচ্ছামত শাস্তি দিতে পারেন, এখন আমায় বিরক্ত করিও না।—যাও।"

বাঁদী গেল না। সে কমলাপতির দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—"সাহাজাদী তোমার মৃত্যু আজ্ঞা দিয়াছে। মর্ত্তে প্রস্তুত আছ?"

"রাজপুত মর্ত্তে সতত প্রস্তুত।"

"মর্ত্তে পার্ব্বে?"

"কমলাপতি প্রদীপ্ত নেত্রে তাহার পানে চাহিলেন। বাঁদী শান্তস্বরে কহিল মর্ত্তে পার্ব্বে? কষ্ট হবে না! এমন পৃথিবী, এমন আপনার জন ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে না! সত্য করে বল—"

"না।"

"দেখ, আমি তোমায় মুক্ত করে দিতে পারি। এই মুহূর্ত্তে। যদি মুক্তি চাও—বল।"

"না, আমি মৃত্যু চাই।"

"মৃত্যু চাও কেন? জীবনে কি কোনো প্রয়োজন নাই? কোনো কর্ত্তব্য নাই? দেশের এই দুর্দ্দিনে, তোমার মত যোদ্ধার, বীরের প্রাণ কি মূল্যবান নহে? কি—বল?"

কমলাপতি নীরবে বাঁদীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বড় শান্ত, স্থির, ধীর করুণ সে মুখ।

বাঁদী বলিয়া চলিল—সাহাজাদি গোলেনার আমি অন্তরঙ্গ সহচরী, প্রধানা বাঁদী। আমি তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্ত্তে পার্চ্চি; আর তুমি বুঝি রাজপুত গর্ব্বের খাতিরে, দেশের মহা অপকার সাধিত করে, এক উদ্ধতা, কু-চরিত্রা রমণীর আজ্ঞায় মর্ত্তে যাচ্ছো?"

কমলাপতি বিস্মিত হইলেন। এ রমণী—মুসলমানী—বাঁদী!! সে ভাবিল সত্য আমি কোন্ অপরাধে বন্দী? বিনাপরাধে তবে কেন মর্ত্তে যাই।

বলিলেন—"কি মূল্যে তুমি আমায় মুক্তি দিবে?"

"বিনামূল্যে!"

কমলাপতি জিজ্ঞাসিলেন—আমায় মুক্ত কর্ব্বে, সম্ভবতঃ তুমি বিপদে পড়বে?"

"সামান্য বিপদ হ'তে পারে বৈ কি, তাতে আমার বিশেষ ভয় নাই। যদি জান্তে পারি যে তুমি নিরাপদে তোমার দেশে উপস্থিত হ'য়েছো ত আমি সকল রকম বিপদকে সহাস্যে কোলে তুলে নিতে পার্ব্ব।"

"কিন্তু আমি ভাবছি যে তুমি আমার জন্য কেন এত—"

"কষ্ট স্বীকার কর্ব্ব? অতি সহজ কথা—একটা আস্ত প্রাণ রক্ষা কর্ব্বার জন্য।"

"তই কি?'

"নহিলে?''

"ভাবিয়াছি, এতে তোমার স্বার্থ কি?" বাঁদী বলিল—"সেটুকু না শুনলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। আমি একবার একটা মহা অপরাধ করে-ছিলাম; সেই সময় এক হিন্দু জ্যোতিষী এখানে আসেন, তিনি বলেছিলেন—'সময় পেলে প্রায়শ্চিত্ত করো।' তা দেখছি এও একটা সুযোগ। যদিও আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব।"

কমলাপতি বলিলেন—"বেশ, আমি যাবো। কিন্তু স্বীকার কর, যদি তুমি তুবিপদগ্রস্ত হও, ত আমায় জানাতে লবে না।"

"কোথায় তোমায় পাবো ?"

"আরামবাগের পশ্চিমপ্রান্তে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের সেনানিবাসে আমার সন্ধান কর্লে'ই পাবে। আমরা কাবুল হ'তে মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা কোরে এখানে আছি। করুণাময়ী—"

বিস্ময়াবিষ্টের মত বাঁদী কমলাপতির মুখের পানে চাহিল। কমলাপতি বলিলেন—স্নেহময়ী নারী ! তোমার নাম ?"

একটু ইতঃস্তত করিয়া বাঁদী কহিল "করুণা,—মুন্না বাঁদী।—"

"এসো তুমি, বাহিরে। আমি বেগবান অশ্ব প্রস্তুত রাখিয়াছি।"

"হাঁ—একটা কথা। তুমি রাজপুত,—বল্‌তে পার, মুসলমান সহবাসে রাজপুত কি হয় ? তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?"

"মৃত্যু।"

"এসো !"—কমলাপতি বাঁদীর পশ্চাদানুসরণ করিলেন।

৪

যে প্রবল প্রতাপ ও অসীম ক্ষমতা লইয়া মোগলগণ ভারতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, সে শক্তির পরাজয়ের প্রধান কয়েকটি কারণের মধ্যে 'স্ত্রী-প্রভুত্ব একটি উল্লেখ যোগ্য। সম্রাজ্য অধঃপতিত হইবার প্রথম কারণ যাহাই হো'ক জাহানারার ও রোশনারার প্রভুত্ব সম্রাট সাজাহান ও ঔরংজীবের উপর যে অক্ষুণ্ণ ও প্রবল ছিল, এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মোগল রাজনৈতিক আকাশে প্রবল বেগে ঝড় উঠিয়াছিল। বৃদ্ধ সম্রাট সাজাহান বন্দী, জাহানারা তাঁহার সঙ্গিনী, ঔরংজীব দিগ্বিজয়াশায় পরিভ্রমণ করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গিনী ও মন্ত্রীরূপিণী সহোদরা রোশনারা।

সাহাজাদী গোলেনা রাজপ্রাসাদেই অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং এখানে তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ।

সেদিন যখন তাতারিণী আসিয়া সংবাদ দিল বন্দী রাজপুত, প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়াছে—সাহাজাদী ক্ষিপ্তের মত হইয়া উঠিলেন। সামান্য একজন হিন্দু তাঁহাকে অপমানিত করিয়া, তাঁহার প্রসাদ হইতে পলায়ন করে, ইহা কম স্পর্দ্ধার কথা নহে ! তিনি চতুর্দ্দিক চতুর চর প্রেরণ করিলেন। যে কোনো উপায়েই হোক, তাহাকে চাই। সে জীবন্ত বা মৃত, সাহাজাদী তাহাকে দেখিতে চান। প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার পথে এই অন্তরায় সাহাজাদীকে

আরো ভীষণ করিয়া তুলিল। আজ্ঞা দিলেন, যদি চরেরা তাহার সন্ধান করিতে না পারে, তাহাদের শির ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইবে।

সকলকে বিদায় দিয়া সাহাজাদী বাঁদীকে ডাকিলেন।

বাঁদী আসিয়া সাহাজাদীর সে ভীষণ ক্রোধোদ্দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল।

এ বিশ্বে যদি সাহাজাদীর কৃপার পাত্র কেহ থাকে ত সে এই বাঁদী। শৈশবে রাজপুতনার এক অরণ্যমধ্য হইতে তিনি ইহাকে কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন। তদবধি করুণা তাঁহার সহচরী, সখী, সঙ্গিনী—সব। করুণাও তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালোবাসিত।

সে আসিবামাত্র সাহাজাদী তাহাকে পার্শ্বের আসনে বসাইয়া বলিল—"করুণা, একটা গান গাতো।"

বাঁদী বীণা তুলিয়া লইল। চম্পক-বিনিন্দিত অঙ্গুলী দ্বারা তারে ঝঙ্কার দিল। সুর কাণে ভালো লাগিল না। নূতন সুর যোজনা করিল। তাও অসংলগ্ন লাগিল। সে বীণা রাখিয়া শুধু গান ধরিল। গলা জড়াইয়া আসিল।—কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

সাহাজাদী রাগান্বিত ভাবে কহিলেন "দূর হ'।"

বাঁদী বাহির হইয়া গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। কয়েকজন দূত ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল বন্দীর তল্লাস পাওয়া যায় নাই। সাহাজাদী চতুর্গুণ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন—'জীয়ন্ত বা মৃত বন্দীকে চাই-ই।' করুণা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল—"কেন এমন হয়? মানুষ মানুষের উপর বিনাদোষে কেন এত নৃশংস হয়! বিশেষতঃ রমণী! নারী হৃদয়—যা শুধু স্নেহ, দয়া, মায়ার স্থান; যে হৃদয় পবিত্রতার আধার, ক্ষমার প্রশস্ত স্থান, সেই কোমল হৃদয় কেন এত কঠোর, নিষ্ঠুর হয়—কে জানে? নারীতে যদি হত্যা করে, হিংসা করে ত পুরুষ কি তা অপেক্ষাও নৃশংস পিশাচ হইবে? যদি কমলাপতির সন্ধান পায়, যদি তাহাকে বন্দী করে?—ওঃ! প্রাসাদে বৃদ্ধ সম্রাট্ বন্দী, নবীন সম্রাট বিদেশে, তরুণ ও উদারহৃদয় কুমার মহম্মদও নাই। তবে কি ইহারা কমলাপতিকে হত্যা করিবেই। বিনা অপরাধে—এক অমূল্য জীবন নষ্ট করিবে? কমলাপতি রাজপুত, সে ত পলাইতে চায় নাই, সে মৃত্যুকে ভয়করে নাই। আমিই তাহাকে পলাইতে পরামর্শ দিয়াছি; এখন! কি করিতে পারি? কিছু না! চোখের উপর শুধু এই দানবী লীলা দেখ্‌ব? আর কিছু না?"

সে কি ভাবিয়া প্রসাদ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিল। বাহিরে তাহাকে তাতার প্রহরিণী বাধা দিল। সে অতি করুণ ভাবে বলিল—"ভাই, সহরের বাহিরে আমার স্বামী বড় বিপদগ্রস্থ; এমন কি জীবন সংশয়, এই মাত্র সংবাদ পাইয়াছি। তাই দেখিতে চলিয়াছি।"

প্রহরিণী বিশ্বাস করিল না। সে হাসিয়া জিজ্ঞাসিল—তোমার বগলে ও কিসের পুঁটুলি?"

বাঁদী বলিল-সামান্য খাবার আছে। ভাই তুইও রমণী; তোরও স্বামীপুত্র আছে ত—"বড় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী কণ্ঠে সে এই কথা কয়টি বলিল। প্রহরিণী দ্বার মুক্ত করিল। দেশে তাহারও জ্ঞানের জ্ঞান আছে!

করুণা বাহিরে আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিল।

৫

ক্ষুদ্র শিবিরমধ্যে কমলাপতি গভীর নিদ্রামগ্ন। এক কোণে একটা আলোক মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। এই সময় এক মলিন বেশা রমণী তথায় প্রবিষ্ট হইল। রমণীর মুখ ভাব অত্যন্ত ব্যাকুল ও উদ্বেগপূর্ণ; কক্ষের চারিধার নিরীক্ষণ করিয়া সে নিদ্রিত যুবকের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। স্থির দৃষ্টিতে যুবকের বিস্তৃত নয়নদ্বয়ের দিকে চাহিয়া রহিল; ধীরে ধীরে তাহার আন্তঃস্থল হইতে এক গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। সে তখন অতি সাবধানে যুবকের বিচেতন দেহ বেষ্টন করিয়া অতি সন্তর্পনে সে কম্পিত অধর চুম্বন করিল। তখনি সলজ্জ ভাবে পিছাইয়া আসিল।

যুবকের পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ, উষ্ণীষ ও তরবারি লইয়া নিজে পরিধান করিল, নিজ চেষ্টায় যতদূর সম্ভব পুরুষের মত আপনাকে সাজাইল। তার পর—প্রস্থানোদ্যোতা হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল। যুবকের দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় যে হীরকাঙ্গুরীয়ক কক্ষের আলোকে সমুজ্জ্বল হইতেছিল, তাহা খুলিয়া লইল। কয়েকদিনের শাস্তির পর যুবক ঘোর নিদ্রামগ্ন, তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। অঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিয়া যুবকের ঈষৎ উষ্ণ করপুট চুম্বন করিয়া পুনরায় অতৃপ্ত নয়নে তাহার পানে চাহিয়া শিবির পরিত্যাগ করিল।

প্রহরীগণ—সে কে জানিতে চাহিলে অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীয়ক দেখাইল। প্রহরী সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল। সে চলিয়া গেলে, প্রহরীরা বলাবলি করিল—এত রাত্রে কমলাপতি কোথায় গেলেন? একটা মাগী এসে কোথায় পাঠালে বুঝি!"

নবীন সম্রাট ঔরংজীব পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং তাঁহার দৃষ্টান্ত মত অধীনস্থ ভৃত্যবর্গও শীঘ্র কাহাকেও বিশ্বাস করিতে সাহস করিত না। যে তাতার দেশীয় প্রহরিণী বাঁদীকে প্রাসাদ ত্যাগ করিতে দিয়াছিল সে তৎক্ষণাৎ কোনো ছদ্মবেশী দূতকে তাহার অনুসরণ করিতে কহিয়া দিল। সে বাঁদীর সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত শিবির পর্য্যন্ত আসিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিল, তার পর যখন সজ্জিত যুবাপুরুষ বাহিরে আসিল এবং প্রহরীরা বলাবলি করিল যে কমলাপতি বাহিরে চলিলেন, তখন ঐ দূত ক্ষিপ্রগতিতে তাহার সঙ্গিদিগকে সংবাদ দিয়া ঐ যুবা পুরুষের পশ্চাদনুসরণ করিল এবং যমুনা তীরে উপস্থিত হইয়া বন্দী করিয়া ফেলিল। তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল,—কমলাপতি। আর কোনোও সন্দেহ রহিল না।

রাজকুমারী গোলেনার সহচরী আসিয়া সংবাদ দিল।—"কমলাপতি বন্দী হইয়াছে। গর্ব্বিত যুবা এখনও বলিতেছে সাহাজাদীর প্রস্তাবে সে পদাঘাত করে।"

সাহাজাদী আজ্ঞা দিলেন অতি প্রত্যুষে দুর্গ সংলগ্ন বধ্যভুমিতে তাহাকে অর্দ্ধ প্রোথিত করিয়া কুকুর দ্বারা ভোজন করান হইবে।

বন্দী তাহা শুনিল, আপন মনে বলিল—মন্দ—কি! মরণ—সে আর 'কোমল—কঠোর!

৬

তখনো প্রভাত হইতে অনেক বাকী ছিল। হঠাৎ রাজপুত শিবির মধ্যে বিষম গোলযোগ উঠিল—কমলাপতি মোগল কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছেন। রাজপুতগণ কমলাপতির শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—তিনি নিদ্রিত।

তাহাদের চঞ্চল পদ শব্দে কমলাপতি জাগিয়া উঠিলেন। তিনি এই অত্যাদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিলেন। তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না! প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য তিনি সহরাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন। অধিক বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন—তাঁহার বেশভুষা সমস্তই অপহৃত। তিনি দাঁড়াইলেন না—ছুটিলেন। প্রসাদ সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া শুনিলেন দর্পী কমলাপতি বন্দী হইয়াছে, এই প্রত্যুষকালেই কুক্কুর দংশিত হইয়া তাহার জীবনান্ত ঘটিবে। কমলাপতি উন্মত্তের মত ছুটিয়া পুরী প্রবেশ করিলেন। কোন বাধা বিপত্তি না মানিয়া তিনি বধ্য স্থানের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—বিকটদর্শন প্রকাণ্ড দুইটি কুক্কুর এক অর্দ্ধ প্রোথিত ব্যাক্তিকে দংশন করিতেছে। আর

কৃতান্তের মত জল্লাদ তাহাতে লবণ নিক্ষেপ করিতেছে। উঃ! কি সে ভীষণ দৃশ্য! কমলাপতি ছুটিয়া তাহার নিকটে আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"বাঁদী মুন্না? এ যে আমারই বেশ-ভূষিতা।"

করুণার যন্ত্রণা কাতর ও ক্লিষ্ট মুখে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। নিমিলিত নেত্রদ্বয় উন্মীলিত হইল, সে করুণনেত্রে চাহিয়া আবার চক্ষু বুজিল।

উচ্চ আসনোপরি উপবিষ্ট সাহাজাদী আগন্তুককে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—এ কি—কাকে হত্যা করেছিস্? ঐ যে সেই কাফের কমলাপতি।"

জল্লাদ দৃঢ়হস্তে কমলাপতিকে চাপিয়া ধরিল।

কমলাপতি ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে বক্তার পানে চাহিলেন। চিনিতে দেরী হইল না। বলিলেন—সাহাজাদী, তোমারই সহচরী!

"কে—করুণা নয়?"

* * * * * * *

করুণার প্রাণহীন দেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। কমলাপতি দেহ তুলিয়া লইয়া ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন।—রক্ত তখনও উষ্ণ ছিল; লাবণ্য ও মহিমামণ্ডিত মুখমণ্ডল তখনও অবিকৃত—জ্যোতির্ম্ময়!

তাহার দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় কমলাপতির অঙ্গুরী, বাহুতে এক লিঙ্গ দেবের সেবিকার কৃষ্ণবর্ণ ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত।

* * * * * * *

প্রভাতের তরুণ অরুণালোক করুণার রক্তরঞ্জিত বদনমণ্ডলে আসিয়া পড়িল। স্নিগ্ধ সমীর সন্তাড়নে উষ্ণীষশূন্য মস্তকের দীর্ঘ কেশদাম দুলিতে লাগিল।—

সেই সময় জল্লাদ, সাহাজাদীর মুখের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিল। সাহাজাদী উদ্‌ভ্রান্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"না, না—ওকে ছেড়ে দাও,—যেতে দাও।"

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

রঙ্গ বারিধি।

২য় তরঙ্গ।

উল্‌টো বিপদ।

"কার চিঠি গা?"

ললিতভূষণ প্রভাতকালে তাঁহার বাহিরের গৃহে একাকী বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে একখানি চিঠি পড়িতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরী, হৃদয়-প্রভা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানা কার চিঠি গা?"

ললিতভূষণ চিঠি হইতে দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত করিয়া, চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "এ খানা চিঠি নয়, এক খানা বিল।"

"কোন পওনাদারের বুঝি?"

"না কোন পাওনাদারের নয়,—বাবার!"

হৃদয়প্রভা একটু বিস্মিত হইয়া হাসিয়া বলিল, "বাবার বিল? বাবা কি তোমার উপর কোন দাবী করে বিল পাঠিয়েছেন?" ললিতভূষণ বলিলেন,—"হাঁ। সেই রকমই কতকটা বটে, এই শোন, একখানা চিঠিও লিখেছেন;—

প্রিয় ললিত!—

তুমি বোধ হয় অস্বীকার করিবে না যে, তোমাকে মানুষ করিতে আমার বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়াছে;—আশা করি এক্ষণে আমার সেই প্রাপ্য টাকাটা অবিলম্বে শোধ করিবে। এই পত্রের নিম্নে একটা হিসাব পাঠাইলাম, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে, কেবল মাত্র যাহা আমার ন্যায্য ব্যয় হইয়াছে, তাহাই ধরিয়াছি; সুদ প্রভৃতি অন্য কিছুই ধরা হয় নাই। তোমার সহিত আমার অসদ্ব্যবহার করিবার ইচ্ছা নাই;—তুমি কিস্তিবন্দি করিয়া টাকা দিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে পার! ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীঅনাদি ভূষণ।

হিসাব।

দ্বিতীয় বৎসর হইতে পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত গড়ে মাসিক—

২৲ টাকা হিসাবে —৯৬৲ টাকা

ষষ্ঠ বৎসর হইতে একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত গড়ে মাসিক—

৫৲ টাকা হিসাবে —৩৬০৲ টাকা

দ্বাদশ বৎসর হইতে পঞ্চবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত গড়ে মাসিক—

১০৲ টাকা হিসাবে —১৬৮০ টাকা

পাঠ্যের ব্যয় —১০০০ টাকা

ডাক্তার ঔষধ প্রভৃতি —৫০০ টাকা

মোট—৩৬৩৬৲ টাকা

পুঃ—

প্রথম বৎসর ধরা হয় নাই, কারণ তখন তুমি তোমার প্রসূতীর স্তন্য-দুগ্ধ পান করিয়াছিলে।

পত্র পাঠ শেষ করিয়া ললিতভূষণ বলিলেন, "বাবার পত্রতো শুন্‌লে, এখন এ পত্রের উত্তর আমি কি দিই ?" হৃদয়প্রভা পত্র শুনিয়া স্তম্ভীত হইয়া গিয়াছিল, বলিল, "এ পত্রের আর উত্তর দিবে কি ? বাবার টাকা টাকা একটা রোগ !" ললিতভূষণ বলিলেন, "বাবার টাকা টাকা একটা রোগ আছে, তাহা আমি জানি। তবু এর একটা উত্তর দেওয়া উচিত। এর উত্তরে আমি লিখিব যে, এ ঋণ আমার নাবালক অবস্থায় হইয়াছে, সুতরাং এ ঋণের জন্য আইনানুসারে আমি দায়ী নহি।"

ললিতভূষণ গত বৎসর বি, এল, পাশ করিয়া আলিপুর কোর্টে ওকালতি করিতেছেন, তাঁহার দাদা মহাশয় ওই কোর্টের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন, উপস্থিত তিনি কাশীবাসী হইয়াছেন। দাদা মহাশয়ের মক্কেলদিগকে পাইয়া ললিতভূষণ অল্পে অল্পে আপনার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতেছিলেন। দুই দিবস পরে ললিতভূষণ আদালত হইতে আসিয়া বিমর্ষ ভাবে হৃদয়প্রভাকে বলিলেন, "বাবা পত্রের উত্তর দিয়াছেন,—কি লিখিয়াছেন শোন ?"

প্রিয় ললিত ?—

তোমার পত্র পাইয়া আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম, আমি যখন তোমায় মানুষ করিবার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়াছিলাম, তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, যে এমন

অকৃতজ্ঞ পুত্র মানুষ করিতেছি। আমি কেবল স্নেহের খাতিরে সুদ কিংবা টাকার অন্ত লাভ ধরি নাই, কিন্তু তুমি এমনই অকৃতজ্ঞ যে, আমার ন্যায্য প্রাপ্যকেই একেবারে অস্বীকার করিতেছ। তোমার আচরণে আমি যথার্থই মর্ম্মাহত হইয়াছি। এই পত্রের দ্বারা আমি তোমাকে শেষ জানাইয়া রাখিতেছি, যদি তুমি আমার প্রাপ্য টাকা না দাও, তাহা হইলে আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিব না, বুঝিব আমার সন্তান ছিল না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীঅনাদি ভূষণ।

হৃদয়প্রভা পত্র শুনিয়া বিস্মিত ভাবে বলিল, "সত্যই কি তিনি তা কর্ত্তে পারেন ?"

ললিতভূষণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "টাকা না দিলে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, কাজেও নিশ্চয়ই তাহা করিবেন। এখন এর উপায় কি ? দাদা মহাশয়কে একখানা পত্র লিখে দেখি, তিনি কি পরামর্শ দেন।"

ললিত ভূষণের নিকট হইতে পত্রের উত্তর না পাইয়া অনাদি বাবু দিন দিন তাঁহার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিতে ছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বাহিরের গৃহে বসিয়া যখন তিনি উদ্‌গ্রীবচিত্তে ললিতভূষণের পত্রের অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে অনাবশ্যক হইলেও এক এক বার তেজরতির হিসাবের খাতাগুলি উল্টাইতে ছিলেন,—সেই সময় ভৃত্য আসিয়া একখানি রেজিষ্টারি পত্র তাঁহার হস্তে দিল। ললিতভূষণের নিকট হইতে কোনরূপ "ব্যাঙ্ক নোট" বা "চেক" আসিয়াছে আশা করিয়া মহা ব্যাগ্র ভাবে অনাদি বাবু খানখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, কিন্তু পত্র পড়িয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাকে স্তম্ভীত করিয়া দিল। পত্রে লেখা ছিল :—

২

প্রাণাধিক অনাদি ভূষণ !

বহু দিবস তোমার কোন সংবাদ পাই নাই, আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। আপাততঃ আমার কিছু টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। বহু দিবস যাবৎ আমার অনেকগুলি টাকা তোমার নিকট পড়িয়া আছে, হঠাৎ সে কথা মনে পড়ায় তোমাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। টাকাগুলি যত শীঘ্র পার পরিশোধ করিবে। ইতিঃ—

তোমার বৃদ্ধ পিতা।

হিসাব ।

খাদ্য ব্যয়, পাঠ্যব্যয়, ডাক্তার ও অন্যান্য ব্যয়

২১ বৎসর পর্য্যন্ত	—৩০০০ টাকা
সুদ শতকরা ১২ টাকা হিসাবে	—৩৬০০ টাকা
	মোট—৬৬০০ টাকা

পুঃ—

ন্যায্য পক্ষে সুদের সুদ ধরা উচিত, কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র নিস্পত্তির জন্য—আমি তাহা ধরি নাই ।

অনাদি বাবু পত্র পাঠ শেষ করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ আবার কি ? বাবার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হইয়া গিয়াছে, বৃদ্ধ বয়সে উন্মাদ হইলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ কথা বিশেষ ভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া আমার সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য ।"

অনাদি বাবু সেই রাত্রেই পিতার সহিত সাক্ষাতের জন্য কাশীধামে রওনা হইলেন।

পুত্রকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ চক্ষু হইতে চশমা নামাইয়া বলিলেন, "এই যে অনাদি—এস, বাড়ীর খবর সব ভালো ? তুমি চিঠি পেয়েই এসেছ, ভাল, ভাল টাকা কড়ির কাজ যত শীঘ্র মেটে ততই ভালো।"

অনাদি বাবু পিতার কথায় বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "টাকা ! কিসের টাকা ! আর আপনি সে টাকার আশা কেমন করে করেন ! সে ঋণ আমার নাবালক অবস্থায় হইয়াছিল, তা ছাড়া সে ঋণ বহুদিন তামাদি হইয়া গিয়াছে।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয় তা আমি জানি। তবে কি জান, তোমার কাছে বলেই আমি এ টাকার তাগাদা করি নাই। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস ছিল আমার পুত্র কখনও জুয়াচোর হইবে না।"

ক্রুদ্ধ অনাদিভূষণ উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি জুয়াচোর, এ কথা কেহ বলিতে পারে না ; আমি কাহারও এক পয়সা ন্যায্য পাওনা রাখি না।"

বৃদ্ধ চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া গুড়গুড়ির নলটা মুখ হইতে বাহির করিয়া বলিলেন, "তবে কি তুমি বলিতে চাও, এ তোমার ন্যায্য ঋণ নয়। আমি আশা

করি নাই যে তুমি তোমার পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে এরূপ অন্যায় আপত্তি করিবে। তবে না দাও,—সে ভিন্ন কথা।"

অনাদিবাবু তাঁহার পিতার কথার কোন উত্তর দিলেন না, নীরবে বসিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, টাকা দেওয়া না দেওয়া সে তোমার ইচ্ছা, এখন আমার একটা কাজ করিতে পারিবে কি?"

অনাদিবাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কবে আমি আপনার কোন কাজ করি নাই!"

"ভাল তাহা হইলে বাড়ী যাইবার সময় কলিকাতায় আমার এটর্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়া যাইবে যে আমি একটা নূতন উইল করিব, আমার সঙ্গে শীঘ্র যেন তিনি একবার সাক্ষাৎ করেন?"

অনাদি বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন।—"নূতন উইল—?" বৃদ্ধ বলিলেন "হাঁ, একখানা নূতন উইল করিব স্থির করিয়াছি। পুরাতন উইল খানা পরিবর্ত্তন করিয়া আমার যাহা কিছু আছে সমস্তই ললিতকে দিয়া যাইব ভাবিতেছি।"

"ললিতকে সব দিবেন, আর আমাকে কিছুই দিবেন না এটা কি পিতার ন্যায্য কাজ হইবে?'

"আইনানুসারে যখন তোমার উপর আমার কোন দাবী নাই, তখন আমার উপরও তোমার কোন দাবী নাই। তুমি আমার ন্যায্য প্রাপ্য টাকা না দিলে কেন আমি এমন অকৃতজ্ঞ পুত্রকে আমার কষ্টার্জ্জিত অর্থ প্রদান করিব।"

"এ আপনার মহা অন্যায়। আর অত টাকা আমি কোথায় পাইব।"

"আমি তোমার অবস্থা ভালরূপই জানি,—তুমি তেজারতি কারবারে আমা-পেক্ষাও ধনবান হইয়াছ। তাহা ছাড়া আমার মৃত্যুর পর আমার যাহা কিছু আছে সমস্তই তুমি পাইবে।"

"আপনি এখনও বহুদিন বাঁচিবেন, দেখুন আমার কত টাকার সুদ মারা যাইবে।"

"তবে তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই কর" এই বলিয়া বৃদ্ধ রামায়ণ পাঠ করিতে লাগিলেন। অনাদি বাবু অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিলেন,—"বৃদ্ধ আর বেশী দিন বাঁচিবে না তারপরতো সবই আমার।" তিনি তাঁহার পকেট হইতে 'চেক' বই বাহির করিয়া বলিলেন "দোয়াত কলম কোথায়!"

বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখস্থ বাক্স হইতে দোয়াত কলম বাহির করিয়া দিলেন। অনাদি বাবু কলম লইয়া লিখিতে যাইয়া নিরস্ত হইয়া বলিলেন, "আমি সমস্ত টাকা একেবারে শোধ করিয়া দিতেছি, ন্যায্য মতে নিশ্চয়ই কিছু ছাড় পাইব।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এ টাকা হইতে আমি এক পয়সাও ছাড়িতে পারিব না।"

অনাদি বাবু বিশেষ দুঃখ ও বিরক্তির সহিত চেক খানা সই করিয়া দিয়া বলিলেন, "একটা রসিদ দিন।"

বৃদ্ধ রামায়ণ বন্ধ করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই রসিদ দিব বই কি? ষ্ট্যাম্প সঙ্গে আনিয়াছ কি? না আনিয়া থাক পয়সা চারিটা দাও, আমি ষ্ট্যাম্প দিতেছি।"

অনাদি বাবু বিশেষ বিরক্তির সহিত বলিলেন, "ষ্ট্যাম্পের পয়সা আমি দিব কেন?"

"ভাল সামান্যের জন্য গোলযোগের প্রয়োজন নাই; আমি দিতেছি।"

অনাদি বাবু রসিদ লইয়া আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বিকৃতমুখে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা আমরা বর্ণনা করিব না।

* * * * * * *

এই ঘটনার দুই দিবস পরেই ললিতভূষণ তাঁহার দাদা মহাশয়ের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন,—পত্র পাঠ করিয়া আনন্দে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি হৃদয়প্রভাকে ডাকিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, দাদা মহাশয় পত্রের উত্তর দিয়াছেন, কি লিখিয়াছেন শোন:—

প্রাণাধিক ললিত,—

তোমার পত্র পাইলাম। আশাকরি তুমি ভাল আছ। আমার আদরের ও স্নেহের দিদিমনির যত্নে বোধ হয় তোমার কোন অসুখ নাই। কয়েক দিন হইতে আমার একটা পড়তি টাকা আদায়ের জন্য ব্যস্ত থাকায়, তোমার পত্রের উত্তর যথা সময়ে দিতে পারি নাই। বহুকষ্টে এতদিন পরে সেই টাকাটা আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছি। সেই টাকার চেক খানি ইহার সহিত পাঠাইলাম। তুমি ইহা হইতে অনায়াসেই তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে। বাকী টাকায় আমার দিদিমনির জন্য এক ছড়া নেক্‌লেস গড়াইয়া দিও। ইতি

তোমার বুড়ো দাদা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

ক্ষ্যাপার গান।

বোধোন আবার বস্‌লো তোমার,
আসছো মাগো বঙ্গে ;
সবাই সাজে নূতন সাজে
কতই বিরাট রঙ্গে।
রঙ্গ বে-রঙ্গের পোষাক প'রে,
ঘাড়ে নিয়ে নিজের ঢোল ;
সবাই তারা, সবার বড় ;
এই নিয়ে মা করে গোল।
আমরা অতি ক্ষুদ্র মাগো,
জীর্ণ অতি, ছিন্ন বেশ ;
ঢোল বাজা'বার নাই মা কেহ,
তাই বলে কি হবো শেষ ?
মূর্খ ছেলের আদর বেশী,
মায়ের কাছে চির কাল ;
সেই ভরসায় আছি পড়ে,
ধ'রে মাগো থাকিস্‌ হা'ল।
চরণ ধূলি দাও মা তোমার,
ভয় করি না ছিন্ন বেশে ;
আসুক তুফান যতই কেন,
রইবো তবু দেখবে ভেসে॥

কারমাইকেল প্রেস, ১৭৯ নং মা[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত
২৯ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে [illegible] প্রকাশিত।

গল্পলহরী

২য় বর্ষ | কার্ত্তিক ১৩২০ | ৪র্থ সংখ্যা

মোহিতের পরিণাম।

মোহিত আর আমি একই বৎসরে আমাদের গ্রামের ইংরাজী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই। পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল, তখন দেখা গেল মোহিত তৃতীয় বিভাগে গিয়াছে এবং আমি প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছি। মাষ্টার পণ্ডিত সকলেই বলিলেন, আমি নিশ্চয়ই একটা বৃত্তি পাইব; আমার মনে কিন্তু সে আশার উদয় হয় নাই। আমার মতন হতভাগ্যের অদৃষ্ট কি এত প্রসন্ন হইবে?

আমার অদৃষ্ট যদি মন্দ না হইবে, তাহা হইলে যখন আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, যখন আমার বয়স ১৫ বৎসর, তখন সংসারে আমার আর কেহ ছিল না, সেই সময় হঠাৎ বাবা মারা যাইবেন কেন? জ্যেঠা নাই, খুড়া নাই, মামা নাই, বড় ভাই নাই, এমন কি একজন ভগ্নীপতিও নাই, এমন অবস্থায় মা, বিধবা দিদি এবং আমাকে ফেলিয়া বাবা অকালে স্বর্গে চলিয়া যাইবেন কেন?

তবে এ কথাও বলি, বাবা আমাদিগকে একেবারে পথে বসাইয়া রাখিয়া যান নাই। আমাদের সামান্য যে জোতজমা ছিল এবং এখনও আছে, তাহাতেই এই ছোট পরিবারের মোটা ভাত, মোটা কাপড় চলিয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহা হইতে আমার ভবিষ্যৎ পড়াশুনার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বাবার মৃত্যু হইলে আমি মনে করিয়াছিলাম, আর আমার পড়া চলিবে না। কিন্তু মা বলিলেন, "তোর ভয় কি? তোর

লেখাপড়ার ভাবনা নাই। না হয় ভিক্ষা করিব, তবুও তোকে পড়াইব।" মায়ের হাতে কিছু টাকা ছিল, সেই সাহসেই তিনি একথা বলিয়াছিলেন।

যাহা হউক প্রথম বিভাগে পাশ হইয়া আমার উৎসাহ খুব বৃদ্ধি হইল। হেড মাষ্টার বলিলেন "বৃত্তি পাইলে তুমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইও।" আমি বলিলাম "যদি না পাই।" তিনি বলিলেন "পাবে হে পাবে।" আমি ঠিক জানিতাম যে, আমার অদৃষ্টে বৃত্তি পাওয়া নাই।

তাহাই হইল; আমি বৃত্তি পাইলাম না। মা বলিলেন "না পেলী, আমি তোকে মাসে মাসে কুড়ি টাকা ক'রে দেব, তুই কলেজে পড়তে যা।" আমি বলিলাম "পড়বত ঠিক, কিন্তু কলেজে নয়; আমি ডাক্তারী পড়ব।" বন্ধুবান্ধব আমার এই কথা শুনিয়া ছি, ছি, করিতে লাগিলেন; তাঁহারা সকলেই বলিলেন "ফার্ষ্ট ডিবিসনে পাশ ক'রে কিনা ক্যাম্বেলের ডাক্তার হ'তে যাবে।" কাম্বেলের ডাক্তার যেন মানুষ নয়!

আমি মাকে বলিলাম "দেখ, কলেজে অনেক দিন পড়তে হবে, তাতে খরচও অনেক। তারপর পাশ হব, না হব তার ঠিক নেই। আর ধর যদি বি, এ, এম, এ ই পাশ করি তা হইলেই বা কি হবে? এখনকার দিনে মুরুব্বী না থাক্‌লে শুধু পাশে কিছু হয় না। তোমার হাতে ত রাজার ভাণ্ডার নাই যে, দুহাতে দু দশ বছর খরচ করবে। তার থেকে আমি ক্যাম্বেলে ডাক্তারি পড়ি, তিন বছরেই পড়া শেষ হইবে। পাশ যদি করতে পারি তা হ'লে ত ডাক্তারই হয়ে পড়ব, আর পাশ যদি না করি তা হ'লেও চিকিৎসা-পত্র করে দুপয়সা আন্‌তে পরবই। কলেজে পড়ে তা হবার যো নেই।" মা আমার কথা বুঝিলেন, আমার ক্যাম্বেলে পড়াই স্থির হইল।

মোহিত আর আমি এক বয়সী; কিন্তু বয়স সমান হইলে কি হয়, মোহিত আমার অপেক্ষা চালাক, চতুর; মোহিত দশমুখে কথা বলিতে পারিত, মোহিত খবরের কাগজ পড়িত, মোহিত বুয়ার যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ বলিতে পারিত, মোহিত নাকি কবিতাও লিখিতে পারিত। আর আমি;—আমি না হয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগেই পাশ হইয়াছিলাম, কিন্তু উপরিউক্ত বিষয় গুলির পরীক্ষা লইয়া যদি পাশ ফেল হইত, তাহা হইলে মোহিত প্রথম বিভাগে, এমন কি প্রথম দশজনের একজন হইত, আর আমি সমস্ত বিষয়ে ঢেঁড়া সহি হইতাম। আমি একে বাঙ্গাল, তার পাড়াগেঁয়ে, তার উপর আবার মুখচোরা—একেবারে সোনায় সোহাগা!

মোহিতের সঙ্গে যখন আমার কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল, তখন সে আমাকে তালিম দিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল "দেখ, কোল্‌কাতায় গিয়ে এমন অসভ্যের মত থাক্‌লে তুই সেখানে টিক্‌তেও পারবি নে। এখন থেকেই কথাবার্ত্তা কোল্‌কাতার মত বল্‌তে অভ্যাস কর। আমি তোকে কতদিন বলিনি যে, ও 'করতাম' 'খাতাম' বলিস্‌নে, 'কর্ত্তুম' 'খেতুম' বলা অভ্যাস কর। তুই তখন হেসেই উড়িয়ে দিতিস। এখন কোল্‌কাতায় গিয়ে যদি ঐ রকম কথা বলিস্‌, কোঁচার কাপড় কোমরে জড়িয়ে, খালি গায়ে থাকিস্‌, তা-হ'লে কোন লোকেই তোকে স্থান দেবে না; আমিও তা-হ'লে তোর সঙ্গে এক মেসে থাক্‌তে পারব না। কোল্‌কাতায় খুব ফিট্‌ফাট হ'য়ে থাক্‌তে হয়, নইলে ভারি বিপদ; সে কথা কিন্তু আগেই ব'লে র'খ্‌ছি। তুই ত আগে আর কখন কোল্‌কাতায় যাস্‌নি, আমি কতবার গিইছি; তাই আমার কথা ভাল হ'য়েছে, আমি সেখানকার চাল চলন সব শিখে নিয়েছি, এত দিন যারা আমায় ঠাট্টা করত, কলকাতাই ব'ল্‌ত, তারা এখন গিয়ে যেন দেখে নেয়, আমার কেমন সুবিধে হয়েছে, আর তোর কত অসুবিধা পোয়াতে হচ্ছে।"

মোহিতের কথা শুনিয়া সত্য সত্যই আমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। একে কখন দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাই নাই, তাহার পর মোহিত যে প্রকার ভয় দেখাইয়াছিল, তাহাতে মনে হইয়াছিল, হয়ত আমাকে কলিকাতা হইতে ফিরিয়াই আসিতে হইবে, সেখানে পড়াশুনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে। শেষে মনে হইল, আমার মত বাঙ্গাল কি কেহ কলিকাতায় পড়িতে যায় না? আমি তখন মোহিতকে বলিলাম "ভাই, তোর সঙ্গেই ত যাইব, তুই আমাকে যেমন যেমন করিতে বলিবি, আমি তাহাই করিব।"

মোহিতকে যে আমি মুরুব্বী করিলাম, ইহাতে সে বড়ই আনন্দিত হইল। সে বলিল "তা তোর কোন ভয় নেই, তোর সব ত্রুটি আমি সেরে নেব।"

যথা সময়ে মা ও দিদিকে প্রণাম করিয়া, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া মোহিতের সহিত কলিকাতায় যাত্রা করিলাম মোহিতের মামা সিটি কলেজে বি, এ পড়িতেন, তিনি ষ্টেসন হইতে আমাদিগকে তাঁহার মেসে লইয়া গেলেন

তাহার পর বহুবাজার অঞ্চলে আমাদের জন্য একটা মেসের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। আমি বলিলাম "যে মেসে আমাদের দেশের ছেলে বেশী আছে, সেই রকম একটা মেসে গেলে ভাল হয়।" আমার কথা শুনিয়া মোহিত রাগিয়া উঠিল; সে বলিল "বাঙ্গালদের সঙ্গে এক মেসে আমরা থাক্‌ব না।" আমি বুঝিলাম, কলিকাতায়, তেরাত্রি না যেতেই মোহিত কলিকাতাওয়ালা সহুরে হইয়া গিয়াছে, আর আমরা সবাই বাঙ্গাল হইয়া গিয়াছি। কি করিব, তাহাকে কর্ণধার করিয়া যখন কলিকাতারূপ আটলান্টিক মহাসাগরে খেয়ায় উঠিয়াছি, তখন সে যদি একটু জল গায়ে ছিটাইয়াই দেয়, তাহা অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে। মোহিত ও তাহার মামা মেস খুঁজিতে বাহির হইত, আমাকে সঙ্গে লইত না, যাইতে চাহিলে বলিত "তুই ছেলেমানুষ, পাড়াগেঁয়ে, তুই সহরের কি জানিস্।" ব্যস—চুপ। মোহিত একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, সে আমার তিন মাসের ছোট, এবং সে তৃতীয় বিভাগে, আর আমি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। সে আমাকে নিতান্ত নাবালক ও নালায়েকের দলে ফেলিয়া দিল। স্কুলে পড়িবার সময় পণ্ডিত মহাশয় যখন তখন বলিতেন 'বয়সেতে বৃদ্ধ হয় না, বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে।' এ ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাইলাম।

অনেক অনুসন্ধানের পর হৃজুরিমলের ট্যাঙ্ক লেনে একটা মেস পাওয়া গেল। সেই মেসের একটা ঘরই খালি ছিল; তাহাতে দুইজনের থাকিবার কথা। মোহিত নাকি প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল যে, সে আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকিবে না; এক মেসে সে থাকিতে সম্মত হইয়াছে, সে কেবল আমি তাহার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম বলিয়া। কিন্তু সে মেসে অন্য ঘরে কোন স্থান খালি ছিল না, অগত্যা তাহাকে আমার সঙ্গে একমেসেই থাকিতে হইল। মোহিত বঙ্গবাসী কলেজে ভর্ত্তি হইল, আমি শিয়ালদহের ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে প্রবিষ্ট হইলাম।

মা তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হইতে প্রতিমাসে আমাকে কুড়িটী টাকা পাঠাইতেন। প্রথম আসিবার সময় পুস্তক ও জিনিষপত্রাদি কিনিবার জন্য অতিরিক্ত ৫০৲টী টাকা দিয়াছিলেন। স্কুলের বই কিনিতেই তাহার অর্দ্ধেকের অধিক ব্যয় হইয়াছিল। আমি যখন বই কিনিতে আরম্ভ করিলাম, তখন মোহিত একদিন আমাকে বলিল "এক সঙ্গে এত বই কেন কিন্‌চিস;

যখন যে বই পড়া আরম্ভ হ'বে, তখন সেইখানি কিন্‌লেই হবে। এখন অন্যান্য অনেক খরচ আছে।" আমি বলিলাম "অন্য খরচ আর কি? কাপড় চোপড় যা বাড়ী থেকে আনিয়াছি, তাহাতেই চলিয়া যাইবে, বিছানা পত্রও আনিয়াছি, থালা গ্লাসও আনিয়াছি। এখন আর চৌকী কিনিব না; দোতালার ঘর, একটা মাদুর কিনিয়া লইলেই হইবে।"

আমার কথা শুনিয়া মোহিত রাগিয়া অস্থির হইয়াছিল; সে বলিল, "ঐ জন্যই ত তোর সঙ্গে 'এক ঘরে, এক মেসে থাকব না ব'লে ছিলাম। বাড়ী থেকে যে কাপড় জামা এনেছিস্, তা যদি এখানে ব্যবহার করিস্, তা হ'লে তোকে 'স্কুলে বস্‌তেই দেবে না।' ঐ চটি জুতো পায়ে দিয়ে বুঝি স্কুলে যাবি। কোল্‌কাতায় যদি থাক্‌তে হয়, 'তা হ'লে আমি যা বলি, তাই কর। আমার সঙ্গে চল, ভাল দেখে জামা কিনে দিই, কোট কিনে দিই, বুট জুতো কিনে দিই। তার পর আয়না বুরুস, চিরুণী কিন্‌তে হবে, তোয়ালে কিন্‌তে হবে, সাবান কিন্‌তে হবে, রুমাল কিন্‌তে হবে। এ সব চাই; কোল্‌কাতায় থেকে পড়াশুনো কোরতে হলে এ সব আগেই চাই; বই দুই একখানা 'চেয়ে চিন্তেও চলে, এ সব ত আর চেয়ে পাওয়া যায় না। তার পর জানিস্, একটু চালাক চতুর হ'তে হবে, থিয়েটার দেখ্‌তে যেতে হবে; যেখানে যেখানে সভা হবে, লেক্‌চার হবে, তা সব শুন্‌তে যেতে হবে। এ সব না ক'রলে লেখাপড়াই হয় না। এই ত কয় দিন এসেছিস্; 'এর মধ্যে ছেলেদের চাল চলন দেখেও কি বুঝ্‌তে পারলি না?"

আমি সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলাম "ভাই মোহিত, তোমাদের অবস্থা ভাল, তোমরা ও সবে খরচ করিতে পার। আমি গরিব মানুষ; আমার কি ও সমস্ত পোষায়। তা, তোমাদের যদি অসুবিধা বোধ হয় তাহা হইলে আমি দেখে শুনে 'আমার মত গরিবের ছেলেরা যেখানে থাকে সেই রকম একটা মেসে যাব।"

মোহিত রাগিয়া বলিল "বেশ, সেই ভাল। আমি তা হলে বাঁচি।"

তাহার পর কুড়ি বাইশ দিন মোহিতের সঙ্গে এক মেসে ছিলাম, পরে শিয়ালদহের অতি নিকটে আর একটি মেসে গিয়াছিলাম। সেখানে আমাদের অঞ্চলের কয়েকটী ছাত্র ছিলেন, সকলেই ডাক্তারী পড়িতেছেন, এবং সকলেই

প্রায় আমার মত গরিব। আমি যে তিন বৎসর কলিকাতায় ছিলাম, তাহা এই এক মেসেই কাটিয়াছিল।

মোহিতের সঙ্গ ছাড়িয়া আসিবার পর সে যদিও কোনদিন আমার সংবাদ লয় নাই, আমি কিন্তু সর্ব্বদাই তাহার খোজ লইতাম। তাহার সহিত দেখা হইলে সে মুরুব্বীগিরি করিতে ছাড়িত না। বিশেষ সে তখন নাকি দশ-জনের একজন হইয়াছিল। মাথায় লম্বা চুল রাখিয়াছিল, (তখন তাহাই ফ্যাসান ছিল) চসমা পরিয়াছিল, সিঁথি কাটিত, এসেন্স মাখিত—এক কথায় বাবু হইবার জন্য যাহা কিছু সরঞ্জাম তাহা সমস্তই সে সংগ্রহ করিয়াছিল। শনিবার ও রবিবারে সে যথানিয়মে থিয়েটারে যাইত, আকাশ ভাঙ্গিয়া বজ্রপাত হইলেও তাহার থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ হইত না। যেখানে যখন যে হুজুগ হইত, মোহিত তাহাতেই যোগ দিত। সে সবই করিত, কিন্তু যে জন্য কলিকাতায় গিয়াছিল, সেই পড়াশুনাই করিত না।

তখন কলেজে উপস্থিত, অনুপস্থিতের কোন হাঙ্গামা ছিল না, দুই বৎসর রেজেষ্টারী বহিতে নাম রাখিতে পারিলেই এল, এ পরীক্ষা দেওয়া যাইত। মোহিত কলেজে যাক্ আর নাই যাক্; পড়ুক আর নাই পড়ুক, দুই বৎসর কলেজে বেতন যোগাইয়াছিল; সুতরাং দুই বৎসর পরে তাহার পরীক্ষা-প্রদানের কোন প্রতিবন্ধক হইল না, তাহার পিতা তাহাকে মাসে মাসে যে টাকা পাঠাইতেন, তাহাতে কি মোহিতের মত বাবু লোকের কলিকাতার খরচ চলে? সে মধ্যে মধ্যে নানা কথা বলিয়া বাড়ী হইতেও কিছু কিছু অতিরিক্ত আনাইত; কিন্তু তাহাতেও তাহার কুলাইত না। আমার নিকট সে কোনদিন টাকা ধার করিতে আসে নাই, কারণ সে জানিত, আমার বড়ী হইতে যাহা আসে তাহার একটি পয়সাও বাঁচে না। সে অন্যান্য ছাত্রের নিকট ধার করিত, মেসের ঝির নিকট তাহার অনেক টাকা ধার হইয়াছিল, যে লোকটা জলখাবার দিত তাহার নিকটও ধার হইয়াছিল। সে কাহারও টাকা সহজে শোধ দিত না, সেই জন্য একস্থানে দুইবার ধার করা তাহার পক্ষে সহজ হইত না।

পরীক্ষার পর আমার সঙ্গে যখন তাহার দেখা হইল তখন তাহাকে বাড়ী যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল "বাবা, ঐ ম্যালেরিয়ার মধ্যে যাইয়া কি প্রাণ হারাইব?" মোহিত বাড়ীতে গেল না। পরীক্ষার

ফল বাহির হইলে, গেজেট খুঁজিয়াও তাহার নাম পাওয়া গেল না ;—পড়াশুনা করিলে ত পাশ হইবে ?

আমি মনে করিয়াছিলাম, একবার ফেল হইয়া হয় ত মোহিতের জ্ঞান হইয়াছে, সে হয় ত পুনরায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে। বাহিরে আমার কথাই ঠিক থাকিল। মোহিতের পিতা আর এক বৎসর তাহার পড়ার খরচ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু মোহিত আর কলেজে নাম লিখাইল না ; বাড়ীতে সকলে জানিতে লাগিল মোহিত পড়াশুনাই করিতেছে, কিন্তু মোহিত কলেজ ছাড়িয়া দিল। মাসে মাসে বাড়ী হইতে টাকা আসে, মোহিত বাবুগিরিতে সে টাকা উড়াইয়া দেয়। সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না, মোহিতের নাকি স্বভাবচরিত্রও বিগড়াইয়া গিয়াছে।

এই সময়ে একদিন মোহিতের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। সে শুনিয়াছিল যে, আমি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় কয়েকটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছি এবং আমাকে কলেজের বেতন দিতে হয় না। মোহিত আমাকে দেখিয়া বলিল "ওরে, তুই নাকি বৃত্তি পেয়েছিস্, বেশ—বেশ আর একটি বছর গেলেই ডাক্তার আর কি! তা দেখ্, এখন ত তোর টাকা কড়ির অভাব নেই, আমাকে দশটী টাকা হাওলাত দিতে পারিস্, আমি মাইনে পেলেই তোর টাকা দিয়ে যাব।"

আমি বলিলাম "মাইনে কি ? তুমি চাকুরী কোরছ নাকি ?"

মোহিত বলিল "ওহো! সে খবর তোকে বুঝি দিই নেই, আমি যে বেঙ্গল থিয়েটারে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার হয়েছি ; মাসে ৬০৲ টাকা মাইনে পাই ; দু'চার মাস পরেই ম্যানেজার হব আর কি। তখন ১০০৲ টাকা মাইনে হবে; আর অংশ পাব। তুই একদিন থিয়েটারে যাস্, তোকে 'বক্সে' বসিয়ে প্লে দেখাব।"

আমি বলিলাম "আজ দুই বছর হ'য়ে গেল, কোন আমোদ দেখতে যাই নাই ; শেষ পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তার পর সে সব দেখা যাবে. এখন কি আর সময় আছে ?"

মোহিত বলিল "তা বেশ, বেশ, তাই হবে। চল্ তোর সঙ্গে যাই, আমার দশটি টাকার খুবই দরকার। যেদিন মাইনের টাকা পাব, সেই দিনই তোর টাকা আগে দিয়ে যাব, বড় বেশী হয় ত আট নয় দিন।"

আমি বলিলাম "ভাই, আমার অবস্থা ত জান, মা তাঁর জমা টাকা ভেঙ্গে আমার খরচ দিতেন। এবার বৃত্তি পাওয়ার পর থেকে মার নিকট থেকে আর খরচ আনাই নে। বৃত্তির টাকা যা পাই, তাই দিয়েই চালাই। কাজেই আমার হাতে একটী পয়সাও থাকে না।"

মোহিত ছাড়িবার পাত্র নয়; সে বলিল "তোর কাছে না থাকে, মেসের কোন ছেলের কাছ থেকে ধার ক'রে দে, আমি ঠিক আট দশদিন পরে দিয়ে যাব।"

আমি বলিলাম "এটা হবে না ভাই, ধারকে আমি বাঘের মত ভয় করি। আমি কোন দিন ধার করি নাই, কখনও ধার করবো না, ভিক্ষা করতে হয়, সেও ভাল।"

মোহিত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল "দিবিনে তাই বল্. অত কথায় দরকার কি?" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

আমাদের মেসে আমার সতীর্থ একটী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার থিয়েটার দেখিবার খুব বাতিক ছিল। তাঁহাকে মোহিতের কথা বলিলাম। তিনি হাসিয়া অস্থির, শেষে বলিলেন "তুমিও যেমন, মোহিত বাবু ম্যানেজার না আরও কি! তিনি থিয়েটারের টিকিট কালেক্টর। যে কয়দিন থিয়েটার হয়, সেই কয়দিন দুয়ারে দাঁড়াইয়া টিকিট লন। শুনিয়াছি এই কাজের জন্য তিনি সপ্তাহের ঐ তিন দিন আট আনা হিসাবে পারিশ্রমিক পান, আর থিয়েটার দেখা উপরি লাভ। আর যা করেন, তা আর শুনে কাজ নাই।" এই কথা শুনিয়া আমি ত অবাক! মোহিতের যে এতদূর অধঃপতন হইবে, তাহা কোন দিনই ভাবি নাই; তাহার জন্য বড়ই দুঃখ হইল।

মাস দুইয়ের মধ্যে মোহিতের আর কোন সংবাদ পাইলাম না। একদিন রবিবার রাত্রি প্রায় একটার সময় আমার উপরিউক্ত বন্ধুটী থিয়েটার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জাগাইয়া বলিলেন "শুনেছ, তোমাদের মোহিত আজ কি কীর্ত্তি করেছে?" আমি বলিলাম "ব্যাপার কি?" তিনি বলিলেন "আর ব্যাপার! একেবারে পিক-পকেট (Pick-poket) একটী ভদ্রলোক থিয়েটার দেখ্‌তে এসেছিলেন। তিনি যখন দুয়ার দিয়া ভিতরে যাইতেছিলেন, মোহিত তখন তাঁহার পকেট হইতে টাকাশুদ্ধ রুমালখানি তুলিয়া লইয়াছিল। আর একটী লোক তাহা দেখিতে পাইয়া তখনই মোহিতকে ধরিয়া ফেলেন। মহাগণ্ডগোল! আমরা সকলে গিয়ে তাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য কত অনুরোধ

করিলাম; ভদ্রলোকটীও সম্মত হইলেন; কিন্তু থিয়েটারের কর্ত্তারা সে কথা শুনিলেন না। তাঁহারা মোহিতকে পুলিশের জিম্মা করিয়া দিলেন। তাহাকে তখনই থানায় লইয়া গেল।”

মোহিতের এই কুকার্য্যের কথা শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। সে রাত্রিতে আর কি করিব? পরদিন সকাল সকাল লালবাজার পুলিশ কোর্টে গেলাম। সঙ্গে কিছু টাকাও লইয়া গেলাম; যদি তাহার বিশ পচিশ টাকা জরিমানা হয়, তাহা হইলে তাহা দিয়া তাহাকে খালাস করিয়া আনিব।

পুলিশ কোর্টে যাইয়া চারি টাকা দিয়া একজন উকিল নিযুক্ত করিলাম। যথাসময়ে মোহিতের মোকর্দ্দমা উঠিল। সে যে পকেট মারিয়াছিল, তাহা সপ্রমাণ হইয়া গেল। উকিল বাবু মোহিতের প্রতি দয়া করিবার জন্ম বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বিচারক মহাশয় তাহার প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। মোহিত ছলছল নেত্রে একবার আমার দিকে চাহিল; তাহার পরই আদালতের লোকেরা তাহাকে গারদে লইয়া গেল।

সে আজ দশ বৎসরের কথা। কারাগার হইতে বাহির হইয়া মোহিত যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সে বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়া গিয়াছে, তাহাও আজ পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারে না।*

শ্রীজলধর সেন।

* এই গল্পটী ‘বন্দনা’ নামে অপ্রকাশিত মাসিকে ছাপা হইয়াছিল; আমরা পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ভবিষ্যতে জলধর বাবুর একাধিক রচনা আমরা প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিব।

খড়্গে মিলন।

মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এক দিন সন্ধ্যার সময় একটী বালিকা দিল্লীর চক বাজারে টুপি বিক্রয় করিয়া কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। বালিকার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে, পরিধানে একখানি লাল রঙ্গের সাড়ী। বেশ, সচরাচর পশ্চিম দেশীয় রমণীগণ যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—সেইরূপ। সে সময়ে নীলাকাশে এক একটী করিয়া তারা ফুটিতেছিল, কোথা হইতে যেন তারাগুলি দেখিতে দেখিতে আকাশের যেখানে সেখানে উদিত হইতে লাগিল, বালিকা এক মনে তাহাই দেখিতে দেখিতে কুটীরে ফিরিতেছিল।

তাহার লাল সাড়ী দেখিয়া পথ-পার্শ্বস্থ একটা মহিষ অতিশয় কুপিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। বালিকা প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল; তাহার চীৎকারে মহিষ আরও কুপিত হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। চারিদিক হইতে লোক ছুটিল, যাহার মহিষ সে নিকটে ছিল, সেও ছুটিয়া আসিল, কিন্তু মহিষের নিকট যাইয়া বালিকার প্রাণরক্ষা করিতে কাহারও সাহস হইল না। আর এক মুহূর্ত্ত,—বালিকাকে মহিষ প্রায় ধরিয়াছে,—এখনই তাহাকে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ফেলিবে,—এমন সময়ে কোথা হইতে একটি তীর আসিয়া সেই কুপিত মহিষের নত মস্তকের উত্তোলিত শৃঙ্গের ঠিক মধ্যস্থলে বিদ্ধ হইল। নিমিষের মধ্যে মহিষ ধরাশায়ী হইল, আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। বালিকা চমকিত ও স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইল। তখন সকলে দেখিল যে একটী অতি সুন্দর আরবীয় অশ্বকে বায়ুবেগে প্রধাবিত করিয়া একটী রাজপুত যোদ্ধা সেই দিকে আসিতেছেন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি সেই স্থানে আসিয়া অশ্বকে দণ্ডায়মান করিয়া লম্ফ দিয়া ভূমে অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে একেবারে বালিকার হাত ধরিয়া বলিলেন, "লাগে নাই তো?" বালিকা এত মিষ্ট কথা কখনও শোনে নাই; সে কিছুই উত্তর দিতে পারিল না, তাহার চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে নয়নাশ্রু বহিল। তখন সে যুবক নিজ পরিচ্ছদ মধ্য হইতে একখানি বহুমূল্যবান রুমাল বাহির করিয়া বালিকার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "আর ভয় কি? চল আমি তোমায় বাড়ী রাখিয়া আসি।" এই বলিয়া তিনি বালিকাকে লইয়া তাহাদের গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথে আসিতে আসিতে কেহই কোন কথা কহিলেন না,—বালিকার কথা কহিবার ক্ষমতা লোপ

হইয়াছিল; তাহার আপদ মস্তক কম্পিত হইতেছিল, কুটিরের সম্মুখে আসিয়া বালিকা কম্পিত স্বরে কহিল, "এই আমাদের বাড়ী।"

যুবক কুটীর দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। বালিকার মাতা বালিকার নিকট সকল কথা শুনিয়া যুবকের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যুবক বলিলেন, "আমি বেশী আর কি করিয়াছি,—সম্মুখে নারীহত্যা হয়, সেই নারীজীবন রক্ষা করিবার জন্ত তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; কোন্ রাজপুত ইহা না করিত ?" যুবক ইচ্ছা করিয়া সেই কুটীরে বসিলেন; তৎপরে বালিকার মাতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার নিকট হইতে কথায় কথায় তাঁহাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল জানিয়া লইলেন; সে বালিকার নাম কমল, তাহার পিতার নাম লছমন সিংহ। লছমন সিংহের দিল্লীর বাজারে একখানি কাপড়ের দোকান ছিল। কমলের বয়স দ্বাদশ বৎসর হইলে লছমন সিংহ কালগ্রাসে পতিত হন, তখন নানাছলে তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার বিধবা স্ত্রীর নিকট হইতে দোকান খানি ফাঁকি দিয়া লয়। কমলের মাতার দারিদ্র্যতা দেখিয়া তাঁহার রূপবতী কন্তার উপর অনেকের দৃষ্টি পড়ে। তিনি এই সকল দেখিয়া ভীত হইয়া দিল্লী ত্যাগ করিয়া, দিল্লী হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কুতব মিনারের নিকটে কমলকে লইয়া এই কুটীরে বাস করিতেছেন। মাতা ও কন্তা টুপী সেলাই করিয়া যাহা পান তাহাতেই তাঁহাদের অতি কষ্টে একরূপ চলিয়া যায়। তৎপরে যুবক আবার আসিব বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

২

কমলের মন বড় অস্থির হইল। পরদিন সে সমস্ত দিনই যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কাহারও পদশব্দ হইলে সে চমকিত হইয়া উঠিত, কিন্তু সে যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল, তিনি আসিলেন না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন বৃদ্ধ মুসলমান চারিজন হিন্দুবাহকের দ্বারা নানা প্রকার আহারীয় ও বস্ত্রাদি আনিয়া কমলদের কুটীরে উপস্থিত করিল। কমলের মাতা কত বারণ করিলেন, কমল কত বারণ করিল, তাহারা সে কথায় কর্ণপাতও করিল না,—সমস্ত তাহাদের দ্বারে রাখিয়া চলিয়া গেল। তখন কমলের মাতা কমলকে বলিলেন, "যিনি কাল তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তিনিই তোমাকে এই সকল পাঠাইয়াছেন। আমাদের অবস্থা ভিক্ষুকের অধম হইয়াছে। আর দান গ্রহণে কুণ্ঠিত হইয়া লাভ কি ?" কমল আরও অস্থির হইল। পর দিবস তাহার কাজ কর্ম্মকর্ম্ম কঠিন হইয়া উঠিল; সে তাহার হৃদয়ের ভাব অত্যন্ত কষ্টে গোপন করিতে

লাগিল। কিন্তু যাহার জন্য সে এত অস্থির হইল, তিনি আসিলেন না। সন্ধ্যার সময়ে বাহকেরা দ্রব্যাদি লইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু রাজপুত যুবক আর আসিলেন না। একদিন কমল মুখ ফুটিয়া বাহকদিগকে রাজপুত যুবকের কথা জিজ্ঞাসা করিল; তাহারা প্রথমে কোন কথাই কহিল না, অবশেষে তাহার অনেক কাকুতি মিনতিতে বলিল, "আমরা কোন রাজপুত যুবককে চিনি না, কোন রাজপুতের আজ্ঞায়ও এ সকল আনিতেছি না।" তখন কমল হতাশ হইল; এইরূপে তিন মাস কাটিয়া গেল।

তিন মাস পরে সহসা একদিন রাজপুত যুবক দেখা দিলেন। কমলের বিষণ্ণ বদনে হাস্যের উদয় হইল। কমলের মা তাঁহাকে প্রথমেই এরূপে দ্রব্যাদি পাঠাইতে বারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "কে পাঠায়,—সে আমি নই। যদি তাঁহার সঙ্গে দেখা হয়, বারণ করিব।" তৎপরে কমলের মাতা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে যুবক বলিলেন, "আমি সামান্য রাজপুত মাত্র, নাম কুমার সিংহ, মাহারাজা মানসিংহের সহিত কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে।"

সেই দিবস হইতে রাজপুত যুবক প্রত্যহ কোন না কোন সময়ে কমলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন।

কমলের মাতা ইহা জানিতেন, তবে ইহাতে তিনি আপত্তি করিতেন না। যাহারা এরূপ সদাশয় ও মহৎ অন্তকরণ, তাঁহার উপর তিনি কোনই সন্দেহ করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সময় হইলেই যুবক বিবাহের প্রস্তাব করিবেন। রাজপুত যুবকের সহিত কমলে বিবাহ হউক, ইহাপেক্ষা আর অধিক সে কি আশা করিতে পারে? এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল যুবক প্রত্যহই আসিতে লাগিলেন, আহারীয় দ্রব্যাদিও প্রত্যহ আসিতে লাগিল। কমল বড় সুখেই এক বৎসর কাটাইল।

৩

সহসা একদিন রাজপুত যুবক অনুপস্থিত হইলেন,—যিনি প্রতিদিন আসিতেন, ঝড় বৃষ্টি মানিতেন না; তিনি সহসা অনুপস্থিত হইলে কাহার না ভাবনা হয়? কমল নানা প্রকারে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল। বহু কষ্টে সে রাত্রি কাটাইল; কিন্তু পর দিনও কুমার সিংহ আসিলেন না, পর দিনও আসিলেন না, তার পর দিনও আসিলেন না।

এইরূপে আবার এক বৎসর কাটিয়া গেল। কমল ক্রমে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তাহার মুখে দুঃখের মেঘ গাঢ় হইতে গাঢ়তম হইল। কিন্তু কুমার

সিংহ আসিলেন না। এই এক বৎসর প্রত্যহই নিয়মমত আহারাদি আসিত কিন্তু সহসা তাহাও একদিন বন্ধ হইল। তখন কমলের মাতার যুবকের উপর বড়ই ক্রোধ হইতে লাগিল, তিনি যুবককে গালা গালি দিতে লাগিলেন। কমল কেবল এই মাত্র বলিল, "তিনি ইচ্ছা করিয়া কখনই ইহা করেন নাই।"

ক্রমে আবার কমলদের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইল, কমলের মাতা এ কষ্ট সহ্য করিতে পারিলেন না, পীড়িতা হইলেন। তখন কমল দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া মাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিল. অবশেষে দেখিল যে আর অন্নের চেষ্টা না করিলে চলে না, পথ্যাভাবে চক্ষের উপর মাতার প্রাণনাশ হয়; তখন সে একদিন হৃদয়ে সাহস বাঁধিয়া দিল্লির দিকে চলিল;—ভাবিল একটা চাকরীর চেষ্টা করিবে, আর পারেতো কুমার সিংহের সংবাদ লইবে। মাতাকে "বাজারে যাইতেছি," বলিয়া সে একদিন প্রাতে পদব্রজে দিল্লী চলিল।

সহর কি তাহার জ্ঞান ছিল না;—সহরে আসিয়া চাকরীর চেষ্টা করা দূরে থাকুক, সে দেখিতে দেখিতে পথ ভুলিয়া গেল। কত জনে কতরূপে তাহাকে অপমানিত করিতে লাগিল। সে তখন বাটী প্রত্যাগমনে হতাশ হইল, সমস্ত দিনের অনাহারে ব্যাকুলা হইয়া এক মসজিদের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই পথে একজন বৃদ্ধ মোগল যাইতেছিলেন, তিনি তাহাকে দেখিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তৎপরে বলিলেন, "কমল কুমারী?" কমল চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তৎপরে নীরবে কাঁদিতে লাগিল। তিনি বলিলেন "তুমি এখানে কেন?" তখন কমল মোগলকে চিনিল। ইনিই প্রথম দিবস তাহাদের কুটীরে আহারাদি লইয়া গিয়াছিলেন। সে অধিক কিছুই বলিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমি বাড়ী যাইব। পথ ভুলিয়া গিয়াছি। তখন মোগল বলিলেন, "আমার সঙ্গে এস।" কমলকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মোগলের দয়া হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার আরও দয়া হইল। তিনি বলিলেন "সে যুবক কি আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করেন না? আহা-রাদিও কি বন্ধ হইয়াছে?" এবার কমল একেবারে ফুঁফাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন মোগল পথে আসিতে আসিতে তাহার নিকট একে একে সমস্ত কথা শুনিলেন। কমল চাকরীর প্রত্যাশায় যে দিল্লী আসিয়াছিল, তাহাও তিনি শুনিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "আমি তোমার জন্য একটী চাকরী জোগাড় করিয়া দিতে পারি। কিন্তু মুসলমানের বাড়ী, চাকরী করিবে কিনা জানি না। কমলের চক্ষে তখন মাতার অনাহার নাচিতেছিল, তাহার আর অন্য জ্ঞান ছিল

না; সে বলিল, "করিব।" মোগল বলিলেন, "তবে কাল প্রস্তুত থাকিও, আমি কাল প্রাতে যাইয়া তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিব। চাকরী আগ্রায়, বেগম মহলে। মাকেও সঙ্গে নিও। বোধ হয় সেখানে সুখে থাকিতে পারিবে।" এই সময়ে তাঁহারা প্রায় সহরের বাহিরে আসিয়াছিলেন; বৃদ্ধ মোগল কতকগুলি আহারীয় ক্রয় করিয়া কমলকে প্রদান করিতে উদ্যত হওয়ায়, কমল সঙ্কুচিতা হইল। মোগল বলিলেন, "এই আহারীয় লইতে সঙ্কুচিত হইও না, ইহা তোমার মাহিনার টাকার অগ্রিম বলিয়া গ্রহণ কর।" তখন কমল সেই গুলি লইয়া দ্রুতপদে গৃহের দিকে চলিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে।

৪

কমল বাটী আসিয়া মাতাকে সকল কথা বলিল; তিনি প্রথমে কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। একে চাকরী, তাহাতে আবার মুসলমান গৃহে, কমলের মাতার পক্ষে ইহা একরূপ অসহ্য হইল। কিন্তু কমল অনেক বুঝাইতে লাগিল; তাহার কাকুতি মিনতিতে কমলের মাতা অবশেষে স্বীকৃতা হইলেন। মাতার কষ্ট কমলের পক্ষে সহ্য করা একরূপ অসম্ভব হইয়াছিল,—তাহার উপর তাঁহার আর সে স্থানে বাস করিবার ইচ্ছা এক বিন্দুও ছিল না—প্রতি পদেই তাহার কুমারসিংহের কথা মনে পড়ে, কমলের কোমল প্রাণে এ অসহ্য হইয়াছিল। তাহাই সে এ বাসস্থান ত্যাগ করিতে এত ব্যাকুলা। সে ভাবিয়াছিল, অন্যত্র যাইয়া দাসী বৃত্তি করিয়া একরূপে মাতার কষ্ট নিবারণ করিতে পারিবে, কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে কুমারসিংহের কথাও মনে পড়িবে না। এই সকল ভাবিয়াই কমল আগ্রায় যাইয়া চাকরী করিতে এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। তাহাদের যাহা কিছু ছিল, কমল বাঁধিয়া ঠিক করিয়া রাখিল। সকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই একখানি গরুর গাড়ী লইয়া মোগল আসিলেন। কমল ও কমলের মাতা তাহাতে আরোহণ করিলেন। বৃদ্ধ মোগল একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

প্রায় সন্ধ্যাকালে তাঁহারা আগ্রায় পৌছিলেন। সে রাত্রে আর মোগল কমলকে বেগম মহলে লইয়া গেলেন না। নগরের প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র কুটীর স্থির করিয়া তথায় কমল ও কমলের মাতাকে রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে আসিয়া মোগল কমলকে লইয়া বেগম মহলে চলিলেন। বেগম মহলের দ্বারে আসিয়া একজন প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মলক্ এখন কোথা?" প্রহরী কহিল, "খোজা সাহেব ঐ খানে আছেন।" তখন মোগল কমলকে লইয়া খোজার নিকট আসিলেন। বেগম মহলের তত্ত্বাবধানের ভার

ইহার উপর ছিল। মোগলকে দেখিয়া তিনি বলিলেন "এই বালিকা?" মোগল কহিলেন, "যাহার কথা বলিয়াছিলাম এই সে; কোন্ বেগম সাহেবের নিকট রাখিবে?" খোজা কহিলেন, "সাহাজাদা সেলিমের দিলখোস বেগমের নিকট।" মোগল বলিলেন, "ভালই হইল; তাঁহার প্রশংসা সর্ব্বত্রই আছে।"

তখন খোজার সহিত কমল চলিল। কত গৃহ, বহুমূল্য সুন্দর সুন্দর কত দ্রব্য,—আগ্রার বেগম মহল কবি-কল্পনা প্রসূত ইন্দ্রপুরি অপেক্ষাও মনোহর ছিল; কমল বিমুগ্ধচিত্তে এই সকল দেখিতে দেখিতে এক অতি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় মখমল গদিযুক্ত হস্তি-দন্ত-নির্ম্মিত সিংহাসনে দিলখোস বেগম আসনে কি পাঠ করিতেছিলেন। খোজা প্রবেশ করিয়া ভূমি চুম্বন করিয়া বলিল, 'বেগম সাহেব! বাঁদী উপস্থিত হইয়াছে," বেগম কমলের দিকে চাহিয়া খোজাকে প্রস্থান করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, খোজা সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। তখন বেগম বলিলেন, "বোস—তোমার বয়স তো বড় অল্প।" বেগমের বয়সও কমলের অপেক্ষা বড় অধিক নহে।

তখন বেগম সাহেব একে একে কমলের সকল কথা শুনিলেন,—কমল সকল বলিল, কেবল কুমার সিংহের কথা বলিল না, তাহাদের কষ্টের কথা শুনিয়া বেগমের মনে বড়ই কষ্ট হইল, কমলের সহিত তাঁহার সমান বয়স হওয়ায় সহানুভূতি আরও গাঢ় হইল। কমল প্রার্থনা করায়, তিনি কমলকে প্রত্যহ মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আহারাদি প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য অনুমতি করিলেন। অবশেষে বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নামটী কি?" কমল বলিল "আমার নাম কমল, কিন্তু এখানে আর সে নাম রাখিবার ইচ্ছা নাই?" বেগম সাহেব বলিলেন, "কেন কেন? তোমার ধর্ম্মের উপর হাত দেয় কাহার সাধ্য? জানই ত বাদসাহ স্বয়ং হিন্দুর মেয়ে বিবাহ করিয়াছেন।"

এইরূপে বাঁদী হইয়া কমল ছয় মাস কাটাইল। প্রত্যহ দুই প্রহরের সময় সে যাইয়া মাতার আহারাদি রন্ধন করিয়া দিয়া আসিত। এইরূপে তাহারা একরূপ সুখে দুখে জীবনাতিপাত করিতে লাগিল।

৫

একদিন কমল বৈকালে মাতাকে আহারাদি করাইয়া বেগম মহলে আসিতেছিল;—পথিমধ্যে আসিয়া দেখিল, অসংখ্য-সৈন্য সামন্ত সহ বাদ্যোদম করিয়া কে আসিতেছেন; সে সেই জনতার মধ্য দিয়া যাওয়া অসম্ভব বুঝিয়া এক দোকানের পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন সর্ব্ব প্রথমে পাঁচ সাত জন নকিব ফুকরাইতে ফুকরাইতে

আসিল; তৎপশ্চাতে একদল বাদ্যকর, তৎপশ্চাতে প্রায় একশত সুসজ্জিত হস্তী, পৃষ্ঠে একদল সৈন্য। তৎপশ্চাতে অসংখ্য কামান, তৎপশ্চাতে অসংখ্য পদাতিক সৈন্য, তাহার পর প্রায় দশহাজার অশ্বারোহী, ইহাদের পশ্চাতে প্রায় পঞ্চাশ জন সৈনিক পুরুষে বেষ্টিত হইয়া একজন মুসলমান যোদ্ধা একটী সুন্দর অশ্ব পৃষ্ঠে সদর্পে আসিতেছেন। কমল এই সকল দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল; সে মুসলমান যোদ্ধাকেও দেখিল, সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। সে পড়িতেছিল, কিন্তু দোকান প্রাচীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর যে অসংখ্য সৈন্যগণ তাহার সম্মুখ দিয়া গেল, সে আর তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না। সে মুসলমান বেশে দেখিল—কুমারসিংহ। প্রথমে তাহার অবিশ্বাস হইয়াছিল। কুমারসিংহ রাজবংশ সম্ভূত বটে, কিন্তু রাজা নহেন। তাঁহার এত জাঁক জমক কোথা হইতে হইবে? এত জাঁক জমক সাহাজাদাগণের হইতে পারে।

যখন সে প্রকৃতিস্থ হইল, তখন সৈন্য সামন্ত সকল চলিয়া গিয়াছে। কেবল আগ্রার জনতাপূর্ণ পথে অসংখ্য লোক যে যাহার কার্য্যে চলিয়াছে। সে দেখিল সন্ধ্যা হয়, তখন সে দ্রুতপদে বেগম মহলের দিকে চলিল। কিছুদূর আসিয়া তাহার আর একটী বাঁদীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। কমল বহুকষ্টে মুখ ফুটিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই পথে এইমাত্র কে এলেন জান?" বাঁদী যেন চমকিত হইয়া বলিল, "এঁা! তুমি কি সাহাজাদা খসরুকে চেন না? হয় তো উনিই বাদসা হবেন। খসরু রাজা মানসিংহের ভাগিনেয়। কি আশ্চর্য্য তুমি সাহাজাদা খসরুকে চেন না!" কমলের সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইল, কমল চারিদিকে অন্ধকার দেখিল, তৎপরে সেই রাজপথে মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিত হইল। তখন দেখিতে দেখিতে সেইস্থানে একটা জনতা হইল। বাঁদী একখানা গাড়ী যোগাড় করিয়া কমলকে বেগম মহলে লইয়া গেল।

বেগম মহলে আসিয়া কমলের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল; সে বলিল, "তাহার এইরূপ মূর্চ্ছা মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।" তৎপরে সে সেই রাত্রে অসুস্থ বোধ করায় মাতার নিকট গেল। তথায় যাইতে না যাইতে পথিমধ্যেই সে ভয়ানক জ্বরাক্রান্ত হইল। বেগম সাহেব কমলকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া তাহার তত্ত্ব লইতে লাগিলেন ও তাহার চিকিৎসার জন্য একজন হাকিম পাঠাইলেন, একজন দাসীও নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এক মাস জ্বরে ভুগিয়া কমল উঠিতে সক্ষম হইল। তখন সে বেগম সাহেবের নিকট আসিয়া তাহার কৃতজ্ঞতা জানাইল, কিন্তু বলিল "বেগম সাহেব, বাঁদী আপনার দয়া, স্নেহ

ও ভালবাসা কখনই ভুলিতে পারিব না, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ বাঁদী আর আপনার আশ্রয়ে থাকিতে পারিতেছে না।" বেগম অনেক অনুরোধ করায়ও কমল কারণ বলিল না, থাকিতেও স্বীকৃতা হইল না। তখন বেগম সাহেব তাহাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া বলিলেন, "যদি নিতান্তই যাইবে, তবে আজিকার রাত্রি থাকিয়া যাও।" কমল এ অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, সে রাত্রি বেগম সাহেবার নিকট থাকিতে স্বীকৃতা হইল।

রাত্রিকালে কমল বেগমের নিকট শুনিল যে সেলিম খসরুকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তখন এই কথা শুনিয়া তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। তাহার কুমারসিংহই খসরু, আকবরের পৌত্র, এ কথা ভাবিতেও তাহার হৃদয় বসিয়া যাইতেছিল; কিন্তু যে তাহাদিগকে অনাহার হইতে রক্ষা করিয়াছে, যে তাহাদিগকে এত ভাল বাসিয়াছে, যে তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, তাহার আসন্ন বিপদ জানিতে পারিয়াও তাহাকে সংবাদ না দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। সে পর দিবস বেগম সাহেবাকে বলিল যে সে এখন আর যাইবে না, সে ইচ্ছা সে এখন ত্যাগ করিয়াছে। বেগম মহা সন্তুষ্ট হইলেন ও সেই আনন্দে আর তাহাকে তাহার এই সহসা ইচ্ছা পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

তৎপরে সে শুনিল যে খসরুকে বন্দি করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইয়াছে,—রজনীতে খসরুকে বন্দি করা হইবে। নানা সুযোগ অনুসন্ধান করিয়াও সে খসরুকে এই সংবাদ জ্ঞাত করিবার কোন সুবিধা পাইল না; সে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবার বিষয়ে হতাশ হইল।

৬

এক দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় যেই আগ্রার প্রসাদের সিংহদ্বার-উপরস্থ নহবত খানার মধুর বাদ্য বন্ধ হইল, অমনি প্রাসাদে এক মহাগোল উঠিল। সহসা প্রচার হইল যে বাদসাহ আকবর সাহা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বাদসাহের পুত্র ও পৌত্র, সাহাজাদা সেলিম ও খসরু—উভয়েই সিংহাসন প্রার্থী;—উভয়েরই পক্ষে ওমরাওদিগের মধ্যে অনেকেই ছিলেন; সুতরাং বাদসাহের মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইলে, প্রথমে রাজপ্রাসাদে, তৎপরে দেখিতে দেখিতে সমস্ত নগরে, সেই নিশীথ রাত্রিকালে একটা গোল উঠিল। সাহাজাদা খসরু নিদ্রা যাইতেছিলেন; জনৈক খোজা তাঁহাকে এ সম্বাদ দিল। তিনি অনতিবিলম্বে পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হইলেন। অন্ধকারে দিল্লীর শত সহস্র প্রকোষ্ঠ-

নয়ী প্রাসাদের ঘূর্ণায়মান পথ দিয়া খসরু আসিতেছিলেন, পথি মধ্যে কে তাঁহার গতিরোধ করিল—কে তাঁহার হাত ধরিল। খসরু চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" তখন স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর হইল, "সাহাজাদা, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন; আপনি এক্ষণে বাহিরে যাইবেন না। সেলিমের চর আপনাকে বন্দি করিবার চেষ্টা করিতেছে।" তাঁহাকে যে কেহ বন্দি করিতে পারে, এ কথা খসরুর বিশ্বাস ছিল না; তিনি মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "খসরু আকবরের পৌত্র মানসিংহের ভাগিনেয়, খসরুকে বন্দি করে এমন লোক এখনও জন্মায় নাই।" এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইবার উপক্রম করিলেন। তখন সেই ঘোর অন্ধকারে সেই রমণী আবার আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল; বলিল, "আপনাকে আমি যাইতে দিতে পারি না, যাইতে দিব না।" খসরুর মনে সন্দেহের উদয় হইল,—তিনি ভাবিলেন, হয়তো এই পিশাচীই সেলিমের চর। তিনি সবলে হস্ত উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি দেখিলেন রমণী অতিশয় বল সহকারে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়াছে। তখন তাহার অধিকতর সন্দেহ হইল, তিনি সবলে হস্ত উন্মুক্ত করিলেন। বোধ হইল রমণী দূরে নিক্ষিপ্তা হইলেন,—বোধ হয় যেন প্রস্তর প্রাচীরে তাঁহার মস্তকে বিশেষ আঘাত লাগিল; কিন্তু দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতে সেই রমণী আসিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল; বলিল, "দেখুন, আমার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে। আমায় মারিয়া ফেলিতে চাহেন, মারিয়া ফেলুন, কিন্তু জানিয়া শুনিয়া আমি কিছুতেই আপনাকে বিপদে যাইতে দিব না।" খসরুর তখন বিবেচনা ও চিন্তাশক্তি ছিল না,—তিনি গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুমি কে, আমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছ, পথ ছাড়িয়া দাও।" এই বলিয়া তিনি সবলে পদমুক্ত করিলেন; রমণী বোধ হয় আবার প্রস্তরে আঘাতিতা হইলেন।

তখন খসরু দ্রুতবেগে বাহিরে আসিলেন। যেই বাহিরে আসিতেছেন, অমনি প্রাচীর পার্শ্বে লুকায়িত প্রায় পঞ্চাশ জন সৈনিক পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি নিজ অসি উন্মোচনেরও সময় পাইলেন না, বন্দি হইলেন। সৈনিকেরা তাঁহাকে লইয়া চলিল,—যাইতে যাইতে খসরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি?" একজন সৈনিক বলিল, "সাহাজাদা, ক্ষমা করিবেন। আমাদের সে হুকুম নাই।" তখন খসরু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এই পথে বেগম মহলে এই মাত্র কেহ গিয়াছিল কি?" সেই সৈনিক আবার কহিল, "আর কাহাকেও যাইতে দিবার আমাদের

অনুমতি ছিল না। সাহাজাদা সেলিমের বাঁদী কমল গিয়াছিল।" "কে? কমল, কমল!" অস্পষ্টস্বরে খসরু দুই তিন বার এই কথা বলিলেন, তৎপরে অন্যমনস্ক হইলেন। সৈনিকেরা তাঁহাকে কারাগারের দিকে লইয়া চলিল।

কমল বিফল মনোরথ হইয়া ধীরে ধীরে নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করিল; তৎপরে খসরুর বন্দি হইবার সংবাদ পাইল। তখন সে অতি কষ্টে সে রাত্রি বেগম মহলে কাটাইয়া পর দিবস মাতার নিকট আসিল। আসিয়া দেখিল যে মাতার ভয়ানক জ্বর।—সে চিকিৎসক আনাইবার সময় পাইল না। তাঁহার মুমূর্ষাবস্থা উপস্থিত হইল। তিনি সেই মৃত্যু-শয্যায় কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "কমল, সব করিস, কিন্তু ধর্ম্মচ্যুত হইয়া যেন আমার জল গণ্ডুষ বন্ধ করিস্‌নে।" এই কথা শুনিয়া কমলের হৃদয় কম্পিত হইল; সে ভাবিল, "মা কি আমার কুমার সিংহের বৃত্তান্ত সব জানিতে পারিয়াছেন!" কিন্তু তাহার আর অধিক ভাবিবার সময় হইল না। কমলের মাতা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন কমল কাঁদিতে কাঁদিতে বহু কষ্টে মাতার সৎকারাদি করিল।

এ দিকে খসরু নির্জ্জন কারাগারে বন্দি হইয়া সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বন্দি হইবার রাত্রে যে রমণী তাঁহাকে আসিতে প্রতিবন্ধক দিয়াছিল, তথায় তাঁহার মনে তাহারই কথা উদয় হইতে লাগিল। যত তাহার বিষয় তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে কোথায় তিনি সে স্বর শুনিয়াছেন।—কিন্তু কোথায় শুনিয়াছেন, কিরূপ অবস্থায় শুনিয়াছেন, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কমল বাঁদী কে?—সে তাঁহার জন্য এত করিবে কেন? এই সকল বিষয় যত ভাবেন, তাঁহার মন ততই অধীর হয়; শেষ তাঁহার এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান না করিয়া থাকা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি কারাধ্যক্ষকে নিজ হীরক হার প্রদান কবিয়া তাহাকে কমল বাঁদীর সবিশেষ বিববরণ জানিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি কয়েকদিন পরে আসিয়া বলিলেন, "সাহাজাদা সেলিমের দিলখোস বেগম সাহেবার নিকট কমল বলিয়া একজন বাঁদী ছিল। কয়েকদিন হইল তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, সেইজন্য সে বিদায় লইয়া গিয়াছে। তাহারা বেগম মহলের পশ্চিম দিকে যমুনা-তীরে একখানি কুটীরে বাস করে।" খসরু এইমাত্র জানিতে পারিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে বাধ্য হইলেন।

রাজা মানসিংহের ইচ্ছা, নিজ ভাগিনের বাদসাহ হয়েন। তাঁহার যত্ন ও সাবধানতাকে পরাস্ত করিয়া সেলিম খসরুকে কারারুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তিনি এই

ঘটনার পর নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিলেন না। তিনি অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিয়া নানা উপায়ে খসরুকে কারামুক্ত করিলেন; তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়াই তাহাকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্রই উদয়পুরে পলায়ন কর; এদিকে যোগাড় হইলে তোমাকে সংবাদ দিব।" খসরু রাত্রিকালে কারামুক্ত হইলেন, কিন্তু উদয়পুরে পলায়ন করিলেন না।

খসরু প্রায়ই রাজার বেশে দিল্লীর নিকটস্থ নানাস্থানে পর্য্যটন করিতেন। স্থানে স্থানে নানা নাম গ্রহণ করিয়া নানা লোকের উপকার করিতেন। ইহা তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ভিন্ন আর কেহই জানিত না। বলা বাহুল্য যে এইরূপ ভ্রমণেই একদিন তিনি বালিকা কমলকে মত্ত মহিষশৃঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লী প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার একজন বিশ্বস্ত মোগল অনুচরকে কমলের বাটীতে আহারীয় পাঠাইতে আজ্ঞা করিলেন। তৎপর দিবস কমলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি তাহা পারিলেন না। সেই রাত্রিতেই বাদসাহের আজ্ঞায় একদল সৈন্য লইয়া দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে তাঁহার তিন মাস হইল; তাহাই তিনি, তিন মাস আর কমলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। তৎপরে তিনি প্রত্যাগমন করিলে বাদসাহ আগ্রায় যাইয়া বাস করিবার ইচ্ছা করিলেন, তাঁহাকে দিল্লী থাকিবার জন্যই আজ্ঞা হইল। তিনিও তাহাই চাহেন, তিনি তৎপরে যে এক বৎসর দিল্লী বাস করিয়াছিলেন, প্রত্যহ কমলের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

সহসা একদিন বাদসার নিকট হইতে লোক আসিল, তিনি, সেই লোকের সহিত সেই রাত্রিতেই আগ্রা যাত্রা করিলেন, তথা হইতে তিনি বাদসাহের আজ্ঞায় কাশ্মীর যাত্রা করিলেন; কমলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় ও সুবিধা পাইলেন না। কিন্তু যাইবার সময় কমলের আহারীয় ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন, তিনি এক বৎসরের মধ্যে আর কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই; তাঁহার অনুপস্থিতি বশতঃ লোকেরা কমলদের আহারীয় দানে অবহেলা করিতে লাগিল, তৎপরে একেবারে বন্ধ করিল। পরে যাহা যাহা হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন। এক বৎসর পরে যুদ্ধ জয় করিয়া খসরু যে দিবস আগ্রায় প্রত্যাগমন করেন, সেই দিন পথে কমল তাঁহাকে দেখিতে পায়।

আগ্রায় আসিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া খসরু সেই দিবসই দিল্লী প্রস্থান করিলেন; দিল্লী আসিয়াই তিনি কমলের সন্ধানে গেলেন। তিনি দেখিলেন যে কমল আর তথায় নাই। অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন সংবাদ পাইলেন না, তবে কেহ কেহ বলিল যে "শুনিয়াছি তাহারা আগ্রায় গিয়াছে।" তৎপরে তাঁহার দিল্লী থাকা কষ্টকর হইল,—তাঁহার মন বড়ই খারাপ হইল তিনি দিল্লী বাস ত্যাগ করিয়া আগ্রায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বন্দি হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তখন সেই নির্জ্জনে কমলের কথা তাঁহার আরও অধিক মনে হইতে লাগিল।

৮

মাতার শ্রাদ্ধাদি যথাসাধ্য সম্পন্ন করিয়া কমল সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার মনস্থ করিল। তাহার যাহা কিছু ছিল সে বিক্রয় করিল, গেরুয়া বসন ও কমণ্ডলু সংগ্রহ করিল, তৎপরে একদিন অতি প্রত্যুষে বাটী হইতে বহির্গত হইল। দ্বার হইতে বহির্গত হইয়া সম্মুখে দেখিল কুমারসিংহ। তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, সে পড়িবার উপক্রম করিল, তখন খসরু তাহাকে ধরিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। কমল সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "সাহাজাদা, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনি খসরু, অগ্রে এ কথা আমাকে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে দুঃখিনীর কন্তা আপনার ন্তায় লোককে কখন ভালবাসিত না—ভয়ে দূরে থাকিত।" খসরু বলিলেন, "আমার অধিক কথা কহিবার সময় নাই আমার পশ্চাতে শত্রু। কমল,—বল, তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে কি না? তোমার কথার উপর জীবনের সুখ দুঃখ, আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে। রাজ্য সিংহাসন আমি কিছুই চাহি না, তোমাকে লইয়া জঙ্গলে থাকিলেও আমি সুখে থাকিতে পারিব। বল বল, দিল্লীর সিংহাসন তো আমার।" কমল ধীরে অথচ গম্ভীরে বলিল, "আপনি কেন কুমারসিংহ হইলেন না? আপনি কেন আমার নিকট আত্ম গোপন করিলেন?" খসরু ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কমল, আমাকে ক্ষমা কর। অত কথা কহিবার আমার সময় নাই। বল, বল, তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইতে পারে কি না?" তখন কমল কহিল, "কুমারসিংহ, ভালবাসার দ্রব্য পাইব, দিল্লীর বাদসাহের সহধর্ম্মিণী হইব, এ প্রলোভন—বড়ই প্রলোভন; কিন্তু কুমার তুমি কি আমাকে, তোমায় বিবাহ করিয়া ধর্ম্মচ্যুৎ হইয়া মাতার জলগণ্ডুষ বন্ধ করিতে বল? মাতাকে অনাহারে রাখিয়া, তুমি কি আমাকে রাজ্য সুখ ভোগ করাইবে? আমি যে তোমাকে বিবাহ করিলে আর মাতাকে জল দিতে পারিব

না। তুমি কি আমাকে, মাতাকে অনাহারে রাখিয়া বিলাস ভোগে দিল্লীর বাদসাহের মহিষী হইতে বল?" খসরু সেইস্থানে জানু পাতিয়া বসিলেন, "তুমি দেবী, তোমায় পাইব এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছি। তোমাকে না পাইয়া আমার রাজ্য সিংহাসন সকলই মিথ্যা। কমল্ ইহজন্মে হইল না, দেখি পরজন্মে তোমাকে পাই কি না" তৎপরে তিনি বেগে উত্থান করিলেন, আর কমলের দিকে চাহিলেন না। যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিলেন,—একটী প্রার্থনা—মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে একবার দেখা দিও, আমায় গোয়ালিয়ারের কারাগারে পাইবে।" খসরু উদয়পুর পলাইলেন না, তিনি মান সিংহের কথা শুনিলেন না, সেলিমের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন। তিনি যাহা ভাবিয়া ছিলেন তাহাই হইল, তিনি গোয়ালিয়ারের কারাগারে বন্দি হইলেন।

খসরু প্রায় দশ বৎসর গোয়ালিয়ারের দুর্গে বন্দি রহিলেন। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। সকলেই অবগত আছেন, যে দিবস হন্তাগণ জীর্ণ-শীর্ণ খসরুকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়, সেই সময়ে খড়্গের নিম্নে একটী রমণী কোথা হইতে আসিয়া নিজ দেহ নিক্ষিপ্ত করে। আহত রক্তাক্ত কলেবর খসরু এক জটাজুট ধারিণী সন্ন্যাসিনীকে নিজ দেহোপরি আহতা পতিতা দেখিয়া অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে কহিলেন, "দেবী আপনি কে? তখন আসন্ন-মৃত্যু সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আমি কমল আজ আমাদের বিবাহ।"

আমার কাহিনী।

তাকে যখন প্রথম দেখি, আমি তখন বালক। আমার বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর, আর তার বছর দশেক হইবে।

তার নাম পুষ্পমালা। নামটি যেমন মিষ্ট, মেয়েটি তেমন শিষ্ট ছিল না। তার পিতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; পুষ্পমালা তাঁহার একমাত্র আদরিণী কন্যা।

ডেপুটী বাবু যেদিন প্রথম বদলী হইয়া আমাদের সহরে আসিলেন, সেইদিন হইতেই পুষ্পমালা, গ্রামের সমবয়সী বালিকাদের ভিতরে একাধিপত্য স্থাপন করিল।

ডেপুটী বাবু, বিপত্নীক! পুষ্পমালাকে প্রসব করিয়া, সূতিকাগৃহেই তাঁহার স্ত্রী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতেই এই মাতৃহীনা কন্যাকে কোলে তুলিয়া নিয়া, তিনি মায়-মত-যত্নে তাকে মানুষ করিতে লাগিলেন,—দ্বিতীয়বার বিবাহের নাম পর্য্যন্ত আর মুখে আনেন নাই। তিনি যেমন একাধারে পিতামাতা, পুষ্পমালাও তেমনি তাঁর একাধারে পুত্রকন্যা! এমন কি মেয়েকে তিনি সর্ব্বদা পুরুষের বেশে সাজাইয়া দিতেন।

পুষ্পমালার স্বভাবের সঙ্গে পুরুষ বেশে দিব্য মানানসই হইয়াছিল। স্নানের ঘাটে গিয়া, যখন সে দেখিত বয়স্ক বালকেরা নদীতে ডুবজলে সাঁতার দিতেছে, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিত না। যদিও সে নিজে সাঁতার জানিত না—তবু সে খপ্ করিয়া কোন রমণীর কাঁকাল হইতে কলসী কাড়িয়া নিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িত এবং কলসীতে ভর দিয়া স্রোতের সঙ্গে দূরে ভাসিয়া যাইত।

গাঁয়ের দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে সে বড় বড় গাছে উঠিত,—পাখীর ছানা পাড়িবার জন্য। মালীর চোখে ধুলা দিয়া, পরের বাগান হইতে ফল চুরি করিতে, অনেক দুষ্ট বালক অপেক্ষা তার অল্প দক্ষতা ছিল না।

একদিন হইল কি, আমি আমাদের বাগানে দাঁড়াইয়া আছি। আমার মাথার উপরে পেয়ারা গাছে অনেকগুলি পাকা পেয়ারা রহিয়াছে। একটাকে টিপ্ করিয়া আমি ঢিল ছুড়িলাম, পেয়ারাটি মাটিতে আসিয়া পড়িল।

অমনি হঠাৎ সামনের "পুঁইডাটার মাচানে"র তলা হইতে পুষ্পমালা বাহির হইয়া আসিল এবং আমার দিকে চাহিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল "ত্যাখ্ মান্কে খপর্দ্দার তুই ও পেয়ারাটায় হাত দিস্‌নে !"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম "বাঃ, এ'ত আমাদের গাছ, আমাদের পেয়ারা !"

পুষ্পমালা চোখ ঘুরাইয়া বলিল, ।"

"বারে ! ওঁদের গাছ ব'লে মাথা কিন্‌লেন আর কি ; আমি বলে কিনা এতক্ষণ ব'সে ব'সে দেখছিলাম, কোন পেয়ারাটা খাব, আর উনি কোথা থেকে এসে চিলের মত ছোঁ দিয়ে পড়লেন !

হুঃ ! আদরের নেটো !"

পুষ্পমালা পেয়ারাটি মাটি হইতে তুলিয়া লইল ! আমি ছুটিয়া গিয়া, তাড়াতাড়ি তার হাত ধরিয়া বলিলাম "দাও, আমার পেয়ারা—দাও বল্‌চি !"

"এই যে দিচ্ছি" বলিয়া পুষ্পমালা ধাঁ করিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া লইয়া, বা হাতে পেয়ারাটি মুখে পুরিয়া দিল এবং ডান হাতে আমার গালে এক খাব্‌ড়া বসাইয়া দিয়া. চোখের নিমিষে নিরাপদ ব্যবধানে গিয়া দাঁড়াইল !

ভাল মানুষ বলিয়া চিরকাল আমার একটা খ্যাতি আছে। চড় খাইয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া—কেন জানিনা,—পুষ্পমালা আবার আমার কাছে আসিল, "মান্‌কে, তুই কাঁদছিস্ ?"

খ

তারপর ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ডেপুটী বাবু, অনেক দিন ভিন্ন জেলায় বদ্‌লী হইয়া গিয়াছেন। পড়াশুনায় বরাবর আমার সুখ্যাতি ছিল। তার প্রমাণ এই কুড়ি বৎসর বয়সে, আমি বিএ পাশ দিয়া, এম এ পড়িতেছি।

কুড়ি বৎসরের ছেলে—এম এ পড়ে, সুতরাং বিয়ের বাজারে দর খুব। অতএব, ঘটক-দলের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বাবার রোজ আপিসের বেলা হইয়া যায়।

কিন্তু, মা'র আমার, কোন সম্বন্ধই মনঃপুত হয় না। তাঁর ইচ্ছা, কনে চাই টুক্‌টুকে, গয়না হবে 'গা-মোড়া', টাকা পাবেন বাক্সভরা, আর 'খাশুড়ী-মাগী তত্ত্ব পাঠাবে কি মাসে। এমন সম্বন্ধ মেলা ভার। এমনি করিয়া কিছুদিন যায়।

অবশেষে, গ্রীষ্মের ছুটীতে দেশে আসিয়া, হঠাৎ শুনিলাম, আমার বিবাহ স্থির। ক্রমে শুনিলাম, সেই পুষ্পমালার সঙ্গে আমার বিবাহ। মা-মরা মেয়ে, ও মনের মত কুলিনের ঘরের ছেলে পাওয়া যায় নাই বলিয়া ডেপুটী বাবু এতদিন কন্যার বিবাহ দেন নাই। আমাকে তাঁর পছন্দ হইয়াছে, তাই ছশো ভরি সোনা আর নগদ ছয় হাজার টাকার সঙ্গে তিনি তাঁর সমস্ত বিষয়ের একমাত্র অধিকারিণী কন্যাকে আমার হাতে সঁপিয়া দিবেন।

মা'র মুখে হাসি ধরে না, বাবাও বড় খুসি। কিন্তু সেই পুষ্পমালা! সুন্দরী বটে, কিন্তু তার চপেটাঘাত আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। সুতরাং আমার অন্তরাত্মা কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমি খাঁটি হিন্দু বামুনের ঘরের ছেলে। বরাবর মন দিয়া লেখা-পড়া করিয়াছি এবং তখনও পর্য্যন্ত একখানি নভেল পড়ি নাই। সুতরাং মনের অশান্তি মনেই রহিল,—বাপ-মার সামনে গিয়া লেক্‌চার ঝাড়িতে পারিলাম না।

গ

কাল আমার বিবাহ। বাবা, সমস্ত গ্রামকে নিমন্ত্রণ করিয়া, খাওয়াইয়া দিয়াছেন। আয়োজনের কোন ত্রুটী নাই—এমন কি প্রীতি-উপহার পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। পাড়ার একটী পনেরো বছরের 'নাবালক' বালক সেই কবিতাটি লিখিয়া দিয়াছিল। যদিও এখনও সে বিবাহ করে নাই, তবু দাম্পত্য-জীবনের কর্ত্তব্য ও প্রেম লইয়া সে এমন লেখা লিখিয়াছিল যে, গাঁয়ের সবজান্তা ঠাকুর্দ্দা পর্য্যন্ত গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিয়াছিলেন "ছোকরা বেড়ে রচনা করেছে হে! এমন রচনা পড়েছি কেবল ঈশ্বর গুপ্তের। আহা! ঈশ্বর গুপ্ত কি লেখাটাই লিখতে পার্ত্ত!

"বিবিজান চলে যান, লবেজান করে!"

কাব্যের কি ভাব—আ-হা-হা! ওরে বিশু, ওরে নিধে! কোথা গেলি বাবা সব,—একটু তামুক সাজ দেখি!"

ঠাকুর্দ্দা, তামুক সেবন করুন, ইত্যবসরে তোমাদের কাছে আমি চুপি চুপি স্বীকার করিতেছি যে, কবিতাটির মানে আমি এক বর্ণও বুঝিতে পারি নাই।

পদ্মার ধারে, গোয়ালন্দে আমার ভাবী শ্বশুরবাড়ী। পরদিন যথাসময়ে বরবেশে সদলবলে যাত্রা করিলাম।

বিবাহের সময়ে আমাদের এই যে "চারিচোখ এক-করা" প্রথাটি আছে, এ বড় চমৎকার প্রথা! বিবাহিতেরা জানেন, তখন সুধু চোখে চোখে মেলে না—প্রাণে প্রাণে মেলে!

আমি পুষ্পমালার দিকে চাহিবা মাত্র দেখিলাম, বড় বড় কৌতুহল-ভরা চোখে সে আগে হইতেই আমার দিকে চাহিয়া আছে—সে দৃষ্টিতে নববধূসুলভ লজ্জার লেশমাত্র ছিল না। চোখে চোখে মিলিবামাত্র সে হাসিয়া ফেলিল। ভাবিলাম, পুষ্পমালা, যে পুষ্পমালা সেই পুষ্পমালাই আছে।

* * * * * * *

কেন জানি না, শ্বশুর মহাশয় বাসর ঘরের রঙ্গরসের পক্ষপাতী ছিলেন না। সন্ধ্যালগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। রাত্রি গভীর হইবার পূর্ব্বেই যে দু'চারিজন স্ত্রীলোক ছিলেন, সামান্ত কথাবার্ত্তার পরে, তাঁরা একে একে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

আমার চোখে সেদিন ঘুম ছিল না—আমি তখন যেন এক নূতন আনন্দের দেশে প্রবেশ করিতে ছিলাম।

বাহিরে, সানায়ে কি একটা অজানা রাগিণী বাজিতেছিল,—তার সুর যেন "হাসির কান্না" মাখা! শুনিতে শুনিতে আমার প্রাণের ভিতরে যেন কেমন করিতে লাগিল। আস্তে আস্তে আমি পুষ্পমালার নরম হাত দুটি আমার নিজের হাতের ভিতরে লইলাম। তারপর মৃদুকণ্ঠে ডাকিলাম, "পুষ্পমালা, জেগে আছ?"

পুষ্পমালার দেহ একটু নড়িয়া উঠিল।

"পুষ্পমালা?"

"উঃ!"

"আমায় চিন্তে পার?"

"হুঁ!"

"পেয়ারা খাওয়ার কথা মনে পড়ে?"

"যাও—"

"আর সেই—সেই চড়্ মারা?"

পুষ্পমালা, আমার দিকে পিছন ফিরিয়া শুইল। কত ডাকিলাম, কোন জবাব দিল না। বুঝিলাম সে পুষ্পমালা আর নাই!

জান্‌লা দিয়া রজনীগন্ধার সুগন্ধ নিয়া হাওয়া আসিতেছিল,—সে হাওয়া ধীরে ধীরে আমাকে ঘুম পড়াইয়া দিল। গভীর সে সুখসুপ্তি! তেমন ঘুম আর কখনও ঘুমাই নাই—ঘুমাইবও না!

৬

অঘোরে ঘুমাইতেছিলাম। হঠাৎ মনে হইল, কে যেন আমার গায়ে হাত দিয়া, আমাকে ঠেলিয়া বলিতেছে।

"ওগো,—ওঠ, ওঠ!" সে স্বর কম্পিত, ব্যগ্র, ত্রাসাতুর।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। কিসের একটা তুমুল কোলাহল কাণে পশিল। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; ভাবিলাম স্বপ্ন দেখিতেছি!

ঘর অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে কে বলিল "চল, চল—বাণ্ এসেছে!"

জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি?"

"বাণ এসেছে গো, বাণ এসেছে! জলের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছ না?"

"বাণ?—"

ক্রমে ক্রমে সকল কথা মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কে? পুষ্পমালা?"

"হ্যাঁ!"

"আর সবাই কোথায়?"

"কেউ নেই—সবাই পালিয়েছে। ওঠ, ওঠ, আর দেরি নয়,—বাইরে চল!"

হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ হইল,—তারপর যেন শত শত লোকের চীৎকার আর আর্ত্তনাদ! আমার মাথার ভিতরে সব যেন গোলমাল হইয়া গেল,—এক লাফে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম,—সেই সঙ্গে কে যেন নরম দুখানি হাত দিয়া আমাকে একান্তভাবে জড়াইয়া ধরিল।

বাহিরের কল্লোল ক্রমবর্দ্ধমান! থাকিয়া থাকিয়া আমাদের পায়ের তলায় ভূমিকম্পের মত মাটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল —শুষ্ককণ্ঠে কহিলাম, "ভয় পেও না পুষ্পমালা, আমার হাত ধর। অন্ধকারে আমি বাইরে যাবার পথ চিন্তে পাচ্ছি না।"

কম্পিত করে সে আমার হাত ধরিল। বাধার পর বাধা পার হইয়া, কতবার পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া, বাহিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলাম।

কি অন্ধকার!

অন্ধকার যে এত গাঢ় হইতে পারে, তা আমি জানিতাম না। উপরে চাহিলাম, আকাশের সেই সোনার চাঁদ কোথায় গেল?

নীচের দিকে চাহিলাম; কি দেখিলাম? জানি না! শুধু মনে হইল, বিশ্বব্যাপ্ত অন্ধকারে যেন কাহার বিরাট ভীষণ তিমির-নিবিড় দেহ দোদুল দুলিতেছে,—এক আধারে, যেন আর এক ততোধিক ঘন আঁধার উৎকট উল্লাসে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে!

আর—আর—সেই কর্ণভেদী মিশ্রিত কোলাহল! কখনও মনে হয়, তাহা উন্মত্ত মহা জলধির নৃত্যমত্ত তরঙ্গদলের মৃত্যু-ধ্রুপদ, কখনও মনে হয়, তাহা অবিরামবাহী ঝটিকার প্রবল আরাব, আবার কখনও বা বোধ হয়, তাহা সারা পৃথিবীর সহসা অসহায় শত লক্ষ নরনারীর বুকফাটা আর্ত্তরব!

উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—"পুষ্পমালা—পুষ্প—"

কথা শেষ হইবার আগেই আর একটা অপূর্ব্ব-শ্রুত ভীষণ শব্দ শুনিলাম। সেইসঙ্গে, অকস্মাৎ আকাশের কঠোর-কালো নিকষে বিদ্যুতের সুতীব্র স্বর্ণাগ্নি-লেখা ফুটিল! সভয়ে চাহিয়া দেখিলাম, আমাদের বাড়ীর ভিতরটা পড়িয়া যাইতেছে।

আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম,—সেখানটাও থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বাড়িতেছে—ক্রমেই বাড়িতেছে! তাহার ঝাপটে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার মত হইলাম; এমন সময়ে, আমার পদতলে বন্যার খর-জিহ্বার প্রথম স্পর্শ অনুভব করিলাম।

এতদূর জল উঠিয়াছে!

পুষ্পমালাকে তাড়াতাড়ি কাছে টানিয়া আনিলাম। সে কাঁপিতে কাঁপিতে আমার বুকের উপরে মুখ রাখিল। উদ্দাম ঝোড়ো হাওয়ায়, তার বেণীমুক্ত চুলগুলি আমার মুখের উপরে আসিয়া পড়িল। কেন জানি না—জীবন-মৃত্যুর সেই ভয়াবহ সীমারেখায় দাঁড়াইয়াও তাহার পেলব অঙ্গস্পর্শে সর্ব্বাঙ্গে আমার, একটা অজ্ঞাত তড়িতপ্রবাহ বহিয়া গেল। মনে হইল, এই বিরাট অন্ধকারে এই ভীষণ ঝটিকা-দাপটে, এই পৃথ্বীপ্রমাথী বন্যা-প্লাবনে, সে আমার,—একান্ত আমারই, আমি ভিন্ন তার আর গতি নাই,—তাকে না বাঁচাইতে পারিলে আমার মরণই শ্রেয়!

আমি তার মুখের উপরে মুখ রাখিলাম, আমি তাকে বুকে চাপিয়া ধরিলাম!

হঠাৎ বারান্দাটা ভয়ানক দুলিয়া উঠিল,—বুঝিলাম, আর এক পলক দেরি হইলে, বারান্দার সঙ্গে আমরাও সলিল-সমাধি লাভ করিব।

প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "পুষ্প, কোন ভয় নেই তোমার! যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ তুমি আছ! আমাকে ছেড় না!"

বলিতে বলিতে, বক্ষে সেই কমনীয় তনু নিয়া আমি মৃত্যু পাথারে ঝাঁপ দিলাম।

৮

যখন ভাসিয়া উঠিলাম,— তখন পাগ্‌লা ঢেউ ব্যোমচ্যুত নক্ষত্রের মত বেগে আমাদের ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে!

যে দিকে চাই, শুধু অকূল পাথার! এমনি কতদূর ভাসিয়া চলিলাম। কখনও আমাদের মাথার উপর দিয়া বেগ-তীব্র তরঙ্গ বহিয়া যায়, কখনও তাহার বিপুল ফুৎকারে আমরা ক্ষুদ্র ক্রীড়নকের মত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হই!

হঠাৎ আবার বিদ্যুৎ চমকিল।

দেখিলাম, অদূরে—আমার পার্শ্বে দীর্ঘ উচ্চভূমি।

কণ্ঠসংলগ্ন পুষ্পমালাকে লইয়া, আমি দুইহাতে জল ঠেলিয়া সেইদিকে যাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমি যদি বহু চেষ্টায় এক হাত অগ্রসর হই, জলস্রোতঃ আমাকে দশহাত পিছাইয়া লইয়া আসে। এমনি করিয়া কতক্ষণ যে মরণের সহিত যুঝিলাম, তা জানি না; কিন্তু ধীরে ধীরে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম।

ক্রমে আমার হাত-পা অসাড় হইয়া আসিল, মাথার ভিতরে যেন হিম-ধারা বহিতে লাগিল, এবং চক্ষুর উপরে কে যেন একটা আবরণ দিয়া দিল! আর বুঝি পারি না,—গেলাম, এইবারে তাকে লইয়া অতলে ডুবিয়া গেলাম।

আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া, পুষ্পমালা বলিল, "কষ্ট হচ্চে তোমার?"

"না।"

"আমার ভারে তুমি ডুবে যাবে।"

আমার চেতনা তখন লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। তবু পাগলের মত বলিলাম, "না, না—পুষ্প! তোমার কোন ভয় নেই।"

"আমার জন্ত তুমি ডুবে যাবে? তুমি সাঁতরে একলা তীরে ওঠ,—আমি আর তোমার ভার বাড়াব না"

আকুলভাবে দুইহাত বাড়াইয়া পুষ্পমালাকে বুকের ভিতরে চাপিয়া ধরিতে গেলাম,—কিন্তু নিজের দেহকেই দুইহাতে জড়াইয়া আমি ডুবিয়া গেলাম,—আমার বাহুবেষ্টনে পুষ্পমালা নাই।

আবার ভাসিয়া উঠিলাম এবং উত্তপ্ত শ্রবণে অস্ফুট জলকল্লোল শুনিতে শুনিতে আমি অজ্ঞান হইয়া গেলাম।

* * * * * * *

যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম—অগাধ-বিস্তার ধু-ধু বালুচরে আমি একলা পড়িয়া আছি।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

অন্ধাশ্রম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কার্য্যারম্ভ।

কণ্ডেরাও—হেনার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া বাটীর পশ্চাদ্ভাগটা ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা করিলেন।

সে দিকে একটী অপরিসর গলি, একখানি গাড়ীমাত্র যাইতে পারে, কিন্তু কখনও এ গলিতে গাড়ী আসিত না,—এই গলির দিকে কোন বাড়ীর সদর দরজা না থাকায় কেহ বড় এ গলিতে চলাচলও করিত না—

কণ্ডেরাও এই গলিতে একখানা গাড়ীর চাকার দাগ লক্ষ্য করিলেন—

মনে মনে বলিলেন, "দেখিতেছি সম্প্রতি একখানা গাড়ী এই গলির ভিতর দিয়া গিয়াছে, ঘোড়ার গাড়ী নহে,—তাহা হইলে চাকার দাগ এত মোটা হইত না,—টমাও নহে,—স্পষ্টই একখানা গরুর গাড়ী—এখানে গরুর গাড়ী কেন? এ দিকে কোন বাড়ীরই দরজা নাই, সুতরাং এ গলিতে গরুর গাড়ীতে আসা আশ্চর্য্য বটে!

তাঁহার দৃষ্টি নরোত্তম দাসের স্নানাগারের গবাক্ষে পতিত হইল,—তিনি বলিয়া উঠিলেন "ও এই যে, এ দিকে তাহা হইলে একটা জানালা আছে—তাই তো বলি !"

তিনি জানালার নিকট গিয়া জানালাটা টানিলেন, দেখিলেন জানালা খোলা, বলিলেন ; বটে—জানালাটা খোলা ! আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। এ জানালা দিয়া অনায়াসেই কেহ বাহির হইয়া যাইতে পারে। যে ঘরের দরজা ভিতর হইতে দিয়াছিল,—সে নিশ্চয়ই এ জানালা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে,—একি !"

ক্ষণ্ডেরাও দেখিলেন, এক খণ্ড বস্ত্র জানালার দরজায় ঝুলিতেছে—তিনি টানিয়া দেখিলেন যে ইহার এক কোণ কবজায় আটকাইয়া গিয়াছে, তিনি অতি সাবধানে বস্ত্র-খণ্ড কবজা হইতে ছাড়াইয়া লইয়া বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে চিন্তিতভাবে বলিলেন কেহ এই জানালা দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়াছে তাহারই কাপড়ের কোণ কবজায় বাধিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে কাপড় ছাড়াইয়া লইবার সময় পায় নাই—কাপড় ছিঁড়িয়া লইয়াই পলাইয়া গিয়াছে ; এখানে অনেকটা রহিয়া গিয়াছে। ইহা কোন ভদ্র লোকের কাপড় নহে—কোন গরীব লোকের কাপড় বলিয়া বোধ হয়। যাহার কাপড়, সেই জানালা দিয়া পালাইয়াছে—ইহার সন্ধান আবশ্যক।—এই তো কোন ধোপার মার্কা রহিয়াছে—এটা আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে এখন এ কাহার কাপড় জানা বড় শক্ত হইবে না—"

ক্ষণ্ডেরাও তথায় আর কিছু বিশেষ দেখিতে পাইলেন না।—তিনি গৃহাভিমুখে ফিরিলেন।

কয়দিন তিনি সহরের সমস্ত রজকালয়ে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিলেন, তাঁহার পরিশ্রম বৃথা হইল না। সব শেষে একজন বলিল, হাঁ এ কাপড় আমি কাচিয়াছি ইহা আমার একজন খদ্দেরের।

"কে সে খদ্দের ?"

"দামোদর বলিয়া একজন গাড়োয়ানের।"

"সে কোথায় থাকে ?"

"এই কাছেই থাকে—ঐ গলিতে তাহার বাটী, জিজ্ঞাসা করিলেই সকলে বলিয়া দিবে।"

রাও দামোদরের বাটীর দিকে চলিলেন, একজনকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বাড়ী দেখাইয়া দিল। দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তিনি দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন—

একটী স্ত্রীলোক দ্বার খুলিয়া দিল, রাও বলিলেন, "এই দামোদরের বাড়ী—সে এখানে থাকে!

"হাঁ, আপনি কে?"

"পরে বলিতেছি, দামোদর বাড়ী আছে?"

"না—"

ক্ষণ্ডেরাও লক্ষ করিলেন, তাহার চক্ষু দ্বয় অশ্রু পূর্ণ হইয়া আসিল। এবং অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিল।

ক্ষণ্ডেরাও জিজ্ঞাসা করিলেন, "দামোদর তোমার কে হয়?"

"আমার স্বামী।"

"তোমার স্বামী কোথায় গিয়াছে?"

"জানিনা।"

এবার স্ত্রীলোকটার পক্ষে অশ্রু সম্বরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, সে কাঁদিয়া ফেলিল। "চল তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

এই বলিয়া তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অগত্যা স্ত্রীলোক পথ ছাড়িয়া দিল। ক্ষণ্ডেরাও গৃহ মধ্যে আসিয়া বলিলেন, "আমি একজন গোয়েন্দা।"

এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকের মুখখানা কাগজের মত সাদা হইয়া গেল, সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং ব্যাকুল ভাবে ক্ষণ্ডেরাওয়ের দিকে চাহিল।

ক্ষণ্ডেরাও বলিলেন, ভয় নাই—"দরজা বন্ধ করিয়া বসো,—তোমার ভালর জন্যই আমি আসিয়াছি।"

রমণী বসিয়া পড়িয়া দুই হস্তে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্ষণ্ডেরাও বলিলেন, "এ সব বিষয়ে সব কথা খুলিয়া বলাই সৎপরামর্শ। আমাকে সব খুলিয়া বল, কিছু লুকাইও না, দেখিবে তাহাতে তোমার উপকার হইবে।

রমণী আরও অধিক ক্রন্দন করিতে লাগিল।—ক্ষণ্ডেরাও বলিলেন, "বাপু কাঁদিলে বিশেষ উপকার হইবে না। এখন বল দেখি শুনি তোমার স্বামীটী কোথায়।"

"জানিনা—কিছুই জানিনা।"

"কোথায় গিয়াছে?"

"কাল বিকালে গিয়াছে, সমস্ত রাত্রের মধ্যে আর আসে নাই।"

"কোথায় গিয়াছে মনে কর ?"

"কিছুই জানিনা—আপনি তাহার কাছে কি জন্য আসিয়াছেন ?

"সমস্তই বলিতেছি।" বলিয়া তিনি পকেট হইতে সেই ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড বাহির করিয়া বলিলেন—"এ কাহার কাপড়, চিনিতে পার ?"

রমণী সেই ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড হাতে লইয়া বলিয়া উঠিল,—"কেন—এ আমার স্বামীর কাপড়ের খানিকটা—আপনি পাইলেন কোথায় ?"

"বলিতেছি। এখন তাহা হইলে এ কাপড়ের টুকরা তোমার স্বামীর কাপড়ের ?"

রমণী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।—রাও বলিলেন, আমার কাছে কিছু গোপন করিলে তোমার ক্ষতি হইবে ভিন্ন লাভ হইবে না। তোমার স্বামী তাহা হইলে কাল সমস্ত রাত্রে বাড়ীতে আসে নাই ?"

"না, সেই জন্য ভাবিতেছি—"

"আর এক দিনও সমস্ত রাত্রি আসে নাই, কেমন না ?"

রমণী আবার ইতস্ততঃ করিতে লাগিল দেখিয়া ক্যাণ্ডেরাও বলিলেন, "সত্য কথা বলিলে তোমারই উপকার হইবে—সে দিন কত রাত্রে ফিরিয়াছিল ?"

"তাহা আমি জানি না—ঘুমাইয়া ছিলাম ?"

"এটা মিথ্যা কথা—সত্য কথা না বলিলে আমি তোমার স্বামীর ভাল করিতে পারিব না, তাহাতে আমার দোষ নাই—কাল কখন তোমার স্বামী বাহির হইয়া গিয়াছিল ?"

"বৈকালে ?"

"তাহার পর আর বাড়ী আসে নাই ?"

"না।"

"কখন বাড়ীতে ফিরিবে বলিয়া ছিল ?"

"তাহা কিছু বলে নাই।"

"একা গিয়াছিল, না সঙ্গে কেহ ছিল ?"

"ছিল।"

"কে সে ?"

"তাহার একজন বন্ধু।"

"নাম ?"

"জানি না।"

"এটাও মিথ্যা কথা।—এরূপ করিয়া ভাল করিতেছ না—আর আমার কোন দোষ নাই—তোমাদের ভাল করিবার জন্যই আসিয়া ছিলাম,—তুমি আমাকে তাহা কিছুতেই করিতে দিবে না,—দোষ আমার নাই। তাহা হইলে তুমি আর কিছু আমাকে বলিবে না।"

"আমি আর কিছু জানি না।"

"ভাল বুঝিতেছ না,—এখন তোমার স্বামীকে কিরূপে পাইবে ভাবিতেছ?"

"জানি না।"

"পুলিশে খবর দিয়াছ?"

"না।"

"কেন? এখনও মনে করিতেছ সে ফিরিয়া আসিবে—এইরূপ মধ্যে মধ্যে সে অনুপস্থিত হয়?"

"কখনও নয়, তাহাই ব্যস্ত হইয়াছি, আমার বিশ্বাস, তিনি আর বাঁচিয়া নাই।"

রমণী আবার কাঁদিয়া উঠিল।—স্কাওেরাও বলিলেন, "সে বাঁচিয়া নাই, তুমি ইহা কি জন্য ভাবিতেছ?"

"সে বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয় আমায় খবর দিত—আমি জানি আমি জানি—" স্কাওেরাও আরও দুই একটা কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আর কিছুই তাহার নিকটে জানিতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।"

তিনি প্রতিবেশী দিগের নিকটে জানিয়া লইলেন, দামোদর কিরূপ দেখিতে ছিল, পুলিশেও তাহার বিষয় সন্ধান লইলেন,—সকলেই বলিল তাহার বিরুদ্ধে কেহ কখনও কোন অভিযোগ শুনে নাই।—

স্কাওেরাও মনে মনে ভাবিলেন, "এটা স্থির দামোদর জানালা দিয়া নরোত্তম দাসের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল, নতুবা তাহার বস্ত্র সেখানে থাকিত না। প্রথমে এই লোকটাকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহা হইলে এ ব্যাপারের কতকটা কিনারা হইবে।"

দামোদরের স্ত্রী তাহার জন্য যেরূপ ব্যস্ত হইয়া ছিল, তিনিও তাহার জন্য সেইরূপ ব্যস্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "দুই একদিনের মধ্যে ইহাকে বাহির করিবই করিব।"

তাঁহার প্রতিজ্ঞা বৃথা হইল। যে সময়ে তিনি মনে মনে এ প্রতিজ্ঞা করিতে ছিলেন, সেই সময়ে দামোদরের মৃতদেহ ডাক্তার গোকুল দাসের সিন্দুকের ভিতর বিরাজ করিতেছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চতুরে চতুরে।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। ডাক্তারের আরক প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য তাঁহার ডাক্তার খানার এক পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড উনান ছিল, তাহাতে প্রায় এক মন কয়লা জ্বলিত, সময়ে সময়ে এই বৃহৎ উনান জ্বালাইয়া ডাক্তার তাহার ঔষধাদি প্রস্তুত করিতেন।

আজ ডাক্তারের আজ্ঞায় ভৃত্যগণ এই বৃহৎ উনানে আগুণ দিয়াছে—এক্ষণে আগুণ গন গন করিয়া জ্বলিতেছে।

"আমি এখন একটা ঔষধ প্রস্তুত করিব—দেখিও কেহ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।"

এই বলিয়া ডাক্তার ভৃত্যদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিল। ডাক্তার আপন মনে বলিল, "বোবার শত্রু নাই—এই লোকটা বাঁচিয়া থাকিলে আমার সর্ব্বনাশ করিত,—এখন আর আমার কিছুই করিতে পারিবে না, তবে এই দেহটা—তাহাও ছাই করা অপেক্ষা একেবারে ইহাকে অন্তর্হিত করিবার আর অধিক সদুপায় কি?—তবে গন্ধ—"

ডাক্তার গৃহ মধ্যস্থ বোতল গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "এই সকল বোতলে যে সকল আরক আছে,—তাহাতে এই মানুষ পোড়া চাম্‌সে গন্ধ ঢাকিয়া অন্য গন্ধ বাহির হইবে, কেহ জানিবে না যে এটাকে আমি ভস্মীভূত করিতেছি।"

ডাক্তার এক খানি বড় ছোরা হাতে লইল,—তাহার ধার আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিল,—তাহার পর বাক্স খুলিয়া দেহটা টানিয়া বাহির করিল।—

ডাক্তার কার্য্য আরম্ভ করিবে, এই সময় কে সবলে রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল, ডাক্তার বিরক্ত হইয়া দ্বারের নিকটে আসিয়া বলিল, "কে?—কে দরজায় ঘা মারে?"

বাহির হইতে ভৃত্য বলিল, "আমি।"

"আমি তোকে বলিয়াছি যে কোন মতেই আমাকে বিরক্ত করিবি না।"

"একজন লোক আসিয়াছে।"

"এখন যাইতে বল্—আমি খুব ব্যস্ত আছি—এখন দেখা হইবে না।"

"তিনি যাইতে চাহেন না, বলেন, তিনি দেখা করিবেনই করিবেন।"

"কে সে—নাম কি?"

"পুলিশের লোক—ক্যাণ্ডেরাও।"

সহসা সম্মুখে বজ্রপাত হইলে মানুষের যেরূপ হয়, ডাক্তার গোকুল দাসেরও সেই অবস্থা—তাহার মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।—তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইল।

কিন্তু সে অতি কষ্টে আত্ম সংযম করিল। পার্শ্বস্থ বোতল হইতে খানিকটা সুরা গ্লাসে ঢালিয়া পান করিল। বলিল, "জিজ্ঞাসা কর্ কি জন্য দেখা করিতে চায়?"

ভৃত্য চলিয়া গেল, ডাক্তার সত্বর দেহটা আবার বাক্সমধ্যে পুরিয়া ফেলিল,—হাত মুখ ধুইয়া মাথা আচড়াইয়া বাহির হইয়া আসিয়া দ্বার ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

ভৃত্য আসিয়া বলিল, "তিনি আপনাকে সে কথা নিজে বলিবেন।"

"নিয়া আয় এইখানে। বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটা ঘরে ঢুকিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল।"

কিয়ৎক্ষণ পরে খাণ্ডেরাও তথায় উপস্থিত হইলেন।

তাহাকে দেখিয়া ডাক্তার বিস্মিতভাবে বলিল, "ওঃ—আপনি এত রাত্রে!"

"কথা আছে। বসিতে পারি!"

"নিশ্চয়—বসুন—চুরুট খান।"

ক্যাণ্ডেরাও বসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমি আপনার কাছে আসিয়াছি—"

"হাঁ, কি জন্য।"

"এই মুরাবাজীর খুনের জন্য।"

ডাক্তার বহু কষ্টে আত্ম সংযম করিল, বলিল, "সে কি—খুন—অসম্ভব।"

ক্যাণ্ডেরাও অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "অসম্ভব নহে, সম্পূর্ণ সম্ভব।"

ডাক্তার প্রায় চেয়ার হইতে লম্ফ দিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্থির ভাবে বলিল, "আপনার কথা কিছুই বুঝিলাম না।"

শ্লেষপূর্ণস্বরে ক্যাণ্ডেরাও বলিলেন "বুঝাইবার জন্যই আসিয়াছি—ডাক্তার মহাশয়।"

ডাক্তার তাহার স্বরে ভীত হইয়া বলিল, "আপনি এরূপ ভাবে কথা কহিতেছেন কেন?"

"কেন, কিছু বিশেষত্ব দেখিতেছেন কি! আপনার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিতে পারি কি!"

"কেন!"

"অনেক কথা আছে, ডাক্তার,—আর কাহারও সে সব শুনিবার প্রয়োজন নাই।"

তিনি উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া উঠিয়া গিয়া দরজা অর্গল বন্ধ করিয়া আসিলেন।—পরে বসিয়া অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, ডাক্তার মুন্নাবাঈ কিসে মরিয়াছে তাহা আপনার অগোচর নাই,—কেমন না।"

ডাক্তারের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, ইহাতে ক্যাণ্ডেরাও বিস্মিত হইলেন না।

ডাক্তারও মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "হাঁ নিশ্চয়ই জানি, পুলিশেও—"

"পুলিশের কথা এখন ছাড়িয়া দিন,—এখন আসল কথা হউক—এ ব্যাপারে পুলিশের চোখে যে ধুলা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন, ডাক্তার"

"আপনি কি বলিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

এই বলিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল। বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল।

ক্যাণ্ডেরাও তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বসুন অত অধীর হইবেন না,—আসল কথা আপনি যাহা জানেন, তাহা আমি জানিয়াছি—এই মনে করুন—আপনার সঙ্গে মুন্নাবাঈর সম্বন্ধটা—"

"আমার সহিত সম্বন্ধ—?"

"অমন হঠাৎ আকাশ হইতে পড়ার ভাব দেখাইবেন না।—বৃথা—বৃথা আপনি আমার চোখে ধুলি দিতে পারিবেন না।—দেখিতেছেন, আপনার সঙ্গে মুন্নাবাঈর যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা আমি জানি"

"আমার সঙ্গে!"

"আমি ইহাও জানি, আপনার পক্ষে তাহার মৃত্যু কতদূর প্রার্থনীয় হইয়াছিল।"

ডাক্তারের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, ক্যাণ্ডেরাও বলিলেন। "মুন্না সে কথা স্বামীকে বলিয়া দিতে চাহিয়াছিল—"

"কি কথা ?"

"মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ঐ আশ্চর্য্য ভাবটা কথঞ্চিৎ সম্বরণ করুণ—কথা কহিয়া সুখ হইতেছে না। আপনি আর আমি, এখানে আর কেহ নাই—কেহ আমাদের কথা শুনিতে পাইবে না। তবে স্পষ্ট শুনিবেন, আমি জানি, মহাশয় কি জন্য; আর কি রূপে মুন্নাবাঈকে হত্যা করিয়াছেন।"

ডাক্তারের মুখ হইতে রক্ত অন্তর্হিত হইল, তাহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না,—ক্যাণ্ডেরাও তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার কথায় একটু মাত্রা সংযোগ করিলেন—বলিলেন, "ডাক্তার,—সম্প্রতি তুমি যে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছ, তাহাতে সুদক্ষ হইতে পার নাই—তুমি ডাক্তার, সুতরাং হত্যা বিষয়ে খুব পোক্ত—তবে এই হত্যা গোপন বিষয়ে একেবারেই পরিপক্ক নও—কোন কাজে সূত্র রাখিতে নাই।"

ডাক্তারের মত লোকেও জালে পড়িল, সে বলিয়া ফেলিল "এই ঔষধ।" পর মুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইল যে সে এ কথা বলিবার পূর্ব্বে জিহ্বা কাটিয়া ফেলিল না কেন ?"

ক্যাণ্ডেরাও গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কেবল ঔষধ কেন ?—আরও সূত্র আছে।"

ডাক্তার উঠিল—ধীরে ধীরে পার্শ্বস্থ আলমারি খুলিয়া একটা শিশি হইতে একটা গেলাসে কি ঢালিল। সহসা ক্যাণ্ডেরাওয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল "তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছ।"

ভয়ে তাহার কাণ্ডজ্ঞান লোপ হইয়াছিল, বিবেচনা শক্তি থাকিলে সে সহজেই বুঝিতে পারিত যে ক্যাণ্ডেরাও পুলিশের লোক নহেন, স্বাধীন গোয়েন্দা মাত্র।

ক্যাণ্ডেরাও বলিলেন "শিশিতে কি বিষ! ডাক্তার এমন নির্ব্বোধের মত কাজ করিবেন না বিশেষতঃ আপনার ন্যায় মহাপ্রভুর পক্ষে তাহা একান্তই অশোভন হইবে।"

বিস্মিত ভাবে গেলাসটী রাখিয়া ডাক্তার বলিল "আপনি কি বলিতেছেন ?"

"এই বলিতেছি—তুমি আমার কথার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিলে, বিষ

লইয়া নাড়া চাড়া করিতে না,—বাঁচিয়া থাকিলে অনেক লাভ আছে—রেখে দাও গ্লাস, এই দিকে এস।"

ডাক্তার স্তম্ভীত প্রায় দণ্ডায়মান রহিল। যথার্থই সে বিষ ঢালিয়াছিল—সে ফাঁসি কাঠে ঝুলিবে না—পুলিশ তাহাকে জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না,—ইহা সে বহুকাল হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।—তাহাকে নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ক্যাণ্ডেরাও বলিলেন, "আমি তোমাকে যত দূর গাধা ভাবিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষাও প্রকাণ্ড গাধা দেখিতেছি। তুমি জান আমি পুলিশে কাজ করিনা, তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে চাহিলেও আমি তা পারি না।"

এ কথা শুনিয়া ডাক্তারের মধ্যে যেন চৈতন্যের সঞ্চার হইল, তাহার হৃদয়ে সাহস দেখা দিল, সে বলিল "তবে কি জন্য আমার কাছে আসিয়াছ।"

"অধীর হইও না—এস বসো—বলিতেছি।" ডাক্তার আলমারির ভিতরে শিশি ও গেলাস বন্ধ করিয়া আসিয়া স্থির ভাবে বসিল।—

তখন ক্যাণ্ডেরাও ধীরে ধীরে বলিলেন, "যখন কেহ অপরের কোন গুপ্ত কথা জানিতে পারে—আর সেই অপরের টাকা—অনেক টাকা থাকে, আর সেই লোক গরীব হয়, আর যদি সে মনে করে যে এই গুপ্ত কথা গোপন করিয়া রাখিলে অপরে তাহাকে টাকা—অনেক টাকা দিতে পারে—তখন সে কি করিতে প্রলুব্ধ হয়।"

ডাক্তারের হৃদয়ে আশা দেখা দিল, তাহা হইলে টাকা দিয়া ইহার মুখ বন্ধ করা যাইতে পারে? কিন্তু কত টাকা? ডাক্তার প্রথমে ইহার কথায় নিতান্ত বিহ্বল ও বিচলিত হইয়াছিল কিন্তু সে বহুক্ষণ এরূপ থাকিবার লোক নহে।

ক্যাণ্ডেরাওয়ের কথায় তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, সে প্রকৃতই বিষ খাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারই কথায় সে এক্ষণে তাহাকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক হইল।

নির্জ্জন রাত্রি, নির্জ্জন গৃহে—ইহাকে এখানে হত্যা করিয়া দামোদরের অবস্থা করিলে কেহই তাহার কিছু করিতে পারিবে না,—কেহ তাহাকে সন্দেহ পর্য্যন্ত করিবে না।—

এই ভাবিয়া সে নিঃশব্দে—টেবিলের দেরাজ টানিয়া তাহার ভিতর হাত দিল, তথায় তাহার পিস্তল ছিল।

ক্যাণ্ডেরাও তাহা দেখিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তার মহাশয়, হস্তখানি টানিয়া লউন—আপনি পিস্তল খুঁজিতেছেন,—আপনি হাত খানি না টানিয়া লইলে আমি আমার পিস্তলটী বাহির করিতে বাধ্য হইব। আপনার ন্যায় লোকের নিকট আসিতেছি, সুতরাং আমি অপ্রস্তুত হইয়া আসি নই।—দেখিতে পাইতেছেন আমার করকমলে কি শোভা পাইতেছে? আরও দেখুন—আমার অঙ্গুল পিস্তলের ঘোড়ার উপর রহিয়াছে—মুখটা ঠিক আপনার বুক লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে—অমন করিয়া লাফাইবেন না,—আপনি বাধ্য না করিলে আমি এ ঘোড়া টানিব না। তাই বলি—হস্তটী টানিয়া লউন—দেরাজ টী বন্ধ করিয়া দিন—বেশ,—এখন কাজের কথা হউক।—"

ডাক্তারের মুখে কথা নাই। ক্যাণ্ডেরাও বলিলেন "মহাশয় জানেন যে নরোত্তম দাসকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমি নিযুক্ত হইয়াছি, এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি ইচ্ছা কর যে আমি তাহাকে খুঁজিয়া পাই!"

ডাক্তারের ভাব দেখিয়া ক্যাণ্ডেরাও মনে মনে বলিলেন এই লোকটা ইহার অন্তর্ধ্যানের বিষয় জানে।—"কিন্তু কত দূর জানে"?—

তিনি ডাক্তারকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "ডাক্তার,—তুমি যাহাই কর, আমি তাহাকে খুজিয়া লইব,—আমি বিশেষ সূত্র পাইয়াছি—তুমি কথা কহিতেছ না, ইহাতে আমি বুঝিলাম, তুমি তাহাকে পুনরায় দেখিতে চাও না, কেমন এই নয়।—মুন্নাবাঈর মৃত্যুর কথাও প্রকাশ হয়, ইহাও তুমি চাহ না।—হাঁ এখন কাজের কথা হউক—এ দুই বিষয়ে আমি চুপ করিয়া থাকি, ইহার জন্য তুমি কত দিতে প্রস্তুত আছ।"

ডাক্তার ভাবিল, "কি রূপে এটাকে পাশের ঘরে লইয়া যাইব—তাহা হইলেই হয়—ইহা করি কি রূপে।"

ডাক্তার তাহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া তুলিতেছিল,—কিন্তু কিছুতেই কোন উপায় ভাবিয়া পাইল না, তবু সময়ে কিছু উপায় হইতে পারে। এই জন্য বলিল, "যদিও তর্ক স্থলে স্বীকার করি, তুমি যাহা বলিতেছ তাহাতে কিছু আছে—

"তর্ক বিতর্ক নহে,—কাজের কথা।"

"তাহাই হউক—"

"কত দিতে প্রস্তুত আছ।"

"তুমি কি চাও!"

"আমি একটা মোটা টাকা চাই—এ কথা বলা অনাবশ্যক। তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়া আমি বিপদে পড়িতে পারি, তুমি বুদ্ধিমান ডাক্তার, তুমি সবই বুঝিতে পার, আমি কি চাই তুমি তা জানিতে চাও—উত্তম কথা, ইহার ভিতরে আর দর-দস্তর নাই—টানা-টানি কমা-কমি নাই—তুমি জান আমি মুখ বন্ধ না রাখিলে তোমার কি হইবে, সুতরাং সে বিষয় আমাকে বেশী কিছু তোমাকে বলিতে হইবে না—তবে আমার মুখ উপযুক্ত রূপে বন্ধ করিলে তুমি ইহাও জান যে তোমার আর কোন ভয় নাই—কেমন না কি !"

"কত —তাহাই বল।"

"ব্যস্ত হইও না—বলিতেছি।"

"সেইটা বলিলেই বুঝিতে পারি।"

"দশ হাজার টাকা—পাই পয়সা কম নয়।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"শঠেশাঠ্যং—"

ডাক্তার দশ হাজার টাকার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল,—দামোদরও ঠিক দশ হাজার টাকা চাহিয়াছিল। দশ হাজার টাকা! দশ হাজার টাকা যেন রাস্তায় পড়িয়া আছে!

ডাক্তারকে এই লোক ধৃত করিতে আসিয়াছে, এই ভয়েই সে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পরে যখন শুনিল যে ক্ষাণ্ডেরাও পুলিশের লোক নহে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই, তাহা হইলে ইহাকে টাকা দিলেই নিরস্ত করিয়া রাখিতে পারা যাইবে—তবে ভয় কি ?

ডাক্তার মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজমধ্যে লুপ্ত-প্রায় সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইল। সে তখন ক্ষাণ্ডেরাওকে হত্যা করিবার জন্য আর ব্যকুল হইল না,—মনে মনে তাহার বড়ই আনন্দ হইল।

সে ইহাও বুঝিল যে ক্ষাণ্ডেরাও তাহার বৃত্তান্ত সামান্যই অবগত আছে, নিজেরই মূর্খতা হইয়াছে, ভয় পাইয়া ঔষধের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল, বোধ হয় রাও কিছুই জানে না,—কেবল ধাপ্পা দিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছিল।—তাহার সহিত মুন্নাবাঈর যে সম্পর্ক ছিল, তাহা তিনি ও মুন্নাবাঈ ব্যতীত আর কেহই জানিত না। মুন্নাবাঈ আর নাই,—সুতরাং এ সব বিষয় আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই।—

তিনি কখনও এক খানা পত্রও মুন্নাবাঈকে লেখেন নাই যে, সেই পত্র দেখিয়া কেহ কোন সন্দেহ করিবে বা তাহাদের উভয়ের সম্পর্ক জানিতে পারিবে। এ লোকটা কি রূপে সে সব জানিবে?—লোকটা বাহাদুর বটে, আমা হেন লোককেও খুব সহজে বেকুব বানাইয়াছে।

ডাক্তার ভাবিল লোকটা কতদূর কি জানে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা ভাল,—তাহা হইলেই ইহার বিদ্যা বুদ্ধি বুঝিতে পারা যাইবে।—ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিল, "আপনার নিকট যে প্রমাণ আছে তাহা বোধ হয় আমি যে সকল পত্র মুন্নাবাঈকে লিখিয়াছিলাম, সেই গুলিই।"

ক্ষাণ্ডেরাও—খুব চতুর হইলেও এবার তিনি ডাক্তারের ফাঁদে পড়িলেন। ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, হাঁ—নিশ্চয়ই—সমস্ত গুলা—এক খানাও হারায় নাই।"

ডাক্তার মনে মনে হাসিল, তাহার মন হইতে সমস্ত ভয় অপসৃত হইল। এইবার সে চিত্তমধ্যে বেশ একটা বিমল আনন্দানুভব করিল।

সে পূর্ব্বে প্রকৃতই ভয় পাইয়া যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, এখনও সেই রূপ ভীতভাবে বলিল, "তাহা হইলে বোধ হয় পুলিশ যাহা লক্ষ্য করে নাই, তাহা আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন, মুন্নার বুকে একখানা ছোট ছোরা বসান ছিল।"

ক্ষাণ্ডেরাও আরও জালে পড়িলেন, পূর্ব্বরূপ ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "হাঁ, তাহাতেই আমার চক্ষু খুলিয়াছিল।"

ডাক্তার আনন্দে উৎফুল্ল হইল, তবে সবই ধাপ্পা! সকলই মিথ্যা কথা! তাহার গৃহে সর্ব্বদাই সুরা থাকিত। তিনি আলমারি হইতে বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া বলিলেন, "এখনতো কথাবার্ত্তা হইল, এখন একটী বার আসুন—"

ক্ষাণ্ডেরাও শত্রুর সহিত কখনও সুরাপান করিতেন না।—তিনি ভাবিলেন "মদের সহিত কিছু মিশাইয়া দিবার মতলব!" তিনি বলিলেন, "আমি ও সব পান করি না।"

"ও!" বলিয়া ডাক্তার নিজে পান করিল।—পরক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া বলিল, "আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না যে আমি বাটীতে সর্ব্বদাই অত টাকা রাখি।"

"আমি তত গাধা নই।"

"ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনিতে হইবে।"

"কতক্ষণ লাগিবে?"

"আজ আর সময় নাই —কাল এই সময়ে আসিলে আমি টাকা আপনার জন্য ঠিক করিয়া রাখিব। তাহা হইলে হইবে তো?"

"খুব হইবে।"

ক্যাণ্ডেরাও টাকাটা নিতান্তই পাইলেন দেখিয়া মনে মনে আনন্দে বিহ্বল হইয়াছিলেন। আর কি? এবার একদমে একরূপ রাতারাতি বড়লোক হইলেন।

ডাক্তার বলিল, "তবে আমাদের উভয়ের মধ্যে কথা হইল এই—আপনি এ সম্বন্ধে আর একটী কথাও কাহাকে বলিবেন না, —আর আমি এজন্য আপনাকে নগদ দশ হাজার টাকা দিব।"

"এই ত বেশ পরিষ্কার কথা,—কোন গোল নাই।"

"কাল এই সময়ে আপনি আসিবেন, তাহার পর আর এ জীবনে আপনাতে আমাতে দেখা সাক্ষাৎ হইবে না।"

"নিশ্চয়ই—ডাক্তার, কথাটা ভাল নয়, তাহা আমি জানি, তবে সকলকেই ত এক রকম করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।"

"তাহাতো নিশ্চয়—তাহাতো নিশ্চয়—"

"তবে খুব কমে ডাক্তার কাজটা যে তুমি মিটাইয়া ফেলিলে, তাহাও তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে।"

"হাঁ—হাঁ—তাহা অবশ্য স্বীকার করি। তাহা হইলে এখন বিদায়—"

ক্যাণ্ডেরাও উঠিলেন, বলিলেন, "কাল এই সময়ে আসিব।"

তিনি প্রস্থান করিবামাত্র ডাক্তার গোকুল দাস সত্বর বড়ী হইতে বহির্গত হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

নবজীবন।

সামাজিক নাটক।

প্রধান পাত্র পাত্রীগণ।

পুরুষ।

ভবতারণ	নবজীবন সভার সভাপতি
সিদ্ধেশ্বর	ঐ সম্পাদক ও স্কুলের অধ্যক্ষ।
কৃষ্ণলাল	গ্রাম্য গৃহস্থ।
শরৎ	কৃষ্ণলালের ভ্রাতুষ্পুত্র।
বিনোদ	ভবতারণের পুত্র।
মিষ্টার এম্ গাপ্ট (মহিম গুপ্ত)	ব্যারিষ্টার, কৃষ্ণলালের মাতুল পুত্র।
ডক্টর ভ্যাটাভেল (বটব্যাল)	বিলাত প্রত্যাগত।
মন্মথ (মনু)	কৃষ্ণলালের গ্রামবাসী আত্মীয় যুবক।
জগদীশ রায়	জমিদার।
গগণ বাবু	ঐ কর্ম্মচারী।

নবজীবন সভার সভ্যগণ।

স্ত্রী।

তারামণি	মহিমের মাতা, কৃষ্ণলালের মাতুলানী।
কমলা	কৃষ্ণলালের স্ত্রী।
সৌদামিনী	সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী।
বাসন্তী	শরতের স্ত্রী।
লীলা (মিসেস্ লিলী গাপ্ট্)	মহিমের স্ত্রী, ভবতারণের ভাগিনেয়ী।
রমা	সিদ্ধেশ্বরের কন্যা।
চামেলী	ডক্টর ভ্যাটাভেলের কন্যা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কলিকাতা, সিদ্ধেশ্বরের গৃহ, বারান্দা।

(সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ)

সিদ্ধে।—সদু, সদু,—ও সদু।

(সৌদামিনীর প্রবেশ।)

সৌদা।—নাঃ!—মিন্সেকে ব'লে ব'লে আর পাল্লুম না। 'সদু' 'সদু', 'সদু'। সদু যেন ওর ছেলে বেলার খেলার সাথী। কেন নাম ধ'রে না ডাক্‌লে, হয় না? 'সদু,' 'সদু,' 'সদু,' এখনও যেন খোকাটি র'য়েছেন।

সিদ্ধে।—তবে কি ব'লে ডাক্‌ব?

সৌদা।—আহা হা!—দেশশুদ্ধ ছেলে বুড়ো সব ভাতারই যেন মাগ্‌কে নাম ধরেই ডাক্‌ছে—কি ব'লে ডাক্‌ব? কেন, সবাই কি ব'লে ডাকে?

সিদ্ধে।—তারা ত ডাকে, 'ওগো' 'ওগো শুন্‌চ,' 'তুমি কোথাগো,'—এই সব ব'লে।

সৌদা।—কেন, ওতে কাজ চলে না? আমার কাণে ও পৌছয় না! 'সদু' 'সদু' ব'লে না ডাক্‌লেই যেন আমি বুঝ্‌ব না, যে আমাকে ডাক্‌ছেন। বুড়ো হ'য়ে উঠেছ,—আমি এখন গিন্নী বান্নী হ'য়েছি, ঐ মেয়েটা র'য়েছে—ওর সাম্‌নে, ঝি চাকর মেথরাণী সকলের সাম্‌নে,—কেবল 'সদু' 'সদু' 'সদু',—ওমা কি ঘেন্না।

সিদ্ধে।—কেন এতে দোষ কি! তোমার নাম যে 'সদু', তা সবাই জান্‌লে তোমার এমন কি সর্ব্বনাশটা হবে।

সৌদা।—তোমাদের ত কিছুতেই দোষ নেই। মাগ ভাতারে নাম ধরাধরি করে ডাকবে—বুড়ো মাগীরাও লক্‌ পায়রা সেজে বুড়ো ভাতারের সঙ্গে হাত ধরা-ধরি ক'রে বেড়াবে, মুখোমুখি টেবিলে বসে চা খাবে, লোকের সাম্‌নে এ ওর গায় ঢলে পড়বে,—এই না হ'ল তোমাদের সভ্যতা, সুরুচি? আর এই যদি না পাল্লুম, তবেই তোমাদের ঘর হ'ল অরণ্য,—আর সেথায় সব অন্ধকার,—তমসাচ্ছন্ন।

সিদ্ধে।—হায় রে! যার জন্য করি চুরী সেই বলে চোর! আমরা যা কর্ত্তে চাই,—সে ত তোমাদেরই ভালর জন্যে। তোমাদেরইত এই দারুণ হীনতা থেকে উন্নত কত্তে চাই। এখন পুরুষের কত নীচেয়—তাদের থেকে কত দূরে প'ড়ে আছ,—তাদের সঙ্গে এক আসনে তোমাদের বসাতে চাই।

সৌদা।—ওমা, এক আসনে পুরুষের গা ঘেঁসে গে বস্‌তে হবে! এই হ'ল উন্নতি। ওমা মিন্সে কি কালে কালে পাগল হ'ল নাকি?

সিদ্ধে।—কি মুস্কিল, কথাটাই বুঝ্‌ছ না? এক আসনে, গা ঘেঁসে বসার কথা কোথায় হ'ল?

সৌদা—কেন, এই বল্লেনা যে এক আসনে পুরুষদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের বসাতে যাও? তবে আর গা ঘেঁসাঘেঁসির বাকী রইল কি?

সিদ্ধে—ওগো, আমি কি তাই ব'ল্‌ছি? আমি ব'ল্‌ছিলুম যে এখন তোমরা পুরুষের কত নীচেয় আছ, ঘরে থেকে কেবল তাদের দাসীপণাই কচ্চ,—

সৌদা—দাসীপণা? নিজেদের সোয়ামী পুত্তুরকে রেঁধে খাওয়াচ্চি—একি দাসীপণা? নিজের ঘরকন্নার কাজ সব নিজের হাতে ক'রব—একে বলে দাসীপণা! আমরা কি মাইনে খেয়ে পরের ঘরের কাজ কচ্চি যে দাসী হ'তে গেলুম?

সিদ্ধে—আহা, বলি কথাটা বুঝিয়ে বল্‌তেই দেবে না? বলি, মেয়েরা কি কেবল এই সব দৈহিক শ্রমসাধ্য হীন কাজই ক'রবে? তাদের কি আর উচ্চ জ্ঞানালোচনা, কর্ম্ম সাধনা, উন্নত সামাজিক সম্মিলন,—এ সবের অধিকার থাকবে না? আমরা চাই মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করে, উন্নত হ'য়ে, পুরুষের সঙ্গে সমান স্বাধীন ভাবে মিলে ভাবের আদান প্রদান ক'রবে—আর সামাজিক সকল বিষয়ে সমান অধিকার ভোগ ক'রবে।

সৌদা—হ্যাঁ বুঝলুম—মেয়েরা কেবল বই প'ড়বে, মিন্সেদের সঙ্গে ব'সে ঠ্যাকার করবে, আর বাইরে সামাজিকৃতে ক'রে বেড়াবে। তা ঘর-কন্না কে ক'রবে? খাবে কি? সে ত দুসন্ধ্যে ষোড়শোপচারে নইলে পেট ভরেনা—মাথা ঘোরে,—বুক দুড় দুড় করে। এর পর আবার সকাল বিকালে চা আছে ভন্নো বেভন্নো খাবার আছে। আবার ধোপার যে দুর্গতি, রোজ সাবানে কাপড় কেচে দিচ্চি,—তবে বাবুটি হয়ে বেরুচ্ছ; বলি এ সব করবে কে? তার ব্যবস্থা কিছু ঠাওরেছ?

সিদ্ধে—এ সব ত দাসদাসীর কাজ, তারাই করবে ?

সৌদা—বলি দাসদাসী ত আর আকাশ থেকে পড়েনা, আর ভুঁই ফুঁড়েও ওঠেনা ; রাখ্‌তে পয়সা লাগে। এম্‌নিই ত সংসার চলেনা।—কটি বা টাকা মাসে দেও ? কি দিয়ে কি চালাই,—খবর রাখ কিছু ? দাস-দাসী—দাস-দাসী যেন বাজারের মুড়ী-মুড়কী—আধ পয়সায় মেলে এক এক ঠোঙা।

সিদ্ধে—যাদের দাস দাসী রাখবার সামর্থ্য নাই—তাহাদের পুরুষরা নিজেরাই এ সব কাজ ক'র্‌বে।

সৌদা—চাকরী ক'রে পয়সা আন্‌বে, বাহিরে হাটবাজার ক'র্‌বে, ঘরে রেঁধে খাবে, বাসন মাজবে, কাপড় কাচবে, বলি একবার করেই দেখ না দুদিন, তবু হাড়টা জুড়োক্।

সিদ্ধে—এই ত কষ্ট যে হয়, তা ত নিজেই স্বীকার ক'চ্চ। আমরাও ত বলি, কোমল অবলা জাতি,—তাদের দিয়েই কেবল এ সব হীন ক্লেশকর কাজ করাব কেন ?

সৌদা—আহা হা ! কি দরদ গো ! তা সেই কোমল অবলারা যে দশমাস পেটে ছেলে বইছে, কত ব্যাথা স'য়ে সে গুলোকে বিয়োচ্চে--তা এত যদি দয়া—তবে তোমরা কেন এই কাজ গুলোরও ভার নেও না ? অবলার কোমল শরীরে কি এত সয় গা ?

সিদ্ধে—তুমি কেবল ঠাট্টাই ক'রবে, কোন কথা তলিয়ে বুঝ্‌বে না। জান আমাদের সমাজের, আমাদের দেশের এ দুর্গতি কেন ? তোমাদের এই হীনতায়, অজ্ঞতায় আর অবনতিতে। আর ইয়োরোপ যে এত বড়, সে কেবল ইয়োরোপীয় মহিলারা এত উন্নত ব'লে,—সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ ব'লে। আমরা চাই, তোমরাও তাদেরই মত হও।

সৌদা—যা হয়েছে, তাতেই রক্ষে নেই, আবার একেবারে বিলিতী বিবি ! নমুনো যা পথে ঘাটে দেখ্‌তে পাই, মেয়েরা যদি সব সে দেশের ওই রকমই হয় তবে তাদের দেশ যে আছে, তা ভাগ্যি ব'ল্‌তে হবে। বুড়ীগুলো, দাঁত পড়েছে, চুল পেকেছে—তাও যেন সব নাচ্‌তে যাচ্চে। ওদের দেশ যদি বড় হয়, তবে পুরুষগুলোর গুণে বড়। আর আমাদেরও দেশ বল, সমাজ বল, ধর্ম্ম-কর্ম্ম বল, তা যে আছে, তা এই আমরা এই রকম ব'লে। ঘরকন্না নিয়ে কাম্‌ড়ে পড়ে আছি,—গতরের সুখ এতটুকুও চাইনে,—তাই খেয়ে পরে সব দেশে আছ।—নইলে যে এদ্দিন সব শ্মশান হয়ে ছারেখারে যেত।

সিদ্ধে—নেও রোজ রোজ আর এক ঝগড়া তোমার সঙ্গে কত্তে পারিনে। মনে তোমাদের এমনই বিকার জন্মে গ্যাছে যে, এ সব বড় কথা, যুক্তির কথা, সত্যের কথা তোমরা কিছুতেই ধ'ত্তে পার না।

সৌদা—আমরা আকারেই আছি—বিকার তোমাদেরই হয়েছে। যে দেশে জন্মেছি, সেই দেশের আচার নিয়মেই আমরা চলি। আর তোমরা,—এক স্থয্যিতে রোদ পায়না—এখন সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে যারা এসেছে, তাদের ভঙ্গী-রঙ্গীতে নাচ্‌তে আরম্ভ করেছ। দেশ নেই, ধর্ম্ম নেই, আচার-নিয়ম নাই, ঘর ঘরকন্না নেই, মান্যি-মাননা নেই, গুরু-লঘু নেই, ভার-ভারিক্কি লজ্জা সঙ্কোচ কিছুই নেই—কেবল মিন্সে মাগীতে মিলে ধেই ধেই নাচ, আর হোই হোই হুজুক। বলি কোন্ কাজটা তোমরা ক'চ্চ—তোমাদের ওই মিস্ মিসেস্ গুলো,—পৃথিবীর কোন কাজে তারা লাগে? বিলিতি মেম গুলোর মত যদি খট্‌মট্ ক'রে রাস্তা ভেঙ্গে বেড়াতেও পাত্ত, তবু বুঝতুম—না গাড়ীভাড়াটাও বাচল। আমরা যে কিছু না, ঘরকন্নার ষোলআনা কাজ সেরে, আবার দুপুর বেলায়—রোদে পায় হেটে গে গঙ্গা নেয়ে আস্‌ছি। যাক্ দিকি তারা, এমন একটি দিন? তা ননীর পুতুল সব, রোদের আঁচে গ'লে জল,—আর জলের ছিটেয় এলিয়ে চল!

সিদ্ধে—তা শরীর একটু ডেলিকেট্ (কোমল) হ'লেও, মন এদের কত উন্নত হচ্চে। এই সব সুশিক্ষিতা, উন্নতপ্রাণা নারীগণ যখন দেশের জননী হবেন, তখন দেখ্‌বে দেশের কি অবস্থা হয়।

সৌদা—হ্যাঁ!—'হাতে সয়না ভাতের হাঁড়ী—মন দেবে আমার সাগর পাড়ি', এইত সব পুতুল, এঁরা আবার ব্যাথা সয়ে বিয়োবেন ছেলে,—মাই দেবেন তাদের কোলে তুলে। যদি ছবি এঁকে ছেলে হয়, আর ন্যাকা ন্যাকা নাকী কথায় ছেলের পেট ভরে, তবে যদি হয়। নইলে এঁরা যা জননী হবেন, তা মা গঙ্গাই জানেন। তোমরা উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা করে নাচ, আমি ত দেখি মেয়েগুলো গোল্লায় গেল। হাঁ, লেখাপড়া শিখবি, শেখ্। তাই বলে, মেয়ে মানুষ—ঘরকন্না কর্‌বিনি কেন? মিন্সেরা লেখাপড়া শিখে চাকরী-বাকরী কচ্চে না? মাথার ঘাম পায় ফেলে,—আহা, সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত বেহদ্দ খাটনি খেটে, পয়সা এনে দিচ্ছে না? তোরাও ঘরের কাজ সব না করে, কেবল বই নিয়ে, কি বাজনা নিয়ে, আর সকের সেলাই নিয়ে, কেবল আরাম চেয়ারে এলিয়ে পড়ে থাক্‌বি কেন? যার যে কাজ তা ত কত্তে হয়? লেখাপড়া শিখে যদি মিন্সেদের পয়সা রোজগার কর্ত্তে প্রাণ যায়, আর মাগীদের ঘরকন্না কর্ত্তে প্রাণ যায়, তবে এমন লেখাপড়ায়

কি লাভ? লেখাপড়া শিখে মানুষ মানুষের মত হবে, বেশী কাজ কর্ত্তে শিখবে।—তা যদি একেবারে অকেজোই হল, কেবল ন্যাকা ন্যাকা নাকী কথাই কইল, আর কথায় কথায় মুর্চ্ছাই গেল, তবে ও ছাই কতক গুলো বইএর কথা গিলে কি ফল?

সিদ্ধে—কোথাকার ২।১টা বাবু মেয়ে দেখে তুমি শিক্ষিতা মহিলা মাত্রকেই গাল দিচ্ছ। এইত আমাদের মিসেস্ গ্যাপ্ট, শিক্ষিতা মহিলার আদর্শ—নেত্রী স্থানীয়া। নারী জাতীর উন্নতির জন্য অবিরত কি অক্লান্ত পরিশ্রমই তিনি কর্চ্চেন। আর তাঁর বাড়ীতে গেলে মিষ্ট আলাপে, মিষ্ট ব্যবহারেই সকলকে কি আপ্যায়িতই করেন!

সোদা—কে, তোমাদের ওই মহিম গুপ্তের গাপ্তী বিবিটা? ও পোড়া কপাল! তিনি আবার পরিশ্রমও কচ্চেন! ফুর ফুর চুল উড়ছে, ভুর ভুর গন্ধ ছুট্‌ছে, ফর ফর রেশমী সাড়ীর কুঁচি দুল্‌ছে, যেন এক খানা পিরতিমে আর কি? আবার হিঁ হিঁ ক'রে হাসি, চিঁ চিঁ ক'রে মুখের বুলি,—বস্‌তে দাঁড়াতে যেন নতিয়ে পড়েন। ঘরে দু দণ্ড মন টেকেনা, গাড়ী ক'রে কেবল দেশ বিদেশের মিন্সে মাগীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাই খাচ্চেন। ওগো, আর আদর্শে কাজ নাই। তোমাদের ও গোলাপী রেশমী ন্যাতা তোমরাই ফর ফর করে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াও গে। আমাদের গেরস্ত ঘরের মাজা ঘসা নিকোন পোছানতে ও একটানও টিক্‌বে না। চুলোয় যাক্, এ নিয়ে আর কত ঝগড়া করব? তা, ডাকছিলে কেন?

সিদ্ধে—রান্না হয়েছে?

সোদা—না।

সিদ্ধে—না! সে কি? সেই কখন ব'লেছি সকাল সকাল খেয়ে বেরোতে হবে।

সোদা—তা কি হবে? আমরা একে অবলা কোমলা, তায় কুশিক্ষায় কাজ-কর্ম্ম সব গোলমালা। তা এত তাড়াতাড়িই যদি ছিল, তবে সেই আদর্শ মিসেস্ গ্যাপ্টকে গিয়ে বলেই পার্ত্তে? চায়ের কেটলীতে ক'রে দুটো আলুভাতে ভাত সে রেঁধে দিত?

সিদ্ধে—নেও, নেও, তোমার সব কথাতেই কেবল ঠাট্টা। তা অবলা কোমলা, গোলমালা যাই হও, এখন গরম মনে নরম হাতে দুটী গরম গরম নরম ভাত নিয়ে এস। আমি নেয়ে নি।

সৌদা—মনটায় এই গরমটুকু আছে বলেই সকাল সন্ধ্যা গরম ভাত আর চা পাচ্ছ। নইলে ঠাণ্ডা চাল চিবিয়েই থাক্‌তে হ'ত।—ও রমি?

(নেপথ্যে রমা।—কি মা?)

সৌদা—বলি রান্না হ'ল?

(রমার প্রবেশ)

রমা—রান্না ত কখন হয়েছে মা। কখনা কাপড় সেদ্ধ কচ্চি,—নাইবার সময় কেচে দেব।

সৌদা—উনি এখনই খেয়ে বেরোবেন। আমি ঠাঁই পিড়ি করে দিচ্চি। তুই ভাত বেড়ে আন।

(রমার প্রস্থান)

সিদ্ধে—ও কি, রমা আজ কলেজে যায় নি?

সৌদা—আজ আগে নাকি ওর পড়া বেশী নাই। ১২টার পরে গেলেই চল্‌বে।

সিদ্ধে—তখন কি আর গাড়ী আস্‌বে? কি করে যাবে?

সৌদা—কেন, কালেজ ত কাছেই। ছ মাসের পথত আর নয়? হেটেই যাবে এখন।

সিদ্ধে—একা হেটে যাবে কলেজে!

সৌদা—একা যাবে কেন, আমি গঙ্গা নাইতে ত ঐ পথেই যাব, আমার সঙ্গেই যাবে এখন।

সিদ্ধে—কি ব'লছ? তোমার সঙ্গে হেটে কলেজে যাবে। পাগল হয়েছ নাকি?

সৌদা—ওমা কি স্বাধীনতা গো! কি বড় উন্নতি গো! ঘরের দোরে কলেজ, স্বাধীন মেয়ে একদিন সেথায় হেটে যেতে পার্‌বে না। দশটা ঝি চাকর নইলে ঘরের একখানা কাজ হবে না, মাইনে করা রাঁধুনী একদিন না এলে, হোটেলে গে খেতে হবে, এক পা পথ চল্‌তে গাড়ী চ'ড়তে হবে,—এঁরা স্বাধীন। আর আমরা, এক এক হাতে এক একটা সংসার চালিয়ে নিচ্চি,—হেটে গিয়ে গঙ্গা নাইচি,—দেবালয়ে প্রণাম ক'রে আস্‌চি,—আমরা দীন হীন পরাধীন! এক কড়া কাজের কেউ না, কেবল মেয়ে পুরুষে ঢলাঢলি,—এর নাম হ'ল স্বাধীনতা।

সিদ্ধে—হ'য়েছে, হ'য়েছে? আর কাজ নাই। আমি নেয়ে আসি, গামছাটা দেও।

সৌদা—এই নেও। উচিত কথায় গায় বড় জ্বালা ধ'রেছে,—নেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে এস গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মিস্ চামেলীর ড্রইং রুম্।

চামেলী।

গান।

কারে যেন পাগল প্রাণে ভালবেসেছি।
কার সনে বা মনে মনে প্রেমে প'ড়েছি?
কই কারো ত দেখি নাই,
তবে বুঝি পড়িনি ছাই,
দেখলেই অম্‌নি প'ড়বে কেবল প'ড়ো প'ড়ো হয়ে আছি।
কিসের যেন মিষ্টি মিষ্টি,
সাড়া পেয়ে, সারা প্রাণটি
বিভোর কি এক মধুর নেশায়, আপনা তায় হারিয়েছি।
মিষ্টিত সব তবু কেমন,—
ফাঁকা ফাঁকা উদাস যে মন।
যেন জোছনা রেতে, হাওয়া খেতে একলা ছাতে বসে আছি।
(এমন) মধু মাখা ফাঁকা ফাঁকা,
ভরা ভরা তবু একা,
যেন ভালবেসে পাইনে খুঁজে, কারে ভালবেসেছি।

(রমার প্রবেশ)

রমা—ইস্ ভারি যে গান হ'চ্ছে।

চামে—এই যে রমা! রমা,—রমা,—রমা।

(ছুটিয়া গিয়া রমাকে আলিঙ্গন)

রমা—ওমা,—ওমা,—ওমা! আহ্লাদে যে আটখানা! কেন, হয়েছে কি।

চামে—বড্ড ভালবাসা পেয়েছে।

গান।

চামে—বড্ড পেয়েছে ভালবাসা

প্রাণটা যে পাগল পাগল।

রমা—ক্ষিদে পেলেই প্রাণটা যেমন

খাই খাই খাই ক'রে কেবল।

চামে—ভাল না বেসে বাঁচিনে আর,

কারে ভাল বাসি বল্?

রমা—(পেলে) বাসি পান্তাও বাঁচে প্রাণটা

সপ্ সপিয়ে খাই সে জল!

চামে—ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে,

ভালবাসার ঢেউ নাচিয়ে,—

উথলে ওঠে প্রাণটা ভ'রে কানায় কানায়

চ'লে ঢল ঢল্।

রমা—আহা ফুট্‌ছে যেন ফাটো ফাটো

ভাতের হাঁড়ী উথল পাথল!

চামে—এ বেগ বুকে রাখতে নারি,

রমা—ফাটেই জালে ঢাকা হাঁড়ী।

চামে—তপ্ত তরল ভালবাসা কার উপরে ঢালি বল্?

রমা—ত্যাখ্ রাস্তায় কে যায় ঢেলে দে গায়,—

লুটুক পায়ে জ্বালায় বিকল।

চামে—সত্যি রমা, আমার বড্ড ভালবাসা পেয়েছে। তোর কি কখনও পায় না?

রমা—ক্ষিদে পায় ভাত খাই;—তেষ্টা পায় জল খাই,—ঘুম পায় ঘুমুই। কিন্তু কই, ভালবাসা টাসাত কখনও পায় নি। সেটা কেমন লো? তোর বুঝি খুব পেয়েছে?

চামে—খুব-খুব-খুব পেয়েছে। ক্ষিদে তেষ্টা পেলেই ভাত জল জোটে, ঘুম পেলে বিছানাও জোটে। কিন্তু ভালবাসা পেলে যে কাকে ভালবাস্‌ব, সে মানুষ যে জোটে না,—তাই ত ছটফটিয়ে মচ্ছি।

রমা—তা তেমন ক্ষিদে পেলে ত লোকে যা পায় তাই খায়। তা তোরও তেমন তেমন ভালবাসা পেয়ে থাকে, ত্মাথ না—রাস্তায় ত কত লোক যাচ্চে, যাকে চোকে ধরে—অমনি ভালবেসে ফেল্‌ না।

চামে—এ ত নির্জ্জীব ভাত নয়, সজীব মানুষ। আমি ভালবাসতে গেলেই বা সে আস্‌বে কেন? আর ক্ষিদে খুব বেশী পেলেও ত একটু বিবেচনা করে খেতে হয়,—ছাই পাঁশ যা জুটল, তাই অমনি গিলে ত কেবল অম্বল—অজীর্ণ হয়ে মরা।

রমা—তা না হয়, গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করেই ফেলে দিবি।

চামে—তা আর এ পোড়া দেশে হয় কই? ওয়াক্‌ তুলে তুলে যে ফের আবার তাই গিল্‌তে হয়।

রমা—তা তোরা ত আর এ দেশের নস্‌। এ পুরোণো দেশের পচা পুরোণো মাটি ছেড়ে ত তোরা উড়ে উড়েই বেড়াচ্চিস্‌। আকাশে ত একটা নূতন দেশই তোরা গড়ছিস্‌।

চামে—আর তুই নাকি বড় বাদ যাচ্ছিস্‌?

রমা—আমি এই পুরোণো পচা মাটীতেই আছি। যেমন হ'ক, এ আমারই মাটী ত। এই মাটীতেই আছি, এই মাটীতেই থাক্‌ব। আকাশে উড়িওনি, উড়বও না।

চামে—একবার তবে একটু উড়েই দেখ না,—মাটীতে প্রাণ টেকে কি না।

রমা—আর উড়ে কাজ নেই। উড়ে ত দেখতে পাই এক নূতন রোগ,—ভালবাসা পায়। ক্ষিদে তেষ্টা পায়, এতেই বাঁচিনে,—এর উপর আবার ভাল বাসা পেলেই গেছি।

রমা—ভালবাসা পাবেনা? ভালবাসা না পেলে ভালবাস্‌ব কি করে? ভাল না বাস্‌লে ভালবাসাবাসি হবে কি করে? ভালবাসা—ভালবাসাবাসিই যে জীবন সাহিত্যে কাব্য, জীবনগগনে জোছনার আলো, জীবন কাননে সুরভি ফুল, জীবনবসন্তে মলয় আকুল। আহা ভালবাসায় জীবন কি মধুর;—জীবনটী ভ'রে বয় যেন তরল সঙ্গীতের সুর।

গান।

চামে—ভালবাসা ভালবাসা, ভালবাসা জীবনে কি ?

রমা—ভালবাসা এ জীবনে, আহা গরম ভাতে ঘি !

চামে—বসন্তে বয় মলয় রঙ্গে,—

রমা—তার দুপুরে ঘুম অলস অঙ্গে !

চামে—ভালবাসায় প্রাণ-আকাশে, হাসে ফুট ফুট কৌমুদী !

রমা—(আর) নাচে প্রাণটা ছেলের যেমন, শোনে যখন কালকে ছুটী !

চামে—ফোটে প্রাণে ফুলের বাগান,—

রমা—খেয়ে উঠে মুখভরা পাণ !

চামে—ভালবাসায় জীবনটি এক তরল গানের সুর !

রমা—(আর) শুয়ে প'ড়ে নভেল পড়া সারাটি দুপুর !

চামে—হিঃ হিঃ হিঃ ! এইবার ঠিক বলেছিস্, রমা ! সত্যি সারাটি দুপুর শুয়ে প'ড়ে প'ড়ে নভেল পড়ার মত মজা আর নেই। আহা, বারমাস যদি এম্নি হ'ত, কলেজে গিয়ে সেই একঘেয়ে নীরস লেক্‌চার শুন্‌তে না হত, নোট না লিখ্‌তে হ'ত, কেবল শুয়ে প'ড়ে নভেল পড়াই যেত, তবে তা ঠিক ভালবাসার মতই হ'ত। যে রকম ভালবাসার আরামের কথা ব'ল্লি তুই, তুই সত্যিই ভাল বেসেছিস্। সত্যি রমা, বল্‌না ভাই, ভাল বেসেছিস্ ?

রমা—বেসেছি বই কি।

চামে—বটে বটে বটে ! তা আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিস্ ! আমি যদি কাউকে ভালবাসি, অমনি ছুটে গিয়ে তোর কাণে কাণে ব'লে আসি। তা কাকে ভাল বেসেছিস্, বল্‌না ?

রমা—সবাইকে,—এই মাকে, বাবাকে, তোকে——

চামে—দূর ! দূর ! দূর ! ওকি ভালবাসা হ'ল ?

রমা—তবে কি হ'ল ? ছেদ্দাকরা ?

চামে—ও হ'ল, ওই এক রকম ভালবাসা ; যেন রোজকার ডাল ভাত মাছের ঝোল খাওয়া।

রমা—তবে লুচি মণ্ডার ভালবাসাটা কি রকম, একটু বুঝিয়ে বল্।

চামে—আহা, যেন জানিস্ নি,—ন্যাকাটি ! সেই যে নভেলের ভালবাসা, মেয়ে পুরুষে।

রমা—তা আমি ত মেয়ে, কত পুরুষ মানুষকে ভালবাসি। বাবাকে ভালবাসি, কাকাকে ভালবাসি, ঠাকুর দা বাড়ীতে আছেন, তাঁকেও কত ভালবাসি। নভেলে কি এ সব ভালবাসা বারণ আছে?

চামে—নাঃ তোর সঙ্গে আর পাল্লুম না। এই ধর্ স্বামী স্ত্রীতে যেমন ভালবাসা।

রমা—তা আগে বে হ'ক,—তবে ত স্বামী ব'লে কাউকে ভাল বাস্‌ব।

চামে'—বে হ'লে আর ভালবাসা কি? বের আগে না ভালবাসা? ভাল বাসা হ'লে—না তারপর বে!

রমা।—তা বে না হ'তেই কি করে কাকে স্বামীর মত ভাল বাস্‌ব লো? বে না হ'লেত আর স্বামী হবে না?

চামে।—স্বামী না হ'ক, প্রেমিক ত হ'তে পারে। প্রেমিকা হ'য়ে তাকে ভাল বাস্‌বি।

রমা।—দূর কালামুখী! স্বামীছাড়া আবার গেরস্তমেয়ের প্রেমিক কিলো!

চামে।—স্বামীত শেষে হবে.—বের পরে। আগে ত প্রেমিক? আগে প্রেম সঞ্চার, প্রেমে পড়া, প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম বিনিময়,—তারপর না বিবাহ।

রমা।—তার পর,—এত প্রেমাপ্রেমির পর যদি বে না হয়?

চামে।—ভগ্ন হৃদয়ে প্রেমিকা প্রেমিকের ছবি, নীরবে নিরাশার অশ্রুসিক্ত ক'রে পূজা করবে। আহা সে কি মধুমাখা মিঠে দুঃখ!—কি অমৃতময় বিষের জ্বালা! আহা সে যেন কৌমুদী-ভাসিত, মলয়-সেবিত, কুহুতান-মুখরিত উপবনে ফুটন্ত কুসুমশোভিত, সৌরভে আমোদিত, গোলাপের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরা! আহা, এমন মধুর মরা কি আর হয়!

রমা।—তা গোলাপ ডালে গলায় দড়ি দিয়েই হ'ক, গরমীতে বরফজলে ডুবেই হক, আর শীতে সহমরণের চিতের উঠেই হ'ক—মরা ত মরাই। তা বেঁচে থাক্‌তে পাল্লে সাধকরে মরণ ডাকার দরকার কি! 'সুখে থাক্‌তে এ ভূতের কিল খাওয়া' কেন? বিয়ের পরে কি আর স্বামীস্ত্রীতে প্রেম হয় না?

চামে—বিয়ের পরে প্রেম! খাওয়ার পর ক্ষিদে!—তাও কি কখনও হয়!

রমা—তা এ দেশভরা ত এই হচ্ছে।

চামে—এত শিক্ষা লাভ করেছিস্, তোকেও বল্‌তে হবে, প্রেম ব্যতীত প্রকৃত বিবাহ হয় না? আগে হৃদয় দিতে হয়, তার পরে হাত। সে দিন একটা নভেল থেকে তোকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলুম না, মা তার মেয়েকে ব'লছে, যেখানে হৃদয়

দিতে পার না,—সেখানে হাত দিও না। এই হ'চ্চে আদর্শ বিবাহ। আর এ দেশের বিবাহ,—সে ত দানে পাওয়া দাসী ঘরে নেওয়া। স্ত্রীরা ত এ দেশে সব বলদ গরুর মত লোকের সম্পত্তি।

রমা—কই, তেমন কিছু ত দেখতে পাইনে। সবাইত ঘরের পুরোপুরি গিন্নী।

চামে—গিন্নী—না রাঁধুনী!

রমা—তা গিন্নীকে যদি খেতে দিতে হয়, তবে রাঁধতে হবে না?

চামে—বাঃ, কি যুক্তি! গৃহিণী হলেই তাকে রাঁধুনী হতেই হবে?

রমা—নিদেন রাঁধুনী রাখবার পয়সা না থাক্‌লে ত হবেই।

চামে—রাঁধুনী যে না রাখতে পার্‌বে, সে বে করে কেন?

রমা—এ দেশে কম পুরুষই তবে বে কর্ত্তে পারে। পুরুষরা যদি বেই না করে,—তবে তোদের এত প্রেম পাগলামির কি গতি হবে? কেবলই কি ফুলের বাগানে গোলাপ ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বি?

চামে—তা স্ত্রীর যদি দুবেলা রাঁধতেই গেল,—তবে বের পরই বা তোদের প্রেম হবে কি ক'রে? রান্না ঘর ত আর বসন্তের কুঞ্জ নয়। সেথায় আগুন জ্বলছে, মলয় বইছে না,—সেথায় গরম তেলে মাছ তরকারীই ছ্যাক্ ব্যাক্ কর্চ্চে, বিহগ কাকলী উঠছে না, খোলা কেরোসিনের আলোর ধোঁয়া, উঠছে, মধুর জোছনা ঝর্‌ছে না।

রমা।—তা তোরা বাবু হ'য়েছিস্ ব'লে, স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা ত আর সত্যি বাবু হ'য়ে ওঠেনি? তোদের ভালবাস্‌তে বসন্তের কুসুমিত কুঞ্জে মলয় পবন, চাঁদের কিরণ আর বিগহ কুজন লাগে। কেবল তাতেও হয় না, নাগরও একটী বিলেতফেরা হ্যাটকোট পরা ইংরেজি হরবোলা চাই। তা এ দেশের গেরস্তর মেয়েরা ঐ রান্না ঘরে, আগুনের জ্বালে, মাছ তরকারীর ছ্যাক্ ব্যাকানির মধ্যেই, খালি গায়ে ক'ল্‌কে হাতে তামাক খেতে আগুন নিতে এসেছে এমন স্বামীকেও বেশ ভালবাসে। এই গেরস্তালী ভালবাসা বার মাস সারা জীবন সমান চলে। আর তোদের যে এই বাবুয়ানা পোষাকী ভালবাসা, তা সেই বসন্তের কুঞ্জ থেকে বাইরে গেলেই শূন্যে মিলিয়ে যায়। এ যেন সুন্দর শিশিতে ভরা এসেন্স,—মুখটি খুলে রেখেছ কি সব উড়ে গেছে। এ যেন জাপানী সিল্কের হাওয়া সাড়ী, ড্রইং রুমে পরে একটু ফরফরিয়ে বেড়ান যায়, কাজে একটু চেপে বস্‌লেই ফেঁসে গেল।

চামে—মুখে ঘাম, হাতে কালী, কাপড় ভরা হাতমোছা হলুদ, কোমরে আঁচল বেঁধে প্রেমিকা ছ্যাকবে গা তরকারীতে নাড়া দিচ্ছেন, আর সারাটি গা তেলে চুপ চুপ, ঠেটি পরা প্রেমিক কি না হুকো হাতে আগুন নিতে সেই রান্নাঘরে উঁকি দিচ্ছেন,—বলি এই দাম্পত্যের আদর্শই বুঝি সাম্‌নে রেখেছিস্‌?

রমা—তা বাঙ্গালী গেরস্তের মেয়ে এর চেয়ে অন্য রকম, নভেলী ঢঙের বাবুয়ানা আদর্শ ধরলে চল্‌বে কেন?

চামে—তবে প্রেমও হবে সেই বের পরে,—রান্নাঘরে!

রমা—তা বের আগে বসন্তের কুঞ্জে গিয়ে কোন প্রেমিকের প্রেমিকা হব, তা ত কখনও ভাবিনি।

চামে—এত লেখা পড়া শিখে, এই উন্নত নারীজীবনের আদর্শ পেয়েও?

রমা—তা লেখা পড়া শিখেছি কি বের আগে ভালবাস্‌তে? কৌমার্য্যে প্রেমিকা সাজতে?

চামে—নারীর ন্যায্য অধিকার পেতে ত?

রমা—নারীর ন্যায্য অধিকার স্বামীর যোগ্য সঙ্গিনী হওয়া, স্বামীর ঘরে যোগ্য গৃহিণী হওয়া, নারীর অধিকার পরিজনের সেবায়, লোক সেবায়; তা যদি না পারি, তবেই বলবো বৃথা লেখা পড়া শিখেছি।

চামে—তা, যার যোগ্য সঙ্গিনী হবি, সেই স্বামী ত চাই?

রমা—তা যখন বে হবে, স্বামীত তখন হবেই।

চামে—বে কি করে হবে?

রমা—যে ক'রে সবার হ'য়ে থাকে, বাপ মায় সবার বে দিয়ে থাকে, তেমনি করেই হবে।

চামে—সে কিলো? বাপ মায় বে দেবে কি? বে আমার,—বাপ মায় তা দেবে কি? ভালবেসে স্বামী নিজে বেছে নেব। আমি ত আর বাপ মার ঘটিটি বাটিটী নই যে যাকে খুসী তাকে তারা দান করবেন?

রমা—ভাই, নিজেকে কেউ নিজে বেছে পায় নি,—বাপ মা থেকেই এসেছি। দেহে মনে বাপ মার দেহের মনের দোষগুণ নিয়েই সকলকে চল্‌তে হয়, এড়াবার যো কারও নাই। যা নিয়ে আমি, তাই যদি বাপ মা থেকে পেলুম,—তবে যাকে নিয়ে জীবন কাটাতে হবে, তাকেও না হয় তাঁরাই বেছে দিলেন। আর তাঁদের বয়স বেশী,—বুদ্ধি বেশী,—আমাদের ভালর ভাবনাও বেশী,—নিজেদের চেয়ে তারা বাছতে বরং ভালই পার্‌বেন।

চামে—হ'য়েছে আর কি? তোর দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গ্যাছে। এ বুদ্ধি তোকে কে দিলে?

রমা—বুদ্ধি যার যার নিজের মনের সম্পত্তি—কেউ কাউকে দিতে পারে না। জোর ক'রে দিতে গেলেও দাঁড়ায় না।

চামে—ঐ যে মিসেস্ গ্যাপ্ট আস্‌ছেন, এ ঝগড়া তবে আজ ধামা চাপা থাক্।

(লীলার প্রবেশ)

চামে—আসুন, মিসেস গ্যাপ্ট,—ভাল ত?

লীলা—ও—মাঃ! বড্ড হয়রান্ হয়ে গেছি। এই সিঁড়ি গুলো দিয়ে ওঠা কি কষ্ট! একেবারে হাঁপিয়ে গেছি, বুক দুর দুর কচ্চে। ওঃ—মাঃ! বড় বড় বাড়ী গুলোতে সব লিফ্‌ট এর বন্দোবস্ত হলেই ভাল হয়। উঃ! কি তেষ্টা পেয়েছে! চামেলী, এক কাপ চা যদি চাই তবে কি তোমার অসুবিধা হবে?

চামে—কিছু না, আমার ষ্টোভে জল চড়ানই থাকে। তেষ্টা পেলেই চা খাই। ঠাণ্ডা জল ছুঁইও না। আয়ি!

রমা—(স্বগত) সাধে মনটা এত গরম!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

চামে—তিন পেয়ালা চা লে আও।

রমা—আমার চাইনি।

চামে—তব দো পেয়ালা!

(পরিচারিকার প্রস্থান)

লীলা—এই যে রমাও এখানে। ওঃ গড্! (Smelling salt বাহির করিয়া গন্ধ নেওন।) ভাল আছ রমা!

রমা—হ্যাঁ, আছি একরকম। আপনার কি অসুখ করেছে কিছু।

লীলা—অ—সু—খ। হ্যাঁ—না—তা এমন কিছু নয়। তবে স্নায়ুগুলো বড় দুর্ব্বল আর শিথিল হয়ে পড়েছে। বড্ড খাটতে হয় কিনা,—রোজই প্রায় সভায় যেতে হয়,—আবার লোকের সঙ্গে দেখা শুনো কত্তে হয়, বাড়ীতে যারা আসেন. তাঁদের অভ্যর্থনা কত্তে হয়। এ সব ত যেন আছেই। তারপর দেশের এই হীন অবস্থার ভাবনা,—ও! মাথাটা একেবারে খাক্ হয়ে গেল। স্নায়ুগুলো সব একেবারে হয়রান্ হয়ে পড়ছে।—তবে কি জান,—উপায় নেই। উন্নত জীবনের দাম এ সব দিতেই হবে। মরি বাঁচি ঠিক সভ্য নিয়মে আমাদের চ'লতেই হবে।

এই অধঃপতিত দেশ, আর এই দেশের অধঃপতিতা অন্ধকারে নিমজ্জিতা ভগিনী গণ,—এদের জন্ত খাট্‌তেই হবে। চা কই চমেলী ? ওঃ!

চামে—আয়ি! জল্‌দি চা লে আও।

(পরিচারিকার চা লইয়া প্রবেশ ও যথাস্থানে রাখিয়া প্রস্থান,
লীলা ও চামেলীর চা পান আরম্ভ।)

চামে—আপনার চেহারাটা সত্যি বড় কেমন ফ্যাকাসে হ'য়ে যাচ্ছে। কিছুদিন কোথাও গিয়ে হাওয়া পরিবর্ত্তন করে আসুন না।

লীলা—হ্যাঁ, তাই ভাবছি। মহিমকেও বলেছি। ছুর ছুর করে একাজে ওকাজে দিনের পর দিন কাটাতে হয়,—মধ্যে মধ্যে হাওয়া পরিবর্ত্তন আর বিশ্রাম দরকার। এই ত গ্রীষ্ম এসে পড়্‌ল—উঃ কি ভয়ঙ্কর গরম! পাথরকেও যেন স্নায়ু ভাজা করে ফেলে। এবার কিছুদিন দার্জ্জিলিং টিং কোন পাহাড়ে গিয়ে না থাকলে বাঁচ্‌ব না।

চামে—আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

লীলা—তা বেশ ত। তোমাদের মত কেউ সঙ্গে থাক্‌লেই ত বেড়িয়ে সুখ। মহিম ত আর তার ব্যবসা ছেড়ে যেতে পারবে না ? তার পর চামেলী, আমি এসেছি কেন জান ?

চামে—কোন কথা আছে ?

লীলা—হাঁ বিনোদ দা বিলেত থেকে এসেছে, তা শুনেছ। তাঁর অভ্যর্থনার জন্ত একটা সান্ধ্য-সম্মিলন আমাদের ওখানে বন্দোবস্ত কচ্চি। কোরাসে একটা অভ্যর্থনা সঙ্গীত গাইতে হবে,—৩।৪ দিন একটু রিহার্সাল দিয়ে নিতে হবে কি না, তাই সন্ধ্যের সময় আমাদের ওখানে যাবে ?—রমা!

রমা—আজ্ঞে।

লীলা—তোমাকেও কিন্তু যেতে হবে।

রমা—মা বোধ হয় যেতে দেবেন না।

লীলা—আর রেখে দেও, রেখে দেও, তোমার মার কথা। সব কাজেই তিনি পথ আগ্‌লে বসে থাকবেন। কিন্তু তোমার বাবাকে ত ব'লেছি। তিনি ত মত দিয়েছেন।

রমা—বাড়ীতে আমাকে মার মত মতই চ'ল্‌তে হয়।

লীলা—তোমার নিজের কি একটা মত নেই ? তোমার মা কে ? কোথাকার এক সেকেলে অশিক্ষিতা মেয়ে মানুষ। তার মতে তোমার কি এসে যায় ? উচ্চ-

শিক্ষা পাচ্ছ, উন্নত ভাব সব আস্‌ছে। এখনও মার মত নিয়ে চ'ল্‌তে হবে? Shame (শেম্)!

রমা—তিনি মা, গুরুজন। অন্যায়ও কিছু বলেন না। কেন তাঁর অবাধ্য হব?

নীলা—তোমার বাবা কি তোমার গুরুজন নন?

রমা—তিনিও মার মতের বিরুদ্ধে আমায় কখনও চল্‌তে বলেন না।

নীলা—যদি এ সম্বন্ধে তিনি বলেন?

রমা—যদি বলেন, আর মা মত দেন, তবে যাব। মার মত না হলে তিনিও ব'ল্‌বেন না।

নীলা—আচ্ছা, তবে দেখি তোমার বাবা কি বলেন। তবে আমি উঠি আজ চামেলী। আজ সন্ধ্যায় অবশ্য যাবে। আর সুধু কোরাসের গান হবে না। তোমাকে একটা আলাদা গান গেয়ে একটা ফুলের মালাও তাকে দিতে হবে।

চামে—আচ্ছা।

নীলা—আর রমা,—তোমার বাবা যদি তোমার মার মত নেওয়াতে পারেন, তোমাকেও কিন্তু ওর সঙ্গে গাইতে হবে।

রমা—গাইতে আমি পার্‌বো না।

নীলা—গাইতে পারবে না! সে কি!—কেন?

রমা—আমার লজ্জা করে।

নীলা—ও শেম্। কি কুসংস্কার! কি হীন সেকেলে গ্রাম্যতা! কেন লেখা পড়া শিখেছ? গ্রামে ঘরের কোণে ঘোম্‌টা দিয়ে ব'সে দাসীপণা করগে। তোমার বাবাকে আজ ব'ল্‌তে হবে। যাকগে! চামেলী তুই একাই তবে গাইবি।

চামে—তা বেশ,—গাইব।

(নীলার প্রস্থান)

রমা—আর দেখিস্, যে রকম ভালবাসা পেয়েছে—বিনোদ বাবুও বিলেত থেকে এসেছে,—পারিস্ ত একেবারে ভালবেসেই ফেলিস্। আবার গান গেয়ে মালাও দিবি। একেবারে গন্ধর্ব্ব বিয়েই বা হয়ে যায়।

চামে—তা ভালবাস্‌তে হ'লে,—বিনোদ বাবু—ভালবাসার মতই হবে। তা যদি বেসেই ফেলি————

রমা—যদি ফেলি কি ! ফেল্‌বিই। মনটা ত তৈরী হ'য়েই আছে। সময়টা সুযোগটাও তেম্‌নি।

চামে—সত্যি রমা, বিনোদ বাবুকে আমি ভালবাস্‌বই। তবে চোকে ত এখনও দেখি নাই।

রমা—বাঁশীটি শুনেছিস্‌। মনটা ত তাতেই দেখছি কেমন কেমন হয়ে উঠল। ও দেখলেই হ'য়ে যাবে। বিবশা হ'য়ে তখন গায় ঢলেই না পড়িস্‌। তা যাই এখন, বেলা গেল।

চামে—ইস্‌! তাই ত! ছটা যে বাজে, টয়লেট্‌ টেট্‌ করে সময় মত পৌছনই যে দায় হবে। তুই তবে যা, আর ব'কে সময় নষ্ট করিস্‌ নি। গাড়ী এসেছে?

রমা—গাড়ী ক'রে আর কি আমাদের বেড়ান চলে? ঝির সঙ্গে হেটেই এসেছি, বেশী দূর ত আর নয়? সে নীচের ঘরে বসে আছে, তার সঙ্গেই হেটে যাব এখন।

চামে—তা বস্‌না একটু। আমি টয়লেটটা সেরে আসি। একেবারে আমার গাড়ীতেই যাবি। তোকে বাড়াতে রেখে যাব এখন।

রমা—না ভাই, সন্ধ্যের আগেই মা ফির্‌তে বলে দিয়েছেন। তিনি কোথায় যাবেন। আমাকেই রাঁধতে হবে। তোর অনেক দেরী হবে, আমি যাই।

চামে—তবে যা।

(উভয়ের প্রস্থান)

ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

রঙ্গ বারিধি।

তৃতীয় তরঙ্গ।

শেষ রক্ষা।

বহু তর্ক বিতর্কের পর রজনীকান্ত তাহার বন্ধু প্রফুল্লনাথকে সম্মত করাইলেন। প্রফুল্লনাথ দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুল রক্ষার্থ আত্ম-বলিদানে স্বীকৃত হইলেন। তিনি ভাবিয়া ছিলেন, এ জীবনে বিবাহ না করিয়া একাকি চির কৌতুকে মহা শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু ভগবান বিরূপ। এক-দিকে বন্ধুর অনুরোধ, অন্যদিকে দরিদ্র ব্রাহ্মণের জাতিপাত,—কাজেই প্রফুল্লনাথকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইতে হইল। রজনীকান্ত বলিলেন, "তাহা হইলে অদ্য রাত্রির গাড়ীতেই চল, ললিতের বাড়ী যাওয়া যাক, সে লিখিয়াছে তাহাদের বাড়ী যাইলেই সে মেয়েটীকে তোমায় দেখাইয়া দিবে।"

প্রফুল্লনাথ নীজে ইমানকল্যাণ আলাপ করিয়া বলিলেন "কাজেই শুভস্য শীঘ্রং।"

প্রফুল্লনাথ জমিদারের ছেলে জমিদার, বহু সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী। ললিতের মত অত বড়লোক না হইলেও দরিদ্র বা গৃহস্থ নহেন, সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য। সংসারে তাহার থাকিবার মধ্যে আছেন একমাত্র ৺ পিতৃদেবের অশীতি বর্ষীয়া পূজনীয়া জননী, সুতরাং তিনি তাঁহার সম্পত্তি বা নিজের সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রফুল্লনাথ একটু খাম-খেয়ালী হইলেও সুচতুর একটু কৌতুকপ্রিয় হওয়া সত্বেও বুদ্ধিমান। তাঁহার মন উদার, সর্ব্বদা পরোপকারে ব্যস্ত।

কথামত উভয়ে যথা সময়ে বাটী হইতে বাহির হইয়া রাত্রির গাড়ী ধরিলেন। পল্লিগ্রামের ষ্টেসন, অর্দ্ধদেহ লৌহযান গহ্বরে প্রবেশ করাইবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়িয়া দেয়, রজনীকান্তকে ঠেলিয়া ভিতরে দিয়া প্রফুল্লনাথ তাঁহাদের ট্রাঙ্কটি রজনীকান্তের ভৃত্যের নিকট হইতে সবলে আকর্ষণ করিয়া ভিতরে লইলেন। অমনি একব্যক্তি "উ" শব্দে ব্যাকুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "দেখতে পাও না বাপু?"

প্রফুল্লনাথ বিনীত ভাবে বলিলেন, "কিছু মনে কর্‌বেন না, মশায়?"

সে বলিল, "আর মনে করবো আমার মাথা। পা খানা একেবারে চেপ্‌টে গেছে, ফেলে দাও তোমার ঐ—"

"এই সরিয়ে নিচ্ছি মশায়" বলিয়া প্রফুল্লনাথ সবলে বাক্সে টান মারিলেন, বেঞ্চের নিচে ট্রাঙ্কে কিসে আঘাত প্যাইল, সঙ্গে সঙ্গে একব্যক্তি লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন "গুড়ের কলসিটা ভেঙ্গে ফেল্লে। তুমিতো ভারি ব্যাস্তবাগিস লোক হে।"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন, "কিছু মনে—"সে ব্যক্তি ক্রোধে কাঁপিতে ছিলেন, প্রফুল্লনাথকে আর কথা কহিতে দিলেন না "বলিলেন, রেখে দাও 'তোমার কিছু মনে করনা,' বেয়াকুব লোক। 'মনে কর না' আমার মাথা আর মুণ্ডু। দেখচ না উজবুক, পয়রা গুড়ের কলসিটা ভেঙ্গে ফেলেছ। কতদূর থেকে কতকষ্ট করে আনছি—আহম্মক।"

গাড়ীর ভিতর একটা মহা হুলুস্থুল পড়িল। তরল গুড় গাড়ী প্রায় প্লাবিত করিয়া চারিদিকে ছুটিল, প্যাসেঞ্জারগণ যে যাহার জুতা, ব্যাগ, পোটলা, কাপড় সরাইয়া লইতে হুড়াহুড়ি আরম্ভ করিল;—অনেকে চটচটে গুড়ে চর্চ্চিত হইয়া গেল। সকলেই রোষকষাইত লোচনে প্রফুল্লনাথকে ভস্মীভুত করিবার জন্ত তাহার দিকে চাহিতে ছিল। গাড়ীর ভিতর একটা কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধ ঘটিত — দুই একজন 'মারো শালাকে' বলিতেও ত্রুটি করে নাই। প্রফুল্লনাথ যুদ্ধ সমাগত দেখিয়া একখানা বেঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,— "দেখ বাবুরা, এতক্ষণ কোন কথা কহি নাই, আর একটা কথা ঠোঁট দিয়ে বার করিয়াছ কি এক একটার মুণ্ডু ধরিয়া এই গুড়ে ডুবড়াইয়া দিব।

প্রফুল্লনাথের ভীমমুর্ত্তি দেখিয়া সকলে নীরব থাকাই যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করিল। মনে মনে তাহার কিরূপ আগুশ্রাদ্ধ করিতে লাগিল, তাহা অকথ্য। সেই যে সকলে নীরব—আর তাঁহারা যতক্ষণ গাড়ীতে ছিলেন—সেই পর্য্যন্ত নীরব। যথা সময়ে গাড়ী ফোঁপাইতে ফোপাইতে তাহার গন্তব্যস্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সহযাত্রীদের উপর প্রফুল্লনাথের আর বিন্দুমাত্র সহানুভুতি ছিল না, তিনি রজনীকান্তকে ঠেলিয়া প্লাটফরমে নিক্ষেপ করিলেন ও নিজে গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন! ট্রাঙ্কদ্বয় সবলে প্লাটফরমে ফেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা গুড় মিশ্রিত জুতা 'আসকে পিঠের' মত ধপ করিয়া নিচে পড়িল। প্যাসেঞ্জারগণ আর একবার প্রফুল্লনাথের দিকে ভ্রুকুটী কুটিল দৃষ্টি পাত করিলেন, অনেকেই বিড় বিড় করিয়া তাঁহার আগুশ্রাদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু প্রফুল্লনাথের

তাহাতে দৃকপাত নাই। ইত্যবসরে গার্ড 'হুইসিল' দিল, গাড়ী প্লাটফরম ছাড়িয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। এতক্ষণ রজনী কান্ত নীরব ছিলেন, এবার হাসিয়া উঠিলেন। প্রফুল্লনাথ বলিলেন, "এতক্ষণ হাসি কোথায় ছিল বাপু।"

রজনীকান্ত বলিলেন, "গাড়ীতে হাসিলে মার খাইতে হইত। একটা হাঙ্গামা করেছিলে আর কি, একটা হাঙ্গামা না নিয়ে থাকতে পার না।"

প্রফুল্লনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে কেবল প্রফুল্ল[illegible]থের

রজনীকান্ত হাসিয়া বলিলেন, 'ওটা তোমার স্বভাব, দেখ যেন আবার ললিতদের বাড়ী গিয়ে কোন হাঙ্গামা বাদিও না।"

মস্তকে চাদর বাঁধিয়া প্রফুল্ল নাথ ও রজনী কান্ত বাঁধা রাস্তা ধরিয়া ললিতের বাড়ীর দিকে চলিলেন। পশ্চাতে মুটের মস্তকে তাহাদের ট্রাঙ্কদ্বয় চলিল। পূর্ব্বে সংবাদ দিলে নিশ্চয়ই ললিতের পিতা রামধন চৌধুরীর বৃহৎ ফিটন ও জুড়ী তাঁহাদের প্রতীক্ষায় ষ্টেসনদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত।

২

অর্দ্ধপথে এক বৃহৎ সুদীর্ঘ দিঘির পাড়ে আসিয়া সহসা প্রফুল্লনাথ জমি লইলেন। রজনীকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আর দূর নাই, ওই বাড়ী দেখা যাচ্ছে।"

প্রফুল্ল নাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন "অবগত আছি।"

"তবে চল, আর দেরী করে ফল কি।"

"উঁহু, আমাদের সমাদর কিরূপ হইবে অবগত না হয়ে প্রফুল্লনাথ এখান থেকে এক পাও অগ্রসর হচ্ছেন না। তুমি অগ্রসর হও, আমি ঐ 'লম্বা টিকির' মৎস্য শীকার একটু পর্য্যবেক্ষণ করি।"

বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন ;—চারিদিকে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে এ সময় প্রফুল্ল নাথের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া কোনই ফল নাই ,—ললিতকে ডাকিয়া আনিলেই যখন গোল মিটিয়া যাইবে ; এই ভাবিয়া রজনীকান্ত বলিলেন, "আমি ললিতকে ডাকিয়া আনিতেছি, তুমি তাহা হইলে এই খানেই অপেক্ষা কর।"

প্রফুল্ল নাথকে ত্যাগ করিয়া যাইতে রজনী কান্তের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিরুপায়, তিনি মুটে সহ দীর্ঘ পদে বন্ধু সম্ভাবণে চলিলেন। রামধন বাবুর বৃহৎ অট্টালিকা, একটি গ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্মুখস্থ কাছারি বাড়ীর গদীতে একটা নাদুশ নদুশ ভদ্রলোক নানাবিধ রং বেরংয়ের লোক পরিবেষ্টিত

হইয়া বার দিয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকেই একটা গোলমাল, চারিদিকেই বহু লোকজন, সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত, এরূপ বৃহৎ ব্যাপার রজনীকান্ত পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, তিনি মুটে সহ সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, কি করিবেন, কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পরিলেন না। এই সময় এক ব্যক্তি দাওয়ান মহাশয়ের কাণে কাণে কি বলিল, দাওয়ান মহাশয় অমনই প্রায় লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বল কি." তৎপরে অতি সম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রণাম হই, প্রণাম হই, বসতে আজ্ঞা হোক, এখনি কর্ত্তাকে সংবাদ দিতেছি।

রজনীকান্ত ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলেন না, তিনি স্পন্দিত হৃদয়ে বলিলেন, "অনুগ্রহ করে একবার ললিত বাবুকে খবর দিন। আমার সঙ্গে একটি ভদ্রলোক আছেন।"

দাওয়ান মহাশয় অতি ব্যগ্র ভাবে বলিয়া উঠিলেন—

"পোড়ো একজন সঙ্গে থাকিবারই কথা। এখনই পাইক পাঠাইয়া ডাকিয়া আনিতেছি।"

এই বৃহৎ দেহের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কোন গুরুতর গোলযোগ ঘটিয়াছে ভাবিয়া রজনীকান্ত বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয় আমার সঙ্গে একটী বন্ধু আছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ললিত বাবুকে সংবাদ দিন।"

দাওয়ান মহাশয় আকর্ণ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আজ কাল আপনারাও সুসভ্য হইয়া পড়িয়াছেন। ললিত বাবু আপনার সমবয়সী হইলেও আপনি কর্ত্তার ঠাকুর মহাশয়, তাঁহাকে এখনই সংবাদ দিতেছি।"

রজনীকান্ত অতি বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনি কি ক্ষেপিয়াছেন। আমি কায়স্থ; আপনি আমাকে গুরু ঠাকুর বলিতেছেন কোন সাহসে।"

এই সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, 'রজনী তুমি! একি!"

রজনীকান্ত চমকিত হইয়া ফিরিলেন, দেখিলেন সম্মুখে তাঁহার বন্ধু ললিত, বন্ধুর দরশনে একটু আশ্বস্ত হইয়া রজনী কান্ত বলিলেন, "ভাই তোমাদের এ লোকটা কি পাগল, ইনি আমায় প্রণাম করিতেছেন, কি বলিতেছেন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

ললিত বিস্মিত ভাবে দাওয়ানের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "ইনি আমার বিশেষ বন্ধু, রজনী বাবু, আপনি ইহাকে কি স্থির করিয়াছেন?"

যে ব্যক্তি প্রথম দাওয়ান মহাশয়ের কাণে কাণে কি বলিয়াছিল, দেওয়ান

মহাশয় তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"এই নচ্ছার আমায় এই ভুল জন্মাইয়া দিয়াছে, এই কুষ্মাণ্ড বলিল যে ঠাকুর মহাশয়ের আসিবার কথা আছে, ইনিই ঠাকুর মহাশয় "

ললিত হাসিয়া বলিলেন, "রজনী কিছু মনে করিও না, দাওয়ান মহাশয় তোমাকে আমাদের গুরুঠাকুর ভাবিয়াছেন। আমাদের গুরুঠাকুর বহুকাল আমাদের বাড়ী আসেন নাই, তিনি এক ছেলে রাখিয়া মারা গিয়াছেন, আমরা আমাদের এই নূতন গুরুঠাকুর মহাশয়কে কখনও দেখি নাই। কাল হঠাৎ আমাদের এই নূতন গুরুঠাকুর মহাশয় এক আরজেণ্ট টেলিগ্রাম করেছেন, এখানে আজ আসবেন। যাক্ কিছু মনে কর না—এস।"

এস্থলে আর থাকা কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া ললিত হাসিতে হাসিতে রজনীকান্তের হাত ধরিয়া নিজ বৈটকখানার দিকে চলিলেন। রজনীকান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "তোমার কথা মত আমার বন্ধু প্রফুল্লনাথকে সঙ্গে আনিয়াছি।"

ললিত অতি ব্যগ্র ভাবে বলিলেন ; "কোথায় তিনি ?"

রজনীকান্ত বলিলেন, "তোমরা ভাই বড়লোক, কিরূপ আদর অভ্যর্থনা হবে তিনি জানেন না, তাই পুকুর পাড়ে বসে আছেন।"

"সেকি এখনই চল, কোথায় তিনি ?" এই বলিয়া ললিত অতি ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে চলিলেন। ললিত ও রজনীকান্ত পুষ্করণী তীরে আসিয়া দেখিলেন কেহ কোথায়ও নাই। রৌদ্রে চারিদিক দগ্ধিভূত হইতেছে।

৩

রজনীকান্তের বহু বিলম্বে অসীম 'ধৈর্য্যশালী প্রফুল্লনাথেরও ধৈর্য্যচ্যুৎ হইল, তিনি সহসা লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নীরবে সেই দীর্ঘ-টিকির পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময় সহসা এক বিপর্য্যয় ব্যপার ঘটিল। দীর্ঘ-টিকি ভীমবলে হস্তস্থ ছিপ টানিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতস্থ প্রফুল্লনাথের উপর পতিত হইলেন ; দুইজনে আঘাতিত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে সেই দীর্ঘিকার কর্দ্দমাক্ত জলে ধরাশায়ী হইলেন। সেই দীর্ঘ-টিকি কর্দ্দমে আপাদমস্তক আপ্লুত হইয়া উন্মুক্ত বস্ত্রে, কম্পিত দেহে, ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "বোল্লক!" সত্যযুগ হইলে প্রফুল্লনাথ নিশ্চয়ই এই ব্রহ্ম কোপে ভস্মিভুত হইতেন, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এ কলিকাল, ভস্মিভূত হইলেন না বটে, কিন্তু পচা পুকুরের পচা পাঁকে নিমজ্জিত হইয়া জলমগ্ন হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বেল্লিক নই—বেয়াকুব বটে।"

ব্রাহ্মণ কর্দ্দমাক্ত উত্তরীয়ে মুখের কর্দ্দম অপসারিত করিতে গিয়া তাহার অপরা-পর সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করিতে ছিলেন, ইহাতে তাঁহার রাগ, তাঁহার অন্তস্থল হইতে ধূমগিরীর উত্তপ্ত খর-প্রস্রবণের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছিল, তিনি কম্পিত, রুদ্ধ-ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তু—তু—তুমি কেহে বাপু? বেয়াকুব—এমন মাছটা ছুটে গেল, আমি তোকে খড়ম পেটা করবো—বেয়াকুব বেল্লিক।"

প্রফুল্লনাথ চক্ষু কর্ণ ও মুখের কর্দ্দম কথঞ্চিত অপসারিত করিয়া বলিলেন, "মহাশয় কিছু মনে করিবেন না, আমার অবস্থা আপনার অপেক্ষা খারাপ হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "প্রফুল্ল না? তুই তুই—"

প্রফুল্লনাথ অতি দুঃখিত স্বরে বলিলেন "আমার বুড়ো ঠাকুরমা এক্ষণে আমায় দেখলে চম্‌কে উঠতেন, আপনি চিন্‌লেন কি করে?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তুই—তুই তুই এখানে? কখন এলি, কোথায় এসেছিস্?"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন,—"পণ্ডিত মহাশয় পুকুরের কাদার গন্ধে প্রাণ যায়! আগে দেহটাকে ভাল ক'রে মেজে ঘসে নিই—তারপর কথা হবে।"

৪

বহুকাল পূর্ব্বে এই ব্রাহ্মণ সার্ব্বভৌম উপাধীতে ভূষিত হইয়া কলিকাতার এক ক্ষুদ্র বাঙ্গালা স্কুলে লাষ্ট ক্লাসে সাড়ে সাত টাকা মাহিনায় পণ্ডিতি করিতেন। আর ঐ সঙ্গে সাড়ে সাতের সংখ্যা একটু বৃদ্ধি করিবার জন্য সকালে ও সন্ধ্যায় বাহিরেও একটু পণ্ডিতি করিতেন। যখন প্রফুল্লনাথ বৃদ্ধা পিতামহীর সহিত কলিকাতায় আবাস লইয়া বর্ণপরিচয়ের সহিত প্রথম পরিচয় করিতে ছিলেন, সেই সময় সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। আজ প্রফুল্লনাথ সেই বহুকালের বর্ণপরিচয় পরিত্যাগ করিয়া স্তরে স্তরে নানা স্তর অতিক্রম করিয়া আইন-কাননে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহাকে সেই পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েন নাই, বার্ষিক আদায়ে একদিনের জন্যও ত্রুটী হয় নাই। বৎসরের পর বৎসর প্রফুল্লনাথ তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকের যথাবিহিত পূজা দিয়া আসিতেছেন।

প্রফুল্লনাথ অবগাহনান্তর তীরে উঠিয়া ইস্ত্রি-বিভ্রাট সার্টে মস্তকাদি যথা সম্ভব বিশুষ্ক করিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত মহাশয়, চলুন আজ আপনার ওখানেই প্রসাদ পাইব।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় ছাত্রের জন্য একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, প্রফুল্লনাথ

বড়লোক, সে তাঁহার কুঠিরে আহার করিবে, এতো পরম সৌভাগ্য, তিনি ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "এসো বাবা এসো—এতো আমার ভাগ্য।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় অগ্রসর হইলেন, প্রফুল্লনাথ গুরুর অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর আসিবার পর কে অতি মৃদু মধুর মিষ্ট স্বরে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"দাদা, এ কি মূর্ত্তি।"

প্রফুল্লনাথ সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তিনি বিস্মিত অথচ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, পূর্ব্বে জীবনে তিনি আর এমনটী কখনও দেখেন নাই। সম্মুখে একখানি প্রকৃতই ছবি। কিন্তু বহুক্ষণ বিস্মিত হইয়া থাকিবার পাত্র প্রফুল্লনাথ নহেন, বিশেষতঃ মধুর খিল খিল অঞ্চলাবৃত হাস্যধ্বনিতে কল্পনার অমর-কানন হইতে তাঁহাকে মর জগতে আনিয়া ফেলিল। তিনি দেখিলেন সম্মুখে একটী সুন্দরী বালিকা মুখে অঞ্চল চাপিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। বালিকার বয়স প্রায় চতুর্দ্দশ, নিমিষে যতদূর বুঝিয়া লওয়া সম্ভব, সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রফুল্লনাথ বুঝিলেন, বালিকা সুন্দরী, অবিবাহিতা কুমারী, ব্রাহ্মণ কন্যা। সার্ব্বভৌম মহাশয় ভৎ´সনার স্বরে বলিলেন, "পাগলী! কোন লোকের হাস্যোদ্দীপক অবস্থা দেখিয়া হাস্য করা কর্ত্তব্য নয়। ইনি আমার ছাত্র প্রফুল্লনাথ, দৈবদুর্ব্বিপাকে জলমগ্ন হইয়াছেন। প্রফুল্ল, সুলেখা আমার দৌহিত্রী।"

বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, "দাদা ওঁকে দেখে আমি হাসছি না, তোমার একি মূর্ত্তি হয়েছে?"

বৃদ্ধ "আমার" বলিয়া প্রায় লম্ফ দিয়া উঠিলেন। একবার প্রফুল্লনাথের দিকে, একবার বালিকার দিকে চাহিলেন, ব্যাপারখানা কি ভাল উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। অপরিচিত লোক দেখিয়া বালিকা সলজ্জভাবে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "দাদা এত কাদা মাটী কোথায় মাখলে। যাও যাও শীঘ্র চান ক'রে ফেল।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় একবার প্রফুল্ল নাথের দিকে তীব্র কটাক্ষ পাত করিয়া বলিলেন "সুলেখা প্রফুল্লকে বস্ত্রাদি দাও, আমি অবগাহন করিয়া আসিতেছি।"

ব্রাহ্মণ সত্বরপদে গৃহের পশ্চাৎ দিকে ধাবমান হইলেন। প্রফুল্ল নাথের মস্তক কুণ্ডয়ন অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। পূর্ণ যৌবনা বালিকার সহিত কথোপকথন ব্যাপারে তিনি অভ্যস্থ ছিলেন না। স্ত্রীলোক দেখিলে তিনি আতঙ্কে সে স্থান অচীরে পরিত্যাগ করিতেন। অদ্য সহসা এই পল্লিগ্রামে, আম জাম কাটাল বনের ভিতর এই নারীরূপী পুষ্পের সংস্রবে আসিয়া তিনি কিং কর্ত্তব্য-

বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বালিকাও অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়াছিল। এই অপরিচিত যুবককে তাহাদের এক খানা কাপড় আনিয়া দিবে, না ইহার সহিত নিজের বস্ত্রাদি আছে, বালিকা তাহা স্থির করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরবে দণ্ডায়মান থাকিবার পর অবশেষে বালিকা অবনত মস্তকে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার সঙ্গে কাপড় আছে কি।"

প্রফুল্লনাথ ভীমবলে হৃদয়ে সাহস আনিয়া প্রায় জড়িত স্বরে বলিলেন "না?'

বালিকা সত্বর পদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল ও নিমিষ মধ্যে তাহার দাদা মহাশয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গরদের ধুতি ও উত্তরীয় আনিয়া প্রফুল্লনাথের হস্তে দিয়া, ভিতর হইতে পা ধুইবার জল ও এক জোড়া খড়ম আনিয়া দাওয়ার উপর রাখিল। একখানা গালিচা পাতিয়া দিয়া বলিল, "আপনি এইখানে বসুন, আমি আপনার জল খাবারের বন্দোবস্ত করিতে যাই, দাদা এখনই আসিবেন।"

বালিকা অন্তর্হিতা হইল। প্রফুল্ল নাথ আজ প্রথম অন্ধকার কি তাহা উপলব্ধি করিলেন, মনে মনে বলিলেন, যথার্থই সুন্দরী। তিনি বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া একবার নিজমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, মনে মনে হাসিলেন। দুগ্ধ ফেননিভ পট্টবস্ত্র পরিধান, পাট্ট বস্ত্রের উত্তরীয় স্কন্ধে, পদ যুগল খড়মে সুশোভিত, গলায় পইতাতো আছেই। প্রফুল্ল নাথ মনে মনে বলিলেন, "কপালে ফোঁটা ও মাথায় একটা লম্বা চৈতন মাত্রের অভাব।"

এই সময় দুই ব্যাক্তি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পাদ নিম্নে পতিত হইল; হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "আসুন—পাল্কি এসেছে। ষ্টেশন থেকে ছুটে আসছি। গরীবদের ক্রটী মাপ করিবেন, কর্ত্তা শুনলে আর রক্ষা রাখবেন না।"

৫

সুলেখা অতিথীর জন্ত পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে শ্বেত পাথরের সুন্দর রেকাবীতে নানাবিধ ফল মূল মিষ্টান্ন, অতি সুচারুভাবে সাজাইয়া বাম হস্তে রেকাবি-খানি ও দক্ষিণ হস্তে গেলাসে সুশীতল পরিস্কৃত জল লইয়া বাহির বাটীতে আসিল। বাহিরে জন শূন্ত, প্রফুল্লনাথ অন্তর্দ্ধান। একটু বিস্মিত ভাবে রেকাব ও জল হস্তে সুলেখা দাঁড়াইয়া চারিদিকে সলজ্জ ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, কিন্তু যতদূর দৃষ্টি চলে তাহার মধ্যে কোন স্থানে জনমানবের

কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। সে খাবার ও জল লইয়া ফিরিতে ছিল, সম্মুখে দেখিল সার্ব্বভৌম মহাশয় সিক্ত বস্ত্রে, গামছা স্কন্ধে নানারূপ শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে অগ্রসর হইতেছেন, সুলেখাকে দেখিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, বলিলেন, "তোকে বাবুর বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য পাল্কি আসিয়াছে, এখনই যা। তাঁদের গুরুঠাকুর মহাশয় এসেছেন, খাবার দাবার জোগাড় যত্ন করে দিতে হবে।" এতক্ষণে ব্রাহ্মণের নাতিনীর হস্তস্থিত মিষ্টান্নের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তিনি বলিলেন, "মিষ্টান্ন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছ কেন, প্রফুল্ল কোথায়?"

সুলেখা হাসিয়া বলিল, "দাদা, তুমি বুড়ো হয়েছ, তোমায় যত 'যোচ্চরে' ঠকায়।"

নাতিনীর এই অত্যাদ্ভুত কথার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিছুই ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "সে কি।"

সুলেখা তাহার মধুর হাসিতে চারিদিক বিকম্পিত করিয়া বলিল, "তুমি যে লোকটাকে সঙ্গে করে এনেছিলে, আমি তোমার ভাল গরদের কাপড় চাদর, হাতির দাঁতের খড়ম তাকে পরতে দিয়েছিলেম, সে সেসব নিয়ে লম্বা দিয়েছে।"

এই কথায় ব্রাহ্মণ অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত জিহ্বা দন্তে কাটিয়া চক্ষু আকর্ণ বিস্ফারিত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ও কথা মুখেও আনিও না, প্রফুল্ল বড়লোকের ছেলে, আমার ছাত্র, যা তুই বাবুদের বাড়ী, আমি তাহার অনুসন্ধান লইতেছি।"

আর মুখে আনিব না, এতক্ষণ দেখগে সে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো, এই বলিয়া সুলেখা হাসিতে হাসিতে তথা হইতে পলাইল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রিয় ছাত্র প্রফুল্লনাথের অনুসন্ধানে বাহিরের দিকে চলিলেন। বাবুর বাড়ীর দাসী ও দ্বারবান পাল্কি লইয়া দণ্ডায়মান ছিল, সুলেখা পাল্কিতে গিয়া উঠিল, পাল্কি হুঁ হুঁ শব্দে রামধন চৌধুরীর বিস্তৃত অট্টালিকার পশ্চাৎ দিকে ধাবিত হইল।

প্রফুল্লনাথ নাই, প্রফুল্লনাথ যেন সহসা বাতাসে কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিলেন, বাঁদর প্রফুল্লটার চরিত্র কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, সেই পূর্ব্বের মতই উশৃঙ্খল আছে,

নিশ্চয়ই একটু কৌতুক করিবার জন্য এই খানেই কোথাও লুকাইয়া আছে। বৃদ্ধ নিচু হইয়া আম জাম কাঁটালের ঝোপের মধ্যে প্রিয় শিষ্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "পণ্ডিত মহাশয় কি খুজিতেছেন ছাগল নাকি?" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ফিরিয়া দেখিলেন; স্বয়ং জমিদার পুত্র ললিত কুমার তাঁহার দ্বারে উপস্থিত। তাঁহার সঙ্গে একটা সম বয়স্ক যুবক, পশ্চাতে বহু লোক জন। বৃদ্ধ সহাস্য বদনে হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন, "চেহারায় নয়,—বুদ্ধিতে বটে।"

ললিত কুমার হাসিয়া বলিলেন, "সে কি রকম?"

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন, "আমার একটী ছাত্র আজ আমার এখানে আসিয়াছে, বড় লোকেব ছেলে, দুষ্টামিতে পরিপক্ক এখনও কিছুমাত্র তাহার চরিত্রের কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আমার নাতিনী সুলেখা বলিতেছে সে আমার উৎকৃষ্ট গরদের ধুতি, চাদর ও হাতির দাতের খড়ম লইয়া লম্বা দিয়াছে;—না। প্রফুল্ল নাথের এতদূর অধঃপতন হইতে পারে না!"

রজনীকান্ত অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন প্রফুল্লনাথ। সে আপনার ছাত্র, আপনি তাঁহাকে কোথায় পেলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কোথায় পাইলাম! দীঘির ধারে পাইলাম। আমার আধ মোনি রোহিতটা গোল করিয়া দিয়াছে। সে পেছনে দাঁড়াইয়া ছিল দেখিতে পাই নাই, টান মারিয়া মাছটা বড়সিতে গাঁথিলাম, আর বেল্লিকের উপর গিয়া পড়িলাম।"

এই সময় একজন পাইক ছুটিয়া আসিয়া সেলাম দিয়া বলিল, কর্ত্তা তলব দিয়াছেন, গুরু ঠাকুর মহাশয় আসিয়া পৌছিয়া গিয়াছেন।

এখন কি করা কর্ত্তব্য। ললিত কুমার বন্ধুর দিকে চাহিলেন। রজনী কান্ত বলিলেন, "ভাই তুমি বাড়ী যাও, আমি প্রফুল্লের সন্ধান করিয়া এখনই ফিরিতেছি।"

এই সময় একজন বৃদ্ধ কৃষক আসিয়া জমিদার পুত্রকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "একজন গোঁসাই ঠাকুর এইখানে বেড়াইতে ছিলেন, রাজ বাড়ীর পাল্কি এসে তাঁকে নিয়ে গেছে।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় সবেগে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার কি কাপড় পরা ছিল।

কৃষক বলিল, "ভাল গরদের কাপড় চাদর, পায়ে খড়ম।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় বিস্ময়ে ভয়াবহ ভাবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "সেই বটে ; রাজবাড়ীর পাল্কিতে গেছে, সে কি ! কি একটা বিপদ না জানি ঘটাইল।"

ললিত কুমার আবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "পণ্ডিত মহাশয় আজ এদেশে বড়ই ভুল চুকের প্রকোপ পড়িয়াছে। আমাদের গুরু ঠাকুর মহাশয়ের আজ আসিবার কথা ছিল, তাঁহাকে আনিবার জন্য পাল্কি ষ্টেসনে গিয়া ছিল। বোধ হয় বেহারারা ভুল ক্রমে প্রফুল্ল বাবুকে গুরুঠাকুর ভাবিয়া পাল্কিতে লইয়া গিয়াছে।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় অতি রাগের স্বরে বলিলেন, "আর সেই মূর্খটা কোন কথা না বলিয়া পাল্কি চড়িয়া গেল। সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে কৌতুক ! কর্ত্তা শুনিলে আর রক্ষা রাখিবেন না।"

কর্ত্তার কথা উত্থিত হওয়ায় ললিতকুমারও একটু চিন্তিত হইলেন। যদি প্রফুল্লনাথ যথার্থই এ কৌতুক করিয়া গুরু সাজিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতা বিশেষ বিরক্ত ও রাগত হইবেন ! তিনি রজনীকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "প্রফুল্ল বাবু কি যথার্থই এ কৌতুক করিবেন !"

রজনী কান্ত জানিতেন প্রফুল্লনাথের কিছুই অসাধ্য নাই। তিনি মনে মনে বুঝিলেন প্রফুল্লনাথ একটা ভয়াবহ বিপর্য্যায় ঘটাইয়াছে, প্রকাশ্যে বলিলেন "ভাই কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, এখানে আসিয়া সকলি অদ্ভুত দেখিতেছি।"

৬

চৌধুরী মহশয়ের ঠাকুর বাড়ীর সুন্দর উদ্যান মধ্যে একটি সুন্দর অট্টালিকা ছিল। গুরু ঠাকুর প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তি আগমন করিলে, তাঁহার এই বাড়ীতেই বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইত, আজ প্রফুল্লনাথ মহা সমারহে এই অট্টালিকায় নীত হইয়াছেন। সুন্দর গালিচায় তিনি উপবিষ্ট, চারিদিকেই বহু লোকের সমাগম। জমিদারের গুরু ঠাকুর মহাশয় আসিয়াছেন শুনিয়া চৌধুরী মহাশয়ের জ্ঞাতি কুটুম্ব ললনাগণ অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া ঠাকুর বাড়ীতে ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়াছে। প্রফুল্লনাথ অবিচলিত, তিনি নীরবে বসিয়া মনে মনে গবেষণা করিতেছেন, "গুরুগিরি কখনও করা হয় নাই, এ ব্যবসায়ের পর্য্যায় সকল আদৌ তাঁহার অভ্যস্ত নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের কল্যাণে বেশভূষা সম্বন্ধে কোন ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে না, তবে বুলি আয়ত্ত নাই,

এ ঘোর শঙ্কটে নীরব বাক্যহীন থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। চৌধুরী গৃহিণী লাল বারানসী শাড়ীতে ভূষিতা হইয়া গুরুঠাকুর মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন, কন্যাও লাল বহুমূল্যের একখানি বারানসী পরিয়াছে। ইনিই যে ললিতকুমারের জননী ও ইনিই যে ললিতকুমারের ভগিনী ইহা বুঝিবার বুদ্ধি প্রফুল্লনাথের সুতীক্ষ্ণ মস্তিস্কে যথেষ্টই ছিল। ইহাদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ও আবশ্যক তাঁহার আইন প্রপীড়িত মস্তিস্কে তাহা প্রবেশাধিকার পাইল না। তিনি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। চৌধুরী গৃহিণী গললগ্ন কৃতবাসে গুরুঠাকুর মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন. কন্যাও জননীর অনুসরণ করিল। প্রফুল্লনাথ একেবারে লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন "করেণ কি—করেণ কি!

চৌধুরী গৃহিণী অতি বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গুরুঠাকুর মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, গুরুঠাকুর মহাশয়ের বিস্ফারিত চক্ষু, প্রসারিত হস্ত অর্দ্ধ বহিস্কৃত জিহ্বা দেখিয়া চৌধুরী কন্যা অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিল। এই সময় সুলেখা তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। সে গুরু ঠাকুরকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার বিস্ময় পূর্ণ মুখ দেখিয়া চৌধুরী কন্যা বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে চাহিল। সুলেখা তাহাকে টানিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া কাণে কাণে বলিল, "জুয়াচোর।"

চৌধুরী কন্যা প্রায় উচ্চস্বরে বলিয়া ফেলিয়াছিল "জুয়াচোর!" কিন্তু সে কষ্টে আত্মসংযম করিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য সুলেখাকে লইয়া পার্শ্বের গৃহে পলাইল। চৌধুরী গৃহিণী কন্যা ও সুলেখার দিকে চাহিয়া ভ্রুকুটি করিলেন। প্রফুল্লনাথ নীরব নিস্পন্দ। তাহার ভাব দেখিয়া চৌধুরী গৃহীণী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছিলেন, এই সময় কন্যার আহ্বানে তিনি ধীরে ধীরে পার্শ্বের গৃহে প্রস্থান করিলেন।

প্রফুল্লনাথ একবার নিমিষে চোরের ন্যায় চারিদিকে চাহিলেন। সুলেখা আসিয়া তাহার বৃত্তান্ত চৌধুরী কন্যার নিকট রং চড়াইয়া বর্ণিত করিয়াছে তাহা বুঝিতে তাঁহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। এখনই সেই অত্যাশ্চর্য্য বিবরণ যে চৌধুরী গৃহিণীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে, তাহাও উপলব্ধি করিতে তাঁহার অধিক ক্লেশ পাইতে হইল না; গুরুগিরী যে চূড়ান্ত হইয়া শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে তাহা তিনি বেশ বুঝিলেন। এক্ষণে লম্বা দেওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই, কিন্তু পট্টবস্ত্রে, খড়ম পায়ে লম্বা দেওয়া কার্য্যে তিনি

অভ্যস্ত ছিলেন না ; বিশেষতঃ শত্রুপুরী, বহু কালো কালো দীর্ঘ লাঠীহস্তে লাঠিয়ালে পরিপূর্ণ, সুতরাং নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া স্থির থাকাই যুক্তি। শুনিলেন পার্শ্ববর্তী গৃহে চৌধুরী গৃহিণী বলিতেছেন,"পাগল আর কি। সুলেখা মৃদুস্বরে বলিতেছে, "দাদার কাপড় এখনও পরে আছে। প্রফুল্লনাথ মনে মনে বলিলেন, এই ছুঁড়ীর গলা টিপিয়া একটা নর হত্যায় কি পাপ হইবে ?

এই সময় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তৎপশ্চাতে ললিত ও রজনীকান্ত ; তৎপশ্চাতে প্রায় সমস্ত গ্রামবাসী। সকলে প্রফুল্লনাথকে অবিচলিত ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন "প্রফুল্লনাথ, বাপু তোমার চরিত্র বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই !"

প্রফুল্লনাথ বিনীত ভাবে বলিলেন, "কেন পণ্ডিত মহাশয় ?"

রজনী কান্তের মুখ রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছিল, প্রফুল্লনাথ চিরকালই কৌতুক প্রিয়, কিন্তু অপরিচিত স্থানে এরূপ ভয়াবহ কৌতুক করা কি উচিত ! চৌধুরী মহাশয় কি ভাবিবেন, ললিত কি মনে করিবে। রজনীকান্ত প্রকৃতই মরমে মরিয়া গেলেন। প্রফুল্লনাথের "কেন" শুনিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতে লাগিল, তিনি বলিলেন,"এই কি কৌতুক করিবার স্থান, কর্ত্তা শুনলে আর রক্ষা রাখবেন না,—উঠে আয় বানর !

প্রফুল্লনাথ অবিচলিত ভাবে বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয় কৌতুক বুঝিলেন কিসে ?" এই সময় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার চির পারিষদ বৃদ্ধ জনার্দ্দন শর্ম্মার সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরু গৃহে বৃদ্ধ জনার্দ্দন শর্ম্মাই বৎসরে একবার করিয়া গিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়া আসিতেন, সুতরাং নূতন গুরুকে কেবল জনার্দ্দন শর্ম্মাই চিনিতেন। তিনি প্রফুল্লনাথকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে ভায়া এসেছ। আমরা তো মনে করে ছিলেম, তোমার পদধূলি আর এ বাড়ীতে পড়লো না।"

এই কথায় সকলে স্তম্ভিত, চৌধুরী মহাশয় ভক্তিভরে প্রফুল্লনাথকে প্রণাম করিলেন প্রফুল্লনাথ মৃদু হাস্য করিয়া বঙ্কিম নেত্রে সুলেখার দিকে চাহিলেন, সে দূরে দ্বার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার মুখ লাল হইয়া চারিদিকে এক অপরূপ শোভা বিস্তার করিয়াছে। প্রফুল্লনাথ কিয়ৎক্ষণ

মস্তক কুণ্ডয়নে নিযুক্ত হইয়া হেটমুণ্ডে বলিলেন, "আমার বোধ হয় দু এক কথা বলা আবশ্যক। রজনীকান্ত আমার বন্ধু, ললিতকুমার বাবু তাহার বন্ধু, সুতরাং জ্যামিতীর হিসাবে আমারও বন্ধু। রজনীকান্ত একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে, সে যখন আমাকে কন্যা দেখিবার জন্য ললিত কুমার বাবুর বাটী যাইতে অনুরোধ করে, তখন আমি শিশুগৃহে যাইতেছি জানিতাম না, হঠাৎ মনে পড়িল, তাই আপনাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, রজনী কান্তকে কিছুই বলি নাই, তাহাকে একটু আশ্চর্য্যান্বিত করিবার ইচ্ছা ছিল, বোধ হয় এ কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছি!"

জনার্দ্দন শর্ম্মা বলিলেন, "ও সকল আমরা রজনীকান্ত বাবুর আগেই জানিয়াছিলাম। কেবল তুমি যে আমাদের সেই গুরুঠাকুর প্রফুল্লনাথ এইটুকু জানা ছিল না। যাহা হউক ভায়া সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নাতিনী সুলেখা তোমারই উপযুক্ত, আমরা সকলে জোর করিয়া তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব।"

সকলে মিলিয়া তখন প্রফুল্লনাথকে অনুরোধ-বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, সকলের অনুরোধে বাধ্য হইয়া প্রফুল্লনাথ সুলেখাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং হেটমুণ্ডে অবনত মস্তকে অতি মৃদু স্বরে বলিলেন "কাজেই।"

ললিতকুমারের ভগিনী সুলেখার কাণে কাণে বলিল "তোর বর জুয়াচোর" সুলেখা মৃদু হাসিয়া তাহাকে একটি কিল মারিল।

রজনীকান্ত আশ্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, যাহা হউক তবু শেষ রক্ষা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

গল্পলহরী

২য় বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩২০ | ৫ম সংখ্যা

গুপ্তধন।

নরহরি পাল হাটখোলার একজন বড় লোক, কিন্তু প্রাতঃকালে সে অঞ্চলের কোন লোক তার নাম মুখে আনতো না,—ভয় সেদিন তাহার আহার না জোটে; লোকের এমনি বিশ্বাস ছিল বটে, আমরা কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে জানি যে এমন ব্যাপার কোনও দিন ঘটে নাই। নরহরি কৃপণ হইলেও তার বাড়ী দেখিলে কাহারও সে ধারণা হ'তনা। সে তার অতুল ধনরত্ন রক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার অট্টালিকার সর্ব্বাংশে বিপদজ্ঞাপা ঘণ্টাবলী (alarm bell) স্থাপিত করিয়াছিল। বাড়ী খুব ছোট না হইলেও, বাড়ীতে তেমন লোকজন ছিল না। নরহরি বাবু বিপত্নীক, তাঁর সন্তান-সন্ততি নাই, এক উড়ে বামুন ও এক বাঙ্গালী চাকর ভিন্ন তার সংসারে আর কেহ থাকিত না। নরহরির সুশীলানাম্নী এক ভাগ্নী ছিল, সে চন্দননগরে থাকিত, তার স্বামীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। যদিও ঐ ভাগ্নী ছাড়া নরহরির এই অতুল বিষয়ের কেহ দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী ছিলনা, তবু তার আপদে বিপদে শত কাকুতি মিনতি প্রার্থনা সত্ত্বেও নরহরির নিকট সুশীলা কখনও এক কপর্দ্দক সাহায্য পায় নাই।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে সুশীলার স্বামী কঠিন রোগাক্রান্ত হইলে, সুশীলা এক হৃদয়বিদারক পত্র মামাকে লিখিয়াছিল; যে দিন সে পত্র নরহরি পায়, সেদিন তার একজন দেনদার তার ঋণের আসল ও সুদের টাকা পরিশোধ করিতে আসিয়াছিল। বেচারা ৫০৫৲ টাকা সুদের মধ্যে ৫টী টাকা রেহাই দিতে বলায় নরহরি বলে যে ঐ ৫৲ টাকা সে সেদিন কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না, কারণ তার কোন আত্মীয়কে ঐ ৫৲ টাকা সাহায্য পাঠাইতে হইবে; তার নিজের টাকা হইতে সে এরকম সাহায্য করিতে নিতান্ত অপারগ না হইলেও, একান্ত অনিচ্ছুক।

হলকামরাটী নরহরির ড্রয়িংরুম ছিল। ড্রয়িংরুম বলিলে সাধারণতঃ যে রকম হালফ্যাসানের সাজান ঘর বোঝায়, নরহরির ঘরটীতে সেরূপ কোন সৌখিন আসবাব ছিল না। ঘরের মেজেতে একখানি পুরাতন সতরঞ্চ পাতা থাকিত, মাঝখানে একটী পুরান সেক্রেটেরিয়াট টেবিল ও দুইখানি হাত ভাঙ্গা চেয়ার ও উত্তর দিকের দেওয়ালে একটী বড় বুককেস (আলমারী) ছিল, তাতে অনেক গুলো ভাল ভাল বাঁধান বই ছিল। নরহরি বাবু তার এক খাতকের তমসুকের টাকার দায়ে আলমারী ছাড়া অন্যান্য আসবাবপত্র নিলামের সময় দুই টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছিলেন। ঐ জিনিস কয়টী নিলামে উঠিলে তাদের তৎকালিক অবস্থা দেখিয়া কেহই ডাকে নাই, সুতরাং নরহরি বাবু দয়া করিয়া যা দাম দিয়াছিলেন তাহাতেই তাহা বিক্রীত হইয়াছিল। সেক্রেটেরিয়েট টেবিলটীর দুইটী পায়া ছিলনা, বনাতটিতে শত ছিদ্র বর্ত্তমান, আর তাতে ড্রয়ার একটীও ছিলনা। সতরঞ্চখানি খরিদ করিয়া রিপুকর্ম্ম করায়, গরম কাপড়ের নমুনা জোড়া দেওয়া কোটের মত দেখাইতে ছিল। এ রকম আসবাব থাকিলেও নরহরি ঘরখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিত, সন্ধ্যার সময় ঘরে রীতিমত সন্ধ্যা দেওয়াইত, ধুনা গুগ্‌গুল জ্বালাইত ও যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিত নরহরি প্রায় ঐ ঘরখানিতেই বসিয়া থাকিত ও মাঝে মাঝে আলমারীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত।

সুদের টাকা পাইলে, কিম্বা কোন পাওনাদার তার দেয়টাকা পরিশোধ করিয়া যাইলে, বৃদ্ধ নরহরি সেই টাকা লইয়া অতি সন্তর্পণে তার হলকামরায় ঢুকিত ও ঘরের মধ্যে কেহ আছে কি না নিরীক্ষণ করিয়া দরজা জানালাগুলি ভিতর হইতে বন্ধ করিত, তারপর বুককেসের নিকট গিয়া একটী স্প্রীং টিপিত। বুককেসটী যে সমান দুইভাগে অদৃশ্যভাবে বিভক্ত ছিল তাহা কেবল স্প্রীংটি টিপিলেই বোঝা যাইত, কারণ একদিকের অর্দ্ধেক অংশটী তৎক্ষণাৎ ঘরের মেজের নীচে নিঃশব্দে নামিয়া যাইত ও আলমারীর পশ্চাতে একটী গুপ্তদ্বার বাহির হইত। সেই গুপ্তদ্বারের গায়ে অন্য একটী স্প্রীং ছিল, সেটী টিপিবামাত্র দরজাটি খুলিয়া যাইত; নরহরি তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া তথায় স্থাপিত বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আর একটী স্প্রীং টিপিলে সেই গুপ্তঘরের মেজের ভিতর হইতে একটী সিন্দুক উপরে উঠিয়া আসিত। সিন্দুকটী খুলিবারও একটী অভিনব কৌশল ছিল, সিন্দুক খুলিয়া নরহরি একবার তার অতিকষ্ট-সঞ্চিত অর্থরাশি প্রাণ ভরিয়া দেখিত ও মা লক্ষ্মীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া হস্তস্থিত অর্থ সিন্দুকে রাখিয়া কলটী টিপিয়া সিন্দুক বন্ধ করিত।

তারপর পূর্ব্বকথিত স্প্রীংগুলি টিপিয়া টিপিয়া নরহরি হলকামরায় আলমারীর অর্দ্ধেকাংশটী যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া একবার সন্দিগ্ধচিত্তে চারিদিক চাহিয়া দেখিত, কারণ কেহ তার এই গুপ্তগৃহের গুপ্তসিন্দুকের সন্ধান পাইলে তার সর্ব্বনাশ হইবে।

শামা নরহরির পুরান চাকর, সে তার মনিবের চালচলন জানে, যাতে তার মনে কোন রকম সন্দেহ হয় এমন কাজ সে প্রায় করিত না। সে অনেক দিনের পুরান চাকর হইলেও জানিত না যে নরহরি একজন ধনকুবের; সে এইমাত্র জানিত যে কৃপণ নরহরির কিছু নগদ টাকা আছে, কিন্তু সমস্ত বাড়ীতে টাকা রাখবার মত একটী সিন্দুক প্যাটরা শামা কোথাও দেখিতে পাইত না, তাই সে মনে করিত যে নরহরি টাকা বাইরে কোথাও রাখে; কিন্তু যখন এক একদিন হলকামরা বন্ধ ক'রে নরহরি সেই ঘরে ১০।১৫ মিনিট থাকিত তখন শামার কেমন একটা সন্দেহ হ'ত, ও নরহরি সেখানে কি করে জানবার জন্য তার কৌতূহল ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। একদিন নরহরি বাইরে গেছে, শামা জান্‌তো যে সেদিন তার ফিরতে ৫।৬ ঘণ্টা দেরী হ'বে, বামুনঠাকুরও ছুটি পেয়ে তার ইয়ার বন্ধুদের বাসায় একটু খোস-গল্প করতে গিয়েছে। শামা সেই অবসরে একটি তিরপুন (ছিদ্রকরার যন্ত্র) এনে হলকামরার সামনের দরজায় ছিদ্র করলে ও সেই ছিদ্র দিয়ে ঘরে কোন লোকে কিছু করলে বেশ দেখা যায় দেখে, একটি কাটের ছিপি দিয়ে সেটি বন্ধ করলে। ছিপিটা এমন ভাবে বন্ধ করলে যে যখন ইচ্ছা সেটি সহজে ও নিঃশব্দে খোলা যায়। দরজায় যে রং দেওয়া ছিল, সেই রং একটু সেই ছিপিটার উপর মাখিয়ে দিলে, সুতরাং খুব লক্ষ্য করে না দেখলে দরজায় যে একটি নূতন কাণ্ড করা হয়েছে তা সহজে দেখা যেতনা।

কিছু দিন পরে একদিন নরহরি হলকামরার দরজা বন্ধ করলে পর, শামা নিঃশব্দে দরজার কাছে এসে আস্তে আস্তে ছিপিটা খুলে দেখলে যে একটি স্প্রীং টিপিবা মাত্র হলঘরের বুককেসের অর্দ্ধেকটা যেন ভূগর্ভে নেবে গেল, এই কাণ্ড দেখে শামা একবারে অবাক; তারপর কি হয় দেখবার জন্য সে ব্যাকুলনেত্রে চেয়ে রইলো। আর একটি স্প্রীং টেপা, আর গুপ্তঘরের দরজা খুলে যাওয়া, তারপর একটি সুইচ্ নাবিয়ে দেওয়ায় সেই গুপ্তকক্ষটি বৈদ্যুতিক আলোতে উদ্ভাসিত হইল ও সেই আলোকে শামা দেখিল যে আর একটি কি উপায়ে একটি সিন্দুক যেন যাদুবিদ্যা প্রভাবে নিম্নদেশ হইতে উত্থিত হইল, তারপর

আসুন পাঠক পাঠিকা! আমরা একবার বেচারা শামের অবস্থা দেখি। সে ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলেই বরাবর আছে, কামারের কাজ করে। একদিন তার সঙ্গীকয়েদী যদু কথায় কথায় কি অপরাধে শামের জেল হইল জিজ্ঞাসা করায় শাম আনুপূর্ব্বিক সেই দিনের ঘটনা বর্ণনা করিল। কথা প্রসঙ্গে নরহরি পালের গুপ্তআলমারী, গুপ্তদ্বার ও গুপ্তসিন্দুকের কৌশলাদিও সব যদুকে বলিল এবং সে বড় কৌতূহল চিত্তে এই বর্ণনা গুলি শুনিল ও স্মরণ করিয়া রাখিল। কিছু দিন পরে যখন একদল কয়েদী কলিকাতা সেণ্ট্রাল জেলে বদলী হইয়া আসিতেছিল সেই সঙ্গে যদুরও বদলী হইল, কিন্তু যে ট্রেনে কয়েদীরা আসিতেছিল সেই ট্রেণের সহিত পিরপৈন্তির নিকট একখানি মালগাড়ীর ভীষণ সংঘর্ষণ হয় ও তাহাতে প্যাসেঞ্জার গাড়ীর প্রায় অধিকাংশ লোক মারা যায়। যে গাড়ীতে কয়েদী ও ওয়ার্ডার ছিল সে গাড়িতে যদু ছাড়া আর সকলেই মারা যায়, যদু একটু আধটু আঘাত পাইয়াছিল মাত্র। সে ওয়ার্ডারের পকেট হইতে চাবী লইয়া হাত কড়ি খুলিয়া ফেলিল ও গোলমালে কোনরকমে কয়েদীর পোষাক খুলিয়া মৃত একজন যাত্রীর কাপড় পরিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। ২।৩ দিনের রাস্তা চলিয়া আসিয়া সে ভিক্ষা আরম্ভ করিল ও ভিক্ষালব্ধ অর্থে রেলে উঠিয়া কলিকাতায় আসিল। রেল দুর্ঘটনায় সব কয়েদী মারা গিয়াছে বিশ্বাস হওয়ায় যদুর জন্য আর সরকারবাহাদুর হইতে কোন খোঁজ খবর হয় নাই।

কলিকাতায় আসিয়া যদু হাটখোলার নরহরি পালের বাড়ীর সন্ধান করিল ও সুশীলাদের আর্থিক অবস্থা দেখিয়া বুঝিল যে গুপ্তধনের সন্ধান তারা পায় নাই, তার প্রাণে অর্থের দারুণলালসা জাগিয়া উঠিল, সে সন্ধান লইল, যে ঘরের আলমারী আছে সে ঘরে সুশীলারা থাকে না। পরদিবস গভীরনিশীথে যদু তার যন্ত্রাদির সাহায্যে আস্তে আস্তে হলকামরায় প্রবেশ করিল ও আলমারীর মাথার স্প্রীং টিপিবা মাত্র অর্দ্ধেক আলমারীটি নিঃশব্দে নামিয়া গেল, তখন শামের কথা যে সত্য তার স্থিরবিশ্বাস হইল, বাতি জ্বালিয়া যদু গুপ্তদ্বার দেখিল ও সেটিও স্প্রীংএর সাহায্যে খুলিল; গুপ্তঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া যদুর ভয় হইল যে পাছে কেহ আলো দেখিয়া সেই ঘরে আসে সেজন্য সে স্প্রীং টিপিয়া গুপ্তদ্বারের দরজা বন্ধ করিল ও সেই দরজা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে আলমারীও যথাস্থানে উত্থিত হইল। তখন আলো লইয়া সিন্দুক উঠাইবার স্প্রীংটি টিপিল এ

একটি প্রকাণ্ড সিন্দুক যেন ভূগর্ভ হইতে উঠিল, যদুর তখন আনন্দ দেখে কে! সিন্দুকটি কি উপায়ে খুলিতে হয় তা শাম যদুকে বলে নাই, তবে সে ভাবিল যে এক বার টানাটানি করে দেখি খোলে কি না, যদি না খোলে কলকব্জা যন্ত্রের সাহায্যে কেটে ফেলবো এই ভেবে যেমন যদু হ্যাণ্ডেল ধরে সিন্দুক খুলতে যাবে অমনি সিন্দুকের পাশ হইতে দুটি স্প্রীংএর হাত যদুকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, যদু যতই তাদের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করে তারা ততই নির্দ্দয়ভাবে তাকে পেষণ করিতে লাগিল, শেষে এমন হইল যে যদু আর নিশ্বাস ফেলিতে পারেনা, চীৎকার করিয়া যে কাহাকেও ডাকিয়া সাহায্য চাইবে সে উপায়ও নাই। প্রায় ঘণ্টা খানেক টানাটানির পর বেচারী যদুর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এ ঘটনা নরহরি পালের মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে ঘটে। সুশীলার দেনা তখন সুদে আসলে অনেক টাকা হইয়াছে ও চতুর্ভুজ তাগাদার উপর তাগাদা আরম্ভ করিয়াছে, কারণ আর কিছুদিন হইলে বাড়ীর দাম হইতে ঐ টাকা পরিশোধ হইবে না। একদিন সুশীলার নিকট চতুর্ভুজ এসে বলিল, যে যদি একমাস মধ্যে তার টাকা সুদে আসলে পরিশোধ করা না হয়, তবে সে নালিশ করিবে। সুশীলা কোথায় অত টাকা পাইবে, সুতরাং যথা সময়ে চতুর্ভুজ নালিশ করে ডিক্রী করিল ও নীলামে বাড়ীখানি প্রাপ্য টাকায় খরিদ করিয়া লইল। ইহার কয়েক মাস পরে একদিন চতুর্ভুজ আসিয়া সুশীলাকে বলিল যে তাকে ঐ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে, কারণ ঐ বাড়ী মেরামত করে সে কার্ত্তিকের বসবাসের জন্য দিবে। কার্ত্তিক সেবার বি, এল, পাশ করেছে, ওকালতী করিবে; তাদের বসতবাটীখানি ছোট, সেখানে বাস করলে উকিলের পশার ভাল জমবে না মনে করে চতুর্ভুজ নরহরির বাটীতে এসে বাস করবার মনস্থ করেছে। যখন এই প্রস্তাব সুশীলার কাছে হইতেছিল তখন পার্শ্বের ঘরে কার্ত্তিক ও মাধবী তাদের সুখ-স্বপ্নে বিভোর। কার্ত্তিক বলিতেছে দেখ মাধবী! এবার আমি ওকালতী পাশ করেছি, বাবা আমার বিবাহ দিবেন ও সে প্রস্তাব উত্থাপন করিলেই তোমার সঙ্গে যদি বিবাহ হয় তবেই আমি বিবাহ করিব এই কথা জানাইলে পিতা বোধ হয় স্বীকৃত হইবেন। মা তোমায় খুব ভালবাসবেন ও তাঁর একান্ত ইচ্ছা তুমি তাঁর পুত্রবধু হও, তবে কেন তুমি ভাবছো মাধবী যে আমাদের এ মিলনে বাধা পড়বে! মাধবী বল্লে তুমি ত বোঝনা যে আমরা দরিদ্র, আমার সঙ্গে বিবাহ হ'লে তোমায় ত মা কিছু দিতে পারবেন না, তুমি আমাদের জাতির এক উজ্জ্বল রত্ন, বড় বড়

লোক কত অর্থ যৌতুক দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করে কৃতার্থ হ'বে, না কার্ত্তিক, কেন তুমি আমার হৃদয়ে এ দুরাশা জাগাচ্ছ। তাদের এই কথোপকথনের মধ্যে সুশীলার অস্পষ্ট ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইয়া তারা ছুটিয়া আসিল, তখন সুশীলা চতুর্ভুজ বাবু যা বলিয়া গেলেন তা সব কার্ত্তিক ও মাধবীকে বলিলেন। কার্ত্তিক বলিল মা ভয় নাই, আপনাদের বাড়ী ত্যাগ করতে হবেনা, আমি তার ব্যবস্থা করবো।

যখন কার্ত্তিকের মা তার বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন তখন কার্ত্তিক বলিল যে যদি মাধবীর সহিত আমার বিবাহ দাও তবেই বিবাহ করিব, নতুবা আমি চিরকুমার থাকিব। কার্ত্তিক-জননী সেই কথা কর্ত্তাকে বলিলেন, চতুর্ভুজ রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পুত্রকে ডাকাইলেন ও বলিলেন যে দরিদ্রা সুশীলার কন্যাকে বিবাহ করিলে তাঁর আর্থিক ও সামাজিক দুই বিষয়েই ক্ষতি হইবে। আর্থিক ক্ষতি, প্রথমতঃ এ বিবাহে এক পয়সা পাবার আশা নাই, উপরান্ত সুশীলার সহিত এ সম্বন্ধ হইলে তাকে বাড়ী হইতে তাড়ান দুষ্কর হইবে, আর সামাজিক ক্ষতি এই জন্যে, কার্ত্তিকের অন্যত্র বিবাহে একটা বড় ঘরের সহিত তাদের কুটুম্বিতা হইবে, এ বিবাহে তার কোন আশা নাই, কারণ সুশীলার কোনবংশে কেউ বড় লোক নয়। কার্ত্তিক পিতাকে অনেক বুঝাইল যে অর্থ সঙ্গে আসে না, সঙ্গে যাবে না, বড় ঘরে বিবাহ করিয়া অর্থ লইলেও কালপ্রভাবে অদৃষ্টবৈগুণ্যে অনাহারে মরাও আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু চতুর্ভুজ জগতে টাকাই সার বুঝিয়াছেন, কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না ও পাছে সুশীলারা বেশীদিন থাকিলে ছেলে বেহাত হয়ে যায় এই ভয়ে পরদিনই সুশীলাদের বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

সুশীলারা ঐ পাড়ায় একখানি খোলার ঘরে আশ্রয় লইল, কার্ত্তিক তাদের যতদূর সম্ভব আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য করিতে লাগিল। ঠিক ঐ সময় আমাদের মহামান্য শ্রদ্ধেয় রাজকুমার প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ এ দেশে আসার জন্য অনেক কয়েদী মুক্তি পায়। আমাদের শাম জেলখানায় তার আদর্শ সদ্ব্যবহারের জন্য ও জেলারের বাসায় আগুন লাগিলে তার নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়া জেলার সাহেবের কন্যাকে বাঁচানয় সাহেব তার মুক্তির জন্য বিশেষ করিয়া সরকার বাহাদুরকে লেখেন, শামের তখনও প্রায় ৫ বৎসর কাল মেয়াদ বাকী ছিল তবুও উপরোক্ত কারণে সেও এ আনন্দের দিনে মুক্তি পাইল।

মুক্তি পাবামাত্রেই জেলার সাহেবকে তার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া শাম কলিকাতা ছুটিল, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য প্রাণ তখন বড় ব্যাকুল। বাড়ী আসিয়া সুশীলাদের দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিল, সুশীলার সহিত দেখা করিয়া

"না কার্তিক, কেন তুমি আমার হৃদয়ে এ দুরাশা যাগাচ্ছ" গুপ্তধন।

[illegible] প্রেস, কলিকাতা।

নরহরির গুপ্তধনের কোন সন্ধান পাইয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিল, সুশীলা নিজের অবস্থা দেখাইয়া সে কথার উত্তর দিল। শামের প্রাণ তাদের কষ্টে বড় কাঁদিল। বিশেষতঃ যখন শুনিল যে অর্থপিশাচ চতুর্ভুজ শুধু টাকার জন্য মাধবীর সহিত কার্ত্তিকের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হয় নাই ও পরে এই বাড়ীতে ওরা থাকিলে কার্ত্তিক তাদের অনুগত হইয়া যায়, এই ভয়ে তাদের তাড়াইয়া দিয়াছে তখন রাগে তার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। সে সুশীলাকে বলিল, মা, তোমার কোন চিন্তা নাই তোমার যে গুপ্তধন আছে তাহা পাইলে কলিকাতায় তোমার সমকক্ষ বড় লোক মিলিবে না, কোথায় কি ভাবে সে গুপ্তধন আছে আমি তা জানি এই তোমায় বলিতেছি শুন। সুশীলা ও মাধবী কৌতূহলচিত্তে ও একাগ্রমনে শামের কথা শুনিতে লাগিল, তখন শাম কোথায় কি ভাবে গুপ্তধন আছে ও তাহা কি উপায়ে পাওয়া যাবে বিস্তারিত বর্ণনা করিল। তারপর বলিল, বাড়ী যখন চতুর্ভুজের দখলে তখন পুলিশ কি ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্য ব্যতিরেকে সে বাড়ীতে ওরা যেতে পারবে না ও গুপ্তধনে দখল পাবে না অতএব সেই তদ্বিরে সে চলিল। বৈকালে সব যোগাড় যন্ত্র করে কাল আসবে। বিকালে এই সব কথাবার্ত্তা হয় ও শাম চলে গেলে সন্ধ্যায় যখন কার্ত্তিক মাধবীদের খবর নিতে এল, তখন মাধবী বালিকাসুলভ চপলতাবশতঃ যে সমস্ত বিষয় শামের কাছে শুনেছিল তাহা আনুপূর্ব্বিক কার্ত্তিককে বলিল। মাধবীদের এই ভাগ্যোদয়ের কথা শুনিয়া কার্ত্তিকের আনন্দাশ্রু বহিল। সেই রাত্রে বাড়ী গিয়ে পিতাকে ঈর্ষানলে দগ্ধ করিবার জন্য কার্ত্তিক সুশীলাদের অবস্থাপরিবর্ত্তনের কথা বলিল ও ইচ্ছা করিলে এবার তারা তাদের প্রতি অপমানের ও অবজ্ঞার প্রতিশোধ লইতে পারে জানাইয়া পিতাকে একটু শাসাইল। সংসারে অনভিজ্ঞতা বশতঃ ও তর্ক স্থলে কথায় কথায় উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কার্ত্তিকও কোথায় কি ভাবে গুপ্তধন আছে ও পাওয়া যাইবে সে সংবাদ পিতাকে বলিয়াছিল।

কার্ত্তিকেরা তখন নরহরি পালের বাড়ীতে বাস করিতে যায় নাই, চতুর্ভুজ রাত্রে শুইয়া শুইয়া ভাবিল যে, কাল সকালে নিশ্চয় সুশীলারা পুলিশ লইয়া আসিয়া গুপ্তধন দখল করিবে, তবে সে কেন এই রাত্রে নরহরির বাড়ীতে গিয়ে কার্ত্তিকের কথিতমত কৌশলগুলির সাহায্যে সেই গুপ্তধন আত্মসাৎ না করে, একথা কেউ জানিতে পারিবে না, এই স্থির করিয়া বৃদ্ধ চতুর্ভুজ আস্তে আস্তে বিছানা হইতে উঠিয়া নরহরির বাড়ীর চাবী ও একটী আলো লইয়া গেল। হলকামরায় গিয়া কার্ত্তিকের কথিতমত কৌশল অবলম্বন করায় আলমারী সরিয়া গিয়া চতুর্ভুজ

গুপ্তদ্বার দেখিতে পাইল, বৃদ্ধ তখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছে ; তাড়াতাড়ি স্প্রীং টিপিয়া গুপ্তদ্বার খুলিয়া যেমন গুপ্তঘরে সে প্রবেশ করিয়াছে অমনি সিন্দুকের গায়ে যদুর কঙ্কাল দেখিতে পাইল। চতুর্ভুজ নিমিষেই বুঝিল যে নরহরির প্রেতাত্মা যক্ষের ন্যায় তার অতিকষ্টে সঞ্চিত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, আতঙ্কে চতুর্ভুজ বিকটচীৎকার করিয়া সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, হাতের আলো নিবিয়া গেল ও গুরুতর পতন হেতু গুপ্তদ্বারের দরজার স্প্রীং আলগা হইয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে আলমারীর অর্দ্ধাংশও উঠিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল।

সংজ্ঞা হইলে চতুর্ভুজ সমস্ত রাত্রি ভয়ে চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে কিন্তু সে শব্দ কাহারও কর্ণে পৌঁছে নাই এবং পৌঁছান সম্ভবও ছিল না। অন্ধকারে শত চেষ্টায়ও দরজা খুলিবার কলটী চতুর্ভুজ পায় নাই, আর নরহরির প্রেতাত্মাদর্শন-ভীতিহেতু বেশীক্ষণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া থাকারও উপায় ছিল না ; এইভাবে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল।

চতুর্ভুজ প্রভাতে হলকামরায় অনেক লোকের পদশব্দ শুনিতে পাইয়া বুঝিল যে পুলিশ আসিয়াছে ও তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে, অতি লোভে যে সব দিক্ নষ্ট হইল, এই ভাবিয়া তার কান্না আসিল, লোভ করিয়া রাত্রে নরহরির এই গুপ্তধন আত্মসাৎ করিতে না আসিলে তার ছেলে কার্ত্তিকই মাধবীকে বিবাহ করিয়া এই অতুলসম্পত্তির অধিকারী হইত, এখন তার সব দিক গেল।

ক্রমশঃ গুপ্ত আলমারী, গুপ্তদ্বার খোলার শব্দ হইল, যেমন গুপ্তদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, বৃদ্ধ চতুর্ভুজ অমনি ঘর হইতে দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পালাইবার চেষ্টা করিল। সমস্ত পুলিশ কর্ম্মচারীগণ, সুশীলা, মাধবী, শাম সকলেই বৃদ্ধ চতুর্ভুজকে সেই ঘর হইতে অমনভাবে বাহির হইতে দেখিয়া যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইল ; কিন্তু কার্ত্তিক তাহার পিতার নীচপ্রবৃত্তি ও দুরভিসন্ধির কথা বুঝিতে পারায় মর্ম্মাহত হইয়া অধোবদনে রহিল।

পুলিশ চতুর্ভুজকে গ্রেপ্তার করিল, কারণ কেন সে ঐ গুপ্তঘরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা তাদের বুঝিতে বাকী রহিল না। পুলিশের সাহায্যে নরহরির গুপ্তধন ও যদুর কঙ্কালের উদ্ধার হইল এবং সুশীলা ও মাধবীর একান্ত অনুরোধে ও হাজার দুই টাকা খরচ করিয়া চতুর্ভুজ এ যাত্রা ফৌজদারীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। আর শাম হতভাগ্য যদুর জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল কারণ সে বুঝিল যে রেল দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইয়াও নিয়তিবশে যদু এই গুপ্তধনাগারে প্রাণ হারাইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

মদের মাহাত্ম্য।

অষ্টাদশবর্ষীয় গোপাল বাবু বৃদ্ধ পিতার সহসা মৃত্যুতে হঠাৎ অগাধ টাকার মালিক হইয়াছেন। সনাতন কুণ্ডুর যে এত টাকা ছিল, তাহা কেহই জানিত না। কখনও সন্ধ্যায় সনাতন কুণ্ডুর বাড়ী আলো জ্বলিত না;—গ্রাম্য বিড়াল কুকুর তাহার বাড়ীতে পাতের অবশিষ্ট অংশ পাইবার বিন্দুমাত্র আশা নাই দেখিয়া অনেক দিন হইতে তাহার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এক ক্ষুদ্র ভগ্ন অট্টালিকায় সনাতন কুণ্ডু বাস করিতেন। বহু পুরুষ হইতে তাহাতে বালিচুণ পড়ে নাই। সনাতন কুণ্ডুর কিছু টাকা আছে, তাহা সকলে জানিত,—সকলে ইহাও জানিত সে তাহার ন্যায় ভয়ানক কৃপণ লোকও আর ত্রিসংসারে কেহ ছিল না,—কিন্তু তাহার যে এত টাকা ছিল তাহা কেহ জানিত না।

তাহার একমাত্র বংশধর পুত্র গোপালচন্দ্রও তাহা জানিতেন না। জল খাবারের জন্য তাহার আধ পয়সার মুড়ী প্রত্যহ বরাদ্দ ছিল;—পরিধানের ব্যবস্থা—কাপড়ের পরিবর্ত্তে মোটা দেড় হস্ত পরিমাণ গামছা;—আহারের জন্য বুগড়ী চাল,—কড়াইয়ের ডাল ও নিকটস্থ পচা পুকুরের কলমী শাক,—কখনও কদাচিত ঐ পুষ্করিণীর সিংহী মাছ, তাহাও গোপালচন্দ্র স্বয়ং যেদিন ধরিতে সক্ষম হইতেন, নতুবা ঐ কলমী শাকই মাত্র ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থার কখনও কেহ কোনরূপ ব্যতিক্রম হইতে দেখে নাই!

গুরু মহাশয় কিছু মাসিক পারিশ্রমিক চাওয়ায় সেই পর্য্যন্ত গোপালচন্দ্রের লেখা পড়ায় ইতি হইয়াছে। গোপালও তাহাই চাহেন;—তিনি পরের বাগানের আম জাম নিচু সংগ্রহ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতেন। পয়সা ব্যয় হইবার ভয়ে কুণ্ডু গুণধর পুত্রকে কোন কথা বলিত না;—ছেলের দিকে পারত পক্ষে চাহিত না,—এরূপ অবস্থায়, এরূপ গুণধর ছেলের যেরূপ হওয়া উচিত, গোপালচন্দ্রেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে,—গ্রামের লোক তাহার "আহ্লাদে গোপাল" নাম দিয়াছে।

সহসা পিতার মৃত্যুতে গোপালচন্দ্রের হস্তে অগাধ টাকা আসিয়া পড়িল। পিতা থাকিতেই গোপালের বেশ কয়েকজন উপযুক্ত অনুচর জুটিয়াছিল;—গোপাল লুকাইয়া চুরিয়া দুই এক পাত্র টানিতে শিখিয়াছিল, গ্রামের দূরে এক খড়ো ঘরে এক যাত্রার দলও বসাইয়াছিল, এরূপ স্থলে গোপালের হস্তে অগাধ টাকা পতিত হওয়ায়,—গোপাল আনন্দ সাগরে গা-ভাসান দিল। বাপের শ্রাদ্ধ হইবার

পূর্ব্বেই বাড়ীর সম্মুখে এক বৃহৎ আটচালা নির্ম্মাণ করিল,—প্রত্যহ দিনরাত্রি তথায় গান বাজনা চলিতে লাগিল, গ্রামে 'মামার' দোকান ছিল না। দূর হইতে মাল সরবরাহ করিতে হইত, তাহাতে বিশেষ অসুবিধা,—সময় মত মিলে না। গোপাল নিজ বৃহৎ আটচালার পার্শ্বে এক দোচালা ঘর তুলিল,—তথায় এক 'মামার' দোকান স্থাপিত করিল,—স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা ছুটিল,—টাকায় কি না হয়!

অষ্টাদশ বর্ষীয় গোপাল 'ধরাকে সরা' দেখিতে লাগিল; আশে পাশের গ্রামের ইয়ার বন্ধু আসিয়া দিন রাত্রি "আহ্লাদে গোপালকে" "গোপাল বাবু, গোপাল বাবু" বলিয়া ডাকিয়া তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়া তুলিল। গোপাল বাবুর গোঁপে চাড়া দিয়া বৈঠকখানায় বসিতে ইচ্ছা হইত, কিন্তু ভগবান সে বিষয়ে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন,—পুনঃ পুনঃ পরামাণিকের নির্য্যাতনেও গোঁপ মস্তকোত্তলি করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে বিশেষ দুঃখিত হইবার সময় গোপালচন্দ্রের ছিল না, কারণ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অল্পক্ষণই তিনি স্পষ্টভাবে চাহিতে সক্ষম হইতেন;—তাহার বন্ধুগণ তাহাকে সে অবসর দিত না, গোপাল-চন্দ্রের চক্ষু একটু পরিষ্কার হইলেই তাহারা আবার সুরা চালাইত;—সু ছেলে গোপালের চক্ষু অর্দ্ধনিমিলিত হইয়া আসিত। গোপাল সুখনিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বর্গসুখ উপলব্ধি করিত।

গোপালের বৃদ্ধ মা জীবিত ছিলেন, কিন্তু গোপাল তাঁহাকে 'গো-টু-হেল' করিয়া দিল। মা দিন রাত্রি ছেলের জন্য বাড়ীর ভিতর কাঁদিতেন, বাহিরে আসিয়াও কাঁদিতেন,—কিন্তু গোপাল তাহাতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করিত না।

খুব স্ফূর্ত্তি চলিতেছে; এই সময়ে একদিন ডাকওয়ালা তাহার হস্তে এক পত্র দিল; সৌভাগ্যের বিষয় এই সময়ে সহসা গোপালের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি একবার চারি দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, তাহার ইয়ারগণ কেহ উলঙ্গ, কেহ অর্দ্ধ উলঙ্গ, নানা জনে নানা ভাবে নানা দিকে পড়িয়া আছে। অনেকের মুখে লাল গড়াইতেছে, তাহাতে মাছি ভন ভন করিতেছে।

এই কুৎসিত বিভৎস দৃশ্য লক্ষ্য না করিয়া গোপালচন্দ্র কম্পিত হস্তে পত্র খানি খুলিলেন, বিদ্যা বুদ্ধি তাহার অতি কমই ছিল। অতি কষ্টে নামটা সই করিতে পারিতেন, আর ছাপার মত লেখা হইলে, দুই একছত্র পড়িতেও পারিতেন,—এ বিদ্যাও গান শিখিবার জন্য ঘটিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় পত্রখানি ছাপার মতই লেখা ছিল। গোপাল অতি কষ্টে ইহা একবার পড়িতে পারিলেন। তাহার পর, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি বিস্ফারিত নয়নে হাঁ করিয়া স্তম্ভিত

ভাবে বসিয়া রহিলেন;—সহসা মস্তকে বজ্রাঘাত হইলে বোধ হয় লোকের এরূপ হয় না।

২

সনাতন কুণ্ডু ডাকাতের ভয়ে বেশী টাকা কাছে রাখিতেন না।—কলিকাতার বৃদ্ধ উকিল, সংসার বাবুর উপর তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল; তিনি তাঁহার অধিকাংশ টাকা সংসার বাবুর হস্তে রাখিয়া ছিলেন।—তিনিই সে টাকা খাটাইতেন, তাহাতে তাহার টাকা এত বাড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া সংসার বাবু গোপালের সহিত দেখা করিতে আসিলেন,—ছেলের বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, চরিত্র দেখিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন, "এ হতভাগা তো তিন মাসেই সব ফুকিয়া দিবে। তবে আমার তাহাতে হাত কি! পরের টাকার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি। যদি কুণ্ডু একটা উইল টুইল করিয়া যাইত, তাহা হইলেও যাহা হয় দেখা যাইত!"

তিনি প্রকাশ্য ভাবে গোপালকে বলিলেন, "দেখ, তোমার বাবার প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা আমার নিকট আছে, যখন ইচ্ছা লইতে পার।"

গোপাল মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে বলিল, "ক গণ্ডা হবে!"

সংসার বাবু ক্রোধে মনে মনে বলিলেন, 'আবেগের বেটা ভূত! ভগবান এমন অপদার্থকেও এত টাকা দিয়াছেন! তাঁর লীলা বুঝা ভার।" তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, কত গণ্ডা টাকা তা তোমার মা বুঝিয়ে দিবেন! যে দিন নিতে ইচ্ছা কর, কলিকাতায় আমার বাড়ী যেও, আমি পাই পয়সা সব বুঝাইয়া দিব।"

সংসার বাবু চলিয়া গেলেন।—বাড়ীতে হাজার দশেক টাকা ছিল, গোপাল তাহাই লইয়া ইয়ারদের সহিত স্ফূর্ত্তি সাগরে ভাসিলেন,—পাঁচ লক্ষ টাকার কথা বড় ভাবিলেন না,—মনে মনে বলিলেন, পরে দেখা যাবে,—এ টাকা ফুরুক!" বন্ধুগণ পাঁচ লক্ষ টাকার কথা শুনিল,—তাহারা গোপালচন্দ্রের মত পণ্ডিত ছিল না;—তাহারা পরামর্শ দিল, "টাকা পরের হাতে রাখা ভাল নয়।—সব এখানে এনে ফেল, গোপাল বাবু।"

গোপাল বাবুর হাতে তখনও টাকা ছিল; তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "পরে দেখা যাবে।" বন্ধুগণ দুঃখিত হইল,—তাহারা দুই হাতে লুটিতেছিল,—যত শীঘ্র হয় গোপালচন্দ্রের টাকা শেষ হইলে, তাহারাও সরিয়া পড়ে।—সর্ব্বদাই মনে মনে বলিত "শালা মূর্খকে আর তেল দেওয়া চলে না।"

বাড়ীতে যে টাকা ছিল, গোপাল প্রায় তাহা শেষ করিয়া আনিয়া ছিলেন ;— আর দুই দশ দিন চলিবে।—তাহাই তিনি মনে মনে কলিকাতায় যাইবার কথা ভাবিতেছিলেন, কিন্তু তাহাদের ক্ষুদ্র গ্রাম ছাড়িয়া গোপাল এক পাও কোথায়ও কখনও যায় নাই ;—তাহাই কলিকাতায় যাইতে তাহার ভয় হইতেছিল, সেজন্য ইতস্ততঃ করিতে ছিলেন বলিয়াই এতদিন তাহার যাওয়া হয় নাই ;—আর নিজে না গেলেও, সংসার বাবু অপর কাহাকেও টাকা দিবেন না,—কিন্তু আর না গেলেও নয়, বাড়ীর টাকা সব শেষ হইয়া আসিয়াছে।

এই সময়ে গোপালচন্দ্র এক ভয়ানক পত্র পাইলেন, সংসার বাবু লিখিয়াছেন, "যদি আজ বাড়ী হইতে রওনা হইয়া এখানে না উপস্থিত হও, তাহা হইলে তোমার সমস্ত টাকা মারা যাইবার সম্ভাবনা,—ইহা বুঝিয়া কাজ করিও।"

সমস্ত টাকা মারা যাইবে! তবে এ স্ফূর্ত্তি চলিবে কিসে? গোপালচন্দ্র সংসার বাবুর পত্র পাইয়া চারি দিক অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার শিরায় রক্ত-চলাচল বন্ধ হইল, তিনি পুত্তলিকার মত কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তাহার পর লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "এরা জান্‌লে আমায় আর যেতে দেবে না।"

গোপাল বাড়ীর ভিতর গিয়া অবশিষ্ট যে এক শ টাকা ছিল—তাহা সঙ্গে লইয়া মার কাছে গিয়া বলিলেন, "সংসার বাবু চিঠি লিখেছে,—আমি আজই না গেলে সব টাকা মারা যাবে,—আমি কলিকাতায় রওনা হলেম—কিছু ভাবিস নে।"

বৃদ্ধা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গোপাল তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন,—জননী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পুত্র মাঠের মধ্য দিয়া রেল ষ্টেসনের দিকে ছুটিতেছে। শিবনিবাস ষ্টেসন গোপালের গ্রাম হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত!

সন্ধ্যার পরে কলিকাতায় শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। নানারূপ গাড়ীঘোড়া, বহু লোক, বড় বড় আলো, এরূপ ব্যাপার গোপাল পূর্ব্বে আর কখনও দেখে নাই, সে বিস্ফারিত নয়নে এই সকল দেখিতেছিল। এমন সময় একজন আসিয়া বলিল! নাম হে বাবু, হাঁ করে দেখ্‌ছ কি!"

গোপাল উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি কলিকাতা!"

লোকটা তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল! "তুমি কি মনে কর?—এটা কি জেলখানা!"

গোপাল আর কোন কথা না কহিয়া নিতান্ত অপ্রস্তুতভাবে গাড়ী হইতে নামিলেন, কিন্তু তিনি কোথায় যাইবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না—লোকের জনতা ও কোলাহল দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি স্তম্ভিত-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, লোকে তাঁহাকে ধাক্কা মারিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, এইরূপ ধাকায় ধাক্কায় গোপাল ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন।

চিরকাল পাড়াগাঁয়ে লালিতপালিত,—এরূপ জনকোলাহলপূর্ণ সহর যে জগতে আছে, তাহা গোপালচন্দ্রের আদৌ ধারণা ছিল না। প্রকৃতই তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি চিন্তিত ও স্তম্ভিতভাবে চারিদিকে চাহিতেছেন, এই সময় এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় কি পূর্ব্বে কখনও কলিকাতায় আসেন নাই?"

গোপালচন্দ্র চমকিত হইয়া ফিরিলেন,—দেখিলেন, একটী ভদ্র লোক। বলিলেন, "আমি এই প্রথম কলিকাতায় এসেছি,—কিছু জানি না।"

"কোথায় যাবেন!"

"সংসার বাবুর বাড়ী!"

"ঠিকানা!"

"ঠিকানাটা ভুলে এসেছি, তিনি বড় উকীল!" "এ সহরে কি তা হ'লে খুঁজে পাওয়া যায়!"

"কাল দিনের বেলায় আদালতে সন্ধান নিও, চল আমার বাড়ীতে রাতটা কাটিয়ে দেবে, আমার বাড়ী কাছেই, উলুবেড়ে, আমার কাল আদালতে কাজ আছে, একসঙ্গেই আসবো।"

গোপাল ভাবিলেন,—এ যুক্তি মন্দ নয়। যে রকম ব্যাপার, তাহাতে তিনি একাকী এ সহরে এক পা চলিলেই বিঘোরে মারা যাইবেন। প্রাণে বড়ই কষ্ট হইল, কেন এমন করিয়া একাকী আসিলাম। তিনি কাতরে বলিলেন, "মহাশয়, আমি এখানকার কিছুই জানি না;—আমায় অনুগ্রহ করে সেইখানে নিয়ে চলুন।"

"এস" এই বলিয়া ভদ্রলোকটী অগ্রসর হইলেন। গোপাল,—বিপদে বন্ধু মিলিল ভাবিয়া, অতিশয় আশ্বস্থ হইলেন, তাহার সহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

কিয়দ্দূর আসিয়া ভদ্রলোকটী একটি জনতাপূর্ণ, আলোকিত দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "চল—একপাত্র খেয়ে যাই!"

গোপাল সোৎসাহে বলিলেন, "মদ!" তাহার আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। লোকটা হাসিয়া বলিল, "কে বল্লে মদ? মধু—এস।"

উভয়ে দোকানে প্রবিষ্ট হইলেন, লোকটী এক বোতল মদ লইল, বলিল, "আমার কাছে নোট রয়েছে,—ভাঙ্‌টা টাকা আছে? গোপাল বলিলেন, "আছে, আমি দিচ্ছি।"

গোপাল কাপড়ের কোঁচায় এক শ টাকা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহা খুলিয়া বলিলেন, "কত দিতে হবে?"

"দু টাকা।"

"আমাদের দেশে পাঁচসিকে বোতল!"

"এ তোমাদের দেশ নয়।"

"গোপাল নীরবে দুই টাকা দিয়া বাকী টাকা কাপড়ে বাঁধিলেন। ভদ্রলোক তাহাকে পুরো এক গেলাস দিল। তিনি বোঁ করিয়া তাহা নিঃশেষ করিলেন তখন তাঁহার ধড়ে প্রাণ আসিল, প্রাণেও উৎসাহ দেখা দিল। কয়েকটা গলি ঘুরিয়া, ভদ্রলোক তাহাকে গঙ্গার ধারে লইয়া আসিলেন, তথায় উলুবেড়ে যাইবার জন্য একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া ভদ্রলোক গোপালকে নৌকায় উঠিতে বলিলেন।

গোপাল নৌকায় উঠিয়া এক পার্শ্বে যাইয়া বসিল, ভদ্রলোকটী আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিলেন,—দাঁড়িগণ দাঁড় ধরিল,—অমাবস্যার রাত্রি, অতিশয় অন্ধকার,—সেই গভীর অন্ধকারে নৌকা নাচিতে নাচিতে চলিল।

সহসা মাঝি বিকট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "সামাল—সামাল!"

সামালের আর সময় ছিল না। অন্ধকারে মহা বেগে একখানি জাহাজ আসিতে ছিল, দাঁড়ি মাঝি কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই। তাহারা নৌকা সামলাইতে পারিল না;—তাহার পর কি হইল, গোপালের তখন জ্ঞান নাই;—তার এই মাত্র মনে হইল যে সে গভীর,—গভীরতম গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে! চারিদিক গোপাল এক অভূতপূর্ব্ব আলোক দেখিল,—তাহার পর তাহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

কতক্ষণ সে অজ্ঞান ছিল,—তাহা সে জানে না। যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিল, সে এক ক্ষুদ্র কুটির মধ্যে মাদুরের উপর পড়িয়া আছে। গৃহের কোণে একটা কেরোসিনের কুপি জ্বলিতেছে;—তাহার সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা,—উঠিবার ক্ষমতা নাই।

কোথায় আসিয়াছে,—কি হইয়াছে,—গোপালের কিছুই প্রথম মনে হইল না।

কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অসাড়ভাবে শয়ন করিয়া রহিল, তখন ধীরে ধীরে

তাহার স্মরণশক্তি পুনরাগত হইতে লাগিল ;—তখন ধীরে ধীরে তাহার সকল কথা স্মরণ হইল। দেশ হইতে কলিকাতায় আগমন, ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহার সঙ্গে নৌকায় আগমন, তাহার পর জলমগ্ন,—সমস্তই একে একে তখন মনে হইল —তবে সে জলে ডুবিয়া একেবারে মরে নাই,—এখনও জীবিত আছে।—কিন্তু সে কোথায় আসিয়াছে ?

গোপাল ব্যগ্রভাবে চক্ষুরুন্মিলন করিল,—সমস্ত শরীরে দারুণ বেদনাসত্বেও বেগে উঠিয়া বসিল,—তখন কে মৃদু মধুরস্বরে বলিল,—"উঠিবেন না, শুয়ে থাকুন, আমি আপনার গা শেঁক দিয়ে দি !"

গোপাল বাণবিদ্ধের ন্যায় ফিরিলেন, সেই কেরোসিনের ধূমাবরিত আলোকে তিনি যাহা দেখিলেন—সেরূপ জীবনে আর কখনও দেখেন নাই,—তাহার সম্মুখে এক দেবী মূর্ত্তি ! এক দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা তাহার পার্শ্বে উপবিষ্টা,—তেমন রূপ গোপাল আর কখনও দেখেন নাই !

সেই বালিকার সুন্দর চক্ষু দুইটীতে স্বর্গীয় সুধা ঝরিতেছে।—তাহাতে হতভাগ্য গোপালের ছিন্ন ভিন্ন শতধা হৃদয়ের প্রজ্বলিত অগ্নিতে যেন সুশীতল সুধা সিক্ত হইল ;—গোপাল ব্যাকুলিতভাবে সেই দেবীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন ! তাহার পর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন। "তুমি কে ?"

৩

বালিকা আবার ধীরে ধীরে বলিল, "স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন, আমি আপনার গা শেঁক দিয়ে দি !"

গোপাল সবেগে বলিলেন, "তুমি কে, আগে আমায় বল।"

বালিকা বলিল, "ছেলেবেলায় ডাকাতেরা আমায় চুরি করে এনেছিল,—সেই পর্য্যন্ত আমি এদের সঙ্গে আছি।"

"এরা কে ?"

"মগ্ সর্দ্দারের দল !"

"কোথায় তারা ?"

"ঐ বাহিরে সব আছে !"

"আমি এখানে এলাম কি করে ?"

"আপনি জলে ভেসে যাচ্ছিলেন,—আমরা নৌকা করে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেম, —এরা নৌকায় করে তুলে নিয়ে এখানে এনেছে।"

"এ কোন যায়গা ?"

"সুন্দর বোন"

গোপাল কিয়ৎক্ষণ কথা কহিল না, স্তম্ভিত প্রায় বসিয়া রহিল। তাহার চিন্তাশক্তি তিরোহিত হইল,—অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "ভগবান অদৃষ্টে দুঃখ লিখিলে কে খণ্ডাইতে পারে? মা গঙ্গা কোথা হতে এসে ক্রোড়ে নিলেন। তারপর দেখিতেছি তাহা হতেও বেঁচেছি।—জলে ডুবে মরি নি! কিন্তু দেখিতেছি ডাকাতের হাতে পড়েছি,—আরও ভগবান অদৃষ্টে কি লিখেছেন,—কে জানে!"

তিনি কথা কহেন না দেখিয়া—বালিকা আবার মধুরস্বরে বলিল,—"শুইয়ে থাকুন,—আমি গা শেঁকে দি,—না হলে জ্বর হতে পারে।"

গোপাল বিমুগ্ধভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—তাহার পর বলিল, "তুমি কি হিন্দু?"

বালিকা অবনত মস্তকে বলিল, "আগে আমার নাম সুবালা ছিল,—এখন আমার নাম লুংলা; মগ সর্দ্দার আমায় মেয়ের মত ভালবাসে।"

গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাপ মা কে!"

বালিকা বলিল, "তা জানিনে,—এরা আমায় খুব ছোট বেলায় চুরি করে এনেছিল!"

গোপাল দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "শালা ডাকাত!"

বালিকা মৃদু হাসিয়া বলিল, "গালি দিবেন না।—মগ সর্দ্দার এখন আমার পিতৃস্থানীয়।"

গোপাল বেগে বলিল, "ভদ্রলোকের মেয়ে চুরি করে এনেছে,—শালাকে আমি জেলে দেব।"

বালিকা অতি মৃদুস্বরে বলিল, "চুপ,—শুনতে পেলে আপনার প্রাণ থাকবে না।"

"আমি তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাব!"

"পারবেন!"

"দেখতে পাবে,—পারি কি না পারি।—তুমি যাবে?"

"আমায় বে করবেন!"

গোপাল কি উত্তর দিবে, ইতস্ততঃ করিতেছিল;—এমন সময় এক ভীমকায় মূর্ত্তি সেই গৃহমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল,—তেমন ভয়াবহমূর্ত্তি গোপাল আর কখনও দেখে নাই। লোকটা অতি খর্ব্ব,—বুকখানা একখানা বড় পীঁড়ের মত,—মাথাটা ও মুখখানা যেন একটা বড় বাঘের মুখ,—তাহার রং ঘোর তাম্রবর্ণ,—

তাহার পর, মুখে বসন্তের দাগ থাকায় সেই ভয়ানক মুখ আরও ভয়ানক ভাব ধারণ করিয়াছে! বেশ—মগের বেশ! তাহার দক্ষিণ হস্তে এক বৃহৎ লগুড়,—তাহাকে দেখিয়া গোপালচন্দ্রের প্রাণ প্রাণের ভিতর বসিয়া গেল,—এই ভীমমূর্ত্তি তাহার দন্তপাতি বাহির করিয়া বিকট হাসি হাসিয়া বলিল—"আমার নাম 'জঙ্গলে সা' কোন্ শালা না আমায় চেনে! এস তোমার বিচার হবে!"

৪

গোপাল নিমিষের মধ্যে ব্যাকুলভাবে বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন,—চারি চক্ষু মিলিল;—গোপালের মনে হইল, সেই দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিরায় শিরায় কি এক সুধার স্রোত প্রবাহিত হইল! জীবনে এরূপ আর কখনও তাহার হয় নাই!

তাঁহার বোধ হইল বালিকা যেন নয়ন ইঙ্গিতে তাঁহাকে মগ সর্দ্দারের সঙ্গে যাইতে বলিল;—তাহাই তিনি কোন কথা না কহিয়া নীরবে উঠিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসলেন। দেখিলেন চারিদিকে গভীর জঙ্গল, সুন্দর গাছের পর সুন্দর গাছ,—পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র নদী,—সেই নদীর একটু দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটু পরিস্কার স্থানে এই ক্ষুদ্র ঘরখান স্থাপিত।

গোপাল বাহিরে আসিয়া দেখিল, প্রায় ত্রিশ জন ভীমমূর্ত্তি পুরুষ, আসেপাশে চারিদিকে বসিয়া লম্বা লম্বা চুরুট টানিতেছে, সকলেই ভীমকায় মগ, বিকট ভাষায় কথা কহিতেছে;—স্থানে স্থানে তাহারা কাট স্তূপাকার করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে,—কাষ্ঠস্তূপ হু হু শব্দে জ্বলিতেছে,—চারিদিকে সেই আলোকে আলোকিত হইয়া গিয়াছে।

চারিদিকে নীরব—নীস্তব্ধ;—কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে হিংস্র জন্তুগণ চীৎকার করিয়া সেই নির্জ্জনতার মধ্যে এক ভয়ানক ভাবের সৃষ্টি করিতেছে।—দূরে দূরে মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্রও গর্জ্জন করিতেছে। গোপাল বুঝিলেন,—তিনি গভীর সুন্দর বনের মধ্যে কোথাও আসিয়াছেন।—

মগ সর্দ্দার বাহিরে আসিলে সকলে তাহার কাছে আসিয়া সমবেত হইল!—তখন সে সকলকে সেইখানে বসিতে আজ্ঞা করিল,—সকলে বসিলে সে গোপালকে হিন্দুভাষায় বলিল, "তুমিও বসো।"

গোপালও বসিল।—তিনি এখন আর তাঁহার বৃদ্ধ মাতার নন্দদুলাল,—তাঁহাদের গ্রামের 'আহ্লাদে গোপাল' নাই। ঘোর বিপদে পড়িয়া, তাঁহার হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে। এটা স্থির—যখন গঙ্গাগর্ভে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই,—তখন তিনি সহজে

মরিবেন না,—এ শালারা না ছেড়ে দেয়,—এইখানেই থাকিবেন,—এখানে অন্ততঃ এই সুখালা লুংগী আছে।"

ডাকাত বলিল, "তোমার প্রাণ রক্ষা আমরা করেছি!"

গোপাল গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "খুব ভাল।—সেজন্য আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকলেম।—এখন কবে আমায় ছেড়ে দেবে,—এ জঙ্গল থেকে নিয়ে লোকালয়ে পৌছে দেবে তাই বল।"

মগ সর্দ্দার দন্ত বাহির করিয়া হাসিল, বলিল, "ব্যস্ত হইওনা ভায়া,—তোমায় যখন আমরা হাতে পেয়েছি,—তখন কি তোমায় আমরা সহজে ছাড়তে পারি।"

গোপাল আর সে গোপাল নাই,—গোপাল অচল অটল,—বলিলেন, "তোমরা আমায় নিয়ে কি কর্ত্তে চাও!"

"তোমায় ছেড়ে দি, আর তুমি পুলিসে গিয়ে আমাদিগকে ধরাইয়া দেও।"

"তোমরা কি আমায় এমনই অকৃতজ্ঞ মনে কর!"

"না—তা মনে কর্ব্বো কেন! তবে আমরা কাকেও বিশ্বাস করি না।"

"তবে কি কর্ত্তে চাও বল।"

"তোমাকে আমাদের দলে মিশ্‌তে হবে!"

গোপাল রাগত হইয়া বলিলেন, "কি! আমি ভদ্রলোকের ছেলে,—ডাকাত হবো!"

মগ সর্দ্দার হাসিয়া বলিল, "না স্বীকার হও, তোমার গলাটি কেটে—এই জঙ্গলে ফেলে যাব,—বাঘে শিয়ালে খাবে।"

গোপাল বাবু দেখিলেন যে, এই দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে ইচ্ছা করিলে বুদ্ধির দরকার,—কৌশল প্রয়োজন,—জোর করিয়া কিছুই হইবে না!—এখন স্বীকার করি,—পরে সময় ও সুবিধা পাইলেই পালান যাইবে,—আর,—আর—এই মেয়েটাকে কিছুতেই এই ডাকাতের হাতে রাখিয়া যাইব না, তাহাকেও সঙ্গে লইব,—এই জন্যই আমাকে এই বদমাইসের মধ্যে থাকিতে হইল,—তিনি হতাশভাবে বলিলেন, "রাজি—কি কর্ত্তে হবে বল।"

৫

ডাকাতগণ মহানন্দে এক ভয়াবহ বিকট শব্দ করিয়া উঠিল,—মগ সর্দ্দার বলিল, "ভাল—ভাল;—এইতো বুদ্ধিমানের কথা! এখন থেকে তুমি আমাদের একজাত হলে,—এখন তোমায় লুঙ্গি পরাই।

গোপাল বলিলেন, "লুঙ্গি কি?"

মগ সর্দ্দার গম্ভীর ভাবে বলিল, "তোমায় আজ থেকে মগ হতে হবে !"

গোপাল অতি সাবধানে, ভীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মগ ! মগ—হবো !"

ডাকাত বলিল, "হাঁ,—আমরা মগ ছাড়া আর কাকেও দলে রাখি নে !"

গোপাল মহা ব্যাস্ত হইয়া বলিলেন, "আমি হিন্দুর ছেলে, মগ—হবো।"

সর্দ্দার অতি গম্ভীর স্বরে বলিল, "হাঁ! --বাজে লোক আমারা সঙ্গে রাখি না।—তোমায় ছেড়ে দেব,—আর তুমি দেশে গিয়ে পুলিশে খবর দেবে—তা হবে না,—না ;—এখন কি বল,—টুটি কাটব—না—মগ হবে।"

গোপাল বাবু গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, মনে মনে বলিলেন, "ভগবান, অদৃষ্টে এও লিখেছিলে ! না স্বীকার হলে,—এই বদমাইসরা আমায় নিশ্চয়ই খুন কর্ব্বে। ফাঁসি থেকে বেঁচে, জলে ডোবা থেকে বেঁচে, শেষে কি এই শালা ডাকাতদের হাতে প্রাণটা হারাতে হল।

মগ বলিল, "তুমি মগ হলে আমি তোমার সঙ্গে আমার মেয়ে লুংলীর বে দেব ;—তা হলে তুমি আর কখনও আমাদের দল ছেড়ে যেতে পার্ব্বে না।"

অদৃষ্ট,—সকলই অদৃষ্ট। অদৃষ্টের হাত হইতে কে কবে রক্ষা পাইয়াছে।—ফাঁশি হইতে বাঁচিলাম,—দ্বীপান্তর হইতে বাঁচিলাম,—গঙ্গায় জলে ডুবিয়া গিয়াছিলাম, তাহা হইতে বাঁচিলাম—শেষ কি মগ ডাকাত হইবার জন্য,—শেষ কি দুর্বৃত্ত খুনী হইবার জন্য। বাড়ী ঘর, দেশ, জাত, বৃদ্ধা জননী ছাড়িয়া শেষে আমার এ দশা ঘটিল।"

গোপাল বাবুর দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—কিন্তু এই দুর্ব্বৃত্তগণ,—তাহার চক্ষে জল দেখিলে হাসিবে,—বিদ্রূপ করিবে,—ইহা প্রাণে সহ্য হইবে না।—তিনি চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইলেন,—অদৃষ্টের হাত হইতে রক্ষা নাই—পরে যাহা হয় হইবে।—সুবিধা পাইলেই পালাইব, এই জঙ্গলে যাহা হইল, তাহা আর কেহ জানিতে পারিবে না,—দেশে ফিরিয়া গিয়া এ সব কথা না প্রকাশ করিলেই চলিবে। আর সুবালা, সে হিন্দুর মেয়ে, তাহাকে বিবাহ করিতে ক্ষতি কি। আর যদি বিবাহ কখনও কাহাকেও করিতে হয়, তবে তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও করিব না।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গোপাল ক্ষুদ্র কুটিরের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন সুবালা তাহার অপরূপ রূপে বিভাসিত হইয়া কুটির দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেই অন্ধকার রাত্রে চারি দিকের অন্ধকার মাথা অগ্নিস্তুপের আলোক তাহার সুন্দর মুখে পতিত হইয়া তাহাতে এক অপরূপ শোভা বিস্তার করিয়াছে।

আবার চারি চক্ষে মিলন,—গোপাল বাবুর মনে হইল,—সে যেন বলিতেছে, "রাজি হউন।" তিনি আর কোন চিন্তা করিলেন না, হৃদয়ের সমস্ত ভাবনা দূর করিয়া দিয়া—সবেগে বলিলেন, "রাজি।—শীঘ্র বে দেও।"

ডাকাতগণ তখন অগ্নিস্তূপে আরও কাট ফেলিল,—আগুন আরও ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

কয়েকজন জঙ্গল হইতে একটা বড় গোসাপ টানিয়া তথায় আনিল,—তখন তাহারা সকলে সেটাকে হত্যা করিবার জন্য বন্দোবস্তে নিযুক্ত হইল।

কয়েকজন অগ্নি স্তূপের উপর একটা বৃহৎ হাঁড়ি বসাইল।—তাহার ভিতরে নানবিধ অতি দুর্গন্ধময় মসলা নিক্ষেপ করিল।

গোপাল বাবু নাকে কাপড় দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া ছিলেন,—অন্যত্র অন্য সময় হইলে তিনি নিশ্চয়ই ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন,—কিন্তু কোন উপায় নাই;—ইহাদের হুকুম না শুনিলে, এই দুর্বৃত্তগণ নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়া বাঘ শিয়ালের আহারে পরিণত করিবে,—কোন উপায় নাই,—রক্ষা নাই, আর অন্য কোন উপায়ও নাই।

ডাকাতগণ তাঁহাকে লুঙ্গি পরাইয়া দিল, মগ সাজাইল; মগ সর্দ্দার কি মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করিল, হতভাগ্য গোপাল হতভাগ্যের ন্যায় সেই সকল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধমকে উচ্চারণ করিতে লাগিল—হায়,—হায়, হিন্দুর ছেলে তিনি অবশেষে মগ ডাকাত হইলেন,—বৃদ্ধা জননী শুনিলে আত্মঘাতিনী হইবেন।

ডাকাতগণ এক পাত্র সেই গো সাপের মাংস তাহার সম্মুখে ধরিল,—গোপাল এতক্ষণ অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে ছিলেন,—আর সহ্য করিতে পারিলেন না,—রাগে তিনি প্রকৃতই উন্মাদ হইলেন।—তাহার সমস্ত বুদ্ধি বিবেচনা হিতাহিত জ্ঞান তিরোহিত হইল,—তিনি গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বলিলেন "শালা!—এত বড় আস্পর্দ্ধা,—আমি এই গো সাপের মাংস স্পর্শ করিব!—আমি হিন্দুর ছেলে,—আমি ইহা খাইব!—শালা, এত বড় আস্পর্দ্ধা,—যত না কিছু বল্‌চি, ততই বেড়ে উঠছে!"

মগ সর্দ্দারের মুখ ক্রোধে ভয়ানক বিকট ভাব ধারণ হইল,—তাহার বৃহৎ দুই গোল চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল;—সে ভয়ঙ্কররূপে দন্ত কড়মড় করিতে

করিতে বলিল, "তবে রে কুকুর বাচ্চা!—এত বড় তেজ,—শালাকে চীৎ করে ফেলে মুখে এই মাংস ঢেলে দে।"

গোপাল উন্মত্ত হইয়াছিলেন,—তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না;—তিনি মাংস সুদ্ধ সেই পাত্র সবলে মগ সর্দ্দারের মুখে নিক্ষেপ করিলেন,—ডাকাতগণ তাহার এই অসম সাহসিক কার্য্যে—ভয়ঙ্কর বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহারা সকলে তাহার উপর পতিত হইল।

গোপালের দেহে শত হস্তির বল আসিল,—গোপাল হস্ত পদ মস্তক একত্রে এক সময়ে সম ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন,—ডাকাতগণ আঘাতিত প্রবাতিত হইয়া দূরে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কিন্তু ত্রিরিশ চল্লিশ জন ভীমকায় দস্যুর সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করা সম্ভব নহে,—গোপাল পরাভূত হইলেন,—ডাকাত গণ তাঁহাকে ভূমে ফেলিয়া নির্ম্মম ভাবে প্রহার আরম্ভ করিল,—দমাদম তাহার পৃষ্ঠে লাঠি পড়িতে লাগিল; হতভাগ্য গোপাল প্রহারের যন্ত্রণায় কাতরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন,—ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "দোহাই তোদের, ছেড়ে দে, আর মারিস নে।"

ডাকাতগণ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল,—আরও প্রহার আরম্ভ করিল; গোপালের হাত পা গুড়া হইয়া গেল! তাহার কাতর আর্ত্তনাদ, সেই নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে, বিজন সুন্দর বনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! তিনি আর্ত্তনাদের উপর আর্ত্তনাদ করিয়া প্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন,—তাঁহার দেহে গলদ ঘর্ম্ম ছুটিল!

এই সময়ে তাঁহার বোধ হইল, কে যেন তাঁহার বুকের উপর আসিয়া পড়িল, কে যেন তাহাকে জড়াইয়া ধরিল,—সে কে! সে কি সুবালা!

গোপাল চক্ষুরুন্মিলন করিলেন,—দেখিলেন তাঁহার বৃদ্ধা জননী তাঁহার বুকের উপর পতিতা হইয়া তাঁহাকে তাঁহার দুই শীর্ণ জীর্ণ বাহু দ্বারা জড়াইয়া কাতরে বলিতেছেন, "বাবা গোপাল,—বাবা গোপাল!"

৭

প্রথম গোপাল কিছু বুঝিতে পারিলেন না।—তবে কি ডাকাতের নির্দ্দয় প্রহারে তিনি অজ্ঞান হইয়াছেন,—সেই অজ্ঞান অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন! স্বপ্নে মাকে দেখিতেছেন!

তিনি বৃদ্ধা জননীকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সবেগে উঠিয়া বসিলেন;—ঘর্ম্মে

সমস্ত বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে।—জননী "বাবা গোপাল—বাবা গোপাল" বলিয়া ব্যাকুলে কাঁদিয়া উঠিলেন।

গোপাল উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিতে লাগিলেন,—চীৎকার করিয়া বলিলেন, "শালা ডাকাতেরা কোথায় ?"

জননী আবার তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা গোপাল,—স্থির হও—স্থির হও—বাবা স্থির হও।"

গোপাল ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন ; দেখিলেন,—স্বপ্ন নহে,—তিনি যথার্থই নিজের বাড়ীতে নিজের বিছানায় বসিয়া আছেন,—তাঁহার বৃদ্ধা জননী তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতেছেন। তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমি কোথায় ?"

জননী বলিলেন, "বাবা,—তুমি বাড়ী আছ,—তোমার অসুখ করেছে,—সমস্ত রাত্রি চেঁচিয়েছ,—এই কবিরাজ মহাশয় এসেছেন,—বাবা তুমি এখনই ভাল হবে।"

গোপাল দেখিলেন বাড়ী সুদ্ধ লোক সেইখানে সমবেত হইয়াছে,—বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "গোপাল বাবু, হাত খানা দেখাও তো।"

গোপাল সবেগে কবিরাজের হাত দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি সুন্দর বন থেকে এখানে কবে এলাম,—কে আমায় এখানে আনিল।"

কাবরাজ—মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "অত্যধিক সুরাপান জনিত মস্তিস্কের বিকৃতি।"

* * * * * *

বহুক্ষণ পরে গোপাল বুঝিলেন যে তিনি এখন যাহা দেখিতেছেন,—তাহা স্বপ্ন নহে,—যাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, তাহাই স্বপ্ন,—তিনি এক পাও বাড়ী হইতে বাহির হন নাই। মদ খাইতে খাইতে ঘুমাইয়া পড়িয়া ছিলেন,—সেই ঘুমন্ত অবস্থায় ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছেন,—এক রাত্রে তিনি নানা কষ্টে, নানা বিপদে, নানা স্থানে নানারূপ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন,—এরূপ কাহারও—কখনও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। গোপাল হতাশ ভাবে বলিলেন,—

স্বপ্ন ! স্বপ্ন !! স্বপ্ন !!!

৺ধীরেন্দ্রনাথ পাল।

নরাধম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"সমাচরেৎ"

কিষণদাস নামে একব্যক্তি ডাক্তার গোকুলদাসের বিশেষ বন্ধু ছিলেন তিনি সহরের এক নাট্য সমাজের কার্য্যাধ্যক্ষ।

কিষণদাস গোকুলদাসকে বড় মান্য ও ভক্তি করিতেন। তাহার গুপ্ত চরিত্রের বিষয় তিনি কিছুই জানিতেন না।—তাহাকে একজন মহানুভব লোক বলিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বিশেষতঃ একবার ডাক্তার, কঠিন পীড়ায় কিষণদাসকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া ছিলেন, সেইজন্য কিষণদাস তাহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন।

ডাক্তারকে দেখিয়া কিষণদাস বলিলেন, আসুন—আসুন - কি সৌভাগ্য, বলিয়া হাত ধরিয়া সমাদরে বসাইলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "একটু বিশেষ কাজে আসিয়াছি।"

"বলুন কি!"

"আমার একটু উপকার করিতে হইবে।"

"বলুন, আপনার জন্য কি না করিতে পারি? বলুন—বলুন।"

"সামান্য কাজ—আপনাদের থিয়েটারে না পুলিশের ইনেস্পেক্টরের একটা খুব ভাল পোষাক ছিল।"

"আছে, কেন?"

"সেইটা তোমার কিছুক্ষণের জন্য আমার বাড়ীতে পরিয়া থাকিতে হইবে।"

কিষণদাস বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন? সে কি!"

"তোমাকে বলিতে আপত্তি নাই! একটা লোক মিছামিছি আমাকে কাল আসিয়া বলে যে তুমি মন্নুবাঈকে খুন করিয়াছ।—দশহাজার টাকা দেও তো —কিছু বলিব না,—নতুবা পুলিশে সম্বাদ দিব—"

"এরূপ বদমাইশ আছে?"

"সংসারে কত রকম বদ্‌লোক আছে—এই লোকটাকে তাড়াইবার জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি। আমি পুলিশে খবর দিতে পরিতাম, তবে তুমি জানইতো পুলিশকে সম্বাদ দেওয়া অনেক হাঙ্গামা।—তুমি পুলিশের সাজে আমার ঘরে বসিয়া থাকিলে লোকটা ভয়েই পালাইবে, আমাকে আর বিরক্ত করিবে না।"

"আমাকে কি করিতে হইবে।"

"কিছুই না,—কেবল পোষাকটা লইয়া আমার ওখানে যাইও,—সেখানে সেইটা পরিয়া বসিয়া থাকিলেই সব কাজ হইবে।"

কিরণদাস হাসিয়া বলিলেন, "মজা আছে দেখিতেছি—নিশ্চয়ই কাল যাইব—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"আমি নিশ্চিন্ত থাকিলাম!"

"নিশ্চয়ই।"

ডাক্তার বিদায় হইল।—চতুর চূড়ামণি ক্ষাওেরাওকে জব্দ করিতে পারিবে ভাবিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পর দিবস যথা সময়ে পুলিশের পোযাক লইয়া কিষণদাস উপস্থিত হইলেন।

ডাক্তার বলিল, 'আসিয়াছ—আমি ভাবিতে ছিলাম।'

"ভাবিবার কথা কি! আমিতো নিশ্চিতই আসিব বলিয়াছিলাম।"

"এখন পোষাকটা পরিয়া ফেল।"

"হাঁ—সে কখন আসিবে?"

"এই এখনই আসিবে—তাহার আসিবার প্রায় সময় হইয়াছে।"

তবে আমি শীঘ্রই পোষাকটা পরিয়া ফেলি।"

কিষণদাস পোষাক পরিয়া ঘরে বসিলেন,—একটু পরেই ভৃত্য আসিয়া বলিলেন, "কালিকার সেই লোকটী আসিয়াছে।"

"এইখানে আসিতে বল।"

"আমি না হাসিয়া ফেলি।"

"চুপ—আসিতেছে।"

ক্ষাওেরাও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমনি কিষণদাস সত্বর গিয়া দ্বারে খিল দিলেন।

তাহাকে পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর ভাবিয়া ক্ষাওেরাওয়ের মুখ শুকাইয়া গেল,

তিনি বুঝিলেন তিনি ডাক্তারের ফাঁদে পড়িয়াছেন। পুলিশকে তিনি কি উত্তর দিবেন!

শ্লেষপূর্ণ স্বরে ডাক্তার বলিলেন, "ক্ষাণ্ডেরাও সাহেব—আসুন—আসুন। কাল আপনি বলিবার আগেই আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আসুন, আজও সেই আনন্দদান করুন।"

কিন্তু ক্ষাণ্ডেরাওয়ের পা উঠিল না,—তিনি অগ্রসর হইতেই পারিলেন না, তা বলিবেন কি? তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি কাতর স্বরে বলিলেন, "এ—এ—কি?"

ডাক্তার বলিল,—"আপনি দাঁড়াইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন! যদ্রূপ আপনার অভিরুচি। ইহার পরিচয় দিবার আকশ্যকতা নাই,—ইহার পোষাকেই তাহা মহাশয়কে বলিয়া দিতেছে,—আপনার সহিত আজ কথাবার্ত্তা হইবার সময় ইহাকে উপস্থিত রাথাই আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছি। আপনি কাল মন্নুবাঈয়ের মৃত্যুসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন—আমার নিকট দশ হাজার টাকা চাহিয়াছিলেন। মহাশয় যখন কাল বলিতেছিলেন যে আমি যে সকল পত্র মন্নুবাঈকে লিখিয়াছি, তাহা আপনি পাইয়াছেন,—মহাশয় জানিতেন যে আপনি সে সময়ে মিথ্যা—ঘোরতর মিথ্যা বলিতেছিলেন।"

ক্ষাণ্ডেরাও নড়িতে পারিলেন না,—একটা কথাও বলিতে সক্ষম হইলেন না।

ডাক্তার বলিল, "মহাশয় চলিয়া যাইবার পর- আমি পুলিশকে সমস্ত কথা বলিয়াছি, মন্নুবাঈর বুকে ছোরার আঘাত ছিল,—তাহাও মিথ্যা কথা,—মহাশয় জানিয়া শুনিয়া—এই মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। এখন যদি ইহার সম্মুখে সে সব কথা বলিতে সাহস কর—তবে বল।"

ক্ষাণ্ডেরাও নিস্তব্ধ—সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কণ্ঠ হইতে শব্দ নির্গত হইল না।

এবার ডাক্তার কিছু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"যদি সাহস থাকে বল।"

এবার ক্ষাণ্ডেরাও কথা কহিলেন, বলিলেন, "ডাক্তার গোকুলদাস,—আপনি কি বলিতেছেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না,—আমি আপনার নিকট কখনও এক পয়সাও তো চাহি নাই।

ডাক্তার উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিলেন, তাহার হাসি আর থামে না,—তৎপরে তিনি বলিলেন, "তবে কাল মহাশয় আমার কাছে কি জন্ত আসিয়াছিলেন? দশ হাজার টাকা দান করিতে নাকি?"

স্কাণ্ডেরাও গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাই আসিয়াছিলাম।"

ডাক্তার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তাহা হইলে আমিই মহাশয়ের নিকট বলিয়াছিলাম যে আমি মন্নুবাঈকে খুন করিয়াছি।"

স্কাণ্ডেরাও সবেগে বলিলেন, "হাঁ,—তুমি ইহাই বলিয়াছিলে, আর এখনও বলি তুমিই তাহাকে খুন করিয়াছিলে!"

"তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছ।"

"হাঁ—তুমিই নিজে বলিয়াছিলে যে তাহার বুকে ছোরা মারিয়াছ।"

ডাক্তার জাল ইন্‌স্পেক্টরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় আপনি সবই শুনিতেছেন, ইহার পর বিচারের সময়ে এ সব কাজে লাগিবে। এ পাজি মিথ্যাবাদী আসিয়া আমায় বলে কিনা, যে আমি মন্নুবাঈকে অনেক পত্র লিখিয়াছি,—সেই সব পত্র পাইয়াছে—এই বদমাইশ বলে কিনা যে আমি মন্নুবাঈর বুকে ছোরা মারিয়াছি!"

তখন স্কাণ্ডেরাও বুঝিলেন যে তাহাকে জালে ফেলিবার জন্যই ধূর্ত্ত ডাক্তার চিঠির কথা ও ছোরার আঘাতের কথা বলিয়াছিল, তিনি বুঝিলেন তিনি প্রকৃতই মহা বিপদে পড়িয়াছেন। ডাক্তার তাহাকে ধরাইয়া দিলে অন্ততঃ তাহার কিছুদিন জেল হইবে। কি ভয়ানক,—এই দুরাত্মা তাহাকে এত সহজে মুষ্টিমধ্যগত করিল। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল।

ডাক্তার সরোষে বলিল,—"এই দুর্ব্বৃত্ত, পশু—এই ঘোরতর বদমাইস,—আমাকে ভয় দেখাইয়া দশ হাজার টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছিল। যদি কেবল আমার কথা হইত,—তাহা হইলে যাহা হয় হইত,—এই দুরাত্মাকে ছাড়িয়া দিলে অন্যের উপরও এইরূপ করিবে—যথোচিত শিক্ষা না দিয়া ইহাকে কিছুতেই ছাড়িব না ইন্‌স্পেক্টর!

স্কাণ্ডেরাও কম্পিতস্বরে বলিলেন, "ডাক্তার ইহাই কি তুমি করিতে চাও?"

ডাক্তার সক্রোধে বলিলেন, "করিতে চাহি না।" চাহি কি না চাই—এখনই দেখিতে পাইবে।

স্কণ্ডেরাও কাতরস্বরে বলিলেন, "ডাক্তার—ডাক্তার -আমার উপর—"

"তোর উপায় দয়া —তোর উপর দয়া—বয়মাইস নির্লজ্জ, দুরাত্মা।"

"ডাক্তার, আমি চলিয়া যাইতেছি,—আর আমি এমন কাজ করিব না,—দয়াকর, —আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে—আমি জেলে গেলে তাহারা না খাইয়া মরিবে।"

"দয়া—দয়া—তোর উপর দয়া—"

ক্ষাণ্ডেরাও এবার আরও কাতর হইয়া কহিল "আমায় ছাড়িয়া দাও—আমি এমন কাজ আর কখনও করিব না,—দোহাই তোমার—দয়া কর—"

"তাহা—হইলে তুমি স্বীকার করিতেছ যে তুমি যাহা বলিয়াছিলে সব মিথ্যা—"

"হাঁ—হা—দয়া কর!"

"আচ্ছা,—যা বলি এখনই লিখিয়া দাও, তাহা হইলে ছাড়িয়া দিব,—ইনেস্পেক্টর,—এ বিষয়টা আপনাতে আমাতে—এই বদমাইশের যথেষ্ট সাজা হইয়াছে—

ইনেস্পেক্টররূপী কিষণদাস গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'কঠিন—কঠিন—'

ডাক্তার বলিল, "যাহা হইক, সে আমরা মিটাইয়া লইব—এখন যা বলি তাহাই লেখ।"

কোনরূপে রক্ষা পাইবার জন্য ক্ষাণ্ডেরাও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল,—সে কোন কথা না বলিয়া ডাক্তার তাহাকে যাহা লিখিয়া দিতে বলিল, তাহাই লিখিয়া দিল।—

ক্ষাণ্ডেরাও লিখিলেন, "আমি ডাক্তার গোকুলদাসের নামে ময়নাবাঈর খুনের মিথ্যা অপবাদ দিয়া ভয় দেখাইয়া টাকা লইবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম।—আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সমস্তই মিথা।—এজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি, আর কখনও এইরূপ কাজ করিব না। ডাক্তার দয়া করিয়া আমায় ছাড়িয়া দিলেন।"

ডাক্তার বলিল। "সই কর।"

ক্ষাণ্ডেরাও কম্পিত হস্তে সই করিল।—তখন ডাক্তার ইঙ্গিত করায়—কিষণ দাস দরজা খুলিয়া দিল,—ক্ষাণ্ডেরাও টলিতে টলিতে উৰ্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে পালাইল। সে যথার্থই বাটী হইতে গিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য ডাক্তার সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিল।—

তৎপরে ফিরিয়া গিয়া কিষণদাসকে বলিল, "এই সব বদমাইশকে এই রূপেই জব্দ করিতে হয়।"

কিষণদাস উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "ডাক্তার, তোমার বুদ্ধি প্রশংসনীয়—পুলিশে সম্বাদ দিলে একটা মস্ত গোলযোগ হইত।"

"সেই জন্যই তো বলি নাই।"

তখন উভয়ে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ক্যাণ্ডেরাও ডাক্তারের বাড়ী হইতে দূরে আসিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আজ আমি তোমার হাতে পড়িয়াছিলাম, তুমি বড় চালাক,—আমি গাধার মত তোমার চিটীর কথা, আর ছোরা মারার কথা বিশ্বাস করিয়া ছিলাম, আচ্ছা থাক,—আজ আমি হারিয়াছি,—কিন্তু তোমাকে শিক্ষা না দিয়া আমি নিরস্ত হইতে পারিব না।—যদি তোমার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না পারি,—তাহা হইলে আমার নাম ক্যাণ্ডেরাও নয়।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিষম শঙ্কট।

দামোদর ডাক্তারের বাটীতে প্রবেশ করিলে লালদাস দূরে দাড়াইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে ছিল। বহুক্ষণ সে অপেক্ষা করিল, কিন্তু দামোদর আসিল না।

লালদাস ডাক্তারের দরজায় নজর রাখিয়াছিল,—এক পলকের জন্যও তাহার চক্ষু দ্বার হইতে সরায় নাই—দামোদরকে তাহার বিশ্বাস ছিল না।—টাকা কড়ির ব্যাপারে সে কাহাকেও বিশ্বাস করিত না। টাকা লইয়া পাছে দামোদর সরিয়া পড়ে ভাবিয়া সে ডাক্তারের গৃহদ্বারে কঠোর দৃষ্টি রাখিয়াছিল। কিন্তু সে দেখিল দামোদর বাড়ীতে প্রবেশ করিল,—কিন্তু আর বাহির হইল না।—

প্রায় তিন চার ঘণ্টা কাটিয়া গেল, ক্রমে অৰ্দ্ধেক রাত্রি হইল,—তবুও দামোদর বাহির হইল না।—তখন ভয়ে তাহার সৰ্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

দামোদরের কি হইল! যদি সে পুলিশের হাতে তাহাকে দেখিত, তাহা হইলে সে ভীত হইত না—কিন্তু—কিন্তু—সে ডাক্তারের বাড়ীতে প্রবেশ করিল, আর বাহির হইল না কেন।—তবে - তবে কি—তবে তাহার কি হইল?

সে আর এক ঘণ্টা সেখানে বিলম্ব করিল, ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল,—সে আর বসিতে পারিল না,—বুকে সাহস করিয়া ডাক্তার বাড়ীর দ্বার সম্মুখে আসিল,—সে একটু পূৰ্ব্বে ডাক্তারকে বাটী হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছিল, ইহাতেই তাহার সন্দেহ ও ভয় আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল—তবে দামোদর কোথায়?

ডাক্তার বাটীতে নাই --তবে তাহার আর তো ভয় করিবার কারণ নাই—সে অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া, সাহস করিয়া ডাক্তারের দ্বারে আঘাত করিলে ভৃত্য দ্বার খুলিয়া দিল। লালদাস তাহাকে বলিল, "আমার একটী বন্ধু বৈকালে ডাক্তারের নিকট আসিয়াছিল—"

ভৃত্য ভ্রূকুটী করিয়া, বলিল, "যদি বৈকালে আসিয়া থাকে—তবে অনেকক্ষণ বাড়ী গিয়াছে।"

লালদাস ব্যগ্রভাবে বলিল, "আমি সেই পর্য্যন্ত বাহিরে এখানে তাহার অপেক্ষা করিতেছি—সে এই বাটীতে আসিয়াছিল, কিন্তু বাহির হয় নাই।"

তাহার কাতরস্বরে ভৃত্য একটু নরম হইল, বলিল, "বৈকালে একজন লম্বা লোক ডাক্তারের নিকট আসিয়াছিল বটে, সে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল।"

"ঠিক জান।"

"ঠিক জানি—আমিই তাহাকে ডাক্তারের ঘরে লইয়া গিয়াছিলাম।"

"তাহার পর?"

"সে নিশ্চয়ই বাটীতে চলিয়া গিয়াছে—"

"না, আমি বাহিরে থাকিয়া দরজার দিকে নজর রাখিয়াছিলাম সে বাহির হয় নাই।"

"পাগল আর কি? এখানে সে এতক্ষণ কি করিবে—ডাক্তার পর্য্যন্ত বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

"না সে এ দরজা দিয়া বাহির হয় নাই।"

"তাহা হইলে ও দিক্ কার দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।"

তাহা হইলে আর একটা দরজা আছে; তাহাকে ফাঁকি দিবার জন্য দামোদর অন্য দরজা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর আমি এখানে গাধার মত দাড়াইয়া আছি. —এতক্ষণ বোধ হয় সে টাকা লইয়া এদেশ ছাড়িয়া পালাইয়াছে।—

সে উর্দ্ধশ্বাসে দামোদরের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

দামোদরের স্ত্রী এত রাত্রি পর্য্যন্ত স্বামী বাড়ীতে না আসায় ক্রমে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। এখন লালদাস হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে—সে—কোথায়?"

লালদাস বলিয়া উঠিল, "সে কি এখনও এখানে আসে নাই?"

তাহার মুখ দেখিয়াই লালদাস বুঝিল যে দামোদর বাড়ীতে ফিরে নাই,—তবে কি দশ হাজার টাকা লইয়া সে স্ত্রীকে ফেলিয়াই পালাইয়াছে—সে দুই হাতে মাথা চাপিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

তাহার ভাব দেখিয়া দামোদরের স্ত্রী অতি ভীত হইল। দামোদরের স্ত্রীর নাম বাসু। বাসু অতি কাতরভাবে বলিল "দামোদর কোথায় ?"

"চুপ," বলিয়া লালদাস দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাসু কাতরে বলিল, "সে কোথায় ?"

"বলিতে পারি না; সে ডাক্তারের বাড়ী গিয়াছিল। সেই পর্য্যন্ত আমি তাহার জন্য রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিলাম—কিন্তু সে আসিল না, আমি ভাবিলাম সে বাড়ীতে আসিয়াছে, তাহাই ছুটিয়া আসিয়াছি।"

"ডাক্তারের বাড়ীতে কেন ?"

"একটু কাজ ছিল,—সে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল,—আমি বাহিরে তাহার অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

"তুমি তাহাকে বিপদে পাঠাইয়া নিজে বাহিরে ছিলে ?"

"না, তাহা নহে,—ডাক্তার আমাকে চেনে,—দামোদরকে চিনিত না ;—তাহাই সে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল,—সে বাহির হয় না দেখিয়া তখন আমি ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়াছিলাম,—একটা চাকর বলিল যে হাঁ দামোদর বৈকালে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই অন্য দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। এখন ডাক্তার পর্য্যন্ত নাই—তাহাই মনে করিলাম সে বাটীতে ফিরিয়াছে—"

বাধা দিয়া—"না—না—আসে নাই—তাহাকে তুমি কোথায় রাখিয়া আসিলে ?"

"কেমন করিয়া বলিব !"

বাসু কাঁদিয়া উঠিল,—বলিল, "তবে—তবে—উপায়—সে আমার কোথায় ?"

"বসো—ভেবে দেখি।"

সে কপালে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সন্ধান।

ক্যাওেরাও চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহেন—তিনি প্রথমে দামোদরের সন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। ভাবিলেন, কোন গতিকে দামোদর এই ব্যাপারে জড়িত

আছে, সেজন্য সে গা ঢাকা দিয়াছে—নতুবা এরূপ নিরুদ্দেশ হইত না। তাহার বিষয় সমস্ত অবগত হইতে পারিলে, এ রহস্য ভেদ করা কঠিন হইবে না। তিনি পুলিশে গিয়া সকল কথা বলিলেন। তাহার পর দামোদরের বাড়ী খানাতল্লাসী করিবার জন্য এক হুকুমনামা বাহির করিলেন।

দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী সঙ্গে ক্ষাণ্ডেরাও দামোদরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পুলিশ দেখিয়া বানু ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।—তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

পুলিশ কর্ম্মচারী বলিল, "আমরা তোমরা বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিব,—গোল না কর, কেহই কিছু বলিতে পারিবে না।"

বানু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি—আমি—কি করিয়াছি ?"

"তুমি কিছুই কর নাই।"

"আমার বাড়ী—এমন কি আছে—"

"তাহাই আমরা দেখিব।"

তাহারা তিনজনে তাহার ঘর অনুসন্ধান করিতে লাগিল,—এক কোণে একটা ভাল জামা দেখিয়া বলিল, "এটা কার ?"

এ জামা দামোদর এখানে রাখিয়াছিল, তাহা তাহার স্ত্রী জানিত না,—দেখিল এ জামা তাহার নহে,—ইহা অনেক ভাল। সে কি উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

একজন পুলিশ কর্ম্মচারী সেই জামার পকেট হইতে কতকগুলি কাগজ টানিয়া বাহির করিলনে, ইহা তিনখানি পত্র,—সকলগুলিরই শিরোনাম—'নরোত্তম দাস।'

যখন তাহারা মৃতদেহ প'ড়ো বাড়ীতে ফেলিয়া আসে তখন এই জামা নরোত্তমের গায়ে ছিল। পাছে কাপড়চোপড় থাকিলে, তাহার দেহ চেনা যায় এই ভাবিয়া দামোদর ও লালদাস তাহার বস্ত্রাদি খুলিয়া লইয়া আসিয়াছিল,—ইহার জন্য কেহ যে কখনও তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিবে, তাহা তাহাদের মাথায় প্রবেশ করে নাই—"

ক্ষাণ্ডেরাও ঘরের আর এক কোন হইতে একজোড়া জুতা টানিয়া বাহির করিলেন,—বলিলেন "এত জুতা কি তোমার স্বামীর ?"

এরূপ ভাল জুতা তাহার স্বামী কোথায় পাইবে—পাইলেও এ জুতা তাহার পায়ে হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এ জুতাও যে তাহার বাড়ীতে ছিল, বানু তাহাও জানিত না, সে কোন কথা কহিতে পারিল না। ক্ষাণ্ডেরাও জামা জুতা হস্তগত করিলেন।

সমস্ত গৃহ তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়া স্কাণ্ডেরাও বলিলেন, "তোমার স্বামী এখন কোথায় আছে—নিশ্চয়ই তাহা তুমি বলিবে না।"

"তাহা আমি জানি না।"

"জান বইকি, বলিবে না—"

"আমি কিছুই জানি না।"

স্কাণ্ডেরাও জামা ও জুতা পাইয়া স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে, দামোদরই নরোত্তমদাসকে খুন করিয়াছে, এখন লুকাইয়া আছে, তাহার স্ত্রী জানে সে কোথায় লুকাইয়া আছে, তাহা বলিবে না।"

তাঁহারা গমনে উদ্যত হইলে বানু তাহাদের পথরোধ করিয়া বলিল "তোমরা কেন—কেন—তাহাকে খুঁজিতেছ ?"

জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী বলিল, "আমরা তাহাকে চাহি—তুমি কিরূপে জানিলে !"

আমার মন বলিতেছে, নতুবা তোমরা আমাদের বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিবে কেন ?"

"সে কথা ঠিক।"

"যাহা খুঁজিয়াছিলে, তাহা কিছু পাইয়াছ ?"

"হাঁ—পাইয়াছি।"

"এখন আমার স্বামীকে তোমরা চাও ?"

"হাঁ—বোধ হয়—"

"কিসের জন্য ?"

বানুর কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল,—সে জড়িত কণ্ঠে বলিল, "বল—বল—কিসের জন্য ?"

তাহার কাতরতায় পুলিশ কর্ম্মচারীগণও একটু দুঃখিত হইল। একজন বলিল "তাহা বলিতে পারি না।"

বানু আরও ব্যাকুল হইয়া কহিল, "কেন, কেন ?"

"কেন—আমরা নিজেরাই জানি না—ঠিক কেন ?"

এবার বানু আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "তোমরা নিশ্চয়ই জান,—আমাকে বলিতেছ না,—"

"না—ঠিক নয়—আমরা জানিনা কেন পুলিশ তোমার স্বামীকে চাহিতেছে,—কারণ যে লোকের নিরুদ্দেশের জন্য তাহাকে প্রয়োজন, সে বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে তাহা আমরা নিশ্চিত জানিনা।"

বান্নু বিস্মিতভাবে বলিল, "মরিয়াছে !"

"হাঁ। তাহাই—"

বান্নু তাহাদের মুখের দিকে সজলনেত্রে কহিল "তবে কি তোমরা মনে কর—" এবার ক্ষাণ্ডেরাও কথা কহিলেন, "যখন মনে করার কথা বলিতেছ, তখন আমি বলি, কেবল ইহা মনে করিতেছি, তাহা নহে, আমি নিশ্চিত জানি—"

"কি জান—যা জান সব আমায় বল, নতুবা আমি এক দণ্ড বাঁচিব না।"

"এই জানি, যে লোক নিরুদ্দেশ হইয়াছে—সে আর বাঁচিয়া নাই ?

"বাঁচিয়া নাই ?"

হাঁ।—আর আমরা এই বাটীতে যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই যে, দামোদর সেই লোককে খুন করিয়াছে।"

এই বলিয়া তাহারা সকলে তাহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বান্নু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠানে আছাড়িয়া পড়িল—এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু কবলে।

ক্ষাণ্ডেরাওকে জব্দ করিয়া ডাক্তার গোকুলদাস যে আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।—সে ভাবিল, ক্ষাণ্ডেরাও হইতে তাহার আর কোন ভয় নাই,—এ আর কখনও সাহস করিয়া আমার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবে না। যদিও বলে, তাহা হইলে তাহার নিকট যাহা লিখিয়া লইয়াছি, তাহাতে সে একটু গোল করিলেই তাহাকে কিছুদিনের মত জেলে পাঠাইয়া দিতে পারিব।"

দামোদরের চিহ্নমাত্র নাই—তিনি তাহাকে আরক মাখাইয়া তাহার হস্তপদ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাকে ভস্মীভূত করিয়াছেন, সুতরাং সে বিষয়েও তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

আর তাহার বিষয় কেহই জানে না, জানিবার মধ্যে আছে এক জিনাবাঈ—তবে সেও অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে—সে ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে ঔষধের সহিত বিষ দিয়া তাহাকে হত্যা করিতে পারিত,—কিন্তু তাহার এ কার্য্য করিতে সাহস হইল না,—এই সেদিন মন্নুবাঈ—এই বাড়ীতে বিষ খাইয়া

মরিয়াছে,—আবার এত শীঘ্র আর একজন মরিলে সন্দেহ জন্মিতে পারে,—কি জানি যদি অনুসন্ধানই হয়, তবে ইহাকে নজরে নজরে রাখিতে হইবে,—যাহাতে সে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তাহার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, তাহাই করিতে হইবে।

পাপীর সুবিধা শয়তানে মিলাইয়া দেয়,—পরদিবস ডাক্তার নরোত্তম দাসের বাড়ীতে আসিলে জগন্নাথ নরোত্তম বলিলেন, "আর এ হাট খুলিয়া রাখা চলে না।"

ডাক্তার বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনি কি বলিতেছেন,—বুঝিতে পারিলাম না।"

"কথা এই—আর মিছামিছি এ বাড়ী রাখিয়া ফল কি? আমি মনে করিতেছি যে আমি এ বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইব—তবে—"

"আপনি জিনাবাঈর কথা ভাবিতেছেন?"

"হঁা—তাহাকে এ অবস্থায় কোথায় রাখি? হাসপাতালে পাঠানটা ভাল দেখায় না।"

"নিশ্চয়ই—লোকে বলিবে কি! জিনাবাঈর সহিত আমার বহুকালের পরিচয়,—আপনার যদি আপত্তি না থাকে,—আমি তাহাকে আমার বাড়ীতে অতিযত্নে রাখিতে পারি—আমার বাড়ীতে রোগী থাকিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। আপনার আপত্তি না থাকিলে আমি তাহাকে আমার বাড়ী লইয়া যাইতে পারি।"

"আমি তাহাকে চিনি না,—সুতরাং আপনি তাহাকে লইয়া গেলে, আমি সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট হইব না। তবে কথা হইতেছে, তাহাকে এখন কি এখান হইতে লইয়া যাইতে পারা যাইবে?"

"হা—অনায়াসে পাল্কী করিয়া লইয়া যাইতে পারা যাইবে।"

"তাহা হইলে যাহা ভাল বিবেচনা করেন, করুন।" সেইদিনই গোকুলদাস জিনাবাঈকে নিজ গৃহে লইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

তাহার বাড়ীর উপরে একটী ঘর ছিল। এক সময়ে একজন উন্মত্তকে রাখিবার জন্য তিনি এ ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এইঘর বন্ধ করিয়া দিলে, এ ঘর হইতে পালাইবার কাহারই সাধ্য ছিল না.—বিশেষতঃ ইহা এমনইভাবে প্রস্তুত করা যে, দারুণ চীৎকার করিলেও বাহিরের কেহ সেই শব্দ শুনিতে পাইত না। ডাক্তার ভৃত্যকে সেই ঘর পরিষ্কার করিয়া রাখিতে বলিলেন।

বৈকালে পাল্কী লইয়া ডাক্তার স্বয়ং নরোত্তম দাসের বাড়ী আসিলেন। তখনও জিনাবাঈর সেই অবস্থা, কোন জ্ঞান নাই,—অথচ সে নিদ্রিত নহে,—তাহার চক্ষুতে নিদ্রা নাই, তাহার চক্ষু অবিচলিত, যেন কাঠে নির্ম্মিত।

ডাক্তার তাহাকে ভাল করিয়া দুই তিনখানা চাদরে জড়াইয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, তৎপরে তাহাকে আনিয়া পাল্কীতে শোয়াইয়া দিলেন।

পাল্কী নিজের বাড়ীতে পৌছিলে, তিনি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া প্রাগুক্ত গৃহে লইয়া শয্যার উপর শায়িত করিলেন। ভৃত্যকে বলিলেন, "এ ঘরে কেহ আসিও না,—আমি নিজে ইহার ঔষধ আহারাদি দিব,—ইহার যে রোগ হইয়াছে, —তাহাতে অন্য লোক ইহার নিকট আসিলে তাহারই এই ভয়ানক রোগ হইতে পারে।"

ভৃত্যকে আর কিছু বলিতে হইল না, সে এই কথা শুনিয়াই পালাইল।

ডাক্তার জিনার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইহার জ্বর দেখিতেছি কাল সন্ধ্যা লাগাইত ছাড়িবে—তখন তাহার জ্ঞান হইবে,—কিন্তু তাহার শয্যা হইতে উঠিতে বিলম্ব আছে,—সুতরাং সে আমার কিছুই করিতে পারিবে না—বিশেষতঃ এখন সে সম্পূর্ণ আমার হাতের মধ্যে আছে, জিনা হইতে আর তাহার কোন ভয় নাই।"

ডাক্তার আবার ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে বলিল, "এখান হইতে কিছুতেই পলায়ন করিতে পারিবে না, তবে যদি কাহাকেও সংবাদ পাঠায়, তাহাই বা কিরূপে পারিবে—এ ঘরে আমি ব্যতীত আর কাহাকেও আসিতে দিব না ; আর ভয় নাই—আর ভয় নাই—"

গোকুলদাস অতি সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

গোকুলদাস জানিত—সন্ধ্যার সময় জিনাবাঈর জ্বর ছাড়িবে—সুতরাং জ্ঞানও হইবে। সে সন্ধ্যার সময় জিনাবাঈর গৃহে প্রবেশ করিল, শয্যা হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

জিনাবাঈ চক্ষুরুন্মিলন করিল। তাহার দৃষ্টি গোকুলদাসের উপর পতিত হইল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল,—সে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কি বলিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু সে এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, কথা কহিতে পারিল না।

ডাক্তার তাহার পার্শ্বে আসিয়া জিনার একখানি হাত ধরিয়া তাহার মুখ অবনত করিয়া কোমলস্বরে বলিল, "তুমি কি বলিতেছ ?"

অস্ফুটস্বরে জিনাবাঈর ওষ্ঠ হইতে নির্গত হইল, "আমি কোথায় ?—"

আর একদিন ডাক্তারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া, মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার পাইয়া সে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল।

ডাক্তার বলিল. "তুমি ঠিক আছ—এখনই তোমার জ্বর ছাড়িবে—তোমার ভারী ব্যারাম হইয়াছিল,—আমি তোমার চিকিৎসা, ও শুশ্রূষা করিতেছি।"

জিনাবাঈ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া অতি অস্পষ্ট স্বরে বলিল. "তুমি!—তুমি!'

ডাক্তার বলিল, "হঁা—আমি—অন্যে তোমায় হাসপাতালে পাঠাইতেছিল,—আমি যত্ন করিয়া তোমাকে আমার বাড়ীতে আনিয়া চিকিৎসা শুশ্রূষা করিয়া যাহাতে তুমি শীঘ্র আরোগ্যলাভ কর সেজন্য চেষ্টা করিতেছি। তাহারা সে বাটী ছাড়িয়া দিয়াছে—"

সে বাড়ীর কথায় জিনাবাঈর যুগপৎ সমস্ত কথায়ই মনে উদিত হইল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিল।

জিনাবাঈর সম্পূর্ণ জ্ঞান আসিয়াছে—তাহার সমস্ত কথা মনে পড়িয়াছে—সে ডাক্তারের করকবলিত হইয়াছে—কিন্তু ডাক্তার ইচ্ছা করিলে তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় অনায়াসেই হত্যা করিতে পারিত,—যদি তাহাকে প্রাণে মারাই ডাক্তারের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাহার যথেষ্ট সুবিধা ছিল,—বোধ হয় তাহার কোন গুপ্ত অভিসন্ধি সাধনের জন্যই সে তাহাকে প্রাণে না মারিয়া নিজ বাড়ীতে আনিয়াছে।

যাহা হউক মৃত্যু ভয় নাই,—জিনাবাঈ এইরূপ ভাবিয়া মনকে অনেকটা শান্ত করিল।

সে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল,—ডাক্তার বলিল, "এই ঔষধটা খাও—তাহার পর এই দুধটা খাও ইহাতে বল পাইবে—আর কোন ভয় নাই—কেবল দুর্ব্বলতা মাত্র—বিপদের আশঙ্কা কাটিয়া গিয়াছে।"

জিনাবাঈ কথা কহিল না,--ডাক্তার যত্নে তাহাকে ঔষধ পান করাইল,—তৎপরে তাহার মুখে চামচে করিয়া দুধ দিতে লাগিল,—জিনাবাঈ নীরবে ধীরে ধীরে সবটা দুধ, পান করিল। তাহাতে সে অনেকটা বল পাইল,—আবার বলিল, "আমি কোথায় ?"

এবার তাহার স্বর অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। তেমন ক্ষীণ নহে।

"আমি কোথায় ?"—নরাধম।

বিজয়া প্রেস, কলিকাতা।

ডাক্তার বলিল, "আমার বাড়ীতে।"

"তাহা হইলে—এই ঘর—এই ঘর না তুমি একদিন আমায় দেখাইয়াছিলে—তাহা হইলে আমি সেই পাগলের ঘরে রহিয়াছি—"

"হাঁ—তাহাতে কি হইয়াছে ?"

"আমি—আমি তবে পাগল নই।"

"অধীর হইও না—অধিক কথা কহিও না। তাহা হইলে আরও দুর্ব্বল হইবে।"

"আমি—আমি—আমায় তুমি বল—আমি কি যথার্থই পাগল হইয়াছি।"

"আমি মনে করি না,—তবে অন্যান্য ডাক্তারগণ তোমায় পাগল বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। আমি তোমাকে না রাখিলে তোমাকে পাগলা গারদে যাইতে হইত।"

জিনাবাঈ অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "আমি পাগল নই—পাগল নই—"

"এখন নও,—যখন তাহারা তোমায় দেখিয়াছিলেন, তখন তোমার মাথা খারাপ হইয়াছিল।"

"তাহা হইলে—তাহা হইলে—এখন—আমি পাগল নই—আমাকে যাইতে দিবেন।"

জিনাবাঈ অত্যন্ত কাতরভাবে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিল। ডাক্তার বলিল তোমার কি এখন যাইবার অবস্থা আছে ?"

"এখন নয়—দুদিন পরে ?"

"তোমার ভাল হইতে এখন অনেক দিন লাগিবে।"

"যখন—যখন আমি বেশ ভাল হইব—"

"হাঁ—তখন তুমি যাইতে পারিবে ; তবে যতদিন তোমার মাথা ঠিক না হয়, ততদিন তোমাকে এখানেই থাকিতে হইবে।"

"তুমি—তুমিই এইমাত্র বলিলে—আমার মাথা ঠিক হইয়াছে—"

এই বলিয়া জিনাবাঈ কাঁদিয়া ফেলিল,—ডাক্তার বলিল, "আমি হইলে কাঁদিতাম না—কাঁদিয়া কোন লাভ নাই—বরং তোমার অসুখ বাড়িবে !"

বহুক্ষণ জিনাবাঈ নীরবে রহিল, অবশেষে ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে লুকাইও না—কতদিন তুমি আমাকে এখানে আট্‌কাইয়া রাখিতে চাও ?"

"সেটা পরে যাহা ঘটে, তাহার উপর নির্ভর করিতেছে।"

"তুমি—তুমি কি আমাকে মৃত্যু পর্য্যন্ত এখানে আটকাইয়া রাখিতে চাও ?"

"না—তাহা নয়—তুমি ভাল হইলে এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।"

"আমি বুঝিয়াছি,—কেন আমায় কষ্ট দাও, তোমার হাতে পড়িয়াছি—কি করিবে স্পষ্ট বল,—এরূপ সন্দেহে কিছুদিন থাকিলে যথার্থই আমি পাগল হইয়া যাইব।

"অনর্থক তুমি অধীর হইতেছ—ইহাতে দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পাইবে—সম্ভবতঃ আবার জ্বরও হইতে পারে। তোমার স্থির হইয়া থাকাই উচিত।"

"আমি—আমি—কিরূপে স্থির থাকিব। আমি কি সব জানি না ?

"হাঁ—তাহাতেই গোল,—যতদিন তোমাকে—স্পষ্টতঃ বলিতে কি—যতদিন আমি নিরাপদ না হইব, ততদিন তোমাকে এখানে থাকিতে হইবে।"

"কতদিন—সে কতদিন—"

"স্থির হও, বৃথা অধীর হইতেছ, এখন সে কথা বলিবার সময় নয়।"

"কেন—কেন ?"

"কেন—সে তোমার নিজের উপর নির্ভর করিতেছে ?"

"আমার নিজের উপর ?"

"হা, তোমার নিজের উপর—সে সব কথা পরে হবে। তোমার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত হইলেই—আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব।"

"দেবে—দেবে—"

"হাঁ, নিশ্চয়ই দিব।"

"হয়তো—হয়তো—তুমি আমাকে কিছু ভয়ানক কাজ করিতে বলিবে।"

"মৃত্যুর—কবলে পড়িয়া মানুষ অত শত ভাবে না।"

"তবে তুমি আমায় অজ্ঞান অবস্থায় মারিয়া ফেলিলে না কেন ?"

"মনে কর সেটা কৃতজ্ঞতার জন্য মারি নাই ; তুমি এক সময় আমার প্রাণ রক্ষা করিয়া ছিলে। যাহা হউক,—বৃথা অধীর হইও না—সবই সময়ে বুঝিতে পারিবে।" এখানে তোমার কোন কষ্ট হইবে না,—আমি তোমার আহারাদি আনিয়া দিব—আর জানইতো এ ঘর হইতে পলাইবার কোন উপায় নাই—চেঁচাইলেও বাহিরের কেহ শুনিতে পাইবে না।"

এই বলিয়া ডাক্তার সাবধানে দ্বার বন্ধ করিয়া সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অভাগিনী জিনাবাঈ হতাশভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিল। তাহার উঠিবার শক্তি ছিল না। ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

পরিবর্ত্তন।

"ওমা কি ঘেন্না, কি লজ্জা, এমন তো' কখনও দেখিনি!" হ'লেই বা সৎ-শাশুড়ী, তাই ব'লে কি কচি বৌটাকে এমন ক'রে মেরে ফেল্‌তে হয়? আহা! দুধের মেয়ে ওকি কখনও একাদশী কোর্ত্তে পারে! তুই আবার আমাকে শাস্ত্র দেখাতে আসিস্‌, তোর একটু লজ্জা হ'ল না! আমি না তোর মার বয়েসী! শাস্তর! বাচ্‌পতের মেয়েটা ৯ বছর বয়সে রাঁড় হ'ল, হরি বাচ্‌পোত তখন তার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, সে নিজে হাতে তাকে একাদশীর দিন ভাত খাইয়েছে, তা' আমি নিজ চক্ষে দেখিছি। আম্বুবতীর তিন দিন আগে থেকে বড় হাঁড়ায় ক'রে ভাত ভিজিয়ে রাখত। মিত্তিররা ত' না হয় একে বড় লোক, তায় কায়েত তাদের কথা ছেড়েই দিলুম। তুই না মেয়ের মা, পরের মেয়ের সঙ্গে এ রকম ব্যাভার কোর্ত্তে তোর একটু বাধে না গা! তোর মেয়ে কি কখনও রাঁড় হবে না, কখনও একাদশী কোর্ত্তে হবে না? আমি আজকের নই, আমি এখন মরছি নি, আমিই আবার আস্‌বো, দেখে যাবো ধম্মো এর বিচার করেন কিনা! এই বোশেখ মাসের রদ্দুর, তুই কিনা কাঁচ মেয়েটাকে এক ফোটা জল না দিয়ে রেখেছিস্‌। এর ফল তোকে হাতে হাতে ভুগতে হবে। ধম্মে সইবে না, সইবে না!"

দম বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়ায় বামা ঠাকুরঝিকে বাধ্য হইয়া থামিতে হইল! বৈশাখের দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে চারিদিক দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। একটি বৃহৎ অট্টালিকার অন্দর মহলে চণ্ডিমণ্ডপের দালানে দাঁড়াইয়া বামা ঠাকুরঝি ভীষণ রণ-রঙ্গের অভিনয় করিতেছিলেন। বামা ঠাকুরঝি বান্দীপুর গ্রামের বধু মাত্রেরই ঠাকুরঝি এবং কন্যা মাত্রেরই বামা দিদি। বেঁটেখাট গড়ন, পাকা মিশির রং, বয়স অনিশ্চিৎ, যুবতী বলিলেও চলে, অথবা প্রৌঢ়া বলিলেও চলে। ঠাকুরঝি চির-সধবা, পরণে একখানি লাল কস্তা পেড়ে সাড়ী, হাতে দুগাছি অতি প্রাচীন সোনার বালা এবং সীমন্তে সুদীর্ঘ সিন্দুর লেখা! বামা ঠাকুরঝি সধবা বটে, কিন্তু গ্রামে কেহ কখনও ঠাকুর জামাইকে আসিতে দেখে নাই। গ্রামের বধুরা কখনও ঠাকুর জামাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা করিত না, যদি কোন প্রগল্‌ভা মেয়ে বাপের বাড়ী আসিয়া বামা দিদিকে ঠাট্টা করিয়া তাহার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে বামা তাহাকে বিলক্ষণ দশ

কথা শুনাইয়া দিত। কোন্দলে কেহ কখনও বামাকে জিতিতে পারে নাই, সে যেখানে চেঁচাইয়া জিতিতে পারিত না, সেখানে কাঁদিয়া জিতিত, পিতৃ-মাতৃ ভ্রাতৃ-পুত্র-কন্যা-হীনা বন্ধ্যা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বন্দীপুর গ্রামের সকলেই শমনের ন্যায় ভয় করিত এবং সম্ভব হইলে দূর হইতে দেখিয়া সরিয়া পড়িত।

এ হেন দিগ্বিজয়ী বামা ঠাকুরঝির সম্মুখে দাঁড়াইয়া হরবল্লভ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নী দারুণ গ্রীষ্মেও অষ্টমী পূজার জন্য উৎসর্গীকৃত ছাগ-শিশুর ন্যায় কাঁপিতেছিলেন।

বন্দীপুর নদীয়া জেলার একখানি বিশিষ্ট গ্রাম। গ্রামের মুখোপাধ্যায় বংশ বহুকালের প্রাচীন জমীদার। লোকে বলিত তাঁহারা নবাবী আমলের জমীদার। চারিটি পুত্র রাখিয়া হরবল্লভ মুখোপাধ্যায়ের প্রথমা পত্নী যখন ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তখন বাধ্য হইয়া সংসার রক্ষার জন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, কারণ হরবল্লভের আপনার বলিতে সংসারে অপর কেহ ছিল না! দেখিয়া শুনিয়া নিজে পছন্দ করিয়া এক দারিদ্র ব্রাহ্মণের মাতৃহীনা কন্যাকে হরবল্লভ যখন বিবাহ করিয়া লইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। গ্রামের লোকে কত কথা বলিল, বৃদ্ধেরা বলিলেন হরবল্লভ একটা হা'ঘরের মেয়ে আনিয়াছে, এইবার মুখুর্য্যেদের অচলা লক্ষ্মী বুঝি চঞ্চলা হইলেন, গ্রাম্য-গেজেটগণ বলিয়া বেড়াইলেন যে নূতন বৌ আসিয়াই ছেলে চারিটার মুখের ভাত কাড়িয়া লইয়া বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে, হরবল্লভ ইহার মধ্যেই ভেড়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ফলে কাহারও কথা সত্য হইল না, বিমাতার কি এক আশ্চর্য্য গুণে বশীভূত হইয়া মাতৃহীন শিশু চতুষ্টয় বিমাতার প্রতি আকৃষ্ট হইল। মুখুর্য্যেদের নূতন বধূ অঘটন ঘটাইল দেখিয়া গ্রামে যত ঈর্ষান্বিতা পরশ্রীকাতরা রমণী ছিলেন তাঁহারা একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, পাড়ায় পাড়ায় মজলিস্ বসিয়া গেল, ঘোরতর তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, নূতন বধূ নিশ্চয়ই ডাকিনী। যে প্রবল বলে, প্রবল প্রতাপান্বিত হরবল্লভ মুখোপাধ্যায় মেষশাবকে পরিণত হইয়াছেন, তাহার বলে যে মাতৃহীন অনাথ শিশু চতুষ্টয় বশীভূত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? স্থির হইয়া গেল, ছেলে চারিটির রক্ষার আর কোনও উপায় নাই! হরবল্লভের নূতন স্ত্রী নীরবে সাধারণ গৃহস্থ বধূর ন্যায় সংসারে মিশিয়া গেল। তাহার ঐশ্বর্য্য, তাহার সুখ সম্পদ দেখিয়া যাহারা জ্ব'লিয়া উঠিয়াছিল তাহারা তুষের আগুণের ন্যায় ভিতরে ভিতরে পুড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নূতন বধূ বিবাহিত

জীবনের বিশ বৎসর কাটাইয়া দিল, কিন্তু বন্দীপুর গ্রামে তখনও তাহার নূতন বৌ নাম ঘুচিল না। হরবল্লভের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে দুই তিনটী সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কন্যা মাত্র জীবিতা ছিল, পিতা আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন শেফালিকা। অনুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়সে হরবল্লভের মৃত্যু হইয়াছিল, তখন তাঁহার পুত্র চতুষ্টয় ও কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র সংসারের ভার লইয়াছিলেন। তিনি ধীর, তীক্ষবুদ্ধি ও শান্তস্বভাব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটি বিশেষ দোষ ছিল। কলিকাতায় থাকিয়া পাঠাভ্যাস কালে তিনি সুরাপান করিতে শিখিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া পিতার সহস্র তিরস্কার ও লাঞ্ছনা সত্বেও তিনি এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সামান্য মাত্র সুরা উদরস্থ হইলে তাঁহার আর জ্ঞান থাকিত না। পিতার মৃত্যুর পর ছয় মাস কাল হেমচন্দ্র জমিদারী কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় অত্যধিক সুরাপান হেতু অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। একবৎসরের মধ্যে দুইটি শোক পাইয়া হরবল্লভের পত্নী শয্যা গ্রহণ করিলেন। তখন হেমচন্দ্রের পত্নী নয়নমঞ্জরীর বয়ক্রম দ্বাবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। হরবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র পরেশচন্দ্র জন্মাবধি সংসারের প্রতি উদাসীন, তিনি বাল্যকালাবধি সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন সংসারের বা বিষয় সম্পত্তির ধার ধরিতেন না। তাঁহার ন্যায় সুন্দর সুপুরুষ, সুকণ্ঠ গায়ক দেশে অত্যন্ত বিরল ছিল। তাঁহার পত্নী নিঃসন্তান বলিয়া মনের দুঃখে কাহারও সহিত মিশিতেন না। তৃতীয় পুত্র নরেশচন্দ্র হরবল্লভ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান এবং বিষয় কর্ম্মে পারদর্শী, কিন্তু কূটবুদ্ধির জন্য পিতার প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। তিনি ধনীর গৃহে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী নিরুপমা দেবী পিতার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে এবং শ্বশুরের জীবন কালে দুইটি পুত্রের জননী হইয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না; তবে শ্বশুর যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বাধ্য হইয়া স্বামীর বিমাতাকে মানিয়া চলিতেন। হরবল্লভের চতুর্থ পুত্রের নাম যোগেশচন্দ্র, পিতার মৃত্যুর একবৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর হরবল্লভের পত্নী প্রায় দুই বৎসর কাল সংসারের কার্য্য দেখেন নাই। হেমচন্দ্রের পত্নী তখন সবে বিধবা হইয়াছেন, মধ্যমের পত্নী সন্তান কামনায় দেবসেবা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, সংসারের দিকে চাহিয়াও দেখিতেন না। কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া সেজ বৌকে সংসারের ভার লইতে হইল। কর্ত্তৃত্ব বড় মধুর, যাঁহারা

একবার ক্ষমতা হাতে পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই তাহা ছাড়িতে পারেন না, বিশেষতঃ একবার গৃহিণী হইয়া পুনরায় ঘোমটার আড়ালে নববধূ সাজিতে পারা যায় না। সেজ বৌ ত' মানুষ বটে, তাহার ত' রক্ত মাংসের দেহ, সেও পারিল না। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর দুইবৎসর পরে শেফালিকা প্রসব করিতে পিত্রালয়ে আসিল, তখন হরবল্লভের পত্নী তাহাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ছয় মাসের পুত্র লইয়া কন্যা যখন শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল, তখন কার্য্যাভাবে হরবল্লভের পত্নী সংসারে মনোনিবেশ করিতে গিয়া দেখিলেন যে তাঁহার স্থান অপরে অধিকার করিয়াছে। সেজ বৌ ছাড়িবার পাত্রী নহেন, সে বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি ছাড়িয়া দিবে না প্রতিজ্ঞা করিল, তখন হরবল্লভের পত্নী ভাবিয়া দেখিলেন সংসার ত' তাঁহার নহে, তিনি স্বামী পুত্রহীনা, স্বামীর মৃত্যুর সহিত সংসারের সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গিয়াছে। পুত্র ও পুত্রবধুগণ তাঁহার নহে, তাঁহার যে আপনার সে অন্যস্থানে সংসার পাতিয়া বসিয়াছে, তখন তিনি ইহকাল ছাড়িয়া পরকালের কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। বিধবা বড় বধুকে আগ্‌লাইকা রাখা ও দেবসেবা করা, তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিল। সেজ বৌ দেখিল যে শাশুড়ী থাকিতে, বড় বধু মেজ বধু থাকিতে, তাহার সংসারে কর্ত্রী হইয়া বসা ভাল দেখায় না, তখন সে বড় বধুকে ভাঙ্গাইয়া লইবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে লাগিল।

একাদশীর দিন প্রাতঃকালে বড় বধূর মুখে তাম্বুলরাগ দেখিয়া হরবল্লভের পত্নী অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন এবং যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন। বড় বৌ তখন সেজ বৌর নিকট বিশেষ ভরসা পাইয়াছে, শাশুড়ীর মুখের উপর কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু সেজ বৌর ঘরে যাইয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। সেজ বৌও কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু তাহার পর মধ্যাহ্নে রণচণ্ডীরূপে বামা ঠাকুরঝির আবির্ভাব হইল।

"তুই ভেবেছিস্ কি যে এর ফল তোকে ভুগ্‌তে হবে না, ঘোর কলি হলেও এখনও ধর্ম্ম আছেন, এখনও চন্দর সূর্য্যি উঠ্‌ছে, এই দুধের মেয়েকে একাদশী করান—তোর কি ভাল হবে ভেবেছিস্—তুই কি ভালোর মাথা খাবিনি!" যাতনা ক্লিষ্টা বিধবা আর সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময়ে মেজ বৌ পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা বামা পিশি, তুমি এত কোরে কাকে বল্‌চো গা?" মেজ বৌকে দেখিয়াই বামাপিশি রাগে গরগর করিয়া বকিতে বকিতে দ্রুতবেগে সেজ বৌর ঘরে প্রবেশ করিলেন।

মেজ বৌকে দেখিয়া বামা পিশির পলায়নের একটু বিশেষ কারণ ছিল, বড় বধুর পিত্রালয়ের দরুণ তাহার সহিত বামা পিশির একটু সম্পর্ক ছিল। একদিন সন্ধ্যার পর বামা পিশি যখন বড় বধুর ঘর হইতে বাহির হইতেছেন, তখন মেজ বৌ, তাহাকে, নারায়ণের শিতলের জন্য কলিকাতা হইতে আনীত ২৫টি ল্যাংড়া আমের সহিত গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়াছিল, তদবধি বামা পিশির ন্যায় জাঁহাবাজ্ মেয়েও মেজবধূকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিত।"

মেজ বৌ আসিয়া শাশুড়ীর হাত ধরিয়া উঠাইল, দেখিল ঘামে শাশুড়ীর সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, আর চোখ্ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। হরবল্লভের স্ত্রী মেজবৌএর সাহায্যে শয়নকক্ষে যাইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন, মেজবৌ অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও কোন কথা জানিতে পারিল না। হতাশ হইয়া যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন সেজ বৌএর ঘর হইতে উচ্চহাস্যধ্বনি উঠিয়া মুখোপাধ্যায়দিগের চক্ মিলান দালানে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। মেজ বৌ বুঝিল ইহা সেজ বৌএর বিজয় দুন্দুভির নিনাদ।

সন্ধ্যাকালে মেজ বৌ বিস্মিতা হইয়া দেখিল যে, বামা ঠাকুরঝির ভোজনের জন্য রান্নাঘরে বিরাট আয়োজন হইয়াছে। কোন কথা না বলিয়া মেজ বৌ ধীরে ধীরে শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিল, সংসারে তাহার কোনই অধিকার ছিল না, কারণ তাহার স্বামী তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করিত না।

২

"মা, ওমা, ওঠ না মা, তোমার পায়ে পড়ি, ওঠ না মা, বেলা যে এক প্রহর হোতে চোল্লো, ওঠ না মা, তুমি না উঠ্‌লে যে ঠাকুর ঘরে যেতে পারছি না।"

দ্বাদশীর দিন প্রভাতে সিক্তবস্ত্রে মেজ বৌ শাশুড়ীর শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছে। ছোট বধূ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। বৈশাখের বেলা, তখন রৌদ্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, দারুণ উত্তাপে আকাশে যে সীসার রং ধরিয়াছে। পূজার ঘরের সম্মুখে পুরোহিত আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিতেছেন যে, শিব মন্দির ও নারায়ণের গৃহ তখনও পরিষ্কৃত হয় নাই। পুরোহিত তাঁহার জীবনে কখনও এরূপ বিশৃঙ্খলা দেখেন নাই। সেজ বৌ ও বড় বৌ ব্যস্ত হইয়া সমস্ত অন্দরময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু ঠাকুরঘরের দিকে চাহিয়াও দেখিতেছে না। এমন সময় একখানা বড় গাড়ি আসিয়া অন্দরের দেউড়িতে দাঁড়াইল, কে যেন নামিয়া আসিয়া করুণ বামাকণ্ঠে ডাকিল "মা" কণ্ঠস্বর শুনিয়া মেজ বৌ, ছোট বৌকে বলিল "ছোট বৌ তুই

শীগ্‌গির নেমে যা, শিউলি এসেছে, তাকে তোর ঘরে নিয়ে যা, আমি ততক্ষণ মাকে বার করছি।" তাহার পর দরজায় খুব জোরে ধাক্কা দিয়া, জোরে বলিয়া উঠিল "ওমা, শিউলি এসেছে মা, শিগ্‌গির দোর খোল, ওর সাম্‌নে আমাদের মুখ আর পুড়িও না।" রুদ্ধ দ্বার তথাপি ও মুক্ত হইল না।

শেফালিকা ননদ সঙ্গে করিয়া দেবরের বিবাহ উপলক্ষে পিত্রালয়ে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল। তাহার পুত্রটি আসিয়া বাড়ীময় মাতামহীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। মাতামহীকে কোথাও না পাইয়া শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল "দি'মা, ওদি'মা!" মেজ বৌ তখন অভিমান ভরে বলিয়া উঠিল "মা, নমু ডাকৃছে।" এমন সময় দেখিতে দেখিতে শেফালিকা উপরে আসিয়া পড়িল। সে মাতার একমাত্র সন্তান, বহুদিন অদর্শনের পর জননীকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইয়া পড়িয়াছে। ছোট বৌ তাহাকে নিজে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, বরঞ্চ সে ছোট বৌকে ধরিয়া লইয়া উপরে আসিল। ছোট বৌ তখন তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়াইয়া কুটুম্বিনীর অভ্যর্থনার জন্য নিচে চলিয়া গেল।

শেফালিকা আসিয়া দেখিল যে মাতার শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ, দ্বারের পার্শ্বে মেজ বৌ অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে, আর নমু তাহার ছোট ছোট হাত দুখানি দিয়া দুয়ারে ধাকা মারিতেছে ও ডাকিতেছে "দি'মা, ও দি'মা।" শেফালিকা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর আকুলকণ্ঠে ডাকিল "মা।" ভগ্নহৃদয়ের কোন ছিন্নতন্ত্রীতে সন্তানের করুণ আহ্বান আঘাত করিয়া কি এক অভিনব ভাবের সৃষ্টি করে, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারিয়াছে। হরবল্লভের পত্নী আর থাকিতে পারিলেন না, এইবার রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইল। কন্যাকে দেখিয়া মনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, মাতাপুত্রী দৃঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, আর মেজ বৌ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

নমু দেখিল তাহারই বিলক্ষণ লোক্‌সান্‌। সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখন মেজ বৌ তাহাকে উঠাইয়া লইয়া তাহার মাতামহীর ক্রোড়ে দিল, নমু কাঁদিয়া জিতিল এবং সকলের ক্রন্দন থামাইল। তখন শিউলি মেজ বৌকে বসাইয়া সে যতদূর জানিত তাহা শুনিল, তাহার পর হরবল্লভের পত্নী অশ্রুজলের সঙ্গে মিশাইয়া অবশিষ্টটুকুও বলিয়া দিলেন।

ইত্যবসরে ছোট বৌ শেফালিকার ননদকে লইয়া সেজ বৌর ঘরে যাইয়া দেখিল যে সে মুড়ি দিয়া বিছানায় শুইয়া আছে, আর বড় বৌ তাহার মাথা টিপিতেছে।

ব্যাপার দেখিয়া ছোট বৌ স্তম্ভিত হইয়া গেল, কারণ অর্দ্ধদণ্ড পূর্ব্বে সেজ বৌএর চীৎকারে বাড়ীতে কাক কোকিল বসিতে পারিতেছিল না। সেজ বৌ বাধ্য হইয়া শেফালিকার ননদকে অভ্যর্থনা করিল। ননদ শেফালিকাকে অনেকক্ষণ না দেখিয়া চঞ্চলা হইতেছিল, কিন্তু ছোটবধূ তাহাকে সেখানে রাখিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

মাতার শয়নকক্ষে সেফালিকা মাতাকে বলিতেছিল "মা, তবে আর কিসের জন্য থাকা, তুমি আমার সঙ্গে চল।" মাতা উত্তর করিলেন "তাই যাব মা, স্বামীর সংসার বলে তাই এতদিন পড়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি আমাকে না তাড়ালে এরা তিষ্টিতে পারবে না। আমি স্বামীপুত্রহীনা, এদের সংসারে আর আমার কোন প্রয়োজন নাই।" মেজ বৌ স্থির হইয়া বসিয়াছিল, মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিতে-ছিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল "মা তুমি কি সত্যসত্যই আমাদের ছেড়ে যাবে?" তাহার কথা শুনিয়া হরবল্লভের পত্নীর চক্ষু আবার জলে ভরিয়া আসিল, "আমি না গেলে তোদের সংসারে শান্তি আসবে না মা। তাঁর সঙ্গে আমার দিনও ফুরাই-য়াছে, তোমাদের হাতে ক'রে মানুষ করিছি, এখন তোমরা নিজের সংসার বুঝে সুঝে নাও।" মেজ বৌ শাশুড়ীর পা জড়াইয়া কাঁদিয়া পড়িল, বলিল "তুমি যেও না মা, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না, আমার যে আর কেউ নেই মা, শ্বশ্রু বন্ধ্যা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

শেফালিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া সেজ বৌএর ঘরে গেল, তাহাকে দেখিয়া কেহ কথা কহিল না, তাহার ইসারায় তাহার ননদ উঠিয়া আসিল। পথে ননন্দা ও ভ্রাতৃবধূতে যে কথোপকথন হইল, তাহা শুনিয়া ননন্দার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া গেল। তখন উভয়ে উপরে যাইয়া হরবল্লভের পত্নীর কক্ষে প্রবেশ করি-লেন, শেফালিকা ও তাহার ননদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে হরবল্লভের পত্নী তখনই বন্দীপুর ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ছোট বৌ ঠাকুর ঘরের কাজ সারিয়া শাশুড়ীর নিকট আসিয়া বসিল। পরেশচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্র আহার করিতে আসিয়া বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে আহারের সময়ে মাতা তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন না, দুই ভাই নীরবে আহার করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরের পর নরেশচন্দ্র আসিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, আহারান্তে পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেলেন, কি হইয়াছে তাহা কেহই জানিল না। হরবল্লভের পত্নী যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন তখন মেজ বৌ ও ছোট বউ কাঁদিয়া কহিল "মা তুমি যদি যাবে ত দ্বাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া যেও না, আমা-

দিগের অকল্যাণ কেয়ো না।" হরবল্লভের পত্নী কি ভাবিয়া আহার করিতে সম্মতা হইলেন। তৃতীয় প্রহরে সকলের আহার সমাপ্ত হইল।

শেফালিকার সহিত মা চলিয়া যাইতেছেন, মেজ বৌ এই সংবাদ স্বামী ও দেবরগণের নিকট পাঠাইয়া দিল। সংবাদ আসিল, মেজ বাবু ভিন্নগ্রামে যাত্রা শুনিতে গিয়াছেন, ছোট বাবু মাছ ধরিতে গিয়াছেন, সেজ বাবু বলিয়া পাঠাইয়াছেন "শিউলির মা যদি চলিয়া যান ত' আমি কি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিব?" লজ্জায় ঘৃণায় মেজ বৌর মুখ লাল হইয়া গেল। হরবল্লভের পত্নী স্বামীর শয়নকক্ষে ও ঠাকুরঘরে প্রণাম করিয়া ধীরপদে গাড়ীতে উঠিলেন, শেফালিকা তাহার পুত্র ও ননদ লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিল. মেজ বৌ ও ছোট বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিল। তখন সেজ বৌএর ঘরে মস্ত তাসের আড্ডা বসিয়াছে, হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে। যখন চোখ্ মুছিতে মুছিতে মেজ বৌ ও ছোট বৌ অন্দরে প্রবেশ করিল তখন বামা ঠাকুরঝি উঠানে পানের পিক্ ফেলিতে আসিয়াছিল, তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন "বলি তোদের আবার হলো কি, 'সৎ শাশুড়ি বিদেয় হলো, ওতো ফোড়া গল্'ল,' তার জন্যে আবার চোখে নোনা পানি কেন?"

৩

শরতের শেষ বড়ই মধুর, বড়ই সুন্দর। এই সময়ে বৈদ্যনাথ মধুপুর অঞ্চলে অনেক বাঙ্গালীর সমাগম হইয়া থাকে। বৈদ্যনাথে ও মধুপুরে একটি আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা বাঙ্গালী রমণীর স্বাধীনতা। কোন কোন শৈলাবাসে বঙ্গদেশীয় মহিলাগণ কিছু কিছু স্বাধীনতা পাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু বৈদ্যনাথ বা মধুপুরের নিয়মের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। এই দুই স্থানে আসিয়া বাঙ্গলা দেশের অবরোধ প্রথা যেন উঠিয়া যায়, বরঞ্চ পুরুষদিগকে সঙ্কুচিত হইয়া পথ চলিতে হয়। দাড়োয়া নদীরতীরে মহিলাদিগের বেড়াইবার অতি রমণীয় স্থান। অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে একটি বর্ষিয়সী বিধবা মহিলা নদীতীরে দাঁড়াইয়া একটি বালককে ডাকিতেছেন। বালক কোনমতেই উঠিবে না, সে কেবল জল ঘাঁটিতেছে আর অপরাপর বালক বালিকাগণের সহিত উল্লাসে বালি ছড়াইতেছে। তৃণ-শয্যায় বসিয়া কতকগুলি যুবতী কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। বালক কোনমতেই তাঁহার কথা শুনিল না দেখিয়া, বৃদ্ধা নিরুপায় হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া কহিলেন "ও শিউলি, দেখ্না মা, নন্তু আমার কথা শুনে না, কেবল জল ঘাঁটছে।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বালকের মাতা উঠিয়া আসিল, মাতার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র বালক খেলা ছাড়িয়া আসিয়া মাতামহীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইল।

এমন সময়ে একখানি বড় জুড়িগাড়ী আসিয়া দাড়োয়া তীরে দাঁড়াইল। দুইটি সুসজ্জিতা যুবতী ল্যাণ্ডো হইতে অবতরণ করিলেন। বৃদ্ধা একমনে তাহাদিগকে দেখিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যে, তাহারা যেন তাঁহার চিরপরিচিত, অথচ ভরসা করিয়া তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। নবাগতাদিগের মধ্যে একজনকে দেখিলে হিন্দুরমণী বলিয়া বোধ হয়, কারণ তাহার সীমন্তে সিন্দুর রেখা এবং প্রকোষ্ঠে সোণার 'নোয়া' দেখা যাইতেছিল। দ্বিতীয়া উভয়ের মধ্যে অধিক সুন্দরী, যে রূপে নয়ন ঝল্‌সিয়া যায়, তাঁহার সৌন্দর্য্য সেই জাতীয়। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যে তিনি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজভুক্তা, মাথায় এলবার্ট সিঁথি, প্রকোষ্ঠে হীরকমণ্ডিত ব্রেস্‌লেট, কোমল চরণদ্বয় গ্লাসি কিডের হাইহিল বুটের মধ্যে বন্দী। পশ্চাৎ হইতে কন্যা ডাকিল "মা," বৃদ্ধার চমক ভাঙ্গিল, তিনি উত্তর দিলেন "যাই"। কার্ম্মটেয়ার্স টাউনের পথে ফিরিতে মাতা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে শিউলি, বিবি দুটি দেখিতে বড় বৌ ও সেজ বৌএর মত না?" কন্যা উত্তর করিল "বড় বৌ আর সেজ বৌই বটে, আমি অনেকক্ষণ চিনেছি, তোমার মনে কষ্ট হবে বলে বলিনি।" বৃদ্ধা ললাটে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন "ওরে আমার হেমের বৌএর বরাতে এই ছিল?"

* * * * * *

হরবল্লভের পত্নী অনেকদিন কাশীবাস করিয়াছেন, বৎসরান্তে কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্র তাঁহাকে দেখিতে আসে। বৃদ্ধা প্রভাতের কার্য্য শেষ করিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছেন, কন্যা নিকটে বসিয়া আছেন; মাতা বলিতেছেন "ল্যাখ্ শিউলি, এখন আর চোখে ভাল দেখতে পাই না, কোন্‌দিন রাঁধতে রাঁধতে পুড়ে মরব, তুই জামাইকে বলে একটি ভদ্রবংশের ব্রাহ্মণের মেয়ে ঠিক করে দিতে পারিস্?" কন্যা স্বামীকে বলিয়া মাতার জন্য পাচিকা ঠিক করিল, যথাসময়ে পাচিকা রন্ধন করিতে আসিল। পাচিকার প্রথম যৌবন অতীত হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় এককালে তাহার রূপ ছিল, কিন্তু সমস্তই যেন জ্বলিয়া গিয়াছে, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, অঙ্গারমাত্র অবশিষ্ট আছে। মাতাপুত্রী জানালায় বসিয়া জলস্রোত দেখিতেছিলেন, পাচিকা রন্ধন করিতে করিতে সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহাদিগকে দেখিতেছিলেন। কন্যা বলিতেছে "মা বামুন ঠাকরুণকে যেন কোথায় দেখিয়াছি," মাতা উত্তর করিলেন "আমারও যেন তাই মনে হয় মা, কিন্তু ভরসা করে কিছু

বোল্‌তে পারছি না, জীবনে কত লোকই দেখলুম, কত লোকই এলো গেল, বিশ্বেশ্বর কেবল আমায় ভুলে রয়েছেন, কবে যে দয়া কর্ব্বেন তা জানি না।" শেফালিকার সন্দেহ দূর হইল না, সে উঠিয়া গিয়া পাচিকাকে ডাকিয়া আনিল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া বৃদ্ধার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল "মা আমি তোমারই বড় বৌ, মুখ পোড়াইয়া কাশীবাস করিতে আসিয়াছি, আমাকে চরণে ঠাঁই দেও।" মাতা ও পুত্রী পতিতার অশ্রুজলের সহিত অশ্রুধারা মিশাইয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন।

* * * * * *

উষাকাল হইতে বারাণসীর প্রধান প্রধান মন্দিরের পথে শত শত অভাগিনী রমণী ভিক্ষার জন্য বস্ত্রাঞ্চল বিছাইয়া বসিয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাস সবে আরম্ভ হইয়াছে, প্রভাতে বেশ শীত অনুভূত হয়। কেদার ঘাটের পথে দাঁড়াইয়া একটি বাঙ্গালী রমণী চীৎকার করিয়া যাত্রীদিগকে উত্যক্ত করিতেছে "ওগো লক্ষী মা, দুটী ভিক্ষে দাও মা, আমার কেউ নাই মা" কমণ্ডুল ও পুষ্পপাত্র হাতে লইয়া জনৈক বর্ষীয়সী বিধবা কেদার দর্শনে যাইতেছিলেন, তাঁহার পট্টবস্ত্রের অঞ্চল ধরিয়া একটি দ্বাদশ বর্ষীয় গৌরবর্ণ বালক তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। বৃদ্ধাকে দেখিয়া রমণী আরও চীৎকার করিতে লাগিল। বৃদ্ধা তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া দাঁড়াইলেন, দয়ার্দ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি মা, বাড়ী কোথায়?" রমণী উত্তর করিল, মাগো আমার নাম বামা, আমার বাড়ী ন'দে জেলা, বন্দীপুর, আমার সবই ছিল মা, বরাতের দোষে এমন হ'য়েছে। বৃদ্ধার পশ্চাতে নমু আসিতেছিল, বৃদ্ধা তাহাকে বলিলেন "নমু একে একটা টাকা দেও দাদা," বালক ভিক্ষারিণীকে একটি টাকা দিল, বৃদ্ধার নয়নদ্বয় হইতে দুইটি উষ্ণ বারিবিন্দু পতিত হইল।

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোকে ও আঁধারে।*

সামাজিক নাটক।

প্রধান পাত্র পাত্রীগণ।

পুরুষ।

ভবতারণ	নববিদ্যাকর সভার সভাপতি।
সিদ্ধেশ্বর	ঐ সম্পাদক ও স্কুলের অধ্যক্ষ।
কৃষ্ণলাল	গ্রাম্য গৃহস্থ।
বিনোদ	ভবতারণের পুত্র।
মিষ্টার এম্ গ্যাপ্ট (মহিম গুপ্ত)	ব্যারিষ্টার, কৃষ্ণলালের মাতুল পুত্র।
ডক্টর ব্যাটাভেল (বটব্যাল)	বিলাত প্রত্যাগত।
মন্মথ (মনু)	কৃষ্ণলালের গ্রামবাসী আত্মীয় যুবক।
জগদীশ রায়	জমিদার।
গগণ বাবু	ঐ কর্ম্মচারী।

নববিদ্যাকর সভার সভ্যগণ।

স্ত্রী।

তারামণি	মহিমের মাতা, কৃষ্ণলালের মাতুলানী।
বগলা	কৃষ্ণলালের স্ত্রী।
সৌদামিনী	সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী।
কমল কামিনী	মনুর মাতা।
লীলা (মিসেস্ লিলী গ্যাপ্ট্)	মহিমের স্ত্রী, ভবতারণের ভাগিনেয়ী।
রমা	সিদ্ধেশ্বরের কন্যা।
চামেলী	ডক্টর ব্যাটাভেলের কন্যা।

* পূর্ব্ব সংখ্যায় নাটক খানি, 'নবজীবন' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক সেই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পুস্তক খানির 'আলোকে ও আঁধারে' এই নূতন নাম দিলেন। পঃ—সং

আলোকে ও আঁধারে।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

পল্লীগ্রাম, কৃষ্ণলালের গৃহ—বারান্দা।

তারামণি ও কমলকামিনী।

তারা—কমু কি মন্নুর মায়, মোর বুহের মইদ্যে পুরিয়া পুরিয়া যায়। হাতগো পোলা প্যাডে থুইছিলাম, কগ্‌গল দিলাম যোমেরে, হ্যাযে কত ওষুধ খাইলাম, গঙ্গাস্নানে গ্যালাম, সন্ন্যাসী দেহাইলাম, কত পূজা হইল, যইজ্ঞ হইল—তহন ত আর পয়সার দুঃখ আছিল না—হেয়ার পর মহিমায় হইল। ছোড কালে আছিল কি,—এই কেচ্ছুয়াডার লাহান,—পীরা পীরা—প্যাড দিয়া—কমু কি—তাজা রক্তগুলা পরত। নবীন ডাক্তারেরে দেহাইলাম, হব্ব ধোপানীর ভাল ওষুধ আছিল, হেয়া আনিয়া খাওয়াইলাম,—ধোনাই ওজ্ঝারেইবা কত পয়সা দিলাম, চাউল দিলাম, নতুন কাপর দিলাম।—ও মন্নুর মা, হে দুঃখ ত মোর হারছিলই;—হারিয়া হুরিয়া পোলা যে বরো হইল, য্যান হাত্তীডা, আর লেহা পরায় হে গেলাসেখে গেলাসে যে ওঠ্‌তো, যান লাফাইয়া লাফাইয়া। হগ্‌গলে কইথ, 'মহিমার মায়' তোমার হত পোলা মরছে, সে দুঃখ আর মনে কইরোনা। ওই এক পোলাই তোমার হাত পোলার সার। ও মন্নুর মায়, হেই পোলায় হ্যাযে মোরে একালেই ভাসাইয়া দিল। এ দুঃখ আমি কথায় রাখমু লো মন্নুর মায়!

কমল—হ্যাঁগা ঠান্‌দি,—রোজ রোজ আর এক কান্না কত কাঁদ্‌বে? মনে কর না ও ছেলেও তোমার নেই,—ছেলে তোমার মোটে হয়ই নি।

তারা—ওমা তুই এমন কথা কও মন্নুর মায়! পোলার আমার রাজার লাহান। মানষে কয় হাইব হইছে,—একবার চক্ষেও ভাখলাম না।

কমল—বলি: সাহেব ছেলে দেখলে কি চক্ষু জুড়োবে? তবে যাওনা, একবার গে দেখেই এস না। তোমায় মা ব'লে পুছবে কিনা? আরও ঘরে বড় মানুষের মেয়ে, বিবি বউ। শাশুড়ী ব'লে গে সাম্‌নে দাঁড়ালে যে তার হিষ্টিরিয়া

হবে। ছেলে তখন দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আস্‌বে, আছাড় খেতে খেতে পালাতে যে পথ পাবে না।

তারা—বারীতে যহন আছিল, মোরে কত ছেদ্দ্যা করতো। কলিকাতায় পর্‌তে গেল, আর বারীতে আইল না। কার মাইয়া বোলে বিয়া করিয়া বিলাতে গেল। আহা, মোর হগল হ্যাবতার পায়ের ধুলার ধোন মহিমায়,—হেয়ার বিয়া, হেয়ার বউ—একবার চক্কেও ত্থাহাইল না। বারেষ্টর নাকি বোলে হইচে। কত টাহা বোলে আনে,—মোরে ডাইক্যাও জিগাইল না। মন্নুরে কত কইয়া দিছি,—ডাকপিয়নগো পথে দেহি, হাতে ধরিয়া কত করিয়া কইয়াদি, কত চিঠি ত তোমরা কলিকাতায় পাডাও, মোর মহিমারে এট্টু লিখ্যা দিও, মোরে একবার চক্কের ত্থাহাডা দেহে যায়, দুগ্‌গা করিয়া টাহা মোরে মাসে পাডাইয়া দেয়। এমন পোরা কপাল করিয়াই আইছিলাম মন্নুর মায়, প্যাডের পোলা, কত করিয়া মানুষ কর্‌ছি,—একখান চিডিও দেলে না।

কমল—নাঃ! বুড়ীর ঘ্যান্‌ঘেনিতে আর বাঁচিনে। বলি টাকায় কি তোমার দুঃখু রয়েছে? ছেলেয় কিছু না দিক্‌, অমন ভাগ্নে রয়েছে, যখন যা চাইচ দিচ্ছে, মার মত আদর যত্ন ক'রে তোমার ঘরে রেখেছে, তবে ছেলের কাছে টাকা ভিক্ষে কর কেন? আর না দিলেই বা এ মরাকান্না কেন? ভাগ্নে কি তোমার এতই পর?

তারা—ওমা, তুই কও কি, মন্নুর মায়? ভাইগ্না পর! "যোম জামাই ভাইগ্না, তিন নয় আপনা?" নন্দে আমার হাথক পোলা প্যাডে থুইছিল। ভাইগ্যাবতী মরিয়া হগ্‌গে গ্যাছে, মুই রইছি কাঁদ্‌তে।

কমল—বলি কাঁদ্‌বে কেন? মনে কর না এই তোমার পেটের ছেলে। এমন পেটের ছেলেরও বড় ভাগ্নে কি কারও হয়?

তারা—তুই তাম্‌সা কর মন্নুর মায়? ভাইগ্না কমু প্যাডের পোলা! থাক্‌ত তোর ঠাউরদাদায়, হ্যারে একথা কইথি, মোরে কইয়ে করবি কি?

কমল—পোড়া কপাল! আবার রঙ্গও আছে! হ্যাঁ ঠান্‌দি—কপালে ছিল না, ঠাকুরদাকে দেখিনি। তা তুমি এখন একটা নিকে কর না ভাই? আবার নতুন ঠাকুরদা পাব, কত ঠাট্টা তামাসা কর্‌ব।

তারা—মুই করমু নিহা! তুই কও কি মন্নুর মায়?

কমল—কেন দোষ কি ঠান্‌দি? ছেলেয় কিছু করে না ব'লে কাঁদছ,—আবার ছেলে হবে, কত রোজগার করে দেবে,—সব দুঃখ সেরে যাবে।

তারা—মুই করমু নিহা! মোর হইবে পোলা! এই বুরাকালে! তুই কও কি? হেই পোলার আবার মোরে রোজগার করিয়াও দিবে! পোরা কপাল! পোরা কপাল! 'থাক্‌তে কর্‌লো হাড়ি বাড়ি, মর্‌লে দিবে হীওল পাড়ি'। হেই পোলার রোজগার খামু কি যোমের বারী যাইয়া?

কমল—বলি একা কাজ কর না। সাহেব ছেলে, দেখ্‌তে যাবে যাবে ক'চ্চ, বলি একবার যাওনা, অম্‌নি ধ'রে নিকে দিয়ে দেবে।

তারা—মহিমার দিবে মোরে নিকা! তুই কও কি? মায়েরে নি কেও নিহা দেয়?

কমল। ওগো, সাহেবরা তা দেয় গো—দেয়। তারা মা মাসী পিসী সবাই-কেই বিধবা হলেই অমনি ধ'রে নিকে দিয়ে দেয়।

তারা—ও গোসাই! তবে ত মুই যামুনা, হাত জন্ম পোলার মুখ না ত্থাখ্‌লেও না। শেষে কি বুরাকালে জাত-জন্ম খোয়াইমু।

বগলার প্রবেশ)

ও ভাইগ্না বউ, ভাইগ্না বউ লো,—আলো মন্থুর মায় কইথে লাগ্‌ছে কি হোন্‌ছোনি? কলিকাত্তার গ্যালেই পোলায় বোলে মোরে ধরিয়া নিহা দিয়ে দিবে। হাইবরা বোলে হেয়াই করে। আবার বোলে মোর পোলাও হইবে। এ রাম! এ রাম! কি ঘেন্না—না ভাইগ্না বউ, হেয়া হইলে মুই যামুনা—মহিমের মুখ খান একবার হা,—তাহাঙগো যে যোমেরে দিছি,—বালাই! বালাই! বাবায় মোর বাচিয়া থাক,—আমি কানে হুন্‌মু, বাবায় মোর ভাল আছে; মুখখান—না হয় নাই দেখ্‌মু।

বগ— তুমিও যেমন মা,—ভাসুরঝি তোমায় ক্ষেপিয়েছে। হিন্দুর ঘরে কি আর নিকে হয়? আর ভাসুরঝিও এমন পাগল!

তারা—তবে নিহা দিবে না?

বগ—না গো না! তোমাকে ক্ষেপাচ্চে, তুমি বুঝতে পাচ্চ না?

তারা— ও মোরে তামসা করছে! ওলো তুই হইলি, কোমলেকামিনী হতেক কোমলের কোমলিনী,—তুই আগে নিহার জামাই একো আন্‌, আমি হাবে হেয়ার লগে নিহা কইমু,—তোর হতীন হইমু! হতীন যে কেমন, হেয়া তোরে ত্থাহাইমু।

'মিডা ভাতার হেও তিতা বিষ হতীনে যদি পায়
হীতের ল্যাপেও হুক কিছু নাই ওদা যদি হয়।'

কমল—তা তুমি হ'লে বয়সে কত বড়, আবার সম্পর্কে ঠান্‌দি,—তোমার আগে হ'ক। তার পর না হয় একটু প্রসাদ আমায় দিও আমার এটো কি আর তোমায় দিতে পারি ঠান্‌দি?

বগ—আর ভাসুরঝির কথায় জ্বালায় আর বাঁচিনে। বুড়ীকে একেবারে পাগল না বানিয়ে ছাড়্‌বে না।

তারা—ও ভাইগ্নাবউ, মনুর মায় কি পাগল হইছে? ওডায় কয় কি? মুইও রাণ্ডী ওডায়ও রাণ্ডী,—পূজা সইন্ধ্যা দুই জনেই করি। মোরা কি পারি এক জনে আর জনের উচ্ছিষ্ট খাইতে? এ রাম!

বগ—নাগো, তা কেন খেতে যাবে? ভাসুরঝি পাগলই হয়েছে। যা তা মুখে আসে তাই বলে। বেলা গেল, যাও না,—রাণীর সঙ্গে ঘাটে গে কাপড় টাপড় কেচে এসগে না।

তারা—হ, যাই, ব্যালাডা দেহি গ্যাছেই। হোনার মাসী আইবে কইছিল,—আইল ত না দেহি। হুঁ—! ও ভাইগ্না বউ, কয়ডা কুসি আম পাইছিলাম তগায়। হেই কয়ডারে ছেচিয়া মাইখ্যা থুইও রাত্তিরে খামু অনে। দাত ত নাই,—চাবাইতে পারি না। কমু কি মনুর মায়,—কোন হুখই এহনে আর নাই। রাণ্ডী মানুষ,—ডাটা গাছটাও চাবাইয়া খাইতে পারি না। টিপ্যা টিপ্যা একটু মুহে দিয়া নাড়ি। হুঁ—! যাই—, ঘাটে থে গে কাপড় ধুইয়া আই গিয়া। ব্যালাডাও গ্যাছে। ও রাধি, রাধিলো, কথায় গেলি?

[প্রস্থান।

কমল—সত্যি খুড়ী, তোমার দ্যাওর কি? আহা বুড়ো মা,—কত আশা করে কত কষ্টে মানুষ করেছে। একবার চোকের দ্যাখাটাও দেয় না গা? না হয় সাহেব হ'য়ে বিবি বউই নিয়ে করেছে। মাকে নিয়ে ঘর ক'ত্তে না পারুক, একবার চোকের দেখাটাও কি দিতে পারে না। তাতে ত বউ আস্ত ধরে গিলে খাবে না?

বগ—ওই ত মা,—ওদের যে কি ভাব,—তা বুঝিনে। কত চিঠি পত্র লেখা হ'য়েছে,—তা জবাবও দেয় না। আগে ত এমন ছিল না। তা যে ক'রে আর বিলেত গিয়ে, একেবারে আস্ত বদলে গ্যাছে। তাই ত তোমাকে এত ক'রে বল্‌ছি ভাসুরঝি,—ধ'রে বেঁধে মনুর একটা বে থা দেও। ওই দলেই ত মেশে; বিলেতে না যাক, সঙ্গে থেকে থেকে ওদের ভাব সাব ত আস্‌বে। তারপর ওই চাঁদের মত চেহারা,—লেখা পড়াও শিখেছে। কোন্ আবাগের ব্যাটা শেষে কুসঙ্গে ফাঁস্‌লে মেয়ের বে দিয়ে বিলেত পাঠিয়ে দেবে,—সর্ব্বনাশ হবে শেষে।

কমল—না খুড়ী, সে ভয় আমি বড় করিনে। এম্‌নি পাগলামো যা করুক, মা ব'লতে মনুর আমার প্রাণ যায়। কি সব বাজে কাজে ঘোরে,—তা ফাঁক

পেলেই অম্‌নি ছুটে বাড়ীতে আসে। এ কাজে ও কাজে ঘুরি, কোলের খোকার মত 'মা' 'মা' ব'লে পেছনে পেছনে ঘোরে।

বগ—তা ত দেখছিই। তা, তাই বলে কি বে দেবে না? বয়সের ছেলে,—ওই সব বিবিয়ানা ঢঙের সোমত্ত মেয়েদের মাঝে ফেরে।—কখন কোন আবাগীকে মনে ধরে যাবে। সে টানের ওপরে কি আর তোমার টান হবে মা?

কমল—তা কি করব বাছা? কত ত বলছি, বোঝাচ্ছি,—তা কিছুতেই বে করবে না। কত বলেছি,—'গ্যাখ তুই কাজ কর্ম্ম কিছু না করে ঘুরে বেড়াতে চাস্, বেড়া। তিনি যা রেখে গ্যাছেন, মোটা ভাত কাপড়ে দিন যাবে। একটী বউ আমার এনে দে,—কোন দায় তোকে দেব না,—আমি এক পয়সাও চাবনা। যে ক'রে পারি, সব চালিয়ে নেব।

বগ—তা কি বলে?

কমল—বলে তার মাথা আর মুণ্ডু। কেবল বাজে বকে, আর হিহি ক'রে হাসে। ব'লব কি বাছা, দুঃখু আমার কি এক রকম? রোজগার ত কিছু করে না? লোকের কাছে শুনি, কত কষ্ট পায়। আমি একা বিধবা মানুষ, কতই আমার লাগে। কত ব'লেছি, গ্যাখ অত কষ্ট পেয়ে থাকিস কেন? যা কিছু আছে, সব ত তোরই। বাড়ী থেকে কিছু খরচ পত্র নে না? তা একটা পয়সাও নেবে না। বলে, 'তোমায় রোজগার করে দিচ্চিনা,—তিনি যা রেখে গ্যাছেন, তাও নিয়ে ওড়াব—না না সে হবে না।' জমা জমি বাগ বাগিচা যা আছে,—তাতেও বছরে কম ঘরে আসে না। টাকা যা লাগান আছে—তার সুদটাও খরচ হয় না। আবার তা লাগাই। তা কার জন্যে এ সব করি বাছা?

বগ—আস্ত পাগল। আস্ত পাগল! এবার এলে বেড়ী দিয়ে ঘরে রেখ।

কমল—ধুগ্যি ছেলে,—নিজের ভাল নিজে যদি না বুঝল,—কথা যদি না মান্‌ল,—তবে আর উপায় কি আছে? তা বাছা, তুমি কেষ্টলালকে একটু ভাল করে বল না। তাকে মানে,—সে যদি ব'লে ক'য়ে বুঝিয়ে পাগলকে স্থিতি করাতে পারে।

বগ—আমি কি আর বল্‌তে কসুর করি মা। তা আবার ব'লব। তুমিও ব'লো।

কম—আমিত ব'লছিই। তা সে যে তেমন গা করে না। বলে হবে—হবে, ব্যস্ত কি! একটু রক্ত ঠাণ্ডা হক,—আপনিই ঘরে আস্‌বে। তা বয়স ত কম হ'ল না। কবে আর রক্ত ঠাণ্ডা হবে বল, তারপর যা ব'ল্লে—সত্যি যদি তাহাদের দলের একটা বিবি মেয়ে বে-থা ক'রে বসে,—তবে কি হবে? ইহকালের সংসারীত চুলোয় যাক্, পরকালের জল-পিণ্ডির পিত্যেশটাও ত আর থাক্‌বে না!

বগ—তাত বটেই মা, তাত বটেই। তা তিনি আসুন, আজ ভাল করে বলব, এখন যাতে কাজটায় একটু গা করেন।

কমল—তাই ব'লো বাছা, ভাল করে ব'লো। সে একটু গা কল্লেই হবে। তবে আসিগে এখন বাছা, বেলা গ্যাছে। তোমারও আবার রান্না-বান্না সব আছে।

বগ—হ্যাঁ এসগে। আমারত যজ্ঞির ভোগ রোজই সেদ্ধ কত্তে হবে। একটা দিনও জিরেন নেই। একা আর পারিনে মা। মনু যদি বে করে, বউকে মা আমার কাছেই রাখবে? আমার হাড়টা একটু জিরোবে।

কমল—তা বে টাত করিয়ে দেও বাছা। বউ তুমিই নিও। ব্যাটা শুদ্ধই না হয় তুমিই নিও। আমার ঠাকুর দেবতা আছেন, পুজো সন্ধ্যে, ব্রত নিয়ম আছে, তাই নিয়ে যে এক নুতন সংসার পাতিয়েছি,—তাতেই আমার বেশ দিন যাবে। তবে আসিগে বাছা।

বগ—এসগে মা।

[উভয়ের প্রস্থান।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

গল্পলঃ

গল্পলহরী

২য় বর্ষ | পৌষ, ১৩২০ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বন্ধুত্ব।

লাউডান ষ্ট্রীটের প্রকাণ্ড অট্টালিকার এক কক্ষে বসিয়া রমেন্দ্র তার জমিদারী সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতেছে, এমন সময় চাকর এসে খানকতক ডাকের চিঠি দিয়া গেল; রমেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে তাহার একখানি খাম খুলিয়া যেমন পত্রের হস্তাক্ষর দেখিয়াছে, অমনি বহুদিনের মধুর বাল্য-স্মৃতিজড়িত বিনয়ের সহিত অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা ও প্রীতির কথা মনে জাগিয়া উঠিল। হাতের কাগজপত্র অপসারিত করিয়া রমেন্দ্র বিনয়ের পত্র একাগ্রচিত্তে পাঠ করিল; বিনয় লিখিয়াছে;—

ভাই রমেন,—বহুকাল পরে তোমায় আজ এই পত্র লিখ্‌ছি, জানি না এ দরিদ্র বন্ধুর কথা তোমার এতকাল মনে আছে কি না? এখন আর বাল্যের সে সব সুখস্মৃতির ও তোমার অতুলনীয় সৌহার্দ্দের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার আমার অবসর নাই, সামর্থ্যও নাই; কারণ আজ প্রায় বৎসরাবধি আমি রোগ শয্যায় শায়িত, বুঝিতে পারিয়াছি শীঘ্রই এই শয্যাই আমার অন্তিমশয্যা হইবে; তাই, ভাই বড় ব্যাকুল হ'য়ে আমার পত্নী স্নেহলতার ও কন্যা মায়ালতার একটা উপায় করে দেবার জন্য তোমায় একবার আসতে অনুরোধ করছি। বহুকাল দেখি নাই, ইহজীবনে আর দেখা হবার আশাও থাক্‌ছে না; রমেন, ভাই! একবার দয়া ক'রে তোমার পাঠদশার অভিন্ন হৃদয় বিনয়ের এ শেষ বাসনা পূর্ণ করিবে না কি? যদি এস, তবে আর বিলম্ব করো না, কারণ আমার আর দেরী নাই। ইতি—

তোমার অভিন্নহৃদয়—বিনয়।

রমেন তখনই বেয়ারাকে তার মোটর গাড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিল ও বন্ধুর ঠিকানাটী পকেট বুকে নোট করে, ক্যাসবাক্স হইতে কিছু টাকা লইয়া রওনা হইল। রাস্তায় রমেনের স্মরণ হইল যে, বিনয়ের সহিত কলেজে আলাপ না হইলে, আজ সে পথের ভিখারী হইত। বিনয় কত যুক্তিতর্ক করে, পাপের পরিণামের কত ভীষণ ছবি দেখিয়ে, নিজের পাঠাদির কত ক্ষতি করে, রমেনকে অধঃপতনের হাত হইতে বাঁচাইয়াছিল; এর জন্য রমেনের সে সময়ের অন্তরঙ্গ কৃত্রিম বন্ধুদের কাছে বিনয়কে কত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছিল, এমন কি একদিন তারা বিনয়ের প্রাণনাশের চেষ্টাও করেছিল; তবু বিনয় রমেনকে পাপপঙ্কে ডুবতে দেয় নাই, তাকে বড় যত্নে, বড় ভাইটীর মত পদে পদে রক্ষা করে ক্রমশঃ তার হৃদয়ের সব আবিলতা ও কুচিন্তার উচ্ছেদ করেছিল, তাই আজ রমেন তার পিতার অতুল সম্পত্তি রক্ষা করতে পেরেছে, তাই আজ সে দেশের ও দশের কাছে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। যতই এ সব কথা রমেনের মনে হতে লাগলো, ততই কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয় আপ্লুত হয়ে উঠলো; যদি তার সর্ব্বস্ব দিয়েও সে বিনয়কে বাঁচাতে পারে, তার জন্য কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে বাড়ী হ'তে বেরিয়েছিল।

প্রায় ২০ মিনিট পরে শ্যামবাজারের একটী ক্ষুদ্র গলির সাম্‌নে মোটর দাঁড়াইল, রমেন আস্তে আস্তে পকেট বইটী হাতে ক'রে ঠিকানাটি দেখে নিয়ে, বাড়ীর অনুসন্ধানে সেই গলিতে প্রবেশ করিল, দেখিল বাড়ীখানি অতি জীর্ণ, যেন সে অতি বার্দ্ধক্যবশতঃ তার দেহ ভারবহনে অক্ষম হয়ে ক্রমশঃ শিথিল হ'য়ে পড়ছে। এক তালা বাড়ী, সাম্‌নে ময়লা ড্রেন, গন্ধে সেখানে দাঁড়ান কষ্টকর। রমেন কড়া নাড়তে নাড়তে একটি সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা দৌড়ে এসে দরজা খুলে একজন অপরিচিতকে সাম্‌নেদেখে 'মা' বলে ডেকে উঠলো। স্নেহলতা, স্বামীকে বল্লে, "ঐ বুঝি তোমার বন্ধু এসেছেন এগিয়ে দেখবো কি?" বিনয় কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে রমেন তাকে মনে করে আসবে, কিম্বা এত শীঘ্র তার পত্র সে পেয়েছে; তবু আশাই নৈরাশ্যময় দুঃখীর জীবনের একমাত্র ভরসা, তাই সে স্নেহলতাকে যেতে বল্লে। স্নেহলতা অতি যত্নে স্বামীর মস্তকটি উপাধানে রক্ষা করে ঘরের বাইরে এসে ছাখে যে তাঁর স্বামীর বন্ধু রমেন বাবু কন্যার সহিত আলাপ করছেন। যদিও রমেনকে চাক্ষুস্ সে কখনও দেখে নাই, কিন্তু তার ফটোগ্রাফ দেখেছিল। স্নেহলতা রমেনকে চিনে ব্রীড়াবনত বদনে অগ্রগামী হয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করলে। রমেন বন্ধুস্ত্রীর মুখে এক অলৌকিক স্বর্গীয়জ্যোতি দেখিতে পাইল। স্নেহলতা নিখুঁত সুন্দরী, তবে অনশনে, চিন্তায়, রাত্রিজাগরণে তার রূপে কালিমা

পড়িয়াছে। রমেন কক্ষে আসিবামাত্র বিনয় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, স্নেহলতা নিকটে গিয়া বাধা দিল, কারণ অত দুর্ব্বল শরীরে বসিয়া থাকিলে মূর্চ্ছা যাওয়া সম্ভব। বিনয় তার রোগক্লিষ্ট শুষ্ক হাতখানি রমেনের দিকে প্রসারিত করিল, রমেন বড় আবেগে ও স্নেহভরে সেখানি নিজহাতে লইয়া বিনয়ের বিছানার কাছে উপবেশন করিল। বিনয় বলিল, "ভাই, আজ বার বৎসর দেখা সাক্ষাৎ নাই। অনেক কথা বলিতে হইবে, তবে তুমি আমার আধুনিক অবস্থা বুঝিতে পারিবে, আমি ধীরে ধীরে তোমায় সব বল্‌ছি।" রমেন বলিল, "পরে সে সব কথা হইবে।" বিনয় সে কথা শুনিল না, বলিল, "এখন না বলিলে ইহ জীবনে তা আর বলা হবেনা, স্নেহলতা, মায়ালতার কোন উপায় হবে না। জানত রমেন, বি, এ, পাশ করার পর আমি দেশে গেলুম, যাবার দিন কতক পরে আমার পিতার মৃত্যু হ'লো, সংসার একবারে অচল; উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি সংসারে দ্বিতীয় ছিল না, তাই কৃষ্ণনগরের স্কুলে আমি সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে বাহাল হলুম, সেখানে বড় সুখে ছিলুম, হেডমাষ্টার মিষ্টার বটব্যালের স্নেহ মায়ায় আমি পিতার শোক ভুলিলাম, তিনি ও তাঁর পত্নী আমায় বড় যত্ন করতেন ও ভাল বাসতেন, আর তাঁদের একমাত্র আদরের কন্যা স্নেহলতা তার মধুর স্বভাবে অমায়িকতায় ক্রমশঃ আমার হৃদয় অধিকার করতে লাগলো। কিছু কাল পরে আমাদের বিবাহ হল, কিন্তু অভাগা আমি, বৎসরের মধ্যে মিষ্টার ও মিসেস বটব্যালের কাল হইল। স্নেহলতা ও আমি সংসার সমুদ্রে ভাসিলাম। দুই বৎসর পরে আমাদের এই স্নেহপুত্তলিকার উদয়। অল্প বেতন হইলেও স্নেহের মিতব্যয়িতায় ও সকল কার্য্যে সুনিপুনতায় আমাদের সংসার বড় সুখেই কাটিতে লাগিল। গত বৎসর এই পৌষ মাসে আমার ম্যালেরিয়া হয়, প্রথম প্রথম কৃষ্ণনগরের ম্যালেরিয়া বলে উপেক্ষা করি, জ্বর কুইনাইন খেয়ে বন্ধ করতুম, খাওয়া দাওয়ার বাদ বিচার করি নাই, স্কুলও কামাই করতুম না। তিন চার মাস মধ্যে উপর্য্যুপরি সাত আট বার জ্বরে পড়লুম তারপর শরীর একবারে ভেঙ্গে পড়লো ওখানে সুচিকিৎসা হওয়া যতদূর সম্ভব তা করালুম, কোন ফল হল না, ডাক্তারেরা কলিকাতা আস্‌তে বল্লেন, যা কিছু সম্বল ছিল নিয়ে কলিকাতা এসে দশমাস চিকিৎসা করালুম, কিছুতেই কোন ফল হইল না। ক্রমশঃই শরীর ভেঙ্গে পড়ছে, দেড় মাস হ'তে পতিপ্রাণা স্নেহলতা তার সব অলঙ্কার গুলি বিক্রয় করে সংসার খরচ ও চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ করছে, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় ভাই, এত যত্ন, সেবা অর্থব্যয় সব বৃথা হল, উপরন্তু আমার স্নেহ ও মায়া রাস্তায় বসবে।"

রমেন বলে উঠলো, "কি পাগলের মত সব আবল তাবল বক্‌ছো, শীঘ্রই তুমি সেরে উঠবে, আমি সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করছি, তুমি কিছু ভেবো না।" বিনয় বল্লে, "কেন বৃথা ভাই কুহকিনী আশার আলোক দেখিয়ে এ নির্ব্বাপিত প্রায় হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করছো, আমি বেশ বুঝছি ও শুধু সান্ত্বনা মাত্র। যাক্ কাজের কথা বলি, যার জন্য তোমায় এত কষ্ট দিয়ে আনিয়েছি। আমার একটি ৫০০০৲ হাজার টাকার জীবন বীমা আছে, বহুকষ্টে এত দিন তার ষান্মাষিক চাঁদা দিয়ে এসেছি এই বারের যে টাকা ৭নের দিনের মধ্যে দিতে হ'বে, তার সংস্থানের উপায় আমার নাই, তুমি ভাই দয়া করে আমার এই জীবন বীমাটা রক্ষা করো, ও আমার মৃত্যুর পর টাকাটী আদায় করে দিয়ে স্নেহের ও মায়ার একটী উপায় করে দিও, আর যে কয়টা দিন বাঁচবো, ছুটী ছুটী খেতে দিতেও তোমায় হবে, কারণ আমরা একবারে রিক্তহস্ত। বিনয়ের কথা শেষ হ'তেই রমেন বল্লে "আচ্ছা তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আস্‌ছি," এই বলে সে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ওয়াট্‌স সাহেবের বাড়ীর দিকে ছুটিল ও আধ ঘণ্টার মধ্যে মোটর কারে তাঁকে ডেকে নিয়ে এল।

ওয়াটসের সুচিকিৎসায়, রমেনের যত্নে ও অকাতর অর্থব্যয়ে এবং স্নেহলতার অক্লান্ত পরিশ্রম ও শুশ্রূষায় বিনয় ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। রমেন দিবারাত্র বিনয়দের বাড়ীতে থাকে, শুধু দুবার খাবার জন্য বাড়ী যায়। স্নেহলতার স্বামীর প্রতি অচলাভক্তি, ও তার আরোগ্যের জন্য জীবনপাত করে পরিশ্রম করা দেখে রমেন ভাবতো বিনয় কত সুখী, যদি তার অতুল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে স্নেহলতার ন্যায় পত্নীলাভ সে করতে পারে তবে সে নিজেকে ধন্য মনে করবে। স্নেহলতার প্রতি রমেনের এই আন্তরিক শ্রদ্ধা, ক্রমশঃ তার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করিল।

রমেন অবিবাহিত যুবক, কথনও পতিপরায়ণা রমণীর স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা স্নেহ মমতার সম্যক পরিচয় পায় নাই, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কি নিগূঢ়শৃঙ্খলে আবদ্ধ তা সে উপলব্ধি করে নাই, তাই বিনয়ের প্রতি স্নেহলতার প্রত্যেক ব্যবহারে সে মধুর স্বর্গীয়সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেছিল ও স্নেহলতার প্রত্যেক কার্য্যটী কি এক অজানাশক্তিতে তাকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিতে ছিল। চৌরঙ্গীর বিলাস বৈভব মাদকতা পূর্ণ অট্টালিকার শোভা পূতিগন্ধময় ড্রেনবেষ্টিত শ্যামবাজারের সেই জীর্ণ ভগ্নকুটীরের আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের কাছে অতি হীন ও ক্ষীণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বিনয় যখন একটু

সবল হইয়া উঠিল তখন স্নেহ ও রমেন একত্রে বসিয়া দুই বন্ধুর বাল্যজীবনের কত মধুময় স্মৃতির আলোচনা হইত ও নানা প্রসঙ্গে রমেন বিনয়ের পত্নীভাগ্যের কথা বলিয়া স্নেহলতার অশেষ প্রশংসা করিত; স্নেহলতার মুখখানি লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিত ও রমেন সেই সৌন্দর্য্যবিস্ফুরিত সরলতামাখান মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইত, এক এক দিন সে বুঝিতে পারিত তাহার এই ব্যবহার নিন্দনীয়, তখন সে আত্মসম্বরণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। এইরূপে প্রায় এক মাস অতিবাহিত হইলে হঠাৎ রমেনের পায়ে একটা ফোড়া হইয়া, রমেন আর বিনয়কে দেখিতে আসিতে পারে না; বিনয়েরও এমন সামর্থ্য নাই যে সে গিয়ে রমেনের সংবাদ লয় বা তার পীড়ার কোনরূপ শুশ্রূষা করে। রমেন প্রায়ই পত্র লিখিয়া বিনয়ের সংবাদ লইত ও নিজের শারীরিক অবস্থার কথা জানাইত; বিনয় স্নেহকে প্রত্যহ একবার রমেনদের বাড়ী গিয়া তার সংবাদ লইবার জন্য অনুরোধ করিত, কিন্তু স্ত্রীসুলভ লজ্জাবশতঃ স্নেহ তা পারিত না, কিন্তু যার জন্য তার স্বামী আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন তার সংবাদের জন্য তার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয় শতবার আকুল হইয়া উঠিত।

একদিন ডাক্তার ওয়াটস বিনয়কে বলিল, "আপনি এবার অনতিবিলম্বে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য পশ্চিমে যান, কারণ বর্ষা নামিলে আপনার পুনরায় জ্বর হওয়া সম্ভব।" বিনয় বলিল, "রমেন বাবু এখন পীড়িত, সে আরোগ্য না হইলে কে তার পশ্চিম যাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে, রমেন সারিতে যখন এখনও মাস খানেক, তখন তার পশ্চিম যাত্রায় বিলম্ব হইবে।" ডাক্তারসাহেব বলিলেন, "আচ্ছা আমি এ সম্বন্ধে রমেন বাবুর সহিত যুক্তি করিব, তাঁর এত চেষ্টা ও অর্থব্যয় যাহাতে সম্পূর্ণ সার্থক হয় তাহা করিতে তিনি নিশ্চয় যত্নবান হইবেন এ আমার বিশ্বাস।" সেইদিন দ্বিপ্রহরে স্নেহলতা রমেনের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইল।

মাননীয়াসু,

আমার পায়ের ফোড়া হওয়ায় অনেকদিন আপনাদের বাড়ী যাইতে পারি নাই। তবে বিনয়ের সংবাদ ডাক্তারের কাছে ও আমার লোকেদের কাছে প্রত্যহই পাইতেছি। কৈ আমার যে এত অসুখ করেছে আপনারা কেউত একবার সংবাদ নিলেন না? তা যা হ'ক আজ ওয়াটস সাহেব বল্লেন যে বিনয়কে খুব শীঘ্র পশ্চিমে হাওয়া বদ্‌লাতে পাঠাতে

হবে, আমায়ত ডাক্তারেরা উঠতে নিষেধ করেছে, বিনয়ও এখন সম্পূর্ণ দুর্ব্বল, কাজে কাজেই বাধ্য হয়ে একটা অন্যায় অনুরোধ করছি, যদি দোষ বিবেচনা হয়, ক্ষমা করবেন। যদি আজ একবার বৈকালে দয়াকরে আপনি অধীনের বাটীতে পদার্পণ করেন তা হ'লে আমি বিনয়ের পশ্চিম যাবার সব পরামর্শ আপনার সঙ্গে স্থির করে খরচ পত্রের বন্দোবস্ত করিব। আশাকরি এ বিষয় আপনাদের দুজনের কাহারও অমত হ'বে না।

নিঃ—শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ বোস।

পত্রখানি পড়ে স্নেহ স্বামীর পরামর্শ নিতে গিয়ে দেখে, তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত, বৈকালে আবার সংসারের কাজ নিয়ে, রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে মনে হওয়ায় ও এ বিষয়ে যে স্বামীর সম্পূর্ণ অভিমত হবে তাহা মনে স্থির বিশ্বাস থাকায়, স্নেহলতা আর স্বামীকে এ বিষয় জানিয়ে অনুমতি নেবার অপেক্ষা না করেই মায়ালতাকে বলে গেলেন যে তোমার বাবা উঠলে বলো যে তোমার কাকা বাবু একটা পরামর্শ করবার জন্য ডাকায় আমি সেখানে যাচ্ছি, শীঘ্রই ফিরে আসবো, এই বলে স্নেহলতা একখানি গাড়ী ডাকাইয়া রমেনের বাড়ী গেল।

রমেন নিজ কক্ষে শুইয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে ভাবিতেছে, সে কি আসিবে? সে কি জানে তাকে আমি কত ভালবাসি? বিনয় যদি আমার সহিত অবস্থা বিনিময় করিতে চায়, আমি স্নেহের মত পত্নী পাইলে তাহাতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। স্নেহ শুধু রূপসী তা নয়, সে গুণিপুনা গৃহিণী, কর্ত্তব্যপরায়ণা রমণী, স্নেহময়ী জননী, পতিব্রতা স্ত্রী, স্নেহের ন্যায় পত্নীলাভ বহু পূণ্যের ফল। হঠাৎ রমেনের চিন্তাস্রোত বাধা পাইল, বেয়ারা ঘরে ঢুকিয়া বলিল একজন সম্ভ্রান্তা রমণী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষিণী হইয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। রমেন বুঝিল কে সে রমণী; তাঁহাকে ভিতরে আনিতে বলিয়া, রমেন উপাধান অবলম্বন করিয়া পালঙ্কে উঠিয়া বসিল ও স্নেহকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। স্নেহ জিজ্ঞাসা করিল, "রমেনবাবু আপনি কেমন আছেন, ঘা টা সম্পূর্ণ সারিতে আর কতদিন লাগিবে, আমরা এসে আপনার খবর নিতে পারি নাই বলে কি আপনি রাগ করেছেন? আপনিত জানেন আমাদের বাড়ীর সব অবস্থা, সুতরাং সে দোষ ক্ষমা করবেন, কারণ আপনার অনুগ্রহে আমরা বেঁচে আছি; আপনি রাগ করলে আমাদের আর কোন উপায় নাই। রমেন বিমুগ্ধনেত্রে স্নেহের দিকে চাহিয়াছিল, তার কথা শেষ হইবা মাত্র যেমন স্নেহ রমেনের দিকে চাহিয়াছে অমনি চারি চক্ষুর সম্মিলন

হইল ও রমেন অপ্রস্তুত ভাবে বলিয়া উঠিল, "আপনার অত গুলি প্রশ্নের উত্তর ত এক কথায় দেওয়া অসম্ভব, সুতরাং ক্রমশঃ বলিতেছি। আমার ঘা টা ক্রমশঃ আরোগ্য হইতেছে, তবে ঘা টার ব্যথার জন্য যত কষ্ট না হক, বাধ্য হয়ে যে আপনাদের বাড়ী গিয়ে আপনাদের সহবাস সুখ ভোগে বঞ্চিত হয়েছি তার জন্য বেশী কষ্ট হয়। আপনারা জানেন না আপনাদের কাছে থাকলে আমি কত সুখী হই। বিনয় আমার বাল্যবন্ধু, কিন্তু আপনার সঙ্গে এ কয় দিনের আলাপ—তবু আপনার সদ্ব্যবহারে ও স্নেহ যত্নে মনে হয় যেন আমরা কতদিনের পরিচিত।" স্নেহ আত্মপ্রশংসায় তার সলজ্জ রক্তিমাভবদন আনত করিয়া, রমেন বাবু তার স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য যে রকম অকাতর অর্থব্যয় ও রাত্রিজাগরনাদি শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া তার হৃদয়ের বহুদিনের অব্যক্ত কৃতজ্ঞতা—যা বলি বলি করে সে অনেকদিন বল্‌তে পারে নাই—আজ প্রকাশ করিল ও উপসংহারে বলিল, "আপনার চেয়ে প্রিয়জন আমাদের এ সংসারে কেউ নাই, আপনার অসুখে প্রত্যহই এসে আপনার সংবাদ লইবার বাসনা আমার হৃদয়ের শতবার জাগিলেও, লজ্জায় আসিতে পারি নাই, ইহা সত্য জানিয়া আমাদের ক্ষমা করবেন, আর তিনি ভাল থাকলে যে আসতেন তা কি আপনাকে বলে জানাতে হবে? আমার আসবার জন্য প্রত্যহ বলেছেন, অনুরোধ করেছেন আদেশও দিয়েছেন—আমি যে কেন আসি নাই তাত আপনায় বল্লুম। রমেন স্নেহের সেই সৌন্দর্য্য-বিভাসিত মুখের দিকে চাহিয়া আত্মহারা হইয়া কথাগুলি শুনিতেছিল, যেমন শেষ হইয়াছে কোথা হইতে দুর্দ্দমনীয় আসঙ্গ-লিপ্সা ক্ষণিকের, তরে তার হৃদয়ে উদয় হইল। সে চকিতে স্নেহের দক্ষিণ হাতখানি সবলে ধরিয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "স্নেহ, জান কি তুমি, তোমায় আমি কত ভালবাসি, কি কুক্ষণে তোমায় প্রথম দিন দেখিয়াছিলাম সেইদিন হইতে পলে পলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমি মরিতেছি, বুঝিতে পারিয়াছি ইহা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, মনকে শতবার বোঝাইয়া নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি কিন্তু সব বৃথা। বল স্নেহ, তুমিও আমায় একটু স্নেহের চক্ষে দেখ?"

স্নেহ তখন প্রায় সংজ্ঞাশূন্য;—অপমানে, লজ্জায়, ভয়ে তার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে। হাতখানি ছাড়াইবার জন্য তার সেই দুর্ব্বল শরীরে যেন ক্রুদ্ধা মাতঙ্গিনীর বল আসিয়াছে। হাতখানি ছাড়াইয়া স্নেহ বলিয়া উঠিল, "রমেন বাবু আপনি আমার স্বামীর অকৃত্রিম বন্ধু সহায় ও আমার সহোদরোপম ভেবে আজ আপনার বাড়ীতে, আপনার কক্ষে একাকী আসিতে সাহসী হইয়াছিলাম কিন্তু তার উপযুক্ত

পুরস্কার আমায় দিলেন, আজ কি বলিয়া তাঁর সাম্‌নে দাঁড়াইব, কেমন করিয়া তাঁকে তাঁর আরাধ্য বন্ধুর এই ব্যবহারের কথা জানাইব?" এই বলিয়া স্নেহ কাঁদিতে লাগিল। রমেনের মোহের ঘোর তখন কাটিয়াছে, সে তখন বুঝিয়াছে যে সে কি অন্যায় কাজ করিয়াছে, অনুতাপের প্রবলবহ্নি তখন তার হৃদয়ে প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, সে স্নেহের পাদু'খানি জড়িয়ে ধরে বল্লে, "আপনি দয়া করে অভাগার এ দুর্ব্বলতার কথা বিস্মৃত হন, আমি এ পাপমুখে যা বলে অভ্যাগতা অসহায়া বন্ধুপত্নীর প্রতি মোহান্ধ হইয়া অন্যায় অত্যাচার করিয়াছি অনুগ্রহ করে তা ভুলে যান। বিনয়কে যেন একথা কোন রকমে প্রকাশ করবেন না। আমি আপনার কাছে শপথ করে বল্‌ছি, আমার এ দুর্ব্বলতা, হৃদয়ের এ পঙ্কিলভাব এই মুহূর্ত্ত হ'তে ত্যাগ করলুম, যেমন বন্ধুভাবে আমায় দেখে এসেছেন আবার তেমি দেখ্‌বেন। স্নেহ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রমেনকে পা ছেড়ে দিতে বল্লে ও রমেনের অনুতাপ যে প্রকৃত তা তার প্রতিকথায় ধ্বনিত হচ্ছে বুঝ্‌তে পেরে মনে মনে রমেনকে ক্ষমা করলে, রমেন স্নেহের মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারলে যে তার বন্ধুপত্নী রমণীর সর্ব্বগুণেভূষিতা, অনুতপ্ত পাপীকে সে ক্ষমা করছে। রমেন তাড়াতাড়ি একখানি ৫০০শত টাকার চেক স্নেহের হাতে দিয়ে বল্লে এইখানি বিনয়কে দেবেন, আপনারা ৭।৮দিন পরে পশ্চিমে যাবেন আমি ততদিনে সেরে উঠ্‌বো ও আপনাদের যাবার সব বন্দোবস্ত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করবো। যদিও রমেনের কাছে অর্থগ্রহণ করতে তার মন সরছিল না, তবু স্বামীর অমূল্য জীবনের কথা স্মরণ করে, অর্থ বিনা তার প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকতে পারে এই ভেবে স্নেহ রমেনের দান শত ধন্যবাদ দিয়ে গ্রহণ করে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রমেন বিছানায় লুটাইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল ও ভগবানের কাছে তার পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল ও হৃদয়ে শান্তিলাভের জন্য কায়মনোচিত্তে তাঁর নিকট প্রার্থনা করিল। সে আত্মবিহ্বল হইয়া কি গুরুতর অন্যায় করিয়াছে, ক্রমশঃ যতই উপলব্ধি করিতে লাগিল ততই কি করিয়া বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর প্রতি এ বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করা যায় এই চিন্তা তার হৃদয়ে প্রবল হইল।

চারমাস পরে বিনয় সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে পশ্চিম হইতে ফিরিল, সেদিন রমেনের কি আনন্দ; সে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া বিনয়, স্নেহ ও তাদের আদরের কন্যা মায়ালতাকে সাদর অভ্যর্থনা করিল। বিনয় তার হৃদয়ের গভীরকৃতজ্ঞতা আবেগপূর্ণ করমর্দ্দন দ্বারা নীরব ভাষায় জানাইল, আর স্নেহ সাহস করিয়া রমেনের মুখের

"স্বামীর বন্ধু বলে আপনার কক্ষে একাকী আসিতে সাহস করিয়াছিলাম। তাহার উপযুক্ত পুরস্কার দিলেন"

দিকে চাহিতে পারিতেছিল না তা রমেন লক্ষ্য করিল, একবার রমেনের অলক্ষিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহ দেখিল সেই নিত্য সহাস্যবদন যেন বিষাদকালিমা মাখা হইয়াছে, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের কোন অব্যক্ত ব্যথা যেন মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্নেহই যে তার এ যাতনার কারণ তাহা বুঝিতে পারিয়া সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। রমেন স্নেহের কাছে গিয়া কেমন ছিলেন জিজ্ঞাসা করায় ঘাড় নাড়িয়া স্নেহ সে কথার উত্তর দিল। মালপত্র নামান ও গাড়ীতে উঠানের সময় বিনয় যখন খুব ব্যস্ত সেই অবসরে রমেন স্নেহের হাতে একখানি পত্র দিয়া বলিল, "এইখানি দয়া করে পড়ে, এর উত্তর দিবেন; এতে কোন অন্যায় কথা আমি লিখি নাই।"

বাড়ীতে আসিয়া অবসরান্তে স্নেহ রমেনের পত্রখানি পড়িল।

মাননীয়াসু,—

আপনার নিকট যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, আপনার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছি, তাহার জন্য এই চারি মাস নিশিদিন আমি অনুতাপ করিয়াছি, যাহা করিয়াছি—তাহা আর ফিরিবার নয়। তবে আপনি দয়াময়ী উচ্চহৃদয়া রমণী তাই আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে সাহসী হইলাম। আমি আমার পাপের যেমন করে পারি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। আপনি আমার অপরাধের কথা ভুলে গেছেন ও আমায় ক্ষমা করেছেন এই লিখে আমার অনুতপ্ত হৃদয়ে একটু শান্তি দিবেন। ইতি,—

হতভাগ্য রমেন।

পত্রখানি স্নেহ তার বাক্সে রেখে দিল। সেইদিন বৈকালে রমেন এসে বিনয়কে বল্লে, ভাই আমার শরীর, ইদানীং বড় ভাল নাই, একজন ম্যানেজার না রাখ্‌লে জমিদারীর কাজ আর নিজে দেখ্‌তে পারছি না—তা কেন একজন বাহিরের লোক রাখতে যাব, তুমি যদি দয়া করে দেখ তবে আমি বড় সুখী হ'ব। তোমার খরচের জন্য ষ্টেট হতে মাসে ২০০৲ দুইশত করে নেবে। বিনয় এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের জন্য রমেনকে হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাইয়া বলিল, ভাই তুমি না দয়া করলে আমি ত মরে যেতাম, আর আমার পত্নী-কন্যা আজ রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, ভগবান তোমায় সুখী করুন, তোমার এ ঋণ ইহজীবনে ভুলিব না। রমেন স্নেহের দিকে চাহিয়া দেখে যে অপাঙ্গ বহিয়া তার বক্ষে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঝরিতেছে।

দুদিন পরে রমেন বিনয়ের বাড়ী বেড়াইতে আসিলে, স্নেহ তার হাতে একখানি কাগজ দিয়া গেল, রমেন বুঝিল সেখানি তার পূর্ব্বপত্রের উত্তর, অতি যত্নে সে তার বুকের পকেটে কাগজখানি রাখিল ও অন্যান্য দিনের ন্যায় কথাবার্ত্তায় বিলম্ব না করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। বাড়ীতে আসিয়া কাগজখানি তাড়াতাড়ি খুলিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে পড়িল, স্নেহ লিখিয়াছে—

রমেন বাবু—

আপনার পত্র পড়িয়া বড় সুখী হইলাম, সব কথা ভুলিয়া যাইব কিন্তু আপনার অতুল স্নেহ দয়ার কথা ইহজীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না। জগদীশ্বরের কাছে একান্ত প্রার্থনা যেন তিনি আপনার হৃদয়ে বল দেন ও প্রাণে শান্তি দেন। আমি লজ্জাবশতঃ আপনাকে যদি কোন রকমে ব্যথা দিয়ে থাকি আমায় ক্ষমা করবেন।

ইতি—স্নেহলতা।

রমেন পত্রখানি শতবার পড়িল, ঐ কয় পংক্তিতে স্নেহলতা যাহা লিখিয়াছে তাহাতেই সে বুঝিল যে তার আধুনিক মানসিক অবস্থা স্নেহের কাছে অবিদিত নয়; তবে সেজন্য স্নেহ রমেনকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া যে সহানুভূতি দেখাইয়াছে ইহাতে সে বড় সুখী হইল। পত্রখানি অতি যত্নে সে নিজের ড্রয়ারে রাখিয়া দিল।

পাঁচ মাস পরে বিনয় একদিন জল খেতে বসেছে, স্নেহ পাখা দিয়ে তাকে বাতাস করছে, এমন সময় রমেনের বাড়ী হ'তে তার চাকর ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে— ম্যানেজার বাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে, বাবু হঠাৎ চেয়ার থেকে পড়ে কেমন হয়ে গেছেন আমরা অনেকে নাড়াচাড়া করে দেখ্‌লুম দেহ অসাড়, বেজন বাবু ডাক্তারকে ছুটে ডেকে আনলুম তিনি হাত দেখে বুক পরীক্ষা করে বল্লেন, বাবু আর নাই, কি হ'লো ম্যানেজার বাবু, লক্ষ টাকা খরচ করে আপনি যদি আমার বাবুকে বাঁচাতে পারেন বাঁচান, বুকে হাওয়া চালিয়ে দেন, কল্‌কাতা সহরে যত বড় ডাক্তার থাকে তাঁকে আনান, আনিয়ে বাবুর প্রাণবায়ু ফিরিয়ে দিন; ম্যানেজার বাবু, তিনি আপনার শক্ত ব্যারাম হতে বাঁচাবার জন্য কি না করেছেন তাত আপনি জানেন, এবার আপনি তাঁকে বাঁচান এই বলিয়া চাকরটী কাঁদিতে লাগিল। বিনয় বুঝিল কি ঘটিয়াছে, ইদানীং রমেনের শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল, ডাক্তার ওয়াটস্ সপ্তাহ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, রমেনের হৃদ্‌রোগ হয়েছে, রমেনকে দার্জ্জিলিং কি আলমোরা পাঠাবার জন্য বিনয় সব বন্দোবস্ত করছিল কিন্তু রমেন কোথাও যাবে না বলে জিদ্ ধরে বসেছিল। হায়! এত শীঘ্র এমন ভাবে যে রমেন তাদের ছেড়ে চলে যাবে এ কথা বিনয় কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাই এ

আঘাত পেলের মত বুকে বাজিল সে আর কথা বলিতে পারিল না হাত ধুইয়া রমেনের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

রমেন চলিয়া গেলে স্নেহ একবার প্রাণ খুলিয়া কাঁদিল, ও অনুচ্চস্বরে বলিল, "তুমি দেবতা ছিলে, কি কুক্ষণে এ অভাগিনীকে দেখিয়াছিলে ও ভালবাসিয়াছিলে, আমি তোমার অকাল মৃত্যুর কারণ হইলাম, কিন্তু ভগবান সাক্ষী আমার কোন দোষ নাই।"

বিনয় গিয়া দেখে যে সে যাহা ভয় করিয়াছিল তাহাই ঘটিয়াছে, হৃদরোগেই রমেন মারা গিয়াছে। যথাবিধি রমেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর প্রতিবাসী ও স্থানীয় পুলিস ইনেস্পেক্টরের সম্মুখে রমেনের লোহার সিন্দুকাদি খুলিয়া তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে দেখা হইল।

একখানি রেজিষ্টারী উইল পাওয়া গেল তাহাতে রমেন নিম্নোক্ত ব্যবস্থা করিয়াছে।

সম্পত্তির আয় হইতে বাৎসরিক লক্ষ টাকা দেশের দরিদ্র বিধবা ও ভদ্র পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ব্যয়িত হইবে ও বক্রী ১০০০০৲ টাকা বিনয় ষ্টেটের একমাত্র এক্জেকিউটর স্বরূপ পাইবে। মাসহরা কাহাকে দেওয়া যাইবে সে মনোনয়নের ভার বিনয় ও তার পত্নীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। বিনয় উইলে স্নেহের নাম দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত ও বিচলিত হইল।

একদিন ষ্টেটের কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে বিনয় রমেনের ড্রয়ার খুলিল ও কাগজের মধ্যে স্নেহের হস্তলিপি দেখিতে পাইয়া শিহরিয়া উঠিল, সে যে রমেনকে কোনদিন চিঠি লিখেছিল তা সে জানিত না, কিম্বা স্নেহও কখন সে কথা তাকে বলে নাই। উদ্বেলিত প্রাণে কম্পিত হস্তে পত্রখানি লইয়া বিনয় পড়িল, পড়িতে পড়িতে তাহার শিরায় শিরায় অগ্নিপ্রবাহ ছুটিল ; এবার বিনয় বুঝিল কেন ইদানীং স্নেহ রমেনকে দেখিলেই এত সলজ্জ হইয়া থাকিত, আর কেনই বা রমেন তাদের প্রতি এত ধনদান ও কৃপাবৃষ্টি করিতেছিল ও স্নেহের নাম উইলে কিসের জন্য সন্নিবেশিত হইয়াছে! হায়! বন্ধুতার ভান করিয়া রমেন,—যাহাকে সে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছে, ভাল বাসিয়াছে, সেই রমেন,—তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে ; আর যে স্নেহকে তার সর্ব্বস্ব দিয়ে সে ভাল বাসিয়াছে তাহারও কি এই ব্যবহার! বিনয়ের চক্ষে সব অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল, সে তাড়াতাড়ি ড্রয়ার বন্ধ করে বাড়ীর দিকে ছুটিল ও বাড়ীতে এসে স্নেহের হাত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে উন্মত্তের ন্যায় বলতে লাগলো, "রাক্ষসী! তোমার এই কাজ, রমেনের সহিত গুপ্তপ্রণয় কতদিন

হইয়াছিল? তোমার অমূল্য সতীত্বরত্নের বিনিময়ে বুঝি রমেন অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া আমাদের এই রাজার হালে রাখিয়াছে? ধিক্ আমাকে এর চেয়ে আমার অনশনে রোগশয্যায় মৃত্যু যে শতগুণে বাঞ্ছনীয় ছিল। পিশাচিনী! কেন তুমি আমার পীড়ার সময় ঔষধ ছলে কোনরকমে বিষ খাওয়াইয়া নিজের পাপ প্রবৃত্তির পথ কণ্টকশূন্য করতে পার নাই।" এই বলিয়া বালকের ন্যায় বিনয় কাঁদিতে লাগিল।

স্নেহ ব্যাপার কি বুঝিতে পারিল না, তবে বলিল, "একি বল্‌ছো, আজ তোমার মুখে একি নিদারুণ কথা শুনছি; তুমি আমার আরাধ্য দেবতা, পতি, গুরু, তুমি যদি বলো আমি অসতী তাহ'লে সতী হইয়াও জগতের চক্ষে আমি কুলটা, রমণীর এর চেয়ে বেশী অপবাদ ও মর্ম্মভেদী যাতনা আর জগতে নাই। আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পারছি না, কি হয়েছে; আমায় বুঝিয়ে বল, কেন তোমার পদাশ্রিতা, তোমার অনন্যরতা পত্নীকে সন্দেহ করে তাকে দুঃখসাগরে ভাসাচ্ছ?" বিনয় শ্লেষপূর্ণস্বরে বলিল, "ও তুমি খুকী. বুঝতে পারছ না, এই দেখ তোমার পাপের জাজ্বল্যমান প্রমাণ," এই বলে স্নেহের চিটিখানি দেখাইল। স্নেহ চিটিখানি দেখে একবার ক্ষণিকের তরে শিহরিল, তারপর বলিল, "স্বামিন্! সত্যই আমি তোমার কাছে এক অপরাধে অপরাধিনী, তোমার এই পত্রের কথা বা তোমার বন্ধুর বিষয় কোন কথা বলি নাই। রমেন বাবু তোমায় কোনও কথা না বল্‌তে আমায় শপথ করিয়েছিলেন, এবং তিনি তাঁর মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার জন্য বড় মর্ম্মাহত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন দেখে অন্যায় হ'লেও আমি সে শপথ এতদিন রক্ষা করে এসেছিলুম, তবে আজ যখন আমার পতির হৃদয়ে সন্দেহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন সব কথাই আমায় বলিতে হইবে; বিশেষতঃ তোমার স্বর্গীয়বন্ধুকে তুমি যতদূর নীচ ভাবিতেছ, তিনি যখন ততটা নীচ প্রকৃতির লোক নন, তখন অন্ততঃ তাঁর দোষ ক্ষালনের জন্যও আমায় তাঁর শত অনুরোধ সত্ত্বেও সেদিনকার ঘটনা বলিতে হইবে। সব কথা বলিবার আগে তোমায় একটী জিনিষ দেখাই, যদি তাহ'তে তুমি ব্যাপারটী হৃদয়ঙ্গম করতে পার, এই বলে স্নেহ রমেনের পত্রখানি এনে স্বামীর হাতে দিল, বিনয় পত্রখানি পড়ে গভীর এই অন্ধকারে আলো দেখিতে পাইল না, তখন স্নেহ সেই দিবসের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। বিনয় তখন বুঝিতে পারিল রমেন কেন ইদানীং এত বিমর্ষ অবস্থায় থাক্‌তো ও কি মর্ম্মবেদনায় ও অনুশোচনায় তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। তার হৃদ্‌রোগের কারণ সে এতদিনে জানিতে পারিল; অতিরিক্ত মানসিক কষ্টে ও চিন্তায় সে তার স্বাস্থ্য ও হৃদয়

ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়াছিল একথা রমেন কাহাকেও ঘুণাক্ষরে জানতে দেয় নাই, এখন বিনয় বুঝিতে পারিল পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসার পর কেন রমেন স্নেহের সহিত তেমন অবাধে ও সহাস্তে কথাবার্ত্তা কহিত না, এবং স্নেহের প্রসংশাকীর্ত্তন করিয়া বিনয়কে পাগল করিয়া তুলিত না। রমেনকে দেখিলে ইদানীং স্নেহের সলজ্জভাবের কারণ সে এতদিনে উপলব্ধি করিল; আর যথন বুঝিল যে হঠকারিতার জন্য পত্নীর গভীর ভালবাসার প্রতি অযথা সন্দেহকরতঃ তাহাকে নানা অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিয়া বিনয় কি অন্যায় করিয়াছে, তখন সে স্নেহের হাত দুখানি সাদরে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। স্নেহের চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। স্নেহ জানিত ধৰ্ম্মতঃ সে নিরপরাধিনী, স্বামীর নিকট যদি সে কোন অপরাধ করে থাকে তবে সে তাঁর বন্ধুর হৃদয়ের দিকে চাহিয়া করিয়াছিল, সেজন্য তার উদারহৃদয় স্বামী তার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, এ দৃঢ়বিশ্বাস তার ছিল। সে বলিল, "দেখ আমার বড় দুঃখ রহিল যে তোমার অমন দেবতুল্য বন্ধুর অকাল মৃত্যুর কারণ এই অভাগিনী। যাঁর করুণায় ও অর্থসাহায্যে আমি আমার জীবনের সর্ব্বস্বধনকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছি, ঘটনাচক্রে কিনা তিনিই আমার জন্য প্রাণ হারাইলেন।" বিনয় বলিল, "তবে এস স্নেহ, আমরা দুজনে আমাদের সেই স্বর্গীয় বন্ধুবরের পবিত্র আত্মার উদ্দেশে এই প্রার্থনা করি যেন তার ইহজীবনের এই ঐকান্তিক নিস্ফল ভালবাসার প্রতিদান সে জন্মজন্মান্তরে পায়, আর পরলোকে যেন তার আত্মা শান্তিতে বিরাজ করে।" স্নেহ বলিল, "সে কি প্রভু! আমি যে জন্মজন্মান্তরে তোমারই দাসী হই এই আমার কামনা, এবং জগদীশ্বরের কাছে নিবেদন; তবে আমি কেমন করিয়া এ প্রার্থনায় যোগদান করিব?" বিনয় বলিল, "দেখ স্নেহ, ঐকান্তিক ভক্তিতে ও ধ্যানে স্বয়ং ভগবান বশীভূত হন, সুতরাং রমেনের এই ঐকান্তিক হৃদয়ভরা ভালবাসা কখনও নিস্ফল যাইতে পারে না, তোমারই অংশ, তোমারই রূপে গুণে সমন্বিতা হয়ে জন্মান্তরে রমেনের অঙ্কলক্ষ্মী হইবে, এ আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আর আমার আদেশে এ প্রার্থনায় যোগদান করিলে তোমার ধর্ম্মের কোন হানি হইবে না।"

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

মুষিকের পর্বত-প্রসব।

১

কোথায় যাইতেছি? শ্বশুরবাড়ী? কেন? জামাই ষষ্ঠির নিমন্ত্রণে। কতদিন বিবাহ হইয়াছে? তিন বৎসর।

প্রথম পরিচয় ঐটুকু। তারপর আরও যদি কিছু জানিতে চান, তাহা হইলে শুনুন:—

আমি কাজ করি, পশ্চিমে। শ্বশুরবাড়ী কলিকাতায়। বিবাহের পরে এই প্রথম সেখানে যাইতেছি।

আমার স্ত্রী পশ্চিমেই রহিয়া গেলেন। কারণ, ম্যালেরিয়া জ্বরে তিনি এখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম, যেহেতু কাঁপিতে কাঁপিতে পিত্রালয়ে যাওয়াটা শাস্ত্রনিষিদ্ধ না হইলেও, নিয়মবিরুদ্ধ এবং তদুপরি পথপরচটাও কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক—তখন, তখন—বুঝ্‌লে কিনা—

"বুঝেচি।" বলিয়া তিনি পুরু লেপে চন্দ্রবদন ঢাকিলেন।

একটু হেট হইয়া কহিলাম, "প্রিয়ে চারুশীলে, একটী বিদায়ী চুম্বন।"

স্ত্রী। (লেপের ভিতর হইতে) বৌ যখন জ্বরে কাঁপে, তখন—বুঝ্‌লে কিনা—তাকে—

আমি। চুমো খেতে নেই। বুঝেচি।"

২

শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছি। "আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী। ডাকিনী যোগিনী কেহ, কেহবা নাগিনী!"—স্ত্রীর মুখে তাঁহাদের "হাতে-নাতে ঠাট্টা"র অনেক রোমহর্ষণ কাহিনী শুনিয়াছিলাম। তাঁহারা পানীয় জলে নুণ মিশাইয়া রাখেন। তাঁহারা গর্ত্তের উপরে আসন পাতেন। তাঁহারা পান্তুয়ার ভিতরে আল্‌পিন ঢুকাইয়া দেন—ইত্যাদি।

ভয়ে ভয়ে বাড়ীর ভিতরে গেলাম। দশটি ভগিনী সারি সারি দাঁড়াইয়া ছিলেন। বুঝিলাম, আমার সঙ্গে "হাতে-নাতে ঠাট্টা" করিবার জন্ত সবাই পিত্রালয়ে আসিয়াছেন। আমি ছোট জামাই। অতএব তাঁহাদের শেষ শিকার।

আমি যাইবামাত্র, তাঁহারা আমাকে রাজার মত অভ্যর্থনা করিলেন। একজন আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। আর একজন আঁচল পাতিয়া কহিলেন :—

"এস এস বঁধু এস
আধ আঁচরে বোস—
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি!"

উঃ! শ্যালিকাদের বিদ্যুতের মত রূপ! বাঁশীর মত গলা!

প্রথম অভ্যর্থনাতেই দমিয়া গেলাম। মনকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "মন! ধাঁধা খেওনা—খুব শক্ত হয়ে থাক! এ সব তোমাকে জব্দ কর্ব্বার ফিকির!"

যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিলাম। কিন্তু শ্যালিকাদের নবীনতার তারল্যে ক্ষণে-ক্ষণে আমার বিপুল গাম্ভীর্য্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল।

এক শ্যালিকা কৃপাভরা চক্ষুতে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া সমবেদনা জানাইয়া কহিলেন "আহা দেখচ গা! পশ্চিমে থেকে থেকে জামাই বেচারীর গায়ের রং 'ব্লু-ব্ল্যাক্' কালীর মত হয়ে গেচে।"

২য়া। আজ আর ঘরে আলো জ্বাল্‌তে হবে না।

৩য়া। কেন না?

২য়া। এই যে অমাবস্যার চাঁদ এসেচে বাড়ীতে।

সবাই হাসিয়া উঠিল। একেত আমাকে 'কালো' বলিলে, আমার দ্বিতীয় রিপু ভয়ঙ্কর উগ্র হইয়া উঠিত, তাহার উপরে আবার এই হাসি! যেন ফুটন্ত তেলে 'ফোড়নের' ছিটে! আমি যেন কেমন এক রকম হইয়া গেলাম। অথচ কোন কথাও বলিতে পারিলাম না। কারণ, আপনারা যাকে 'মুখচোরা' বলেন, আমি সেই জাতীয়।

৩

শ্যালীদের ভিতরে সারাদিন 'গুজ্‌গাজ্‌ ফুসকাস্‌' চলিতেছে এবং আমি ক্রমেই ম্রিয়মান হইয়া যাইতেছি। বুঝিতেছি, আমার বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র ক্রমশঃ জমাট হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু, যাই বল আর যাই কর, আমিও সহজে ধরা দিবার ছেলে নই। আহারের সময়ে আসনের নিম্নভাগ পরীক্ষা করিয়া তবে বসিয়াছি। খাদ্যদ্রব্য আগে ভাজিয়া তবে গলাধঃকরণ করিয়াছি। গেলাসের জল আগে চাকিয়া, তবে চুমুক দিয়াছি! আমার অতি-সাবধানতার দৌড় দেখিয়া, পরস্পরের দিকে

অপাঙ্গে চাহিয়া শ্যালিকারা সুগোল গাল টিপিয়া নীরবে প্রচুর হাস্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অয়ি নিষ্ঠুরে, ও হাসি আমাকে মজাইতে পারিবে না।

সারাদিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর আমি আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। মহাসমাদরে, শ্যালীরা আমাকে 'আগ্' বাড়াইয়া নিয়া গেলেন। পালঙ্কের উপরে শয্যা প্রস্তুত। ঝমাঝম্ মল্ বাজাইয়া, কোমরের গোট্ দুলাইয়া ছোট শ্যালী আমার সামনে আসিয়া বলিল, "জামাই বাবু, জামাই বাবু, বড়ই দুঃখের কথা!"

আমি জিজ্ঞাসমান নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। কিন্তু, রূপসীর চোখে তখন বিদ্যুৎ খেলিতেছে—চপল ওষ্ঠাধরে দুষ্ট হাসির লীলা!. সহ্য করিতে পারিলাম না—মাথা নীচু করিয়া মেজের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

শ্যালিকা কহিলেন, "দুঃখের কথা জামাই বাবু, দুঃখের কথা! চারুকে রেখে এলেন পশ্চিমে,—এখন মজাটা টের পাবেন। শূন্য শয্যায় পড়ে হাহাকার, আর ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ কর্ত্তে হবে আর কি!"

আর এক শ্যালী বলিলেন, "নেইবা রৈল চারু! জামাই আমাদের পশ্চিমের ছাতুখোর্ খোট্টা—অতশত বুঝবে না লো, বুঝবে না! ও হয়ত চারুকে না পেয়ে বিছানার 'গির্দ্দে' আলিঙ্গন করেই রাত কাটিয়ে দেবে। কি বল ভাই জামাই?"

সবাই হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। ঘাড়্ হেঁট করিয়া মনে মনে কহিলাম, "অয়ি মুখরে! অয়ি অসভ্যে! এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় তোমাদের এবংবিধ আচরণ, মার্জ্জনার অযোগ্য!"

শ্যালীরা প্রস্থান করিল। আমি আগে দরজাটা ভেজাইয়া দিলাম। কিন্তু তথাপি, কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। খালি মনে হইতে লাগিল চারিদিকে যেন কতকগুলি কৌতূহলী চারুকণ্ঠ সহসা হাস্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার জন্য, গোপনে প্রস্তুত হইয়া আছে। বুঝিলাম, দিনের বেলায় বুদ্ধির কবচে দেহ ঢাকা থাকাতে শ্যালীরা আমার কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু নিশাভাগে এইবারে তাঁহারা ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িবেন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে, ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। একদিকে একটা টুল্; তার উপরে পিতলের পিল্‌সুজে মিট্‌মিটে প্রদীপ জ্বলিতেছে! ঘরের দেওয়ালে বেঙ্গল আর্টষ্টুডিওর খান্‌কত দেবদেবীর ছবি। দেওয়ালের গায়ে একটী কুলঙ্গী,—কবে, কে, ইহার ভিতরে কেরোসিনের 'ডিপা' রাখিয়াছিল, তার ভুষা এখনও

উপরে জমা হইয়া রহিয়াছে। কুলঙ্গীর ভিতরটা পরীক্ষা করিলাম। একটা টিক্‌টিকি, একটা আরসুলা, খানিকটা তৈলাক্ত চুলের ফিতা, একখানা 'ছেঁড়া-খোড়া' কাশীদাসী মহাভারত এবং লালপিপড়াভরা আধখানা মুড়্‌কির মোয়া ও চারখানা বাতাসা ছাড়া তাহার ভিতরে আর কিছু সন্দেহজনক ভয়াবহ দ্রব্য লুকানো ছিল না।

হঠাৎ মনে হইল, বাহিরে আড়ালে থাকিয়া কাহারা যেন চাপাগলায় হাসিতেছে, মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতেছে। ভাবিলাম, নাঃ, এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাটা কিছু না। আমি যে ভয় পাইয়া গিয়াছি, এটা যদি ওরা টের পায়—তাহা হইলে আরও খারাপ কথা। শত্রুকে নিজের ছিদ্র দেখাইয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। অতএব, এখন শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়।

কিন্তু, বিছানার কাছে গিয়া মনে হইল, পৃথিবীর যত কিছু রহস্য যেন ঐখানেই জমায়েৎ আছে। ঐ কুঞ্চিত মশারী, ঐ পুরু গদির তলা, ঐ ভাঁজ করা লেপ,—উহাদের অন্তরালে যেন হাস্যাস্পদ হইবার উপযোগী বহু উপকরণ, পেলব এবং কৌশলি হস্ত কর্ত্তৃক সযত্নে স্থাপিত আছে—তাইত !

দূর থেকে আগে পালঙ্কের তলাটা দেখিয়া নিলাম। কিছুই নাই। আস্তে আস্তে বালিশ তুলিলাম, গদী তুলিলাম, লেপ তুলিলাম। কিছুই নাই।

কিন্তু, সন্দেহ গেল না। হয়ত মশারীর ভিতরে এক ঘটী জল আছে,—নাড়া পাইলে উপুড় হইবে। হয়ত খাটখানা আলগা ভাবে রাখা আছে,—শয়ন করিলেই—ভূমিসাৎ হইবে।

মশারীতে দিলাম এক টান—খাট ধরিয়া দিলাম এক নাড়া—সব ঠিক ! তবু কেন জানি না, মনটা কেমন খুৎ খুৎ করিতে লাগিল।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম—আমাকে জব্দ করিবার আর কি কি উপায় থাকিতে পারে ? কিন্তু কিছুই ঠাহর করিতে পারিলাম না।

হঠাৎ আমার মাথায় অব্যর্থ এক সেরা মৎলব জাগিল। হাঁ সেই ঠিক কথা।

প্রদীপের শিখায় ফুঁ দিলাম,—ঘর অন্ধকার। তারপর, সেই সন্দেহকর খাটের উপর হইতে চাদর ও তোষক টানিয়া নিয়া ঘরের মধ্যস্থলে, নিরাপদ ব্যবধানে, দরজার ঠিক সামনে মেঝেতে এক আলাদা বিছানা তৈরি করিলাম।

ভাবিলাম, এখনত দুর্গা বলিয়া শুইয়া পড়া যাক ; তারপর, খুব ভোর বেলায়

উঠিয়া পড়িয়া, যেখানকার যা'—সেখানে সেটি ঠিকঠাক রাখিয়া দিলেই, কেহ আর কোন সন্দেহ করিতে পারিবে না।

৩

লেপের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু পোড়া ঘুম কি সহজে চোখে আসে? সম্ভব, অসম্ভব নানান রকম চিন্তা, আমার মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

অনেকক্ষণ পরে, একটু তন্দ্রা আসিল। চোখ প্রায় মুদিয়া আসিতেছে—এমন সময় ঘরের ভিতরে খুট্‌খাট করিয়া কিসের শব্দ হইল।

ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিলাম। চারিদিকে ঘুট ঘুটে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভিতরে কি আছে, আর কি নাই, কার সাধ্য তাহা বুঝিয়া ওঠে?

দুই চোখ যতটা সম্ভব বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

আবার শব্দ হইল—খুব অস্পষ্ট—যেন কে এদিকে ওদিকে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম "কে?"

উত্তর নাই। পদশব্দ দ্রুততর।

ঘরের ভিতরে কে তবে? সাড়া দেয় না—অথচ চলিয়া বেড়ায়—ভূত নয়ত? আমার গায়ে কাঁটা দিল। দিনের বেলায় যদিও আমি ভূতের ভয় একটুও বিশ্বাস করি না—কিন্তু রাত্রিকালে 'ভূত প্রেতে' আমার অত্যন্ত আস্থা।

ভূতের কথা মনে হইবামাত্র, আমি প্রাণপণে দুচোখ বুজিয়া আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

খানিক পরে,—আমার কপালের উপর যেন কার উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িল! ও বাবা!

মনে হইল,—মাথার উপরে কে যেন তার দুখানা মাংসশূন্য দীর্ঘ কঙ্কালবাহু বিস্তার করিয়া, নয়ন হীন নেত্র-কুহরের অপার্থিব দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া একমনে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে!

ভূত তাড়াইবার মহামন্ত্র 'রাম রাম' স্মরণ করিতে করিতে শুষ্ক কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে সসম্মানে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—

"কে—কে—আপনি?"

মিহিস্বরে ভূত উত্তর দিল—

"ম্যাও!"

বিড়াল! মনে ভয়ানক রাগ হইল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া এক পাটি জুতা তুলিয়া নিয়া আন্দাজ করিয়া ছুড়িবার উপক্রম করিতেছি। কিন্তু তার আগেই চালাক্ বিড়ালটা এক লাফে জানালা দিয়া সরিয়া পড়িল।

আস্তে আস্তে আবার শয়ন করিলাম। এবারে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

* * * * * *

কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম,—তা জানি না—তবে অনেকক্ষণ বটে!

হঠাৎ, বিষম যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া আমি জাগিয়া উঠিলাম।

বাপরে!—

আমার মুখ আর গলা তখন পুড়িয়া যাইতেছে—কি এক তপ্ত আগুনের তরল ধারা যেন, আমার চারিপাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। পাছে, অন্ধ হইয়া যাই, সেই ভয়ে আমি চোখ চাহিতেও পারিলাম না।

উঠিয়া বসিতে গেলাম—পারিলাম না! আমার দেহের উপরে জগদ্দল পাথরের মত ভারী, একটা কিছু সজীব পদার্থ চড়িয়া বসিয়াছে!

কি এ?—ভয়ে কণ্টকিত এবং রাগে অজ্ঞান হইয়া, মারিলাম তাকে—এক ঘুষা!

যেমন ঘুষা মারা,—অমনি এক আর্ত্তনাদ!

"অগ্ গো কে আছ গো—দাদা বাবু আমার দফা একেবারে রফা কর্‌লে গো! উহু, উহু, উহু।"

তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, তড়াক করিয়া আমি লাফাইয়া পড়িলাম।

চোখ কচলাইয়া, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি,—বাহিরে ভোরের আলো!

এদিকে, মাটীর উপরে এক দিকে শ্বশুর বাড়ীর আধবুড়ী ঝী মাগি আপনার মোটা এবং কাল দেহ খানা সটান ছড়াইয়া দিয়া পড়িয়া আছে,—আর এক দিকে চায়ের পিয়ালা ও মিষ্টান্নের থালা গড়াগড়ি যাইতেছে।

অদূরে ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ মল এবং ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ চুড়ীর শব্দ পাইলাম। বুঝিলাম সারা বাড়ী এখনি ঘরের ভিতরে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। পলাইবার পথ নাই, নহিলে তখনই চম্পট্ দিতাম।

আর কিছু না—আমার এই অস্থানে বিছানা করাই যত গণ্ডগোলের মূল। সকাল বেলা, জলখাবার ও চা নিয়া ঝী ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া ছিল,—কিন্তু, অতি বুদ্ধি আমি—দরজার সামনে মেঝের উপরে যে খাট ছাড়িয়া শুইয়া আছি,—

অতটা সে খেয়াল করে নাই। সুতরাং, হোঁচট খাইয়া পড়বি ত পড়—একেবারে আমারই ঘাড়ের উপরে! এ 'পর্ব্বতের মুষিক প্রসব' না—'মুষিকের পর্ব্বত প্রসব!'

ওঃ! সে দিন সবাই কি হাসিটাই যে হাসিয়াছিল!*

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়।

অন্নাশ্রম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধারের উপায়।

লালদাস তাহার সঙ্গীর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে বহু চিন্তা করিল। সে যতই এ বিষয় ভাবিতে লাগিল। ততই তাহার বিশ্বাস হইতে লাগিল যে দামোদর ডাক্তারের বাড়ী হইতে বাহির হয় নাই। সে যে ডাক্তারের নিকট হইতে টাকা লইয়া তাহাকে ফাঁকি দিবে, তাহার স্ত্রীকে পর্য্যন্ত ফেলিয়া পলাইবে, তাহা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে যতই ভাবিল, ততই তাহার বিশ্বাস হইল যে, দামোদর নিশ্চয়ই ডাক্তারের বাড়ীতেই আছে—নিশ্চয়ই ডাক্তার তাহার বাড়ীর উপরের কোন ঘরে তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে,—ডাক্তার সকলই পারে।

সে ডাক্তারের বাড়ীতে কোন রাত্রে প্রবেশ করিয়া তাহার টাকা কড়ি লইবে, ইহা বহু দিন হইল স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, এই জন্য তাহার বাড়ীর সকল খবরই রাখিত। নিশ্চয়ই দামোদর তাহার বাড়ীতে আটক আছে ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই—সে ডাক্তারের বাড়ী রাত্রিতে নজর রাখিবার ইচ্ছা করিল।

* মূল ঘটনা Guy De Maupassant এর সামান্য ছায়ামাত্র লইয়া লিখিত

সে জানিত উপরের পশ্চাদ্দিককার ঘরে কেহ থাকিত না। রাত্রে সে গৃহে আলো জ্বলিতে দেখিয়া বুঝিল যে, নিশ্চয়ই সেই ঘরে দামোদর বদ্ধ আছে।—সে সমস্ত রাত্রি সেই ঘরের প্রতি নজর রাখিল। দেখিল সমস্ত রাত্রিই সে গৃহে আলো জ্বলিল।

লালদাস ভাবিল, দামোদরের স্ত্রীকে এ কথা বলা কি উচিত? সে স্ত্রীলোক, তবে তাহার স্বামী যে মরে নাই—ডাক্তারের বাড়ী বদ্ধি আছে, এ কথা জানিয়াও তাহাকে না বলা যে নিতান্ত অন্যায়—তাহাত সে বুঝিল; ওদিকে দামোদরের স্ত্রী তাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছে।

তবে সে স্ত্রীলোক,—এ কথা শুনিলে সে হয়তো কেবল চীৎকার করিয়া কাঁদিবে, মহা গোলযোগ করিবে—তাহা হইলে সকল কার্য্য পণ্ড হইবে। কিন্তু সে ইহাও জানিত, দামোদরের জন্য তাহার স্ত্রী সব করিতে পারে—আগুণে ঝাপ দিতে পারে—জলে ডুবিতে পারে, পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারে, সে স্ত্রীলোক হইলেও নির্ভীকা।

সে একাকী কোন মতেই ডাক্তারের বাড়ী হইতে দামোদরকে উদ্ধার করিতে পারিবে না, অন্ততঃ একজন সঙ্গী চাই। কিন্তু এ কথা আর দ্বিতীয় লোককে বলিবার উপায় নাই। কাজেই অনেক ভাবিয়া সে অবশেষে বামুকে বলাই স্থির করিল।

সে দামোদরের বাড়ীতে আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলে, বামু আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া দূরে সরিয়া গেল,—বলিয়া উঠিল, "আমায় ছুঁয়ো না!"

তাহার ভাবে ভঙ্গিতে লালদাস নিতান্ত চিন্তিত হইয়া বলিল, "কেন কেন কি হইয়াছে।"

বামু কাতরে বলিল, "কি হইয়াছে—তোমার হাতে রক্ত!"

"রক্ত—পাগল নাকি—আমি দামোদরের খবর আনিয়াছি—"

বামু ঘরের দিকে চাহিয়া—ভীত ভাবে বলিল, "তাহা হইলে,—তাহা হইলে—তাহাকে তাহারা ধরিয়াছে—"

"ধরিয়াছে? কে ধরিবে?"

"পুলিশ—আর আমার কাছে লুকাইতে হইবে না, আমি সব জানি।"

"বটে—তাহা হইলে দেখিতেছি, তুমি আমার চেয়ে বেশী জান। কি তুমি জান?"

"খুন!"

"খুন! সে কি! কে খুন হইয়াছে? কে খুন করিল—"

"তোমরা দুজনে।"

"বটে!"

"হাঁ—তোমাদের দুজনকেই পুলিশ খুঁজিতেছে। তুমিই আমার স্বামীর সর্ব্বনাশ করিয়াছ।"

এই বলিয়া বাসু কাঁদিয়া উঠিল। লালদাস তাহার মুখের দিকে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া বলিল, "দেখিতেছি, তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

কে খুন হইয়াছে?"

"তাহা আমি জানি না।"

"জান না, বটে! এখন যদি শীঘ্র আমরা দামোদরের জন্য কিছু না করি, তাহা হইলে খুন—আজই—জল জিয়ন্ত খুন হইবে—দামোদর খুন হইবে?"

"তাহা হইলে তোমরা দুজনে সে দিন রাত্রে বাহির হইয়া কাহাকেও খুন কর নাই।"

"না—নিশ্চয়ই নয়—আমরা কাহাকেও খুন করি নাই।

"তাহারা এখানে—এই বাড়ীতে—জামা জুতা পাইয়াছে।"

এবার লালদাস যথার্থই বিশেষ আশ্চর্য্যন্বিত হইল। বলিল, কে পাইয়াছে?"

"পুলিশ!"

"পুলিশ— তাহা হইলে পুলিশ এখানে আসিয়াছিল?"

"হাঁ—সমস্ত বাড়ী খানাতল্লাসি করিয়া গিয়াছে?"

লালদাসের মুখ শুকাইয়া গেল—তাহার বোধ হইল, যেন পশ্চাদ্ভাগ হইতে কনেষ্টবলের বজ্র কঠোর করতল তাহার কণ্ঠে অর্পিত হইল, সে কম্পিত স্বরে বলিল, তাহারা আর কি পাইয়াছে—"

"তার জামা ও জুতা—তোমরা দুজনেই নিশ্চয় ঘরের কোণে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে, যাহাকে খুন করিয়াছিলে—তাহারই জামা ও জুতা।

লালদাস ভাবিল, তবে পুলিশে নরোত্তমদাসের মৃতদেহ পড়ো বাড়ীতে পাইয়াছে, তাহার জামা ও জুতার সন্ধানে এখানে আসিয়াছিল,—কিন্তু পুলিশ কিরূপে জানিল যে, তাহারা মৃতদেহটা লইয়া আসিয়াছিল? সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল,—"সব—সব আমাকে তুমি বল—"

বাসু বলিল, "আর বলিব কি—আমার পকেটে কাহার কতকগুলা চিঠিও তাহারা পাইয়াছিল।"

দামোদরের সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ছুটিল ? তাহারা যে নরোত্তমদাসকে খুন করে নাই, তাহা তাহারা কিরূপে প্রমাণ করিবে। তখনই তথা হইতে পলাইতে তাহার মন ব্যাকুল হইল,—আর এক মুহূর্ত্তও এদেশে নহে—এখান হইতে না পলাইলে ফাঁসি হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। নিশ্চয়ই হয়তো দামোদর পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হাজতে আছে—না না ডাক্তারই তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়া তাহাদের স্কন্ধে খুন চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে—সে সব পারে—সে সব পারে।"

তখন তাহার মনে হইল,—এখনও সময় আছে এখনও সে অনায়াসে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারে; কিন্তু তাহার চির-সঙ্গী দামোদরকে সে এ বিপদে ফেলিলা কি রূপে পলাইবে ? বিপদে আপদে—সুখে দুঃখে তাহারা কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিবে না,—তাহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; সে কি বলিয়া এখন তাহাকে ফেলিয়া পলাইবে ? না প্রাণ থাকিতে সে তাহা করিতে পারিবে না,—সে যাহাতে দামোদরকে রক্ষা করিতে পারে, প্রাণ পণে তাহার চেষ্টা করিবে; সে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই যাইবে না।

সে বাসুকে বলিল, "তুমি খুব একটা অদ্ভুত গল্প বলিলে যাহা হইক। আমার এখন কোন কথা বলা বৃথা; কারণ তাহা তুমি বিশ্বাস করিবে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলি, আমরা কাহাকেও খুন করি নাই। তোমার ইহা হয় বিশ্বাস কর, না হয় না কর—কিছু যায় আসে না। তবে আমি যাই, তুমি বিশ্বাস করিবে কি যে, দামোদর বাঁচিয়া আছে—আর সে কোথায় আছে, তাহা আমি জানি।"

"তোমার কথা আমার কিছুই বিশ্বাস হয় না।"

"তোমার স্বামী বলিলেও বিশ্বাস করিবে না—আমরা কাহাকেও—খুন করি নাই।"

"হাঁ তা হলে বিশ্বাস করিব।"

"তবে সে যাহাতে তোমায় সে কথা বলিতে পারে তাহাই এখন কর।"

"তুমি জান, আমি তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি।"

"তাহা হইলে আমাকে সাহায্য কর। সে যেখানে আটক আছে, সেখান হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে আমার সাহায্য কর। যদি যথার্থই খুনের জন্য পুলিশ আমাদের সন্ধান করিতেছে তাহা হইলে আমাদের—পলানই উচিত,

আমরা যদিও কাহাকেও খুন করি নাই, তবুও আমি স্বীকার করি, আমাদের বিরুদ্ধে এমন প্রমাণ হইবে যে, আমাদের রক্ষা পাইবার কোন উপায়ই থাকিবে না।"

লালদাসের কথা এমনই কাতরতাপূর্ণ যে তাহার কথা বানুর বিশ্বাস হইল, সে বলিল, "তুমি আমায় কি করিতে বল?"

"যে ঘরে তোমার স্বামী বন্ধ আছে,—আমি সেই ঘরে যাইতে চাহি। তোমার শরীরে জোর আছে—তোমাকে যাহা করিতে বলিব,—তুমি তাহা করিবে?"

"কোথায়—কখন যাইতে হইবে, বল।"

লালদাস ডাক্তার গোকুল দাসের কথা সকলই বলিল। সে শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল।

লালদাস বলিল, "ভয় নাই—আমি একটা লম্বা দড়ি লইয়া যাইব,—যে ঘরে সে বন্ধ আছে,—আমি সেখানে ঠিক যাইতে পারিব, তাহাকেও খালাস করিয়া আনিব.—তুমি কেবল নীচে হইতে দড়ীটা টানিয়া থাকিবে।"

"তবে সে বন্দি আছে?"

"হাঁ, দেখিতেই পাইবে।"

"আমি নিশ্চয় যাইব। তুমি যাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব।"

"তবে এই কথা ঠিক থাকিল, আমি রাত্রে তোমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।

"কত রাত্রে।"

"দুই প্রহর রাত্রির আগে গেলে হইবে না, সকলে না ঘুমাইলে কোন কাজ হইবে না।"

"আমি ঠিক থাকিব।"

"হাঁ—থাকিও।"

এই বলিয়া লালদাস অন্যান্য বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রস্থান করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পতন ও মৃত্যু।

ঠিক রাত্রি এগারটার সময়ে লালদাস উপস্থিত হইল।

তখন সে বলিল, তোমায় কি করিতে হইবে, এখনই বলি। যে ঘরে দামোদর বদ্ধ আছে, সে ঘরের জানালার কাছে একটা বড় গাছ আছে—এই গাছের সব উপরের ডালে ডালে প্রায় জানালার কাছে যাইতে পারিব। তাহার পর এই দেখ, এক বাণ্ডিল সুতা আনিয়াছি,—এই সুতার একটা কোণ জানালায় গরাদে ঘুরাইয়া লাগাইবার চেষ্টা করিব,—চেষ্টা কেন ঠিক লাগাইব—ইহার এক কোণে একটা ঢিল বাঁধিয়া এমনই ছুড়িব যে, সে ঢিলটা ঘুরিয়া ঠিক জড়াইয়া যাইবে। তখন আমি সুতাটা নীচে নামাইয়া দিব,—তুমি এই দড়ীর একটা কোণ সুতায় বাঁধিয়া দিবে,—আমি তখন দড়িটা টানিয়া লইয়া এক দিক্ জানালার ভিতরে দিয়া লইয়া আমার কাছে আনিব, তখন দড়ির দুই মুখ ডালে বাঁধিয়া আমি অনায়াসে জানালায় যাইতে পারিব,—তখন, নিশ্চয়ই অতরাত্রে আর কেহ ঘরে থাকিবে না।—আমি দামোদরের সঙ্গে কথা কহিতে পারিব,—পরে ঐ দড়ী ধরিয়া দুই জনে নামিয়া আসিব,—তুমি কেবল দড়িটা টানিয়া রাখিবে।"

বাহু বলিল, "জানালায় লোহার গরাদে আছে, তাহার ভিতর দিয়া সে কি রূপে বাহির হইয়া আসিবে?"

লালদাস একখানা ছোট লৌহ কাটিবার করাত বাহির করিল, বলিল, "সে বন্দোবস্তও করিয়া আসিয়াছি—এই করাতে লোহার গরাদে কাটিয়া ফেলিব এখন যাহা বলিলাম, সব বেশ ভাল করিয়া বুঝিলে?"

"হাঁ বুঝিয়াছি।"

"তবে এস।"

উভয়ে সেই গভীর রাত্রে নিঃশব্দে অতি সাবধানে ডাক্তারের বাড়ীর দিকে চলিল।

কোনদিকে কেহ নাই, পথ জনমানব সমাগম শূন্য; তাহাতে একটু একটু বৃষ্টি হইতেছিল,—মেঘে অন্ধকার আরও গাঢ়তর করিয়াছিল, এক হাত দূরের লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে তাহাদের কার্য্যে সুবিধা ব্যতীত অসুবিধা হইল না। তাহারা অন্ধকারে অলক্ষিতভাবে ডাক্তারের বাড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

লালদাস বান্নুকে একটা গাছের নিকটে লইয়া গেল। উপরে একটা ঘর আলোকিত দেখিয়া, সে তাহার কাণে কাণে বলিল; "ঐ ঘরে আছে, এইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক, আমি গাছে উঠি, যাহা যাহা বলিয়াছি, যেন সবে মনে থাকে।"

বান্নু কথা কহিল না। লালদাস তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সত্বর গাছে উঠিতে লাগিল,—বান্নু গাছের অন্ধকারে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লালদাস বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় উপস্থিত হইয়া সুকৌশলে জানালার গরাদেয় সুতা লাগাইল। এ সকল কাজে তাহার ন্যায় দক্ষ আর কেহ ছিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে সুতা নিম্নে নামাইয়া দিল।

স্পন্দিত হৃদয়ে বান্নু বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ছিল, সে সুতা হাতে পাইবামাত্র তাহার সহিত দড়ীর একটা মুখ বাঁধিয়া দিল। তখন দড়ী ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল।

বহুক্ষণ সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, উপরে লালদাস কি করিতেছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না, সে এমনই ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

এদিকে লালদাস দড়িটীও সুকৌশলে গরাদেতে লাগাইল, তাহার পর সেই দড়ি ধরিয়া অতি সাবধানে জানালায় উপস্থিত হইল।

গৃহমধ্যে আলো জ্বলিতেছে, জানালা খোলা, তবে তাহার পরে আর একটা জানালা— সেটা কাচ দিয়া বন্ধ।

লালদাস দেখিল, খাটের উপর কে শুইয়া আছে। ভাবিল নিশ্চয়ই দামোদর, সে ধীরে ধীরে ডাকিল "দামু—দামু"—

কেহ উত্তর দিল না। তখন সে তাহার স্বর আর একটু উচ্চে তুলিয়া বলিল, "দামোদর বন্ধু—"

তথাপি কোন উত্তর নাই। তবে কি দামোদর এতই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছে,—তাহার ঘুম তো এরূপ নহে। বিশেষতঃ এ অবস্থায় সে এমনভাবে কখনই ঘুমাইতে পারে না।

সে তাহার স্বর আরও উচ্চে তুলিয়া ডাকিল। "দামোদর—দামোদর—দামোদর—"

এবার যে শয়ন করিয়াছিল, সে নড়িল, ধীরে ধীরে তাহার মুখ জানালার দিকে ফিরাইল।

এ কে! মুহূর্ত্তমধ্যে লালদাস তাহাকে চিনিল।

এ যে সেই—এই সেই জিনাবাঈ,—যে সেদিন তাহাদের সম্মুখে নরোত্তম দাসকে খুন করিতে ডাক্তারকে সাহায্য করিয়াছিল, এখন ইহার রোগশীল মুখ এই রাত্রে প্রেতিনীর মুখের মত বড়ই ভীষণ দেখাইল।

এই গভীর রাত্রে এ অবস্থায় তাহার মুখ দেখিয়া লালদাসের সর্ব্বাঙ্গ যেন পাষাণে পরিণত হইল,—সে চীৎকার করিল না, তাহার চীৎকার করিবার ক্ষমতাও ছিল না, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া গেল,—তাহার হাত হইতে দড়ি ক্রমে সরিয়া আসিতে লাগিল।

সে ইহা বুঝিল—সে প্রাণপণে আত্মসংযমের চেষ্টা পাইল,—কিন্তু বৃথা—তখন বৃথা—

একটা শব্দ হইল,—অকস্মাৎ লালদাস নিম্নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, বিস্মিত ভীত বান্নুর পদতলে মহাশব্দে লালদাসের দেহ পতিত হইল।

বান্নু অতি কষ্টে চীৎকারধ্বনিত-কণ্ঠ রুদ্ধ করিল। অন্ধকারে কিছু দেখিতে না পাইয়া হাত বাড়াইল,—দেখিল একটা মাংসপিণ্ড মাত্র। তাহার হস্ত কিসে ভিজিয়া গেল। সে তখনই বুঝিল যে, লালদাস উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া মাংসপিণ্ড হইয়া গিয়াছে,—তাহার প্রাণ বহির্গত হইয়াছে।

এই লোমহর্ষণ বিভীষিকা দেখিয়া, তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত জল হইয়া গেল, সে চীৎকার করিতে পারিল না, এক পদ নড়িতেও পারিল না,—কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবন-সঞ্চার।

মানবের অদৃষ্টলিপি অতীব বিচিত্র! সুন্দরীলাল স্ত্রীর জন্য দেশত্যাগী হইলেন।

তিনি শতসহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার স্ত্রীর মন পাইলেন না। স্ত্রী আত্মহত্যা করিল।

রাত্রে গৃহে ফিরিয়া নিজের শয়নগৃহে গিয়া সুন্দরী-লাল দেখিলেন, তাহার স্ত্রী গলায় ছুরি দিয়া রক্তাক্ত কলেবরে পড়িয়া আছে,—তিনি স্তম্ভিত হইয়া এক

দৃষ্টে এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন,—তিনি সেই বিভিষিকা হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষু সরাইতে পারিলেন না।

স্ত্রীর অঙ্গে হস্ত দিবামাত্র—তাঁহার পরিচ্ছদ—তাঁহার দুই হস্ত রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল।—তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন এই ভয়াবহ খুন করিয়াছেন।

ক্রমে এ কথা তাহার হৃদয়ে এতই দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইল যে, তখন তাঁহার আর কোন সন্দেহ আসিল না যে,—তিনি খুনী নহেন।

সহসা তাহার মনে হইল, —তিনিই খুনি,—আর এই মৃতা স্ত্রীর পার্শ্বে এখনও দাঁড়াইয়া আছেন,—এ অবস্থায় কেহ তাহাকে দেখিলে তাহার আর রক্ষা পাইবার উপায় নাই। যেমনই তাঁহার মনে একথা উদিত হইল, অমনি তিনি উর্দ্ধশ্বাসে সেই গৃহ হইতে পলাইলেন।

তখন অনেক রাত্রি হইয়াছিল, শেষ রাত্রি। তিনি উর্দ্ধশ্বাসে পথ দিয়া ছুটিলেন। দিন হইলে তাহার রক্তাক্ত দেহ দেখিলে ধরা পড়িতেন ভয়ে তিনি সহরের প্রান্ত সীমায় একটী পড়ো বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন।

তিনি সেই পড়ো বাড়ীতে প্রবেশ করিবার কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য লোকের পদ শব্দ বাড়ীর নিকট শুনিয়া তিনি অতি সাবধানে দ্বারের নিকট আসিলেন। তখন তিনি দেখিলেন. দুই জন লোক ধরাধরি করিয়া কি একটা লইয়া আসিতেছে।

তাহারা একটা ঘরে কি রাখিয়া আবার নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। তখন তিনি সেটা কি দেখিবার জন্য অন্ধকারে তাহাতে হাত দিয়া বলিলেন, "এ আবার কি। আমি কি মৃতদেহের হাত কখনও এড়াইতে পারিব না।"

লালদাস ও দামোদর নরোত্তম দাসের দেহ সেইখানে ফেলিয়া গেলে সুন্দরীলাল তাহা স্পর্শ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

তাহার মস্তিষ্কে অনল প্রবাহ ছুটিল। কিন্তু তিনি নিজে চিকিৎসক; সহসা মৃতদেহ ও পীড়িত ব্যক্তি দেখিলে তাহার চিকিৎসক-সুলভ স্বভাব কোথায় যাইবে? সেই দেহে হস্ত দিয়া তাঁহার বোধ হইল, এ লোকটা যেন এখনও মরে নাই। যেমন এই কথা তাহার মনে হইল,—অমনই তাঁহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল;—তিনি এই লোকটাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

অতি সন্তর্পণে বাহিরে আসিয়া কয়েকটা গাছের পাতা ও শিকড় সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া নরোত্তম দাসের মুখে সেই গাছ ও শিকড়ের রস ঢালিয়া দিলেন, কতক তাহার উদরস্থ হইল,—কতক তাহার মুখ দিয়া গড়াইয়া পড়িয়া গেল।

তাহার পর সুন্দরীলাল নরোত্তম দাসের বুকে একটা গাছের পাতার রস ক্রমান্বয়ে মালিশ করিতে লাগিলেন। আবার তাহার মুখে খানিকটা রস দিলেন।

এবার যথার্থই নরোত্তমদাস একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল,—সুন্দরীলাল আরও যত্নের সহিত তাহার বুকে পাতার রস মালিশ করিতে লাগিলেন।

এখন ধীরে ধীরে নরোত্তমদাসের নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। সুন্দরীলাল যে সম্পূর্ণ উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; তবে সহসা কিয়ৎক্ষণের জন্ত প্রকৃতিস্থ হওয়ায় নরোত্তম দাস এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন।

লালদাস ও দামোদর তাড়াতাড়িতে নরোত্তমকে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ করিয়া তাহার সমস্ত পরিধের বস্ত্র প্রভৃতি লইয়া যাইতে পারে নাই,—একটা ভিতরের জামা তাহার গায়ে ছিল। সুন্দরীলাল নরোত্তমের গা হইতে জামাটি খুলিয়া লইয়া নিজের গায়ে দিলেন। নিজের জামা খুলিয়া তাহার গায়ে পরাইয়া দিলেন,—তিনি বাটী হইতে বাহির হইবার সময়ে তাড়াতাড়িতে কতকগুলি বস্ত্রাদি সঙ্গে আনিয়াছিলেন,—এক্ষণে তাহা হইতে কতকগুলি বাহির করিয়া লইয়া নরোত্তম দাসকে পরাইয়া দিলেন।

তৎপরে নরত্তমের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা হইবে বলিয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া প্রাচীর ঠেস দিয়া বসাইয়া দিলেন। আবার তাহার মুখে কতকটা পাতার রস ঢালিয়া দিয়া তিনি ধীরে ধীরে—তাহার মস্তক ধরিয়া নাড়া দিলেন।

নরোত্তম দাস চক্ষু মেলিলেন,—কিন্তু তাহার দৃষ্টি কিয়ৎক্ষণ অবিচলিত থাকিয়া ক্রমে সজীবতা লাভ করিল,—তিনি বিস্মিত ভাবে সুন্দরী লালের মুখের দিকে চাহিলেন।

সুন্দরী লাল বলিলেন—"তোমার আত্মীয় স্বজন কোথায় থাকেন? তাহা হইলে তাহাদের সংবাদ দিব।"

নরোত্তম দাস অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"আমার আত্মীয় স্বজন কেহ নাই।"

"তবে কাহাকে সংবাদ দিব?"

এই বলিয়া সুন্দরীলাল, তিনি কি উত্তর দেন, তাহা শুনিবার জন্ত তাহার মুখের নিকট কান পাতিলেন তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে ভীত হইয়া—সরিয়া [।।]

নরোত্তম দাসের ওষ্ঠ হইতে অস্পষ্ট স্বরে বাহির হইল—

"পুলিশ!"

সুন্দরী লাল পুলিশের ভয়ে গৃহ সংসার ত্যাগ করিয়া পলাইতেছেন—তিনি সেই—পুলিশকে ডাকিবেন—কি রূপে ডাকিবেন! কি ভয়ানক! অথচ এই লোকের প্রাণ দান করিয়াও তাহাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া গেলে সে আবার মৃত্যু মুখে পতিত হইবে; না ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়া ইহাকে এরূপে হত্যা করা উচিত নহে।

তিনি বহুক্ষণ গৃহ মধ্যে পদচারণ করিলেন,—পরে পকেট হইতে পেনসিল ও কাগজ বাহির করিয়া লিখিলেন।

"সহরের প্রান্তে পড়ো বাড়ীর ভিতর একটী লোক পড়িয়া আছে। সে পুলিশের সাহায্য চায়—এখনই সাহায্য না পেলে সে রক্ষা পাইবে না।"

তিনি পত্রখানি একটী খামে পুরিয়া তাহার উপর লিখিলেন,—

"পুলিশ ইনেস্পেক্টর * * *"

এই কার্য্য শেষ করিয়া তিনি নরোত্তম দাসের নিকটে আসিয়া তাহাকে আবার খানিকটা সেই পাতার রস পান করাইয়া দিলেন, বলিলেন, "ইহাতে তুমি বল পাইবে।"

তিনি তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাকে শয়ন করাইয়া দিলেন। নরোত্তম দাস চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

তখন সুন্দরীলাল সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন,—তখন প্রায় ভোর হয়—না হইয়াছে—চারিদিক বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে রাস্তায় দু একটী লোকও চলাফেরা আরম্ভ করিয়াছে; একজন কনষ্টেবল দেখিয়া সুন্দরীলাল সভয়ে চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাহার মন যেন সেখান হইতে পলাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু মনের যে সদ্বৃত্তির বলে তিনি নরোত্তম দাসের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বৃত্তিই তাহাকে পলাইতে দিল না,—তিনি সেই পাহারাওয়ালার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ঐ যে দূরে বাড়ীটা আছে, ঐ বাড়ীর একটী লোক এই চিঠি-খানা থানায় দিতে আমায় বলিয়াছিল,—তোমায় যখন পাইলাম, তখন তুমিই এ খানা ইনেস্পেক্টর সাহেবকে দিয়ো।"

"হাঁ—দিতে পার,—আমার রোঁদ হইয়া গিয়াছে—আমি থানায় যাইতেছি।"

"আমাকে আর তাহা হইলে অতদূর যাইতে হইবে না।"

এই বলিয়া সুন্দরীলাল পত্রখানি পাহারাওয়ালার হস্তে দিয়া সত্বর পদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

* * * * *

তিন দিবস পরে সুন্দরীলালের মৃতদেহ কলিকাতার এক পুষ্করিণীতে ভাসিতে দেখিতে পাওয়া গেল ? উন্মত্ত সুন্দরীলাল আত্মহত্যা করিয়াছিল।

পুলিশ তাহার পকেটে কতকগুলি পত্র দেখিতে পাইল,—সুতরাং তাহারা ইহা নরোত্তমদাসেরই মৃতদেহ স্থির করিয়া আমেদাবাদের পুলিশে সংবাদ দিল।

ইহা কেহ অবিশ্বাস করিল না,—সকলেই জানিত নরোত্তম দাস স্ত্রীর শোকে বিবাগী হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং সে যে দূর কলিকাতায় গিয়া আত্মহত্যা করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি !

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

পথ-হারা।

নদীর জল কমিয়া আসিয়াছে, জল সরিয়া গিয়া কাদা বাহির হইয়াছে, এই সময়ে পল্লীগ্রামে নদীতে স্নান করিবার বড়ই অসুবিধা। শুধু স্নান করিবার কেন, সকল বিষয়েরই অসুবিধা। হেমন্তের শেষে শীতের প্রারম্ভে বর্ষার জল বদ্ধ হইয়া নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি করিতে থাকে। রোগক্লিষ্ট কৃষক শ্যামল শস্য ক্ষেত্রে পক্ক ধান্যের দিকে চাহিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া, আশায় দিনযাপন করে। যাহারা নদীতীরে বাস করে, তাহাদিগের এ সময়ে জলের বড়ই কষ্ট। নদীতে জল থাকিলে তাহা আনা কষ্টসাধ্য। নদীতীর তরল কর্দ্দমে পরিণত হয়, সেইজন্য গ্রামের লোকে বাঁধা ঘাট না থাকিলে কাদার উপরে কাঠ ফেলিয়া বা ইট ফেলিয়া পথ করিয়া দেয়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি কিশোরী অতি সন্তর্পণে জলে নামিতেছিল। ভাগীরথীর তীরে একটি পুরাতন বাঁধা ঘাট, যে কালে ভাগিরথীর রূপ যৌবন গর্ব্ব ছিল ঘাটটিও সেই কালের। কালের প্রভাবে জীর্ণা শীর্ণা নদী ঘাট হইতে সরিয়া গিয়াছে, ঘাটের নিম্নের সোপানগুলি মৃত্তিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কেবল বর্ষার সময়ে ঘাটে জল আসিয়া থাকে। কিশোরী সোপান কয়টি অতিক্রম করিয়া

কর্দমের উপর দিয়া চলিয়াছে। চারি পাঁচখানি গ্রামের লোক একত্রিত হইয়া পথ করিয়া দিয়াছে, বড় বড় তাল গাছের উপরে কাঠ বাঁধিয়া পথ প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু লোকের পায়ে পায়ে কাদা উঠিয়া পথ এত পিচ্ছিল হইয়াছে যে কিশোরী সে পথে চলিতে ভরসা করে না। সে অতি ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া কাদার উপর দিয়া চলিতেছিল, তাহার হাতে একখানি পিতলের রেকাবি, তাহাতে কাঁচা মাটীর কয়েকটী প্রদীপ, তুলার সলিতা ও ঘৃত দিয়া সাজান। সেইগুলি পড়িয়া যাইবার ভয়ে কিশোরী অতি ধীরে ধীরে চলিতেছিল, পা পিছলাইয়া যাইবার ভয়ে সে একবার পথের কাঠগুলি চাপিয়া ধরিতেছিল।

ঘাটের রানার উপরে বসিয়া একটি কর্দমলিপ্ত বালক আমসত্ব ভক্ষণ করিতে করিতে বালিকার প্রতি লক্ষ করিতেছিল, বালিকা একবার পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল, বালক তাহা দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। বালিকা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল; তখন বালকটি বলিয়া উঠিল "সুরি, থালা খানা আমাকে দে, আমি পৌছে দিই?" বালিকা উত্তর করিল "তোর যে এঁটো হাত।"

বালক। তা হোকগে কেউ তো আর দেখতে আসছে না।

বালিকা। দূর পাগল, তাই কি হয়, এ যে ঠাকুরদের জিনিষ।

বালক। ঠাকুররা তো আর দেখতে আসছে না।

বালিকা। মা বলেন ঠাকুররা সব দিকে সব সময় দেখতে পান।

বালক। বাবা তুই যেন ভাই পুরুত মশাই! তোর সঙ্গে কথা কইবার যো নাই, বালিকা কথা কহিবার জন্ত দাঁড়াইয়াছিল আবার চলিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে তাহার পা পিছলাইয়া গেল, সে পথের কাঠ ধরিয়া সামলাইল বটে, কিন্তু রেকাবী হইতে দুইটী প্রদীপ পড়িয়া গেল। বালক হাসিতে হাসিতে কাঠের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিল, বলিল "দেখলি সুরি, আমি তখনই তোকে বলে ছিলুম থালা খানা আমায় দে আমি পৌছে দিই, তা আমার কথা শুনিল না, এখন কি করবি কর"। বালিকা হাসিয়া বলিল "কি আর করব বাড়ী ফিরে যাই। আবার গিয়ে নিয়ে আসি, মা অনেক প্রদীপ গড়িয়ে রেখেছেন"। বালিকা ধীরে ধীরে ধীরে ঘাটের উপর উঠিল, বালকও ফিরিল। বালিকা গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া বালক বলিল "সুরি তুই তবে বাড়ী চল্লি? আমি এই খানে বসে থাকি। তোর সঙ্গে এক সঙ্গে বাড়ী যাব।

বালিকা ঘাটের উপরে উঠিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহার সম্মুখ দিয়া একটী শৃগাল দৌড়িয়া চলিয়া গেল, বালিকা সভয়ে চীৎকার করিয়া ডাকিল "রূপি ও

মণি শিগ্‌গির আয়না ভাই!" বালক তখন ঘাটের রাণার উপর বসিয়া এক মনে আমসত্ব ভক্ষণ করিতেছিল, সে অন্য মনস্ক হইয়া উত্তর দিল "কেন"? বালিকা তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আরও চীৎকার করিয়া ডাকিল, মণি শিগ্‌গির আয়।" বালক আমসত্ব ফেলিয়া এক লম্ফে বালিকার নিকট উপস্থিত হইল এবং ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি? কি হয়েছে?" বালিকা তখনও ভয়ে কাঁপিতেছিল, সে ধীরে ধীরে বলিল "ভাই একটা শিয়াল, তুই আমাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আয়"। বালক খুব একচোট হাসিয়া লইল, তাহার পর বলিল "চল যাচ্ছি।"

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক তমসাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, গঙ্গাবক্ষ হইতে বাষ্প পুঞ্জ উত্থিত হইয়া তীরে কুয়াসার সহিত মিশিতে লাগিল, অস্তাচলগামী মরিচীমালীর রশ্মীতে পশ্চিম গগন সিন্দূর রঞ্জিত হইয়া গেল, দেখিতে দেখিতে সোনার থালা খানি অদৃশ্য হইল। গঙ্গাতীরের অদূরে বৃক্ষরাজীর মধ্যে গ্রাম খানি অবস্থিত, ধান্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া উভয়ে সেই দিকে চলিতেছিল। পবন হিল্লোলে সুপক্ক ধান্য শীর্ষগুলি আন্দোলিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল গঙ্গাতীরে হরিৎবর্ণ সরোবরের বিশাল বক্ষে তরঙ্গ রাশি নৃত্য করিতেছে। ধান্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া উভয়ে অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

গ্রামখানির নাম দৌলতপুর, ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই ভদ্রলোক। গ্রামের জমিদার গ্রামেই বাস করেন। পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না, বহু কষ্টে লেখা পড়া শিখিয়া উকিল হইয়াছিলেন, তাহার পর তাঁর ভাগ্য ফিরিল, চঞ্চলা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী গ্রামের বুনিয়াদী জমিদার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সদাশিব মিত্রের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেনার দায়ে যখন জমিদার প্রবোধচন্দ্র ঘোষের যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া গেল, তখন সদাশিব মিত্র বাস-গ্রামখানি কিনিয়া লইলেন; এখন তিনিই গ্রামের জমিদার। সদাশিব পূর্ব্বে বড় গ্রামে আসিতেন না; কিন্তু জমিদারী খরিদ করিবার পর হইতে ছুটির সময় গ্রামে আসিয়া থাকেন, দুই একটি করিয়া পূজা-পার্ব্বণও আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রামের কেহ কেহ পূর্ব্ব অভ্যাস মত প্রবোধ বাবুকে জমিদার বলিয়া ফেলিলে, মিত্র মহাশয় বড়ই অসন্তুষ্ট হন।

পুরাতন জমিদার বংশ লোপ হইতে চলিয়াছে। প্রবোধ বাবুর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের কাছাকাছি, সুরমা তাহার এক মাত্র কন্যা, আর সন্তান হইবার কোন আশাও নাই। প্রবোধ বাবু সময় সময় দুঃখ করিয়া বলিতেন ঠিক

সময়েই মালক্ষ্মী ঘোষবংশের বাস্তুভিটা ছাড়িয়াছেন। মেয়েটার বিবাহ দিয়া স্ত্রী পুরুষে কাশী চলিয়া যাইব, বাড়ী ঘর পড়িয়া যাইবে, তাহা আর আমাকে চোখে দেখিতে হইবে না। মিত্র গোষ্ঠীর সহিত ঘোষ বংশের প্রকাণ্ড বিবাদ না থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। এক পুরুষের জমিদার বলিয়া অনেকেই সদাশিব মিত্রকে উপহাস করিতেন, মিত্র মহাশয়ও অন্নহীনের বুনিয়াদী চাল সম্বন্ধে নানান কথা বলিতেন।

মণিলাল সদাশিব মিত্রের একমাত্র পুত্র, মিত্র মহাশয়ের আরও অনেক গুলি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা কেহই বাঁচিয়া নাই। হারা-মরা বলিয়া মণিলাল বড়ই আদরের। মণিলাল বড়ই দুষ্টু, গ্রামের কোন ছেলের সহিত তাহার বনে না। তাহার গুণের মধ্যে একটী, সে পড়া শুনায় বড়ই মনোযোগী। এই জন্যই তাহার পিতা দুষ্টামীর জন্য তাহাকে কিছু বলেন না। মণিলাল যতদিন সহরে ছিল, ততদিন কাহারও সহিত মিশিত না, কিন্তু দৌলতপুরে আসিয়া তাহার এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল। সুরমার সহিত কোথায় তাহার পরিচয় হইয়াছিল তাহা কেহই বলিতে পারে না। সে ক্রমশঃ সুরমার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কথার বাধ্য হইয়া সুরমাকে সময়ে সময়ে মিত্র বাড়ী যাইতে হইত, আর সেতো সমস্ত দিনই সুরমাদের বাড়ী কাটাইয়া দিত। সদাশিব মিত্র নিষেধ করিয়াও মণিলালের সুরমাদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিতে পারেন নাই। প্রবোধ বাবুও প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও মনে মনে চাটিতেন। কিন্তু উভয় গোষ্ঠিতেই ইহাদের যাতায়াত সহিয়া গিয়াছিল।

সুরমার মাতা তুলসী তলায় সন্ধ্যা দিতে ছিলেন, দূর হইতে সুরমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সুরি, তুই যে বড় ফিরে এলি?"

সুরমা! কাদায় পড়ে গিয়েছিনুম মা, তাই আবার প্রদীপ নিতে এসেছি।

মাতা ঠাকুর ঘর হইতে প্রদীপ বাহির করিয়া দিলেন, কন্যা তাহা রেকাবীতে তুলিয়া লইল, মাতা তখন আবার বলিলেন "তুই অন্ধকারে একা যেতে পারবি ত?"

সুরমা। একা কেন, আমার সঙ্গে যে মণিলাল এসেছে?

মাতা। কই?

সুরমা। ওই যে কাঁঠাল তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

মাতা। আমিত তাকে দেখতে পাইনি।

বাস্তবিক মণিলাল নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় দূরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল।

সুরমা আঙ্গিনা ছাড়াইয়া বাহির হইল, মণিলাল কিছু না বলিয়া পিছু পিছু চলিল।

সুরমার মাতা তুলসী তলায় প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হে ঠাকুর! আমার সুরির যেন মণিলালের সঙ্গে বিবাহ হয়।

২

দীর্ঘ বৎসর গুলা যেন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়, কালের গতি অবিরাম, কিন্তু নীরব। দেখতে দেখতে পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। দৌলতপুর গ্রামে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সুরমা আর কিশোরী নাই, মণিলালও কাদা মাখিয়া গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আমসত্ব খায় না। সুরমা এখন পূর্ণ যুবতী কিন্তু এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। মণিলাল বড় হইয়া উঠিয়াছে, সে এখন কলিকাতায় কলেজে পড়ে। আধুনিক যুবা জনোচিত সভ্যতার আদব কায়দা গুলি মণিলালের বেশ অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহার পাড়াগেয়ে ভাবটি কাটিয়া গিয়াছে। পুত্র সৌখিন হইয়াছে দেখিয়া মণিলালের মাতা বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু মণিলাল বিবাহ করিতে চায় না। সে কলিকাতা হইতে দৌলতপুরে বড় একটা আসিতে চায় না, কলেজের ছুটী হইলে হয় অন্য স্থানে বেড়াইতে যায়, না হয় কলিকাতাতেই থাকে। বৎসরের মধ্যে দুই একবার যখন বাড়ী আসে, তখন মণিলাল সর্ব্বাগ্রে সুরমাদের বাড়ী ছুটিয়া যায়।

মণিলাল বিবাহ করিতে চায় না, কথাটা গ্রামে রাষ্ট্র হইতে বাকি রহিল না। কুৎসা যাঁহাদিগের উপজীবিকা তাঁহাদিগের একটা নূতন খোরাক জুটিল, কেহ বলিলেন সুরমা স্বয়ম্বরা হইয়াছে, কেহ বলিল মণিলাল গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিয়াছে, কোন কোন দূরদর্শী রাজনৈতিক ইহাতে রোমিও-জুলিয়েটের কাহিনীর পূর্ব্বাভাষ দেখিতে পাইলেন। যাহাদিগকে লইয়া এত কথা চলিতেছে ক্রমশঃ একথা তাহাদিগের কর্ণেও পৌঁছিল, সুরমা লজ্জায় মরিয়া গেল, মণিলাল দৌলতপুরে আসা পরিত্যাগ করিল।

মণিলালের মাতা ভাবিলেন যে ছেলে হয়ত সুরমার জন্যই বিবাহ করিতে চায় না, এবং স্থির করিলেন যে সুরমার সহিত সম্বন্ধ হইলেই মণিলালের বিবাহে আপত্তি থাকবে না। স্বামীকে রাজী করিতে তাঁহার বড় বিশেষ বেগ পাইতে হইল না, কারণ মণিলালের জন্য সদাশিবও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যথাসময়ে সদাশিব মিত্রের প্রস্তাব প্রবোধ বাবুর নিকট উপস্থিত করা হইল, মিত্র মহাশয় ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রস্তাব সাগ্রহে গৃহীত হইবে, সেইজন্য তিনি বিবাহ

সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ঘটক যখন ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, প্রবোধ ঘোষ মিত্র বংশে কন্যাদান করিবে না, তখন বিস্ময়ে তাঁহার বাকরোধ হইয়া গেল। সুরমার মাতা কিছুতেই স্বামীর মত করাইতে পারিলেন না, প্রবোধ অপমান ভুলিতে পারে নাই, প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল যে সদাশিব মিত্রের পুত্রকে কন্যা দান করিবে না। কলিকাতায় মণিলাল সব কথা শুনিয়াছিল সে স্থির করিল যে দৌলতপুর গ্রামে আর যাইবে না।

অনেক অনুসন্ধানের পরে সুরমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল, দূর দেশের একজন ধনবান জমিদার যৌবনের শেষে পত্নীহারা হইয়া একটি বয়স্থা সুন্দরী পাত্রীর অনুসন্ধান করিতেছেন, সুরমাকে দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইল। শুভদিন দেখিয়া সুরমার বিবাহ হইয়া গেল, লজ্জায়, ঘৃণায়, অভিমানে মিত্রজা মরমে মরিয়া গেলেন। যথাসময়ে মণিলাল সুরমার বিবাহের কথা শুনিল, শুনিয়া পাঠে দ্বিগুণ মনসংযোগ করিল, সদাশিব মিত্র ভাবিলেন পুত্রের জীবনের ছায়া কাটিয়া গেল।

সুরমা এখন ধনীর গৃহিণী, পিত্রালয়ে আসিবার অবসর পায় না, আসিলেও দুএকদিন থাকিয়া চলিয়া যায়। প্রবোধ ঘোষ ভদ্রাসনখানি এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া কাশীবাসের চেষ্টায় আছেন। তিনি বলিয়া থাকেন যে সুরমাকে এমন ঘরে দিয়াছেন যে তাহার পক্ষে পিতৃগৃহে আসা অসম্ভব, সুতরাং তিনি কাশীবাস করিলেও সে কখনও তাঁহার অভাব অনুভব করিবে না।

বহুকাল পরে সুরমা দৌলতপুরে আসিয়াছে, তাহার পিতা মাতা কাশীযাত্রা করিবেন, সেই জন্য একবার দেখা দিতে আসিয়াছে। সুরমা আসিয়া শুনিয়াছে যে সদাশিব মিত্র ও তাঁহার পত্নী গঙ্গালাভ করিয়াছে, মণিলালদের বাড়ীতে আর কেহই নাই, সে নিজে কলিকাতায় থাকে, ভুলিয়াও দেশে আসে না। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাড়ায় বেড়াইতে গিয়া সুরমা মণিলালদের বাড়ীখানি দেখিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আসিয়াছে, এই সেদিন সে সদাশিব মিত্রের কোলাহলপূর্ণ অট্টালিকায় সুখের সংসার দেখিয়া গিয়াছে, আর আজি দুইদিন পরে সেখানে মহাশ্মশান।

প্রবোধ বাবু যেদিন কাশীযাত্রা করিবেন, সেইদিন প্রভাতে সুরমা একটি দাসী সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে চলিয়াছে। তাহার শ্বশুরালয় হইতে গঙ্গা বহুদূর, সেই জন্যও বটে, আর জন্মের মত শৈশবের লীলাক্ষেত্র, বাল্যের কৈশরের সুমধুর স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি দেখিবার জন্যও বটে, সুরমা পুরাতন বাঁধা ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছিল। ঘাটের অবস্থা ক্রমশঃ অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, চাতাল ও রাণাগুলি

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা কেহই সংস্কার করিয়া দেয় না। ঘাটের ধাপগুলি কাদায় ভরিয়া গিয়াছে, গঙ্গার জলও অনেকদূর সরিয়া গিয়াছে, এখন বর্ষার সময়েও ঘাটে জল আসে না, ঘাটের অবস্থা দেখিয়া সুরমার চোখে জল আসিল। গ্রামের লোকে এখন আর ঘাট ব্যবহার করে না ; স্নান করিতে আসিয়া ঘাটের পাশ দিয়া চলিয়া যায়, সুরমা গ্রামের পথ ছাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ঘাটের উপর উঠিল। সে দেখিল যে সকলের নীচের ধাপে একজন সুসজ্জিত পুরুষ বসিয়া আছে।

সুরমা দাঁড়াইল,তাহার দাসী তখনও পশ্চাতে পড়িয়াছিল,তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেই পুরুষটি তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, দেখিয়াই ব্যাস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া সুরমা ঘোমটা টানিয়া ভয়ে ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া একপাশে দাঁড়াইল, যুবক তাহা দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া ডাকিল "সুরমা!" সুরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সে মণিলাল। মণিলাল তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল "সুরমা আমায় চিনিতে পারিলেন না ?" সুরমা তখন একটা প্রণাম করিয়া বলিল "হ্যাঁ পেরেছি, আপনি মণিদা! উত্তর শুনিয়া যুবকের মুখ লাল হইয়া উঠিল। উভয়ে অল্পক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মণি-লাল কহিল "সুরমা তুমি দৌলতপুর ছেড়ে যাবে শুনে একবার দেখিতে এলাম।" সুরমা কোন উত্তর দিল না, অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মণিলাল আবার বলিল "সুরমা তবে এখন আসি।" সুরমা কি বলিতে যাইতেছিল, তাহা আর বলা হইল না, মণিলাল ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

৩

কলিকাতায় জগন্নাথ ঘাটে আজ লোকের বড় ভীড়, কারণ আজ বারুণী। পল্লীগ্রাম হইতে দলে দলে লোক গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছে গঙ্গার ধারের পথে লোক আর ধরিতেছে না, তাহার ভিতরে সারি সারি গাড়ী আসিতেছে। একখানি বড় ল্যাণ্ডো গাড়ী ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা হইতে তিনটি পুরুষ ও দুইটি স্ত্রীলোক নামিল, একজন চাকর তাহাদিগের কাপড় গামছা ইত্যাদি নামা-ইয়া লইল। স্ত্রীলোক দুইটি অবগুণ্ঠনহীনা, দেখিলে ভদ্রঘরের স্ত্রী বলিয়া বোধ হয় না, তাহারা ঘাটের সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিল। ল্যাণ্ডোর পিছনে একখানি ভাড়া-টিয়া গাড়ী আসিয়াছিল, তাহা হইতে একটি বিধবা স্ত্রীলোক ও দুইজন দাসী নামিয়া দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। পুরুষ তিনজনের মধ্যে দুইজন অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য ঘাটের সম্মুখে

লোক জমিয়া গিয়াছিল, স্ত্রীলোক তিনটি পথ না পাইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাদিগের সঙ্গে একজন দরওয়ান আসিয়াছিল, সে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কলিকাতায় ভিড়ের সময়ে পথে গাড়ী দাঁড়াইতে দেয় না, সেইজন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া গাড়ী হইতে নামিতে হইয়াছিল, এবং মাতালের দল সম্মুখে পড়ায় তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অপেক্ষা করিতে হইতেছিল।

সুখের বিষয় কলিকাতায় অধিকক্ষণ ভীড় থাকিতে পায় না, একজন কনষ্টেবল আসিয়া ভিড় সরাইয়া দিল। ঘাটের লোকে স্ত্রীলোক দুইটিকে পুরুষদের ঘাটে নামিত দিল না, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়া স্ত্রীলোকদিগের স্নানের ঘাটে যাইতে বলিল। ভাড়াটিয়া গাড়ীতে যে বিধবা রমণী দুইটি দাসী লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছিলেন;" বেশ্যা দুইটিও, তাঁহারা সেখানে স্নান করিতে ছিলেন সেই স্থানে গিয়া জলে নামিল। তাহারা নানা ছলে তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিধবা রমণীটি তখন স্নান করিয়া পূজা করিতে ছিলেন, দাসীদ্বয় তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে লাগিল। তাহারা যখন শুনিল যে দাসীদ্বয় দৌলতপুর হইতে আসিতেছে, তখন তাহারা সাগ্রহে বলিয়া উঠিল যে তাহাদিগের 'বাবু' দৌলতপুরের জমিদার।" দাসীরা নাম জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিল "বাবুর নাম মণিলাল মিত্র।" নাম শুনিয়া রমণীর পূজায় বাধা পড়িল, তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিলে বাছা, কি নাম বলিলে?"

"বাবুর নাম মণিলাল মিত্র।"

"তাহার বাড়ী কি দৌলতপুরে?"

"তিনি দৌলতপুরের জমিদার।"

রমণীদ্বয় 'বাবুর' ঐশ্বর্য্য গৌরবের পরিচয় দিতে লাগিল। " 'বাবু' তাহাকে কলিকাতায় বাড়ী কিনিয়া দিয়াছেন, বহুমূল্য আসবাবে তাহা সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, হীরা মুক্তার অলঙ্কারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সাজাইয়া দিয়াছেন, দাস, দাসী, গাড়ী, ঘোড়া, সমস্তই তাঁহার, এমন কি তাহার জন্য 'বাবু' বিবাহ পর্য্যন্ত করেন নাই।" দাসীদ্বয় অবাক হইয়া তাহাদিগের কথা শুনিতে ছিল, কিন্তু বিধবা মহিলাটী বোধ হয় তাহার অধিকাংশই শুনিতে পান নাই, কারণ তিনি তখন অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া পুনরায় পূজা অরম্ভ করিয়াছিলেন। পূজা শেষ করিয়া

বিধবা মহিলা জল হইতে উঠিলেন, দাসীদ্বয়ও উঠিল, বেশ্যা দুইটিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। ঘাটের উপরে সঙ্গীত্রয় বেশ্যাদ্বয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিধবা স্ত্রীলোকটি দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহার পর দরওয়ানকে ডাকিয়া তাহাদিগের মধ্যে একজনকে তাহার নিকটে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

দরওয়ান পুরুষটিকে ডাকিবামাত্র সে ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া গেল ও সলজ্জ ভাবে ধীরে ধীরে বিধবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রমণী হঠাৎ অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বলিয়া উঠিলেন "মণিদাদা, আপনি আমাকে চিনিতে পারেন?" এই বলিয়া গলায় কাপড় দিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। পুরুষটী আশ্চয্য হইয়া দুইহাত সরিয়া গেলেন, তাহার পর বলিলেন "কে আপনি আমিত চিনিতে পারিতেছি না।

রমণী। "একেবারেই চিনিতে পারিতেছেন না?"

পুরুষ। কই—না?

রমণী। আমি সুরমা।

পুরুষটী দুই হাত পিছু হটিয়া গেল,—বলিল তুমি—সুরমা?

রমণী। হাঁ আমি সুরমা! মণিদাদা তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কাজ আছে।

আমি আজ দু বছর বিধবা হয়েছি, বড়ই বিপদে পড়েছি। তুমি আমায় সঙ্গে করে তোমার বাসায় নিয়ে চল। আমার সঙ্গে লোক আছে, তাতে তোমার কোনও লজ্জা নাই।

মণিলাল বিষম বিপদে পড়িল। কলিকাতায় তাহার বাসা নাই, সে যেখানে থাকে, সেখানে ভদ্র গৃহস্থের স্ত্রীলোক লইয়া যাওয়া যায় না। যাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকেই বা ফেলিয়া যায় কোথা? বহুকাল পরে সুরমার দেখা পাইয়াছে, তাহার একটা অনুরোধ, বিশেষ সে যখন বিপদে পড়িয়াছে, এড়াইতেও তাহার মন সরিতেছে না। সুরমা তখন বলিল "আমায় আজ নিয়ে যেতেই হবে, আমি বড় বিপদে পড়েছি, মণিদাদা! আমার দেওরের সঙ্গে বিষয় নিয়ে মকদ্দমা চলছে, আমার পক্ষে কেউ নাই।

মণিলাল অনেকক্ষণ গুম হইয়া থাকিল, অনেকক্ষণ পরে আমতা আমতা করিয়া বলিল "আমার ত এখানে বাসা নাই সুরমা, আমি পরের বাড়ী থাকি, সেখানে তোমায় নিয়ে যাব কি করে?

সুরমা। তবে তুমি আমার সঙ্গে এস।

কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া মণিলাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরমা তাহার দরওয়ানকে গাড়ী ডাকিয়া আনিতে বলিল, গাড়ী আসিল। সুরমা মণিলালকে তাহাতে উঠিতে বলিল। কলের পুতুলটির মত মণিলাল গাড়ীতে গিয়া উঠিল, তাহার পুরুষ সঙ্গী দুইজন দৌড়িয়া আসিল, মণিলাল তাহাদিগকে বলিল "তোমরা ফিরিয়া যাও আমি পরে যাইব।" দাসীদিগকে লইয়া সুরমা গাড়ীতে উঠিল, গাড়ী চলিয়া গেল, মণিলালের সঙ্গী ও সঙ্গীনিগণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

৪

গাড়ীখানি একটি প্রকাণ্ড ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। মণিলাল আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ফটক পার হইয়া একটী প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে গাড়ীখানি দাঁড়িইল। মণিলাল নামিয়া আসিলে একজন আমলা তাহাকে লইয়া গিয়া বৈটকখানায় বসাইল। সুরমার বাড়ীর সাজ সজ্জা দেখিয়া মণিলাল অবাক হইয়া গেল। চারিদিকে বহুমূল্য আসবাব, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর দাস দাসীতে পরিপূর্ণ অবিলম্বে তাহার ডাক পড়িল, মণিলাল অন্দরে গিয়া আহার করিতে বসিল। সুরমা তাহাকে বসিয়া খাওয়াইল। অপরাহ্নে মণিলাল চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল, সুরমাকে খবর দিয়া পাঠাইল, এবং সুরমা আসিলে বলিল "কই কি মকদ্দমার কথা বলিবে বলিয়াছিলে?" সুরমা বলিল "কাল সকালে আমার দেওয়ান আসিবে, তখন সমস্ত কথা হইবে।" সন্ধ্যার সময়ে অভ্যাসের দোষে মণিলাল চলিয়া যাইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল, কিন্তু লজ্জায় কোন কথা বলিতে পারিল না। সুরমার বাড়ীতে আসিয়া মণিলাল যেমন আরাম পাইয়াছিল, এমন আরাম সে বহুদিন পায় নাই। বাড়ীর লোকে যেন তাহার জন্য কাপড় জুতা জামা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে।

প্রভাতে উঠিয়া মণিলাল সুরমার নিকট খবর পাঠাইল, শুনিল সে পূজায় বসিয়াছে। বেলা নয়টার সময় দেওয়ান আসিলে, সুরমা মণিলালকে ডাকিয়া পাঠাইল, মণিলাল অন্দরে গিয়া মকদ্দমার কথা সমস্ত শুনিল। দ্বিপ্রহরে আহারের সময় মণিলাল সুরমাকে বাসায় ফিরিবার কথা বলিল, তাহার উত্তরে সুরমা বলিল "মণিদাদা তুমি যেখানে আছ, সেখানে তোমার আর যাওয়া হবে না।" মণিলাল মুখ হেট করিয়া রহিল, লজ্জায় আর কথা কহিতে পারিল না।

এইরূপে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, মণিলালের ফিরিয়া আসা হইল না, তাহার সঙ্গীর দল তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া ফিরিয়া গেল, সুরমার আদেশে

তাহারা বাড়ী ঢুকিতে পাইল না। কিছুদিন পরে একদিন রাত্রিতে আহারের সময় সুরমা বলিল, "মণিদা তুমি এবার বিয়ে করে সংসারী হও ? মণিলাল মুখ গুঁজিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না। তাহার পর হইতে প্রায় প্রতিদিনই সুরমা বিবাহের কথা পাড়িত, কিন্তু মণিলাল উত্তর দিত না। একদিন সে বলিল, "আমি বিবাহ করিব কিন্তু তুমি দিতে পারবে কি ?"

সুরমা। পারব ;—তুমি যেমন কনেটি চাও আমি তেমনিটি খুঁজে বার করবো।

মণিলাল। আমি এতদিন কেন বিয়ে করিনি, তা তুমি জান সুরমা ?

সুরমা। গ্রহের দোষে।

মণিলাল। গ্রহের দোষই বল, আর বরাতের দোষই বল, একজনের দোষ বটে।

তাহার পর মণিলালের মুখ খুলিয়া গেল সে বলিল, "সুরমা তোমাকে পাইনি বলে এতদিন বিয়ে করিনি, তোমাকে যদি কখনও পাই তবে বিয়ে করবো, তা নইলে এজন্মে আর নয়। সুরমা ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া পলাইল আর দুই তিন দিন মণিলালের সম্মুখে বাহির হইল না। বিরক্ত হইয়া মণিলাল চলিয়া যাইতে চাহিলে সুরমা তাহার সহিত দেখা করিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহাকে নিরস্ত করিল। এইভাবে আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল, সুরমা আর বিবাহের কথা পাড়িত না।

দিন দিন উভয়ের ঘনিষ্টতা বাড়িতে লাগিল, মণিলাল অধিক সময়ই অন্দরে কাটাইত। সুরমার পুজার সময় তাহার নিকটে নীরবে বসিয়া থাকিত, রাত্রিতে তাহাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইত, দিনের বেলায় দেওয়ানজীর সহিত একত্র বসিয়া কাজ করিত। মণিলালের দিন বড় সুখেই কাটিতে লাগিল। তাহাদিগের ভাবে কোন দোষ না পাইলেও লোকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল, মণিলাল তাহা শুনিয়াও গ্রাহ্য করিল না। সুরমা তাহা পারিল না,—মরিল।

একদিন রাত্রিশেষে মণিলাল দেখিল বৃদ্ধ দেওয়ান তাহার বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, দেওয়ান বলিলেন, "আপনি শীঘ্র আসুন কর্ত্রীর মৃত্যুকাল উপস্থিত ?" এক লম্ফে মণিলাল অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখিল নারায়ণের ঘরের সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া সুরমা ছটফট করিতেছে। মণিলাল আসিতেই তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "মণিদাদা আমি চলিলাম, আমার একটি কথা রাখিও,—বল রাখিবে ?" মণিলাল তাহাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিল,

তখন সুরমা ধীরে ধীরে বলিল, "আমি মরিলে বিবাহ করিয়া সংসারী হইও।" মণিলাল কথা কহিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। মৃত্যুর গাঢ় নীলিমায় তখন সুরমার সুবর্ণ গৌরকান্তি ঢাকিয়া যাইতেছিল, মরণ-কাতরকণ্ঠে সুরমা বলিয়া উঠিল, "সে যে তাঁহার জন্যই মরিতেছে; লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে যখন অপরের হস্তে পড়িয়াছিল, তখন বহু চেষ্টা করিয়া কৈশোরের আরাধ্য দেবতাকে ভুলিয়াছিল। তাহাকে পথে আনিয়া সংসারী করাইবার জন্যই সে তাহাকে গঙ্গাতীর হইতে আনিয়াছিল, পথ দেখাইতে গিয়া সে নিজে পথ হারাইয়াছিল। পথভ্রান্ত পুরুষের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু কুলনারীর নাই, তাই সে মরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিল।

শ্রীমতীকাঞ্চনমালা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঙ্গ-বারিধি।

চতুর্থ তরঙ্গ।

দিগম্বর।

১

"ভুল সম্পূর্ণ ভুল!"

অতি বিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মহা আবেগে নলিনবিহারী এই কয়েকটী কথা বলিয়া ফেলিলেন। নানাবিধ মিষ্টান্নপূর্ণ রেকাবী হস্তে তাঁহার দশম বর্ষিয়া শ্যালিকা লাবণ্যপ্রভা সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি ভুল জামাই বাবু?"

নলিনবিহারীর কর্ণে বোধ হয় সে কথা প্রবেশ করিল না,—তিনি নিজ মনে বলিতে লাগিলেন, "স্বভাবের সৌন্দর্য্য, তীর্থ পর্য্যাটন, ঈশ্বরের অসীম অনন্ত প্রেম পরিত্যাগ করিয়া সংসারে থাকিবার অর্থ কি,—তাৎপর্য্য কি, প্রয়োজন কি?"

এবার লাবণ্যপ্রভা তাহার স্বর একটু উচ্চে তুলিয়া বলিল, "কিসের প্রয়োজন কি, জামাই বাবু?"

নলিনবিহারী অতি বিরক্তপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "বিয়ের—বুঝলে—বিয়ের!"

লাবণ্যপ্রভা, জামাই বাবুর ভাবে ও কথায় অতি কষ্টে অঞ্চলে বসনাবৃত করিয়া হাসি দমন করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে বিষয় পরে মিমাংসা করিলেই চলিবে, এখন নিন্ এই জল খাবার খান।"

নলিনবিহারী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "বিবাহ জিনিষটা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অনেকটা জাঁতার ন্যায়, জাঁতায় যেরূপ হস্ত পদ পড়িলে পেষিত হইয়া যায়, বিবাহরূপ কলেও একবার মস্তক গলাইলে দেহের সমস্ত অস্থি-মর্জ্জা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। জাঁতায় যেরূপ মুগ ছোলা অড়হর প্রভৃতিকে ডালে পরিণত করে, বিবাহেও সেইরূপ মানুষকে ভেড়া প্রভৃতি নানাবিধ জীবে রূপান্তরিত করে। পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে;—কেন? বিবাহ করিয়াছি, তাহার ফলস্বরূপ পুত্র কন্যা হইয়াছে—প্রতিপালন করিতে হইবে। বাঁচিতে হইবে কেন? বিবাহ করিয়াছি,—স্ত্রী অনাথ হইবে। এমন যে মাধুরী-মোহন বিবাহ তাহাই করিতে আমরা উন্মত্ত, অথচ সভ্য জীব বলিয়া আমরা জগতে পরিচয় দিই। ধিক! শত ধিক! আর অন্য দিকে লাঞ্ছনা নাই, প্রবঞ্চনা নাই, পরিশ্রম নাই, চিন্তা নাই,—আছে কেবল প্রাণভরা নির্ম্মল আনন্দ। বৃক্ষ ফল আহার, নির্ঝরিনীর পবিত্র জলপান, চন্দ্র সূর্য্যের আলোক, উন্মুক্ত বাতাস—না আর না, বিলম্বে কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। এস,—এস আমার প্রাণে, এস আমার মনে, এস আমার দেহের শিরায় শিরায় জগৎ পিতার সেই অসীম অনন্ত প্রেম!

সহসা জামাই বাবুর মস্তিষ্ক বিকৃত হইল ভাবিয়া লাবণ্য এতক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, জামাই বাবুকে নীরব হইতে দেখিয়া বলিল, "হঠাৎ মাথা গরম হ'লো কেন? পেটে কিছু দিন, এখনি মাথা ঠাণ্ডা হবে।"

"না আর না,"—এই বলিয়া নলিনবিহারী একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন "এত দিনে বুঝিয়াছি সব মিথ্যা,—তুমিই একমাত্র সত্য। হে ঈশ্বর, জগৎ স্বামীন, আজ হইতে তোমার পবিত্র নামে বিভোর হইয়া পথে পথে, মাঠে

অরণ্যে, পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব।" শেষ এই কয়টা কথা বলিতে বলিতে অতি ধীরে নলিনবিহারী তাঁহার শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিলেন।

"জামাই বাবু কোথায় যান, কোথায় যান," বলিয়া লাবণ্য বাহির বাটী পর্য্যন্ত আসিল, কিন্তু সে কথা নলিনবিহারীর কর্ণে পৌছিল না।

২

শান্তিপুরের মধ্যবিদ গৃহস্থ রসময় বাবুর একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা। পুত্রের নাম হেমেন্দ্র, কন্যা দুইটীর মধ্যে জেষ্ঠ্যের নাম অমিয়প্রভা, আর কনিষ্ঠের নাম লাবণ্যপ্রভা। নলিনবিহারী যখন ওকালতী পাশ করিয়া স্বদেশে অর্থাৎ বরিশাল জজ আদালতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন; সেই সময় প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে রসময় বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা অমীয়প্রভার সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। আজ প্রায় ছয় সাত মাস বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু নানা কারণে বহুবার আহ্বান সত্বেও বিবাহের পর নলিনবিহারীর আর শ্বশুরালয়ে আগমন ঘটে নাই। পূজায় দীর্ঘ অবকাশ পাইয়া এই প্রথম তিনি তাঁহার নব পরিণীতা ভার্য্যার অধর সুধাপান করিতে শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিয়াছেন। প্রথম জামাই শ্বশুরালয়ে আসিলে তাহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই একটা রীতি মত ব্যবস্থা হইয়া থাকে, নলিনবিহারীও তাহা হইতে বঞ্চিত হন নাই; শান্তিপুর বলিয়া বরং ইহার মাত্রা আরও গুরুতর হইয়াছিল। আসন, স্নান, বস্ত্র পরিবর্ত্তন হইতে আহারের প্রতি পদে পদে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহার আত্মসংযম দুর্ঘট হইলেও তিনি এ বাবৎ নীরবে তাহা সহ্য করিতে ছিলেন।

সমস্তদিন নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া রাত্রে কোন ক্রমে অর্দ্ধাহারে আহার কার্য্য শেষ করিয়া নলিনবিহারী তাঁহার শ্যালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুন্দর খাটে দুগ্ধফেননিভ শয্যা, মধ্যস্থলে একটি টুলের উপর নীলবর্ণ চিমনিতে পরিশোভিত হইয়া একটী সুন্দর কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলিতেছে। সমস্ত দিন ব্যাপী লাঞ্ছনা ও অপদস্থে ক্ষত বিক্ষত নলিনবিহারী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া একটা অশান্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শয্যার এক পার্শ্বে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। "জামাই বাবু পান খান, দিদি আসছে।" বলিয়া লাবণ্য হাসিতে হাসিতে গৃহের বাহির হইয়া গেল। নলিনবিহারী আনন্দে হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। স্ত্রীকে প্রথমে কি সম্ভাসন করা উচিত, কি ভাবে আলাপ সুরু করা কর্ত্তব্য, এই সকল নানা চিন্তা এক সঙ্গে নিমিষে

তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তক একেবারে আলোড়িত করিয়া দিল। শত সহস্র সোহাগের সম্ভাষণ একটার পর একটা আসিয়া তাঁহাকে গোলক ধাঁধাঁয় ফেলিবার উপক্রম করিল। কোনটা বাদ দিয়া কোনটা গ্রহণ করা উচিত, কোনটার মিষ্টতা অধিক, কোনটা শ্রুতি মধুর, তাহা স্থির করিতে তাঁহাকে গলদঘর্ম্ম করিয়া তুলিল। সহসা বাহিরে মলের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করায়, এতক্ষণ বহু গবেষণায় যাহা কিছু স্থির করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার গুলাইয়া গেল। মলের শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্ষঃ স্পন্দন আরোও বৃদ্ধি হইল। লাবণ্য টানিতে টানিতে আনিয়া এক শুভ্র কালা পাছাপেড়ে সাড়ীতে আপাদ মস্তক আবরিত দেহকে গৃহের ভিতর রাখিয়া বাহির হইতে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সমস্তদিন ব্যাপি লাঞ্ছনা অকাতরে যাহার চন্দ্র বদন দেখিবার জন্ম নলিনবিহারী নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার অন্তর নিহিত সমস্ত প্রেম একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহার চির বাঞ্ছিত আকাঙ্খার বস্তুকে হৃদয়ে টানিয়া আনিয়া অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "প্রিয়ে অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর। দেখ তোমার বিরহরূপ ভূমিকম্পে আমার হৃদয় রূপ হর্ম্ম চূর্ণ বিচূর্ণ।

বধু নীরব! "কিসের লজ্জা", বলিয়া নলিনবিহারী মহা সোহাগে তাহার অবগুণ্ঠণ স্বহস্তে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গৃহের প্রতি গবাক্ষ ও দ্বারের পার্শ্ব হইতে খীল খীল শব্দে হাসির তরঙ্গ উঠিল। পত্নির অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া নলিনবিহারী একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। এতো তাহার স্ত্রী নয়। এ যে পুরুষ-বালক। এরূপ অপদস্থ তিনি আর জীবনে কখনও হন নাই। দুঃখে, ক্ষোভে, লজ্জায় মরমে মরিয়া হতাশ ভাবে নলিনবিহারী একেবারে শর্য্যা গ্রহণ করিলেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত লাঞ্ছনা যেন এক সঙ্গে তাঁহাকে বিদ্রুপ করিয়া উঠিল। তাঁহার বিবাহের উপর মর্ম্মান্তিক ঘৃণা হইয়া গেল।

এদিকে বাহু বন্ধন শীথিল হওয়ায় বধুরূপী বালক হাসিতে হাসিতে গৃহ হইতে পলায়ন করিল। পরক্ষণেই নলিনবিহারীর ত্রয়োদশ বর্ষিয়া বালিকা বধু গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহের অর্গল ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া অতি সঙ্কোচিত ভাবে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিল। তখনও বাহিরে হাসির শব্দ তপ্ত লৌহ

শলাকার ন্যায় তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। আবার অপদস্থ হইবার ভয়েই হউক, অথবা বিবাহের উপর আর শ্রদ্ধা না থাকাই হউক, যে কারণেই হউক তিনি আর পাশ ফিরিলেন না, বালিশের ভিতর মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিলেন। দুঃখে তাঁহার চক্ষে জল আসিতেছিল। অমীর আজ কত আশা করিয়া স্বামীর নিকট আসিয়াছিল কিন্তু স্বামীর ভাবে হতাশ হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল। নলিনবিহারীর চক্ষে নিদ্রা নাই; যে বিবাহের প্রারম্ভে এত লাঞ্ছনা তাহার শেষ যে কি তাহা ভাবিতেও তাঁহার আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তিনি কি কষ্টে যে সে রাত্রি কাটাইয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তিনি একেবারে যাইয়া বাহিরের গৃহে উপবিষ্ট হইলেন। জামাতা উঠিয়াছে সংবাদ পাইয়া নলিনবিহারীর শ্বশ্রূমাতা লাবণ্যকে দিয়া বাহিরে জল খাবার পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

৩

লাবণ্য যাইয়া যখন বাটীর ভিতর সংবাদ দিল, জামাই বাবু চলিয়া গেল। তখন লাবণ্যের মাতা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সেকি, জামাই চলে গেল কেন, কোথায় গেল?"

লাবণ্য হস্তস্থিত মিষ্টান্নের রেকাবী মাটিতে রাখিয়া "বলিল, তা জানি না, পাগলের মত কি বকতে বকতে চলে গেল।"

কন্যার কথা শুনিয়া জামাতার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া লাবণ্যের মাতা তখনি পুত্রকে ডাকিয়া "নলিন কোথায় গেল" দেখিতে বলিলেন, হেমেন্দ্র বলিল "কোথায় যাবে, এখনি আসিবে। তার টাকা কড়ি সমস্তই আমার কাছে রহিয়াছে।"

পুত্রের কথায় মাতার মনে প্রবোধ মানিল না, তিনি বলিলেন, "তাহ'ক তবু তুই একবার যা, দেখে আয় সে কোথায় গেল। কাল থেকে সবাই মিলে তাকে যে জ্বালাতন কচ্ছে, হয়তো সেই জন্য রাগ করে বাড়ী চলে গেল।"

মাতার অনুরোধে হেমেন্দ্র নলিনবিহারীর খোঁজে বাহির হইল কিন্তু চারিদিকে বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পাইল না। সকলেই তাঁহার জন্য একটু বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। সন্ধান না পাইবার কারণ ছিল, পাছে কেহ দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় নলিনবিহারী পাকা রাস্তা ছাড়িয়া একেবারে মাঠে উঠিয়াছিলেন। প্রভাতে মাঠের উন্মুক্ত হাওয়া

বড় আনন্দেই তিনি ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিতেছিলেন। কিন্তু যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই আনন্দ ক্রমেই নিরানন্দে পরিণত হইতে লাগিল। বহুদূর আসায় শরীরও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর প্রায় বেলা দুপুর হইয়াছে, সূর্য্যের প্রখর কিরণ আর সহ্য করা অসম্ভব হাওয়ায় ক্লান্তিদূর করিবার জন্য তিনি এক বৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট হইলেন। রাত্রে ভাল আহার না হওয়ায় ক্ষুধায় উদরও নানারূপ গোলমাল আরম্ভ করিয়া ভগবৎপথে মহা বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছিল। নলিনবিহারী একবার পকেটে হাত দিলেন, তথায় সিগারেটের প্যাকেট ব্যতীত আর কিছুই নাই। ঈশ্বর আহার দিবেন, তাঁহার প্রেমে আমি বাহির হইয়াছি, আমার চিন্তা কি? এই বলিয়া তিনি মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুক্ষণ হইয়া গেল ভগবান তাঁহার জন্য সেই ক্রোশব্যাপি মাঠের ভিতর আহার লইয়া উপস্থিত হইলেন না। সহসা তাঁহার মনে হইল, "আমি কি আহম্মুক! ঈশ্বর কাহারও জন্য আহার লইয়া স্বয়ং উপস্থিত হন না, তাঁহার নাম করিয়া যাহার নিকট যাইব সেই আহার দিবে।"

নলিনবিহারী উঠিলেন, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে এক গোপ গৃহ দেখিলেন। গৃহের দাওয়ার উপর এক নধর অধর গোপশিশু খেলা করিতেছিল। তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এখানে একটু দুধ মিলিবে?"

বালক তাঁহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, "ওই দিকে ভিতরে যাও।"

নলিনবিহারী স্পন্দিত হৃদয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গৃহের প্রাঙ্গণে একটি গোপ ললনা মাথম তুলিতে ছিল, তিনি তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "একটু দুধ পাওয়া যাইবে?"

গোপ ললনা অপরিচিত ভদ্রলোক সম্মুখে দেখিয়া একটু সঙ্কোচিত হইয়া বলিল, "কতটুকু দরকার?"

"যে টুকু হয়।"

"কতটুকু না বল্‌লে কি করে দিব?"

নলিনবিহারী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি ঈশ্বর প্রেমে সন্ন্যাসী হইয়াছি,—ভিক্ষাস্বরূপ দুধ চাইতেছি,—আপনার যতটুকু দয়া হয়, ততটুকু দিতে পারেন।"

গোপ ললনা নলিনবিহারীর কথা ও বেশের পার্থক্য দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিলেও দয়াটুকু বেশ বুঝিল। সে তাঁহার দিকে একবার ভ্রূকুটি কুটিল নয়নে চাহিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "আঃ মরণ মিন্সে! মসকরা করবার আর যায়গা পাওনি। আমরা শান্তিপুরের মেয়ে, মসকরা এখনি বার করে দিব।"

গোপ ললনার উচ্চস্বরে কুটিরের ভিতর হইতে, "কি হয়েছে লক্ষ্মী", বলিয়া এক অতি বলিষ্ট গোপ বাহির হইয়া আসিল।

গোপ ললনা বলিল, "দেখ না বাপ, আমার সঙ্গে মসকরা করছে, বলছে—দয়া হবে না।"

কন্যার কথায় সেই ব্যক্তি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "তুমি কেমন ধারা ভদ্রলোক গা। আমার মেয়ের কাছে এসেছেন, দয়া হবে না,—দয়া রাস্তায় পড়ে আছে! বেরোও, এখনি—বেরোও!"

নলিনবিহারী তাহাদের ভুল বুঝাইয়া দিবার জন্য অতি বিনীতভাবে বলিবেন,—"অন্য দয়া নয়, আমি সন্ন্যাসী, দয়ার স্বরূপ একটু দুগ্ধ চাইয়াছি।"

নলিনবিহারীর কথায় সেই ব্যক্তি ক্রোধে স্বর সপ্তমে তুলিয়া বলিল,"সন্ন্যাসী! জামা জুতো পরে সন্ন্যাসী! আমাদের বোকা বোঝাচ্ছেন। কেলো বাঁকটা নিয়ে আয়তো,—একবার সন্ন্যাসীগিরী ভেঙ্গে দিই।"

নলিনবিহারী স্পষ্টই বুঝিলেন এখানে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইলে সত্যই বাঁক পেটা হইবার সম্ভাবনা। মূর্খ গোয়ালা ঈশ্বর প্রেমের কি বুঝিবে মনে মনে এই ভাবিয়া অতি ক্ষুব্ধ চিত্তে তিনি গোপগৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

৪

ক্ষুধা ও পিপাসায় অর্দ্ধমৃত নলিনবিহারী অতি কষ্টে আরোও প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক প্রকাণ্ড দীঘিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে তাঁহার কণ্ঠতালু, এমন কি পাকস্থলী পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। ক্ষুধায় তাঁহার সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করিতেছিল। তিনি সেই দীঘিকায় নামিয়া জল পান করিয়া উদর ও পিপাসা কতকটা নিবারিত করিলেন। তাঁহার পা টলিতেছিল, তিনি সেই দীঘিকার তীরে এক বৃক্ষ ছায়ায় দুর্ব্বাদল শয্যায় একেবারে আড় হইয়া পড়িলেন ;—অবসন্ন দেহে নিদ্রা আসিয়া দেখা দিল,—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কতক্ষণ সেইভাবে পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই, সহসা মনুষ্য কণ্ঠস্বরে তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন,

বেলা প্রায় অবসান। সম্মুখে তাঁহারই সমবয়স্ক একটী যুবক বলিতেছে,—"এখানে এমনভাবে পড়িয়া আছেন কেন মশাই; আপনার বাড়ী কোথায়?"

যুবকের কথায় নলিনবিহারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কি বলছেন, বাড়ী? হাঁ বাড়ী! আমার বাড়ী পূর্ব্বে ছিল, আজ আর নাই. আজ হইতে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি।"

যুবক নলিনবিহারীকে উন্মাদ ভাবিয়া তাহার আপদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিল, কিন্তু তাহার দেহে উন্মত্তের কোনরূপ চিহ্ন না পাইয়া বলিল, "হঠাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ কি?

অতি গম্ভীরভাবে নলিনবিহারী বলিলেন,—কারণ—মহা কারণ। কি কারণেএত লাঞ্ছনা, এত অপমান সহ্য করি? কারণ—বিবাহ করিয়াছি।.পরিশ্রম করিয়া প্রাণপাত করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে—কারণ বিবাহ করিয়াছি। আর সন্ন্যাসে লাঞ্ছনা নাই,—প্রবঞ্চনা নাই—পরিশ্রম নাই, ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন, তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন, পবিত্র নির্ঝরিণীর জল পান, আর বৃক্ষ ফল আহার।"

যুবক মনে মনে বলিল, "ঈশ্বরের রাজ্যে কত প্রকার পাগল আছে, তাহার ভিতর এই এক প্রকার।" সহসা একটা কূটবুদ্ধি যুবকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল, সে ধীরে ধীরে বলিল, "কথা যথার্থই বটে; পারিলে সন্ন্যাসের ন্যায় আর শান্তির জিনিষ কি আছে? আমরা মহাপাপী এই সংসারে পড়িয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। তা দেখুন আপনি যখন সন্ন্যাসীই হইয়াছেন,—তখন বেশটা আপনার পরিবর্ত্তন করা উচিত।"

নলিনবিহারী একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন! বেশ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে—কেন? সন্ন্যাসের সহিত বেশের কোন সম্বন্ধ নাই।"

"তা নাই বটে;—তবে লোকাচার অনুযায়ীই কার্য্য করা উচিত। এ বেশে আপনাকে সন্ন্যাসী বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিবে না, বরং পাগল বলিয়া পাগলা গারদে দিবার ব্যবস্থা করিবে। তা ছাড়া সন্ন্যাসে উদর পূরণের ভিক্ষাই একমাত্র উপায়, তা এ বেশে ভিক্ষায় যাইলে উদরের বস্তু না পাইয়া পিঠে দু-চার ঘা পাইবারই সম্ভাবনা।"

কথাটা নলিনবিহারীর প্রাণে লাগিল, তিনি মনে মনে বলিলেন কথাটা সত্য, এই বেশের জন্তই গোপগৃহে তাড়না খাইয়াছি। প্রকাশ্যে বলিলেন, "তাহা হইলে এখন উপায়?"

"উপায়ের আর চিন্তা কি? নিকটেই বাজার, চলুন আমার সঙ্গে, আমি এখনিই আপনাকে গেরুয়া বসন ও চাদর কিনিয়া দিতেছি।"

নলিনবিহারী বিষণ্নস্বরে বলিলেন, "আমার কাছে তো এক পয়সাও নাই, আপনাকে দয়াবান ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইতেছে,—আপনি কৃপা করিয়া আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।"

"তাইতো তাহা হইলে তো বড় মুস্কিলের কথা,—আমার নিকটও সম্প্রতি এক পয়সাও নাই যে কিনিয়া দিই।"

নলিনবিহারী যুবকের হাত দুইটী ধরিয়া অতি কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "মহাশয় আপনাকে যা হয় একটা উপায় করিতেই হইবে।"

যুবক একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আমিতো কোনও উপায় দেখিতেছি না, তবে এক উপায় আছে, তাহাও না হয় আমি আপনার জন্য করিতে পারি!"

নলিনবিহারী ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"কি! কি উপায়?"

"আপনার কাপড় জামা ও জুতা আমায় খুলিয়া দিন, বাজারের অধিকাংশ দোকানদারই আমাকে চিনে, আমি ওই সকল তাহাদের নিকট বিক্রয় করিয়া আপনার গেরুয়া বসন কিনিয়া আনি। আর যদি কিছু পয়সা বাঁচে তাহা হইলে আপনার জন্য আহারিয়ও কিছু আনিতে পারি।"

যুবকের কথায়নলিনবিহারী বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "উলঙ্গ হইয়া? তা কিরূপে সম্ভব!"

"তাহা হইলে নিরুপায়! সম্ভব নয় বা কিসে তাহাতো বুঝিতে পারি না। এদিকে লোক চলাচল নাই বলিলেও হয়, তা'ছাড়া আমার বড় জোর এক ঘণ্টা দেরী হইতে পারে। ততক্ষণ আপনি অক্লেশে ঐ ঝোপের ভিতর বসিয়া থাকিতে পারেন।"

নলিনবিহারী মনে মনে ভাবিলেন বেশ পরিবর্ত্তন না করিতে পারিলে রাত্রেও অনাহারে থাকিতে হইবে, কিন্তু বেশ পরিবর্ত্তনের অন্য উপায়ও নাই, কাজেই উলঙ্গ হইয়া বস্ত্র দিতে প্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "দেখবেন যেন বেশী দেরী না হয়।"

যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল, "পাগল হয়েছেন,—আপনাকে উলঙ্গ অবস্থায় রাখিয়া যাইতেছি, দেরী করিতে পারি,—যাইব আর আসিব।"

যুবক একটু দূরে যাইয়া দাঁড়াইলেন,—নলিনবিহারী একে একে জুতা জামা কাপড় তথায় খুলিয়া রাখিয়া সম্মুখস্থ ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ঝোপের ভিতর হইতে গলা বাহির করিয়া তিনি আবার বলিলেন,—"দেখবেন যেন দেরী না হয়!" "কোন ভয় নাই,"—বলিয়া যুবক ধীরে ধীরে নলিন-বিহারীর জুতা জামা কাপড় তুলিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

৫

নগ্নদেহে ঝোপের ভিতর পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র কীটের মৃদু মধুর দংশন ক্রমেই নলিনবিহারীর অসহ্য হইয়া উঠিতে ছিল। যুবক এখনি আসিবে এই আশায় তিনি বহু কষ্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন কিন্তু সূর্য্য ডুবিয়া সন্ধ্যা হইয়া গেল তথাপি যুবকের দর্শন নাই। শেষ নলিন-বিহারী যুবকের আগমন বিষয়ে একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজের সেই বিভৎস উলঙ্গ দেহের প্রতি চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "না যুবক আর আসিবে না,—পৃথিবী প্রবঞ্চনাময়! এখন উপায়?"

সমস্তদিন অনাহারে, নগ্নদেহে, উন্মুক্ত বক্ষে ঝোপের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা প্রভৃতি নানারূপ জীবের ক্রমান্বয় দংশনে তিনি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ও মহিমা দেহের প্রতি শিরায় শিরায় উপলব্ধি করিতেছিলেন। এ যন্ত্রণা হইতে শ্বশুরালয়ের লাঞ্ছনা যে সহস্রগুণে ভাল; এই কথাই তখন বার বার তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল। গৃহের লাঞ্ছনার সহিত সন্ন্যাসের লাঞ্ছনা তুলনা করিয়া তাহার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিতেছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি উঠিয়া দাড়াইলেন, কিন্তু দূরে দুইজন গ্রাম্যললনা আসিতেছে দেখিয়া লজ্জায় তাড়াতাড়ি আবার ঝোপের ভিতর লুক্কাইত হইলেন।

সন্ধ্যার একটু পরই প্রবলবেগে বৃষ্টি নামিল। আশ্বিন মাসের শেষে শীতের বেশ একটু আমেজ পড়িয়াছে,—তাহার উপর বৃষ্টি! শীতে নলিনবিহারীর সমস্ত শরীর বরফে পরিণত হইতে লাগিল, তাঁহার সমস্ত দেহে খাল ধরিতেছিল। সহসা ঝোপের ভিতর সড় সড় শব্দ হওয়ায় তিনি একেবারে ঝোপ হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শেষ কি সর্পের দংশনে মাঠের মাঝে প্রাণ দিতে হইবে? তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল! এরূপ অবস্থায় আর অধিকক্ষণ থাকিলে সর্প দংশনে না হইলেও অনাহারে মৃত্যু নিশ্চিত। উপায়ই বা কি? অপরিচিত দেশে এরূপ অবস্থায় যানই বা কোথায়? অধিকক্ষণ চিন্তা করিবার ক্ষমতাও তাঁহার আর ছিল না, শেষে তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে শ্বশুরালয়ের দিকেই রওনা হইলেন।

চারিদিক ঘোর অন্ধকার,—তখনও টিপি টিপি করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, পথ কর্দ্দমেপরিপূর্ণ। ইটে ও কাঁটায় তাঁহার সমস্ত পদ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। দুই

একটা গ্রাম্য কুকুর তাঁহার উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখিয়া চীৎকার করিয়া যেন তাহার মূর্খতার জন্ত বিদ্রূপ করিতে লাগিল। দুই তিনবার তাঁহাকে মনুষ্য পদশব্দে পথ ছাড়িয়া ঝোপের ভিতর লুকাইত হইতে হইল। এইরূপভাবে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল হাটিয়া নলিনবিহারী লজ্জায় দুঃখে ক্ষোভে মৃতপ্রায় হইয়া বীভৎস উলঙ্গ মূর্ত্তিতে শ্বশুরালয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাহাকেও ডাকিতে তাঁহার সাহস হইল না, দ্বারের নিকট যাইয়া ধীরে ধীরে কড়া নাড়িতে লাগিলেন।

বাহিরের গৃহেই হেমেন্দ্র শুইয়াছিল। সমস্তদিন নলিনবিহারীর কোন সন্ধান না হওয়ায় সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহারা নলিনবিহারীর আগমন প্রত্যাশা করিতেছিলেন। দ্বারে কড়ার শব্দ হওয়ায় হেমেন্দ্র আলো লইয়া সত্বর আসিয়া দরজা খুলিল। সম্মুখে উলঙ্গ মূর্ত্তি নলিনবিহারী! সে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! একি মূর্ত্তি? কাপড় কোথায়?" নলিনবিহারী ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "আগে আমায় একখানা কাপড় আনিয়া দাও। কাপড় খোয়া গিয়াছে।"

"এমন আহাম্মখ আছে, কাপড় খোয়া গেল?" এই বলিয়া হেমেন্দ্র সত্বর যাইয়া একখানা কাপড় ও একখানা আলোয়ান আনিয়া তাহাকে দিল। কাপড় পরিয়া আলোয়ানে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া লজ্জায় অবনত মস্তকে নলিনবিহারী হেমেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। হেমেন্দ্রবলিল,—"মা এই নাও তোমার নেংটা বাবা,—এতক্ষণে ফিরেছেন।"

নলিনবিহারী কোন কথা না বলিয়া একেবারে শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন। শয্যায় পড়িয়া তিনি যেরূপ আরাম উপলব্ধি করিলেন, পূর্ব্বে তিনি জীবনে কখনও সেরূপ আরাম উপলব্ধি করেন নাই। মনে মনে বলিলেন,—এরূপ শয্যা থাকিতে বৃক্ষতল—কি ভুলই করিয়াছিলাম।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার উলঙ্গ মূর্ত্তির কথা বাটীময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। লাবণ্য হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "কি জামাই বাবু, ঈশ্বর প্রেম কেমন লাগ্‌লো? শিবত্ব পাবেন ব'লে বুঝি দিগম্বর হয়েছিলেন?"

নলিনবিহারী নীরব,—তাহার মুখে বাক্য নাই। ঈশ্বর প্রেম তখন তাঁহার মাথায় উঠিয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

গল্পলহরী

২য় বর্ষ	মাঘ, ১৩২০।	৭ম সংখ্যা

শক্তি-ত্যাগ।

১

ফ্রান্সের দক্ষিণে ভূমধ্য-সাগরে করসিকা নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। প্রায় একশত বৎসরের পূর্ব্বে এই দ্বীপে সামান্য গৃহস্থের গৃহে নেপোলিয়ান জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়েই নেপোলিয়ান যুদ্ধ বিদ্যা অনেক আয়ত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যালয়ের সমস্ত বালক একত্রে মিলিয়া যুদ্ধ-খেলা খেলিতেন। তাঁহারা সকলে সমপাটিগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বরফের মধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেন, তখন বরফের গোলা নির্ম্মিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ হইত।

অতি অল্প বয়সেই লেখা পড়া পরিত্যাগ করিয়া নেপোলিয়ান ফরাসী রাজত্বে একটি সামান্য সৈনিকের পদ লাভ করিয়া নিজ মাতৃভূমি করসিকা পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে আসিলেন। তিনি দুইচারি বৎসর চাকুরী করিতে না করিতে ফ্রান্সে বিপ্লব উপস্থিত হইল। সে বিপ্লবের সময় নেপোলিয়ন প্যারিস নগরে একটি হোটেলে বাস করিতেছিলেন। প্রথমে তিনি এই বিপ্লবে যোগদান করিলেন না;—স্বদেশবাসিগণ আপনা আপনি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে দেখিয়া তিনি হৃদয়ে ব্যাথা পাইলেন বটে, কিন্তু দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন, বিপ্লবের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিলেন না। তিনি দেখিলেন, আজ এ দল আধিপত্য লাভ করিল, কাল আবার তাহাদের সকলের শিরঃচ্ছেদ করিয়া অপর আর এক দল আধিপত্য লাভ করিল। এইরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার প্রত্যহই ঘটিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া, শুনিয়া নেপোলিয়ান অবশেষে ফরাসী বিপ্লবের প্রবল তরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিয়া তাহার প্রবল তরঙ্গে ভাসমান হইলেন।

২

ফরাসী বিপ্লবের ফল স্বরূপ ফরাসী দেশে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী পদ্ধতি প্রচলিত হইল। সেই শাসনাধীনে নেপোলিয়ান লেফটেনাণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যা তাঁহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চির গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার অসীম সাহস, ধীর প্রকৃতি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারিগণ সকলেই তাঁহাকে একজন সুদক্ষ সেনানী বলিয়া জানিলেন। সুতরাং দুই তিন বৎসর যাইতে না যাইতে তিনি সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

নেপোলিয়ানের জীবনের প্রারম্ভ বৃত্তান্ত যে টুকু না বলিলে নহে, তাহাই বলিয়া আমরা এক্ষণে তাঁহার জীবনের যে গল্পটী বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি তাহাই বলিব। কয়েক বৎসরের মধ্যে নেপোলিয়ান প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেনাপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ফরাসী সেনাগণের তিনি অতি প্রিয় হইয়া উঠিলেন, তাঁহার জন্য ও তাঁহার কথায় ফরাসী সেনা তৃণের ন্যায় জীবন উৎসর্গীকৃত করিত। তিনি আজ এ যুদ্ধ, কাল ও যুদ্ধ, এইরূপে নানা যুদ্ধে জিতিতে আরম্ভ করিলেন। অজেয় বলিয়া তাঁহার নাম সমস্ত ইউরোপে বিখ্যাত হইল। ইউরোপিয়ান সম্রাটগণ নেপোলিয়ানের নামে কাঁপিতে লাগিলেন।

এইরূপে নেপোলিয়ায়ান অতি শীঘ্রই ফরাসী রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অবশেষে তিনিই ফরাসী রাজ্যের শাসন কর্ত্তা পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না; দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতে তিনি ফরাসী জাতীর সম্রাট নাম ধারণ করিয়া ফরাসী সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

এই সময় তিনি ইউরোপের প্রায় অধিকাংশ দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ও এক এক দেশে তাঁহার এক এক ভ্রাতাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইহাতেও তাঁহার সিংহাসন সুদৃঢ় হইতেছে না। তিনি দরিদ্রের সন্তান, সম্রাট হইয়াছেন বলিয়া অন্যান্য রাজাগণ প্রকাশ্যে তাঁহাকে ভয় করিলেও মনে মনে আন্তরিক ঘৃণা করেন। এই সকল কারণে তিনি ভাবিলেন, যদি কোন প্রকারে কোন ইউরোপীয় সম্রাটের সহিত কুটুম্বিতা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সিংহাসন প্রকৃতই সুদৃঢ় হইতে পারে।

৩

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া নেপোলিয়ান অষ্ট্রীয়া সম্রাটের কন্যা রাজ কুমারী আগা মেরিয়ার পাণিগ্রহণে ব্যগ্র হইলেন ;—ভয়েই হউক অথবা যে কারণেই হউক, অষ্ট্রীয়াধিপতি এ বিবাহে সম্মত হইলেন, কিন্তু নেপোলিয়ান বিবাহিত, তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে তিনি কোন মতেই অন্য বিবাহ করিতে পারেন না। যে স্ত্রীর অতুলনীয় প্রণয়ে তিনি সর্ব্বদা বলিয়ান হইয়া, যাহার প্রেম মাখা হাসিমুখ দেখিয়া সর্ব্বদা উৎসাহিত হইয়া, যাহার মধুময় কথা শুনিয়া তিনি সর্ব্বদা আশ্বাসিত হইয়া ফরাসী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ; কোন্ প্রাণে সেই স্ত্রীকে তিনি পরিত্যাগ করিবেন ?

কিন্তু তাঁহার প্রাণসমা প্রিয়তমা ভার্য্যা জোসেফাইন্, তাঁহার মুখে না হউক, অন্যের মুখেও এ কথা শুনিলেন, জোসেফাইনের ভালবাসা তাঁহার নিজের জন্য নহে, সে নেপোলিয়ানকে ভাল বাসিত নেপোলিয়নের জন্য, সুতরাং ফরাসী সিংহাসন সহ নেপোলিয়ানকে পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল না। নেপোলিয়ান সুখী হইবেন, নেপোলিয়ান নিরাপদ হইবেন, ইহাতে জোসেফাইনের আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। নেপোলিয়ানকে ছাড়িতে তাহার কষ্ট হইবে, তাহাতে তাহার হৃদয়ের বেদনা অনুভূত হইবে, হইলই বা ;—সে যে নেপোলিয়ানের জন্য হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতে পারে।

জোসেফাইন সকলেই শুনিয়াছিল, নেপোলিয়ানও সে কথা জানিতেন। কেমন আপনা আপনি তাহাই আজ তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতে ছিল। সন্ধ্যা হইতে জোসেফাইন্ ব্যাকুল প্রাণে প্রতি মুহূর্ত্তে স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সামান্য শব্দে স্বামীর পদ শব্দ ভাবিয়া দ্বারের দিকে চাহিতে ছিলেন, কিন্তু রাত্রি ক্রমেই গভীর হইতে লাগিল, তথাপি জোসেফাইনের নিকট নেপোলিয়ান আসিলেন না। ভগ্ন হৃদয়ে হতাশচিত্তে জোসেফাইন শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না, একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিলেন, পড়িতে পারিলেন না, তাহার হৃদয়ে আজ তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল। এই সময় কে অতি মধুর স্বরে ডাকিল, "জোসি।" সে আহ্বান জোসেফাইনের চির পরিচিত, সে চমকিত হইয়া ফিরিল,—সম্মুখে নেপোলিয়ান !

৪

জোসেফাইন নেপোলিয়ানকে দেখিলে জগৎ ভুলিয়া যাইত। নেপোলিয়ানকে দেখিয়া জোসেফাইনের হৃদয় হইতে সকল ভাবনা সকল চিন্তা মুহূর্ত্তে অপসারিত

হইল। সে তাহার চির হাসি মুখে আসিয়া স্বামীর হৃদয়ে মুখ লুকাইল। কিন্তু নেপোলিয়ানের তাহা সহ্য হইল না। যাঁহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন বলিয়া জগতে বিদিত, নর শোণিতে সর্ব্বাঙ্গ বিধৌত করিয়া যাঁহার হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হইত না; যাঁহার হৃদয় ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রেও মুহূর্ত্তের জন্যও কম্পিত হয় নাই। যাঁহার চক্ষে এ পর্য্যন্ত কেহ জল দেখে নাই সেই নেপোলিয়ান আজ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহার দুই চক্ষু দিয়া প্রবল জলধারা বহিল, প্রকৃতই তিনি জোসেফাইন্‌কে বড় ভালবাসিতেন।

জোসেফাইন কাঁদিল না, সে আদরে স্বামীর চক্ষু জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "প্রিয়তম আম সকলই শুনিয়াছি, কিন্তু দেখ আমি ত কাঁদিতেছি না, তবে তুমি কাঁদ কেন?

জোসেফাইন যদি ক্রোধ প্রকাশ করিত, জোসেফাইন যদি কাঁদিয়া তাঁহার হৃদয় ভাসাইয়া দিত, তাহা হইলে নেপোলিয়ানের হৃদয়ে এত বেদনা অনুভূত হইত না। নেপোলিয়ান বলিলেন "জোস! তুমি দেবী, তাই তুমি কাঁদ না, আমি পশুর অধম তাই কাঁদি।"

আজ জোসেফাইন প্রাণ খুলিয়া কথা কহিলেন;—বলিলেন, "নাথ তোমার জন্য আমি জ্বলন্ত অগ্নিতে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া মরিতে পারি, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিব এ কি বড় কঠিন কার্য্য। তোমার সুখের জন্য, তোমার নিরাপদের জন্য, তোমার সাম্রাজ্যের জন্য, ফ্রান্সের জন্য আমি আমার হৃদয়কে বলি দিব, ইহা কি বড় কঠিন বিষয়। প্রিয়তম! তোমায় বুঝাই আমার কি সাধ্য, তোমার বলিয়ান হৃদয়ে আমি বল দিই আমার সে ক্ষমতা কোথায়? আমি যদি কষ্ট পাইতাম, আমি যদি কাঁদিতাম, তাহা হইলে তুমি কষ্ট পাইবে, তাহা যখন নয়, তখন দুঃখ কিসের?"

কিন্তু ইহাতে নেপোলিয়ানের, হৃদয়ে প্রবোধ মানে কই! ইহাতে তাহার হৃদয়ে শান্তি আসে কই! নেপোলিয়ানকে নীরব থাকিতে দেখিয়া জোসেফাইন তাহার হাত দুইটি ধ'রয়া আবার বলিল, "নাথ আজ আমার সুখের শেষ দিন; আজ আমকে সুখী হইতে দাও। আজ আমাকে শেষ হাসি হাসিতে দাও, আজ আমি কাঁদিব কেন?"

* * * * * *

পর দিবস নেপোলিয়ান যখন রাজ সভায় আসিলেন, তখন সকলে দেখিল তাহার আকৃতির ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গিয়াছে। রাত্রে যেন তাহার দশ বৎসর বয়স বৃদ্ধি হইয়াছে, সকলেই সকল বুঝিল কিন্তু কেহই কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

জোসেফাইন স্বামীর সুখের জন্য স্বামী পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করিল। যতক্ষণ জাহাজ হইতে ফরাসী উপকূল দৃষ্টিগোচর হইল, ততক্ষণ তাহার চির কমণীয় চির প্রফুল্লিত মুখে হাসি বই আর কিছুই ছিল না কিন্তু তাঁহার পর সে জাহাজের যে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ঠ হইয়াছিল তথা হইতে আর নিষ্ক্রান্ত হয় নাই। শক্তি পরিত্যাগ করিয়া নেপোলিয়ানের অদৃষ্ট যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, ইতিহাস পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

প্রায়শ্চিত্ত।

১

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে একদিবস সন্ধ্যাকালে কাটোয়ার নিকট আসিয়া একদল ইংরাজ সৈন্য শিবির সন্নিবেশ করিল। কয়েক ঘণ্টা মাত্র ইহারা এই স্থানে অপেক্ষা করিয়া নিশীথ রাত্রিতে আবার নীরবে গঙ্গার ধার দিয়া সদর্পে চলিল; অতি প্রত্যুষে পলাশীর মাঠে আসিয়া সকলে দাঁড়াইল। অদূরে বঙ্গের নবাব সিরাজুদ্দৌলা সসৈন্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন।

ইংরাজ সৈন্য নীরবে দাঁড়াইল, মুহূর্ত্ত পরে অগ্রবর্ত্তী কামানে অগ্নি সংযোগ করিল; অমনি চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া বজ্রতুল্য শব্দ গর্জ্জিয়া উঠিল; সেই শব্দের সহিত সমস্ত ইংরাজ সৈন্যও বিকট শব্দ করিল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রায় পাঁচ সহস্র মুসলমান সৈন্য ইংরাজ সৈন্যের দিকে ছুটিল। পাঁচ মিনিট যুদ্ধ হইতে না হইতে যুদ্ধ বন্ধ হইল; সেই পাঁচ সহস্র যোদ্ধা সহসা যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইল। ইংরাজেরা তখন সিংহ পরাক্রমে উহাদের উপর যাইয়া পড়িল। দেখা গেল, অদূরে নবাবের ৫০ সহস্র অশ্বারোহী ও ৬০ সহস্র পদাতিক উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে। পাঁচ মিনিট এইরূপ যুদ্ধের পরেই বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ শেষ হইল।

দূরে আম্র বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ত্রিশূল হস্তে জটাজুটধারিণী এক সন্ন্যাসিনী এই ব্যাপার নীরবে দেখিতেছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, অসংখ্য মুসলমান সৈন্য দুই মিনিটও যুদ্ধ না করিয়া পলাইল, তখন তিনি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না;—অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

২

সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে আম্রবন ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন। তথায় একখানি ক্ষুদ্র নৌকার উপরে একটী মুসলমান ফকির বসিয়াছিলেন; তিনি সন্ন্যাসিনীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?" সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে পদপ্রক্ষালন করিয়া নৌকায় উঠিয়া বলিলেন, "হইয়া গিয়াছে।" ফকির আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "হইয়া গিয়াছে! এত শীঘ্র?" "যুদ্ধ হইল না, একদল আসিল, আর এক দল পলাইল। এখন চলুন," এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী ত্রিশূল দিয়া একজন নাবিককে ঠেলিয়া দিলেন, সে নীরবে নৌকা খুলিয়া দিল। তখন ফকির আবার বলিলেন, "এখন কোথায় যাইতে হইবে?" সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আপনি জানেন তো এখনও কার্য্য শেষ হয় নাই। এখন তো প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই।" ফকির বলিলেন, "আর কেন? ক্ষমা কর।" ফকিরের এই কথায় সন্ন্যাসিনী গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ক্ষমা তো নাই; পরে প্রায়শ্চিত্ত করিব।" ফকির দ্বিরুক্তি না করিয়া নাবিকদিগকে বলিলেন, "উজান যাও।"

এইরূপে নৌকা সমস্ত দিবস ও সমস্ত রাত্রি চলিল। একবার মাত্র মুরসিদাবাদে লাগিয়া ছিল। পর দিবস বেলা দুইটা পর্য্যন্তও চলিল; সন্ন্যাসিনী সর্ব্বদাই গঙ্গার উপকূলাভিমুখে চাহিয়া ছিলেন; এক্ষণে যেন কি দেখিয়া সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন ও চীৎকার করিয়া নাবিকদিগকে নৌকা কূলে লাগাইতে বলিলেন। গঙ্গার স্রোত সেই স্থানে এত খরতর বহিতেছিল যে নৌকা কূলে লইয়া যাওয়া কঠিন হইল। সন্ন্যাসিনী পিঞ্জরাবদ্ধা সিংহিনীর ন্যায় নৌকার উপর পদচারণ করিতে লাগিলেন, পরে আর থাকিতে পারিলেন না, ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িলেন। সাঁতরাইয়া কূলে উঠিয়া দ্রুতবেগে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। ফকির নৌকায় দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতেছিলেন, সন্ন্যাসিনী দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে বলিলেন, "পাগ্‌লী আমাকে পাগল করিবে।" এদিকে নৌকাও কূলে লাগিল, সন্ন্যাসিনী যে পথে গিয়াছিলেন, ফকির নৌকা ত্যাগ করিয়া সেই পথে প্রস্থান করিলেন।

৩

বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে বঙ্গের ধন কুবের জগৎশেঠের যত্নেই সিরাজুদ্দৌলা রাজ্যচ্যুত হয়েন এবং ইংরাজ রাজ্য বঙ্গে স্থাপিত হয়। বোধ হয়, ইহাও সকলে জানেন যে মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠের কন্যার শয়ন-গৃহে নবাব সিরাজুদ্দৌলা এক দিবস প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অপমান করিবার উদ্যম করেন। কিন্তু বোধ হয় ইহা কেহই অবগত নহেন যে সেই কন্যার স্বামী জগৎবল্লভ শ্রেষ্ঠী, তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রীর এইরূপ অপমানের দণ্ড দিবার জন্য, সিরাজুদ্দৌলাকে এক দিবস প্রকাশ্য রাজপথে আক্রমণ করিয়াছিলেন ও সেই রাজপথে নবাব অনুচর কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলা এই বীরের মস্তক জগৎশেঠের বাটী পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠান, "ইহা তোমার রূপসী কন্যা অসামান্যার জন্য।" এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে তাঁহাদের মনে কিরূপ ভাব হইয়া ছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

যে দিবস স্বামীর এইরূপ নৃশংস হত্যা হয়, সেই দিবস রাত্রে অসামান্যা বাটী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। এক বৎসর আর কেহ তাহার কোন সন্ধান পান নাই। অসামান্যা ঘোর নিশীথ রাত্রিতে আসিয়া এক মন্দিরের দ্বারে আঘাত করিল। তখন এক সন্ন্যাসী দ্বার উন্মুক্ত করিলেন ও অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এত রাত্রে কার সঙ্গে আসিলে, কেমন করিয়া আসিলে?" অসামান্যা বলিল, "কাকা, আর কি অসামান্যা সে অসামান্যা আছে! আর কি সে মকমলের উপর চলিতে ক্লেশ অনুভব করে! আপনি কি সকল শুনেন নাই?" অসামান্যার খুল্লতাত যৌবনে মুসলমান কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া ভারতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, অসামান্যাকে ইনি কন্যাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। তিনি বলিলেন, "এখন কি করিতে চাও?" অসামান্যা কহিল, "কি করিতে চাই? প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা! সিরাজুদ্দৌলার বিনাশ ব্যতীত আমার শান্তি নাই। কাকা, কাকা, ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, ঐ দেখুন,—ঐ তিনি। ও রক্ত আমি দেখিতে পারি না! তিনি আমাকে অঙ্গুলী দিয়া রক্ত দেখাইতেছেন। যদি সতী হই, তবে ইহার প্রতি—" অসামান্যা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পড়িতেছিলেন, সন্ন্যাসী ধরিলেন।

৪

এই ঘটনার এক বৎসর পরে মুরসিদাবাদে দুই জন লোক লইয়া বড়ই আন্দোলন চলিল। একজন মুসলমান ফকির ও অপরটী পাগলিনী। বলিতে হইবে কি যে মুসলমান ফকির অসামান্যার খুল্লতাত সন্ন্যাসী আনন্দচাঁদ

জগৎশেঠ, আর পাগলিনী আমাদিগের অসামান্যা দেবী। একজনের উদ্দেশ্য মুসলমান রাজ্যধ্বংস, অপরের উদ্দেশ্য সিরাজুদ্দৌলাকে ধ্বংস।

ফকির ঔষধ বিতরণ করিয়া ও ভবিষ্যৎ বলিয়া শীঘ্রই মুসলমান সমাজে একাধিপত্য লাভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রধান প্রধান ওমরাওগণকে পর্য্যন্তও নিজ দাসের ন্যায় করিলেন। কোন মুসলমানের এমন সাহস ছিল না যে তাঁহার কথা অমান্য করে। এদিকে পাগলিনী কৃষ্ণচন্দ্রকে কালীর কথা কহিয়া, রাজনগরে যাইয়া রাজবল্লভকে অন্নপূর্ণার কথা কহিয়া, তাঁহাদের ভক্তির পাত্রী হইলেন। মুরসিদাবাদে সকলেই তাঁহাকে ভয়ানক পাগল মনে করিয়া ভয় করিত। পাগলিনীর অলোকসামান্য রূপ তাহার ছিন্ন বস্ত্র ও মলিনতার মধ্য হইতে মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইত। সকলেই ভাবিত, এ রূপবতী যুবতী কিরূপে পাগল হইল?

একদিবস পাগলিনী ও ফকির উভয়ে নিভৃতে জগৎশেঠের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জগৎশেঠ ও তাঁহার পত্নী কন্যাকে গৃহে থাকিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু অসামান্যা কিছুতেই শুনিল না। সেই দিন হইতে জগৎশেঠের লুপ্তপ্রায় ক্রোধ পুনঃ প্রজ্জ্বলিত হইল। তিনি সিরাজকে নাশ করিবার প্রধান উদ্যোগী হইলেন। মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠ, কন্যা ও আনন্দচাঁদকে সহায় করিয়া গোপনে সিরাজুদ্দৌলার সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে হিন্দু মুসলমান সকলেই সিরাজুদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিতে প্রস্তুত হইলেন। তৎপরে ইংরাজদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইল। সিরাজ ইংরাজ আগমন বার্ত্তা পাইয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজ মুরসিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইল, পলাসীতে যুদ্ধ হইল; অসামান্যা দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিয়াছিল, তাহা পাঠক অবগত আছেন। পরে খুল্লতাতের সহিত সিরাজের অনুসরণ করিয়াছিল, তাহাও অবগত আছেন। সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়াই খুল্লতাত অসামান্যাকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন; অসামান্যা তাহা শুনিল না। তাহার চক্ষের উপর স্বামীর ছিন্ন মস্তক দিবা রাত্র নাচিতেছিল, সে এখন উন্মাদিনী।

ফকির ও অসামান্যা মুরসিদাবাদে আসিয়া জানিলেন, সিরাজ একাকী পদব্রজে ভগবানগোলার দিকে গিয়াছেন। তাঁহারাও নৌকায় তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

৫

তাঁহার পক্ষে আর কেহ নাই দেখিয়া সিরাজুদ্দৌলা পলাশীতে যুদ্ধ স্থগিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখিলেন যে যদিও যুদ্ধ হইল না সত্য, কিন্তু তিনি হারিলেন ও সিংহাসনচ্যুত হইলেন। সিরাজুদ্দৌলার এই সময়ে চতুর্ব্বিংশ বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রম ; দুঃখ কি তাহা তিনি এত দিন বুঝেন নাই ; এক্ষণে তাঁহার বড়ই প্রাণের মায়া হইল, তিনি তো মরিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মুরসিদাবাদে আসিয়া তিনি সকল পরিজনকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। হায়, যে এক দিবস মকমলের উপর দিয়া পদচারণ করিতে পায়ে বেদনা বোধ করিত, আজ সে প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে ; কণ্টকে পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তে রক্তাক্ত হইয়াছে।

সিরাজ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছিলেন, পশ্চাতে একবারও ফিরিয়া দেখেন নাই। এক্ষণে তিনি আর চলিতে পারিলেন না, ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হায়, কোথায় আসিলাম !" পশ্চাৎ হইতে উত্তর হইল, "যমালয়ে।" সিরাজ চমকিত হইয়া একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন ;—দেখিলেন,—সম্মুখে শাণিত ছুরিকা হস্তে এক রাক্ষসী। সিরাজ জড়িত কণ্ঠে বলিল, "তুমি কে ?" রমণী বলিল, "আমি অসামান্যা, জগৎশেঠের কন্যা !" সিরাজের তখন মুখ হইতে এই কয়টী কথা মৃদুস্বরে দুই তিনবার উচ্চারিত হইল, "হাঁ, মনে পড়িয়াছে। তোমার স্বামীর মস্তক তোমাকে পাঠাইয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি আমার মস্তক তাঁহাকে পাঠাইতে আসিয়াছ, ভাল।" সিরাজ সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইলেন। পাগলিনী মনে মনে বলিল, "যে আমার স্বামীর রক্তপাত করিয়াছিল, সে আমার নিকট আজ মূর্চ্ছিত ; এখন এই শাণিত ছুরিকায় সমস্ত শেষ করিতে পারি। না, প্রাণনাশ করিব না। আমি স্ত্রীলোক, নরাধমের অনেক দণ্ড হইয়াছে। যাহা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু ওকি ওকি !" পাগলিনী চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওই সেই আবার, সেই রক্ত, সেই রক্ত, সেই রক্ত ! ওই, ওই, এই পামরের রক্তে আজ তাঁহার রক্ত ধুইয়া ফেলিব। স্বামিন্ বল দাও, বল দাও আজ স্ত্রীর কার্য্য করি," এই বলিয়া অসামান্যা শাণিত ছুরিকা উত্তোলন করিলেন ; কিন্তু তাহা সিরাজের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল না, ফকির হাত ধরিলেন। উন্মাদিনী ফিরিয়া বলিল, "ছাড়, ব্রত উদ্‌যাপন করি।" ফকির ছাড়িলেন না ; বলিলেন, "বৎসে, তোমায় সব

করিতে দিয়াছি, এটী করিতে দিব না। এতদিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমার হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সব করিয়াছি; কিন্তু তোমার হস্ত নররক্তে কলঙ্কিত করিতে দিব না। আমি বেশ বুঝিয়াছি, সিরাজের রক্তপাত না হইলে তোমার চিত্ত স্থির হইবে না; ইহার রক্তপাত হইবেই—তুমি সে কার্য্য সাধন করিয়া কেন হস্তকে কলঙ্কিত করিবে! ইহার রক্তপাত ইহার স্বজাতিগণই করুক, আমরা কেন করিতে যাইব! তুমি স্বামীহন্তার উপযুক্ত দণ্ড দিয়া স্বামীভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ; এমন পবিত্রতার নামে কি নরহত্যা সংযোগ হওয়া উচিত! তোমায় সব করিতে দিয়াছি, এইটী করিতে দিব না।" অসামান্যা খুল্লতাতের বুকে মস্তক রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর জন্য আজ এই প্রথম সে কাঁদিল।

৬

তাহার পর সিরাজের যাহা হইল তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। ফকির মিরজাফরের লোকের হস্তে সিরাজকে অর্পণ করিলেন। সিরাজ মুরসিদাবাদে আনীত হইলেন। যে সময়ে মিরজাফর অহিফেণ সেবন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, তাঁহার পুত্র মীরণ মহম্মদীবেগ নামক এক পাষণ্ডকে সিরাজের প্রাণ নাশ করিতে আজ্ঞা দিল। সে কারাগারে গিয়া সিরাজের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সিরাজের ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত দেহ হস্তী পৃষ্ঠে কবরে নীত হইল, তথায় বিনা সমারোহে বঙ্গেশ্বরের দেহ প্রোথিত হইল। পাগলিনী দাড়াইয়া দেখিল, তাহাকে তথা হইতে বিদূরিত করিতে কোন মুসলমান সৈনিকই সাহস করিল না। যখন সিরাজের দেহ মৃত্তিকা দিয়া ঢাকা হইল, তখন সে নীরবে সে স্থান ত্যাগ করিয়া শঙ্করপুরের দিকে চলিল। রাত্রি প্রায় আট ঘটীকার সময় অসামান্যা আসিয়া খুল্লতাতের সহিত সাক্ষাৎ করিল। এক্ষণে আনন্দচাঁদ জগৎশেঠ আর ফকির বেশধারী নহেন; তিনি অসামান্যাকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "বৎসে, তোমার কার্য্য তো শেষ হইয়াছে। এক্ষণে দেশে যাও। তোমার মাতা পিতা উভয়েই আসিয়াছেন।" অসামান্যা অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "কি করিতে যাইব?" আনন্দচাঁদ বলিলেন, "কেন তোমারই সব! তোমার পিতামাতার আর কে আছে? এই অতুল ঐশ্বর্য্য সকলই তোমার।" অসামান্যা বিষাদ হাসি হাসিয়া কহিল, "কাকা, আপনিও এই কথা বলিলেন। সেখানে ধন আছে সত্য, কিন্তু রমণীর

যে ধন, সে ধন কি সেখানে আছে? যাহা হউক অধিক কথায় প্রয়োজন নাই; আমি তথায় আর যাইব না। আমি আমার কার্য্য শেষ করিয়াছি; যত দিন বাঁচিয়া থাকি তাঁহারই ধ্যান করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব;—আর প্রায়শ্চিত্ত করিব।" আনন্দচাঁদ বিষাদে কহিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত কেন?" অসামান্যা সোৎসাহে ও সবেগে কহিলেন, "আমি একজনের সর্ব্বনাশ করিলাম, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব না তো কে করিবে? এক্ষণে কাহারও প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলে, তবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আর গৃহে যাইব না—দেশে দেশে পরহিতব্রতে ঘুরিব। চলুন, পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া আসি। তাঁহারা কখনই আমাকে গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিবেন না।" এই কথা বলিয়া অসামান্যা উঠিল; সন্ন্যাসীও উঠিলেন। উভয়ে একটী মন্দিরের দিকে চলিলেন। মন্দিরে গিয়া পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল, অসামান্যার মাতা কত কাঁদিলেন, পিতা কত বুঝাইলেন; অসামান্যা কিছুতেই বুঝিল না। তখন তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিবস অসামান্যা মুরসিদাবাদ ত্যাগ করিয়া চলিল;—আনন্দচাঁদ অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; পরে বলিলেন, "বৎসে, তোমায় ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ চাহে না। সঙ্গে যাইবারও যো নাই; তোমার ব্রতপালন করিয়া তুমি কালী নামে ভাসিলে, কালী জানেন, আমার ব্রত কবে শেষ হইবে?" অসামান্যা কহিলেন, "কেন কাকা সিরাজতো গিয়াছে, ইংরাজও তো আসিয়াছে। আপনিই জানেন কেন আপনি ইংরাজকে দেশে আনিতে চাহেন—আমি স্ত্রীলোক কি বুঝিব?" আনন্দচাঁদ কহিলেন, "ইংরাজ না আসিলে ভারতবর্ষের উদ্ধার নাই, মা ইহা বলিয়াছেন। তাহাই ইংরাজকে আনিতেছি। কবে কার্য্য শেষ হইবে, তাহা তিনিই জানেন।" অসামান্যা কোন কথা কহিল না, বলিল, "তবে আপনি আসুন, আমি যাই।" এই বলিয়া অসামান্যা 'খেয়া' নৌকায় উঠিল। আনন্দচাঁদ সজল নয়নে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে নৌকা পর পারে লাগিল, আর অসামান্যাকে দেখা গেল না।

৭

অসামান্যার মুরসিদাবাদ ত্যাগের সাত বৎসর পরে বঙ্গদেশে এক ভয়ানক ঝড় হইল। সেই প্রলয়ে বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হইল। কত নগর নগরী ধ্বংশ হইয়া গেল, কত লোক প্রাণ হারাইল, তাহার

সংখ্যা হইল না! এই মহা প্রলয়ের দিবস বায়ুতাড়িতা উন্মাদিনী পদ্মার কূলে ত্রিশূল হস্তে অসামান্যা দেবী দাঁড়াইয়া দূরস্থ একখানি নৌকার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিতেছে, সেই বিদ্যুৎ আলোকে নৌকা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বায়ু প্রবলবেগে বহিতেছে, প্রলয় পবনে সন্ন্যাসিনীর জটাজুট উড়িতেছে। সেই বিষণ্ণ বদনে বিদ্যুৎ-আলোক পড়িয়া কি ভয়াবহ দৃশ্য দেখাইতেছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতি রাক্ষসীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগৎ ধ্বংশ করিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছে। অতি বৃহৎ বৃক্ষ সকল ছিন্ন মূল হইয়া বায়ুবেগে তাড়িত হই-তেছে; সম্মুখে পদ্মা উত্তাল তরঙ্গে রঙ্গ করিতেছে। সন্ন্যাসিনী ত্রিশূলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অদূরে নৌকা ঝড়ে উঠিতেছে, ডুবু ডুবু হইতেছে। একবার বিদ্যুৎ হইল সেই আলোকে সন্ন্যাসিনী দেখিলেন, নৌকাখানি ডুবিল। তখন তিনি, "জয় মা কালী" বলিয়া সেই উত্তাল তরঙ্গময়ী পদ্মা বক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। কে ভাবিয়াছিল কোমলকায়া অসামান্যা একদিন এরূপ কঠিনকায়া হইবে? অভ্যাসে সকলই সিদ্ধ হয়। আট বৎসর ধরিয়া সে কেবল কঠোরতা শিক্ষা করিয়াছে; সে ভয় লজ্জা, দুঃখ প্রভৃতি হৃদয় হইতে একেবারে দূরীভূত করিয়াছে, সে যে সেই প্রলয় তাড়িতা পদ্মাবক্ষে আনন্দে সন্তরণ করিবে আশ্চর্য্য কি?

অসামান্যা সন্তরণ করিয়া চলিল; সে যেখানে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বোধ হয় তথা হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে নীতা হইল। তত্রাচ বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হইল না। সাঁতরাইয়া যাইয়া একটী মনুষ্য দেহের কেশ ধরিল; ও তাহাকে লইয়া কূলে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপ প্রায় তিন ঘণ্টা কাল তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া সে কূল পাইল। তখন প্রায় রাত্রি শেষ হইয়াছে, ঝড়েরও বেগ কমিয়াছে। প্রথমে যথায় সে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল, তথা হইতে বোধ হয় দশ ক্রোশ দূরে আসিয়া সে কূলে উঠিতে সক্ষম হইল। অসামান্যা যাহাকে তুলিল, সে একটী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা। সে নিকটস্থ গ্রামে সেই মৃত প্রায় দেহ লইয়া উপস্থিত হইল। গ্রাম এক্ষণে শ্মশান। অনেক ক্লেশে তথায় অগ্নি সংগ্রহ করিয়া বালিকাকে চেতনা দানের চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেক পরিশ্রমের পর বালিকার চেতনা হইল সত্য, কিন্তু তাহার বাক্‌শক্তি বা শ্রবণশক্তি কিছুই হইল না। তখন ঝটিকা নিবৃত্তি হইয়াছিল; সন্ন্যাসিনী সেই বালিকাকে আবার ক্রোড়ে লইয়া চলিলেন।

ঝড় প্রায় সমস্ত প্রদেশ ধ্বংশ করিয়াছিল ; তিনি এ কোন্ স্থান, এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যও একটী লোক দেখিতে পাইলেন না। পাঁচ ছয় ক্রোশ চলিয়া, তিনি একটী গ্রামে আসিলেন ; দেখিলেন তথায় কেহ কেহ জীবিত আছে। তাহাদের জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন যে সেই স্থানের নাম ফরিদপুর।

এই স্থানে এক কুটীরে থাকিয়া সন্ন্যাসিনী বালিকার চীকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সাত দিবস পরে বালিকার পূর্ব্বজ্ঞান আসিল, সে "মা মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সন্ন্যাসিনী নানা উপায়ে তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন ; তখন বালিকা সন্ন্যাসিনীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি কে ?" অসামান্যা কহিলেন, "আমি তোমার পিতার সর্ব্বনাশের মূল ; তোমার পিতার সর্ব্বনাশ ও প্রাণনাশ করিয়াছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি।" বালিকা কিছুই বুঝিল না, সন্ন্যাসিনী বালিকার সেই গোলাপ বিনিন্দিত গণ্ডে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "তুমি আজ হইতে আমার কন্যা হইলে। তোমার নাম রাখিলাম প্রায়শ্চিত্ত।" বালিকা বলিল, "আমার নাম 'গুল্ বাহার।"

৮

আর কয়েকটী কথা বলিলেই অসামান্যার ইতিহাস শেষ হয়। অসামান্যা মুরসিবাদ ত্যাগ করিয়া যথায় সিরাজকে সে প্রথম হস্তে পায়, ও যথায় তাঁহার খুল্লতাত সেই অভাগাকে মিরজাফরের হস্তে সমর্পণ করে, সেই 'ভগবানগোলায়' আসিল। কেন তাহা সে নিজেই ঠিক বুঝিতে পারে নাই। তবে এই পর্য্যন্ত তাঁহার মনে হইয়াছিল, যদি তথায় সিরাজের কোন আত্মীয় কোন বিপদে পড়িয়া থাকে, তবে তাঁহাকে সে উদ্ধার করিবে। সিরাজের কাহারও উপকার করিবার ইচ্ছাই এক্ষণে তাঁহার মনে বলবতী হইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল যে, সে সিরাজের ধ্বংস সাধন করিয়াছে, সিরাজের কাহারও উপকার না করিলে, তাহার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

যাহা হউক সে ভগবানগোলায় আসিয়া যাহা জানিল, তাহাতে তাহার বড় আনন্দ হইল। জানিল, সিরাজের অসংখ্য বেগম ও বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহাকে বিপদে ফেলিয়া মিরজাফরের আশ্রয় লইয়াছেন, কিন্তু একজন লয়েন নাই। তিনিই সিরাজকে যথার্থ ভালবাসিতেন ও সিরাজকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইনি সিরাজের জনৈকা বেগম। ইঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। সিরাজ ইঁহাকে 'গুলবেগম' অর্থাৎ 'গোলাপফুল' বলিয়া আদর করিয়া ডাকিতেন। সিরাজের

পলায়ন বার্ত্তা শুনিয়া ইনি একাকিনী সিরাজের অনুসন্ধানে চলিলেন। মিরজাফরের লোকেরা সিরাজকে লইয়া যাইবার দুই ঘণ্টা পরে ইনি ভগবানগোলায় উপস্থিত হইলেন ও সমস্ত শুনিলেন। বেগম তৎকালে প্রায় নয়মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এই সংবাদে তিনি মুর্চ্ছিতা হইলেন, ও দুই ঘণ্টা পরে তাঁহার মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই একটী কন্যা সন্তানের জন্ম হইল। গ্রামস্থ দয়াদ্রচিত্ত একজন রমণী তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া গৃহে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিলেন। বেগম নিজ কন্যাকে সিরাজের প্রিয় নাম লুৎফবাহার দিলেন। অসামান্যা এই সকল কথা শুনিয়া ব্যথিত ও আনন্দিত হইল। এইবার যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিব,—এই দুঃখিনী ও তাহার সন্তানের উপকার করিব। কিন্তু হায়, বেগম সন্ন্যাসিনীর আগমন বার্ত্তা শুনিবা মাত্র কন্যাকে লইয়া ভগবানগোলা ত্যাগ করিয়া পলাইল। সে শুনিয়াছিল যে এই সন্ন্যাসিনীই তাহার সিরাজকে ধরাইয়া দিয়াছে। অসামান্যা পরদিবস বেগমের পলায়ন সংবাদ শুনিল, শুনিয়া বড় দুঃখিত হইল প্রতিজ্ঞা করিল যেমন করিয়া পারি, ইহাদের উপকার করিব। বেগমের অনুসন্ধানে সে সেই দিবসই যাত্রা করিল। তাহাদিগকে ভাগলপুর, পাটনা, কাশী, গাজিপুর ইত্যাদি নানা স্থানে পাইল, কিন্তু সে যেই সেই সেই স্থানে উপস্থিত হয়, অমনি বেগম তাহার কন্যা লইয়া তথা হইতে পলায়ন করে। অসামান্যা সাত বৎসর বেগমের পশ্চাৎ থাকিয়াও একদিনের জন্যও তাহার সহিত কথা কহিয়া তাহার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতে পারিল না। গাজিপুর হইতে বেগম নৌকা যোগে চট্টগ্রাম চলিল; তথায় তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। অসামান্যাও পদব্রজে পদ্মার কূলে কূলে তাহাদের অনুসরণ করিল ফরিদপুরের নিকট আসিয়া ঝড় উঠিল,- সেই ঝড়ে বেগমের নৌকা ডুবিল; নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়া অনেক কষ্টে অসামান্যা লুৎবাহারকে বাঁচাইল; বেগমকে পাইল না, তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে পাঠক তাহা অবগত আছেন।

৺ধীরেন্দ্রনাথ পাল।

যাদুকর।

১

বিলাত হইতে খনিজতত্ত্বাভিজ্ঞ (Mining Engineer) হইয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার পর 'সিংহ পরিবারের' আর কোনও উদ্দেশ মি'লল না। আমার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিন বৎসর ধরিয়া প্রবাসে, যে 'সাজানো বাগান' খানির ভাবি কল্পনা-সৌন্দর্য্যে অহোরাত্রি মুগ্ধের ন্যায় কাটাইতেছিলাম—আজি সহসা নিদ্রাভঙ্গে যেন একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সে সমস্ত ছারখার করিয়া বালুকাস্তূপে মরুপ্রান্তরে পরিণত করিয়া দিয়া গেল।

সিংহ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত 'খনিজ-তত্ত্বাবিষ্কারক কোম্পানী'তে ছুটিলাম। তথাকার কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেবকে লিখিত, সিংহ সাহেবের শেষ পত্রে অবগত হইলাম তাঁহার সৈন্যদল কাবুল হইতে মিশরাভিমুখে অভিযান করিয়াছে। মিশর সীমান্তে স্বর্ণখনির অস্তিত্ব সিংহ সাহেবের প্রতীতি। অবিলম্বে একজন 'মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারকে উপযুক্ত সাজসরঞ্জামাদি সহ তথায় প্রেরণ করিতে হইবে।

এ সুযোগ—ঈশ্বরদত্ত প্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ করিলাম। অধ্যক্ষ সাহেবকে পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক আমার কৃতিত্বের নিদর্শন দেখাইয়া মিশর গমনের অভিপ্রায় জানাইলে, তিনি সাদরে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে আমার মিশর যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অন্য লোক প্রেরণাপেক্ষা আমার গমনে সিংহ সাহেব যে অধিকতর প্রীত হইবেন—একথা তিনি স্পষ্টাক্ষরেই কহিলেন।

কোম্পানী হইতে, খনি আবিষ্কারের উপযোগী, বিস্তর দ্রব্য সম্ভার—সাজ সরঞ্জাম—ও অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত হইয়া এবং গবর্ণমেণ্টের আদেশ ও ছাড়পত্র সঙ্গে লইয়া, তিন দিন পরে আমি মিশর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

তখন আমার প্রাণের ভিতর, ঝটিকা সংক্ষুব্ধ সাগরের অশ্রান্ত তরঙ্গ ছুটিতেছিল।

২

চৌরঙ্গীতে আমাদের পার্শ্বের বাটীতেই সিংহ সাহেব যখন তিন বৎসরের ছুটী লইয়া আসিয়া বাস করেন, সেই সময়েই তাঁহার একমাত্র মাতৃহীনা দুহিতা 'কমলা'র সহিত আমার পরিচয় ঘটে, আমি সেই সবে ইঞ্জিনিয়ারীং কালেজের তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষান্তে, বন্ধে বাটিতে আসিয়াছিলাম। সহসা একদিন শরতের বিমল

প্রভাতে যেন কোন স্বপ্নদেশের অনাবিল নগ্ন জ্যোৎস্নারাশি মূর্ত্তিমতী হইয়া—স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের অপার্থিব স্নেহ ধারায় চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া—আমার মুগ্ধ নেত্রের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। আমি মোহাবিষ্টের ন্যায় চাহিয়া চাহিয়া, বিহ্বল প্রাণে কমলার প্রতি আকৃষ্ট হইলাম।

পিতার অনুমতিক্রমে সেই হইতে কমলা আমার নিকট পাঠাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। সিংহ সাহেব পলটনের বড় ডাক্তার, কমলা তাঁহার একমাত্র সন্তান। শৈশবেই মাতৃহীনা হইয়া পিতার নয়নপুত্তলি। অগাধ স্নেহে পিতৃ অঙ্কেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সিংহ সাহেব আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। নয়নানন্দদায়িনী আত্মজাকেই সংসারের একমাত্র অবলম্বন করিয়া—কর্ম্মস্থানে—নানা দূর বিদেশে ঘুরিয়া কাটাইতেছিলেন। কিন্তু কমলা এক্ষণে বড় হইতে চলিল—আর সেরূপে রাখিলে চলে না। তাই মনোমত পাত্রে অর্পণ করিয়া তাহার সংসার পাতিয়া দিবার জন্য, তিন বৎসরের অবকাশ গ্রহণ করিয়া সিংহ সাহেব কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন।

আমার পিতা ব্যারিষ্টার হবার জন্য যখন বিলাতে ছিলেন, সিংহ সাহেবও তখন তথায় ডাক্তারী পড়িতেছিলেন। সেইখানেই দুটি প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানের আলাপ পরিচয়ে বন্ধুত্ব ডোর দৃঢ় বদ্ধ হয়। তারপর বিশাল জগতের উদ্দাম কর্ম্ম-প্রবাহে দুইজনকে দুই দিকে লইয়া ফেলিল; এতদিন দেখা সাক্ষাৎ দূরের কথা পত্রাদির আদান প্রদান পর্য্যন্ত ছিল না। বহুদিন পরে আজি অদৃষ্ট প্রবাহ সেই দুইজনের কলিকাতায় পুনর্ম্মিলনে সেই রজ্জু আবার নবীন বলে দুইজনকে বাঁধিয়া ফেলিল।

৩

বাল্যাবধি পিতার সহিত বিদেশে বিদেশে, পলটনে, সাহেব বিবিদের সঙ্গে থাকিয়া, কমলার ইংরাজী শিক্ষা যথেষ্ট হইয়াছিল। বস্তুতই কমলার মুখে ইংরাজী ভাষায় অনর্গল কথাবার্ত্তা শুনিলে, অপরিচিত কেহ, তাহাকে বঙ্গ-ললনা বলিয়া বিশ্বাস করিতেই পারিত না। সে পিতার অনুমতিক্রমে আমার নিকট বাঙ্গালা পড়িতে আরম্ভ করিল।

ভগবানের কেমন বিচিত্র বিধান—আমাদের দুইটি হৃদয় নীরবে গোপনে আমাদের অজ্ঞাতসারে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও বাহিরে সেটা চাপা রহিল না। যেন কোন অজ্ঞাত রাজ্যের সুপ্ত বায়ু অন্ধকারের আবরণ ঠেলিয়া, ঊষার প্রথমালোকের সঙ্গে সঙ্গে জগতময় সে কথা প্রচার করিয়া দিয়া

গেল। আমাদের উভয়েরই অভিভাবকগণ কে জানে কেমন করিয়া—আমাদের অনুরাগের কথা জানিতে পারিলেন। তাঁহারা আনন্দে আমাদের পরিণয়ের কথাবার্ত্তা নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিলেন।

সিংহ সাহেব পলটনে ডাক্তারী করিলেও, নানা বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। বিশেষতঃ খনিজতত্ত্ব আবিষ্কারে তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা পরিলক্ষিত হইত। কর্ম্মোপলক্ষে ভারতের নানা সীমান্ত প্রদেশ সমূহে পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল—উপযুক্ত খনিজাভিজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা করাইলে কোন কোন স্থানে স্বর্ণখনি পাওয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে অবকাশকালে কলিকাতায় স্বীয় অর্থ ও চেষ্টাবলে আমার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি খনি আবিষ্কারের জন্য একটি কোম্পানী গঠিত করিলেন। এই তিন বৎসরের ছুটী ফুরাইলে শীঘ্রই তিনি পেন্সন লইয়া আসিয়া তাঁহার কোম্পানী লইয়া বসিবেন—এইরূপই তাঁহার মনস্থ ছিল।

৪

কমলার ও আমার উদ্বাহের সমস্ত কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলেও, তখন বিবাহ বন্ধ রহিল। সিংহ সাহেবের ইচ্ছাক্রমে, খনিজতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া 'মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার' হইবার জন্য, আমাকে বিলাতে যাইতে হইল। বিলাত হইতে পাঠ শেষ করিয়া প্রত্যাগমনের পরে আমাদের বিবাহ হইবে।

বিলাত গমনের কথা শুনিয়া, আমার চতুর্দ্দিকে দিবালোক যেন মসীময় হইয়া উঠিল। কমলাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে—কি যেন একটা ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় আমার প্রাণের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল।

আমার নিভৃত কক্ষমধ্যে চক্ষু জলে ভাসিয়া, যখন উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় লইলাম, তখন কমলা সহসা আপন অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরি উন্মোচন করিয়া, আমার অঙ্গুলিতে পরাইতে পরাইতে বলিল—

"লজ্জায় কখনো ভাল করিয়া তোমার মুখ পানে চাহিতে পারি নাই। জীবনে অদ্য প্রথম তোমার কর গ্রহণ করিয়া এই অঙ্গুরীয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিলাম। লোকাচারসিদ্ধ না হইলেও—তুমিই আমার স্বামী। মনে রাখিও তুমি তোমার ধর্ম্মপত্নী রাখিয়া চলিলে। বিদেশে, সহস্র প্রলোভনের মধ্যে মাঝে মাঝে ঐ অঙ্গুরীয় পানে চাহিও। আমি তোমার আশাতেই প্রাণ ধরিয়া থাকিব। আমাদের আবার দেখা হইবে—তোমাকে আর একবার না দেখিয়া আমার মৃত্যু হইবে না।

সকলের নিকটে বিদায় লইয়া যখন আসিয়া রেলে বসিলাম—তখনও কমলার প্রতি কথা যেন আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল।

* * * * * *

পত্রগত প্রাণ লইয়া দুই বৎসরাধিক বিলাতে কাটাইবার পর সহসা একদিন কমলার এক পত্রে আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। সিংহ সাহেবের ছুটি ফুরাইবার তখনও পাঁচ ছয় মাস বিলম্ব ছিল। কিন্তু হঠাৎ সীমান্ত প্রদেশে অশান্তি উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার সৈন্যদল তথায় গমনের জন্য আদিষ্ট হইয়াছিল, এবং ছুটি সত্ত্বেও সিংহ সাহেবের প্রতি তাহাদের সঙ্গে যোগদানের আদেশ আসিয়াছে। কমলাও পিতার সহিত যাইবে।

তখনও আমার পরীক্ষার ফল বাহির হইবার অল্পই বিলম্ব ছিল। আমি অতি কষ্টে কমলার দ্বিতীয় পত্রের অপেক্ষায় এবং পরীক্ষার ফলের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সেই কমলার শেষ পত্র—আর কোন পত্রাদি পাইলাম না। পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আমি উত্তীর্ণ হইয়াছি জানিয়াই, আর কালক্ষেপ না করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

* * * * * *

পিতামাতা যখন শুনিলেন দেশে ফিরিয়াই আমি খনিজ তত্ত্বাবিষ্কারী কোম্পানীর চাকরি লইয়া মিশর প্রান্তে যাইতেছি—তখন তাঁহারা প্রথমে আপত্তি করিলেন। তাঁহাদের নিকট আমার মনের কথা খুলিয়া বলার পর—আমার নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া—তাঁহারা আর নিষেধ করিতে পারিলেন না। সকলেই জানিল—আমি বিলাত হইতে পাশ করিয়া আসিয়াই দূর বিদেশে চাকরি করিতে যাইতেছি। কিন্তু আমি যে কি উদ্দেশ্যে, কি চাকরি করিতে মিশর যাত্রা করিলাম, তাহা পিতা মাতা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলাম না।

৫

মিশর প্রান্তে পৌঁছিয়া, তথাকার প্রতিনিধির প্রমুখাৎ যখন অবগত হইলাম—যে তথাকার উপদ্রব শান্ত হওয়ায় সিংহ সাহেবের 'ল্যান্সার' সৈন্যদল কাবুলাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে কিন্তু হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া সিংহ সাহেব আর ইহ জগতে নাই, এবং তাঁহার কন্যারও তদবধি আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই—তখন বায়ুবিতাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় আমার মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল, পদতল হইতে যেন মেদিনী অন্তর্হিত হইয়া—কোন্ অতলে লুকায়িত হইল।

বহুকষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিলাম। সিংহ সাহেবের মৃত্যুর পর প্রায় পক্ষাধিক কাল 'ল্যান্সার সৈন্যদল সেইখানেই ছিল। মিস্ কমলা পিতার সহিত সেই পলটনেই ছিলেন। তাঁহার পিতৃবিয়োগের তিন চারিদিন পরে, একদিন রজনীযোগে তিনি যে সহসা কোথায় অন্তর্হিতা হইয়াছেন এ পর্য্যন্ত আর তাঁহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই।

আমার মনের ভিতর তখন যে কি হইতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু— কে জানে—কেন—মিশর ছাড়িয়া যাইতে কিছুতেই প্রাণ চাহিল না। আমি তথায় কতিপয় স্থানীয় লোক ও একজন দোভাষী নিযুক্ত করিয়া, সমস্ত আস-বাবাদি লইয়া, তাহাদের সহিত মিশরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চাহিলাম।

নানা বনজঙ্গল, পাহাড়, উপত্যকা গিরনদী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া অষ্টম দিনের সন্ধ্যায় যেখানে আসিয়া আমরা তাঁবু ফেলিলাম—সেটা একটা ক্ষুদ্র গ্রামের প্রান্ত সীমা। দূরে উত্তর ও পূর্ব্বদিক প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টন করিয়া অনতি উচ্চ শৈলশ্রেণী বিরাজ করিতেছিল। তথা হইতে নির্গত হইয়া, একটী শীর্ণকায়া স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরণী, গিরিপাদদেশ ধৌত করিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রামখানির দুই প্রান্তঃসীমা ঘিরিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তাহারই তীরে—গ্রাম হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটী বিস্তৃত খর্জ্জুর কুঞ্জের তলদেশে আমরা তাঁবু ফেলিলাম।

নদীর পরপারে কিছুদূরে প্রান্তরের মধ্যে, একটি নাতিবৃহৎ শৈলস্তূপ নীরব প্রহরীর মত—আপন গৌরবে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া ছিল। সন্ধ্যার ধূম্রালোকে —অর্দ্ধক্রোশ দূরের গ্রাম্য গৃহগুলি ধূমাচ্ছন্ন শৈলস্তূপের মতই প্রতীয়মান হইতেছিল।

সন্ধ্যার পরেই তাঁবুর সম্মুখে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, আমার লোকজনেরা রন্ধনাদি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। অল্প দূরে একখানা আরাম কেদারায়, অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় শ্রান্ত দেহ ঢালিয়া, আমি চুরুট টানিতে টানিতে আমার অস্থনি-হিত সহস্র চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। সহসা অনতিদূরে পেচকের কর্কশ কণ্ঠের বিকট চীৎকারে চমকিয়া দেখিলাম কতকগুলি কৃষ্ণকায় গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া আমাদের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশে পরস্পর কি যুক্তি করিতেছে। ক্ষণপরেই আপাদমস্তক শ্বেত বস্ত্রাবৃত কতকগুলি রমণী, নদী হইতে বারিপূর্ণ কলসী লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল। তাহাদিগকে অগ্রগামিনী করিয়া পুরুষেরা পশ্চাৎ চলিল। গমনকালে বারম্বার আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিতে লাগিল।

অসচ্ছ চন্দ্রকরে তন্মধ্যস্থ এক দীর্ঘকায়া রমণীর প্রতি সহসা আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। তাহার হস্তে কলসী বা অন্য কিছু ছিল না। আমার মনে হইল—রমণী যেন ত্রাস্তে বার দুই তাহার মস্তকাবরণ উন্মোচন করিয়া আমাদের দিকে চাহিতে চাহিল, তারপরে যেন কি লুকিতে লুকিতে চলিয়া গেল। দূরত্ব ও চন্দ্রালোকের অস্বচ্ছতা নিবন্ধন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—কিন্তু প্রাণের ভিতর যেন কেমন দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

আমাদের তাঁবু ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের আগমন যে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল—তাহা প্রভাতের পূর্ব্বে আমি জানিতে পারি নাই! প্রভাতে গ্রাম প্রদক্ষিণ মানসে বাহির হইলাম। গত সন্ধ্যায় গ্রাম্য লোকগণ যে স্থানে দাঁড়াইয়া, আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যুক্তি করিয়াছিল সেইখানে আসিলে—সহসা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ছিন্ন ভূর্জ্জপত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। আন্মনে তাহার এক টুকরা তুলিয়া দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। লেখা—ইংরাজী হস্তাক্ষর যেন পরিচিত! কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া সকলগুলি কুড়াইয়া এক করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলাম। যদি কেহ ইংরাজ আসিয়া থাকেন—আমাকে রক্ষা করুণ—ঈশ্বরের দোহাই।"

আর যে কি লেখাছিল—জানিতে পারিলাম না। পত্রের অন্যান্য ছিন্ন অংশ মিলিল না। এদেশে ইংরাজী ভাষায় কে এমন পত্র লিখিল? পত্রখানি এত ত্রাস্তে ও কলমাভাবে বোধহয় কোনরূপ শলাকা দিয়া লিখিত, সে হস্তাক্ষর পরিচিত বোধ হইলেও—বিশেষ চেষ্টাতেও চিনতে পারিলাম না। কিন্তু অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম। তবে কি কোন ইংরাজ মহিলা এদেশে বন্দিনী হইয়া রহিয়াছেন? ইংরাজ শিবির হইতে কমলার সহসা অন্তর্ধ্যানের কথা মনে পড়িল? তবে কি পাষণ্ডেরা কমলাকে অতর্কিত অবস্থায় হরণ করিয়া আনিয়া এখানে রাখিয়াছে?

প্রাণের ভিতর প্রলয়ের ঝটিকা বহিল। কি উপায়ে অনুসন্ধান করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকাও অসম্ভব। অথচ বিপদে অধৈর্য্য হইয়া হঠাৎ কোন কার্য্য করিলেও—কে জানে—হয়ত বা সকল দিক নষ্ট হইবে।

নানারূপ চিন্তা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের ব্যপদেশে—অনুসন্ধানের নিমিত্ত—দোভাষীর সঙ্গে আমার কতিপয় অনুচরকে গ্রামে প্রেরণ করিলাম।

অনুসন্ধান পাওয়া দূরের কথা—আমার লোকজন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যাহা কহিল, শুনিয়া আমার চক্ষুস্থির হইল।

সেইদিন প্রভাতেই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি 'মোড়লের' গৃহে সমুদায় গ্রাম্য লোক একত্রিত হইয়া স্থির করিয়াছে—আমাদিগকে কেহ কোনও প্রকার খাদ্য দ্রব্য বা কোন কিছু বিক্রয় করিবে না। বিক্রয় করিলে মোড়ল তাহার গৃহ ভূমিসাৎ করিয়া গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। আমি কাফের, সদলবলে অনধিকারে তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিয়াছি—অবশ্যই কোন দুরভিসন্ধি আছে। খাদ্যদ্রব্য না মিলিলে বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ইংরাজ সৈন্য যে ছাউনি তুলিয়া তাহাদের সীমান্ত দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছিল তাহা বোধহয় তাহারা অবগত ছিল না। নচেৎ সম্ভবতঃ বল প্রয়োগেও দ্বিধা করিত না।

দোভাষীর প্রমুখাৎ গ্রাম্য লোকের সিদ্ধান্ত শুনিয়া আমি বিপদ গণিলাম। ফিরিয়া যাইব? তাহা হইতেই পারে না। কে বিপদে পড়িয়া আমার উদ্দেশে ওরূপ পত্র লিখিয়াছে—তাহার সন্ধান না লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন—অসম্ভব। ইহাতে প্রাণ যায় ক্ষতি নাই।

৭

আরও তিন দিন কাটিল। এদিকে তাঁবুতে খাদ্যদ্রব্যের অনাটন হইতে চলিল। প্রথম দিন গ্রামের লোকের নিকট খাদ্যদ্রব্যের বিক্রয় নিষেধ শুনিয়া আমার লোকজনের অন্তরে আমার প্রতি যে ক্রমশঃ শ্রদ্ধাহীনতা ও বিদ্বেষ স্থান পাইতেছিল তাহা আমি এ কয়দিন বুঝিতে পারি নাই। সেই হইতে এই তিন দিন আমার অনুচরগণের মধ্যে দুই চারি জন মোড়লকে বুঝাইবার উপলক্ষে প্রত্যহই গ্রামে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের মনে যে কোন অসৎ উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল, তাহা আমি সন্দেহ করিতে পারি নাই।

অদ্য প্রাতঃকাল হইতে সকলকেই স্ব স্ব কার্য্যে অমনোযোগী ও কিঞ্চিৎ রূঢ় ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হইল। দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম অনুচরেরা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে। তাঁবুতে খাদ্যদ্রব্যের অনাটন

হইতেছে—কিন্তু গ্রামের কেহ আমাকে কিছুই বিক্রয় করিবে না। তাহারা কি শেষে না খাইয়া মরিবে? আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে তাহারা গ্রামে আহার্য্য পাইবে—আমার সহিত থাকিলে অনাহারে মরিতে হইবে; এই ভয়ে সকলেই ভীত হইয়াছে। সেই দিনই তাঁবু খুলিয়া প্রত্যাগমনের জন্য সকলেই আমাকে অনুরোধ করিল, নচেৎ তাহারা সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে চলিয়া যাইবে।

দেখিলাম—ভয়ের কথা বটে, কিন্তু উপায় কি? শেষে কি বিফল মনোরথে ফিরিয়া যাইতে হইবে? সকলকে বুঝাইলাম—আমি খাদ্য সংগ্রহ করিতেছি—কাহারও ভীত হইবার কারণ নাই। স্বয়ং সশস্ত্রে মোড়লের সহিত সাক্ষাতে চলিলাম।

একজন সশস্ত্র সাহেবকে যে একটা গ্রাম্য মোড়লের নিকট মূল্য দিয়া খাদ্যদ্রব্য কিনিতে গিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে, সেটা প্রথমে ভাবি নাই।

শেষ যখন মোড়ল কিছুতেই স্বীকার করিল না, তখন কহিলাম—"তবে কি তোমাদের দেশে আসিয়া মূল্য দিয়াও খাদ্যাভাবে মরিতে হইবে?"

তদুত্তরে সে গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—

"আল্লার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।"

আর বাকবিতণ্ডা বৃথা। এতদ্দেশবাসী কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ঐরূপই উত্তর দিয়া থাকে। ক্ষুণ্ণমনে তাঁবুতে প্রত্যাগমনের জন্য যেমন উঠিলাম—মোড়লের অন্দর হইতে যেন কাহার সজোর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ সহসা কর্ণে গেল—কিন্তু আর অনুসন্ধানের অবসর পাইলাম না।

তাঁবুতে আসিবার পথ—মোড়লের অন্দরের প্রান্তদেশ দিয়া বাঁকিয়া গিয়াছিল। সেই বাঁকের মাথায় আসিলেই, অন্দরের দিক হইতে সহসা একটা ঢিল আসিয়া আমার পায়ের কাছে পড়িল। কিন্তু মোড়ল ও তাহার লোকজন তীব্র দৃষ্টিতে আমার পশ্চাতে চাহিয়াছিল বলিয়া আমি তাহা তুলিয়া লইতে বা ফিরিয়া দেখিতে সাহস করিলাম না।

ক্ষণপরেই মোড়লের কঠোর ক্রোধ কম্পিতস্বরে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মোড়ল তীব্রকণ্ঠে কাহাকে শাসন করিতেছিল।

৮

সেইদিন সন্ধ্যার পর তাঁবুর সম্মুখে একাকী বসিয়া ভবিষ্যতের জন্য যুক্তি নিরূপণ করিতেছিলাম। আমার প্রতি আমার অনুচরগণের যা কিছু ভয় ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল, প্রাতে মোড়লের নিকট হইতে ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। একজন সাহেব ও তাহাদের মধ্যে আর কিছুমাত্র যেন ইতর বিশেষ ছিল না। তখন যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহারা আমাকে আক্রমণ করিতে পারে। শীঘ্রই কোন একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, নচেৎ আমার নিজের জীবন বিপন্ন হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

আজি সারাদিন অনুচরগণের মধ্যে বিশেষ একটু ভাববৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু সাহস করিয়া কোনরূপ হুকুম করিতে পারিলাম না—যদি না শোনে! তার উপর আর দুই একদিন মধ্যে প্রকৃতই খাদ্যাভাব ঘটিবে। চারিদিকে ভাবনার অকূল পাথার!

যে কোন উপায়েই হউক ভীতি উৎপাদন করাইয়া এ দেশবাসীকে বাধ্য করিতে হইবে। নচেৎ ইহারা বশ মানিবে না। অনেক চিন্তা করিয়া,—এ দেশবাসীর স্বভাবসিদ্ধ কুসংস্কারকে অবলম্বন করিয়া, ইহাদিগকে বশ করিবার এক মতলব স্থির করিলাম।

আমি তাঁবুর সম্মুখে একটা চৌকীর উপরে বসিয়াছিলাম। একটা মোটা কম্বল আমার পায়ের কাছে পড়িয়াছিল। আমার সম্মুখে একটা লৌহ কটাহে অগ্নি জ্বলিতেছিল। অনুচরগণ আজি আর কেহ আমার নিকটে ছিল না। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় প্রাণের ভিতর যেন শিহরিয়া উঠিতেছিল।

আমার পশ্চাদ্দিকে—তাঁবুর পার্শ্বে একটা চারা খর্জ্জুরের ঝোপ ছিল—তাহার পরেই অনুচরদিগের থাকিবার তাঁবু! হঠাৎ সেই ঝোপটার ভিতর মানুষের সচকিত সাবধান পদক্ষেপের মত কি খস্ খস্ শব্দ হইল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম—পিস্তলের অগ্রভাগের মত কি যেন একটা চক্ চক্ করিয়া উঠিল। তখন মনে পড়িল আমার গুলিভরা পিস্তল—তাঁবুর মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছি, অন্যমনস্কে সেটা সরাইয়া রাখি নাই। নিমেষে সমস্ত ব্যাপার যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিফলিত হইল।

উপায়ান্তর না পাইয়া, নিমেষ মধ্যে পায়ের নিকট হইতে মোটা কম্বলখানা লইয়া আগুনের কড়ার উপর ফেলিয়া দিলাম, সহসা চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমিও উপুড় হইয়া লম্বাভাবে মাটির উপর শুইয়া পড়িলাম। আর ঠিক তন্মুহুর্ত্তেই "গুড়ুম" "গুড়ুম" করিয়া দুইবার আওয়াজ হইল। দুইটা রক্তবর্ণ গুলি নক্ষত্রের মত আমার উপর দিয়া চলিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই, একটা লোক সেই ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, দৌড়িয়া যেমন আমার নিকট দিয়া চলিয়া যাইবে, আমি সজোরে তাহার পদদ্বয়ে আঘাত করিলাম,—সে বিষম হোঁচট খাইয়া সটান উপুড়ভাবে আমার সম্মুখে পড়িয়া গেল, হস্ত হইতে পিস্তল খসিয়া গেল। আমি চকিতে পিস্তলটি কুড়াইয়া লইয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিয়া সজোরে পিস্তলের হাতল দিয়া, তাহার স্কন্ধদেশে আঘাত করিলাম- সে মূর্চ্ছিত হইয়াছে বোধ হইল।

তখন পশ্চাতে ঝোপের নিকট আরও কতকগুলি পদশব্দ শুনা গেল। আমি তখন সেইদিকে পিস্তল লক্ষ্য করিয়া—অগ্নি হইতে কম্বলখানি টানিয়া ফেলিয়া দিলাম, তখনি চতুর্দ্দিক আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আমার অনুচরেরা সকলেই ঝোপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উজ্জ্বল আলোকে—আমার ভীষণ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

৯

কুলিশ-কঠোর স্বরে, ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে, সকলে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল—তাহাদের কোন দোষ নাই। তাহারা কিছুতেই প্রভুহত্যা, সাহেব হত্যা করিতে স্বীকার করে নাই। কিন্তু ঐ ব্যক্তি, এই জন্ত গ্রাম্য মোড়লের সঙ্গে মিশিয়া, তাহাদিগকে বিষম শাস্তি দিবে বলায়—তাহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি দিয়াছিল; কিন্তু তাহারা অগ্রণী হয় নাই—পশ্চাতে ছিল। তাহারা জানিত গুলিতে সাহেবের কিছুই হইবে না—সাহেবকে কেহ মারিতে পারে না—সাহেবরা যাদু জানে।

আমি কহিলাম—সে কথা সত্য। পৃথিবীতে কেহই সাহেবকে মারিতে পারে না। তাহার প্রমাণ দেখ, দুইটা গুলি লাগিয়াও আমার কিছুই হয় নাই। কিন্তু যে আমাকে মারিতে চাহিয়াছিল—তাহার দশা দেখ। যে কেহ আমার অনিষ্ট করিতে চাহিবে তাহারই ঐ দশা হইবে—সাবধান; আমি মনে করিলেই, এখনি উহাকে মারিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু কুকুর

মারিয়া কি হইবে? উহাকে মারিব না। উহাকে ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাও—যেন না পালাতে পারে—তোমরাও গিয়া শোও—সকালে বিচার করিব। খবরদার কেহ তাঁবুর বাহিরে থাকিও না, সাবধান।"

সকলে মিলিয়া হতভাগ্যকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। কোনরূপ দৈবশক্তির অধিকারী ভাবিয়া, সকলে আমার পানে চাহিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে ছিল। ভয়ে তাহাদের মুখমণ্ডলে রক্তহীনতার শ্বেতাভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

* * * * * *

আর এরূপ নিশ্চিন্তে থাকিলে চলে না, একটা কোন উপায় করা চাই। জগদীশ্বরের কৃপায় আজি ত প্রাণ যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

সকলেই চলিয়া গেলে—যখন পরীক্ষায় বুঝিলাম কোথাও কেহ লুক্কাইত নাই, তখন প্রস্তর খননোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র, ডাইনামাইট ও একটী বৈদ্যুতিক 'ব্যাটারী' লইয়া নদীর পরপারে নির্জ্জন শৈলস্তূপের নিকট চলিলাম। নদীতে জল সামান্যই ছিল—পার হইতে কষ্ট হইল না।

সমস্ত রাত্রি ব্যাপী অকাতর পরিশ্রমে সেই শৈল স্তূপের পাদদেশের চতুর্দ্দিকে পাঁচ সাতটী গর্ত্ত করিয়া 'ডাইনামাইট' বসাইয়া যখন 'ব্যাটারী' সংযোগ করিয়া দিলাম তখন পূর্ব্বাকাশে সবেমাত্র শুকতারা জল্ জল্ করিতেছিল। ব্যাটারী সংলগ্ন তার সাবধানে ঘাসের নীচে ও লতা গুল্মে লুক্কায়িত করিয়া নদীর কিছুদূরে একটা ভগ্ন মৃত্তিকাস্তূপের ভিতর ব্যাটারী লুক্কায়িত করিয়া স্থান নির্দ্দেশের চিহ্ন রাখিয়া শ্রান্ত কলেবরে তাঁবুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

যে কৌশলের উপর নির্ভর করিয়া বুকে আশা বাঁধিয়া ছিলাম—তাহা সফল হইলে কল্য প্রভাত হইতেই আমার সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—নচেৎ এই দূর বিদেশে এক নিষ্ঠুর জাতির হস্তে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইবে।

১০

প্রভাতে উঠিয়া, দোভাষীর দ্বারা মোড়ল সহ গ্রাম্য লোক সকলকে বিশেষ কার্য্য ব্যপদেশে আমার তাঁবুতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম। কল্য রাত্রির ঘটনা হইতে আমার অনুচরগণের মনে—আমার প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। সকলেই যেন কেমন এক প্রকার সচকিত ভীত ভাবে আমার পানে ঘন ঘন চাহিতেছিল।

অল্প বেলা হইতেই বিস্তর গ্রামবাসী সমভিব্যাহারে মোড়ল আমার তাঁবুতে আসিলে, তাঁবুর সম্মুখে সকলকে বসিতে বলিয়া মোড়লকে একখানি চৌকি প্রদান পূর্ব্বক, আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম, "তোমাদের দেশের রীতি কি জানি না। কিন্তু আমাদের দেশে কোন বিদেশী আগমন করিলে—সকলে যথাসাধ্য তাহার সাহায্য করিয়া থাকে।"

মোড়ল গম্ভীর স্বরে বলিল, "কাফেরের সঙ্গে সে নীতি খাটেনা—আমাদের শাস্ত্র বিরুদ্ধ।"

আমি বলিলাম, "শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে—তোমাদের অজ্ঞতা বিরুদ্ধ। ভাল, সাহেব লোক কখনও কাহারও কোন অনিষ্ট করিয়াছে—শুনিয়াছ কি? তাহারা যে সকল দ্রব্য লইতে চাহে, তাহার পরিবর্ত্তে প্রচুর অর্থ দিয়া থাকে। তোমাদের নিজ দেশে বিক্রয় করিয়া তাহার সিকি মূল্যও পাও না। তথাপি আমাকে তোমরা দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিতে চাহ না কেন?"

ঈষৎ রাগত ভাবে—উত্তেজিত স্বরে মোড়ল কহিল, "তুমি কাহার আদেশে অনধিকারে আমাদের দেশে আসিয়াছ? শাস্ত্রে আছে—দেশে কাফের আসিলে মারিভয়, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানা উপদ্রব উপস্থিত হয়। তুমি শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও—নতুবা খাইবার জন্য একখানা রুটিও পাইবে না।"

আমি কহিলাম, "ভাল আমি চলিয়া যাইব, এখানে বাস করিতে আসি নাই; কিন্তু আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমরা ত কাফেরকে দূর করিতে চাও—ইহা দেশের রীতি! কিন্তু তোমাদের দেশে কোন চাকর মনিবকে মারিতে চাহিলে—সেটাও কি দেশাচার সম্মত?"

"সাধ্য কি? চাকর—গোলাম—কুকুর—পায়ের নিচেই থাকিবে।"

"ভাল, যদি কোন চাকর এরূপ ব্যবহার করে তাহার শাস্তি কি?"

"প্রাণদণ্ড। ভূমিতে অর্দ্ধেক প্রোথিত করিয়া, কুকুর দিয়া খাওয়াইয়া—প্রাণদণ্ড।"

তখন আমার আদেশে বদ্ধহস্ত সেই ব্যক্তি সম্মুখে আনীত হইলে, তাহাকে দেখাইয়া আমি বলিলাম, "এই ব্যক্তি আমার চাকর—কুকুর। কল্য রাত্রে আমার প্রাণ বধে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু শোন কেহই সাহেব লোককে মারিতে পারে না। এ ব্যক্তি দুই গুলি মারিয়াছিল, গুলি আমার গায়ে লাগিবা মাত্রেই চূর্ণ হইয়া জল হইয়া গেল—অথচ আমার আদেশে এ ব্যক্তির কি দশা হইয়াছে—

চাক্ষুস দেখ। সাহেব লোকের কেহ অনিষ্ট করিতে পারে না। কেহ অনিষ্ট করিবার মতলব করিলে সাহেবরা তাহা পূর্ব্বেই জানিতে পারে। জিন্ তাহাদের বশীভূত, বজ্র তাহাদের হুকুম মানে—বিদ্যুৎ তাহাদের আজ্ঞায় ফিরে—ভূমিকম্প তাহাদের চক্ষুর নিমিষে দেশ গ্রাম চূর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু সাহেব লোক দয়ালু তাহারা পরের অনিষ্ট করে না। কেহ করিলে তাহাকে মার্জ্জনা করে। সে মনে করিলে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে—মার্জ্জনাই তাহার মহত্ত্ব। মনে করিলে ও হতভাগ্যকে এখনি মারিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু না—মার্জ্জনা করিলাম। আমি দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাহিলেও তোমরা আমাকে খণ্ডদ্রব্য বিক্রয় করিতে স্বীকার করিতেছ না—কিন্তু সাবধান, আমি মনে করিলে এখনি—চক্ষের নিমিষে বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত নামাইয়া তোমাদের গ্রাম ছারখার করিতে পারি।"

ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সপ্তমে গলা তুলিয়া এমন অঙ্গভঙ্গির সহিত কথাগুলি বলিলাম—বোধ হইল—গ্রামবাসী সকলেই আমার বাক্যচ্ছটায় অভিভূত হইয়া গিয়াছে। কেবল চতুরের শিরোমণি, বৃদ্ধ মোড়ল অন্তরে চমকিত হইলেও মুহূর্ত্তে সে ভাব সম্বরণ করিয়া ব্যঙ্গভাবে কহিল, 'সত্য নাকি? এমন ওস্তাদ তুমি! কই বজ্র নামাও দেখি—নহিলে জানিব তুমি জুয়াচোর।"

আমি ভাণ-রাগতস্বরে বলিলাম, "ভাল তাহাই হইবে—তোমরা যেমন পাপী—তোমাদের শিক্ষা প্রয়োজন। এখনই বজ্র নামাইয়া সমস্ত ছারখারে দিতেছি।" পরক্ষণে যেন ঈষৎ লজ্জিত হইয়া, নরম হইয়া বলিলাম, "ছি ছি আমি কি পাগল—তোমার কথায় রাগ করিয়া অমন সুন্দর গ্রামখানিকে রসাতলে দিতে বসিয়াছি? ধিক্ আমায়? আহা কত মাতা পুত্রহারা হইবে, কত স্ত্রী স্বামী হারা—কত ভগ্নী ভ্রাতৃহারা হইবে। কত অসহায় অপোগণ্ড শিশু, কত জরাজীর্ণ স্থবির, কত শক্তিমান যুবক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিতে মিশাইয়া যাইবে। না এ গ্রাম আমাকে আশ্রয় দিয়াছে—ইহার অনিষ্ট করিতে পারিব না। কিন্তু আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করিব।" এই বলিয়া এমন ভাবে ইতঃস্তত চাহিতে লাগিলাম—যে সকলেই বুঝিল—বজ্র নামাইবার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতেছি।

আনমনে ইতঃস্তত চাহিতে চাহিতে—সহসা যেন নদীর পরপারস্থ শৈলস্তূপের প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ায় কহিলাম—ও নির্জ্জন শৈলস্তূপটি কি? মোড়ল উত্তর করিল ওটি গ্রামের নিশানদিহি পবিত্র শৃঙ্গ। কত যুগ যুগান্তর হইতে ওইখানে ওইরূপ ভাবেই যে দাঁড়াইয়া গ্রামের পাহারা দিতেছে তাহা কেহ জানে না। আমরা উহাকে আল্লার চিহ্ন স্বরূপ পূজা করিয়া থাকি। ভাল উহাকে বজ্রাঘাতে

ধ্বংশ কর—তোমার ক্ষমতা বুঝিব, নচেৎ আল্লার চিহ্নের অবমাননাকারীকে আল্লাই উচিতমত শাস্তি দিবেন।"

আমি বলিলাম "ভাল তাহাই হউক।" তখন আমার আদেশ ক্রমে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলে নদী পার হইল, অপরাধী অনুচরের হস্ত পদের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। অপর দুইজন অনুচর তাহার দুই হস্ত ধরিয়া লইয়া চলিল। সে বলির ছাগের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। বোধ হয় ভাবিয়াছিল—বলির জন্য তাহাকে পর্ব্বতশৃঙ্গে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

১১

নদীর পরপারে পৌছিলে, সেইখানে সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, আমি কিছুদূরে একটু অগ্রসর হইলাম। যে ভগ্নমৃত্তিকাস্তূপের মধ্যে আমার 'বাটারী' লুক্কায়িত ছিল, তথায় গিয়া—'ব্যাটারীর' বোতামের উপরে একপদ আলগা ভাবে রাখিয়া, অপর পদ কিঞ্চিৎ পিছাইয়া বুক ফুলাইয়া হাত তুলিয়া, আদেশকারী সৈন্যাধ্যক্ষের ন্যায় দাঁড়াইলাম। যদি 'ব্যাটারী' কার্য্যকারী না হয়! আমারও হৃদয় স্পন্দনশূন্য ছিল না। মোড়ল সহ গ্রামবাসিগণ অবাক হইয়া আমার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল।

স্থান ঠিক করিয়া দাঁড়াইয়া প্রায় দশমিনিট পর্য্যন্ত আমি মাইকেলের 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যখানি,—মন্ত্রচ্ছলে উচ্চৈশ্বরে অঙ্গভঙ্গি সহকারে আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। যে কোন যশস্বী অভিনেতা আমার সে অবস্থা দেখিলে হিংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না।

সপ্তমে উচ্চারিত কণ্ঠে ও উত্তোলিত হস্তে আবৃত্তি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ পদ উত্তোলন করিয়া সজোরে ব্যাটারীর বোতামের উপর আঘাত করিলাম। হরি হরি একি—সব নষ্ট হইল। কিন্তু পরক্ষণেই—ভীষণ ব্যাপার?

সহসা নদীর তলদেশ পর্য্যন্ত—প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল। জল উত্তোলিত হইয়া গ্রামবাসিগণের বস্ত্র ভিজাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক আলোকে সকলের নয়ন বাঁধিয়া গেল—আর সেই মুহূর্ত্তেই শত বজ্র নাদের ন্যায় ভীষণ শব্দে সেই শৈলস্তূপ শূন্যে উত্থিত হইয়া পর মুহূর্ত্তেই খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল।

মৃত্তিকার কম্পনের বেগ সামলাইতে না পারিয়া মাতালের মত আমিও পড়িয়া গিয়াছিলাম। ত্রস্তে আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিলাম।

"গল্প-লহরী"

"ব্যাটারির বোতামে পদাঘাত করামাত্র শৈলস্তূপ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল

নদীতীর জনশূন্য। মোড়লের সহিত গ্রামবাসিগণ সকলেই এবং আমার অনুচরগণও—মহাভয়ে ভীত হইয়া সবেগে গ্রামাভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইতেছিল; পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিবার সাহস পর্য্যন্ত কাহারও ছিল না।

আমার সুবিধা হইল। ব্যাটারী প্রভৃতি দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইয়া আমি তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম।

* * * * * * * *

গ্রামবাসিগণ কি আমার অনুচরগণ সমস্ত দিনের মধ্যে কাহারও দর্শন মিলিল না। বৈকালে তাঁবুর সম্মুখে পায়চারি করিতে করিতে সহসা দেখিলাম, দূরে বহুলোক একত্রিত হইয়া তাঁবুর দিকে আসিতেছে। দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসিয়া দলের সকলেই আভূমি প্রণত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। কেহ কেহ বা লম্বা হইয়া সাষ্টাঙ্গে পতিত রহিল। কিন্তু কেহ আর তথা হইতে একপদও অগ্রসর হইল না। বেশ বুঝা গেল তাহারা অতিশয় ভীত হইয়াছে। আমি চীৎকার করিয়া অভয় দিলে, সকলে নতমস্তকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমার অনু-[illegible]গাও তাহাদের সঙ্গে ছিল।

[illegible]আমার সেই অপরাধী অনুচরকে বন্ধন করিয়া গ্রামবাসিগণ আমার সম্মুখে [illegible]ত করিল। এবং সকলের সাধ্যমত, কেহ আটা, কেহ ঘৃত, কেহ তরকারী, [illegible]হ ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উপঢৌকন দিল।

তদুপরি মোড়লের প্রেরিত কতিপয় অনুচর ও চারিপাঁচ জন স্ত্রীলোক প্রচুর [illegible]মাণে দুগ্ধ, ঘৃত, মিষ্টফল, পায়রা, হাঁস, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে [illegible]ৌকন লইয়া আসিল।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একটি দীর্ঘকায়া রমণীর পানে চাহিয়া আমি চমকিত হইলাম, রমণী পরিচিতা বোধ হইল। মনে পড়িল প্রথমদিন সন্ধ্যার পরে জলবাহী রমণীগণের মধ্যে ইহাকেই অস্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

নয়ন পড়াতে রমণী সহসা আপন ওষ্ঠদ্বয়ে অঙ্গুলি রক্ষাপূর্ব্বক গ্রামের উত্তর সীমান্ত দূর পর্ব্বত প্রাচীরের দিকে চকিতে একবার চাহিল। তারপর প্রণতা হইয়া ধীরে ধীরে সকলের সঙ্গে চলিয়া গেল।

তারপর যতদিন সেখানে ছিলাম। গ্রামবাসিগণের নিকট আমার সমাদরের কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। খাদ্য দ্রব্যেরও কোন অভাব হয় নাই।

[আগামীবারে সমাপ্য]

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী।

অদ্ভুত চুরি।

১

গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর যে ষ্টিমার যায়, সেই ষ্টিমারে একদিন এক মাড়োয়ারী অতি ত্রস্তভাবে আসিয়া উঠিল। ষ্টিমারের নঙ্গড় তোলা হইল, এবং দেখিতে দেখিতে ষ্টিমারখানি হুইসেল্ দিয়া পদ্মা নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। মাড়োয়ারী ষ্টিমারে আসিয়াই রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং যত লোক ষ্টিমারে আছে ও যাহারা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উঠিল প্রত্যেকের বদনের প্রতি উদ্বেগের সহিত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। যখন ষ্টিমারখানি দূরে গেল, তখন একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অতি নিম্নস্বরে বলিল, "আর ভয় নাই।" মেইল্ ষ্টীমার, অতএব সব ষ্টেশনে ধরে না, তথাপি যে যে ষ্টেশনে ধরিল, মাড়োয়ারী সেই সব ষ্টেশন দেখিতে রেলিংয়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তারপাশা ষ্টেশনে ষ্টিমারখানি আসিলেই যাত্রীগণ নৌকাযোগে আসিয়া একখানি বোটে উঠিল, সেই বোট হইতে ষ্টিমারে আসিতে লাগিল। মাড়োয়ারী প্রত্যেক লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল। ষ্টিমারখানি সমস্ত যাত্রী লইয়া ছাড়ে, এমন সময়ে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ষ্টিমারের গায় লাগিল মাড়োয়ারীর তখন মুখ শুষ্ক হইল, সে তাড়াতাড়ি রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া নবাগত লোকটিকে দেখিল। নৌকা হইতে একটি ভদ্রলোক ও তাহার পরিবার উঠিল। তখন মাড়োয়ারীর মনে বড় আনন্দ হইল, সে হাস্যবদনে ডেকের দিকে ফিরিল।

মাড়োয়ারী প্রথম শ্রেণীর আরোহী, একটি কামরা দখল করিয়া আছে। সে কামরায় মাড়োয়ারীর দুটি টিনের বাক্স ও একটা হাত বাক্স এবং শয্যা রহিয়াছে। শয্যার নীচে রিভল্‌ভারের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। মাড়োয়ারীর সহিত এক ভৃত্য আছে, সে তৃতীয় শ্রেণীতে বসিয়া অন্যান্য লোকদিগের সঙ্গে গল্প করিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, আকাশে মেঘসঞ্চার দেখা গেল, মাড়োয়ারী কখনও এত বড় নদী দেখে নাই, তাহাতে আবার মেঘের সঞ্চার দেখিয়া ভয় পাইল। রাত্রিকাল যদি ষ্টীমার ডুবে তবে ত প্রাণ রক্ষার কোন উপায় নাই। সে কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে নিজের পরিচ্ছদ খুলিল ও কোমর হইতে একটি চামড়ার থলিয়া বাহির করিল। চারিদিক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, দ্বারটি বেশ বন্ধ আছে কিনা দেখিল, তারপর আবার নিজ শয্যায় আসিয়া থলিয়ার

মুখ খুলিল। থলিয়ার মধ্যে এক অপূর্ব্ব জিনিস, বৈদ্যুতিক আলোতে ঝল্‌সিয়া উঠিল—পান্নার কটিবন্ধ। ঐ সব প্রস্তর হইতে একটি নীল জ্যোতি যেন কামরা-টিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। মাড়োয়ারী আবার তাড়াতাড়ি উহা থলিয়ার ভিতরে পুরিল, কেহ দেখিল কিনা তাহার ভয় হইল। আবার উঠিয়া দ্বারের নিকট গেল, দেখিল দ্বার বন্ধ। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া আসিয়া আবার শয্যায় উপবেশন করিল। মাড়োয়ারী আর কিছু আহারাদি করিল না, বাহির হইয়া ভৃত্যকে ডাকিল। ভৃত্য আসিলে তাহাকে কামরার বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত করিয়া আবার কক্ষে ফিরিয়া আসিল। একজন খানসামা আসিয়া বলিল, "হুজুর, চা চাই।" মাড়োয়ারী সন্দিগ্ধমনে তাহার দিকে তাকাইল, তারপর বলিল, "না" খানসামা সেলাম দিয়া চলিয়া গেল। মাড়োয়ারী শয়ন করিল, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। চাঁদপুর কতদূর, কতক্ষণে পৌছিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। মাড়োয়ারী দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। একবার শয্যায় উঠিয়া বসিতে লাগিল, একবার শয়ন করিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় একপ্রহরের সময় ষ্টিমার চাঁদপুর পৌছিল।

২

চাঁদপুরে ট্রেনখানি সজ্জিত ছিল, মাড়োয়ারী তাড়াতাড়ি ষ্টীমার ত্যাগ করিল না। যখন সব প্যাসেঞ্জার চলিয়া গেল, তখন ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া তীরে অবতরণ করিল, এবং একখানি প্রথম শ্রেণীর রিসার্ভ কামরায় গিয়া উঠিল, ভৃত্য জিনিসপত্র সব ঐ গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া "ভৃত্যের জন্য" লেখা আছে এইরূপ একটি ক্ষুদ্র কামরায় প্রবেশ করিল। ভৃত্য কিছু জলখাবার খাইয়া একখানি বেঞ্চে শয়ন করিল, মাড়োয়ারী নিদ্রা গেল না, বসিয়া থাকিল।

"হস্ হস্" করিয়া গাড়ীখানি ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ গাড়ীখানি প্ল্যাট্‌ফরমে ছিল, ততক্ষণ মাড়োয়ারী জানালার নিকট মুখ দিয়া যাত্রিদিগকে দেখিতেছিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

রজনী ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে, সব নিস্তব্ধ, কেবল ট্রেণের শব্দে শান্তিভঙ্গ করিতেছে। মাড়োয়ারীর একটু তন্দ্রা বোধ হইল, তথাপি সে নিদ্রা গেল না, হঠাৎ লাক্‌সাম্ জংসনে গাড়ী থামিল। এই ষ্টেশনে গাড়ী অনেকক্ষণ থাকে।

অন্য গাড়ীতে অসম্ভব ভিড়, কত লোক গাড়ীতে উঠিতে পারিতেছে না। মাড়োয়ারী উঠিয়া জানালার নিকট দাঁড়াইল, দেখিল একটি পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক গাড়ীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে দৌড়াইতেছে, কোন গাড়ীতে উঠিতে পারি-তেছে না। স্ত্রীলোকটী যুবতী ও অপূর্ব্ব সুন্দরী ও নানারূপ অলঙ্কার অঙ্গে শোভা

পাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক ছুটিতেছে, বোধ হইল কোন আত্মীয় হইবে। স্ত্রীলোকটি মধ্যম শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী, সর্ব্বত্রই গেল, কিন্তু স্থান পাইল না। অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে মাড়োয়ারীর গাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইল। "বাবু সাহেব, আপনার গাড়ীতে একটু স্থান পাবো? আমার স্বামী মণীপুর চাকরী করে, টেলিগ্রাম পাইলাম তাহার শঙ্কটাপন্ন ব্যারাম, তাই তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। এই লোকটি আমার দূরসম্পর্কীয় ভাই। একে সঙ্গে করেই এনেছি। যদি আপনার দয়া না হয়, তবে আর আমার স্বামীকে দেখা হবে না।" যুবতী কাঁদিতে লাগিল। মাড়োয়ারীর ঐ অপরূপ সৌন্দর্য্যে মন একটু নরম হইল। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিল, "আমার এ গাড়ীতে স্থান হবে না, এ রিসার্ভ গাড়ী, অপর লোক নেওয়া নিষেধ।"

স্ত্রীলোকটি আবার কাঁদিতে লাগিল, একেবারে মৃত্তিকায় পতিত হইল। অনেক লোক সে স্থানে জমিল। মাড়োয়ারী সে রূপ দেখিল, চক্ষু দুটি বেশ পরিষ্কার, বিশেষতঃ যুবতী দ্বারা কি অনিষ্ট হইতে পারে? তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল, একজন এরূপ রূপবতী ষোড়শীর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে গেলে রাত্রিটা বেশ কাটিবে। যদি এ যুবতী মণীপুর যায়, তবে ভালই, মাড়োয়ারীও মণীপুর যাইবে। সে বলিল "তুমি একাকী যেতে পার, তোমার ভাইর কি হবে?" স্ত্রীলোকটি ছল ছল চক্ষে ভাইর দিকে তাকাইল। ভাই বলিল "এ বিপদের সময় আর তা বলে কি হবে? এ বাবু সাহেব ভদ্রলোক ও বড় লোক, তুমি যাও, আমি অপর গাড়ীতে কোনরূপ কষ্টে দাঁড়াইয়া থাকিব।" গাড়ী ছাড়িবার বড় বিলম্ব নাই, ইঞ্জিন জল লইয়া গাড়ীতে আসিয়া লাগিল। মাড়োয়ারী দ্বারা খুলিল, স্ত্রীলোকটি গাড়ীতে প্রবেশ করিল। আর অমনি "হুস্ হুস্" শব্দ করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

৩

গাড়ী ছাড়িলেই স্ত্রীলোকটী গাড়ীর এক পার্শ্বে অতি সঙ্কুচিত হইয়া বসিল এবং ধীরে ধীরে বলিল" ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আপনি অদ্য আমার প্রাণ ও মান রক্ষা করিয়াছেন।" মাড়োয়ারী বলিল, এ সামান্য উপকার। যা হ'ক তোমার স্বামী মণীপুর কি করে?" যুবতী বলিল, তিনি তথায় দোকান করে বসেছেন।" মাড়োয়ারী আবার প্রশ্ন করিল "কিসের দোকান?" যুবতী বলিল, "কাপড়ের দোকান"। ইহার পর আর কোন কথা হইল না, যুবতী ঐ কথার পর এক কোণে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল।

মাড়োয়ারী যুবতীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছিল এতক্ষণ তাহার সুধামাখা কথা শুনিয়া একেবারে চিত্ত হারাইল। মনে মনে বলিল, ইহার স্বামী কি সুখী। একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেবল ঐ সব কথাই ভাবিতে লাগিল।

গাড়ী দ্রুতবেগে চলিল। মাড়োয়ারী মোটেই নিদ্রা গেল না, বসিয়া বসিয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিল। মাড়োয়ারীর সম্মুখেই তাহার পোর্ট-ম্যান ও ব্যাগ, এবং একটি জলের কুজা নিকটেই রহিয়াছে। ভৃত্য মধ্যে মধ্যে আসিয়া মুনীবের খবর লইতেছে, এবং যুবতীর ভ্রাতা আসিয়া এক একবার দেখিয়া যাইতেছে যুবতী নিদ্রিতা কিনা।

ক্রমে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এমন সময়ে যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে চক্ষু রগড়াইয়া মাড়োয়ারীকে বলিল, "আপনি একবারও নিদ্রা যান নাই। আশ্চর্য্য! আমার বড় পিপাসা হয়েছে, আপনার কি জলের কুজা আছে?" মাড়োয়ারী জলের কুজা দেখাইয়া বলিল "ঐ জল আছে পান কর। "যুবতী উঠিয়া কুজার নিকট আসিল এবং একটী গ্লাসে জল পুরিয়া পান করিল, পরে গ্লাসটী ধৌত করিয়া যথা স্থানে রাখিয়া আবার তাহার নিজ জায়গায় গিয়া নিদ্রিত হইল। মাড়োয়ারীর বসিয়া থাকিতে থাকিতে নিদ্রাকর্ষণ হইল। প্রাতঃসমীরণ জানালা দিয়া আসিয়া তাহাকে উজ্জীবিত করিতে লাগিল। মাড়োয়ারী পিপাসা বোধ করিল, উঠিয়া একগ্লাস জলপান করিল। পুনরায় আসিয়া নিজ স্থানে ঠিক হইয়া বসিল।

সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহার কেমন নিদ্রিত ভাবের সমাবেশ হইল, সুমধুর সমীরণ নিদ্রার সাহায্য করিতে লাগিল। মাড়োয়ারী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিছুতেই সে এখন নিদ্রিত হইবে না, এই তাহার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু ক্রমেই যেন ক্লান্তি বোধ হইতেছিল, মাড়োয়ারী জানালার নিকট বসিল। যুবতীর দিকে দৃষ্টি করিল, সে অচেতন অবস্থায় পতিত। মাড়োয়ারীর ইচ্ছা হইল যে যুবতীর সঙ্গে গল্প করিয়া নিদ্রাকে দূর করে, তাহাও হইল না। বসিয়া বসিয়া চক্ষু মুদিয়া একটু নিদ্রা যাইবে মনে করিল। কিন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত হইল না, শয্যার উপর শুইয়া পড়িল ও দেখিতে দেখিতে নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে বিশেষ রূপে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

৩

বেলা প্রায় ৮টার সময় গাড়ীখানি একটী ষ্টেসনে থামিল। মাড়োয়ারীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, দেখিল যে সূর্য্য কিরণ তাহার কামরায় প্রবেশ করিয়াছে,

এবং তখনও যুবতী নিদ্রিতা। স্ত্রীলোকটীর এত নিদ্রা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে উঠিয়া কুজা হইতে জল লইয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে যথাস্থানে গেল। ফিরিয়া আসিয়া নিজ শয্যার বসিয়া নিজ কোমরে হস্ত দিল, দেখিল চামড়ার থলিটা নাই। মাড়োয়ারীর মুখ শুষ্ক হইল; সে তৎক্ষণাৎ ষ্টেসন মাষ্টার, পুলিশ প্রহরীদিগকে ডাকিতে লাগিল। বহু লোকের সমাগম হইল। মাড়োয়ারী তাহাদিগকে সমস্ত ঘটনা বলিল। স্ত্রীলোকটী এই গোলমালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিল। তখন মাড়োয়ারীর জবানবন্দী লওয়া হইল, এবং প্রত্যেক গাড়ীর লোক ও তাহাদের বাক্স অনুসন্ধান করা হইল, কোন স্থানেই সে বহুমূল্য কটিবন্ধ পাওয়া গেল না। স্ত্রীলোকটী ঐ গাড়ীতে ছিল, তাহার উপর পুলীশের সন্দেহ হইল, স্ত্রীলোক দ্বারা তাহার বস্ত্রাদী পরীক্ষা করা হইল। তাহার ভ্রাতাকে আনা হইল, মাড়োয়ারীর ভৃত্যকে ডাকা হইল, তাহাদের বস্ত্রাদি দেখা হইল। তার পর গাড়ীর মধ্যে গিয়া বাথরুমগুলিও তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল, কিন্তু সে বহুমূল্য জিনিষ পাওয়া গেল না। গাড়ী প্রায় একঘণ্টা রাখা হইল, তার পর আর রাখা চলে না, মাড়োয়ারী সঙ্গীর স্ত্রীলোক, মাড়োয়ারীর ভৃত্য, ও যুবতীর ভাইকে নামাইয়া রাখিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। চারিদিকে টেলিগ্রাম হইল, প্রত্যেক স্থানে পঞ্চসহস্র মুদ্রা পারিতোষিকের কথা জানান হইল। কুমিল্লার পুলিশের প্রধান কর্ত্তা স্বয়ং আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনেক ইনস্পেক্টর, সবইনস্পেক্টর আসিল কিন্তু কার্য্য কিছুই হইল না, পুলিশের প্রধান সাহেব মাড়োয়ারীকে যেপ্রশ্ন করিতে লাগিলেন, মাড়োয়ারী যে উত্তর দিল আমরা এই স্থানে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

মাড়োয়ারীর নাম লছমী নারায়ণ, তাহার নিবাস বিকানীর। আপাততঃ সে কলিকাতা হইতে আসিতেছে। মণীপুরের মহারাজার বিগ্রহের জন্য একটী পান্নার কটীবন্ধের অর্ডার তাহার উপর ন্যস্ত হয়। কটীবন্ধ বহুমূল্যের, প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রায় প্রস্তুত, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কয়েকটী মণি সংগ্রহ করিয়া ঐ কটীবন্ধ তৈয়ারী করা হয়। চুক্তি হয় যে মণীপুর পৌছাইয়া দিতে হইবে মূল্য ও যাতায়াত খরচ পাইবে। তাই মাড়োয়ারী অতি সাবধানে, প্রথম শ্রেণীতে মণীপুরে যাইতেছিল।

যখন শেয়ালদহ ষ্টেশনে সে আসে, তখন একব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিয়া একখণ্ড লিপি তাহার হস্তে প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করে। মাড়োয়ারী

সে লিপি পাঠে জানিতে পারে যে কতকগুলি বদমাইস তাহার অনুসরণ করিতেছে, সে যেন সাবধানে মণীপুর যায়, নতুবা বহুমূল্য কটীবন্ধ অপহৃত হবে। তাই সে অতি গোপনে কোমরে বাধিয়া যাইতেছিল এবং এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিজের নিকট হইতে অন্যত্র রাখে নাই। ষ্টীমারের মধ্যে সে একবার খুলিয়াছিল। কিন্তু সে সময় দ্বার বন্ধ ছিল, কেহ যে দেখিয়াছে বা জানিতে পারিয়াছে এমন সম্ভাবনা নাই। সে অতি সাবধানে ষ্টিমারে ও ট্রেণে চলিয়াছে। লাকৃসন্ জংসনে এই স্ত্রীলোকটীকে নিরুপায় দেখিয়া সে আশ্রায় দিয়াছে। স্ত্রীলোকটীর উপর তাহার সন্দেহ হয় না। সর্ব্বদাই তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়াছে। সে সমস্ত রাত্রি বসিয়া ছিল, ভোর বেলা ঘুমিয়ে ছিল। নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিয়া আসিয়া দেখে যে তাহার কোমরে কটীবন্ধ নাই। তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। নিশ্চয়ই কোন ভয়ানক চোরের কৌশল, নতুবা এ ভাবে অপহৃত হইতে পারিত না। স্ত্রীলোকটীর জবানবন্দী লওয়া হইল, সে কি ভাবে লাকৃসান্ হইতে উঠিল, মাড়োয়ারীর দয়া, ইত্যাদি সে বর্ণনা করিল। তার পর সে সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়াছে। তাহার স্বামীর নাম ও কি কার্য্য করে জিজ্ঞাসা করা হইল। স্ত্রালোক স্বামীর নাম সহজে বলে না, কৌশলে তাহার নিকট জানা হইল, তাহার স্বামীর নাম শিবপ্রসাদ, মণীপুরে বস্ত্রের ব্যবসা করে। তখনই মণীপুর টেলিগ্রাম পাঠান হইল, তাহার উত্তরে আসিল যে শিবপ্রসাদ অনেক দিন হইতে মণীপুরে বস্ত্রের ব্যবসা করে, তাহার স্ত্রী লাকৃসান্ জংসনের নিকটেই থাকে। অতএব স্ত্রীলোকটীর উপর আর সন্দেহের কারণ থাকিল না। বিশেষতঃ যদি সে চুরি করিত, তবে নিশ্চয়ই কোন ষ্টেসনে নামিয়া যাইত অথবা তাহার ভ্রাতাকে জিনিষ সহ পাঠাইয়া দিত। স্ত্রীলোকটীর সেই অশ্রুপূর্ণ নয়ন, সুন্দর ঢল্ ঢলে মুখ—কিছুতেই সন্দেহ আনিতে পারে না। তাহার ভ্রাতাকে তন্ন তন্ন করিয়া সব প্রশ্ন করিল, কোন নুতন কথাই বাহির হইল না। তাহাকে দেখিয়া নিতান্ত নির্দ্দোষ বলিয়া মনে হয়। পুলিস সাহেব যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি রাত্রি একবারও উঠ নাই। যুবতী বলিল, একবার জলপান করিতে শেষ রাত্রে উঠিয়াছি। তখন বাবু সাহেব বসিয়া ছিলেন। আবার প্রশ্ন হইল "কোনরূপ শব্দ বা অন্য কোন লোককে দেখিয়াছ?" "না" তখন পুলীশদের বড় গোলমাল বোধ হইল, তাহারা কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিল একজন বিচক্ষণ ডিটেক্টীভ চাই, নতুবা এ মোকদ্দমার কিনারা হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

৫

পাটনা সহরে একটি ছোট গলিতে শিউশরণ বাস করে। তাহার পরিবারের মধ্যে একটি বৃদ্ধ মাতা ও স্ত্রী। স্ত্রী যুবতী ও সুন্দরী। শিউশরণ নানারূপ ব্যবসা করে। পূর্ব্বে শিউশরণ অত্যন্ত দরিদ্র ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর মধ্যে ধনী বলিয়া পরিগণিত হইল। লোকে মনে করিল সে ব্যবসা দ্বারা নিজের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। শিউশরণের পাখী পোষা একটি সখ, নানাবিধ পাখী তাহার ঘরে শব্দ করিতেছে, মনে হইতেছে কোন চিড়িখানায় উপস্থিত হওয়া গেল। কাকাতুয়া, ময়না, লালমণ, হীরামণ, টিয়া, শালিক, এবং এই সব ব্যতীত কয়েকটি সুন্দর কবুতর তাহার চিড়িয়াখানার লিষ্ট ভুক্ত। শিউশরণ স্বয়ং এই পাখীগুলিকে আহার দেয় এবং নিজে ইহাদের যত্ন করে।

একদিন রাত্রে শিউশরণ বসিয়া আছে, তাহাকে একটু চিন্তাকুল দেখা যাইতেছে। বারেন্দায় সুন্দর হাওয়া দিতেছে। টবের মধ্যে কয়েকটি ফুলগাছ—গন্ধে ঐ স্থানটি মোহিত করিতেছে। এমন সময়ে দূরে কি শব্দ হইল—শিউশরণ চমকিয়া উঠিল—একটি কবুতর আসিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। শিউশরণ তাড়াতাড়ি কবুতরটি লইয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। পরক্ষণেই হাসিতে হাসিতে বারেন্দায় আসিয়া বসিল, এবং কবুতরটিকে হস্তে লইয়া আহার করিতে লাগিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই একজন পাগলা সন্ন্যাসী তাহার দ্বারে উপস্থিত। শিউশরণ কোন অতিথিকে স্থান দিত না, কিন্তু সন্ন্যাসীর প্রতি তাহার বড় ভক্তি ছিল। এই অর্দ্ধ উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া শিউশরণ আদর করিয়া গৃহে লইয়া গেল, এবং যত্ন করিয়া নানারূপ আহার্য্য তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত করিল। সন্ন্যাসী বলিলেন "আমি শুধু জল আহার করি"। শিউশরণের অত্যন্ত ভক্তি হইল, এবং কতক ফলমূল ও জল আনিয়া উপস্থিত করিল। সন্ন্যাসী ফলমূল স্পর্শ করিয়া তাহাকে প্রসাদ লইতে বলিল এবং শুধু জলপান করিল। সন্ন্যাসী সমস্ত রজনী ভগবৎ আরাধনায় অতিবাহিত করিবেন এইরূপ বলিলেন। শিউশরণ তাঁহাকে একটি কক্ষে রাখিয়া সে নিজ শয়নাগারে গেল এবং আহারান্তে নিদ্রিত হইল।

রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত—নীরব—কেবল প্রহরীর চীৎকার মধ্যে মধ্যে শ্রুতিগোচর হইতেছে। একটা কি দুইটা কুকুর রাস্তায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। পথিকের সমাগম প্রায় নাই। আকাশের অবস্থাও ভাল নয়,

যেন বৃষ্টি হইবে। এ পাশে ও পাশে দুই একটী নক্ষত্র মিটি মিটি করিতেছে। সন্ন্যাসী হঠাৎ উঠিলেন এবং কক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলেন; দেখিলেন দ্বিতলের একটি ঘড়ে আলো জলিতেছে, শিউশরণ ঐ গৃহে নিশ্চয়ই আছে অনুমান করিয়া তিনি সিঁড়ির নিকট গেলেন, সিঁড়িতে একটি দরজা আছে তাহা ভিতর দিকে অর্গল বদ্ধ। সন্ন্যাসী একটা তার ভিতরে প্রবেশ করাইয়া অর্গল খুলিলেন। সিঁড়ি দিয়া উপরের বারান্দায় গেলেন, বারান্দায় গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইলেন! শিউশরণ এক্ষণে একটী কবুতর লইয়া আদর করিতেছে ও তাহার গলদেশ হইতে একটি বহুমূল্য প্রস্তর খচিত কি একটা জিনিষ খুলিয়া লইল। পরে কবুতরটিকে আহার দিয়া পিঞ্জরে আবদ্ধ করিল ও সেই জিনিষটি খুলিয়া নিজ কক্ষে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী অতি ধীরে ধীরে দ্বারদেশ হইতে সব দেখিতে লাগিলেন। কক্ষের মধ্যে গিয়া মেজের একটি প্রস্তর উঠাইল এবং সেই জিনিষটি তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আবার প্রস্তর এমন ভাবে বসাইয়া দিল যে বুঝিবার উপায় নাই— সন্ন্যাসী নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

উপসংহার।

কলিকাতার ডিটেকটিভ্ পুলিশের মধ্যে উপেন্দ্র বাবু একজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারী। সাহেব তাঁহাকে বিশ্বাস করেন ও ভালবাসেন। যখন কুমিল্লার পুলিস সাহেবের টেলিগ্রাম পৌছিল, তখন বড় সাহেব উপেন্ বাবুর উপর এই তদন্তের ভারার্পণ করেন।

উপেন্দ্র একজন ভিখারীর বেশে ঘটনাস্থলে গেলেন, সমস্ত ঘটনা শুনিলেন, তারপর স্ত্রীলোকটিকে ও তাহার ভ্রাতাকে নানারূপ প্রশ্ন করিলেন। তিনি কিছুই পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন না। উহাদিগকে তথায় আবদ্ধ রাখিয়া, মণীপুর গিয়া স্ত্রীলোকটীর স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিলেন, সেস্থানেও কোন অনুসন্ধান না পাইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু আসিবার সময় তাঁহার স্বামীর একখানি পত্র লইয়া আসিলেন। উপেন্ বাবু নানা ভাষা জানিতেন, এবং বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। তিনি হিন্দুস্থানী সাজিয়া যুবতীর নিকট আসিলেন ও তাহার স্বামীর পত্র দিলেন। সে পত্র খুলিয়া পাঠ করিল—

তুমি আমার এই বন্ধু গোলকরামকে বিশ্বাস করতে পার, এ লোক আমাদের দলের ও মণীপুরে আমার নিকট থাকে। আমি স্বয়ং গেলে লোকে সন্দেহ করিবে, তাই ইহাকে পাঠাইলাম। যেমন সাবধানে কর্ম্ম করিতেছ, তদ্রূপ

করিবা। "স্ত্রীলোকটী পত্র পাঠ করিয়া গোলকরামের দিকে তাকাইল, দেখিল সুন্দর মাড়োয়ারী যুবক। গোলকরাম চক্ষু টিপিল, স্ত্রীলোকটি বুঝিল নিশ্চয়ই জানা লোক। তখন সে গোপনে পাটনায় শিউশরণের নিকট এক পত্র দিল, গোলকরাম সেই পত্র স্বয়ং লইয়া যাবে।

পাটনায় বদমায়েসের আড্ডা ছিল। সেই আড্ডার অধিনায়ক 'শিউশরণ'। স্ত্রীলোকটি ও তাহার ভ্রাতা এই দলের লোক। এই দলে অনেক লোক। এক এক দিকে এক এক দল যায়। কলিকাতায় এই স্ত্রীলোকটি ও তাহার ভ্রাতারূপী মাড়োয়ারী শিকারান্বেষণে গিয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই ইহারা সব খবর রাখিত। জানিতে পারিল যে ঐ মাড়োয়ারী মণীপুর রাজার জন্ম বহুমূল্য কটীবন্ধ লইয়া যাইতেছে। এমন কৌশলে তাহা অপহরণ করা চাই, যে কেহ না বুঝিতে পারে। ইহাদের সঙ্গে কবুতর থাকে, যখন কোন মূল্যবান অলঙ্কার অপহরণ করে, তখনই কবুতরের গলায় পরাইয়া দেয়, কবুতর শিউশরণের নিকট লইয়া যায়। ইহাদের চুরির বাহাদুরি এই যে ইহারা অপহরণ করিয়া পলায় না, সেই জন্ম ইহাদের উপর সন্দেহ হয় না। উপেন্ বাবু কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিয়া পাটনায় যান ও সন্ন্যাসী সাজিয়া শিউশরণের বাটী উপস্থিত হন। তিনি সমস্ত ঘটনা দেখিয়া সব বুঝিতে পারিলেন। অতি প্রত্যুষে কলিকাতায় বড় সাহেবের নিকট টেলিগ্রাম করিলেন ও তাঁহার আদেশ মত শিউশরণের বাটী ঘেরাও করিলেন এবং স্বয়ং উপরের ঘরে উপস্থিত হইয়া শিউশরণকে গ্রেপ্তার করিলেন ও মেজের প্রস্তর তুলিয়া কটীবন্ধ ও অন্যান্য অনেক বহু মূল্য দ্রব্য উদ্ধার করিলেন।

সুন্দরী স্ত্রীলোক না হইলে লোকে আকৃষ্ট হয় না, তাই এ যুবতী ও একটি পুরুষ কলিকাতায় আসিয়া নানারূপ জুয়াচুরি করিত। ইহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া মাড়োয়ারীর একজন বন্ধু তাহাকে শেয়ালদহ ষ্টেশনে সাবধান করিয়া দেয়। এই যুবতী ও পুরুষ তারপাশা ষ্টেশন হইতে বাঙ্গালী বাবু ও তাহার স্ত্রীরূপে ষ্টীমারে উঠে, ইহারা ভোরের ষ্টীমারে এইখানে আসিয়াছিল।

সমস্ত বিষয় খোলসা হইল, শিউশরণ সব স্বীকার করিল। সে যুবতী ও পুরুষটিকে ধরিয়া আনা হইল। পাটনায় সকলের বিচার হইল, সকলেরই কারাদণ্ড হইল। উপেন্ বাবুর প্রমোশন হইল। কিন্তু মাড়োয়ারী কিছুকাল যুবতীর জন্ম দুঃখ করিল। এমন সুন্দর মুখ সে কখনও ভুলিতে পারে নাই।

শ্রীঅমলানন্দ বসু।

আলোকে ও আঁধারে।

চতুর্থ দৃশ্য।

গ্যাণ্ট সাহেবের কুঠি—সজ্জিত প্রাঙ্গণ।

বিনোদের অভ্যর্থনার আয়োজন।

[গ্যাণ্ট, ভ্যাটাভেল, লীলা চেয়ারে উপবিষ্ট। একধারে নিশান হাতে যুবকগণ, অন্য-ধারে শাঁক, মালা, তোড়া হাতে সুসজ্জিতা মহিলাগণ, কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া]

ভবতারণ ও সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

যুবকগণ—(নিশান উড়াইয়া) হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে। হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

ভব—এই যে, এই যে সবাই এসেছেন। ডক্টর ভ্যাটাভেল, আমার বোধ হয় একটু দেরী হ'য়ে গ্যাছে। বাগবাজারের শাখা সভার যুবক সভ্যগণ সোনারপুরের জমিদার জগদীশ বাবুকে একটা অভিনন্দন দিলে,—সেখানে সভাপতি হ'য়ে আসতে হ'ল। তারা ছাড়লে না।

ভ্যাট্যা—সোনারপুরের জমিদার জগদীশ বাবু! তিনি ত ভারী গোঁড়া হিন্দু ব'লে শুনেছি।

ভব—হ্যাঁ, আছে কিছু গোঁড়ামী। তবে বড়লোক, ওখানে এসে মস্ত বাড়ী ক'রেছে। ক্রমে যদি সহানুভূতি পাওয়া যায়, তবে বড্ড সুবিধে হবে। আমাদের প্রচার কার্য্য চালাতে টাকারও দরকার। আজই ১০০ টাকা দান করে গেলেন। তা বিনোদ এখনও আসেনি মহিম?

গ্যাণ্ট—এই ত ঠিক পৌনে সাতটায় আসবার কথা—এই এল আর কি?

ভব—এই যে মা লীলা—হ্যাঃ—হ্যাঃ—তা চার পার্টি বেশ সাজিয়েছ। আয়োজনও ত বেশ দেখতে পাচ্ছি। তা সবই কি একেবারে বিলিতি ধরণে করবে? দিশী ভাব কিছু রাখ্‌বে না?

লীলা—তা দিশী ভাব, সুরুচির সঙ্গে যতটা রাখা যায়, আমাদের অগ্রসর আদর্শের সঙ্গে যতটা মিশ খায়, তাত রাখতেই চাই। ঐ দেখুন না, সব মেয়েদের হাতে শাঁখ র'য়েছে। বিনোদ দা যেমন আসবে, অমনি সবাই আগে শাঁখ বাজাবে। গাল ফুলে দেখতে বিশ্রী হয়, তবে। শাঁখের আওয়াজটা নেহাৎ মন্দ নয়।

ভব—হ্যাঁ, তা বেশ ক'রেছ, বেশ ক'রেছ মা। দেশটাত একেবারে ছেড়ে গেলে চল্‌বে না; সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মাঝামাঝি গিয়ে westএর সঙ্গে meet ক'ত্তে হবে।

Ah! Ah! the day!
When East and West shall meet halfway.
সেদিন সেদিন আহা কবে যে আসিবে!
মাঝ পথে প্রাচ্যে আর প্রতীচ্যে মিশিবে!

ভ্যাটাভেল—Halfway কখনও meet করবে না ভবতারণ বাবু—যাই বলেন west কি আর পিছিয়ে আমাদের দিকে আস্‌বে? আমাদেরই পুরো পুরি গিয়ে তার পাশে দাঁড়াতে হবে।

সিদ্ধে—সেটা যেন আমারও মনে হয়।

লীলা—ওহো সিধুবাবু, আপনিও আবার বল্‌ছেন? আপনিত halfwayও আস্‌তে পাচ্চেন না। আপনার better half যে একেবারে পিছনে পড়ে? রমা পর্য্যন্ত আজ এখানে এল না।

সিদ্ধে—কি করব মিসেস গ্যাপ্ট, আপনারা ত কেবল bettter half নন, by far the bigger and stronger half আমাদের হার মেনেই চল্‌তে হয়। কি বলেন মিষ্টার গ্যাপ্ট? হ্যা—হ্যা—হ্যা।

মহি—ঠিক বলেছেন সিধু বাবু। ঘরে বলুন, বাইরে বলুন, এরাই ড্রাইভার আমরা এঞ্জিন।

লীলা—হিঃ হিঃ হিঃ! ও—মহিম! তুমিও এই কথা ব'লছ? আমিত তোমারই ideal ধ'রেই চল্‌ছি,—like a faithful obedient Hindu wife!

মহি—সেটা আমি না বল্‌ছি না।—কিন্তু আমার যে ideal, সে যে তোমারই দেওয়া লিলী! যে চেনটি গলায় পরিয়েছ, সেত তোমারই হাতে গড়া।

লীলা—বলুনত মামা বাবু,—আমি কি কখনও কোন মিসেস গোল্ডস্মিথ ছিলুম?

ভব—হ্যাঃ! হ্যাঃ! হ্যাঃ! মা আমার পাগলী! তা ডক্টর ভ্যাটাভেল, আপনি যা বল্লেন, তা ঠিক। তবে কি জানেন, আমরা ত আর west কে পিছিয়ে আস্‌তে বল্‌ছি না। west যা আছে তা থাক্‌বেই। তবে আমাদের কথা হচ্চে এই যে, আমাদের জন্তে প্রাচ্যের আর প্রতীচ্যের আদর্শের মধ্যে একটা মিশ খাইয়ে নিতে হবে,—যেমন ছানা আর চিনিতে মিলে সন্দেশ হয়। ছানা যেন প্রতীচ্য আর চিনি যেন প্রাচ্য। অবশ্য ছানাটা যত বেশী হবে, সন্দেশটিও তত ভাল হবে।

ভ্যাটা—কি জানেন ভবতারণ বাবু, প্রাচ্যে আর প্রতীচ্যে যে ছানা চিনির মত মিশ খায়, তা মনে হয় না। ও মেশাতে যাওয়া যেন খানার টেবিলে বাপের পিণ্ডি দেওয়ার মত হবে।

লীলা—আর ঠিক যেন হাতে শাঁখা, নাকে নথ, কপালে সিঁদুর ভটচাজ বাম্‌নীরা ঘোমটা দিয়ে সেই টেবিলে খানা খাচ্ছে,তেমনি ধারা একটা ব্যাপার হবে।

মহি—আর হবে যেন ফোটা কাটা, রেলী পরা, টিকিনাড়া পুরুত ঠাকুররা বকিং-হ্যাম প্যালেসে ব'সে চণ্ডী পাঠ কচ্ছে।

ভ্যাটা—তাই বল্‌ছিলুম, ভবতারণ বাবু—ও মিশ খাবে না। হয় পুরো—প্রাচ্য, না হয় পুরো প্রতীচ্য,—এর একটা আমাদের ধ'স্তেই হবে। আমি শেষেরটাই পছন্দ করি।

লীলা—আমিও।

মহি—আমারও তোমার মতেই ডিটো (ditto)।

ভব।—ভিটো (Veto) ক'রে ত দিলে আমায়,—তোমাদের পাল্লায় পড়েছি, আর কি করি? কিন্তু আমাদের ideal হচ্চে reform, not transform,—evolution, not revolution আর আমি বিশ্বাস করি, আশা করি, ভরসাকরি far off is not the day,—when East and West shall meet halfway

সেদিন ত নয় দূরে অচিরে আসিবে,—
মাঝে যবে প্রাচ্যে আর প্রতীচ্যে মিশিবে।

সেই আশা নিয়েই, সেই লক্ষ্য ধরেই আমরা চল্‌ছি,—আমাদের এই সভা আমরা গঠন ক'রেছি। আমরা ভরসা করি,—ভগবান আমাদের সহায়,—আমরা সিদ্ধি লাভ করব,—ক'র্‌বই ক'র্‌ব।

মহি—ওই বুঝি বিনোদ এল।

লীলা—ওহো তাইত! ডক্টর ভ্যাটাভেল—আপনি কিন্তু সভাপতি। মহিম তুমি এগিয়ে যাও। বন্ধুগণ! গানে প্রস্তুত হন্। মহিলাগণ, আগে শাঁক।

(মহিমের দ্রুত বাহিরে গমন)

[মহিলাগণের সারবাঁধিয়া দাঁড়াইয়া শঙ্খধ্বনি,—চুরট মুখে বিনোদের প্রবেশ।]

(অভ্যর্থনা সঙ্গীত)

যুবকগণ—নব আলোকে আলোকিত নব ভাবে ভাবিত,
　　নব বেশে বেশিত এস এস হে।
মহিলাগণ—এস নব—নব নব—
　　নব রসে রসিক নবীনাশ হে!
যুবক—প্রতিবিম্বিত ভাস্কর কর সমুজ্জ্বল!
মহি—মধু সুধাময় শশী চল চল!
যুব। এস আলোক বিতর নাশ হে তিমির
　　তমোময় তোমার এ দেশ হে!

মহি—হীন পরবশা কুবেশা কুভাষা
তোল হে অবলায় সুবেশ হে।
যুব—কদাকারে পূর্ণ এ সমাজ জীর্ণ,
মহি—হেঁসেলে হাঁড়ী ঠেলে রমণী শীর্ণ,
যুব—প্রতীচ্য পদাকায় ত্যজ হে যায় যায়—
জীর্ণ এ প্রাচ্যতা নীরস হে!
মহি—ভাঙ্গল হাঁড়ী সরা ডালা কুলো ঘটী ঘড়া
হীনতা জীবনে হ'ক শেষ হে!
যুব—প্রাচীন কুরীতি কুনীতি যত,—
মহি—চরণে মল, ছি ছি, নাসিকায় নথ,
যুব—নব জীবন জাগরণে উছলিত প্লাবনে
ভাসিয়ে দূরে সব বিনাশ হে!
মহি—নারী বদন শশী ভাসুক হাসি হাসি,
মুক্তাবগুণ্ঠন রাহু গ্রাস হে!

সিদ্ধে—শ্রীমান্ বিনোদবিহারী! অদ্য মিষ্টার ও মিসেস্ গ্যাপ্টের পক্ষ হইতে, কেবল তাহাই কেন, আমাদের সকলের পক্ষ হইতেই, আমরা তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছি। (হিয়ার হিয়ার)! এস শ্রীমান! দীর্ঘ প্রবাসের পরে স্বদেশে স্বজনের মধ্যে এসে দাঁড়াও। তোমার দেশ আজ কত আশায় তোমার আলোক-দীপ্ত আনন পানে আকুল প্রাণে আকর্ণ বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। এস, এস, দেশের আশা দেশের ভরসা, দেশের আলোক, দেশের পুলক, এস,—যেমন মা যশোদার কোলে নেচে নেচে নন্দের গোপাল আসে! এস, অবনত দেশকে উন্নীত করিতে এস, অন্ধকার দেশকে আলোকিত করিতে,—এস, নির্ব্বাপিত দেশে প্রজ্বলিত করিতে। হে অনলপ্রভ, সোমসন্নিভ, সুবেশ-শোভ, সুবেশ সৌভঃ দীপ্ত গৌরব, এই তমসাচ্ছন্ন নভ.—নব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া উদিত ভব! নবীন ঘটায়, নব কিরণ ছটায় তমোনিমজ্জিত আবালিকা বালক, আযুবতী যুবক, আপ্রাচীনা প্রাচীনক, দেশের সমগ্র নরনারী সমাজ প্রতিবিম্বিত হউক। সুমধুর ধ্বনিত, গুরুগম্ভীর নাদিত নারীনরকণ্ঠোচ্চারিত ঘন ঘন জয়ধ্বনি তোমার প্রভামণ্ডিত গগন মণ্ডলে উড্ডীয়মান হউক।

(হিয়ার! হিয়ার! করতালি)

লীলা—চামেলী!
চামে— (বাদ্য হতে অগ্রসর হইয়া গান)
আ মরি উজল আলোকে ঝলমল
কোথা হতে এলে বঁধু আঁধারে।
ঝলকে আলোক এসে পুলকে নাবে বুকে
মরি কি ললিত লীলা লহরে।

আলোকে ভেসে বঁধু এলে যদি দেশে,
রব কি রমণী আঁধারে বসে।
(ওই) আলোকে ভেসে ভেসে হেঁসে দাঁড়াব পাশে,
সম রসে আশে ভাষে আহা রে
নব যে আলোক আনিলে খাসা,
নব যে সুখ, বঁধু, নব যে আশা,—
বিনিময়ে গো তার দিব কি উপহার
কিসে বল তুমি বঁধু তোমারে।
রমণী হৃদয়ে ফোটা এ ফুলহার—
হৃদয়ে ধর হে বঁধু আদরে!

(মাল্যদান, বিনোদের নত জানু হইয়া কণ্ঠে মাল্যগ্রহণ ও চামেলীর কর চুম্বন)

ভব—শ্রীমান্ বিনোদবিহারী আজ তোমার গৌরবে আমি গৌরবান্বিত তোমার এই সুশোভন অভ্যর্থনায় আমি সুশোভিত, অভ্যর্থিত। হে পুত্র, দেশের ও সমাজের উন্নতি সাধনরূপ যে মহান্ ব্রতভার আমার দুর্ব্বলস্কন্ধে আরোপিত, প্রাচ্যে প্রতীচ্যে নব সম্মিলনরূপ যে মহীয়সী আকাঙ্খায় আমার ক্ষীণ হৃদয় উদ্বেলিত;—আমার ভরসা আছে, সেই ব্রত ভার বহনে, সেই আকাঙ্খা পূরণে, তোমার নিত্য সহায়তা লাভে আমি ধন্য হইব। হে প্রতীচ্যালোকোদ্ভাসিত, উত্তাল তরঙ্গায়িত ভীমসিন্ধু পারাগত, যোগ্যবয়সিত, মিত্রবদাচরিত পুত্র! তোমার প্রাচ্য জনক ও প্রাচ্যজননীর স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ হও। সেই মিলনে প্রবীন প্রাচ্যের আর নবীন প্রতীচ্যের অশেষ কল্যাণকর অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হউক।

(করতালি)

বিনোদ—হে ভদ্র মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! আমার কোন উপযুক্ত কথা নাই, আপনাদিকে ধন্যবাদ দিতে, এই অত্যন্ত পরমভোগ্য আনন্দের জন্য যাহা আপনারা আজ আমাকে দিয়াছেন। আমি জানি, আমি যোগ্য নহি, এই উচ্চ সম্মানের। একজন রাজপুত্র গ্রহণ করিত এই সম্মান কৃতজ্ঞতার সহিত। আমি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছি। এমন শক্তি নাই, কিছু বলিতে পারি। যাহা হউক আমাকে দিন্ আবার ধন্যবাদ দিতে আপনাদিগকে। ধন্যবাদ আপনাদিগকে। হে ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ এবং আমার অতি প্রিয় কাণ্ঠিনদ্বয় মিষ্টার এবং মিসেস্ গ্যাপ্ট। আমি আজ যাহা বলিতে পারি, তাহা এই যে —পশ্চিম দেশ কি, তাহা আমি দেখিয়াছি। পশ্চিম হয় আলোক, পূর্ব্ব হয় অন্ধকার। পশ্চিম হয় জীবন, পূর্ব্ব হয় মৃত্যু। যদি আমরা আলোক চাহি, যদি আমরা জীবন চাহি, তবে পূর্ব্বকে অনুপ্রাণিত অনুপ্রবিষ্ট করাইতে হইবে পশ্চিম দ্বারায়।

(হিয়ার! হিয়ার! ও করতালি)

মনু—(অগ্রসর হইয়া) সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি হ'লে একটি দীন সঙ্গীতে আমাদের বন্ধু বিনোদবিহারীকে অভ্যর্থিত ক'রে কৃতার্থ হই।

মহি—কে, মনু! তবে একেবারে মধুরেণ সমাপয়েৎ ক'রো ভাই।

ভ্যাটা—Yes মনু। Come

মনু— গান।

ব্রজের কানাই গলে নেকটাই
এলি কি ভাই ব্রজে ফিরে!
ব্রজে ফিরে এলি কি ভাই
চুরুট-বদন কানাই ওরে!
ছিলি কোন্ সে শ্বেত মথুরায়,
শ্বেতবরণ কি লেগেছে গায়?
(নাঃ) গাটা ত সেই চিকণ কালই,
মন শ্বেতিয়ে এলি কি রে?
শিরে নাই আর মোহন চূড়া,
কাল অঙ্গে পীত ধড়া,—
মথুরার এ রাজার বেশে,
চিনেও যে দায় চেনা তোরে।
ব্রজভরা ধুলো সাদায়,
রাখালগুলো গরুই চরায়,—
তোর) বেশটি রাজার প্রাণটি সাদার
ব্রজে কি আর তিষ্টোবি রে?
ব্রজের যত গোপ আর গোপী
(আজ) ত্যাখ কি তাদের লাফালাফি,
তারা যে সব তোরি কানাই
তুই কি তাদের হবিনি রে!
আছে সবাই তৈরী হ'য়ে,
এদেরও সব নে সাজিয়ে,—
মাথুর লীলায়—ব্রজে আজ সব
গোপগোপী তোর নাচবে ঘিরে!

প্রথম অঙ্ক সম্পূর্ণ

ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

গল্পলহরী

২য় বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩২০। | ৮ম সংখ্যা

মাধুরী-মহিমা।

প্রথম দৃশ্য।

সাজিহান বাদসার রাজত্বকালে এক দিবস অতি প্রত্যুষে শান্তিপুরের ঘাটে একখানি ক্ষুদ্র তরণীর উপরে গেরুয়া বসন পরিধান একটী যুবক দণ্ডায়মান হইয়া মাঝিদিগকে নৌকা খুলিয়া দিতে বলিতে ছিলেন;—নদীতীরে একটী চতুর্দ্দশ বর্ষিয়া বালিকা দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে ইহা দেখিতে ছিল;—সে যখন দেখিল নৌকা খুলিয়া যায়, তখন বলিল, "যাও,—আমার কথা না শোন যাও।" তখন যুবক ধীরে ধীরে নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া উপরে আসিয়া বালিকার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "মাধুরী এত বুঝাইলাম, তবু বুঝিলে না। আমি যদি এখানে থাকি, তবে তোমাকে দুঃখ পাইতে হইবে। তুমি বিধবা,—তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবার সম্ভবনা নাই,—ইহার মধ্যেই লোকে নানা কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমার পবিত্র নামে কলঙ্ক রটাইবে ইহা আমার সহ্য হইবে না। তোমাকে পাইবার আশা নাই, তোমাকে না পাইয়া আমার সংসার শ্মশান হইবে। তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তোমাকে ভুলিব,—জঙ্গলে জঙ্গলে, বনে বনে ঈশ্বরের ধ্যান করিয়া তোমাকে ভুলিব,—পারিব কিনা তিনিই জানেন। আমি অনেক ভাবিয়াছি—তুমি আমাকে ভুলিতে পারিবে,—হয়তো একরূপ সুখেও থাকিবে। যাইবার সময় আর আমায় বাধা দিও না; আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর যে আমায় ভুলিতে চেষ্টা করিবে।"

মাধুরী ধীরে ধীরে তাহার অশ্রুজলসিক্ত মাধুরীময় মুখখানি তুলিয়া বলিল, "যাও—পারিত ভুলিব।"

দ্বিতীয় দৃশ্য।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে মুরসিদাবাদের অভাগিনী বারবণিতাগণের প্রধান বাসভূমির একটী সুন্দর বাটীর দ্বিতলস্থ একটী সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষের দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যার উপর শয়ন করিয়া একটী অষ্টাদশ বর্ষিয়া অলোকসামান্যা রূপ-সম্পন্না যুবতী গীত গোবিন্দ হইতে নিম্ন লিখিত গীতটী অর্দ্ধ সঙ্গীতস্বরে পাঠ করিতেছিল—

"রতি সুখ সারে, গত মভিসারে মদন
মনোহর বেশং;
ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বন, মনুসর
তং হৃদয়েশং;
ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।"

এই সময় একজন দাসী আসিয়া বলিল, "একজন বাবু আসিয়াছেন।"

সুন্দরী পুস্তক পাঠ বন্ধ করিয়া কহিলেন, "বাবু! কি রকম বাবু?"

ঝি বলিল, "খুব বড় জুড়ী করে এসেছেন, বয়স খুব অল্প, দেখতে খুব সুন্দর, হাতে দশ আঙুলে দশটা হীরের আংটী। আর বল্লে না প্রত্যয় যাবে, গলায় একটা দড়ার মত মোটা হার।"

রমণী ধীরে ধীরে মস্তক তুলিলেন, বলিলেন, "এমন! কি উদ্দেশ্য? বাবু তোমায় কত দিলেন?"

"মা ঠাকরুণ যেন কেমন! আমি ডেকে দিই,—এই বলিয়া ঝি চলিয়া গেল। রমণী পাঠ করিতে লাগিলেন;—

পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে, শঙ্কিত
ভবদুপযানং;
রচয়তি শয়নং, শচকিত নয়নং, পশ্যতি
তব পন্থানং।"

একটী নানা সাজে সজ্জিত বাবু প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু রমণী তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না। বাবু প্রায় পাঁচ মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান

থাকিয়া বলিলেন, "আমি বোধ হয় মুরসিদাবাদের অদ্বিতীয়া রূপবতী মুন্নাবাঈয়ের সৌন্দর্য্যে চক্ষু সার্থক করিতেছি।"

সুন্দরী মুন্না ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলিত করিলেন, অতি ধীরে ধীরে উঠিয়া শয্যার উপর উপবেশন করিলেন, সেই ভাবে বস্ত্রাদি শরীরের যথাস্থানে সংস্থাপন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমার ক্ষুদ্র গৃহ কোন্ মহাত্মা আলোকিত করিলেন, তাহা এখনও জানিতে পারিলাম না?"

বাবু ত্রস্তে বলিলেন, "লোকে আমায় রাজা শশীশেখর রায় বলে। হরিহরপুরে কিছু জমিদারী আছে। তোমাকে মহারাজা রাধানাথের বাটীতে দেখিয়া পর্য্যন্ত আমি তোমার রূপে পাগল হইয়াছি। আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমার,—বিনিময়ে কেবল তোমার করুণার ভিক্ষারী।"

সুন্দরী একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি ভুল করিয়াছেন, আমার নাম মুন্না নহে,—মাধুরী।"

রাজা বাহাদুর একটু অপ্রতিভ হইলেন,—কিন্তু তিনি সহজে সামান্য বার-বনিতার নিকট অপ্রতিভ হইবার লোক নহেন, বলিলেন, আমি মুন্নাবাঈকেই চাই।"

"আপনারা তবে রূপ চাহেন না দেখিতেছি,—কেবল নামই চাহেন। মুন্নাতো আমার চেয়ে সুন্দরী নহে, আর তাহার বয়স যে আমার চেয়ে ঢের বেশী,—" এই বলিয়া সুন্দরী মৃদু হাসিয়া আবার ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন,—

মুখর মধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং, রিপুমিব
কেলিষু লোং;
চল সখি কুঞ্জং, সতিমির পুঞ্জং, শীলয়
নীল নিচোলং।"

সেই মধুর স্বর শুনিয়া রাজা ভাবিলেন যে, তাহার কখনও ভুল হয় নাই,—এই মুন্না। কিন্তু মুন্না কথা কহে না, অগত্যা রাজা গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। যেই রাজা প্রকোষ্ঠের বাহিরে গেলেন, অমনি সুন্দরী সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া শয্যাপরি বসিয়া ডাকিলেন, "ঝি।"

ঝি আসিয়া দাঁড়াইল, মুন্না বলিলেন, "বাবুকে আর আমার নিকট আসিতে দিও না।"

"কি জানি তোমার ভাবই ভিন্ন," বলিয়া ঝি চলিয়া গেল। সুন্দরী ধীরে ধীরে বাতায়নে আসিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঝি আসিয়া একটী হস্তীদন্ত নির্ম্মিত বাক্স উন্মুক্ত করিয়া মুন্নার সম্মুখে রাখিল, বলিল, "বাবু তোমার জন্য পাগল; আমাকে কত সাধ্যি সাধনা, তার পর দেখ কত গয়না শুদ্ধ এইটা তোমায় দিলেন, বল্লেন তাঁর যত ঐশ্বর্য্য সব তোমার। অমন কর কেন? বাবুকে কাল আসতে বলবো?"

রমণী বলিলেন, "না, ওটা আমার বালিসের নিচে রাখ,—ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঐ?" সুন্দরীর চম্পক বিনিন্দিত কপোল যুগলে সহসা শোণিত রাশি দেখা দিল কিন্তু তিনি নিজ হৃদয়ের ভাব দমন করিয়া বলিলেন, "বাবুকে শনিবার সন্ধ্যার পর আসিতে বল।"

তৃতীয় দৃশ্য।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে এক দিবস সন্ধ্যাকালে একটি যোগী আসিয়া কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকা, হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অপর একটী যোগী তথায় বসিয়া গঙ্গার শোভা দেখিতে ছিলেন। যোগী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহাত্মন অদ্য বারানসী ধামের কোন স্থানে রাত্রি যাপন করিতে পারি?"

যোগী কহিলেন,—"ভ্রাতঃ সে বিষয়ে অদ্য দুই বৎসর হইতে কাশীধামে বড়ই সুবিধা হইয়াছে। মুরসিদাবাদের মুন্নাবাঈ নাম্নী কোন বারবণিতা তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কাশীধামে যোগীদিগের নিমিত্ত একটী নিবাস ও ছত্র স্থাপনা করিয়াছে,—সেখানে শয়নের ও ভোজনের ক্লেশ নাই।"

"কোন পথে যাইলে সেই নিবাসে যাইতে পারা যায়?"

"চলুন আমিও উপস্থিত সেই নিবাসে বাস করিতেছি।"

মিশিরপোকরা নামক পল্লীর একটী অতি সুন্দর বাটীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া যোগী কহিলেন, "ঐ মাধুরী-মহিমা।"

দ্বিতীয় যোগী এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন "মাধুরী-মহিমা কি?"

"যে নিবাসের কথা বলিলাম সে ঐ।"

"আপনি না বলিলেন উহা একটি বারবণিতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে?"

"হাঁ, মুরসিদাবাদের মুন্নাবাঈ এই নিবাস স্থাপনা করিয়াছে,—আসুন সমস্ত দেখাই,—তৎপরে সকল বলিতেছি," এই বলিয়া উভয়ে সেই সুন্দর অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন, সম্মুখে একটী শিবলিঙ্গ,—সেই লিঙ্গ পূজার্থে যাইতে

হইলে একটি প্রশস্ত পথ দিয়া যাইতে হয়, সেই পথে প্রস্তরের একটী রমণী মূর্ত্তি অঙ্কিত,—ঐ মূর্ত্তির নিম্নে লিখিত :—

অভাগিনী মাধুরীর বিনয় নিবেদন,

মহাত্মন—পবিত্র পদ পাপিয়সীর হৃদয়ে

স্থাপন করিয়া পদধূলি

দানে তাহার পাপের

শান্তি করুণ।

ইহা পাঠ করিয়া যোগী স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আমাকে এই অট্টালিকার সবিশেষ পরিচয় দিন,—নতুবা আমি অগ্রসর হইতে পারি না।" অপর যোগী যোগার এইরূপ ভাব দেখিয়া বলিলেন, "আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন, তবে শুনুন। অগ্রেই বলিয়াছি মুন্নাবাঈ নামে একজন মুরসিদাবাদের বারবণিতা এই নিবাস স্থাপনা করিয়াছে কিন্তু এক বৎসর এই মন্দির স্থাপনা হইবার পর এক দিবস এই স্থানের সমস্ত যোগিগণ একত্র হইয়া স্থির করিলেন যে মুন্না তাহার প্রকৃত নাম নহে, তাহা যদি হইত তবে এই মূর্ত্তির নিম্নে সে মাধুরী লিখিবে কেন? যোগিগণ সকলে এক বাক্যে কহিলেন, যে যখন এক বৎসর ধরিয়া লক্ষাধিক যোগীর পদধূলি ইহার মস্তকে পড়িয়াছে—তখন ইহার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই নিবাস স্থাপনের জন্য ইহার পুণ্য সঞ্চয় হইতেছে; সুতরাং আজ হইতে এই আবাসের নাম 'প্রায়শ্চিত্ত' না হইয়া "মাধুরী-মহিমা" হউক। মুন্না ইহার নাম "প্রায়শ্চিত্ত" রাখিয়াছিল কিন্তু এখন হইতে ইহাকে সকলে "মাধুরী-মহিমা" কহে।"

যোগী কহিলেন, "মহাত্মন্, কোন কারণ বশতঃ আমি এই মাধুরী মূর্ত্তির হৃদয়ে পদ স্থাপন করিতে পারিতেছি না,—অন্যত্র কোন স্থানে অদ্য নিশাযাপন করিব। আপনাকে অনর্থক ক্লেশ দিলাম, ক্ষমা করিবেন।"

অপর যোগী কহিলেন, "আপনার বাক্যে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি,—যাহা হউক কারণ জানিবার আমার ইচ্ছা নাই, তবে কোন মহাত্মনের সহিত আজ পরিচিত হইলাম তাহা কি জানিতে পারি?"

"দাস মাধুর্য্যানন্দস্বামী নামে পরিচিত।" যোগী আর কোন কথা না কহিয়া দ্রুতপদে "মাধুরী-মহিমা" পরিত্যাগ করিলেন।

প্রথম দৃশ্য।

১

শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে যে বালিকা দাঁড়াইয়া নৌকা দেখিতেছিল, তাহার নাম মাধুরী। মাধুরী শান্তিপুরের ব্রহ্মমোহন মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। ব্রাহ্মণের কয়েক ঘর যজমান ছিল, তাহাতেই একরূপ সংসার চলিত। মাধুরী, মাধুরীর মাতা ও ললিত প্রসাদ নামক একটী যুবক, এই তিন জন মাত্রকে লইয়া ব্রহ্মমোহনের পরিবার;—সুতরাং তিনি যাহা পাইতেন, তাহাতে দরিদ্র হইলেও তাঁহাদের কোন ক্লেশ ছিল না। মাধুরীর জন্মের ছয় বৎসর পূর্ব্বে মাধুরীর মাতার এক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া ললিত প্রসাদকে পৃথিবীতে আনিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন;—শিশুর জন্মের তিন মাস পূর্ব্বে শিশুর পিতারও মৃত্যু হয়। ব্রহ্মমোহনের কোন সন্তান ছিল না;—সুতরাং ব্রাহ্মণী এই শিশুকে পালন করিতে চাহিলে, তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। মাধুরীর মাতা শিশুকে অনেক কষ্টে বাঁচাইলেন—অন্নপ্রাসন দিলেন, নাম রাখিলেন, ললিত প্রসাদ। ললিত ছয় বৎসরের হইলে মাধুরীর জন্ম হইল। বালক বালিকা এক বৃন্তের দুইটী পুষ্পের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ললিত প্রসাদ বিখ্যাত রাম নারায়ণ তর্করত্নের টোলে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিলেন;—বাটী আসিয়া তিনি মাধুরীকে পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দিতেন। যখন চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক ললিত ও অষ্টম বর্ষিয়া মাধুরী ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চীৎকার করিয়া সমস্বরে সংস্কৃত পাঠ করিত তখন বড়ই সুন্দর দেখাইত।

ক্রমে উভয়েই যৌবনের প্রারম্ভে পদার্পন করিলেন কুমার সম্ভব গীত গোবিন্দ ইত্যাদি পাঠ করিয়া মনে প্রেমের অঙ্কুর রোপিত হইল,—ললিত তাহা বুঝিলেন, মাধুরী নিজ মনের পরিবর্ত্তন কিছুই বুঝিল না। ক্রমে পড়া শুনায় অযত্ন হইতে লাগিল,—উভয়ে উভয়কে ত্যাগ করিয়া আর অধিক্ষণ থাকিতে পারে না। ললিত তাঁহার জন্মের সকল কথা শুনিয়াছিলেন; সুতরাং ভাবিয়াছিলেন যে, মাধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ অসম্ভব নহে।

এই সময় কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হওয়ায় ও সহসা একটী সুপাত্র পাওয়ায় ব্রহ্মমোহন কন্যার বিবাহ দিলেন কিন্তু মাধুরীর এমনই দুরাদৃষ্ট যে, বিবাহের ছয় মাসের মধ্যেই তাহার স্বামীর মৃত্যু হইল,—কাজেই মাধুরীর আর শ্বশুরালয়ে যাওয়া হইল না। পিতা মাতা কত কাঁদিতে লাগিলেন,—মাধুরী তাহাদের সহিত কাঁদিল বটে কিন্তু কেন কাঁদিল বুঝিল না,—ললিত টোল হইতে আসিলে তাহার

যেমন হাসি মুখ তেমনি হইল। কিন্তু সেইদিন হইতে ললিতের মুখের হাসি লোপ পাইল, সর্ব্বদাই যেন তাহার মুখে কি এক বিষাদের মেঘ ভাসিয়া বেড়াইত। ললিত প্রথমে হৃদয়ের বেগ দমন করিবার চেষ্টা করেন নাই, ভাবিয়া ছিলেন মাধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। যখন মাধুরীর বিবাহের উদ্যোগ হইল, তখন তিনি মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারেন নাই;—ভবিয়া ছিলেন,—না হয় আমিই কষ্ট পাইব, মাধুরীতো সুখে থাকিবে। কিন্তু যখন দেখিলেন মাধুরী বিধবা হইল, তখন বুঝিলেন সকলই পণ্ড হইল, নিজেতো দুঃখী হইয়াছেন,—মাধুরীও হইল।

একদিন সন্ধ্যাকালে ললিত প্রসাদ চিন্তিত মনে টোল হইতে ফিরিতে ছিলেন, পথিমধ্যে দুই ব্যক্তি যাইতে যাইতে কি বলিয়া তাহার নাম উচ্চারণ করিল। তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া একটু মৃদু পদে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, শুনিলেন একজন বলিতেছে, "মাধুরী বড় লক্ষ্মী মেয়ে অমন কথা ব'ল না।" আর একজন বলিল, "আর বল না! আগুণের কাছে ঘি কবে ঠিক থাকে? অমন সুন্দর যুবতী, তাতে আবার বিধবা!" ললিত আর শুনিতে পারিলেন না,—দ্রুতপদে সেই ব্যক্তিদ্বয়কে পশ্চাৎ করিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। গৃহে আসিয়া অসুখ করিয়াছে বলিয়া কিছুই আহার করিলেন না। সমস্ত রাত্রি ভাবিলেন,—পরে স্থির করিলেন, মাধুরীর সুনাম ও তাহার সুখের জন্য তাঁহার এ গৃহ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য;—নতুবা কয়েক দিনের মধ্যেই লোকে মাধুরীর নামে কলঙ্ক রটাইবে তাহাতো তাঁহার প্রাণে কখনও সহ্য হইবে না। এখন মাধুরীকে ত্যাগ করিলে, মাধুরী বালিকা,—ভালবাসা কি বুঝে না, সময়ে সে তাহাকে ভুলিতে পারিবে। মাধুরী শিক্ষিতা ও ধর্ম্মিষ্ঠা;—অবশ্য যখন সকল বুঝিবে তখন ধর্ম্মাচর্য্যায় একরূপ সুখে থাকিবে। পর দিবস মাধুরীকে নির্জ্জনে লইয়া তিনি সকল কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মাধুরী কিছুই বুঝিবে না, বলিল, "পার যাও।"

তখন ললিত ভাবিল অগত্যা আমাকে পলায়নই করিতে হইবে। তিনি রাত্রিতে ব্রহ্মমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সকল কথা লিখিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। পূর্ব্বেই একখানি নৌকা স্থির করিয়াছিলেন,—প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই গেরুয়া-বসন পরিধান করিয়া কেবল নিজ পুঁথি কয়েকখানি সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদে গঙ্গাতীরে আসিলেন। মাধুরীও সে রাত্রে নিদ্রা যায় নাই,—সে মাতার নিকট শয়ন করিত;—যখন শুনিল যে কে দ্বার খুলিয়া বাহির হইতেছে, তখন সেও ধীরে

ধীরে বাহিরে আসিল, দেখিল ললিত নিশব্দে বাহির হইয়া যাইতেছেন। সে কোন কথা না কহিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল,—ললিত নৌকায় আসিয়া দাঁড়িগণকে জাগ্রত করিলেন। যখন নৌকা খুলিয়া যায়, তখন মাধুরী বলিল, "যাও—আমার কথা না শোন যাও।"

ললিত চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন মাধুরী। তাহার পর যাহা হইল পাঠক অবগত আছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

১

ক্রমে সকলে জাগ্রত হইলেন,—ব্রহ্মমোহন ললিতের পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণীকে সকল কথা বলিলেন,—তিনি ললিতকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণও চক্ষুর জল উত্তরীয় দ্বারা মুছিতে মুছিতে ললিতের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন কিন্তু ললিতের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। কেবল মাধুরী কাঁদিল না,—একটী কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। তবে তাহার মুখের সে উজ্জল হাসি গিয়াছে দেখিয়া সকলেই বুঝিল যে, ললিতের জন্য মাধুরী মনে মনে কষ্ট পাইতেছে।

মাধুরী প্রায় চারি বৎসর বিধবা হইয়াছিল কিন্তু সে বিধবার মত থাকিত না,—সে মাছ খাইত, শাঁখা পরিত, চুল বাঁধিত। তাহার মাতা তাহাকে এ সকল করিতে কখনও নিষেধ করেন নাই। ললিতের বাটী ত্যাগের এক মাস পরে যখন সকলেই তাহাকে ভুলিতেছিল সেই সময় একদিন মাধুরী মাতার নিকট বসিয়া পইতা কাটিতে কাটিতে সহসা বলিল, "মা আমি না বিধবা।"

মা একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন। মাধুরী মাতার ক্রন্দনে দৃকপাত করিল না, নিকটে একখানি দা পড়িয়াছিল তাহারই অপরদিক দিয়া সে হস্তের সমস্ত শাঁখা গুলি একে একে ভাজিয়া ফেলিল। নিঃশব্দে চুল খুলিল, দাওয়ার নিম্ন হইতে ধূলা লইয়া সমস্ত চুলে মাখাইল তৎপরে কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "এখন ঠিক হয়েছে। বিধবা বিধবার মত থাকবে;—তবে তুমি কাঁদ কেন।" সেই দিন হইতে মাধুরী বিধবার কঠোর নিয়ম সকল পালন করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল,—এই সময় সহসা জ্বর বিকারে ব্রহ্মমোহন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তিনি তাহার খুল্লতাত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের হস্তে মাধুরীকে সমর্পণ করিয়া গেলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে,

তাঁহার ব্রাহ্মণী নিশ্চয়ই সহমৃতা হইবেন। সত্য সত্যই তাহাই ঘটিল,—ব্রাহ্মণী কন্যার দিকে একবারও চাহিলেন না,—সহাস্য বদনে স্বামীর চিতায় ভস্মীভূত হইলেন। খুল্লতাত হরিমোহন, এরূপ অবস্থা হইলে অধিকাংশে যাহা করে, তিনিও তাহাই করিলেন। ব্রহ্মমোহনের সমস্ত অর্থ ও দ্রব্যাদি নিজ গৃহে যত্নে রহিবে বলিয়া তথায় লইয়া গেলেন ও বিধবা পঞ্চদশ বর্ষিয়া নাতিনীর সহিত ঠাট্টা তামাসা ক্রমেই বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুর দুই তিন মাস যাইতে না যাইতে মাধুরী দেখিল, তাহার ঠাকুরদাদা তাহাকে যত্ন কিছু অধিক করিতেছেন, প্রত্যহই তাহাকে চুল বাঁধিতে ও পান খাইতে বলেন। মাধুরী কতক বুঝিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

এক দিবস হরিমোহনের পরিবারস্থ সকলে ত্রিবেণী গঙ্গা স্নানে চলিলেন, মাধুরীকে কেহ যাইতে বলিল না, মাধুরীও কোন কথা কহিল না। সন্ধ্যার সময় হরিমোহন বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। বাটী আসিয়া বলিলেন, "দেখ্ মাধু, তোর জন্য কেমন একখানা কাপড় এনেছি।"

মাধুরী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "তারা সব কোথায়?" হরিমোহন কহিলেন, "তারা আজ সেখানে থাকিল, কাল প্রাতঃস্নান করে আসবে, বাটীতে কেহ নাই বলিয়া আমি আসিলাম। মাধু আজ তোর ঠোঁট দুখানি যে বেশ লাল হয়েছে।"

হরিমোহন এ কথা সে কথার পর সহসা মাধুরীর হাত ধরিলেন, মাধুরী ভুজঙ্গিনীর ন্যায় মস্তক উত্তোলিত করিয়া হস্ত মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না;—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঠাকুরদাদা আমি তো অনেক কষ্ট পাইতেছি, আর কেন কষ্ট দাও? আমি তো কাহারও কোন ক্ষতি করিতেছি না, প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া আপনার কাজ করিতেছি, আমার উপর অত্যাচার করিবেন না। আমার আর কে আছে? বাবা আপনার আশ্রয়ে আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন, আপনি এরূপ করিলে আর আমি কোথায় যাইব।"

পাষাণের হৃদয় বালিকার অশ্রুজলে সিক্ত হইবে কেন? হরিমোহন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন;—বলিলেন, "ছেলে মানুষ কিনা?" এই বলিয়া হরিমোহন মাধুরীকে একেবারে আক্রমণ করিল;—মাধুরী ভূমে পতিত হইল, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই উঠিয়া হরিমোহনের বুকে সজোরে পদাঘাত করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া নিকট হইতে একখানা বঁটী তুলিয়া লইয়া বলিল, "দেখ, প্রাণের মায়া যদি থাকে, তবে আমার নিকট আর আসিও না। আমি পাগলিনী কি করিতে কি করিব।"

হরিমোহন ধূলায় ধূসরিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রাগে তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিতেছিল, নীরবে কোন কথা না বলিয়া গৃহের বাহির হইয়া গেলেন। পর দিবস হইতে মাধুরী ঠাকুরদাদার তামাসা ও আদর হইতে বঞ্চিত হইল,—সমস্ত গৃহ-কার্য্য, ধানসিদ্ধ ও রন্ধন হইতে গরুর পরিচর্য্যা পর্য্যন্ত সকলই তাহার করিতে হইল। আর মাধুরী বস্ত্র পায় না,—আর মাধুরী মস্তকে তেল পায় না—আর মাধুরী উদরে আহার পায় না।

২

যে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় নিজ বাটীর পার্শ্ব দিয়া যুবকদিগকে চলিতে দেখিলে কয়েকদিন পূর্ব্বে গালাগালি দিয়া ভূত ছাড়াইতেন, তিনিই এক্ষণে নানাপ্রকারে মাধুরীকে এই সকল লোকের সম্মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন;—মাধুরী প্রত্যহই নানা প্রকারে এই সকল উদ্ধত যুবকের দ্বারা অপমানিত হইতে লাগিল। বাটীতে অত্যাচার, গালাগালি, অনাহার, বাহিরেও উপহাস! মাধুরী অনেক সহ্য করিতে পারিত কিন্তু ক্রমেই তাহার এ সকল অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

পিতার মৃত্যুর পর এইরূপে ছয়মাস কাটিয়া গেল। মাধুরী কি করিবে তাহাই দিন রাত্রি মনে মনে ভাবিত কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিত না। কতদিন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে রাত্রিতে বাটী ত্যাগ করিয়া পালাইবার জন্য উঠিয়াছে, কিন্তু একাকিনী বাটীর বাহির হইতে তাহার সাহস হয় নাই;—অমনি সে বালিসে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছে।

একদিন রাত্রে মাধুরী ব্যঞ্জনে লবণ দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, এই জন্য হরিমোহন তাহাকে কুৎসিত গালাগালি দিয়া বাটীর বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। মাধুরী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মাধুরী নড়ে না দেখিয়া হরিমোহন দুই তিন ধাক্কায় তাহাকে গৃহের বাহির করিয়া দিলেন। মাধুরী যাইবে কোথায়? বাটীর পার্শ্বেই একটী পুষ্করিণী ছিল,—অনাথিনী বালিকা ঘোর অন্ধকারে একাকিনী সেই পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

প্রায় মাসাবধি হইতে হরিমোহনের বাটী একটী স্ত্রীলোক আসিয়া বাস করিতেছিল, সকলে তাহাকে ভুতোরমা বলিত। সে জল আনিতে পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া মাধুরী কাঁদিতেছে দেখিল। দেখিয়াই সে একেবারে আসিয়া মাধুরীর হাত ধরিয়া তাহার চক্ষুজল মুছাইয়া বলিল, "আহা এমন করে কি গালাগালি দেয় গা। এস বাছা এস, তুমি আমার সঙ্গে এস, ও পাড়ায় আমার মাসির বাড়ী তোমায় রেখে আসি, এমন বাড়ীতে কি আর থাকতে আছে।"

মাধুরীর হরিমোহনের সেই ভীষণ মূর্ত্তিই মনে পড়িতেছিল ;—সুতরাং সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিল। মাধুরী ভুতোরমার সহিত অন্ধকারে প্রায় এক ঘণ্টা চলিয়া একটী সুন্দর অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাধুরী সেই অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "এ কার বাড়ী ?"

ভুতোরমা বলিল, "এ বাড়ীতে আমার মাসি চাকুরী করে।"

মাধুরী দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই সুসজ্জিত মনোহর অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। নানাবিধ মনোহর দ্রব্যে সুসজ্জিত নানা প্রকোষ্ঠ মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে আনিয়া ভুতোরমা বলিল, "তুমি এইখানে বস,— "আমি মাসিকে ডাকি।"

মাধুরী বলিল, "এ বাড়ীতে তো এত ঘর দিয়া আসিলাম,—কাকেও তো দেখিলাম না,—এ বাড়ীতে কি লোক নেই ?"

"ওদিকে তাঁরা সব আছেন," বলিয়া ভুতোরমা প্রস্থান করিল, মাধুরী দেখিল, সে বাহির হইতে গৃহের দ্বারের শিকল আটিয়া দিল। তখন তাহার সন্দেহ হইল, চারিদিক দেখিল, কোন দিক দিয়া বাহির হইবার উপায় নাই। তাহার আর বুঝিতে বাকি রহিল না, ভূমিতলে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

৩

বর্দ্ধমান রাজবংশের কেহ কেহ কাল্‌নায় বাস করিতেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় অনুরূপচাঁদ নামক এক যুবক মহা আড়ম্বরে কালানায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে নিকটস্থ সমস্ত স্ত্রীলোকগণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। শান্তিপুরে অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে শুনিয়া তিনি এইস্থানে বৈঠকখানা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুন্দরী যুবতী অনুসন্ধানে কয়েকটী স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিত ; কোন একটী সংগ্রহ হইলে রাজা বাহাদুর আসিয়া এইখানে বাস করিতেন ; বলা বাহুল্য ভুতোরমা ইঁহারই একজন চর। মাধুরীর প্রতি ভুতোরমার অনেকদিন দৃষ্টি ছিল। মাধুরীর ন্যায় সুন্দরী শান্তিপুরে কেন, এমন কি বঙ্গদেশে অল্পই ছিল, সুতরাং সে জানিত মাধুরীকে হস্তগত করিতে পারিলে অনেক অর্থ পাইবে। মাধুরীর পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সে এ কার্য্য সহজ বোধ করে নাই, ব্রহ্মমোহনের মৃত্যুর পর সে ভাবিয়া ছিল এখন কার্য্য সহজেই সিদ্ধ হইবে কিন্তু সে আশায়ও সে বঞ্চিত হইল, হরিমোহন অতি সাবধানে মাধুরীকে রাখিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে সে দেখিল আর হরি-মোহন মাধুরীকে সে ভাবে রাখিতেছে না ;—তখন সে শীঘ্রই সকল জানিল ও

একেবারে হরিমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার হস্তে পঞ্চাশ মুদ্রা দিয়া নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিল। হরিমোহন তাহাই চাহিতেছিলেন, তিনি সহজেই রাজি হইলেন, এবং গোপনে মাধুরীকে সরাইবার জন্য সেই অবধি ভুতোর মা তাঁহার বাটীতেই রহিয়া গেল। এক্ষণে সে মাধুরীকে প্রমোদ উদ্যানে বন্দী করিয়া সত্বর যাইয়া অনুরূপচাঁদকে সংবাদ দিল, যে তাঁহার জন্য আর একটী পক্ষী ধৃত হইয়াছে।

ভুতোরমা মনে করিয়াছিল উদ্যানে কেহ নাই, কিন্তু তাহা নহে। সন্ধ্যার সময় কালনা হইতে রাজার বজরায় মুরসিদাবাদের বিখ্যাত বাঈ মতি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। রাজা নির্জ্জনে গান শুনিবার ইচ্ছা করায় তাই আজ মতিবাঈ নৌকারোহণে রাজার নির্জ্জন উদ্যানে আসিয়াছিল; রাজা দুইদিন পরে আসিবেন। মতি দেখিল একটী অতি সুন্দরী যুবতীকে এক বৃদ্ধা গৃহে নিকট আসিয়া রাখিয়া গেল। কি উদ্দেশ্যে যুবতীকে এরূপ ভাবে এখানে রাখিয়া গেল তাহা বুঝিতে তাহার অধিকক্ষণ বিলম্ব হইল না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে নূতন ভাবের উদয় হইল, সে ভাবিল ইহাকে সরাইতে পারিলে মন্দ হয় না। আমার বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইল, পসার ক্রমেই কমিতেছে, এই সময় এই রূপ একটী সাক্‌রেত বানাইতে পারিলে মুরসিদাবাদ একচেটিয়া করিতে পারিব।

পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রিনীর ন্যায় মাধুরী রুদ্ধদ্বার গৃহে পদাচরণ করিতেছিল। সে ভুতোরমার দুষ্টাভিসন্ধি সকলই বুঝিয়াছিল, প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবিতেছিল ঐ কোন নরাধম আসে। দ্বার উন্মোচন হইবার শব্দ শুনিয়া সে কটি হইতে প্রিয় ছুরিকা বাহির করিল,—কিন্তু কোন পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিল না,—প্রবেশ করিল মতিবাঈ। মাধুরী স্ত্রীলোক দেখিয়া একেবারে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আপনি আমায় রক্ষা করুন।"

মাধুরী ভাবিয়াছিল ইনিই এ বাটীর কর্ত্রী। ধূর্ত্তা মতি মাধুরীর ভুল বুঝিল, বলিল, "দেখ বাছা, আমি সব বুঝিয়াছি,—আমার হতভাগ্য ছেলের জন্য গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে, সে যে কত জনের সর্ব্বনাশ করছে তা ভগবান জানেন। তা বাছা তোমার কে আছে—কার কাছে পাঠিয়ে দিব।"

মাধুরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার কেউ নাই, আপনি আমায় রক্ষা করুন।"

মতি দুঃখিতস্বরে বলিল, "তা বাছা এখানে থাক্‌লে, আমার সাধ্য নেই যে তোমায় রক্ষা করি। মুরসিদাবাদে আমার এক কন্যার শ্বশুর বাড়ী। সেখানে যদি থাকিতে চাও তো পাঠাইয়া দিতে পারি। তাহাদের কাজ কর্ম্ম করিলে সুখে থাকিতে পারিবে।"

মাধুরী বারবণিতার ছলনা কিছুই বুঝিল না,—ব্যাকুলভাবে বলিল, "তবে আমায় সেই খানেই পাঠাইয়া দিন।"

"আচ্ছা তাহা হইলে একটু অপেক্ষা কর আমি এখনি তোমায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি," এই বলিয়া মতি তাহার একজন বিশ্বাসী লোককে সকল বলিয়া নৌকা স্থির করিতে পাঠাইল। সেই রাত্রেই অভাগিনী মাধুরী মতির দাসী সহ মুরসিদাবাদে বারবণিতাদিগের মধ্যে প্রেরিত হইল।

৪

তিন দিন নৌকায় যাপন করিয়া মাধুরী মুরসিদাবাদে পৌঁছিল, যখন সে নিজ গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল, তখন সে বুঝিল যে বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে যাইয়া অধিকতর বিপদে পতিত হইয়াছে। পল্লী ও গৃহাদির পারিপাট্য দেখিয়া মাধুরী সহজেই বুঝিল যে, এ ভদ্রলোকের বাটী নহে। সে নিজে রন্ধনাদি করিয়া আহারাদি করিতে লাগিল। বারবণিতালয়ে মাধুরীর এই ভাবে তিন দিন কাটিয়া গেল, তাহার পৌঁছিবার তিন দিবস পরে মতিবাঈ উপস্থিত হইল। এই তিন দিনে মাধুরী কি করিবে স্থির করিয়া লইয়াছিল। সে ভাবিল এই বিদেশে শত্রুপুরে জোর চলিবে না, কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। যখন তাহার কুলটা নাম হইয়াছে, তখন তাহা আর কিছুতেই যাইবে না, যদি যায় তবে সে অর্থে, সুতরাং সে ভাবিল অর্থ উপার্জ্জন করিব। মতিবাঈ যখন আসিয়া নানারূপে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল, তখন সে রাগতভাব একেবারেই প্রকাশ করিল না। তাহাকে এরূপ দেখিবে মতি তাহা একবারও আশা করে নাই, তাই সে মনে মনে ভারি আনন্দিত হইয়া বলিল, "আমি তোমার সকল কথা শুনিয়া আসিয়াছি, যাই হউক তুমি ভাই যে কষ্টে ছিলে তার চেয়ে এ আমাদের সহস্র গুণ ভাল। দেখ, ভাই আমি কত সুখে আছি,—তুমি এরচেয়েও সুখে থাকিতে পারবে!"

মাধুরী মতিকে বাধা দিয়া বলিল, "অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা লঙ্ঘন করে কে? যখন এ ব্যবসা করিতেই হইল, তখন দুএকটা কথা এর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি।"

মতি ব্যগ্র ভাবে বলিল, "কর না কেন, কি জিজ্ঞাসা করবে কর?"

মাধুরী বলিল, "প্রথম এই জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে সতীত্ব বিক্রয় করিলেই বা এ ব্যবসায় কত পাওয়া যায়, আর নাচ গান শিখিলেই বা কত পাওয়া যায় ?"

মতি এক গাল হাসিয়া বলিল, "বেশ ভাই, আমি তোমায় সব বলিতেছি শোন। তুমি যেমন রূপবতী—তাতে প্রতিদিন অন্ততঃ ১৬ টাকা রোজগার কর্ত্তে পারো,—আর যদি অদৃষ্ট ভাল হয়, তা'হলে কারো চোকে পড়ে গেলে আর তোমার ভাবনা কি ?"

"আর সতীত্ব বিক্রয় না করে যদি শুধু নাচ গাওনা করি ?"

"আমি প্রায় বিশ বৎসর এই কাজ করিতেছি,—শুধু নাচ গাওনা করে এমন মেয়ে মানুস একটীও দেখি নাই, যদি কেউ পারে তার পসার খুব বাড়ে। এমন কি দিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত মজুরা হ'তে পারে।"

"দেখ তুমি আমাকে টাকা পাইবে বলিয়া আনিয়াছ,—দেখিলাম যদি আমি সতীত্ব বিক্রয় করি, তাহা হইলে মাসে ৪৮০ টাকা পাইলেও পাইতে পারি, তাও যতদিন রূপ ও যৌবন আছে,—আর যদি ভাল গাইয়ে হই তবে একদিনেই হাজার টাকা পাইতে পারি। তুমি টাকা চাও, আমি তোমায় টাকা উপার্জ্জন করিয়া দিব—তুমি আমার সতীত্ব বিক্রয় করিতে জেদ করিও না।"

মতি হাসিয়া বলিল, "দেখ ভাই তুমি নূতন তাই ও কথা বলিতেছ,— দিন কতক বাদে আর ও সব থাকবে না। আচ্ছা ভাই তোমাকে আমি কখনও কিছু জেদ করিব না। আমি আজই ওস্তাদজীকে ডাকাইব, তুমি গানই শেখ।"

মতি উঠিয়া গেল, মাধুরী আর হৃদয়ের বেগ দমন করিতে পারিল না,—মতির সেই কলঙ্কিত শয্যায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

৫

মাধুরী লেখা পড়া জানিত,—অতি শীঘ্রই সে সঙ্গীতে উন্নতি করিতে সক্ষম হইল। তাহাতে তাহার গলা অতি সুমিষ্ট ছিল,—অতুলনীয় অধ্যাবসায়ে ছয় মাস যাইতে না যাইতেই মাধুরী অতি সুন্দর গায়িকা হইল। এই পাপপুরীর পাপ সঙ্গে পড়িয়া সে কি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সে মাধুরী নাম লুকাইল, মুন্নাবাঈ নাম লইয়া দুই তিন আসরে গাইল। দেখিতে দেখিতে তাহার নাম মুরসিদাবাদে প্রচার হইয়া পড়িল। এক বৎসর যাইতে না যাইতে সত্য সত্যই মুন্নাবাঈ হাজার টাকা মজুরা পাইতে লাগিল। মতি দেখিয়া শুনিয়া আর মাধুরীকে সতীত্ব বিক্রয়ের কথা বলিত না,

যদিও সে প্রত্যহই মুরসিদাবাদের নবাবপুত্রগণ হইতে সামান্য জমিদার পুত্র পর্য্যন্ত সকলের দ্বারাই অনুরুদ্ধ হইত কিন্তু এখন সে নিজেই মাধুরীর নিকট সর্ব্বদাই সশঙ্কিত।

মতি সকলকে তাড়াইতে পারিয়াছিল,—কেবল রাজা শশীশেখরকে পারিল না। তিনি মতিকে টাকার উপর টাকা দিতে লাগিলেন। মতি অগত্যা একদিন সাহস করিয়া মাধুরীকে এ কথা বলিল,—কিন্তু মাধুরী যেরূপ ভাবে "ফের ঐ কথা" বলিল তাহাতে তাহার আর দ্বিতীয় কথা কহিতে সাহস হইল না কিন্তু রাজাও ছাড়িবেন না, মতি অনুপায় হইয়া বলিল, "আমার দ্বারা কিছু হইবে না,—আপনি নিজে চেষ্টা করিয়া দেখুন।"

রাজা শশীশেখর মুন্নাবাঈএর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন;—মুন্না সকলের সহিতই সাক্ষাৎ করিত,—রাজা শশীশেখরের সহিতও সাক্ষাৎ করিল,—তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

শনিবার সন্ধ্যার সময় রাজা শশীশেখর মহা আনন্দে মুন্না বাঈর গৃহে আসিলেন। মাধুরী তাহাকে পালঙ্ক হইতে দূরে একখানি কেদারার উপর বসিতে অনুরোধ করিল। দাসী রৌপ্য পাত্রে পান ও স্বর্ণ ফুরসীতে তামাক আনিয়া দিল। রাজা শশীশেখর একছড়া বহুমূল্যের হীরক হার আনিয়াছিলেন,—মুন্নার গলায় পরাইয়া দিতে গেলেন, মাধুরী বলিল, "উহা ঐ খানে রাখুন,—আপনার উপহার সাদরে গ্রহণ করিলাম,—এখন দুই একটা গান শুনুন।"

মাধুরী তাহার বীণাবিনিন্দিত স্বরে একটির পর একটী করিয়া চার পাঁচ খানি গান গাইয়া সহসা নীরব হইল। রাজা সে সঙ্গীতে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন,—সে সঙ্গীতে বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত মোহিত হইত মানুষ কোন ছার! রাজা বলিলেন, "আর একটী।"

মাধুরী বলিল, "রাজন,—আমার নিকট দুই কার্য্য নাই, যদি গান শুনিতে চান তবে প্রতিজ্ঞা করুণ অন্য কোন প্রস্তাব করিবেন না। আমি যাহাকে আমার সঙ্গীত শুনাই তাহাকে দেহ দান করি না। এক্ষণে বলুন আপনি কি চান?"

রাজার কর্ণে সে বীণাধ্বনি তখনও ধ্বনিত হইতেছিল,—তিনি বলিলেন, "বাঈজী আর কিছু চাই না,—আমায় আর একটী গান শুনাও; মাধুরী গাহিল। তাহার পর হইতে রাজা শশীশেখর প্রায়ই আসিয়া সঙ্গীত শুনিতেন,—কখনও অন্য কথা উত্থাপন করেন নাই। কেবল রাজা শশীশেখর কেন মাধুরীর নিকট

যেই কুইচ্ছায় আসিত,—তাহাকেই সে এইরূপ করিত। শীঘ্রই এ কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল,—মুন্না ক্রমে সতীবাঈ নামে খ্যাতা হইল।

মাধুরী বাবুগিরী করিত না,—সুতরাং তাহার ব্যয় অতি অল্পই ছিল,—দুই বৎসর যাইতে না যাইতে তাহার প্রায় দুই লক্ষ টাকা জমিয়া গেল। তখন সে একদিন মতিকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ অর্থতো তোমায় অনেক উপার্জ্জন করিয়া দিয়াছি,—এখন আমি অবসর লইতে চাহি। তুমি আমার সকল কথাই জান, কেবল একটা কথা জানোনা, তাহাই আজ তোমায় বলিতেছি। আমি বাল্যকাল হইতে একজনকে বড় ভালবাসিতাম, তিনি পাছে আমার কষ্ট হয়, পাছে আমার নামে কলঙ্ক হয় এই জন্য দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। যাহার জন্য তিনি গেলেন,—সেই কলঙ্ক আমার হইয়াছে। যদি তখন সাহস হইত,—যদি সর্ব্ব-নাশের মূল সৌন্দর্য্য না থাকিত, তবে অনেক দিন পূর্ব্বেই, তাঁহার অনুসন্ধানে যাইতাম। এই তিন বৎসর বারবণিতা সাজিয়া আর কিছু হউক আর না হউক সাহস হইয়াছে,—এক্ষণে আমি তাঁহারই অনুসন্ধানে যাইব। যদি তাঁহার দেখা পাই,—তাঁহার পদে জীবন ত্যাগ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমার দুই লক্ষ টাকা আছে,—তাহা হইতে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কাশীতে সন্ন্যাসীদিগের জন্য আবাস নির্ম্মাণ করিব। তিনি সন্ন্যাসী কোন দিন না কোন দিন সেখানে আসিবেন। সেই মন্দিরে যাহা লিখাইব; যদি তিনি আমায় ভুলিয়া গিয়া না থাকেন তাহা হইলে তাহাতে আমার অনুসন্ধান করিতে তাঁহার ইচ্ছা নিশ্চয়ই হইবে। তিনি মুরসিদাবাদে অবশ্যই আসিবেন,—যদি আসেন সকল কথা বলিও। আর বলিও মাধুরী অদৃষ্টের স্রোতে ভাসিয়া বাহির হইয়াছিল,—কিন্তু সতীত্ব নষ্ট করে নাই। তাঁহাকে পাইবার প্রত্যাশা করি না,—কেবল মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহি। বাকী লক্ষ টাকার পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমায় দিয়া যাইতেছি। আর পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমার নিকট রহিল,—যদি চাহিয়া পাঠাই পাঠাইয়া দিও।"

পর দিবস মাধুরী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মুরসিদাবাদ ত্যাগ করিল। কয়েক মাসের মধ্যেই কাশীধামে প্রায়শ্চিত্ত নিবাস স্থাপনা হইল,—তথা হইতে মাধুরী কোথায় প্রস্থান করিল কেহ জানিল না। তবে কয়েক মাসের মধ্যে সমস্ত পশ্চিম প্রদেশ, হরিদ্বার হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত এক মাতাজী সন্ন্যাসিনীর অপূর্ব্ব করুণার কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল।

তৃতীয় দৃশ্য।

ললিতপ্রসাদ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া হরিদ্বার আসিলেন, তথায় আসিয়া গুরুর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কত যোগীর নিকট গেলেন,—কেহই গুরু হইতে চাহেন না। পরে বহু চেষ্টায় বহুদিন পরে অভেদানন্দ স্বামী নামে এক যোগী তাঁহাকে যোগ শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইয়া মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। ললিতপ্রসাদ হিমালয় শিখরে দশ বৎসর ধ্যানে মগ্ন থাকিলেন, কত কঠোর সাধনা করিতে লাগিলেন,—কিন্তু তাহার যোগ শিক্ষা হইল না। দশ বৎসর পরে হতাশ হইয়া তিনি পুনঃরায় গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অভেদানন্দ স্বামী শিষ্যের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি স্ত্রীলোকের প্রেমে আবদ্ধ, তাহা অগ্রে বল নাই কেন? তোমার দ্বারা যোগ সাধনা সম্ভব নয়,—যদি তাহার অনুমতি আনিতে পার তাহা হইলে, হইলেও হইতে পারে।"

ললিত অগত্যা দেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু পথে আসিতে আসিতে ভাবিলেন, দেশে যাইয়া কি করিব, দশ বৎসর দেশত্যাগ করিয়াছি, মাধুরী কি আমায় মনে করিয়া রাখিয়াছে। কেন রাখিবে? আমার মত পাগল তো সে নয়। আবার ভাবিলেন,—অধিকাংশ বালবিধবা যাহা হয়, সে তো তাহা হয় নাই। না,—তাহা সম্ভব নয়,—তবে তাহাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলাম কেন? এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া তিনি শেষ স্থির করিলেন দেশে যাইবেন না,—যখন যোগ শিক্ষা হইল না তখন মাধুরীর ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিবেন।

ললিতপ্রসাদ পশ্চিম প্রদেশে এক বৎসর ভ্রমণ করিলেন,—যেখানে যান সেইখানেই এক মাতাজী সন্ন্যাসিনীর নাম ও তাঁহার গুণের কথা শ্রবণ করেন। এই সন্ন্যাসিনী কে জানিবার জন্য তিনি বড়ই উৎসুখ হইলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। শেষ তিনি শুনিলেন মাতাজী এক্ষণে কাশীধামে আছেন,—তিনি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে কাশীধামে আসিলেন,—দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন,—তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

২

"মাধুরী-মহিমা" হইতে বহির্গত হইয়া ললিতপ্রসাদ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে ছিলেন। যদি কেহ তাঁহাকে গুলি করিত, তাহা হইলেও বোধ হয় তিনি এত আহত হইতেন না। মাধুরী মুন্নাবাঈ হইয়াছে,—মাধুরী কুলটা হইয়াছে, মাধুরী মুরসিদাবাদের বিখ্যাত বারবণিতা হইয়াছে,—এই ভাবিতে ভাবিতে ললিত প্রসাদ একেবারে মাধুরী-মহিমা হইতে দূরে বহুদূরে পলায়ন করিতেছিলেন,—শেষ ক্লান্ত হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল,—আমি কি পাগল,—মাধুরী কি আর কাহারও নাম থাকিতে নাই। সেই দরিদ্রা মাধুরী যদি কুলটাই হইয়া থাকে তাহা হইলে মুরসিদাবাদে আসিবে কিরূপে? কিছুই অসম্ভব নয়। যাহা হউক এই মুন্নাকে আমায় জানিতে হইবে। ললিতপ্রসাদ সেই রাত্রেই মুরসিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মুরসিদাবাদে আসিয়া মুন্নার অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, যে মুন্না বাঈ দুই বৎসর হইল সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে। মতি বাঈ নামক একজন মুন্নার সকল কথা জানে। মতিবাঈএর অনুসন্ধান করিয়া ললিতপ্রসাদ জানিলেন যে সে ছয় মাস হইল কাশী গিয়াছে। মুরসিদাবাদে ললিতপ্রসাদ মুন্নার গুণের সকল কথাই শুনিলেন। বারবণিতা হইয়াও যে মুন্না সতী, ইহা শুনিয়া তাঁহার ভাবনার উপর ভাবনা হইল, তিনি মুরসিদাবাদ হইতে ধীরে ধীরে শান্তিপুর আসিলেন। তথায় নানা জনে নানা কথা কহিল,—কেহ বলিল, হরিমোহন তাহার সতীত্ব নাশ করায় সে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে, কেহ কেহ ইহাও বলিল, "মতিবাঈ নামক একটী বাঈয়ের সহিত সে মুরসিদাবাদ গিয়া বেশ্যা হইয়াছে। ললিতপ্রসাদ ব্রহ্মমোহনের মৃত্যু সম্বাদ, তাঁহার স্ত্রীর সহমরণ, মাধুরীর অনেক ক্লেশ সকলই শুনিলেন। এই সকল শুনিয়া রাত্রিতে ললিতপ্রসাদ গঙ্গার চরে দাড়াইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ললিত প্রসাদ কাশী আসিলেন,—অনেক কষ্টে মতিবাঈকে সন্ধান করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাধুরীর জীবনের কথা শুনিলেন। মাধুরী বারবণিতা হইয়াও যে সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল, এবং শেষে যে সে তাঁহারই সন্ধানে সন্ন্যাসিনী হইয়া গিয়াছে, এই সকল শুনিয়া তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি পাগলের ন্যায় মতির বাটী ত্যাগ করিলেন।

কয়েক দিন পরে ললিত প্রসাদের মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি ভাবিলেন, "মাধুরী বাল্যকালে শান্তিপুর, রূপে গুণে মাতাইয়াছিল, মুরসিদাবাদ বারবণিতা

হইয়া মাতাইয়াছে,—শেষ কাশী আসিয়া কাশী মাতাইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসিনী হইয়াও সে লুকাইয়া থাকিবে না। এই যে মাতাজী সন্ন্যাসিনীর কথা যথায় তথায় শুনিতেছি এ সন্ন্যাসিনী আর কেহই নহে,—এ আমারেই মাধুরী।

৩

ললিতপ্রসাদ শুনিলেন যে মাতাজী সন্ন্যাসিনী প্রয়াগ তীর্থে সেই সময় বাস করিতেছেন,—তিনি অনতি বিলম্বে সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

প্রয়াগ তীর্থে গঙ্গা যমুনা সঙ্গম কূলে দণ্ডায়মানা হইয়া এক সন্ন্যাসিনী সেই নদীর খেলা দেখিতেছিলেন;—জটা সমস্ত পৃষ্ঠদেশ আবরিত করিয়া জানু পর্য্যন্ত লম্বিত;—বাম হস্তে ত্রিশূল,—দক্ষিণ হস্তে কমুণ্ডলু;—ভস্মে সমস্ত দেহ আবরিত,—ঠিক বোধ হইতেছিল যেন উমা শিব আরাধণায় দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। সন্ন্যাসিনী নিকটে দ্রুত পদক্ষেপণ শুনিয়া ফিরিলেন, দেখিলেন তাঁহারই দিকে এক সন্ন্যাসী বেগে আসিতেছেন। সন্ন্যাসিনী একবার দেখিলেন মাত্র,—তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইল, তাঁহার মুখ হইতে অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারিত হইল, "এত দিন পরে কি মনে পড়িয়াছে?" তৎপরে তিনি দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া সন্ন্যাসীকে দূরে থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। ললিতপ্রসাদ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন,—দেখিলেন সন্ন্যাসিনী ত্রিশূল ভরদিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কিন্তু সংজ্ঞাহীনা। তিনি তাঁহাকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন,—অমনি সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে দূরে থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। ললিতপ্রসাদ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "মাধুরী—মাধুরী এত বৎসর ধরিয়া যোগ করিলাম, তপস্যা করিলাম কিছুই হইল না,—ঐ মাধুরীময় মুখ এই বারবৎসর আমার চক্ষের উপর নাচিতেছে। আজ তোমায় এ বেশে দেখিলাম,—তাহাতে তত দুঃখ নয়,—তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত আমি পাগল হইয়াছি,—বল—বল মাধুরী তুমি———"

ললিতপ্রসাদের কথায় বাধা দিয়া ধীরে ধীরে মাধুরী মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল, "বার বৎসর তোমার ধ্যান করিয়া তোমার নামেই, আর বিধাতার অনুগ্রহেই এত কষ্টেও কষ্ট পাই নাই। বারবণিতা হইয়াও সতীত্ব নষ্ট করি নাই। আমি পর স্ত্রী,—আমি বিধবা তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? এ দেহ কার যে আমি তোমায় দিব। এ দেহ পিতা আমার স্বামীকে দান করিয়া গিয়াছেন,—এ দেহ তাঁর, তুমি কি পর দ্রব্য অপহরণ করিবে। তুমি কি আমায় পর পুরুষ স্পর্শ করিয়া দেহ কলঙ্কিত করিতে বল? আমি তোমার দর্শন প্রার্থী মাত্র,—

তোমার চরণে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব বলিয়া বাঁচিয়া আছি, নতুবা অনেক দিন মরিতে পারিতাম। যে দিন পিতা বিবাহ দিয়াছিলেন, সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম আমার অদৃষ্টে সুখ নাই, তুমি কি করিবে! ঐ তর তর করিয়া গঙ্গা যমুনা বহিতেছে, আইস উহার গর্ভে ডুবিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করি। যদি বিধাতার ইচ্ছা হয় আমাদের বিবাহ স্বর্গে হইবে।"

"তবে আর বিলম্ব কেন, এই বলিয়া ললিতপ্রসাদ লম্ফ দিয়া গঙ্গাবক্ষে পতিত হইতেছিলেন কিন্তু পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার হস্ত ধরিল, তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন, সম্মুখে তাঁহার গুরুদেব মহাপুরুষ অভেদানন্দস্বামী। ললিতপ্রসাদ গুরুকে প্রণাম করিলেন। গুরু বলিলেন, "এ দেবীর সহিত আমি পরিচিত নই, ইনিই কি সেই করুণাময়ী মাতাজী সন্ন্যাসিনী?"

মাধুরী অভেদানন্দস্বামীকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দাসী ওই নামেই অভিহিতা বটে।"

গুরু ললিতপ্রসাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইহারই জন্য কি তোমার যোগ শিক্ষা হইল না? এরূপ দেবীর অনুমতি লাভ কঠিন কি?"

তখন ললিত গুরু দেবকে তাঁহাদের উভয়ের জীবনের সকল কথা কহিলেন;—পরে যাহা তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন তাহাও বলিলেন। অভেদানন্দস্বামী সকল শুনিয়া বলিলেন, "আত্মহত্যা মহাপাপ, সে পাপে কলঙ্কিত হইবে কেন? যোগ শিক্ষা কর, যোগ বলে সিদ্ধিলাভ হইলে মহা শান্তি লাভ করিবে।"

মাধুরী কাতর কণ্ঠে বলিল, "গুরুদেব তবে আপনি অমাদের দীক্ষিত করুন।"

"আইস," এই বলিয়া অভেদানন্দস্বামী দুইজনের দুই হস্ত ধরিলেন,—পরে দুই হস্ত একত্রিত করিয়া নিজ কণ্ঠ হইতে রুদ্রাক্ষ মালা লইয়া জড়াইয়া দিলেন, বলিলেন, "বৎসে সঙ্কুচিত হইও না,—এই চন্দ্র সূর্য্য তারকা মণ্ডিত পৃথিবীর সম্মুখে, ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসনের নিম্নে, আমি তোমাদের এই মহাযোগে দীক্ষিত করিলাম।"

৺ধীরেন্দ্রনাথ পাল।

যাদুকর।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১

সেদিন রজনী বড় হাস্যময়ী হয়ে উঠেছিল। নির্ম্মল নীলাকাশে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ ভাসছিল। সিত-কিরণ-স্নাত পার্ব্বত্য তটিনী—লীলাচঞ্চলা, হাস্যমুখরা যুবতীর ন্যায় উপল খণ্ডের বক্ষের উপর দিয়ে, নেচে নেচে চলেছিল; বালু-বেলায় তার রূপের ভাতি প্রতিভাত হয়ে যেন স্বপ্নময় হীরক-রাজ্যের সৃষ্টি করেছিল; প্রিয় সমাগম বিহ্বলা অভিসারিকার ন্যায়, প্রকৃতির রুদ্ধ অন্তরের সমস্ত আনন্দরাশি, ছানিত-কিরণ-ধৌত নগ্ন প্রান্তরের বুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল।

রাত্রের আহারাদির পরে আমার চাকরেরা সকলেই শয়ন করেছিল। কেবল আমি, তাঁবুর সম্মুখে বসে, প্রকৃতির সেই নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখছিলেম। সেদিন সন্ধ্যার পরে মোড়লের বাটীতে নাচ গানের একটা বৈঠক ছিল। আমারও নিমন্ত্রণ হয়েছিল, কিন্তু আমি যাই নাই।

তখন রাত্রি প্রায় দণ্ড তিন চার অতীত হয়েছিল। গ্রাম হতে শ্রান্ত সঙ্গীতের ক্ষীণ মূর্চ্ছনা মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসছিল। হঠাৎ তাঁবুর পার্শ্বের খেজুর গাছের ঝোপের মধ্যে হরিণের ডাকের মত এক প্রকার শব্দ শ্রুত হল, আমি চমকে উঠে চেয়ে দেখলেম,—বোধ হল যেন একটা হরিণ ঝোপের মধ্যে লুকাল। দ্রুতগতিতে তাঁবুর ভিতর হতে বন্দুকটা এনে ঝোপের কাছে এসে দাঁড়ালেম। হঠাৎ বৃহৎ হরিণ আমার সম্মুখে বাহির হল। আমি লক্ষ্য করতে না করতেই হরিণটা মানুষের মত দুই পায়ে খাড়া হয়ে তার মুখের আবরণ মুক্ত করলে। আমি বিস্মিত হয়ে দেখলেম, মৃগচর্ম্মাবরণে এক যুবতী।

যুবতী পরিচিত—আরও দু একবার দেখেছিলেম। কিন্তু কুহক জালের মত কি যে এক রহস্যের আবরণ তার চতুর্দ্দিকে ঘিরেছিল—তা আমি ভেদ করতে পারি নাই। সে তাম্রবর্ণা, সুন্দরী। তার পূর্ণায়ত সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত দেহে লীলা-চঞ্চল লাবণ্যের রাশি বিচ্ছুরিত হত; তার দীর্ঘায়ত বিশাল নয়নে বালিকার সরলতা ও যৌবনের মাধুর্য্য একাধারে মিশ্রিত ছিল, তার অঙ্গচালনায় উদ্দাম

প্রফুল্লতার উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বাসিত হয়ে পড়তো। সে যেখানে গমন করতো তার চতুর্দ্দিক যেন মাধুর্য্যরাশিতে পূর্ণ হয়ে উঠতো।

আমাকে প্রশ্নের অবসর না দিয়েই, নত হয়ে সেলাম করে এক টুকরা জীর্ণ কাগজ আমার হস্তে দিলে। তারপর বাম হস্তের তর্জ্জনী আপন ওষ্ঠে প্রদান পূর্ব্বক, দক্ষিণ হস্ত নির্দ্দেশে একবার গ্রামের দিকে, একবার চন্দ্রের দিকে ও পশ্চিমাকাশের দিকে দেখিয়ে কি ইঙ্গিত করলে। পরক্ষণেই যেন বাতাসে ভর করে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবিস্ময়ে দেখলেম—একটা বৃহৎ হরিণ গ্রামাভিমুখে ছুটছে।

ত্বরিতে তাঁবুর মধ্যে আলোক সম্মুখে এসে কাগজ খানা দেখলেম। একি! ইংরাজী হস্তাক্ষর!

যে কেহ সদাশয় ইউরোপিয়ান হউন আমাকে উদ্ধার করুণ। আমি একজন পদস্থ ইংরাজ-রাজ-কর্ম্মচারীর দুহিতা—অদৃষ্ট চক্রে এই বর্ব্বর মোড়লের গৃহে বন্দিনী। ইহারা আপনাকে 'যাদুকর' ভাবিয়াছে, এবং পাছে আপনি জানিতে পারেন - সেই ভয়ে আমাকে লইয়া দূরে পলাইতেছে। উত্তেজিত হইয়া হঠাৎ কিছু করিবেন না, তাহা হইলে আমার উদ্ধার হইবে না—হয়ত আমাকে হত্যা করিবে। পত্রবাহিকাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন, সে অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমতী—আমার একমাত্র বন্ধু ও সহায়। তাহার যুক্তিমত ধীর ভাবে কার্য্য করিবেন। সে ইংরাজী ভাষা বুঝিতে ও কহিতে পারে।"

পত্র পাঠ করে আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িৎ প্রবাহিত হল, মস্তিষ্ক ঘুরতে লাগলো - বুকের মধ্যে দুর দুর করতে লাগলো—হস্তাক্ষর পরিচিত! কিন্তু কার? পূর্ব্বে নদীতীরে বায়ুবিক্ষিপ্ত যে কয়েক টুকরা হস্তাক্ষর পেয়েছিলেম, সেগুলি আমার নিকটেই ছিল। বাহির করে মিলিয়ে দেখলেন—একজনেরই হস্তাক্ষর—যেন বিশেষ পরিচিত।

হঠাৎ যেন সমস্ত সুপ্ত স্মৃতি জেগে উঠলো,—তা—তা কি সম্ভব? কমলার হস্তাক্ষর? সেই ছাঁদ—সেই ধাঁজ—সেই—সেই—তাই কি?—ইংরাজ—রাজ-কর্ম্মচারীর দুহিতা—তবে কি কমলাই এই বর্ব্বরদের হস্তে বন্দিনী?

সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ ছুটলো, হৃদয়ে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভূত হল, চক্ষের সম্মুখে বর্ত্তিকালোক অন্ধকার হয়ে গেল, সমস্ত পৃথিবী ঘুরতে লাগলো। আমি জ্ঞান হারাবৎ বসে রইলেম। সহসা কে যেন আমাকে আহ্বান করিল। চেয়ে দেখলেম, সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার দোভাষী মৌলুদ।

আমাকে বাক্যের অবসর না দিয়ে সে আপনিই সেলাম করে বলতে লাগলো —ক্ষমা করবেন আমি সব জেনেছি। আপনার বিস্তর নিমখ খেয়েছি, বন্ধুর মত স্নেহের ব্যবহার পেয়েছি—তার যোগ্যতা দেখাব। আমরা কুকুরের মতই বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত। বিশ্বাস করুণ—আপনার কার্য্যে প্রাণ দেব। কেবল এক—এক পুরস্কার চাই। তা যথা সময়ে চাইবো—আমাকে কেবল সে পুরস্কার দেবেন।"

ক্ষণেক নিস্তব্ধ হয়ে মৌলুদ আবার আরম্ভ করলে "শুনুন এক শ্বেতরমণী মোড়লের ঘরে বন্দী। আমি মেয়ানীর মুখে সকল শুনেছি। আপানার ভয়ে তাকে নিয়ে মোড়ল সুদানের দিকে সর্‌ছে, কাসালয়ে এই দস্যুর প্রধান আড্ডা, কেরঙ্কোতেও আড্ডা আছে। অতি গোপনে সর্‌ছে। পাছে আপনি জানতে পারেন, তজ্জন্য তার এক পুত্রের প্রতি নাচগান আমোদ প্রমোদের উপদেশ দিয়ে গেছে। আপনি ভাববেন মোড়ল এইখানেই আছে। কাল ভোরে রওনা হয়েছে, বেশীদূর যেতে পারেনি। চেষ্টা করলে এখনও আমরা তাদের ধরতে পারি। যদি সেই শ্বেত রমণীকে উদ্ধার করতে চান—"

বাধা দিয়ে উত্তেজিত হয়ে আমি বল্লেম—'সেই আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য —এতে যত বিপদ হোক—জীবন পণ।

উৎসাহিত হয়ে মৌলুদ বল্লে—'তবে এখনই—আর বিলম্ব নয়—তাঁবু তুলতে হুকুম দিন। এখনও সময় আছে পথেই তাদের ধরতে পারবো। মেয়ানী আমাদের সঙ্গে যাবে। জানিনা কেন—সেও একার্য্যে তার প্রাণপাত সাহায্য করবে শপথ করেছে। যথাসময়ে এই রাত্রেই সে এসে যোগ দিবে, তখনই আমাদের রওনা হতে হবে।

আর বাক্যব্যয় না করে আমি মৌলুদের উপরে সমস্ত ভার দিলেম। বিষম উত্তেজনায় আমার সর্ব্বাঙ্গে উষ্ণ শোনিত ছুটছিল, মুহূর্ত্তের বিলম্ব যুগের ন্যায় বোধ হচ্ছিল।

মৌলুদের সুবন্দোবস্তে সত্বরই তাঁবু তুলে সমস্ত বন্দোবস্ত করে আমরা প্রস্তুত হয়ে রইলেম। রজনীর তৃতীয় প্রহরে সুন্দরী মেয়ানী এসে উপস্থিত হল। তার প্রদীপ্ত বদনে, আনন্দমিশ্রিত অদম্য উৎসাহের ভাতি যেন উছলে পড়ছিল।

তখনই আমরা ঈশ্বর স্মরণ করে যাত্রা করলেম। সেনাপতির মত সশস্ত্র মৌলুদ বীরদর্পে অগ্রবর্ত্তী হয়ে চল্লো। তার পশ্চাতে আমি এবং আমার বাম পার্শ্বেই মেয়ানী ও তৎপশ্চাৎ অন্যান্য লোকজন ও দ্রব্য সামগ্রী আসতে লাগলো। পথি-

মধ্যে যতবার মেয়ানীর প্রতি দৃষ্টি পড়্‌লো, ততবারই দেখলেম যে বক্র কটাক্ষে প্রদীপ্ত নয়নে আমার সর্ব্বাঙ্গ দেখছিল।

২

ভীষণ মরু-প্রান্তর! সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে—যে দিকে দৃষ্টি যায়—কেবল বালুকারাশি। সীমাহীন, অসীম, অনন্ত বালুকারাশি! পথ নাই, ঘাট নাই, গাছ নাই, ছায়া নাই, গ্রাম নাই, জল নাই, কেবল অনন্তবিস্তৃত ধূ—ধূ বালুকারাশি! ইতস্ততঃ ছোট ছোট বালুকাস্তূপে দু চারটা ছোট ছোট কাঁটা গাছ, কোথাও স্তূপ উচ্চ—উচ্চতর—তাতে ছোট ছোট কাঁটার ঝোপ, কোথাও বা পাহাড়ের মত উচ্চ বালিয়াড়ি—তাতেও ছোট বড় ঝোপ! কেবল দূরে—মেঘের মত—নীলিমার প্রান্তে মিশে নীল শৈলমালা—নববর্ষার নবীন নীরদের মত প্রতীয়মান হচ্ছিল।

দ্বিতীয় দিনে যখন সেই মরুভূমিতে এসে পড়্‌লেম, তখন সকলেরই প্রাণে শঙ্কার উদয় হল। কেবল সেই প্রান্তরে দৃষ্টিপাত করে মেয়ানীর চক্ষু যেন আরও প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। সে তার আপন উৎসাহের প্রভাবে আমাদের দলে যেন নব জীবনের সঞ্চার করে দিলে।

মৌলুদের হাবভাবে, তাকে মেয়ানীর প্রণয়াকাঙ্খী বলে আমার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু মেয়ানীকে বুঝতে পারলেম না। সে কখনও ক্রীড়াচঞ্চলা, হাস্যময়ী প্রফুল্ল বালিকা, কখনও নিত্যশীলা উদ্দাম তরঙ্গিনী, কখনও গীতি-মুখরা বসন্তের পিক, কখনও সৌরভময়ী প্রস্ফুট প্রসূন। আবার পরক্ষণেই ব্রীড়াবণতা গম্ভীরা যুবতী, মধ্যাহ্নে মার্ত্তণ্ডের অগ্নিকণাবর্ষী প্রদীপ্ত কিরণ, কাল বৈশাখের দিগন্তব্যাপী প্রলয় ঝঞ্ঝা, বিশ্বদাহী উল্কার জ্বালা। আবার কখনো বা সে করুণ হৃদয়া স্নেহময়ী রমণী, নববর্ষার মৃদু বারিধারা, সন্তাপহারী সন্ধ্যা-সমীরণ, নিদাঘ মধ্যাহ্নের বটছায়া। সে কখনও কন্যা, কখনও মাতা, কখনও পত্নী, কখনও শিষ্যা, কখনও গুরু, কখনও শিক্ষক, কখনও মন্ত্রী। এই অসভ্য বর্ব্বর বালিকার মধ্যে কেমন একটা আকর্ষনীশক্তি ছিল, যে দেখতো—সেই আকৃষ্ট হত, অথচ তার হৃদয়ে পাশব বৃত্তির, ছায়াপাত মাত্র বিলুপ্ত হত। তার আগমনের পর হতে সেই আমাদের দলের ভাগ্য বিধাত্রী হয়ে উঠেছিল।

মেয়ানীর আদেশ ক্রমে, দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যার পরেই—কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাস্তূপের মধ্যে আমরা বিশ্রাম করলেম। আহারাদির পরে মেয়ানী স্বহস্তে আমার শয্যা রচনা করে দিলে। আমি শয়ন মাত্রেই নিদ্রিত হলেম।

গভীর রাত্রে সহসা নিদ্রাভঙ্গ হল, চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করে দেখলেম—মেয়ানী কি মৌলুদ কারোও চিহ্ন নাই। সন্দেহ হল, চারিদিকে চঞ্চল দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেম। তখন চন্দ্রালোকে সম্মুখস্থ মরু প্রান্তর যেন হাসছিল।

সহসা প্রান্তরে বহুদূরে বৃষের ডাক শ্রুত হল—আবার—আবার। তখন বিপরীত দিক হতে পেচকের ধ্বনি উঠলো—অতি নিকটে। পরক্ষণেই একটা নাতি উচ্চ বালিয়াড়ি ভেদ করে মৌলুদ বার হল, এবং ক্ষণপরে হর্ষ সূচক ডাকে দক্ষিণ দিক ধ্বনিত করে একটা হরিণ দ্রুতবেগে এসে মৌলুদের নিকটে উপস্থিত হল। আমি আর থাকতে পারলেম না। দৌড়ে তাদের কাছে গিয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ করে, সজল নয়নে কৃতজ্ঞতা জানালেম।

আমার হস্ত মধ্যে মেয়ানীর হাতখানি যেন কাঁপছিল। চমকিত হয়ে তার মুখের পানে চাইলেম—সহসা যেন সে নয়নে একটা বিদ্যুতের চমক দেখলেম। পরক্ষণেই মেয়ানী হো হো শব্দে উচ্চ হাস্য করে উঠলো, আমি অপ্রতিভ হলেম; সে কিন্তু আমার হস্ত হতে তার হস্ত মুক্ত করবার চেষ্টা করলে না।

মৌলুদ বল্লে,—'আমরা মোড়লের দলের পদচিহ্নের অন্বেষণে গিয়েছিলেম—পেয়েছি। এখন রওনা হতে হবে। দিবসে এ প্রান্তরে পথ চলা অসম্ভব।

তদ্দণ্ডেই সকলকে জাগরিত করে আমরা আবার রওনা হলেম। মেয়ানী আমার পার্শ্বে পার্শ্বে চল্লো। সহসা বালিকার মত আমার হাত ধরে বল্লে—'সুন্দর! তোমাদের দেশে বুঝি চাঁদের আলোয় স্নান করে, নৈলে তোমরা এত সুন্দর! কিন্তু আমাদের সাথে না। আমার হস্ত পরিত্যাগ করে তাদের আপন ভাষায় গান ধরলে।

মেয়ানীর কণ্ঠস্বর অতি মধুর—সুললিত। ভাষা না বুঝিলেও, তার মধুর কণ্ঠের মূর্চ্ছনা যেন কেঁদে কেঁদে চন্দ্রালোকে মিশিয়ে যেতে লাগলো। আমার প্রাণের সুপ্ত বেদনারাশি জেগে উঠে নয়ন কোণে অশ্রু বিন্দুরূপে দেখা দিল। ফিরে দেখলেম—সকলেই চোখ মুছছে। ভাবলেম, 'মেয়ানী কি পাগলিনী!

তিন দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত সেই মরু প্রস্তরে চল্লেম। শেষ রাত্রে উঠে বেলা আটটা পর্য্যন্ত পথ চলা, তারপরে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত বিশ্রাম, আবার অপরাহ্ণে হতে রাত্র নটা দশটা পর্য্যন্ত পথ চলা হতে লাগলো—তথাপি মোড়লের দলের সন্ধান মাত্র ছিল না। তারা যেন কুহকবলে কোন দূর অজ্ঞাত প্রদেশে লুক্কায়িত হয়েছিল, কেবল বালুকাপরে তাদের ক্লিষ্ট পদাঙ্কগুলি অতীতের সাক্ষ্যরূপে তখনও মিট্ মিট্ কচ্ছিল।

চতুর্থ দিন প্রভাত হতেই আকাশ কেমন তাম্রবর্ণ ধারণ করলে, বাতাসও কেমন শুষ্ক বোধ হতে লাগলো। এমন কি সকলেরই যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসে কেমন অস্বচ্ছন্দতা অনুভূত হলো। তখন আমরা পাহাড়ের মত কঠিন এবং তরঙ্গায়িত এক উচ্চ বলিয়াড়ির নিম্নে উপস্থিত হয়েছিলেম। তখনও দুই ঘণ্টা পথ চলার সময় থাকলেও, মেয়ানীর আদেশে সেই খানে আমরা তাঁবু ফেললেম।

মেয়ানী বল্লে আকাশের লক্ষণে এবং বাতাসে সে বালুকা তুফানের (Sand storm) গন্ধ পাচ্ছিল। সুতরাং এই বালিয়াড়ির আশ্রয় ত্যাগ করে ফাঁকা প্রান্তরে যাওয়া বিপজ্জনক।

৩

বেলা বৃদ্ধির সহিত আকাশের তাম্রবর্ণ আরও ঘোর হয়ে উঠতে লাগলো; বায়ুও অধিকতর ঘন ও শুষ্ক অনুভূত হল; শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগের অত্যন্ত কষ্ট আরম্ভ হল; সকলেরই সর্ব্বাঙ্গে কেমন এক প্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণার সূত্রপাত হল। প্রচ্ছন্ন বস্ত্রাবাসের মধ্যে অবস্থান করেও, সে অবস্থা সকলেরই অসহনীয় হয়ে উঠ্‌লো।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের পরে হঠাৎ দক্ষিণে বহু দূরে যেন কিসের একটা ক্ষীণশব্দ উত্থিত হল। সেই শব্দ ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়ে যত নিকটবর্ত্তী হতে লাগলো, ততই যেন প্রলয়ের ভীষণ আরাবে পরিণত হল। শেষে নিকটে—আরও নিকটে, সেই আরাব সমুদ্র গর্জ্জনকেও ডুবিয়ে আমাদের গ্রাস করতে এল। সকলেই মহা আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিত করে ঈশ্বরের নাম করতে লাগলেম।

মেয়ানী এতক্ষণ কোথায় ছিল জানি না। সহসা বাঘিনীর মত এসে বল্লে 'দেখবে এস।' তার চক্ষু দুটো অগ্নি পিণ্ডের মত জ্বলছিল। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে বাঘিনীর বিক্রমেই হঠাৎ সে আমার হস্ত ধারণ করে টেনে বাহিরে নিয়ে গেল। তার বলের নিকটে আমি শিশুর ন্যায় দুর্ব্বল হয়ে পড়লেম।

আমাদের তাঁবুর অল্প তফাতে পাহাড়টা সমুদ্র তরঙ্গের মত কিঞ্চিৎ নীচু হয়ে আবার উচ্চে উঠে গিয়েছিল। সেইস্থানে আমাকে এনে বল্লে, 'ঐ দেখ।'

পাহাড়ের ওপারের সমস্ত আকাশ মহাধূমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল;—সে ধূমরাশি প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূরে, সেই ধূমান্ধকারে অঙ্গ মিশিয়ে—এক বিশাল কায়, আকাশস্পর্শী, ধূম্রবর্ণ দৈত্য সৃষ্টি সংহার করতে করতে পবনবেগে আমাদের দিকে আসছিল। আমার মস্তিষ্ক বিপর্য্যস্ত হল, জ্ঞানবুদ্ধি লোপ হল, প্রস্তর পুত্তলির ন্যায় একদৃষ্টে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে রইলেম।

দূর বাল্যের ক্ষীণ-স্মৃতির ন্যায় মনে পড়ে, মেয়ানী আমাকে শিশুর মত বক্ষে তুলে লয়ে, নিমেষে তাঁবুর মধ্যে এনে ফেল্লে, আমি অবশ নিস্পন্দ দেহে চীৎ হয়ে পড়লেম। পরক্ষণেই সেই অন্ধকার—সেই গর্জ্জন—সেই দৈত্য—সেই প্রলয় আমাদের উপরে এসে পড়লো। আমি জ্ঞান হারালেম।

যখন জ্ঞান হল—তখনও সেই ঘনান্ধকার। তাঁবুর মধ্যেও দু'হাত তফাতের বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু সেই কর্ণভেদী ভীষণ গর্জ্জন তখন দূরে চলে গিয়েছিল।

বক্ষের উপর ভার বোধ হল; মনে হল কে যেন আমাকে ক্রোড়ে প্রচ্ছন্ন করে ঢেকে রেখেছে। চেয়ে দেখলেম মেয়ানী। বিস্ময়ে ডাকলেম, 'মেয়ানী'—আমাকে সজ্ঞান দেখে, মেয়ানী আমার মুখের উপর মুখ রেখে অতি কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা কল্লে, 'মুখে কি দেহে জ্বালা অনুভব কচ্ছ কি?' তার স্বরে যেন পুত্রবৎসলা জননীর হৃদয়ের অপরিমেয় স্নেহ উথ্‌লে উঠছিল।

আমি বল্লেম, 'না' সে একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লে। কিন্তু তার মুখ পানে ভাল করে দেখে আমি চম্‌কে উঠলেম। সে মুখের ভাতি যেন কেমন—কেমন। যেন অগ্নিদাহে সে মুখখানি ঝল্‌সে গিয়েছিল। বুঝলেম আমাকে আপন বক্ষে ঢেকে রক্ষা করতে সে নিজে আত্মোৎসর্গ করেছে—সেই অগ্নিময় বালুকা তুফানে তার মুখ দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সভয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেম, "তোমার মুখ!"

বাধা দিয়ে মেয়ানী বল্লে, 'ও কিছু নয়' সামান্য দাহ। ধন্য ঈশ্বর—তুমি সুস্থ আছ। শুয়ে থাক, উঠনা—বিপদ কাটেনি। শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ানী চক্ষের পলকে বাহিরে—তমসার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেয়ানীকে বাধা দেবার অভিপ্রায়ে আমিও তার পশ্চাতে লাফিয়ে বাহির হলেম। কিন্তু তদ্দণ্ডেই যেন একটা ভীষণ অগ্নির উত্তাপে আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করে দিলে। শরীরে লক্ষ সূচি বিদ্ধ হল—মুখ জ্বলতে লাগলো—কপালের শিরা সকল যেন ছিন্ন হয়ে গেল। নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অভ্যন্তর দেশও যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌লো। ভীষণ যন্ত্রণায় মেয়ানী বলে উচ্চ চীৎকার করে তাঁবুর মধ্যে এলেম। দাঁড়াতে পারলেম না—পতিত হলেম, সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মূর্চ্ছিত হলেম।

রাত্রে চেতনা লাভ কল্লেম। মেয়ানী আমার মস্তক ক্রোড়ে লয়ে বসে মুখমণ্ডলে এবং মৌলুদ আমার হস্ত পদে ধীরে ধীরে কি লেপন কচ্ছিল। আমার

মুখে একপ্রকার তরল পদার্থ লেপে দিয়ে মেয়ানী বল্লে, 'চিন্তা নাই—নিদ্রা যাও, প্রভাতেই সুস্থ হবে।' ঔষধ ও প্রলেপের গুণে, মেয়ানীর ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করে, পর মুহূর্তেই আমি নিদ্রিত হলেম। যখন প্রভাতে জাগরিত হলেম—তখন শরীরে কোনরূপ দাহ না থাকলেও শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হচ্ছিল। সেদিন তথায় বিশ্রাম করে শেষরাত্রে আমরা আবার যাত্রা কল্লেম। ঔষধের গুণে মেয়ানীর আপন মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ হলেও দুই একস্থানে তখনও দাহের চিহ্ন ছিল।

কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো, আমার জীবন রক্ষয়িত্রীকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারলেম না, কিন্তু মেয়ানী বালিকার ন্যায় উচ্চহাস্যে তা অবজ্ঞার স্রোতে ভাসিয়ে দিলে। কিন্তু আমি মনে মনে তার ক্রীত দাস হয়ে রইলেম। ভাবলেম—জগদীশ্বর সহায় হোন, জীবনে একদিন যেন এ ঋণ পরিশোধ করতে পারি।

এবারে আর প্রান্তরে পদচিহ্ন ছিল না—তুফানে সমস্ত লয় পেয়েছিল। আমরা মেয়ানীর নির্দ্দেশানুসারে চলতে লাগলেম।

পাঁচদিন পরে আমরা আবার এক পর্ব্বতের নিম্নে এসে উপস্থিত হলেম, বালিয়াড়ি নয়—শৈলশ্রেণী—উচু নীচুভাবে বহুদূর পর্য্যন্ত সেই মরুভূমিকে প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টন করে চলে গিয়েছিল। পর্ব্বতটি বিশাল,—অত্যুচ্চ, দুই একস্থানে দুই একটি চূড়া যেন প্রকৃতই আকাশ স্পর্শ করেছিল। তার অঙ্গে দুই চারটি বন্য ঝোপ ভিন্ন বৃক্ষলতাদি অধিক ছিল না। প্রভাতের পথ অতিবাহন শেষ করে সেইখানে এসে আমরা বিশ্রাম করলেম।

মেয়ানী ও মৌলুদ সেই পর্ব্বত উত্তীর্ণ হবে পরপারে গমনের পথ আবিষ্কারে নিযুক্ত হল, আমিও তাদের সঙ্গে গেলুম। কিন্তু তারা কখনও ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদানে কখনও বা বন্য বিড়ালের মত পর্ব্বতগাত্রে উঠে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল আমি আর তাদের দেখতে পেলাম না। ঘুরতে ঘুরতে উত্তরের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলাম। সহসা পদস্খলন হল; আমি পড়তে পড়তে একটা ঝোপে আটকে গেলেম। উঠে লক্ষ্য করে দেখলেম সেই ঝোপের অন্তরালে একটা গহ্বর মুখ, শিকড় ও খণ্ড প্রস্তরে প্রায় আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কাণ পেতে শুনলেম। শূন্য স্থানবাহী বায়ুর সোঁ সোঁ শব্দের সহিত যেন অতি দূরবর্ত্তী বারি প্রবাহের ক্ষীণশব্দ অনুভূত হল। সেই স্থান চিহ্নিত করে

তাঁবুতে প্রত্যাবর্ত্তন কল্লেম। অনুভবে বুঝলেম তাঁবু হতে সেস্থান পর্ব্বত পাদদেশ বেষ্টনে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ।

সমস্ত দিন গেল, মৌলুদ ও মেয়ানী ফিরলো না। সন্ধ্যাবধি উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাদের অপেক্ষায় থেকে, অবশেষে শঙ্কিত চিত্তে তাদের অন্বেষণে বাহির হলেম। দক্ষিণে কিছুদূর অগ্রসর হতেই দেখ্‌লেম—তারা দুজনে পর্ব্বত অবতরণ কচ্ছে।

আমার নিকটে এসেই হর্ষভরে মেয়ানী বল্লে—'পরিশ্রম সফল হয়েছে।' তারপর দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে পুনরায় বল্লে—'প্রায় একক্রোশ দূরে, ওধারে ওইখানে এক সুন্দর উপত্যকা আছে; সেইখানে মোড়লের দল বিশ্রাম কচ্ছে; শীঘ্র এস্থান ত্যাগ করবে বলে বোধ হল না। এইখানেই আমাদের কার্য্যোদ্ধার করতে হবে। কিন্তু অনেক লোক—প্রায় ত্রিশ জন;—বোধ হয় কেরক্কো হতে ওর অধীনস্থ কয়েকজন এসে জুটেছে। এই সংবাদে আমি আশা ও উৎকণ্ঠায় উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেম।

সন্ধ্যার পরে আহারাদি শেষে আমরা তিনজনে বসে যুক্তি স্থির কল্লেম। সেই পর্ব্বতের কোনস্থানে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থেকে কার্য্য উদ্ধার করতে হবে, হয়তো পাঁচ সাতদিন সময়ও লাগবে। তখন আমি সেই গহ্বরের কথা বল্লেম। উৎসাহিত হয়ে মেয়ানী বল্লে,—'চল' এখনিই তা আবিষ্কার করতে হবে।' আমরা দুটি 'আঁধারে লণ্ঠন' ও কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র লয়ে বাহির হলেম।

সেইস্থানে উপস্থিত হয়ে, মেয়ানী কুক্কুরীর মত তার চতুর্দ্দিকের ঘ্রাণ গ্রহণ করলে, এবং কর্ণ সংলগ্ন করে কি শুনলে। তার পরেই আনন্দে লাফিয়ে উঠে বল্লে, 'সুন্দর! তুমি ঠিক বলেছ—এই স্থানই আমাদের আবাসের উপযুক্ত হবে।' তখন মৌলুদ শিকড় কেটে প্রস্তর সরিয়ে সেই স্থান পরিষ্কৃত করলে, একটি গোলাকার গুহা মুখ আবিষ্কৃত হল—তার বৃত্ত প্রায় দুই হস্তেরও অধিক। আমরা ঈশ্বরের নাম নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হলেম। কুক্কুরের মত মুখে লণ্ঠন ধারণ করে এবং এক হস্তে তীক্ষ্ন ছোরা লয়ে মেয়ানী অগ্রবর্ত্তী হলো, তার পশ্চাতে মৌলুদ ও সর্ব্বশেষে গুলিভরা পিস্তল লয়ে আমি চল্লেম।

৪

কিছুক্ষণ—প্রায় পাঁচ মিনিট—এইভাবে গমনের পর সেই সুড়ঙ্গ পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত হতে লাগলো, শেষে আমরা দাঁড়াতে পারলেম। লণ্ঠনের আলোক সাহায্যে চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করে দেখলেম, মনুষ্য হস্ত নির্ম্মিত বলেই বোধ হল,—

চতুর্দ্দিকস্থ শৈলগাত্রে কোপানোর চিহ্ন। আমার সন্দেহ হল—খনির প্রবেশ পথ নয়তো? আরও নিবিষ্ট চিত্তে পরীক্ষা করতে করতে অগ্রসর হলেম।

সেই পথ ক্রমশঃ দক্ষিণে গিয়ে প্রশস্ত হয়ে আবার উত্তর পশ্চিমে বেঁকে গিয়েছিল। ক্রমশঃ প্রশস্ত—আরও প্রশস্ত, চার পাঁচজন লোক অনায়াসে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে ও প্রায় দুই ইঞ্চি ধুলা পূর্ণ। আমরা অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে অগ্রসর হতে লাগলেম।

মোড় ফিরেই মেয়া বিস্ময়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠ্‌লো, আমরা দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে সকলেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেলেম—আমাদের সম্মুখে একটি স্বল্পায়তন প্রায় চতুষ্কোণ গৃহ। ধূলি সমাচ্ছন্ন কতকগুলি দ্রব্যাদিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল।

মেয়া একটি দ্রব্য তুলে আমাকে দেখালে—একটা বড় ছেনি, মরিচা ধরে ক্ষয়িত হয়েছিল। আমরা আরও কয়েকটা ছেনি, হাতুড়ি, শাবল, এবং কয়েকটা গোলাকার নাতি বৃহৎ কাষ্টদণ্ডও পেলেম। আমার সংশয় ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হতে লাগলো। সেখান হতে জলকল্লোলও স্পষ্টতর শ্রুত হচ্ছিল।

সেই গৃহের উত্তরের ভিত্তি হতে আবার একটি প্রশস্ত সুড়ঙ্গ পথ দশ বারো হাত গিয়েছিল। তারপরে বৃহত্তর আর একটি তদ্রূপ গৃহ। সেই গৃহে আগমন মাত্রেই জল কল্লোল অতি নিকটেই শ্রুত হল, এবং শীতল বায়ু আমাদের ললাট স্পর্শ করলে। সেই গৃহের মেঝে ধূলিপূর্ণ হলেও - অনেক স্থলেই যেন পরিষ্কার এবং ইতস্ততঃ নানাপ্রকার আঁচড়ের চিহ্ন। নির্ব্বাক বিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে চেয়ে মেয়ানী বল্লে—'এ কি স্বপ্ন রাজ্য না পাতাল পুরী—নিশ্চয়ই এখানে কাহারা বাস করে।' শঙ্কায় তার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়েছিল, সে কম্পিত কলেবরে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়ালো। এতদঞ্চলের লোক অকুতো সাহসী হলেও—অত্যন্ত কুসংস্কারাপন্ন। মৌলুদ প্রকাশ না করলেও, সে যে অত্যন্ত ভীত হয়েছিল তা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলেম। মেয়ানীর হস্তধারণ করে ঈষৎ হেসে বল্লেম—'যেই বাস করুক এ পিস্তলের মুখে কেহই অগ্রসর হবে না, এ রাজ্য এখন আমাদেরই।'

সেই গৃহের উত্তর ভিত্তিতে, 'চোর-কুঠারী'র মত আর একটি ক্ষুদ্র গৃহও দৃষ্ট হল—খুব মলিন—অন্ধকার। এক কোণে কতকগুলি অঙ্গারের রাশিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ভগ্ন মৃৎ পাত্রের অংশ সকল, যেন কোন অতীত যুগের রন্ধনশালার লুপ্ত স্মৃতি বহন করে পতিত ছিল।

পশ্চিম ভিত্তিগাত্র হতে আর একটি প্রশস্ত সুড়ঙ্গ পথ বহির্গত হয়ে বরাবর পশ্চিম দিকেই গিয়েছিল। এ পথটি সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যেন ইদানী কালের কাহারও ব্যবহারে ধূলা মলিনতার চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত। আমরা সেই পথে অগ্রসর হয়ে চল্লেম। দশ বারো হাত পরেই সেই প্রশস্ত সুড়ঙ্গ পথ—প্রথম সুড়ঙ্গের ন্যায়—হঠাৎ একেবারে স্বল্পায়তন হয়ে গিয়েছিল, এবং সেইস্থান হতে দক্ষিণ দিকেও আর একটি অপ্রশস্ত সুড়ঙ্গ চলে গিয়েছিল—কিন্তু এ পথটি প্রায় অবরুদ্ধ। প্রস্তর খণ্ড ও ধূলা রাশিতে আচ্ছন্ন।

আমরা এই দুই পথের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে একবার ভাল করে চারিদিক দেখলেম, তৎপরে প্রথম বারের মত, মেয়ানীও মৌলুদকে অগ্রবর্ত্তী করে, সর্ব্ব পশ্চাতে আমি পিস্তল হস্তে আবার হামাগুড়ি দিয়ে বরাবর পশ্চিমের পথে চল্লেম। জল কল্লোল—নিকট নিকটতর হতে লাগলো। মেয়ানী চমৎকৃত হয়ে বল্লে 'দেখ সুন্দর এ পথটা, বড় পরিষ্কার, সমতল—যেন কাহারা, প্রত্যহ ব্যবহার করে, কিন্তু অত্যন্ত সিক্ত।' আমি বল্লেম—যেই হোক এখন এ দুর্গ আমাদের অধিকৃত, আমরা সহজে পরাভূত হয়ে ফিরবো না।' মেয়ানী বল্লে—'নিশ্চয় নয়।' আমরা অগ্রসর হয়ে চল্লেম।

প্রায় পাঁচ মিনিট গমনের পরে, সহসা মেয়ানী স্থির হয়ে অত্যন্ত ভীতিব্যঞ্জক স্বরে চীৎকার করে বল্লে—'দেখ কার চক্ষু?' অতি ত্রস্তে এবং কষ্টে মৌলুদকে ঠেলে হামা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মেয়ানীর পশ্চাতে এলেম। মেয়ানী আশঙ্কায় থরথর করে কাঁপছিল। আমি তার মুখ হতে লণ্ঠনটি এক হস্তে গ্রহণ করে, তাকে পশ্চাতে ঠেলে সম্মুখে গেলেম। মেয়ানী কম্পিত কলেবরে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলে। আমার হস্তস্থিত আঁধারে লণ্ঠনের আলোক রশ্মি পাতে দেখলেম যথার্থই প্রায় বার চৌদ্দ হাত দূরে কার দুটো গোলাকার চক্ষু অগ্নি গোলক দ্বয়ের মত জ্বলছিল। তৎক্ষণাৎ সেই চক্ষু লক্ষ্যে পিস্তল ছুড়লেম।

সহসা একটা ভয়ানক কাণ্ড বেধে গেল, মনে হল এই বুঝি আমাদের অন্তিম কাল। বারুদের ধূমে সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গ আরও তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেল, নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হল, একটা ভীষণ প্রতিধ্বনি আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ শৈল ভিত্তি কম্পিত করে ক্রোধে গর্জ্জন করতে লাগলো, এবং সম্মুখে একটা ভীতি প্রদায়ক গোঁঙানি শব্দ উত্থিত হয়ে ক্রমশঃ দূরে মিশিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি খস্ খস্ শব্দও অনুভূত হল। চীৎকার করে মিয়ানী আমার বক্ষ মধ্যে লুক্কায়িত হল এবং মৌলুদও তার উপরে এসে পড়লো।

ক্রমশঃ সমস্তই আবার স্থির হল, ধূমরাশি অপসারিত হল, সেই চক্ষুদ্বয়ও অপস্থৃত হয়েছিল। আমি অগ্রসর হবার উদ্যোগ করতেই বাধা দিয়ে মেয়ানী বল্লে—'না তা হবে না, মৌলুদ অগ্রগামী হোক, তোমাকে অগ্রসর হতে দিব না।' মৌলুদ নিস্তব্দ—বোধ হল, একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস তার বক্ষ ভেদ করে উঠ্‌লো। বিস্তর যত্নে তাকে সাহস দিয়ে আমিই অগ্রবর্ত্তী হলেম, কিন্তু মেয়ানীর সর্ব্ব অনুরোধ উপেক্ষা করে তাকে পশ্চাতে রেখে মৌলুদ এসে আমার পশ্চাতে তার স্থান অধিকার করলে।

আমরা সেইভাবে প্রায় দশ মিনিট পর্য্যন্ত সেই পথে চল্লেম। মৌলুদ আমার কর্ণে নিম্নস্বরে বল্লে—'দেখুন আমার হস্তে ও জানুতে কর্দ্দম লাগছে।' আলোক সাহায্যে লক্ষ্য করে দেখলেম—সম্ভসিক্ত কর্দ্দমই বটে। বুঝলেম আমার গুলি ব্যর্থ হয় নাই।

সহসা আমাদের সর্ব্বাঙ্গে শীতল সমীর লাগলো, পরক্ষণেই আমরা সেই সুড়ঙ্গের মুখে এসে পড়লেম। আমাদের সম্মুখে এক নাতি বিস্তৃত পার্ব্বত্য তটিনী উপল শয্যার পরে ঘোর কলকল রবে প্রবাহিত হচ্ছিল।

আমরা চমৎকৃত হয়ে চতুর্দ্দিক দেখতে লাগলেম। রজনীর অন্ধকার, মস্তকোপরি নীলাকাশে প্রতিফলিত নবোদিত চন্দ্রকরে ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছিল।

তটিনী বরাবর উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিতা। উত্তরের দিকে উপরে নীলাকাশ এবং পূর্ব্ব পশ্চিমের দুই পাড়েই সেই শৈলশ্রেণী অত্যুন্নত প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু দক্ষিণে অল্পদূর পরেই তটিনীর উপর দিয়ে দুই পার্শ্বের শৈলশ্রেণীই একত্রে মিলিত হয়েছিল। পাদদেশে সুড়ঙ্গপথে সেই তটিনী পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশ করেছিল—বারিপ্রবাহ খরস্রোতা—উত্তর গামিনী বুঝলেম। সেই পর্ব্বতের অভ্যন্তর্দ্দেশের কোন স্থান হতে সেই প্রবাহিনী বহির্গত হয়েছিল।

সহসা মেয়ানী,—বামপার্শ্বে অল্প দূরেই তটিনী তটে, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কি প্রদর্শন করলে। বোধ হল কর্ত্তিত বৃক্ষের ন্যায় কি পতিত রয়েছে। নিকটস্থ হয়ে দেখলেম—এক প্রকাণ্ড কায় মৃত কুম্ভীর শায়িত, সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত। তখন বুঝলেম—সেই ভীষণ জীবই সেই গহ্বর গৃহে আবাস স্থাপন করেছিল।

সকল বিষয়ের অবস্থা পর্য্যালোচনা করে আমার সন্দেহ ক্রমেই দূরীভূত হতে লাগলো, কিন্তু সে চিন্তা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রেখে, পরদিন প্রভাতে আমাদের প্রধান দুইজন ব্যক্তির সহিত, দ্রব্যাদি সমস্ত আনয়ন করে আমরা সেই গহ্বরের মধ্যেই বাস করলেম। সেই সুড়ঙ্গ গৃহের নাতি দূরে পর্ব্বতের উত্তর ভাগে একটি

ছোট রকমের উপত্যকা ছিল। সেইখানেই আমাদের অবশিষ্ট লোকজন ও যান বাহনাদি রক্ষিত হ'লো। সেখানে ঘাস জলের প্রাচুর্য্য ছিল ; সুতরাং পশ্বাদির জন্য চিন্তার কারণ ছিল না।

সেই গহ্বর গৃহদ্বয়কে আমাদের বাসের উপযুক্ত করে নিতে সে দিন সমস্তই ব্যয়িত হ'লো। পরদিন হতে আমরা দক্ষিণ দিকের সেই আবদ্ধ সুড়ঙ্গ পথ পরিষ্কৃত করতে আরম্ভ করলেম। তৃতীয় দিন অপরাহ্নে যখন সেই পথ সুপরিষ্কৃত হ'লো তখন আমরা তিনজনে আবার হামা দিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করলেম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে যেখানে আমরা বহির্গত হলেম, সে স্থানটা একটা উন্মুক্ত গহ্বর—মনুষ্য হস্ত খোদিত ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর মত। তার পাড়ে উঠে সকলেই বিস্মিত হয়ে দেখলেম— তার দক্ষিণ দিকে দীর্ঘায়তন এক বিস্তৃত উপত্যকা—বৃক্ষলতা, পত্রপুষ্পে সজ্জিত। একটি ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী পশ্চিম দিকের পর্ব্বত প্রাচীর ভেদ করে নির্গত হয়ে, উপত্যকার মধ্য দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছিল।

তখন সূর্য্য অস্তাচলে আরোহণ করবার উপক্রম কচ্ছিল। সহসা দক্ষিণে সেই উপত্যকা মধ্যে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূরে ঘন সমাচ্ছন্ন বৃক্ষাবলীর শিরদেশে ধূম দৃষ্ট হ'লো। হর্ষভরে মেয়ানী বল্লে, "ঐ মোড়লের আড্ডা।" তখনি আমাদের যুক্তি স্থির হ'লো—মরু প্রদেশে, বেদে বেদেনী বেশে মেয়ানী ও মৌলুদ, সন্ধ্যার পরে বহির্গত হয়ে, মোড়লের আড্ডার অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হয়ে আসবে, পরে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা হবে।

গহ্বর মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে মেয়ানী ও মৌলুদ ছদ্মবেশে সজ্জিত হয়ে বাহির হয়ে গেল। সেই গহ্বর মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মেয়ানী একপ্রকার ঘাস সংগ্রহ করে এনেছিল। তার রস মুখে মাখবার পরে আর মেয়ানীকে চেনবার সাধ্য ছিল না। মৌলুদও সেই রস মেখে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছিল।

প্রায় অর্দ্ধরাত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করে তারা তাদের কার্য্যাবলীর যেরূপ বিবরণ দিল তাতে আমি তাদের উচ্চ সুখ্যাতি না করে থাকতে পারলেম না।

তারা আপনাদিগকে মন্ত্র তন্ত্র ও গীত বাদ্য ব্যবসায়ী সুদান প্রত্যাগত মিশর যাত্রী বেদে বলে পরিচয় দিয়ে মোড়লকে সহজেই প্রতারিত করেছে এবং গীত বাদ্যে তার সে বিশ্বাস আরও দূরীভূত করবার পর, যখন তারা এক কাল্পনিক গল্পের সৃষ্টি করেছিল, তখন লোভে মোড়ল আত্ম বিস্মৃত হয়ে উঠেছিল।

তারা যখন ছিল যে, তারা বিপুল অর্থ ও দ্রব্য সম্ভারবাহী একদল বণিককে 'বারবার' হতে 'অস্বান' গমনের উদ্দেশে, তিন দিন পূর্ব্বে সেই পথেই আসতে

দেখে এসেছে, তখন মোড়লের চক্ষুদ্বয় একবার ধক্ ধক্ করে জলে উঠেছিল। দস্যু সর্দ্দার মোড়ল লোভে এত আত্মহারা ও উত্তেজিত হয়ে ছিল যে,তখনই তাদের বকশিস্ করে আরও নিশ্চিত সংবাদ আনয়নের জন্য অধিকতর বকশিসের লোভ দেখিয়ে বিদায় করেছে।

তাদের উপাখ্যান শেষ করে মেয়ানী বল্লে—সেই কল্পিত বণিক দলের এই পর্ব্বত সান্নিধ্যে উপস্থিতির সংবাদ জ্ঞাপন করবামাত্রেই, নিশ্চয়ই মোড়ল তার সমস্ত দলবলকে তাদের আক্রমণের উদ্দেশ্যে পাঠাবে। সেই অবসরে আমাদের কার্য্য উদ্ধার করতে হবে। পরশু আমাদের সেই নির্দ্ধারিত দিন। মেয়ানী আরও বল্লে যে, সে তার শ্বেত রমণীর সঙ্গে দেখা করবার অবসর না পেলেও তিনি যে সুস্থ আছেন তার প্রমাণ দেখে এসেছে। তখন আমরা ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের জন্য যুক্তি নির্দ্ধারণ করে সে রাত্রে সকলেই বিশ্রাম লাভ করলেম।

উত্তরের গৃহমধ্যে আমার শয্যা ও দক্ষিণের গৃহমধ্যে মৌলুদ ও অন্য দুইজন প্রধান ভৃত্যের শয্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমার গৃহ হতে মৌলুদের গৃহে গমন-পথের মুখে আমার গৃহমধ্যেই মেয়ানী শয়ন করতো।

সে রাত্রে চক্ষু মুদ্রিত করে নিদ্রার চেষ্টা করলেও নানা প্রকার মানসিক চিন্তা ও উৎকণ্ঠার জন্য আমার নিদ্রা হয় নাই। কিন্তু তথাপি আমি নিদ্রিতের মত শুয়ে ছিলেম, সহসা আমার কপোলদেশে কার উষ্ণ নিশ্বাস স্পর্শ হ'লো,সঙ্গে সঙ্গে একটী অতি সন্তর্পিত দীর্ঘশ্বাসের শব্দও অনুভূত হ'লো। বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলেম—মেয়ানী আমার মুখের উপরে নীচু হয়ে কি দেখছিল। আমি আশ্চ-র্য্যান্বিত হয়ে বল্লেম,"মেয়ানী ঘুমাও নাই ?" অপ্রতিভ হয়ে সে বল্লে, "না—ওই শুন সুড়ঙ্গপথে কি শব্দ ?" আমি নিবিষ্ট কর্ণে শুনলেম—যথার্থই পশ্চিমের সুড়ঙ্গ পথে এক প্রকার থপ্—থপ্ শব্দ হচ্ছিল।

আমি দ্রুত উঠে লণ্ঠন ও পিস্তল লয়ে অগ্রসর হলেম। মেয়ানী ত্বরিতে আমার হস্ত ধারণে বাধা দিয়ে বল্লে, 'না, তোমাকে যেতে দেব "না, মৌলুদকে ডাক।" তার কণ্ঠস্বরে একটা আশঙ্কা ও আকুলতা বিদ্যমান ছিল। আমি ঈষৎ হাস্য করে বল্লেম, "সংসারে আমার কোন বন্ধন নাই—কেহ কাঁদবার নাই—আমার জীবনে মায়া কি ?" একান্ত আকুল হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে মেয়ানী বল্লে, "আছে আছে—চোখ মেলে দেখ—তোমা ভিন্ন জগৎ তার"—তার কথা শেষ হ'লো না,সহসা মৌলুদ উপস্থিত হ'লো। বোধ হলো সে বহুক্ষণ হতে আমাদের লক্ষ্য করছিল।

আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম—কি মৌলুদ ? সে বল্লে আপনাদের কথা শুনে উঠে এলেম—নিদ্রা হয় নাই। আমি বল্লেম উত্তম করেছ—ওখানে দেখ কি ব্যাপার, সুড়ঙ্গ পথের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করলেম; তখন তিনজনে সাবধানে অগ্রসর হলেম। দক্ষিণ ও পশ্চিমের সুড়ঙ্গের মিলন স্থানে দৃষ্টি পড়া মাত্রেই দেখলেম—প্রকাণ্ড জালার মত একটা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর স্তুপ যেন দক্ষিণ সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করলে। মেয়ানী ভয়ে চীৎকার করে উঠলো. আমরাও নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালেম।

সেটা যে কি—তা কেহই বুঝতে পারলেম না, অথচ সকলেই চাক্ষুস দেখলেম। আমি তৎক্ষণাৎ পিস্তলে একটা ফাকা আওয়াজ করলেন। ধুমরাশি অপসারিত হ'লে, অগ্রসর হয়ে দেখতে গেলাম, মেয়ানী জোর করে নিবারণ করলে, কিছুতেই অগ্রসর হতে দিলে না। কাজেই লণ্ঠন হস্তে মৌলুদ অগ্রবর্ত্তী হ'লো—আমরা তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুড়ঙ্গে ঢুকলেম। শঙ্কিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে আমরা যখন সুড়ঙ্গের বাহিরের মুখের কাছে এলেম, তখন উষার প্রথম ছটা আকাশ মণ্ডল রঞ্জিত করে দিয়েছিল। সকলেই চমৎকৃত হয়ে দেখলেম—আমাদের সম্মুখে সুড়ঙ্গ হতে বাহির হয়ে বৃহৎ জালার মত, বিশালকায় এক প্রকাণ্ড কচ্ছপ সেই পুষ্করিণীর জলমধ্যে গিয়ে পড়লো। এরূপ বৃহদাকৃতি কচ্ছপ পৃথিবীতে আছে তা স্বপ্নেও কখন ধারণা করিতে পারি নাই।

সেই দিন দিবসে আমাদের যুক্তিমত মেয়ানী আমার জন্য একটী ছদ্মবেশ প্রস্তুত করলে এবং এক বোতল ব্রাণ্ডীর সঙ্গে এক প্রকার পর্ব্বতীয় বৃক্ষের রস মিশ্রিত করে চেতনা বিলোপকারী ঔষধ প্রস্তুত করে রাখলে।

রাত্রে মৌলুদ ও মেয়ানী নিদ্রিত হ'লে আমি ধীরে ধীরে উঠলেম। একগাছি দড়ি একটা শাবল এক গুচ্ছ সরু তার, একটি ছোট সাঁড়াসি এবং একটি লণ্ঠন ও পিস্তল লয়ে একাকী সেই দক্ষিণের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে সেই পুষ্করিণী তীরে গেলেম। তার পূর্ব্বপাড়ের নিম্নে কতকগুলি লতা গুল্ম ও বন্য ঝোপের মধ্যে তিনটি নরকঙ্কাল পতিত ছিল, বাহির হতে তা লক্ষ্য হত না। দিবসে আমি দেখেছিলেম, কিন্তু কাহাকেও বলি নাই। কঙ্কালগুলি ভগ্ন এবং ক্ষয় প্রাপ্তির সীমায় উপনীত হ'লেও, তখনও গুছায়ে গাঁথতে পারলে সে গুলি এক একটি কতকাংশ সম্পূর্ণ কঙ্কাল হতে পারতো। আমি সেইগুলি একত্রে রজ্জুবদ্ধ করে বহন করে লয়ে যখন দক্ষিণের পাড়ে গিয়ে উঠলেম, তখন সহসা পশ্চাতে কার ভীতিব্যঞ্জক অস্ফুট চীৎকার শুনতে পেলেম। চেয়ে দেখি সুড়ঙ্গ মুখে দাঁড়িয়ে মেয়ানী আমার

কার্য্যাবলী লক্ষ্য করছিল। আমি বিস্মিত হয়ে বল্লেম, "মেয়ানী—এ সময়ে এখানে তুমি ?"

মেয়ানী কোন উত্তর না দিয়ে দ্রুত গতিতে আমার নিকটে এসে কঙ্কাল-গুলির প্রতি আঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে সভয়ে বল্লে, 'সর্ব্বনাশ, ওসব কি ?" আমি তাকে বুঝিয়ে দিলেম ওতে ভয়ের কারণ কিছুই নাই, অথচ আমাদের কার্য্যোদ্ধারে সেই কঙ্কালগুলি বিশেষ সাহায্য করবে। তখন মেয়ানী আমার হাত হতে সেগুলি কেড়ে নিয়ে বল্লে, "ছিঃ আমাকে না বলে একা এসেছ। জান না যে তোমার কর্য্যেই আমার সুখ ? আমি তোমার দাসী,।" সে কথা সম্পূর্ণ না করে সহসা উচ্চ হাস্য করে বল্লে, "চল কোথায় যাবে।"

সে পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ের প্রায় এক পোয়া পথ দূরে উপত্যকা মধ্যে সারি সারি পাশাপাশি কতকগুলি ঝোপ ছিল। আমরা সেইখানে এলেম। তারপরে তারদিয়ে তিনটি কঙ্কালকে পৃথক পৃথক গেঁথে তিনটি ঝোপের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখলেম এবং প্রত্যেকের নিম্নে এক একটি গর্ত্ত করলেম।

তারপরে গহ্বর-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে তিনটি ডাইনামাইট, এবং কতকগুলি বৈদ্যুতিক তার লয়ে গিয়ে সেই গর্ত্ত তিনটিতে ডাইনামাইট তিনটি পুতলেম, এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে এক একটি বৈদ্যুতিক তার সংযোগ করে, সেগুলি ঘাসের মধ্যে লুক্কায়িত রেখে সুড়ঙ্গ মুখ পর্য্যন্ত নিয়ে এলেম। সেইখানে ব্যাটারি বসিয়ে সেই তারগুলি সংযোগ করে, ঢেকে রেখে দিলেম। তখন প্রভাত হয়ে গিয়েছিল।

বৈকালে আমি পারস্যদেশীয় বণিকের বেশে সজ্জিত হলেম, এবং মেয়ানী ও মৌলুদ পূর্ব্বের সেই বেদেনী ও বেদের বেশ ধারণ করলে। পোষাকের মধ্যে সকলেই গুপ্ত ভাবে নিজ নিজ অস্ত্র রক্ষা কল্লেম। মেয়ানী তার ঝুলির মধ্যে সেই পত্ররস মিশ্রিত মদের বোতল নিলে এবং মৌলুদ ও একটি নর্ত্তকীর বেশে তদ্দেশীয় একটি বাদ্য যন্ত্র নিলে। আমি এক বোতল ভাল ব্রাণ্ডী ও পাঁচটি গিনি সঙ্গে নিলেম। তারপরে একখানি পত্র লিখলেম,—"যে কোন ভদ্র মহিলা হও—চিন্তা নাই, পত্র বাহিকার আদেশ মত কার্য্য করিবে। তোমার উদ্ধারার্থেই এই সকল আয়োজন জানিবে।"

পত্রখানি মেয়ানীর হস্তে দিয়ে আমরা ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক বাহির হলেম;—তখন অপরাহ্ন। বলা বাহুল্য—ব্যাটারী চালনার কৌশল পূর্ব্বেই আমি মৌলুদকে

শিখিয়ে রেখেছিলেম। ক্রোশার্দ্ধ পথ অতিবাহিত করে যখন মোড়লের আড্ডায় পৌঁছিলেম তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

বাক্সের ঘেরাটোপের মত—মোড়লের তাঁবুটি চতুষ্কোণ। মোড়লের তাঁবুর পশ্চাতে প্রায় চারিশত হস্ত দূরে আবক্ষ উচ্চ কতকগুলি শিলাখণ্ডের নিম্ন দিয়ে সেই তটিনী বহে যাচ্ছিল। সেই তাঁবুর বামে এবং সম্মুখে পাশাপাশি তদ্রূপ আরও কয়েকটি তাঁবু,—তার মধ্যে একটি যেন কতকটা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় সর্ব্বশেষে অবস্থিত। মেয়ানী বল্লে, "সেই তাঁবুটিই বন্দিনীর।"

মোড়লের তাঁবুর দক্ষিণে কতকগুলি বৃহৎ বৃক্ষের নীচে, পশু সকল, ও ভৃত্যদের স্থান। সেই খানে কতকগুলি বিকটাকার অসুরের ন্যায় পুরুষ বসে আপনাপন অস্ত্র মার্জ্জনা করছিল। চারদিকেই যেন একটা সচকিত ভাব।

তাঁবুর মধ্যে একখানি গালিচার উপরে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় মোড়ল ধূমপানে নিযুক্ত। দুই পার্শ্ব হতে দুইজন ক্রীতদাস তার পদ সেবায় ব্যস্ত, এবং কিঞ্চিৎ তফাতে শতগ্রন্থি কোট পেণ্টুলেনধারী এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি কতকগুলি অস্ত্রে ধার দিচ্ছিল।

আমাকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করে সর্ব্বাগ্রে মেয়ানী ও তৎপশ্চাৎ মৌলুদ প্রবেশ করে আভূমি সেলাম করে দাঁড়াল। আমিও তদ্রূপ করে মৌলুদের পশ্চাতে দাঁড়ালেম। মোড়লের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হ'লো। সে মেয়ানী ও মৌলুদকে আহ্বান করলে। কিন্তু আমার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই হঠাৎ তার মুখভাব পরিবর্ত্তিত হ'লো। বারংবার সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ কটাক্ষে আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করতে করতে রুক্ষস্বরে বল্লে, "একে, এখানে কেন?"

তৎক্ষণাৎ পুনরপি সেলাম করে মেয়ানী বল্লে, "ইনি পারসী সদাগর। এঁরা দশজনে পাঁচহাজার টাকার দ্রব্য ও মুদ্রা লয়ে 'মাসোয়া' হতে 'ত্রিপলি' যাচ্ছিলেন। বালুতুফানে পথভ্রষ্ট হয়ে এই পথে এসে পড়েন। পরন্তু রাত্রে সেই বণিকদল এঁদের আক্রমণ পূর্ব্বক সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে তিনজনকে হত্যা ও পাঁচজনকে বন্দী করেছে। এঁরা দুইজনে কোন ক্রমে পলায়ন করে এক্ষণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। হুজুরের আজ্ঞায় সেই বণিক দলের সন্ধান করে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আমরা ইহাকে প্রাপ্ত হয়েছি। ইনি আপন্মার সাহায্যে এর অপহৃত সামগ্রী উদ্ধারের বাসনা করায় আমরা সঙ্গে এনেচি। এক্ষণে জনাব

বন্দোবস্ত করে লন। কিন্তু এই বান্দাবাদীকে পায়ে রাখবেন। মৌলুদ ও মেয়ানী আবার দীর্ঘ সেলাম করিল।

পাঁচহাজার টাকার মণিমুক্তা ও দ্রব্য সম্ভারের কথা শুনে মোড়লের মুখ সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। সে উৎসাহের সহিত বল্লে, "তোমাদের ভালরকম বকশিস্‌ করবো, ওকে সাম্‌নে আসতে বল।"

মেয়ানীর ইঙ্গিতমত অগ্রসর হয়ে দীর্ঘ সেলাম করে, আমি মোড়লকে সেই ব্রাণ্ডীর বোতল ও গিনি পাঁচটা নজর দিয়ে দাঁড়ালেম;—বল্লেম, "হুজুর, মালিক আমার দ্রব্যাদি উদ্ধার করে দিন—অর্দ্ধেক আপনার।" মেয়ানী কথাগুলি আরও রং ফলিয়ে তাদের ভাষায় বুঝিয়ে দিলে।

মোড়ল পুনরায় অত্যন্ত সন্দেহ সূচক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদ মস্তক বিশেষরূপে লক্ষ্য করতে লাগলো। আমি জানুপবিষ্ট হয়ে বুক চাপড়ে, মুখে নানা প্রকার ভঙ্গীর সহিত মূক্‌ অভিনয়ে, আমার দুর্দ্দশা জানাতে লাগলেম, কিন্তু বুকের ভিতর থর থর করে কাঁপছিল।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে মোড়ল আমার প্রদত্ত নজরের দিকে দৃষ্টি করলে। গিনিগুলি হাতে তুলে নিতেই তার মুখভাব পরিবর্ত্তিত হ'লো। প্রফুল্ল মুখে বল্লে ভয় নাই বণিক, তুমি ঠিক লোকের কাছে এসেছ, তোমার সমস্ত দ্রব্য উদ্ধার করে দেব। এক্ষণে তার অর্দ্ধেকেই সম্মত হলেম। কিন্তু মাসোয়ায় গিয়ে দু হাজার দিতে হবে। তুমি পত্রদেবে, আমার লোকে তা নিয়ে যাবে; তোমাকে এখানে জামিন থাকতে হবে। টাকা নিয়ে আমার লোক ফিরে এলেই তুমি মুক্ত হবে; ততদিন এখানে সমাদারে থাকবে, কোন ক্লেশ হবে না।" মেয়ানী কথাগুলি আমাকে বুঝিয়ে দিলে।

মোড়লের বিশ্বাস অধিকতর করবার জন্য টাকার কথা নিয়ে অনেক তর্ক কল্লেম শেষ এক হাজার তিনশো টাকায় রফা হ'লো। মেয়ানীর সঙ্গে মোড়ল ক্ষণেক কি কথাবার্ত্তা কইলে, তারপরে তার আদেশে সেই সন্ধ্যার প্রাক্কালেই কুড়িজন ভীমাকৃতি পুরুষ সসস্ত্রে বাহির হয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলে এবং আমার সম্বর্দ্ধনার্থে রাত্রে নৃত্য গীত ও ভোজের ব্যবস্থা হলো। বুঝলেম—মোড়ল ফাঁদে পা দিয়েছে।

মেয়ানী ও আমি সান্ধ্যাকৃত্য করবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে, মোড়ল একজন ভৃত্যকে ডেকে আমাদের নদীতীরে নিয়ে যাবার হুকুম দিলে। মৌলুদ সেইখানে বসে রইলো।

নদীতীরে কয়েকজন কৃষ্ণকায় দাসদাসী মৃৎপাত্রে জল তুলছিল, ভৃত্য আমাদের অনুমতি ক্রমে তাদের সহিত প্রস্থান করলে। আমরা নিভৃতে উপস্থিত যুক্তি নির্দ্ধারণ করে ফিরলেম। তাঁবু হতে সেই কোট পেণ্টুলেনধারী যুবক তখন নদীর দিকে আসছিল।

মেয়ানী নিম্নস্বরে আমাকে বল্লে, "ওই লোকটা মোড়লের একজন প্রধান সর্দ্দার—বড় খল ও চতুর। ও কিছুদিন সীমান্তে ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে ঘোড়ার সহিসের কাজ করেছিল। তথায় আমার মাতা ও আমি সেই সৈন্যদলের ডাক্তার সাহেবের কন্যার পরিচারিকা ছিলাম। ডাক্তার সাহেব অসুস্থ থাকায় প্রায়ই একা পর্ব্বতের নিম্নে ও প্রান্তরে ভ্রমণ করতেন এই ব্যক্তি মোড়লের আজ্ঞামত তাঁকে অতর্কিত অবস্থায় হত্যা করে, আমার মাতাকেও হত্যা করে এবং কমলাকে ও আমাকে চুরিকরে মুখ বেঁধে লয়ে সেই গ্রামে মোড়লের নিকট উপস্থিত করে। তারপরে সে গ্রামের কথা তুমি জান। ও কার্য্যব্যপদেশ কাসালয়ে প্রেরিত হয়েছিল—সে গ্রামে তোমাদের আগমন দেখে নাই। এক্ষণে কাসালা হতে ফিরে পথেই মনিবের সঙ্গে ঠিক জুটেছে দেখছি। ওই লোকটাকেই আমার যা কিছু ভয়।"

মেয়ানীর কথায় এতদিনের পরে সমস্ত রহস্যজাল উদ্‌ঘাটিত হল। তখন আমার প্রাণের মধ্যে কি হচ্ছিল, তা বলতে পারি না।

মেয়ানী পুনশ্চ বল্লে, "আমাদের ছদ্মবেশে এখানে প্রথমাগমনাবধিই পরশু থেকে লোকটা আমাদের সন্দেহ করেছে। কিন্তু বড় লম্পট আমি কেবল হাবভাব ও কটাক্ষে ভুলিয়ে রেখেছি। আজ মাতৃহত্যা ও প্রভুহত্যার প্রতিশোধ নেব।" সহসা মেয়ানীর চক্ষে যেন বিদ্যুৎ চম্‌কে গেল। তখন আমরা প্রায় তার নিকটবর্ত্তী হয়েছিলেম।

মেয়ানী সরস ঈষদ্ধাস্যে উচ্চৈস্বরে তাকে বল্লে, "হুজুর আমার বরাত জোর যে নিভৃতে তোমার সাক্ষাৎ পেলেম। তোমার সঙ্গে আমার গোপনীয় কথা আছে—নাচগানের পরে—এই নদীতীরে মনে রেখ।" পরে মৃদু স্বরে বল্লে, পুরুষটা বড় সন্দিগ্ধ কিন্তু আমি ঠিক ভুলিয়ে আসবো। মেয়ানী এক সরস কটাক্ষ নিক্ষেপ করলে।

লোকটা আনন্দিত হয়ে মেয়ানীকে কি বলে নদীর দিকে চলে গেল। সেই অবসরে আমরা অতি দ্রুত পশ্চিমের সর্ব্বশেষ তাঁবুর নিকটবর্ত্তী হলেম। সহসা সেই তাঁবুর ঈষন্মুক্ত দ্বারের ব্যবধানে দেখলেম—কমলা—আমার সেই কমলা

একাকিনী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড সম্মুখে দণ্ডায়মানা। আমি চমকিত, বিস্মিত, স্তব্ধ! চকিতে মেয়ানী একটি লোষ্ট্রে, আমার লিখিত পত্রখানা মুড়ে, তার সম্মুখে ছুড়ে দিলে, এবং পর মুহূর্ত্তেই আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে আবার বিদ্যুদ্বেগে মোড়লের তাঁবুর পশ্চাতে নদীর পথে এসে উপস্থিত হ'লো। আমি কথা বলবার অবকাশ পেলেম না—চমকিত হয়ে দেখলেম, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই স্বয়ং মোড়ল সেই পথ মুখে উপস্থিত হ'লো। বোধ হয় আমাদের বিলম্ব দেখে মোড়লের সন্দেহ হয়েছিল।

মোড়ল বল্লে, "এত দেরী কেন?" মেয়ানী নদীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বল্লে, "সর্দ্দারের সঙ্গে কথা কচ্ছিলেম। তখন সর্দ্দারও নদী হতে উঠছিল। মোড়লের মুখভাব প্রসন্ন হ'লো, সে আমাদের লয়ে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করলে।

* * * * * *

আহারাদির পরে নৃত্য গীত আরম্ভ করবার আদেশ হ'লো। সেই সর্দ্দার মোড়লের বাম পার্শ্বে এবং আর আটজন লোক তাদের পশ্চাতে অর্দ্ধবৃত্তাকারে উপবিষ্ট হ'লো। বুঝলেম আড্ডায় ঐ কয়জন মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা তিনজন মোড়লের সম্মুখে সেই তাঁবুর প্রবেশ পথে বসলেম।

মোড়লের বাম পার্শ্বে তাঁবুর পশ্চিম গাত্রের বনাত কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করে তথায় একখানি সূক্ষ্ম চিক্কণ বস্ত্রের পরদা লম্বিত হয়েছিল। বুঝলেম তার পশ্চাতে রমণীগণের আসন নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু কমলা ভিন্ন পর্দ্দানসীন অন্য কোন স্ত্রীলোক সে আড্ডায় ছিল বলে আমার বিশ্বাস হয় নাই।

প্রথমে দুইটি কৃষ্ণাবর্ণা ক্রীতদাসী অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় নৃত্য আরম্ভ করলে। একজন কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাস দুইটি ছোট ছোট পানপাত্র ও আমার প্রদত্ত ব্রাণ্ডীর বোতল সম্মুখে রেখে গেল। মেয়ানী পাত্র দুটি পূর্ণ করে একটি মোড়লের ও অপরটি সর্দ্দারের হস্তে প্রদান করলে। পান করে সর্দ্দার বল্লে, "বণিক তোমার পারস্যের সুরা অতি উত্তম।" মেয়ানীর সাহায্যে আমি উত্তর দিলেম, "ও সুরা পারস্যের নয়। হুজুরের আদেশ হ'লে, আমার কাছে তা এক বোতল আছে— আশা করি পান করে অধিকতর খুসী হবেন।" সেই মিশ্রিত ব্রাণ্ডীর বোতল বহির করে সম্মুখে রাখলেম।

'উত্তম উত্তম', বলে মোড়ল মেয়ানীর প্রতি ইঙ্গিত করলে। মেয়ানী ত্বরিতে উঠে তার ঝুলি লয়ে বাহিরে গেল। আমি সেই অবসরে আবার ভাল ব্রাণ্ডী দুটি

মেয়ারী সর্দারের বুকে ছুরি মারিতেছে— মাতুকর।

পাত্র পূর্ণকরে, সর্দ্দার ও মোড়লের হস্তে দিলেম। পরক্ষণেই মেয়ানী অপূর্ব্ব নর্ত্তকীবেশে রমণী আসনের পরদা সরিয়ে প্রবেশ কল্লে।

রমণীগণের আসনের মধ্য হইতে মেয়ানীকে আসতে দেখে রুক্ষস্বরে মোড়ল বল্লে, "ওদিকে যেতে তোমাকে কে আদেশ করেছে?"

সর্দ্দারের প্রতি এক বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করে মেয়ানী বলে, "হুজুর মাফ করুণ—আমি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের সাহায্য ভিন্ন বেশ ধারণ করতে পারি না।" তখন সর্দ্দার মোড়লের কাণে কাণে কি বল্লে—মোড়লের মুখের রুক্ষভাব অন্তর্হিত হলো। মোড়ল বল্লে, "আচ্ছা ক্ষতি নাই—আর যেন যেও না।"

মেয়ানী সেলাম করে পুনরপি বল্লে, "হুজুর আরও দু একবার যাবার প্রয়োজন হবে নচেৎ আমার বিস্তার সম্যক পরিচয় দেব কি প্রকারে?" আবার সর্দ্দার মোড়লের কর্ণে যুক্তি দিলে, মোড়ল বল্লে, "আচ্ছা দুবার—আর দুবার মাত্র—বেশী নয়," মেয়ানী বল্লে—"যথেষ্ট।" তখন মেয়ানী পুনরায় দু পাত্র সুরা তাদের হস্তে দিয়ে নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গীতে নৃত্য আরম্ভ করলে। মৌলুদ বসে বসে বাজাতে লাগলো।

নৃত্য অন্তে আবার দু পাত্র মদ্য ঢেলে দিয়ে মেয়ানী ভিতরে চলে গেল—মৌলুদ বাজাতে লাগলো। আমি আবার মদ্য দিলেম। তারপরে এবারে যখন সজ্জিত হয়ে মেয়ানী বাহির হলো—তখন যেন একটা বিদ্যুৎ চমকে গেল। সর্দ্দার ও মোড়ল সমস্বরে জড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো, "হুরী—হুরী—নাচ গান চলুক।"

আবার মেয়ানী নৃত্য ও সঙ্গে সঙ্গে গীত আরম্ভ করলে, আমি আবার মদ্য ঢেলে দিলেম। এবারে ভাল ব্রাণ্ডীটা শেষ হয়ে গেল।

ক্ষণপরে জড়িত কণ্ঠে মোড়ল চীৎকার করলে, "মদ ঢাল।" আমি সেলাম করে বল্লেম, "হুজুর এবার পারস্যের মদ আস্বাদ করুন—সে মদ নিঃশেষিত হয়েছে।" মোড়ল বল্লে, "কুচ পরোয়া নেই—আরবী পারসী সব।" বুঝলেম—সুরার ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। আমি এবার সেই মিশ্রিত ব্রাণ্ডী ঢেলে দুজনের হাতে দিলেম। মেয়ানী তখন ঘন ঘন কটাক্ষ ও নৃত্যগীতে তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

পান করে সর্দ্দার ও মোড়ল উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লো, তাদের বদনে পাশব ইন্দ্রিয় লালসা জলে উঠ্‌লো। মেয়ানী তখন দ্বিগুণ উৎসাহে, কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করতে করতে নৃত্যগীতে সকলকে মাতিয়ে তুল্লে। মোড়লও সর্দ্দার অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠে আবার চীৎকার করলে, "লেয়াও আরবী—পারসী—সব।" আমি

আবার সুপাত্র পূর্ণকরে তাদের হস্তে দিলেম। নিমেষে পান করে, মোড়ল পাত্রটা ছুড়ে ফেলে দিলে, ও আমার হস্ত হতে বোতলটা কেড়ে নিয়ে আপন মুখে ঢালতে লাগলো। মেয়ানীও ঘন ঘন কটাক্ষ নিক্ষেপ করতে লাগলো।

পরক্ষণেই মোড়ল বোতলটা নিঃশেষ করে পার্শ্বের দিকে সজোরে ছুড়ে দিলে—সেটা এক ব্যক্তির মুখে লাগলো, সে চীৎকার করে পড়ে গেল। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে চকিতে উঠে মোড়ল মেয়ানীকে আলিঙ্গন করতে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ শিথিল কলেবরে পতিত হলো।

সেই সময়ে একটা হট্টগোল বাধলো। উপবিষ্ট লোক সকল উঠে, মোড়লকে সামলাতে গেল। সর্দ্দার উঠে মেয়ানীকে ধরতে গেল; মেয়ানী চকিতে সরে দাঁড়ালো—নাচ গান ভেঙ্গে গেল—টল্‌তে টল্‌তে সর্দ্দার আবার মেয়ানীর দিকে অগ্রসর হলো। মহা হট্টগোল—চীৎকার—কে কার দিকে লক্ষ্য করে? সর্দ্দার যেমন মেয়ানীকে আলিঙ্গন করতে গেল মেয়ানী চকিতে তার তীক্ষ্ণ ছোরা সর্দ্দারের বক্ষে বসিয়ে দিলে,—সে চীৎকার করে টলতে টলতে পড়ে গেল। মুহূর্ত্তমাত্র একবার সেদিকে স্থির দৃষ্টি করে মেয়ানী ও মৌলুদ রমণী আসনের মধ্যে প্রবিষ্ট হলো। আমিও বিদ্যুৎ গতিতে বাহির হয়ে পড়লেম।

আমার পশ্চাতে মহা গোলমাল শুনলেম—মেয়ানী তাঁবুর দক্ষিণ দিক দিয়ে বাহির হয়ে পশ্চিমের বস্ত্রাবাস ভেদ করে ছুটলো—সকলেই তার পশ্চাতে ছুটেছিল আমার দিকে কারো লক্ষ্য ছিল না।

নদীতীরে এক নাতিবৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের অন্তরালে কমলা ও মৌলুদ অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই মৌলুদ বল্লে, "চলুন পলাই—বিলম্ব নয়।" আমি বল্লেম, "তোমরা অগ্রসর হও, আমি মেয়ানীর জন্য অপেক্ষা করবো।" সেই সময়ে মোড়লের আড্ডায় উচ্চ চীৎকার ও গোলমাল অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলে। আমার বুক কেঁপে উঠলো,—বুঝি মেয়ানী ধরা পড়েছে। ছায়ার মত দেখলেম চতুর্দ্দিকে লোকজন ছুটাছুটি করছে। পর মুহূর্ত্তেই পূর্ব্বদিকের পর্ব্বতমূলে এক ঝোপের মধ্য হতে পেচকের ধ্বনি উঠলো। আমি প্রাণভরে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেম, তা হলে চতুরা মেয়ানী নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করতে পেরেছে!

মৌলুদও সঙ্কেতসূচক মৃগের ধ্বনি করলে। ক্ষণপরেই বিদ্যুতের মত ত্বরিতে মেয়ানী এসে উপস্থিত হলো। তখন সেখানে আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব না করে, কমলাকে লয়ে আমরা সেই নদীর ধার দিয়ে উত্তরে আমাদের আবাস মুখে ছুটলেম। কিন্তু শত্রু পক্ষের লক্ষ্যের অন্তরাল হতে পারলেম না, পেচক ও মৃগের

ডাক বুঝতে পেরে, তারা পশুবৎ চীৎকার করতে করতে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে।

প্রায় দুইরশি পথ অতিক্রান্ত হ'লে আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী নদীতীরের একটা ঝোপের মধ্য হতে উচ্চ ব্যঙ্গহাস্যধ্বনি উঠ্‌লো; আমরা মুহূর্ত্তের জন্য চমকিত হয়ে দাঁড়ালেম। তখনিই এক দীর্ঘকায়া কৃষ্ণা রমণী বাহির হয়ে, হঠাৎ কমলার এক হাত চেপে ধরে দীর্ঘ ছোরা উত্তোলন করলে এবং ব্যঙ্গস্বরে বলে উঠ্‌লো, "আমার বাঘের চক্ষু—কুকুরের নাসিকা, আমি পূর্ব্বেই চিনেছিলেম; কিন্তু মোড়ল মূর্খ, আমার কথা বিশ্বাস করেনি।" রমণী ব্যঙ্গ হাস্য করলে। সঙ্গে সঙ্গে নদীগর্ভ হতে সেই হাস্যের প্রত্যুত্তর এলো এবং চক্ষের নিমেষে দু'জন কৃষ্ণকায় পুরুষ লম্ফ দিয়ে এসে আমাদের বেষ্টন করে দাঁড়ালো। সেই সময়ে পশ্চাতের শত্রুপক্ষের চীৎকারও অধিকতর নিকটবর্ত্তী হল। আর কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র—আমাদের সকল যত্ন ও চেষ্টা বুঝি বিফল হয়?

আর যুক্তির সময় ছিল না। আমি চকিতে আমার পিস্তল দ্বারা তার হস্তে সজোরে আঘাত করলেম, ছোরাখানা তার হস্তচ্যুত হয়ে দূরে পড়লো। তন্মুহূর্ত্তে মেয়ানীও সহসা নীচু হয়ে তার পদদ্বয়ে একটা টান দিলে, সে কমলাকে তার বক্ষের উপর টেনে নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। মেয়ানী তার হস্তের উপর তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত করে কমলাকে তার হাত ছাড়িয়ে, টেনে অগ্রসর হল। সেই সময়ে আমিও সেই দস্যুদ্বয়ের মস্তকের উপরিভাগে শূন্যে পিস্তল ছুড়লেম। তারা হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়লো। সেই অবসরে মৌলুদ ও আমি চকিত বিদ্যুতের মত তাদের অতিক্রম করে ছুটলেম। কিন্তু পশ্চাতের দল তখন আমাদের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছিল। আমার চতুর্দ্দিকে সোঁ সোঁ করে তীর, বল্লম ছুটছিল, কেবল অন্ধকারের জন্য তারা আমাদের স্থির লক্ষ্য করতে পারে নাই; নচেৎ আমাদের রক্ষা ছিল না। আমরা ঝোপের পাশ দিয়ে প্রস্তর খণ্ডের উপর দিয়ে অজ্ঞানের মত ছুটলেম।

আমাদের আবাস অধিক দূর ছিল না। আর শতাধিক গজ যেতে পারলেই আমাদের পূর্ব্বপ্রোথিত কঙ্কালগুলি পার হতে পারতেম, কিন্তু সহসা প্রস্তরখণ্ডে আহত হয়ে কমলা পতিত হল।

ঈশ্বর রক্ষা না করলে আর উপায় ছিল না, পশ্চাতের দল প্রায় আমাদের উপরে এসে পড়েছিল। মৌলুদকে দ্রুত গিয়ে সম্মুখে প্রস্তুত হয়ে বসতে বলে, আমি পিস্তল হস্তে ফিরে দাঁড়ালেম। কমলা ও মেয়ানীর প্রতি ফিরে দেখবার অবসর পেলেম না।

পরে পরে দুটি গুলি ছুড়লেম—শত্রুপক্ষ সহসা থম্‌কে দাঁড়াল, আমিও এক পা এক পা করে পিছু হ্‌টতে লাগলেম। সহসা পশ্চাতে হরিণের ডাক উঠলো—বুঝ্‌লেম—মেয়ানী কমলাকে নিয়ে সরেছে। আমিও তখন আবার দুটি পিস্তলের আওয়াজ করে—চকিতে পিছন ফিরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলেম—দেখলেম মেয়ানী কমলাকে আপন পৃষ্ঠদেশে বহন করে পুষ্করিণীর পাড়ে উঠ্‌ছিল।

সহসা পশ্চাতে বন্দুকের আওয়াজ হলো, আমার উপর দিয়ে সোঁ করে একটা গুলি চলে গেল। শত্রুপক্ষ যেন নবোৎসাহে দ্বিগুণ চীৎকার করতে করতে আবার ছুটে আসতে লাগলো। আবার বন্দুকের শব্দ—আবার দুটো গুলি সোঁ সোঁ করে আমার আধ হাত দূর দিয়ে গেল। কিন্তু তখন আমি পুষ্করিণীর পাড়ের উপর এসে পড়েছিলেম।

দেখলেম—মোলুদ সুড়ঙ্গপথে ব্যাটারির নিকটে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। আমি সেই পুষ্করিণীর পাড়ের উপর ফিরে দাঁড়িয়ে উপর্য্যুপরি আরও কয়েকটি পিস্তল ছুড়লেম। তখন শত্রুপক্ষ, আমাদের প্রোথিত কঙ্কালগুলির প্রায় নিকটবর্ত্তী হয়েছিল।

সেই সময়ে মেয়ানী এসে আমার পার্শ্বে দাঁড়াল। শুনলেম—কমলাকে সে গৃহমধ্যে রেখে এসেছে—জয় জগদীশ্বর! মেয়ানীকে অজস্র ধন্যবাদ দিলেম, তদুত্তরে তার নিকট হতে কেবলমাত্র একটি কোপ কটাক্ষ উপহার পেলেম।

সেই সময়ে সহসা শত্রুপক্ষের মধ্যে কয়েকটি মশাল জ্বলে উঠলো। সেই আলোকে দেখলেম প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন লোক কি যুক্তি করছে। মেয়ানী হেসে বল্লে আমাদের জুয়াচুরি ধরা পড়ে গেছে—সকলেই ফিরে এসে জুটেছে দেখছি? সেই অবসরে আমার ছদ্মবেশ দূর করে দিলেম। ভিতরে আমার আপন সাহেবী বেশ ছিল।

প্রায় পাঁচ মিনিট যুক্তি স্থির করে, শত্রুপক্ষ এবার নীরবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলো। সহসা তাদের মধ্যে ভীতিসূচক কলরব উঠলো এবং অনেকে আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখিয়ে পরস্পর কি বলাবলি করতে লাগলো। তখন তারা ঝোপে লুক্কায়িত কঙ্কালগুলির সম্মুখস্থ হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। মেয়ানী বল্লে, "পরিচিত লোকেরা পুরাতন যাদুকরকে চিনতে পেরেছে, তাই থমকে দাঁড়িয়ে নূতন লোকদের কাছে বলছে।"

অনুভবে বুঝলেম নূতন লোকেরা সে কথা বিশ্বাস কচ্ছিল না, অথচ আর অগ্রসর হবে কিনা সে বিষয়ে ইতস্ততঃ কচ্ছিল। সহসা একজন সেইখানে দাঁড়িয়েই

একটা বন্দুক ছুড়লে। ভগবানের অনুগ্রহে গুলিটা আমার স্কন্ধের উপর দিয়ে চলে গেল। মেয়ানী উচ্চহাস্য করে উঠলো, এবং পরক্ষণেই বজ্র গম্ভীরস্বরে বল্লে, "সাবধান, কার বিপক্ষে এসেছিস, চিন্‌তে পারছিস্‌ না? সেই যাদুকর, আর—আর আর আমি মেয়ানী। শীঘ্র প্রাণ লয়ে পালা, নচেৎ ইনি এখনি এই পর্ব্বতের মৃত আত্মাদের ডেকে এনে তোদের সর্ব্বনাশ করবেন।"

মেয়ানীর কথা শুনে, যারা আমাকে চিন্‌তো, তারা দুই চারি পদ পশ্চাৎ হঠলো কিন্তু অধিকাংশই বিদ্রূপ করে উঠলো, এবং পুনরায় বন্দুক ছাড়বার চেষ্টা কল্লে। আমি গম্ভীরস্বরে ধমক্‌ দিয়ে বল্‌লেম, "তবে ফল ভোগ কর।" মৌলুদকে ইঙ্গিত করলেম, সে ব্যাটারীর একটা বোতাম টিপলে।

তম্মুহূর্ত্তেই সেখানে একটা ভয়ানক কাণ্ড বেধে গেল। ভীষণ শব্দে ডাইনামাইট বিদীর্ণ হয়ে, ভূমিকম্পের মত উপত্যকা কম্পিত হলো, চতুর্দ্দিক বজ্রশব্দে প্রতিধ্বনি ছুটলো এবং একটা কঙ্কাল সহসা শূন্যে উত্থিত হয়ে বিকট শব্দে তাদের মধ্যে পতিত হলো।

শত্রুপক্ষে মহাভীতি ব্যঞ্জক কলরব উঠলো। আবার সেই বজ্রনাদ—সেই ভূমিকম্প—সেই প্রতিধ্বনি সেই কঙ্কালের আবির্ভাব! আবার—আবার তদ্রূপ।

শত্রুপক্ষে প্রাণের ভয়ে কোনদিকে যে ছুটে চীৎকার করতে করতে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল, তার উদ্দেশ রইল না। কেবল দুইটা লোক পালাতে পারেনি, বজ্রাহতবৎ ভূপতিত হয়ে ছিল। মেয়ানী চীৎকার করে বল্লে, "শীঘ্র যা মোড়লকে সংবাদ দে, তাকে কল্যই দু হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে, নচেৎ তোদের দলের চিহ্নমাত্র থাকবে না।"

লোক দুইটা আভূমি নত হয়ে সেলাম করে, উৰ্দ্ধশ্বাসে তাদের তাঁবুর দিকে ছুটলো। আমরা তিনজনে সুড়ঙ্গ পথে গহ্বর গৃহে প্রবেশ করে, ব্যাটারীটা রেখে বরাবর পশ্চিমের সুড়ঙ্গপথে সেই তটিনীকূলে উপস্থিত হলেম। তখন কমলাকে অজ্ঞান অবস্থায় শয্যায় শায়িত বোধ হলো। স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সকলে যখন পুনঃরায় গৃহমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কল্লেম তখন প্রভাত হয়েছিল!

কমলা জাগরিত হয়ে গহ্বরের চতুর্দ্দিক ভীতবিস্মিত নেত্রে দেখছিল। মেয়ানী দৌড়ে গিয়ে তার গলাধরে অজস্র চুম্বন করতে লাগলো; কমলা মেয়ানীর বক্ষে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো। আমি ধীরে ধীরে তার পশ্চাতে গিয়ে দণ্ডায়মান হলেম।

শেষে কমলা মুখ তুলে চাইলে, আমার দিকে দৃষ্টি পড়াতে একবার থর থর করে কেঁপে উঠলো, তার পর উত্তম রূপে চক্ষু মর্দ্দন করে আবার কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলো, তারপরে অস্ফুট চীৎকার করে মুর্চ্ছিতা হলো।

মেয়ানীকে কিঞ্চিৎ উষ্ণ আহার্য্যের জন্য পাঠিয়ে আমি তার চৈতন্য সম্পাদন করলেম। সে পুনরায় বিস্ময় দৃষ্টিতে আমার পানে চাইতে লাগলো—সে যেন কিছুতেই তার চক্ষুদ্বয়কে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমি ঈষদ্ধাস্যে তার মস্তকে হস্তবর্ষণ করতে করতে, সকল ঘটনা মোটের উপর তাকে এক প্রকার বুঝিয়ে দিলেম।

একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে কমলা বল্লে, "সত্য কি—সত্য? স্বপ্ন নয়তো?" তখনও তার সেই বিস্মিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত ছিল। আমি বল্লেম, "না প্রিয়তমে এই তার প্রমাণ;—কমলার গণ্ডে জীবনে সেই প্রথম চুম্বন অঙ্কিত করে দিলেম।

ঠিক তন্মুহূর্ত্তে সেই গহ্বর মধ্যে যেন কার একটি বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ উঠলো। চেয়ে দেখলেম—সুড়ঙ্গ পথে কার ছায়া অদৃশ্য হল।

পনের মিনিট পরে মেয়ানী আহার্য্য এনে উপস্থিত কল্লে। তার বদনে অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলেম। সে যেন সে ভাব লুকাবার জন্য প্রাণপণে হাসবার চেষ্টা করছিল।

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী

নরাশ্রম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অতি লোভ।

নরোত্তমদাস যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার দেখিলেন, তাঁহার ভাই এ সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনই চেষ্টা করেন না,—ইহা পাইবার জন্য কোনরূপ ব্যাকুলতাও তাঁহার নাই;—সুতরাং তিনি এই সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত না করিবেন কেন?

নরোত্তমদাস নিরুদ্দেশ,—সে যে মরিয়াছে তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ;—সুতরাং তাঁহার সম্পত্তি এক্ষণে সে ও তাঁহার ভ্রাতা জগন্নাথের হইয়াছে। জগন্নাথকে অর্দ্ধেক দিয়া লাভ কি ? সে জীবিত থাকিলে তাহাকে অর্দ্ধেক দিতে হইবে কিন্তু তাহার জীবিত থাকিবারই বা প্রয়োজন কি ?

ডাক্তার অতি সহজেই তাহাকে সরাইতে পারিবে। তাহার পানিয়ের সহিত এক ফোঁটামাত্র মিশ্রিত করিয়া দিলেই অতি সহজেই কার্য্য উদ্ধার হইবে, তাহার পর, তাহার দেহ দামোদরের দেহের ন্যায় অন্তর্হিত করাও কঠিন হইবে না,—চারিদিকে প্রচার করিলেই হইবে যে, জগন্নাথ দেশে চলিয়া গিয়াছে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডাক্তার জগন্নাথকে নিমন্ত্রণ করিল,—জগন্নাথের তাহার উপর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না ; সুতরাং আনন্দিত মনে ডাক্তারের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন।

ডাক্তার তাঁহাকে সমাদরে বসাইল। জগন্নাথ বসিয়াই বলিলেন, "নিশ্চয়ই ডাক্তার তুমি শুনিয়াছ—"

ডাক্তার বলিল, "কি শুনিব কিসের কথা বলিতেছ ?"

জগন্নাথ বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কি শুনিব ! তাহা হইলে বোধ হয় শোন নাই—"

"কেন কি বিষয় ?"

"আমার ভাইয়ের বিষয়—"

ডাক্তারের মুখ মলিন হইল, স্বর কম্পিত হইল ; সে বলিল, "কেন কি হইয়াছে ?"

"তাহাকে পাওয়া গিয়াছে।"

ডাক্তার চা আনিতেছিল,—সহসা তাহার হাত হইতে চা পাত্র পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার গত জীবনের সমস্ত ভয়াবহ ব্যাপার তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়া নরকাগ্নি জ্বালিয়া দিল।

তবে নরোত্তমদাস বাঁচিয়া আছে ? নরোত্তমদাস ফিরিয়া আসিয়াছে ? তাহা হইলে তাহার রক্ষা পাইবার আর কোন উপায় নাই,—সে এতক্ষণ নিশ্চয়ই সকল কথা পুলিশকে বলিয়াছে। ডাক্তার চারিদিকে বিভীষিকা দেখিল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন মন্ত্রপ্রভাবে এক মুহূর্ত্তে আড়ষ্ট হইয়া গেল, কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

তাহার ভাব দেখিয়া জগন্নাথ বলিলেন, "আমি জানিতাম, তুমি এ কথা শুনিলে বিস্মিত হইবে তবে যে এতটা হইবে, তাহা জানিতাম না। কখন না কখন যে তাহাকে পাওয়া যাইবে তাহা তুমিও জানিতে—"

ডাক্তার কথা কহিতে গেল,—পারিল না,—অবশেষে চেষ্টাসত্ত্বেও তাহার ওষ্ঠ হইতে কোন শব্দ নির্গত হইল না। জগন্নাথ বলিল, "কলিকাতার একটা পুষ্করিণীতে তাহার মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে।"

"পুষ্করিণীতে ?"

"হাঁ—নিশ্চয়ই তিনি ডুবিয়া মরিয়াছিলেন।" ডাক্তারের মৃতকল্প দেহে যেন প্রাণসঞ্চার হইল। তবে নরোত্তমদাস বাঁচিয়া নাই ? তবে—তবে তাহার আর কোন ভয় নাই ? এতদিন নরোত্তমদাস নিশ্চিতই মরিয়াছে !

এই কথা মনে হইবামাত্র ডাক্তার মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইল,—সে ভয়ে যেরূপ অভিভূত হইয়াছিল,—তাহা তন্মুহূর্ত্তে দূর হইল। পাপাত্মা আবার স্বীয় পৈশাচিকী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

জগন্নাথ বলিলেন,"পুলিশ হইতে আমাকে সংবাদ দিয়াছে,—তাহারা কলিকাতা পুলিশের নিকট রিপোর্ট পাইয়াছে,—সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই।"

তবে নরোত্তমদাস সত্যই মরিয়াছে ! তাহা হইলে এই জগন্নাথকে সরাইবার জন্য আর কোন তাড়াতাড়ি নাই—এখন ইহাকে সরাইলে, উইল লইয়া গোল হইতে পারে,—সুবিধামত ইহাকে সরাইলেই হইবে ।

ডাক্তার তখন নরোত্তমদাস,—তাহার উইল,—তাহার সম্পত্তির বিষয় বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিল,—অনেক রাত্রে জগন্নাথ তাহার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া নিজের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

ভ্রাতার মৃত্যুসম্বাদ আজ ডাক্তারকে না দিলে, তাহাকে আজ ভ্রাতার পথানুসরণ করিতে হইত। ডাক্তার সে বিষয়ের সমস্ত আয়োজন পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ চেষ্টা।

প্রাতে লালদাসের দেহ ডাক্তারের জানালার নিকট পাওয়া গেল,—দড়ী, সূতা, করাত প্রভৃতি দেখিয়া সকলেই বুঝিল লোকটা চুরি করিবার উদ্দেশ্যে ডাক্তারের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল,—সহসা কোনরূপে পড়িয়া গিয়া হত হইয়াছে।

এ কথা কাওেয়াও শুনিলেন। তিনি যে পল্লীতে দামোদর কাজ করিত, তথায় অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন যে, তাহার বন্ধুর নাম লালদাস। এখন

শুনিলেন, পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে যে, সেই লালদাসেরই পড়িয়া গিয়া মৃত্যু হইয়াছে—সেই পল্লীর অনেক লোক তাহার দেহ সনাক্ত করিয়াছে।

এই সকল শুনিয়া ক্যাণ্ডেরাও ভাবিলেন, "খুব সম্ভব নরোত্তমদাসের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া এই লালদাস ও দামোদর তাহাকে খুন করিয়াছিল,—নতুবা দামোদরের বাড়ীতে নরোত্তমদাসের জামা জুতা পাওয়া যাইবে কেন?"

"তাহার পর দামোদর নিরুদ্দেশ হইয়াছে—তাহার বন্ধুর মৃতদেহ ডাক্তারের বাড়ীর পার্শ্বে পাওয়া গিয়াছে—ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কোন না কোনরূপে ডাক্তারও এ ব্যাপারে জড়িত আছে, নতুবা লালদাস এই সেদিন একটা খুন করিয়া এত শীঘ্র আবার ডাক্তারের বাড়ীতে চুরি করিতে যাইত না।"

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া ক্যাণ্ডেরাও দামোদরের স্ত্রীর সহিত দেখা করা স্থির করিলেন। ভাবিলেন, হয়তো তাহার নিকট কিছু না কিছু জানিতে পারা যাইতে পারে।

তিনি দামোদরের বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, তাহার স্ত্রীকে আর চেনা যায় না, সে নিতান্ত অধীরা হইয়া উঠিয়াছে। ক্যাণ্ডেরাও কোমলস্বরে বলিলেন, "গতবার আমি যখন তোমার এখানে আসিয়া ছিলাম তখন তুমি কিছুতেই আমাকে কোন কথা বলিলে না। আমি কোন বিশেষ কারণে তোমার স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহি, -ইহাতে তাহার ভাল ভিন্ন মন্দ হইবে না।"

দামোদরের স্ত্রী কেবলমাত্র বলিল, "তুমি পুলিশের লোক—"

ক্যাণ্ডেরাও সে কথা শুনিয়াও যেন না শুনিয়া বলিলেন, "যে লোকটা পড়িয়া মারা গিয়াছে—তাহার নাম লালদাস—সে তোমার স্বামীর বন্ধু ছিল—তুমি জান সে কিরূপে মরিয়াছে?"

দামোদরের স্ত্রী বান্নুর সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ক্যাণ্ডেরাও বুঝিলেন, বান্নু সকল জানে—লালদাস কি জন্য ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়াছিল,—তাহা জানে—কিরূপে পড়িয়া মরিয়াছে তাহাও জানে। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "লালদাস কেবল চুরির মতলবে কখনই ডাক্তারের বাড়ীতে যায় নাই। যাহাতে পড়িয়া মৃত্যু হইতে পারে, তাহা কেবল চুরির জন্য করিতে পারা যায় না।"

"কেমন করিয়া জানিলে?" অনিচ্ছাসত্ত্বে বান্নুর মুখ হইতে এ কথা বাহির হইয়া পড়িল,—সে বুঝিল যে অন্যায় করিয়াছে—তখন আর উপায় নাই।

ক্যাণ্ডেরাও এ সুবিধা ছাড়িলেন না, বলিলেন, "কেমন করিয়া জানিলাম? অনুমানে। তুমিও জান সে কি করিতে ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়াছিল—আমায় বল।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বানু বলিল, "তোমায় বিশ্বাস কি?"

ক্যাণ্ডেরাও গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ডাক্তার সম্বন্ধে যদি কোন কথা হয়, তুমি নির্ব্বিঘ্নে নির্ভয়ে আমাকে বলিতে পার।" তাহার পর তিনি মনে মনে বলিলেন, "তাহার ন্যায় পরম শত্রু আমার এ ত্রিসংসারে আর কে আছে? যতদিন তাহাকে দণ্ড দিতে না পারিব, ততদিন আমার আহার নিদ্রা নাই।"

তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বানু বুঝিল ক্যাণ্ডেরাও ডাক্তারকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করেন, তাহাই তাহার ভরসা হইল,—কাহাকে না কাহাকে তাহার মনের কথা তাহার বলিতেই হইত, লালদাস পর্য্যন্ত এক্ষণে নাই—তাহাই সে ক্যাণ্ডেরাওকেই সকল কথা বলিতে ইচ্ছুক হইল।

বানু কথা কহে না দেখিয়া ক্যাণ্ডেরাও বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই শুনিয়াছ যে, লালদাসের মৃতদেহ ডাক্তারের বাড়ীর বাহিরে পাওয়া গিয়াছে!"

বানু মুখ অপরদিকে ফিরাইয়া বলিল, "শোনা কেন—দেখিয়াছি।"

"দেখিয়াছ!"

"হাঁ—যখন সে পড়ে তখন আমি সেখানে ছিলাম। সে আমারই পায়ের উপর পড়িয়াছিল।"

ক্যাণ্ডেরাও এই কথায় এত বিস্মিত হইলেন যে, কথা কহিতে পারিলেন না।

বানু বলিল, "আমরা ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, কারণ আমাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে আমার স্বামীকে ডাক্তার তাহার বাড়ীর ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।"

"সেইজন্য বুঝি লালদাস উপরের ঘরে যাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল?"

"হাঁ—লালদাস কয়েকরাত্রি ঐ ঘরের উপর নজর রাখিয়াছিল। ঐ ঘরে সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলে, তাই সে ভাবিয়াছিল ডাক্তার তাহাকে ঐ ঘরেই আটকাইয়া রাখিয়াছে।"

"তোমার স্বামীকে ডাক্তার আটকাইয়া রাখিবে কেন?"

"তাহা আমি জানি না,—লালদাস সে কথা আমাকে বলে নাই—সে বলিয়াছিল যে, আমার স্বামী ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়াছিল, সে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু আমার স্বামী আর ডাক্তারের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসে নাই।"

"তোমার স্বামী ডাক্তারের বাড়ীতে কেন গিয়াছিল, তাহা তুমি জান না?"

"না কিছুই জানি না—লালদাস আমাকে সে কথা কিছুই বলে নাই।"

"আচ্ছা এখন আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি ঠিক কথা বল,—একটী লোক নিরুদ্দেশ হইয়াছে তাহার জামা জুতা, সেদিন এই বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। সেই

লোকটা যে দিন অন্তর্দ্ধান হয়, সে রাত্রে তোমার স্বামী অনেক রাত্রিতে বাড়ীতে ফিরিয়াছিল মিথ্যা কথা বলিও না।"

"হাঁ—প্রায় ভোর রাত্রে।"

"ভাল এই লালদাসও তাহার সঙ্গে গিয়াছিল ?"

"হাঁ—দুজনে এক সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছিল।"

"কোথায় গিয়াছিল, জান ?"

"না—আমাকে কিছুই বলে নাই।"

"যখন ফিরিয়া আসে, তখন কোন মালপত্র সঙ্গে আনিয়াছিল ?"

"না—বোধ হয় ঐ জামা জুতা, তাহাও আমি দেখি নাই—আমার অসাক্ষাতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।"

"গতবার তুমি তোমার স্বামী সম্বন্ধে কোন কথাই আমায় বল নাই,—কাজেই আশেপাশের লোকজনের নিকট হইতে তাহার কথা জানিতে হইয়াছে—তাহার হাতের আঙ্গুল নাই—কেবল চারিটা আঙ্গুল আছে—কেমন না ?"

"হাঁ গাড়ীর চাকা চলিয়া যাওয়ায়, ঐরূপ হইয়াছিল।"

"তাহার হাতেও ঐ জন্য একটা বড় দাগ আছে ?"

"হাঁ—আছে—ঐ গাড়ী চাপার জন্য।"

"ভাল—এখন কথা হইতেছে—তোমাদের সন্দেহ—কেবল সন্দেহ ছাড়া, আর কিছু প্রমাণ আছে যে, তোমার স্বামী ডাক্তারের বাড়ীতে আটক হইয়া রহিয়াছে—"

"না—আর প্রমাণ কি পাইব ?"

"যাহা হউক, সে ডাক্তারের বাড়ী আছে কিনা,—ইহা দেখিতে হইবে।"

"নিশ্চয় আছে—নিশ্চয়ই আছে—"

"নিশ্চয়ই নয়, সন্দেহ মাত্র। তবে এই লালদাস আর তোমার স্বামী ডাক্তারের গুপ্তকথা কিছু জানিত,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

"কি কথা জানিবে ?"

"সেই কথা জানিবার জন্যই আমি তোমার স্বামীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি—তাহারা ডাক্তারের গুপ্ত কথা জানিত,—সে গুপ্তকথা বলিয়া দিবে ভয় দেখাইয়া ডাক্তারের কাছে টাকা আদায় করিতে গিয়াছিল—দামোদর ভিতরে যায়,—লালদাস বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকে—তাহারা ডাক্তারকে চিনিত না,—ডাক্তার দামোদরকে চিনিত না, ডাক্তার দামোদরকে আটক করিয়াছে—"

"তাহা হইলে সে সেইখানেই আছে?"

"খুব—সম্ভব—যে উপায়ে হউক আমরা তাহার বাড়ীটা একবার ভাল করিয়া দেখিব—

"দেখিতে দেবে—"

"কৌশলে দেখিতে হইবে,—সে বন্দোবস্ত আমি করিব। আজই সুবিধা—কোন কাজে ডাক্তার আজ অন্যত্র গিয়াছে—কাল ফিরিবে। আজই সন্ধ্যার সময় তাহার বাড়ীতে যাইব,—তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।

"আমাকে?"

"হাঁ—কোন ভয় নাই—আমার সঙ্গে যাইবে। সন্ধ্যার আগে আসিয়া তোমাকে ডাকিয়া লইয়া যাইব।"

"তাহা হইলে আমার স্বামী তাহার বাড়ীতে আছে?"

"সন্ধ্যার সময় সকলই জানিতে পারা যাইবে।"

এই বলিয়া স্কাণ্ডেরাও প্রস্থান করিলেন, বাণু নানা আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া গৃহমধ্যে বসিয়া স্বামীর জন্য কাঁদিতে লাগিল। ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

রঙ্গ-বারিধি।

পঞ্চম তরঙ্গ।

বোড়ের কিস্তি।

১

বাবুর নাম প্রণয়ভূষণ, বাড়ী যশোহর জেলার অন্তর্বর্তী ভবানীপুর গ্রামে,—পদবীতে বসু,—বয়স আন্দাজ চব্বিশ। অঙ্কশাস্ত্রে মমতা না থাকায় তাঁহাকে পাশের আশায় জলাঞ্জলী দিয়া অন্য কার্য্য না জুটায় অগত্যা গ্রন্থকার হইতে হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন,—প্রণয়ভূষণ দ্বিতীয় কালীদাস,—আবার কাহারও কাহারও মতে, প্রণয়ভূষণ বাঙ্গালা ভাষার সপিণ্ডকরণ করিতেছেন। সে যাহা হউক আমাদের সে কথায় প্রয়োজন কি? তবে আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, প্রণয়ভূষণ বাবুর সখের গ্রন্থকার ব্যবসায় লোকসান ভিন্ন লাভ হয় নাই;—সুতরাং বলিতেই হইতেছে প্রণয়ভূষণের পুস্তক বড় অধিক লোকের কর স্পর্শ করে নাই,—করিলেও

কেহ পয়সা দিয়া পুস্তক ক্রয় করে নাই। গ্রন্থকার বৃত্তিতে কিছু হয় না দেখিয়া প্রণয়ভূষণ ক্রমে ভারত উদ্ধারের আশা ত্যাগ করিলেন;—বৃদ্ধ পিতার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কিছু কম বলিয়াই ধারণা ছিল, এক্ষণে অন্যান্যোপায় না দেখিয়া তিনি বাটী আসিলেন;—অনেক কষ্টে মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে পিতাকে খুলিয়া সব কথা বলিলেন। সকল কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা রামব্রহ্ম বসু মহাশয় বলিলেন, "বাপু তোমার যে এত শীঘ্র জ্ঞানলাভ হইল ইহাই আমার কাশীলাভ,—তুমি যে একটা বিধবা মাগী বিবাহ কর নাই, ইহাই আমার প্রয়াগ,—আর তুমি যে চোখ বুজিতে শিখিয়াও তাহা আবার খুলিতে শিখিয়াছ,—ইহাই আমার হরিদ্বার।"

পিতা বহুক্ষণ ধরিয়া আর কোন কথা কন না দেখিয়া প্রণয়ভূষণ বলিলেন, "আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়?"

বৃদ্ধ দুই তিন বার কাশিলেন, তৎপরে বলিলেন, "তোমার পিতা ঠাকুর,—তোমার পিতামহঠাকুর,—তোমার প্রপিতামহ ঠাকুর,—তোমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতা-মহঠাকুর যাহা করিয়াছেন,—তুমিও তাহাই কর।"

সে কি—প্রণয়ভূষণ ভাল বুঝিলেন না,—ভাবিলেন পিতা ব্যাখ্যা করিবেন; কিন্তু বৃদ্ধ আর কোন কথা না কহিয়া পুঁতি পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রায় অদ্ধ ঘটিকা নীরবে যায় দেখিয়া প্রণয়ভূষণ আবার বলিলেন, "তবে আমাকে এক্ষণে কি করিতে বলেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "দেখ দেশটা এখনও উচ্ছন্ন যায় নাই,—আমাদের চোদ্দ পুরুষ যাহা করিয়া ধন মান সুখ শান্তি যথেষ্ট পাইয়া আসিয়াছেন তুমিও তাহাই কর। বৌমাকে গৃহে আন;—গৃহে থাকিয়া জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখ; নিজের সম্পত্তি আমি থাকিতে থাকিতে বুঝিয়া শুজিয়া লও।"

প্রণয়ভূষণ আবার কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "শ্বশুর মহাশয় কি তাহাকে পাঠাইবেন? আপনি তো বহুবার আনিতে চাহিয়াছেন কিন্তু কই তাঁহারা তো তাহাকে পাঠান নাই। শ্বশুর মহাশয়ের বিশ্বাস যশোহরের লোক বন মানুষ,—তাঁহার কন্যাকে এখানে পাঠাইলে সেও বন্য হইয়া যাইবে।"

বৃদ্ধ পুঁতি হইতে মস্তক তুলিয়া বলিলেন, "সেই জন্যইতো তোমায় বলিতেছি। শুনতে পাই তুমি অনেক কেতাব টেতাব লেখ;—আর বুদ্ধি ক'রে নিজের স্ত্রীকে আন্‌তে পারবে না। বিবাদ বিসম্বাদ ব্যতীত যাহাতে গৃহলক্ষ্মী মাকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করিতে পার, সেটুকু বুদ্ধি যদি তোমার না থাকে তবে তুমি আমার সন্তানেরও যোগ্য নও;—কালই তুমি রওনা হও।"

বৃদ্ধ আবার পুঁথি পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—প্রণয়ভূষণ দ্বিরুক্তি না করিয়া মাতার নিকট গেলেন। আর উপায় নাই দেশহিতৈষী, পত্রব্রতী, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ইত্যাদি ইত্যাদি সকলি হইয়াছেন অথচ কোনটাতেই পয়সা নাই;—গ্রন্থকার পর্য্যন্ত হইলেন তাহাতেও পয়সা নাই, কিন্তু পয়সা না হইলে আর চলে না,—এই সকল নানা বিষয় চিন্তা করিয়া প্রণয়ভূষণ শেষ শ্বশুরালয়ে যাওয়াই স্থির করিলেন।

২

ক্ষেত্রনাথবাবু কলিকাতার বনিয়াদী বড়লোক। বংশ পরম্পরায় তাঁহারা কলিকাতার বড় বড় হাউসের মুচ্ছুদ্দীর কাজ করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। প্রাতে চা পানের পর ক্ষেত্রনাথবাবু খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "জামাই বাবু আসিয়াছেন।" ক্ষেত্রনাথবাবুর বিনা অনুমতিতে কেহ তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে পারিত না;—তাই প্রণয়ভূষণ বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ দিলেন। ক্ষেত্রনাথবাবু বিস্মিত ভাবে ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কে? জামাই বাবু,—ওঁ, পাঠাইয়া দাও।" ভৃত্যের সহিত প্রণয়ভূষণ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন,—ক্ষেত্রনাথবাবু সম্মুখস্থ চেয়ারে তাঁহাকে বসিতে বলিয়া বলিলেন, "তারপর খবর কি: কি মনে করে?"

প্রণয়ভূষণ চেয়ারে উপবেশন করিতে করিতে অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাবা একরূপ জোর করেই আমাকে পাঠাইয়া দিলেন—ওকে নিয়ে যাবার জন্য।"

ক্ষেত্রনাথবাবু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "এ কথা তো তোমার বাবাকে আমি তুশোবার বলেছি যে, আমি মেয়ে পাঠাব না। তোমার সহিত যখন রেণুর বিয়ে হয়, তখন তোমার বাবার সহিত আমার স্পষ্টই কথা ছিল যে, তোমাদের ও জনগায় আমি আমার মেয়ে পাঠাইব না,—তুমি আমার বাড়ী থাকিয়া লেখাপড়া শিখিবে,—কখন কদাচিৎ ছ'মাস ছ'মাসে এক-আদ দিন যাইয়া মা বাপের সহিত দেখা করিয়া আসিবে; কিন্তু তুমি এমনই বেয়াড়া যে কলিকাতায় মেসে থাকিলে, তথাপি আমার বাটীতে থাকিলে না। 'শ্বশুরে গোঁ' যাবে কোথায়?"

এ কথায় প্রণয়ভূষণের মনের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা আমরা বলিতে পারি না—কিন্তু তিনি অবিচলিত ভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে আমারতো বরাবরই সেই ইচ্ছা;—কিন্তু বাবার নিষেধ, যতদিন পর্য্যন্ত না আপনি আপনার কন্যা পাঠান, ততদিন পর্য্যন্ত যেন আমি না এ বাড়ীতে প্রবেশ করি।"

ক্ষেত্রনাথবাবু গুড়গুড়ীর নলে দুই তিনটা জোরে টান দিয়া বলিলেন,—“দেখ ওসব বাবা ফাবা ছাড়। বয়স হয়েছে,—বুদ্ধি হয়েছে,—নিজের পরকালটা একেবারে ঝরঝরে করে ফেল না। এখানে খাও দাও সুখে থাক,—একটা ভাল চাকরী বাকরী কর। আর যদি আমার কথা না শোন, যা খুসি কর্ত্তে পার। আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমার স্পষ্ট কথা আমি মেয়ে কিছুতেই পাঠাইব না। যশুরে লোক শুনেছি মামলায় খুব পরিপক্ক,—ক্ষমতা থাকে তোমার বাবাকে ব'লে মামলা ক'রো কোর্ট থেকে যেন বৌকে নিয়ে যান।”

প্রণয়ভূষণ দুই তিনবার আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, “আজ্ঞে আজ্ঞে আমিও সেই কথা ভেবে এসেছি,—আমি ওকে সেখানে নিয়ে যেতে একেবারেই রাজি নই,—যে ম্যালেরিয়া।”

“ভালো ভালো, তোমার যে এতদিনে একটু মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে এতেই আমি সন্তুষ্ট,”—এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথবাবু তাহার কনিষ্ঠ পুত্র অতুলকে ডাকিয়া প্রণয়-ভূষণকে বাটীর ভিতর লইয়া যাইতে বলিলেন।

৩

মধ্যাহ্নে প্রণয়ভূষণ আহারাদির পর শ্বশুরালয়ে এক অতি পরিপাটী সুসজ্জিত গৃহের সুকোমল শয্যায় অৰ্দ্ধশায়িত অবস্থায় শায়িত হইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে ছিলেন। শ্বশুর মহাশয় যে কিছুতেই তাঁহার কন্যাকে পাঠাইবেন না, তাহা তিনি অতি পরিষ্কার ভাবেই স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, অথচ পিতার আদেশ তাহাকে লইয়া যাইতেই হইবে; কিন্তু কি উপায়ে লইয়া যাওয়া যায়? প্রণয়ভূষণ কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতে ছিলেন না,—ঠিক সেই সময় দরজা বন্ধের শব্দে প্রণয়ভূষণ দ্বারের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, দ্বার বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গেল,—গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল তাঁহার চতুৰ্দ্দশ বর্ষিয়া পত্নি রেণুকা। সুবক্তা বলিয়া প্রণয়ভূষণের খ্যাতি ছিল; কিন্তু সেই লাজবিজড়িত চতুৰ্দ্দশ বর্ষিয়া বালিকার সম্মুখে যেন কে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল। তাঁহার প্রাণের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিতে লাগিল। তিন বৎসর তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীর সহিত এইবার লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চমবার সাক্ষাৎ। তিনি ভাবিতে ছিলেন কত স্থানে কত লোকের সম্মুখে বক্তৃতা করিলাম আজ এই দুগ্ধপোষ্য বালিকার নিকট এমন হইল কেন? কিন্তু সে অবস্থায় প্রণয়ভূষণকে অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না, রেণুকা ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া, অতি মৃদু মধুর স্বরে বলিল, “তুমি আমায় কবে নিয়ে যাবে,—সেই ব'লে গিয়ে ছিলে শীঘ্র নিয়ে যাবে, কই তারপর তো এক বৎসর হয়ে গেল?”

প্রণয়ভূষণ তাঁহার স্ত্রীর মুখে এরূপ কথা শুনিবার আশা একবারেই করেন নাই; তাই বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি এমন! আমি ভাবিয়াছিলাম তুমিও বুঝি তোমার বাবার মত।"

রেণুকা নীরব,—প্রণয়ভূষণ দেখিলেন বালিকার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। কথাটা যে তাহার প্রাণে এমন আঘাৎ করিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। চির জীবন নিজের খেয়াল লইয়াই কাটাইয়াছেন;—বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অসীম প্রেম, কেতাবে অনেক লিখিয়াছেন, কিন্তু বাস্তব জগতে তাহার আস্বাদন কখনও তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই,—তাই বালিকার অশ্রুপূর্ণ নয়নের কাতর দৃষ্টি তাঁহার বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হইল। তিনি আদরে তাহাকে হৃদয়ে টানিয়া বলিলেন, "আমার কি সাধ যে, তোমায় এখানে ফেলিয়া রাখি! তোমার বাবা যে তোমাকে আমাদের বনগায় পাঠাইতে চাহেন না। এ অবস্থায় বল দেখি কেমন করে তোমায় নিয়ে যাই?"

রেণুকা সলজ্জনয়নে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "তা আমি কি জানি;—তুমি তার উপায় কর।"

প্রণয়ভূষণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"হুঁ সেই কথাই ভাব্‌ছি।"

তাহার পর তাহাদের কত কথাই হইল;—কখন কি ভাবে সময় চলিয়া গিয়াছে কেহই জানিতে পারেন নাই। ঝি বাহির হইতে, "দিদিমণি দরজা খোল,—জামাই বাবুর খাবার এনেছি," সংবাদে তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। লজ্জায় সঙ্কোচিতা রেণুকা তাড়াতাড়ি গৃহের বাহির হইয়া গেল।

৪

সন্ধ্যার পর প্রণয়ভূষণ তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্যালক অতুলকে ডাকিয়া বলিলেন, "চল অতুল, থিয়েটার দেখিয়া আসি।"

অতুল থিয়েটারের নামে পাগল, সে বলিল, "চলুন-চলুন। তাহ'লে আর দেরী ক'রে কাজ নেই।"

প্রণয়ভূষণ বলিলেন, "যাও তুমি শীঘ্র তোমার মাকে বলিয়া এস, আমরা থিয়েটার দেখিতে যাইতেছি।"

অতুল আর কোন কথা না বলিয়া আনন্দে তাড়াতাড়ি সে সংবাদ বাড়ীর ভিতর দিতে গেল, কিন্তু সংবাদ বাড়ীর ভিতর পৌঁছিবামাত্র প্রণয়ভূষণের শ্যালিকা

ও অন্যান্য বাটীর আর সকলে তাহাকে থিয়েটার দেখাইবার জন্য ধরিয়া পড়িল। অনন্তোপায় হইয়া প্রণয়ভূষণকে সম্মত হইতে বাধ্য হইতে হইল। ক্ষেত্রনাথ বাবুর নিকট এ সংবাদ পৌছিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ গিন্নিকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ তোমরা প্রণয়ভূষণের সঙ্গে থিয়েটারে যাও আর যেখানে যাও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু খবরদার রেণু যেন না যায়।"

গিন্নি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ওমা সে কি কথা, সবাই যাচ্ছে, আর রেণু যাবে না—তাও কি কখনও হয়।"

ক্ষেত্রনাথ বাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "না না তার যাওয়া হবে না। যণ্ডরে লোক্‌কে আমি বিশ্বাস করি না, ওরা সব কর্ত্তে পারে।"

গিন্নি নথ নাড়িয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। আমাদের সঙ্গে যাবে, আমাদের কাছ থেকে তো আর তাকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না।"

"তুমি জান না, যণ্ডরে লোক সব পারে। রেণুর যাওয়া কিছুতেই হবে না। তোমাদের ইচ্ছে হয় যেতে পার, আমি কাল তাকে থিয়েটার দেখিয়ে আনবো," এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথ বাবু গম্ভীরভাবে তাম্রকুট সেবন করিতে লাগিলেন। গিন্নি অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কাজেই রেণুকার যাওয়া হইল না; গিন্নিও প্রথমে যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন কিন্তু অন্যান্য কন্যাদের বিশেষ পীড়াপিড়ীতে শেষে যাইতে বাধ্য হইলেন। দুইখানি গাড়ী বোঝাই হইয়া রেণুকা ব্যতীত বাড়ীর প্রায় সকলেই থিয়েটার দেখিতে রওনা হইল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে চার ঘটিকার সময় থিয়েটার ভাঙ্গিল। যে গাড়ীতে শ্বশ্রু-ঠাকুরাণী, অনূঢ়া দুই শ্যালিকা ও মধ্যম শালাজ উঠিয়াছিল, প্রণয়ভূষণ সেই গাড়ীর ছাদে উঠিলেন, বক্রী অন্যান্য যে গাড়ীতে উঠিয়াছিল অতুল তাহার ছাদে উঠিল। যথাসময়ে দুই গাড়ী ভবানীপুর ক্ষেত্রনাথ বাবুর বাড়ী রওনা হইল। অতুল যে গাড়ীর ছাদে ছিল সেই গাড়ী অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল; কিন্তু জোড়াগির্জ্জার নিকট আসিয়া অতুল পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল পশ্চাতে গাড়ী নাই। সে বরাবর সেয়ালদহ পর্য্যন্ত তাহাদের গাড়ীর পশ্চাতে সে গাড়ী দেখিয়াছে, সহসা সে গাড়ী কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল? বহুক্ষণ সে তথায় সে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিল, কিন্তু তথাপি সে গাড়ীর সাক্ষাৎ নাই। অন্য রাস্তা দিয়া সে গাড়ী নিশ্চয়ই গিয়াছে, শেষে এই ভাবিয়া সত্বর বাড়ী যাইবার জন্য গাড়ওয়ানকে গাড়ী হাকাইতে বলিল। বাড়ী আসিয়া গাড়ী পৌছিবামাত্র সে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সে গাড়ী তখনও আসে নাই।

এই আসে এই আসে করিয়া বেলা সাতটা বাজিয়া গেল, তথাপি সে গাড়ীর সন্ধান নাই। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল ততই সকলে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িতে ছিলেন। এরূপভাবে বসিয়া থাকা আর কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া ক্ষেত্রনাথ বাবু পুলিসে সংবাদ দিবার জন্ম বাহির হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় প্রণয়ভূষণের হস্ত লিখিত এক পোষ্টকার্ড ডাকযোগে পাইলেন। তাহাতে মাত্র এই কয়েক লাইন লেখা ছিল :—

মান্যবর শ্বশুর মহাশয়েষু !—

শ্বশ্রূ মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া চলিলাম। যতদিন না আপনি আপনার কন্যাকে আমাদের বাটী পাঠান, ততদিন তাঁহাকে আমাদের ওখানেই অবস্থান করিতে হইবে। আপনার কন্যার পরিবর্ত্তে যখন ইচ্ছা তাঁহাকে লইয়া আসিতে পারেন। তাঁহার সহিত অন্যান্য যাঁহারা যাইতেছেন তাঁহারা দুই একদিনের মধ্যেই আপনার বাড়ীতে পৌঁছিবেন। ইতিঃ—প্রণয় !

পত্র পড়িয়া ক্ষেত্রনাথবাবুর ক্রোধে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল,—শীকার পলাইলে সিংহ যেরূপ ক্রোধে গর্জ্জন করিতে থাকে, তাঁহারও আজ সেই অবস্থা। তিনি তৎক্ষণাৎ অতুলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি অদ্যই যশোহর রওনা হও। যদি অনতি বিলম্বে তোমার সহিত তাহাদের না পাঠাইয়া দেয়, বলিয়া আসিবে তাহা হইলে তাহাদের সহিত আমার আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, কোর্টে শীঘ্রই অন্যভাবে সাক্ষাৎ হইবে।

* * * * *

এই ঘটনার পর সাতদিন কাটিয়া গিয়াছে ;—অতুল তাহার বৌদিদি ও ভগিনীদ্বয়কে লইয়া ফিরিয়াছে; কিন্তু তাহার মাতাঠাকুরাণীকে আনিতে পারে নাই। যশুরে বাবরী চুল ও লম্বা লাঠি দেখিয়া সে বেশ বুঝিয়া আসিয়াছে যে, সেখানে জোর চলিবে না। উপায় বিহীন হইলে মানুষের রাগও অধিকদিন স্থায়ী হয় না, ক্ষেত্রনাথবাবুও আজ উপায়বিহীন। তাহার উপর গিন্নির অভাব তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন, কাজেই বাধ্য হইয়া কন্যাকে পাঠাইয়া দেওয়াই স্থির করিলেন। শীঘ্রই এক শুভদিনে রেণুকা অতুলের সহিত শ্বশুরালয়ে চলিল ;—যাইবার সময় রেণুকা আসিয়া যখন পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "তবে আসি বাবা",—তখন ক্ষেত্রনাথবাবু কথা কহিতে পারিলেন না, মনে মনে বলিলেন—বোড়ের কিস্তি—মাৎ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

গল্পলহরী

২য় বর্ষ | চৈত্র, ১৩২০। | ৯ম সংখ্যা

ভুল ভাঙ্গা।

১

রাজকুমারী করুণা ও মন্ত্রীপুত্র জীবনপ্রসাদ একত্রে খেলা করিত। সন্ধ্যায় যখন নীড়গামী বিহগেরা কলরব করিয়া উড়িয়া যাইত,—রামসীতাজীউর মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা মধুর রবে বাজিয়া উঠিত, তখন এই বালকবালিকা একত্র হইয়া সন্ধ্যা আরতি দেখিত। করুণা বলিত, 'দেখিয়াছ জীবন, কেমন ওই সীতা, কেমন রত্নাভরণ, কেমন অপ্সরার মত! আমি রামায়ণে পড়িয়াছি সীতার ন্যায় পতিব্রতা জগতে আর নাই।' জীবন বলিত, "হাঁ। আর ঐ রামচন্দ্রকে দেখিয়াছ? হীরার মত ধনু কেমন ঝক্ ঝক্ করিতেছে! আমি ঐরূপ বীর হইব। ধনুর্ব্বাণ লইয়া যখন যুদ্ধ করিব,—ওঃ সে কি চমৎকার।'

এমনি করিয়া কয়েক বৎসর কাটিল। তাহারপর তাহাদের এমন বয়স আসিল যখন প্রাতঃসূর্য্য তাহাদের কাছে অভিনিগ্ধ কিরণ বিতরণ করে, চন্দ্রালোকিত নিশীথিনীতে কোন স্বপ্নরাজ্যের কি এক অজ্ঞাত বাঁশরীর শব্দ কাণে আসিয়া পৌঁছে, এবং প্রথম মধুর বসন্তে যখন মলয় বাতাস পুষ্প সৌরভ বহন করিয়া আনে, তখন বোধ হয় যেন হৃদয়ের এক নিভৃত নিকুঞ্জে কাহার চঞ্চল চরণধ্বনির অভাব রহিয়া গেছে।

২

রাজা মন্ত্রীপুত্র জীবনপ্রসাদের শৌর্য্যে বীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রাসাদ রক্ষার ভার দিলেন। জীবনপ্রসাদ পুরী রক্ষা করে, প্রাসাদের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করে, এবং গভীর নিশীথে মুক্ত তরবারি হস্তে একবার চারিদিকে ঘুরিয়া আসে।

করুণার সহিত জীবনের আর তেমন ঘন ঘন দেখাশুনা হয় না। যদিও রাজ অন্তঃপুরে জীবনপ্রসাদের অবাধ গতি, এবং রাজকুমারী মন্ত্রীর অন্তঃপুরে সর্ব্বদা সমাদৃতা, তথাপি জীবনপ্রসাদ অতি ব্যস্ততার সহিত রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, আর আসিবার সময় চকিতে একবার দেখিয়া লয় যে, করুণা তার সখীদিগের সহিত গল্প করিতেছে। আবার জীবন যখন প্রত্যূষে তাহার অস্ত্রের ঘরে বসিয়া অস্ত্রাদি শাণিত করিত, আর মধ্যে মধ্যে উর্দ্ধনেত্রে একখানি সুন্দর মুখের ধ্যান করিত, করুণা তখন পূজান্তে মন্দির সোপানে দাঁড়াইয়া তাহার আদরের হরিণ শাবকগণকে নৈবিদ্যের ফলগুলির মধ্য হইতে দুই একটী তাহাদের প্রদান করিত,—আর ভাবিত এই রামসীতাজীউর মন্দির সোপানে আর একজনের পার্শ্বে বসিয়া কতদিন কতই আনন্দে কাটিয়া গিয়াছে।

জীবন যে দিন করুণার সহিত কথা কহিব বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করে সে দিন করুণা সখীদিগের সহিত গল্পের আসর জমাইয়া তুলে, এবং তাহাকে যেন না দেখিয়াই কৌতুক করিয়া বলে, "আচ্ছা রঙ্গিয়া, বাদসা আকবর এক গবাক্ষের ধারে দাঁড়াইয়াছিল আর এক সুন্দরী নাকি না দেখিয়া তাহার গায়ে পিক ে ফলিয়াছিল?"

একদিন জীবন সাহস করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারী, কেমন আ ?" করুণা উচ্চহাস্য করিয়া উত্তর দিল, "কেমন আবার? ভাল!"

৩

এক নিবিড় শ্রাবণ সন্ধ্যায় টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, এবং মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপ্টা, দরজা, সার্শি কাঁপাইয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে ফিরিতেছিল। মুক্ত বাতায়নের ধারে করুণা পুষ্পোদ্যানের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর অন্য মনে দেখিতেছিল, পুষ্পসমেত একটী গন্ধরাজ বৃক্ষ কর্দ্দমাক্ত হইয়া ভূমে লুটাইতেছে।

জীবনপ্রসাদ কাতরকণ্ঠে বলিল, "করুণা এমন এক দিন ছিল, যখন আমার আগমনে তুমি উৎফুল্ল হইতে। তোমার মনে না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার মনে আছে, কত দীর্ঘ মধ্যাহ্ন আমরা গল্প করিয়া কাটাইয়া দিয়াছি। কত চন্দ্রালোকিত রজনীতে প্রহরের ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে, পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যার তারকা নিবিয়া গিয়াছে, কিন্তু তুমি ও আমি গল্প করিয়াছি। কি সে গল্প, কি সে অফুরন্ত কথা? রোহিণী তারকা কোন্টী,—সে চন্দ্রের কে? চন্দ্র কেমন মধুবর্ষণ করে! ঐ স্ফটিক বেদীর উপর কেমন কিরণ সম্পাত! যূথিকাগুচ্ছ

কেমন শুভ্র! কত ছোটফুল তবুও কেমন সুন্দর! তোমার মনে নাই, একদিন একগাছি শেফালিকার মালা আমার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলে।" জীবন একটু থামিল, কিন্তু বুঝিতে পারিল না যে করুণা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছে।

জীবন বলিতে লাগিল, "শোন করুণা, আমার অধিক বলিবার নাই। আমি বুঝিতে পারিয়াছি তুমি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছ। আমি সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তুমি এখন কথাও বল না, কখন ডাকিয়া একবার বসিতেও বল না। না বল, ক্ষতি নাই। আমি শুধু দিনের মধ্যে একবার অন্তঃপুরে আসিব, পুরদ্বার হইতে আসিয়া তোমার নুপুরধ্বনি শুনিয়া যাইব।"

করুণা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "জীবন, তুমি ভুল করিয়াছ। আমি—"

জীবন কঠিনকণ্ঠে কহিল, "ভুল! উত্তম, আমি এ ভুল ভাঙ্গিব।"

করুণা যখন কহিল, "না, না, আমি সে ভুলের কথা বলি নাই, শোন জীবন—" তখন জীবন সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

৪

তখন প্রভাত সমীর বৃক্ষপত্র কাঁপাইতেছিল, এবং ঝিল্লীর অশ্রান্ত কলরব থামিয়া গিয়া পাপিয়ার কলকণ্ঠে দশদিক মুখরিত হইতেছিল। করুণা তাহার হরিণ শিশুটীর সম্মুখে বসিয়া নতমুখে ভাবিতেছিল। তাহার জাগরণক্লিষ্ট মুখে কাতরতার চিহ্ন বিদ্যমান।

রাজকুমারী ভাবিতেছিল, "কেন এমন হইল। আমি ত তাহাকে কোন মন্দ কথা বলি নাই। সে আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে চলিয়া গেল কেন? আমি কি করিয়া তাহার এই ভুল ভাঙ্গিব?"

জীবনপ্রসাদ অতি প্রত্যূষে তাহাদের প্রাসাদ শিখরে তরবারির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিত, "যদি এখন কোন বিপুল মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে রাজা আমাকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইতেন, তবে সেই উর্ম্মিমুখর রক্তসিন্ধু মাঝে আমার এই তুচ্ছ জীবনকে ডুবাইয়া মারিতাম।"

দারুণ মানসিক চিন্তায় রাত্রিতে জীবনপ্রসাদের আর নিদ্রা হয় না। সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল, এবং অবশেষে ঔষধের জন্য চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এই সময় সত্য সত্যই এক মোগলবাহিনী রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিল। রাজ্য মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল—'সাজ, সাজ।' দুর্গপ্রাকারে রক্তকেতন উড়িতে লাগিল।

রাজা যখন প্রধান সেনাপতির সহিত গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষে গভীর পরামর্শে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন জীবনপ্রসাদ বাহিরে চর্ম্মবর্ম্ম পরিধান করিয়া প্রেম প্রত্যাখ্যাত জীবনের কঠোর নৈরাশ্য চিন্তায় শিহরিয়া উঠিত, অথবা প্রাচীরমূলে উপবেশন করিয়া চিকিৎসকদত্ত ঔষধের গুণে অকাতরে নিদ্রা যাইত।

৫

রাজা রাজ্যসীমান্তে বিপক্ষ সৈন্য আক্রমণ করিতে গেলেন। জীবনকে বলিয়া গেলেন, "বাল্যকাল হইতে আমি তোমার বীরত্ব দেখিয়া আসিতেছি। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি প্রাসাদ রক্ষা করিবে। রাত্রিতে তুমি স্বয়ং দুর্গদ্বারে প্রহরী থাকিও।"

রাজা যুদ্ধে জয়ী হইলেন, এবং এক গভীর নিশীথে সেনাপতিকে উপদেশ দিয়া রাজধানী অভিমুখে অশ্ব চালনা করিলেন,—দুর্গদ্বারে প্রস্তর শয্যায় ও কে নিদ্রিত? জীবন প্রসাদ! রাজা ভ্রূকুটি করিলেন, কঠোরস্বরে আদেশ করিলেন, "এই অকর্ম্মণ্য দায়িত্ব জ্ঞানহীন মূঢ়কে বন্দী কর।"

* * * * * *

রাজা সভা আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা শোন, আমি এক কুলাঙ্গারকে দুর্গ রক্ষার ভার দিয়া গিয়াছিলাম। সে বাল্যকালে বীর ছিল। ষোড়শ বর্ষ বয়সে একাকী সিংহ শিকার করিয়া ছিল, অষ্টাদশ বর্ষে মুষ্টিমেয় সৈন্যবলে এক বিপুল মোগলবাহিনী ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়া ছিল, আর এই দ্বাবিংশ বর্ষে, এই ঘোর বিপৎকালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চমৎকার দুর্গ রক্ষা করে।"

রাজা বলিলেন, "শোন বালক, তোমার এই প্রথম অপরাধে আমি তোমার প্রতি এই লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করিলাম। তুমি ক্ষত্রিয়কুলে এবং মন্ত্রীর গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়াছ, এই অপরাধে আমার আজ্ঞায় দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত তুমি অস্ত্রধারণ করিতে পারিবে না, প্রহরি, এই কুলাঙ্গারের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া ইহাকে দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও।"

জীবনপ্রসাদ জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিল, "আমার প্রাণদণ্ড করুন।"

রাজা বলিলেন, "তোমার কাছে পরামর্শ চাহি নাই।"

৬

দিব্য জ্যোৎস্না। জীবন তাহার শয়ন কক্ষের সমস্ত দরজা জানালা উন্মুক্ত করিয়া দিল। রজনী গন্ধার মধুর গন্ধ বায়ুর সহিত ভাসিয়া আসিতে লাগিল। জীবন মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। 'অপমানিত' ধিকৃত জীবন

রাখিয়া লাভ? এই নিঠুর পৃথিবীতে কেন থাকি? কোন আশায়? পৃথিবীতে নাকি আবার নন্দনকানন আছে—মিথ্যা কথা। এখানে মানুষে মানুষের হৃদপিণ্ড ছিঁড়িয়া খায়। বাঃ! কি উদার অনন্ত আকাশ! আমি ঐ অনন্তে বিলীন হইব। ইচ্ছা করিলে যুদ্ধে মরিতে পারিতাম, কিন্তু বুদ্ধির দোষে পারি নাই। অন্য প্রকার মৃত্যুও ত হাতে আছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এখনও মরি নাই।"

জীবন উঠিল। দুগ্ধের সহিত এক প্রকার চূর্ণ মিশ্রিত করিল,—পূর্ণ এক পাত্র। অর্দ্ধেক খাইয়া আর পারিল না। শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। নিদারুণ অবসাদে তাহার চক্ষু ভাঙ্গিয়া আসিতে ছিল। হাত পা অবসন্ন। এমন সময় উন্মুক্ত দ্বারপথে ত্বরিত গতিতে কে গৃহে প্রবেশ করিল। জীবন চক্ষু মেলিয়া দেখিল, রাজকুমারী! করুণা বলিল, "জীবন, আমি তোমার ভুল ভাঙ্গিতে আসিয়াছি। আমি তোমাকে সত্যই ভালবাসি।" করুণা মূর্ত্তিমতী করুণার মত ডাকিল, "জীবন।" জীবন বলিল, "পাষাণি, এখন কেন ভুল ভাঙ্গিতে আসিয়াছ? আর ভুল ভাঙ্গিতে হইবে না। আমি এ পৃথিবীতে আর অধিক্ষণ নাই, আমি অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছি।" করুণা জীবনের মুখের উপর ঝুঁকিয় বলিল, "জীবন, জীবন-সর্ব্বস্ব, তুমি কি করিয়াছ?" জীবন পানপাত্র দেখাইয়া দিল, এবং করুণা তাহা মুহূর্ত্তে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

শারদ নিশীথে পূর্ণচন্দ্র শুভ্রশয্যা শায়িত শুভ্র কুসুমের মত এই দম্পতির উপর রজত-কিরণ-বর্ষণ করিতে লাগিল এবং স্নিগ্ধ বাতাসে রজনীগন্ধার মধুর গন্ধে চারিদিক বিভোর হইয়া গেল।

* * * * * *

প্রভাতের শীতল সমীর স্পর্শে জীবনপ্রসাদ জাগিয়া উঠিল। করুণা তখনও নিদ্রা যাইতেছিল। জীবনপ্রসাদ বিস্মিত হইয়া বাক্স খুলিয়া দেখিল, বিষচূর্ণ যথাস্থানেই আছে;—সে ভুলক্রমে সিদ্ধিঘটিত সুনিদ্রার ঔষধ খাইয়া ছিল। জীবন করুণার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ডাকিল, "করুণা, উঠ। আমরা অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছি।"

শ্রীঅমূল্যনারায়ণ সেনগুপ্ত।

প্রেমের প্রতিশোধ

১

যেখানে শৈবালবিভূষণা শিলার বুকে, ঝরনার রূপালী ধারা ঝর ঝর ঝরিয়া পড়িতেছে,—সেইখানে, চলজলাকুলা আঙ্গুরলতার একটী পাশে তারা দুজনে বসিয়াছিল।

যুবক, রূপাবেশস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যুবতীর সাঞ্জন নেত্রের দিকে চাহিয়া বলিতেছিল—

"চুঁ আর্‌জেতু মাহ্‌ন বাশদ্‌ রোশন্‌
মানন্দ্‌রুখ্‌ৎ গুলন্‌ বুদ্‌ দর গুলশন্‌—"

যুবতী, ভুবনজয়ী ভুরুর ধনুকখানি বাঁকাইয়া তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "থাম ইয়ার্‌, থাম! কাফেরের মুল্লুকে গিয়ে, কিতাব পড়ে তুমি যে মস্ত একজন উস্তাদ্‌ বনে' গেছ! কিন্তু আমারত' অত তালিম্‌ নেই বন্ধু! আমাকে সব খুলাসা ক'রে বলতে হয়ত' বল!"

"কি বল্‌বো?

"যা বল্লে, তার মানে!"

"শুনবে! চাঁদের উজ্জ্বলতা তোমার ঐ কপোলের কাছে হার্‌ মেনে যায়। আর তোমার ঐ মুখখানির যে লাবণ্য—তার কাছ থেকে অমন যে গোলাপ—সেও মানে মানে তফাতে থাকে। তারপর—

"মিজ্‌গানদ্‌—

"সলাম্‌. জাফর মিঞা, সলাম্‌! তুমি যে খুব্‌ লায়েক্‌ হয়েছ তা বিলক্ষণ টের পাওয়া গেছে! আমার কাছে খাম্‌খা তোমার অমন এলেম্‌ বিল্‌কুল্‌ বর্‌বাদ্‌ করে কেন? তার চেয়ে আর কোন কথা থাকেত' বল!"

যুবক হতাশভাবে বলিল, "আমিনা, আর কি বল্‌বো—তোমার নামই যে আমার তস্‌বিহ্‌! আমার সবই যে তোমার,—আমি যে তোমারই খিদ্‌মৎগার!"

"জাফর, আমি তবে চল্লুম।" আমিনা উঠিয়া দাঁড়াইল।

জাফর তাড়াতাড়ি আমিনার হাত চাপিয়া ধরিল। মুখে কিছু বলিল না,—কিন্তু কাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সেই একান্ত মৌনদৃষ্টিমধ্যে আমিনা কি নীরব ভাষা পাঠ করিল, আমরা তা জানি না; কিন্তু মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া, আবার সে জাফরের পাশে আসিয়া বসিল।

চারিদিক কি নির্জ্জন! পাহাড়ের পর পাহাড়,—শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ,—জলদালঙ্কৃত, অনমনীয় ভীষণ মধুর! মাথার উপরে অনন্ত আকাশ, পদতলে অসীম পাতাল! দূরে—বহুদূরে, পর্ব্বতীয় তরুশ্রেণীর পল্লবাকাশ দিয়া সন্ধ্যাশশীর দিব্য জ্যোতিঃ যত ফুটিয়া উঠিতেছে আর উপলাহতা নির্ঝরিণীর চপল জলবেণী তত অপূর্ব্বোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

জাফর ডাকিল, "আমিনা!"

"বন্ধু!"

"আমায় ভালবাস?"

"বাসি।"

২

জাফর ও আমিনা—দুজনেই আফ্রিদী। জাফর গ্রামের সর্দ্দারের একমাত্র পুত্র। আমিনা গৃহস্থের কন্যা এবং জাফরের শৈশব সঙ্গিনী। যৌবনের প্রারম্ভেই জাফর তার পিতার সঙ্গে রাওলপিণ্ডিতে চলিয়া গিয়াছিল। তার পিতার ইচ্ছা ছিল, ছেলেকে সুশিক্ষিত করে। তাই রাওলপিণ্ডিতে গিয়াই, জাফরের শিক্ষাভার একজন মৌলবীর হাতে পড়িল। ফলে জাফর আজ তাহার মাতৃভাষা "পুস্তো"র সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া পার্শি ও আরবী প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত।

সম্প্রতি তার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তাই সে, আবার আপনার জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সকলের আগে তাকে দেখিতে আসিল আমিনা। জাফরের মুখের পানে বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ জাফর, তুমি এত বড় হ'লে কি করে?" জাফর হাসিয়া বলিল, "এই, যেমন করে তুমি বড় হয়েচ!"

তারপর, বড় সুখে জাফরের দিন কাটিতে লাগিল। সে আমিনাকে ভালবাসে। আমিনা তাকে ভালবাসে। মধু-মধুর শৈশবস্মৃতি অতি সহজেই তাহাদের তরুণ প্রাণ দুটী একসঙ্গে যুক্ত করিয়া দিল।

দুটি হরিণ হরিণীর মত তারা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়,—নগর দূরে পড়িয়া থাকে, জনকল্লোল সেখানে পশিতে পারে না।

কোনদিন ঝরণার জলে তারা ঝাঁপাইয়া পড়ে,—তাহাদের অবগাহন-কৌতুকে সারা প্রকৃতি যেন জীবন্ত হইয়া উঠে। আমিনার পেলবক্ষীণ শ্রোণীতট চুম্বন করিয়া পুলকিত স্বচ্ছ জল, অসহ্য আবেগে উচ্ছসিত হইয়া লীলাচঞ্চল হয়—আর, জাফর নিষ্পলক নেত্রে ক্রীড়াসখীর পুষ্পনিভ মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

কোনদিন বনফুল কুড়াইয়া আনিয়া, জাফর, আমিনাকে সাজাইতে বসে। তাহার মাথায় দেয় ফুলের মুকুট, গলায় দেয় ফুলের মালা, হাতে দেয় ফুলের বালা।

তারপর সেই কুসুমালঙ্কৃতা অপূর্ব্ব সুন্দরীর হাত দুখানি টানিয়া আপন বুকের উপরে রাখিয়া জাফর জিজ্ঞাসা করে, "আমিনা, বুকের মাঝে আমার মন কি বল্‌ছে, বুঝতে পার তুমি?"

কোন দিন আমিনা গান গায়। আর তার নরম কোলে মাথা রাখিয়া, জাফর সবুজ ঘাসের বিছানায় দেহ এলাইয়া দিয়া, সেই গান শুনিতে শুনিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

এমনি করিয়া দিন যায়। তারা ভাবিত, এমনি করিয়াই বুঝিবা চিরদিন যাইবে। কিন্তু তা নয়। হঠাৎ তাহাদের সুখের মেঘে আগুন লাগিল। আফ্রিদীদের সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধ বাধিল।

৩

ব্রিটিশ সিংহের গর্জ্জনে, দুঃসাহসী মোল্লারা ভীত হইল না; বরং জিহাদ্ বা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা পূর্ব্বক লোক সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

হঠাৎ জাফরদের গ্রামে একদিন একটা উত্তেজনার সাড়া পড়িয়া গেল। মোল্লাগণের পক্ষাবলম্বী একজন পরাক্রান্ত সর্দ্দার সেখানে লোক সংগ্রহ করিতে আসিল। তাহার নাম খুদাবক্স।

ধর্ম্মযুদ্ধের নামে গ্রামবাসী রণপ্রিয় আফ্রিদীরা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাহারা ভবিষ্য চিন্তা না করিয়া একেবারে সশস্ত্র হইয়া খুদাবক্সের পতাকার তলায় গিয়া দাঁড়াইল।

জাফরও আফ্রিদী,—শিক্ষা তাহার জাতিসুলভ রণপ্রিয়তাকে খর্ব্ব করিতে পারিল না।

সে দিন সকালে সে আপনার ঘরে দাঁড়াইয়া অস্ত্রশস্ত্রাদি পরীক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ হাঁফাইতে হাঁফাইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমিনা আসিয়া সেখানে উপস্থিত, "জাফর! জাফর!"

জাফর বিস্মিত হইয়া আমিনার মুখের দিকে চাহিল।

"জাফর আমাকে বাঁচাও!"

জাফরের সেই সহসা জাগ্রৎ বিস্ময়, এবারে মাত্রাতিক্রম করিল। সে নির্ব্বাক-ভাবে আমিনার উদ্যত হাতখানা ধরিল।

আমিনা তাড়াতাড়ি বলিল, "তারা আমাকে ধরে নিয়ে যেতে আসছে!"

এবারে জাফর কথা কহিল ; বলিল, "তারা কারা ?"

"খুদাবক্সের সিপাহীরা।"

"খুদাবক্সের সিপাহীরা! কেন ?"

আমিনা দুই হাতে মুখ ঢাকিল। কোন উত্তর দিল না—দিতে পারিল না। এমন সময়ে বাহিরের জনতার কোলাহল শোনা গেল।

জাফর তাড়াতাড়ি আমিনার হাত দুইখানি টানিয়া কহিল, "কথা কও। বল কি হয়েছে! আমি বদমাস্‌দের আচ্ছা রকম শিক্ষা দিব।"

আমিনা থামিয়া থামিয়া বাধো বাধো গলায় বলিল, "খুদাবক্স—আমায় নিয়ে যেতে চায়!"

জাফর চমকিয়া উঠিল ; বলিল, "তোমার বাবার মৎ আছে ?"

"না। কিন্তু তিনি দুর্ব্বল।"

জনতার কোলাহল ক্রমে বাড়ীর ভিতরে আসিল। জাফর আমিনাকে আপনার কাছে টানিয়া আনিল।

তারপর ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো রাইফেলটা লইয়া স্থির ভাবে বলিল, "কি আমাদের মৌজা থেকে, আমার মহলা থেকে তোমায় নিয়ে যাবে! দেখি কার এত বুকের পাটা।"

জাফরের কথা শেষ হইতে না হইতে দরজার সামনে কয়েকজন সশস্ত্র লোক আসিয়া দাঁড়াইল। আমিনাকে দেখিতে পাইয়া তারা এক সঙ্গে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল এবং ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল।

জাফর হাকিল,—"তফাৎ!"

লোকগুলা কোনওরূপ বাধা পাইবে বলিয়া ভাবে নাই—জাফরের সতেজ রুক্ষকণ্ঠে একেবারে দাড়াইয়া পড়িল ;—কিন্তু জাফরকে বন্দুক তুলিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া নিয়া সকলে এক সঙ্গে তাহাকে আক্রমণ করিল।

জাফর বন্দুক তুলিয়া লক্ষ্যস্থির করিতেছে,—কিন্তু সহসা তাহার লক্ষ্যপথে কাহার দেহ ছায়া পড়িল। আমিনা তাহার অস্ত্রের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাধা পাইয়া জাফর বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমিনা একি ?"

আমিনা তাহার উত্তেজিত মুখের উপরে আপনার প্রশান্ত দৃষ্টি বিস্তারিত করিয়া বলিল, "জাফর অস্ত্র ছাড়ো। আমি খুদাবক্সের কাছে যাব।"

"সেকি ?"

হ্যাঁ।"

"আমিনা,—আমিনা !"

"ব্যস্ত হয়োনা বন্ধু ! আমাকে ধরে রাখতে পার্ব্বে না। তুমি যদি আজ একলা না হ'তে, তাহ'লে হয়ত আমাকে ধরে রাখতে পারতে, আমি ভুল ক'রে তোমার কাছে এসেছি,—আমার জন্যে তুমি কেন প্রাণ দেবে ভাই ! বিদায় সখা, খোদাতালা তোমার মঙ্গল করুন।"

৪

তারপর. আটমাস কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা হয় হয়,—আকাশের চিত্র-পটে গোলাপী রং মাখাইয়া দিয়া সূর্য্য অনেকক্ষণ ছুটি নিয়াছে। পাহাড়ী পাখীরা একতানে গায়িতে ছিল,—পাহাড়ের গান, আনন্দের গান।

জাফর একমনে বসিয়া বসিয়া তাহাই শুনিতেছিল।

গিরিগুহার ভিতর হইতে সাঁঝের আঁধিয়ার বাহির হইয়া আসিল, আকাশ-পট হইতে সূর্য্যের বিচিত্র রাঙ্গা রঙ্গের ছবি ক্রমেই ঝাপসা হইয়া উঠিল, বিহঙ্গের কলকণ্ঠ ক্রমেই মৃদু হইয়া উঠিল,—কিন্তু জাফর তবু উঠিল না। আনমনে বসিয়া বসিয়া সে আঁধারের বিস্তার দেখিতে লাগিল।

এইখানে রোজ বৈকালে আসিয়া চুপটি করিয়া সে বসিয়া থাকে, আর সুদূরের দিকে চাহিয়া থাকে,—আপনমনে ভাবে। কি ভাবে ? কত কথা

সে যুদ্ধে যায় নাই। তার প্রাণমধ্য পূর্ণ করিয়া যেখানে ছিল স্বদেশভক্তি এবং অগাধ প্রেম, আজ সেখানে আছে শুধু তীব্র জ্বালা এবং দীপ্ত প্রতি-হিংসা। তাহার হৃদয়ের উর্ব্বরা ভূমি আজ অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক, কঠিন, মরুভূবৎ।

আমিনা ছাড়া এই দিনগুলা কি দীর্ঘ ! এমন করিয়া আর ক'দিন চলিবে ? জীবনভোর তাহাকে কি এমনি অপেক্ষা করিতে হইবে ? না, কখনই না !

তবে ? আমি আমার হারাধনকে আবার ফিরাইয়া আনিব ! কিরূপে ? এই বাহুবলে—এই অসি দিয়া !

সন্ধ্যার স্তব্ধতার মাঝে, কঠিন পাষাণে লাগিয়া সহসা তার কটিবন্ধ তরবারিতে ঝনঝনা বাজিল।

ঠিক সেই সঙ্গে অদূর হইতে একটা শব্দ তার কাণে গেল। জাফর, অন্যমনস্ক হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল,—যেন একাধিক অশ্বের পদশব্দ বলিয়া মনে হইল।

একটু পরেই, দুইটা মশালের আলো দেখিয়া, জাফর কিছু বিস্মিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে এরা কারা আসে? সে পাহাড়ের সংকীর্ণ পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

দেখিল,—আরোহী লইয়া দুইটা অশ্বতর তাহাদেরই গ্রামের দিকে আসিতেছে। সঙ্গে দুইজন লোক,—সম্ভবতঃ ভৃত্য। তাহাদের হাতে দুইটা মশাল।

আগন্তুকেরা নিকটস্থ হইলে, জাফর দেখিল, আরোহীদের একজন পুরুষ আর একজন রমণী। ক্রমে তারা আরও কাছে আসিল—আরও, আরও কাছে! তখন জাফর বিস্ফারিত নেত্রে যাহা দেখিল, তার কাছে মনে হইল—তাহা স্বপ্ন, তাহা মিথ্যা।

কিন্তু স্বপ্ন নয়, মিথ্যা নয়। কারণ, আগন্তুকেরাও তাহাকে দেখিয়াছিল, এবং দেখিতে পাইয়া স্ত্রী কণ্ঠে একজন ডাকিল, "জাফর!"

সে কি স্বর! যেন কবেকার স্বপ্নে শোনা পরীর গান! যেন কোন জনমের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির ভাষা।

নিদ্রাভিভূতের মত জড়িত কণ্ঠে জাফর বলিল, "আমিনা!"

আমিনা অশ্বতর হইতে ততক্ষণে নামিয়া পড়িয়াছে। আকাশের সবে ওঠা ধব্‌ধবে চাঁদের আলোয় শ্বেতবসনা আমিনা অগ্রসর হইল,—ঠিক যেন লঘুগতি হাল্‌কা একখানি মেঘের মত।

আবার আমিনা ডাকিল, "জাফর!"

জাফর ডাকিল, "আমিনা!"

"ভাই, কতদিন পরে দেখা?"

"কতদিন পরে আমিনা, কতদিন পরে!"

দুজনে দুজনার হাত ধরিল, দুজনে দুজনার দিকে চাহিয়া রহিল—এমনি অনেকক্ষণ! মুখের ভাষা বুঝি সেখানে হার মানিল,—তাই চোখের ভাষায় মৌন আলাপ গভীর, গভীর, গভীরতম হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে অশ্বতরের পৃষ্ঠ হইতে অস্তজন কর্কশকণ্ঠে ডাকিল, "আমিনা!"

ত্রস্তভাবে আমিনা জাফরের হাত ছাড়িয়া দিল এবং জাফর চমকিয়া আরোহীর দিকে চাহিল।

"ইয়ে আল্লা!"

আরোহী, খুদাবক্স।

চোখের পলক না পালটিতে জাফর বাঘের মত খুদাবক্সকে আক্রমণ করিল। সহসা আক্রান্ত হইয়া খুদাবক্স আত্মরক্ষার কোন অবকাশ পাইল না; সবল পদাঘাতে তখনই সে ভূমি চুম্বন করিল এবং জাফর তাহার বুকের উপরে পা রাখিয়া আপনার তরবারি কোষমুক্ত করিল।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায়, আমিনা প্রথমে একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। তারপর যখন দেখিল, জাফরের মুক্ত অসি শূন্যে বিদ্যুতের মত ঝকিয়া উঠিল,—তখন এক লহমায় তার জড়তা কাটিয়া গেল। তীরের মত ছুটিয়া গিয়া সে জাফরের উদ্ধবাহু চাপিয়া ধরিল এবং গভীর তিরস্কারের স্বরে বলিল, "জাফর!"

তাহার কণ্ঠস্বরে জাফরের হাত যেন অসাড় হইয়া গেল।

আমিনা বলিল, "জাফর, জাফর—একি! তুমি আমার স্বামী হত্যা কর্ব্বে?"

জাফর ফিরিয়া দাঁড়াইল;—বলিল, "তোমার স্বামী?"

আমিনা সহজভাবে বলিল, "হ্যাঁ।"

জাফর নির্ব্বাকভাবে আমিনার দিকে মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে সেইখানে একান্ত অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল। যে আশার বৃন্তকে আশ্রয় করিয়া তার হৃদ্‌গুপ্ত প্রেমের ফুল এতদিন ফুটিয়া ছিল, আজ আমিনার একটা কথাতেই তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে, একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হতাশকণ্ঠে সে কহিল, "যদি চলেই গিয়েছিল, তবে আবার ফিরলে কেন আমিনা?"

আমিনা বলিল, "যুদ্ধে আমরা হেরেছি। সাহেবলোগ আমাদের গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। অনেক কষ্টে আমরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।" বলিতে বলিতে হঠাৎ সে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

"হোসিয়ার জাফর!"

জাফর ফিরিয়া দেখিল, পিছনে খুদাবক্স—তাহার হাতে ধারালো ছোরা। অবসর পাইয়া, সে আক্রমণ করিতে উদ্যত। কিন্তু জাফর নড়িল না। প্রাণের উপর হইতে তাহার সকল মমতা যেন চলিয়া গিয়াছিল। স্থিরকণ্ঠে কহিল, "মারো খুদাবক্স—আমায় খুন করো! যে দিন তুমি আমিনাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে,—সেই দিনই আমার প্রাণ মরেছিল। আজ আমার প্রাণহীন দেহকে খণ্ড খণ্ড ক'রে আমিনার পায়ের তলায় লুটিয়ে দাও।"

ভ্রুকুটি কুটিল মুখে খুদাবক্স অস্ত্র তুলিল। আমিনা অগ্রসর হইয়া জাফরকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। তীক্ষ্ণ ভাষায় বলিল, "খবর্দ্দার! তুমি আমার স্বামী বটে,—কিন্তু, জাফর আমার ভাই!"

ক্রুদ্ধ হইয়া খুদাবক্স কহিল, "আমিনা সরে যাও!" আমিনা, স্বামীর উদ্যত হাতখানা ধরিয়া বলিল, "অস্ত্র ছাড়!"

৫

তিনদিন পরে গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, শত্রুসৈন্য আসিতেছে! অতএব, ছেলে বুড়া সকলেই শত্রুকে বাধা দিতে প্রাণপণ করিয়া দাঁড়াইল।

দূরে—নিম্নে শ্যামলিত উপত্যকায় ইংরাজের রক্ত নিশান দেখা গেল। আর দেখা গেল কামানের তীব্র অগ্নি এবং শুভ্র ধূম! তার সঙ্গে সে কি বজ্র-নাদ! গিরির গর্ব্বিত শৃঙ্গ বুঝি ধূলায় লুটাইয়া পড়ে।

* * * * * *

গজ কচ্ছপের এই অসম যুদ্ধ সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হইয়া গেল। গ্রামের পথে পথে আফ্রিদীদের মৃতদেহ লুটাইতেছে। শবের পাশে বসিয়া পুত্রহীনা মা কাঁদিতেছে, পিতৃহীনা কন্যা কাঁদিতেছে, পতিহীনা সতী কাঁদিতেছে।

সদলবলে কর্ণেল রিচমণ্ড গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যাহারা অস্ত্রত্যাগ করিল, তাহাদের কিছু বলা হইল না। কয়েকজন বন্দী হইল,—তাহারা বিগ্রহের মূল। ইংরাজের গুপ্তচর তাহাদিগকে চিনাইয়া দিল। বন্দীদের ভিতরে একজন আমাদের পরিচিত। সে খুদাবক্স। ইংরাজ তাহাকে খুব চিনিত। হুকুমজারি হইল, পরদিন সকালে তার প্রাণদণ্ড হইবে।

জাফর মিথ্যা নাকাল হইয়া কোন ফল নাই দেখিয়া, আগেই অস্ত্রত্যাগ করিয়া ছিল। সে গ্রামের সর্দ্দার পুত্র। গাঁয়ের ভিতরে তার বাড়ীখানিই বড়সড় ও বেশ শক্ত ছিল। দুর্দ্দান্ত খুদাবক্স পাছে পলাইয়া যায়, সেই ভয়ে জাফরের বাড়ীতেই একটী ঘরে তাকে রাত্রির মত বন্ধ করিয়া রাখা হইল। বলা বাহুল্য দরজায় কড়া পাহাড়া বসিল।

৬

সারা দিনের হাঙ্গামায় জাফরের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার পরে সে, গ্রামের ঝরণার ধারে গিয়া, চারিদিকের নির্জ্জনতার মাঝে আপনাকে ডুবাইয়া দিল। এ যায়গাটি তার বড় প্রিয়। এখানে আসিলে, সে সব ভুলিয়া যাইত।

তেমনি ঝরণা ঝরিতেছে, পাখী ডাকিতেছে, চাঁদ উঠিতেছে, ফুলবাস ভরা বাতাস তেমনি বহিতেছে,—শশিকরসুষম তরুশ্রেণী তেমনি মর্ম্মরিত হইতেছে এবং সকলের মাঝে চির নীরব বৃদ্ধ শৈলরাজ তেমনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপনার ছায়া আপনি দেখিতেছে।

পিছনে শুক্‌না পাতার শব্দ হইল। জাফর ফিরিয়া চাহিল;—দেখিল, আমিনা।

কিন্তু আজ ত জাফর আমিনাকে দেখিয়া হাসিল না, কথা কহিল না,—কিম্বা কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না।

জাফর ফিরিয়া আবার ঝরণার দিকে চাহিল। সেখানে গাছের পাতার ফাক্ দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া কালো জলে পড়িয়া হীরার ফুলের মালা গাঁথিতে ছিল।

আমিনা ডাকিল,—"জাফর!"

জাফরের মুখে কথা নাই।

আমিনা তার 'কাঁধের' উপরে আপনার মোমের মত নরম হাতখানি রাখিল। জাফরের দেহে একটা উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়া গেল; সে একটু কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু কথা কহিল না।

আমিনা বলিল, "কি জাফর! কথা কইছ নাযে বড়? লজ্জা হচ্ছে বুঝি?"

জাফর স্তব্ধ।

"তোমার তাহ'লে শরম্ আছে? তা বেশ! এখনও দিব্যি খুস্‌মেজে আছ?"

জাফর আমিনার এই ব্যঙ্গপূর্ণ বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারিল না। একবার মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আবার মাথা হেঁট করিল।

আমিনা কহিল, "অফ্‌সোস্ মিঞা, অফ্‌সোস্। এমন বেইমান্ তুমি! হা আল্লা!"

জাফর এইবারে কথা কহিল;—বলিল, "কি বল্‌ছ, আমিনা?"

"কাফেরের হাতে আমার স্বামীকে ধরিয়ে দিয়েছ তুমি!"

"কে বল্লে?"

"গাঁয়ের লোকে কাণাকাণি কর্‌ছে।"

জাফর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—কেন গাঁয়ের লোকের কি আর কোন কাজ নেই?"

আমিনা বলিল, "নইলে এত যায়গা থাক্‌তে তোমার বাড়ীতে আমার স্বামী বন্দী কেন?"

"পাছে খুদাবক্স পালিয়ে যায়।"

আমিনা তীক্ষ্ণ নেত্রে জাফরের মুখের দিকে চাহিল। তারপর হঠাৎ তাহার হাত ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "জাফর জাফর! পায়ে পড়ি তোমার আমার স্বামীকে বাঁচাও!"

জাফর কঠোর হাস্য করিয়া বলিল, "শত্রুকে বাঁচাবো? আমার গর্দ্দানা দেবার জন্যে? সাবাস!"

আমিনা ভূতলে বসিয়া দুইহাতে জাফরের পা জড়াইয়া ধরিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "জাফর এত নিষ্ঠুর তুমি!"

"সুন্দরী তুমিই আমায় নিষ্ঠুর করেছ,—নিজেকে দোষ দাও,—আমায় জড়াও কেন!"

"জাফর ভাই! আমার কথা রাখ!"

অটলকণ্ঠে জাফর কহিল, "পারলুম না আমিনা! আমার কি সাধ্য।"

"তবে নিপাত যাও! আমি সয়তানের কাছে দয়া চাইতে এসেছি," বলিতে বলিতে আমিনা চকিতে সোজা হইয়া উঠিল—তাহার হস্তে একখানা ছোরা! আমিনা জাফরের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রাঘাত করিল,—

কিন্তু জাফর নিপুণ পদে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। বেগ সামলাইতে না পারিয়া, আমিনা আপনিই পড়িয়া গেল।

জাফর হাসিয়া বলিল, "আমার বখতে তোমার ও নরম হাতে মরণ নেই, আমিনা!"

ওষ্ঠ দংশন করিয়া আমিনা কহিল, "বে সহবৎ বেইমান্!" উঠিয়া দেখিল জাফর নাই। বনের আড়ালে সরিয়া গিয়াছে।

৭

পরদিন ভোরবেলায় ইংরাজের 'ড্রাম্' বাজিয়া উঠিল। সকলে বুঝিল, এইবার খুদাবক্সের প্রাণদণ্ড হইবে।

তাঁবুর সাম্‌নে, ক্যাম্প্ চেয়ারে কর্ণেল রিচমণ্ড বসিয়াছিলেন। তার ডান হাতে অঙ্গুলীর মাঝে একটী চুরোট ও বাম হাতে মদের গেলাস। ভারি শীত,—মাঝে মাঝে পান না করিলে চলে না। শেষে গেলাসটি একেবারে খালি করিয়া, রুমালে মুখ মুছিয়া, চুরোটে একটা দম্‌ভোর টান দিয়া সাহেব গান ধরিলেন:—

"When the man is twenty one,
This is the time to drink hot rum!"

গাহিতে গাহিতে কর্ণেল হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং বিস্ফারিত নেত্রে সুমুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া সুন্দরী আমিনা।

অনেকক্ষণ বুভুক্ষু নেত্রে আমিনাকে দেখিয়া কর্ণেল অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

আমিনা বলিল, "আমি খুদাবক্সের স্ত্রী।"

সাহেব আফ্রিদী ভাষা কিছু কিছু বুঝিতেন। বলিলেন, "এখানে কি দরকার? ওঃ! তোমার স্বামীকে একবার দেখতে চাও?"

আমিনা সম্মতিসূচক শিরঃস্পন্দন করিল।

সাহেব খুদাবক্সকে সেখানে আনিতে হুকুম দিলেন। তারপর আমিনার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার জন্ম আমি দুঃখিত। কিন্তু কি কর্ব্ব—সে বিদ্রোহী। নইলে—"

"নইলে কি সাহেব? আমার স্বামীকে ছেড়ে দিতে?"

কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া কর্ণেল রিচমণ্ড গোপে চাড়া দিতে দিতে

শবরভূপ ও ভল্লুক কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেবদাস।— পত্নীর গৌরব।
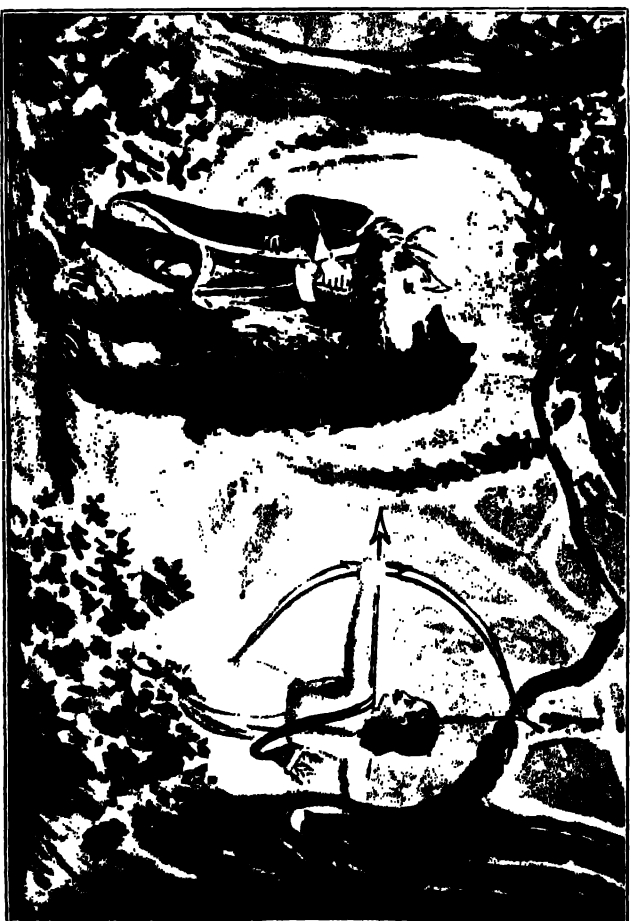
াকাশের দিকে চাহিলেন। একটু অন্যমনস্ক হইয়া মৃদুস্বরে গুঞ্জন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে কাছেই একটা গোলমাল উঠিল। কর্ণেল বিরক্ত দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিলেন। ভ্রূসঙ্কোচ করিয়া অপ্রসন্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?"

একজন ইংরাজ সৈন্য ভীতভাবে অগ্রসর হইয়া সাহেবের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "খুদাবক্স পালিয়েছে।"

সাহেব চেয়ার হইতে এক লাফে উঠিয়া পড়িলেন ; বলিলেন, "ঈশ্বরের দিব্য ! কি বল্লে ?"

সৈনিক আবার ভয়ে ভয়ে কহিল, "খুদাবক্স পালিয়েছে।"

"পালিয়েছে ? কি করে ?"

"ঘরের ভিতরে একটা লুকানো দরজা আছে। কাল রাত্রে আমরা দেখতে পাইনি।"

কর্ণেল ক্রুদ্ধভাবে আমিনার দিকে চাহিলেন ;—বলিলেন, "এই ডাইনীকে পাকড়াও ! খুদাবক্সকে না পেলে, একে আমি দেখ্‌ব।

আমিনা এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল ;—পুলকে তার মনটি ভরিয়া গিয়াছিল। এখন হঠাৎ সাহেবের কথা শুনিয়া, তার প্রাণ যেন বুকের ভিতরে বসিয়া গেল। অপমানের ভয়ে সে তাড়াতাড়ি পিছনে হটিয়া যাইল,—কিন্তু সকলের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া কোথায় যাইবে সে ? দুইজন সৈন্য তখনই ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে আসিল। আমিনা কিরাত জালবদ্ধা হরিণীরমত কাঁপিতে কাঁপিতে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। আমিনার কাতর আর্তনাদ মিলাইয়া যাইতে না যাইতে ভিড়ের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল ;—উচ্চকণ্ঠে কহিল, "খবর্দ্দার ! স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিও না।"

কর্ণেল অগ্রসর হইয়া বলিলেন "কে তুই ?"

সাহেব একটু বিস্মিত হইয়া জাফরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। জাফর একটুও ভীত হইল না ; আপনার বিশাল বক্ষের উপরে দুই বাহু রক্ষণ করিয়া সাহেবের দিকে গর্ব্বিত ভাবে চাহিয়া আবার কহিল, "তোমরা কাপুরুষ ! নইলে, স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দাও ? "আমি জাফর। তোমার বন্দীকে আমিই বাইরে থেকে পিছনের দরজা খুলে দিয়েছি।"

কর্ণেল রিভলভার বাহির করিয়া জাফরের মস্তক লক্ষ্য করিলেন।

আমিনা চীৎকার করিয়া জাফরকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "জাফর—কেন তুমি ধরা দিলে ভাই!

জাফর, প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমিনার অশ্রুপ্লাবিত চোখদুটির দিকে চাহিল। অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "কেন ধরা দিলুম! নইলে তুমি বেইজ্জত হতে! তোমার স্বামী মুক্ত,——খোদাতালা তোমার মঙ্গল করুন।"

কর্ণেল ঘোড়া টিপিলেন।

"আল্লাহ! আমিনা, আমি বেইমান্ নই।"

জাফরের বিদীর্ণ মস্তক, আমিনার স্কন্ধের উপরে লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

নরাশ্রম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ছিন্ন হস্ত।

কাওেরাওয়ের নিকটে কিছুই আটকাইত না। তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে কাহারও সহিত পরিচিত হইলে প্রথমে তাহার হস্তাক্ষর অধিকার করিয়া লইতেন। জালিয়াতি বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই ছিল না। সুতরাং বলা বাহুল্য, তিনি ডাক্তার গোকুলদাসের হস্তাক্ষর এমনই জাল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, গোকুলদাসও কথনও বলিতে পারিতেন না, যে, সে লেখা তাঁহার স্বাক্ষর নহে।

কাওেরাও গোকুলদাসের হস্তাক্ষর অনুকরণ করিয়া ডাক্তারের ভৃত্যের উপরে এক পত্র লিখিলেন। তাহা এই :—

"এই ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রীর সহিত আমার বাড়ী দেখিতে যাইতেছেন,—ইঁহারা বিদেশী, সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন,—আমার সমস্ত ঘর ইহাদিগকে দেখাইবে—যাহাতে ইঁহাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয় তাহা করিবে।"

পত্র লিখিয়া ক্যাণ্ডেরাও,—নিজ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। ছদ্মবেশে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

তিনি বাণুকে একটু রকম-ফের করিয়া সাজাইবার জন্ত কিছু দ্রব্যাদি লইয়া সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বাণু তাহার নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল, কিন্তু ক্যাণ্ডেরাও হাসিয়া তাহাকে বলিলেন, "ভয় নাই—এ সব কাজে এই রকমই চাই,—তোমাকেও একটু ভোল বদলাইতে হইবে,—নতুবা কাজ হইবে না।"

এই বলিয়া তিনি বস্ত্রাদি বাহির করিলেন,—সেই সকল দেখিয়া বাণু মহা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ সব কি? এ সব আমি পরিতে পারিব না।"

"ভয় নাই—না পরিলে ডাক্তারের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিব না,—কোন কাজই হইবে না—তোমার স্বামীকেও উদ্ধার করিতে পারিব না।"

"এই সব আমাকে পরিতে হইবে?"

"ক্ষতি কি—ইহাতে কোন দোষ নাই।"

সে স্বামীর জন্ত সকলই করিতে পারিত, সুতরাং ক্যাণ্ডেরাও তাহাকে যেমন সাজাইলেন, —সে তেমনই সাজিল,—কোন কথা কহিল না।

সন্ধ্যার একটু পরেই আসিয়া তাহারা দুইজনে ডাক্তারের দ্বারে উপস্থিত হইল। দ্বারে আঘাত করায় ভৃত্য দ্বার খুলিয়া দিল,—বলিল, "ডাক্তার বাড়ীতে নাই।"

ক্যাণ্ডেরাও বলিলেন, "তাহা জানি—তিনি এই পত্র দিয়াছেন।"

অনেক সময়ে রোগীর বাড়ী হইতে তাহাকে অনেক দ্রব্য বাড়ীতে চাহিয়া পাঠাইতে হইত, এইজন্ত লেখাপড়া জানা ভৃত্য তিনি রাখিয়াছিলেন।

ভৃত্য পত্রখানি পড়িয়া বিস্মিত হইল। সে এই পাঁচ বৎসর ডাক্তারের বাড়ীতে আছে, ডাক্তার কখন কাহাকেও তাহার বাড়ী দেখিতে দিতেন না। কেহ আসিলে বসিবার ঘরে বসাইতেন, তাহার পর সেখান হইতেই বিদায় করিয়া দিতেন। আজ এই বিদেশীদ্বয়কে তিনি বাড়ী দেখাইবার জন্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সে ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। তবে এই পত্র যে ডাক্তারের হাতের লেখা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যখন নিজে লিখিয়াছেন,—তখন এত শত

ভাবিবার প্রয়োজন কি। তাঁহার কথামত কাজ করাই ভাল। ইঁহারা বিদেশী লোক, ইঁহাদের ফিরাইয়া দিলে তিনি রাগ করিবেন। এইসকল ভাবিয়া সে ক্যাণ্ডেরাও ও দামোদরের স্ত্রীকে ভিতরে লইয়া গেল।

ভৃত্য ক্যাণ্ডেরাওর দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল;—সে তাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছে,—কিন্তু তাহার ছদ্ম বেশ সে ভেদ করিতে পারিল না,—সে তাহাকে একেবারেই চিনিতে পারিল না। ক্যাণ্ডেরাও ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "তুমি আগে আগে যাও—আমরা সব ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে যাই।"

তাহার পর ভৃত্য অগ্রসর হইলে তিনি বাপুর কাণে কাণে বলিলেন, "তোমার স্বামী সেদিন কিরূপ কাপড় পরিয়া আসিয়াছিল, মনে কর;—দেখ, এই সব ঘরের ভিতর তাহার জামা, কাপড়, কুর্ত্তি, পাগ্‌ড়ি কিছুই দেখিতে পাও কিনা?"

তাহারা গৃহের পর গৃহে উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। একটা দরজা দেখাইয়া ক্যাণ্ডেরাও বলিলেন, "এই পাশের ঘরটা কি?"

ভৃত্য বলিল, 'এটা ডাক্তার সাহেবের ঔষধ তৈয়ারী করিবার ঘর।"

তাহারা সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড টেবিল, চারিদিকে আলমারি, আলমারিতে নানা শিশি বোতল। একপার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড উনান,—তাহার উপরে এক বৃহৎ লৌহ কটাহ।

ক্যাণ্ডেরাও এইটাই বিশেষ করিয়া দেখিতেছিলেন,—সহসা বাপু অস্ফুট শব্দ করায় তিনি সত্বরপদে তাহার পার্শ্বে আসিলেন।

বাপু এক গাছা মোটা ঘুন্সি গৃহতল হইতে তুলিয়া লইয়া সে ক্যণ্ডেরাওকে রুদ্ধ প্রায় কণ্ঠে বলিল, "এটা আমার স্বামীর কোমরে ছিল।"

ক্যণ্ডেরাও বলিলেন, "চুপ চাকর শুনিতে পাইবে। কেমন করিয়া জানিলে।"

"আমি নিজে তাহার জন্য ইহা কিনিয়াছিলাম।"

"ঠিক মনে আছে?"

"হাঁ—আমি সেদিন নিজে—"

"চুপ—পরে কথা হইবে।

যেন কিছুই হয় নাই, এইরূপ ভাব দেখাই ক্যাণ্ডেরাও ভৃত্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এ দরজা দিয়া কোথায় যাওয়া যায়?"

"এর পাশে ডাক্তার সাহেবের যাদুঘর।"

D. Banerjee.

"সে কি ?"

"এই ঘরে তিনি ডাক্তারির অনেক জিনিষ সাজাইয়া রাখিয়াছেন।"

ক্যাণ্ডেরাও অন্য কোন কথা না কহিয়া সেই গৃহের দ্বার ঠেলিয়া দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু প্রবেশ করিয়াই ফিরিতেছিলেন—এ গৃহে যে দৃশ্য তিনি দেখিলেন; তাহাতে তাহার গা শিহরিয়া উঠিল।

গৃহমধ্যে সেল্‌ফে সেল্‌ফে অনেক বড় বড় কাচের বোতল। তাহার ভিতর আরক নিমজ্জিত নানা নরদেহ,—কঙ্কাল, জরায়ু, পাকস্থল প্রভৃতি।

তাঁহার গা বমি বমি করিয়া উঠিল, তিনি এই গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, সহসা তাহার দৃষ্টি একটা বোতলের উপরে পড়িল, তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাড়াইলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, এমন কি তাঁহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

তিনি কথঞ্চিত প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! কি করা উচিত—এখন কি করা যায়,—এ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ রাখা উচিৎ নহে—তবে বাণুকে বলিলে এখনই সে একটা গোল করিয়া তুলিবে—তবে উপায় নাই, আমার এ বিষয় সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া উচিত।"

তিনি বাণুকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বাণু উপরে যে ঘরে আলো দেখিতেছিল—সে ঘরের জানালা হইতে পাপদাস পড়িয়া নিহত হইয়াছে সে সেই ঘরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস, তাহার স্বামী সেই গৃহমধ্যে বন্দী আছে;—কিন্তু ক্যাণ্ডেরাও সে ঘর অগ্রে না দেখিয়া এ সকল গৃহ অনর্থক দেখিতেছেন দেখিয়া সে বিরক্ত হইয়া উঠিতে ছিল।

এক্ষণে ক্যাণ্ডেরাও ইঙ্গিত করায় সে বিরক্তভাবে তাহার নিকটে আসিল, ভৃত্যও তাহাদের উপর সন্দিগ্ধ হইয়াছিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

ক্যাণ্ডেরাও বাণুকে বলিলেন, "আমি আশা করি, তুমি অধীর হইবে না, অধীর হইলে সমস্ত কাজ পণ্ড হইবে, আমি এক ভয়াবহ জিনিষ তোমাকে দেখাইতে চাহিতেছি তুমি ভাল করিয়া দেখিয়া আমাকে বলিবে যে, আমার ভুল হয় নাই।"

বাণু কম্পিতস্বরে বলিল, "কি—কি—তুমি আমাকে কি দেখাইতে চাও?"

ক্যাণ্ডেরাওয়ের মুখ পাণ্ডুবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিল,—তাহার সহস্র চেষ্টায়ও তাহার ওষ্ঠ কম্পিত হইতে ছিল। তিনি তাহার মনোভাব কিছুতেই গোপন করিতে পারিতেছিলেন না। তাহার ভাব দেখিয়া বাণু আরও ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িল।

প্রতিশ্রুত। বাড়ীতে লিখিল দুই চারি দিন পরে যাইব। নির্ম্মলের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেশে চলিল।

নির্ম্মল দরিদ্র—সে জানিত। তবু দারিদ্রে সে বীতশ্রদ্ধ ছিল না, তাই ধনীর পুত্র হইয়াও নির্ম্মলের কথায় একেবারে রাজী হইয়া চলিল।

*   *   *   *   *   *

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিক্রমপুর গ্রামের সীমান্তে দুইখানি খড়ো ঘরের সামনে আসিয়া নির্ম্মল করুণ কণ্ঠে কহিল, "ভাই, এই আমাদের কুঁড়ে।" সুধীন্দ্র অমায়িক ভাবে বলিল, "বেশ ত চল।" উভয়ে প্রবেশ করিল। নির্ম্মল ডাকিল, "মা—মা ..."

নির্ম্মলের বাটীতে তাহার জননী ও একমাত্র কনিষ্ঠা ভগ্নী সুধা। নির্ম্মলের ডাক শুনিয়া সম্বব্যস্তে তাহার ভগ্নী ছুটিয়া আসিয়া, "দাদা"—বলিয়াই—অপরিচিত একজনের দৃষ্টি পথে পড়িল বলিয়া লজ্জিত ভাবে বাড়ীর ভেতর গেল। নির্ম্মল ডাকিল, "সুধা! মা কোথা?"

ততক্ষণে মা আসিয়া পৌঁছিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া নির্ম্মল বলিল, "মা আমার বন্ধু সুধীন এসেছে।"

মা উভয়কে, "এস, বাবা এস"—বলিয়া রোয়াকে মাদুর বিছাইয়া দিলেন। উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইল।

সুধীন্দ্র লজ্জা বলিয়া যে জিনিষটা আমাদের মনের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত, তাহা হইতে বরাবরই বঞ্চিত ছিল। সে এই পরিবারের মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিল না। ঠিক নির্ম্মল যেমনভাবে নিজ বাটীতে বিচরণ করে, সেও ঠিক সেইরূপে চলিতে লাগিল। কিন্তু যাহা সে কখনো অনুভব করে নাই; যাহা তাহার নিকট হইতে বরাবরই দূরে অবস্থান করিত, সেই যে লজ্জাটা কেমন একটুখানি তাহার মনের এককোণে বাসা লইল। সে অনুভব করিল, কিন্তু কারণ বুঝিল না। কোনখানে যে একটা ত্রুটি আছে, তাহা সে বুঝিল, কিন্তু সে ত্রুটি যে কোন্‌খানে তাহা বুঝিতে দেরী হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নির্ম্মলেরা দরিদ্র। এত দরিদ্র যে গ্রাম্য জমিদারের অর্থ সাহায্য ব্যতীরেকে নির্ম্মলের কলিকাতার পাঠ চালানও অসম্ভব। তার উপরে, ঘরে এই অনূঢ়া ও বয়স্থা ভগ্নী সুধা। বাঙ্গালীর ঘরে যাঁহার এ ভার আছে, তিনি ব্যতীত সে ভারত্ব বড় কেহ বুঝিবেন না। বিশেষতঃ যার ঘরে গোলাকৃতি রজত মুদ্রার সম্পর্ক নাই, তাহার অবস্থা যে কি ভয়াবহ তাহা

লিখিয়া বুঝাইবার নহে। নির্ম্মলের দরিদ্রা জননীর সম্বলমাত্র অশ্রু ও সেই নিরুপায়ের উপায় ভগবান! কিন্তু এত অশ্রু, এত প্রার্থনার বিনিময়ে ভগবানের দয়া এক কপর্দ্দকও এই বিধবার প্রতি বর্ষিত হয় নাই বলিলেও চলে। কন্যাটিকে লোকে দেখিতে আসিত। মেয়ের রূপ ছিল, অনেকেরই পছন্দ হইত; কিন্তু মায়ের রৌপ্য মুদ্রা ছিল না কাজেই অপছন্দ হইয়া যাইত। বিধবা কাঁদিয়া দিন কাটাইতেন। তাঁহার স্বামীর অবস্থা পুর্ব্বে স্বচ্ছল ছিল, কিন্তু অল্প বয়সে এই দুই অপগণ্ড ও বিধবা রাখিয়া তিনি প্রস্থান করিলে জ্ঞাতিবর্গ সম্পত্তির প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র ক্রটী করিলেন না। নিরাশ্রয় বিধবার মুখ চাহিতে কেহই ছিল না।

তবু তিনি অতি কষ্টে সন্তানাদি লইয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছিলেন। পুত্রটিকে সুশিক্ষা দান করিতেও ক্রটি করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে—আর উপায় নাই।

বালিকার স্বভাব বড় নম্র। তাহার আকৃতিও বড় কোমল। রূপটিও বড় মধুর। সুধীন্দ্র ভাবিত কেন ইহার সৎপাত্রে বিবাহ হয় না? এমন মেয়ে! নাই বা থাক্‌লো টাকা। লোকে বিয়ে কর্ব্বে মেয়েকে—না টাকাকে? ছিঃ আমি এ ভালবাসি না। সংসারে সে এতই অনভিজ্ঞ ছিল, এবং সুধীন্দ্রের গোল ছিল এইখানেই।

২

"কোনই উপায় নেই। বোসেদের ঐ ছেলে, দুইবার এণ্ট্রেন্স ফেল,—তবে খেতে পর্ত্তে পাবে, তারাই চেয়েছে নগদ মায় গহনা দেড় হাজার টাকা। ভগবান এমন কোরে সর্ব্বনাশ কর্ব্বে? শেষে নিজের পেটের মেয়েকে একটা কানা খোড়া ভিখারীর হাতে দিতে হবে?"

"মা, কি হবে? কেউ কি নেই যে, আমাদের এ বিপদে রক্ষা করে? কেউ কি নেই যে, ঐ টাকাটা ধার দেয়—আমি আজীবন তার দাসত্ব করে শোধ দেব। এমন কি কেউ নেই মা?"

"কে দেবে বাবা? কে আছে আমাদের? সেদিন আবার সরকার মশাই বলে গেছেন—ডিরেক্ট সমাজে কথা উঠেছে—মেয়ের শীঘ্র বিয়ে না দিলে—"

রুদ্ধ নিশ্বাসে সুধীন্দ্র শুনিতেছিল। গভীর রাত্রে, পার্শ্বস্থ কক্ষে মাতা পুত্রের এই কথোপকথন হইতেছিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপুরিত হইল। সে উঠিয়া বসিল, বসিয়া ভাবিতে লাগিল—ইহাদের দুঃখ দূর করিব। কিন্তু কি উপায়ে? যদি অর্থ সাহায্য চাই—বাবা তাও দিতে অসম্মত হইবেন না, কিন্তু—

অমন মেয়েটি, এমন শান্ত-শিষ্ট, অমন ধীর মেয়েটি যার হাতে পড়িবে, সে যদি যত্ন না করে, যদি তাহাদের বাড়ীতে ইহার লাঞ্ছনা হয়? অমন যে ঢল ঢল মুখখানি, এমন স্নিগ্ধ, চঞ্চল চাহনি,—কি শেষে বানরের গলায় মুক্ত হারের ন্যায় শোভিবে? একটি সুপাত্র চাই? কই তেমন ত দেখিতেছি না।—আচ্ছা,—যদি তাই হয়—মন্দ কি! কোন দোষ নাই, বাবা মাও আর কি বলবেন! যদি তাঁদের আপত্তি হয়? তবে কি? হতে পারে, তবেই ত! কিন্তু—না—এই ঠিক!

* * * * * *

তার পর দিন, যখন সুধীন্দ্র ও নিম্মল পাশাপাশি আহারে বসিয়াছে। নির্ম্মলের মা এটি খাও, ওটি খাও করিয়া খাওয়াইতেছেন; সুধা একখানি তালপাতার পাখা হাতে বাতাস করিতেছে, তখন কথায় কথায় জননী বলিলেন, "বাবা সুধীন্দ্র! তোমার ত বাবা অনেক জানা শুনো বন্ধু বান্ধব অছে, আমার মেয়ের একটি পাত্র জুটিয়ে যদি দাও। আমরা যে গরীব, বিয়ে দিতে না পাল্লে আর জাত মান থাকে না। লোকের কাছে মুখ দেখাতেও পারি না। আমাদের অবস্থা ত জান। যে সম্বন্ধ আসে তাদের দর শুনেই আমাদের হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে যায়; এখন তোমরা বাবা যদি গরীবকে রক্ষা করো—" বলিয়া তিনি বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুমোচন করিলেন।

সুধীন্দ্র বলিল, "আমিও বলবো বলবো মনে কর্‌ছিলুম, যদি আপনাদের মত হয়—"

"কি বাবা—কি বল?"

"মত হয় ত—"লজ্জায় জীভ জড়াইয়া ধরিল। সে ঈষৎ উন্নত দৃষ্টিতে সুধার পানে চাহিয়া বলিল, "আমার—আমাকে যদি আপনাদের —"

ততক্ষণ সুধা প্রস্থান করিয়াছে। সুধীন্দ্র গলাটা চাপিয়া কথা শেষ করিল—আমিই বিয়ে কর্ত্তে পারি। সুক্তনি মাখিয়া ঝোলের মাছ পাতে তুলিয়া তাহার জ্ঞান হইল। সে লজ্জারক্তিম বদনে থালের দিকে চাহিল।

কথাটা এত বেশী আবেগে নির্ম্মলের জননীর মনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, যে সাহসা তিনি ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "এ কি সত্য কথা বলছো বাবা?"

সেইরূপ অবনত মস্তকে সুধীন্দ্র বলিল, হাঁ, মা—"আমি মিথ্যা বলছি না।"

"হে মা কালী, দুর্গা, তারা, মুখ তুলে চাও মা! হাঁ বাবা, তোমার বাপ মায়ের মত হবে?"

"অমত হবে না—বোধ হয়।"

"রাজ্যেশ্বর হও।" জননীর দুই চক্ষু হইতে অঝোরে অশ্রু ঝরিতেছে।

এই সময় অন্য ঘরে দুগ্ধপানরত মার্জ্জারীর পুচ্ছ সবলে চাপিয়া ধরিয়া সুধা ভাবিল এটা বুঝি জাগ্রত স্বপ্ন!

*　　*　　*　　*　　*　　*

বাড়ীতে খবর দেওয়া হইল না। যদিই বা কেহ অমত করে। বিবাহের পর পত্র দিয়া সুধীন্দ্র সস্ত্রীক বাটী যাইবে, এইরূপ ঠিক করিল। সে তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের পুত্র, তাহার পরিনীতা পত্নীকে যে তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না, এ বিশ্বাস বলেই সুধীন্দ্র এতটা স্বাধীন ভাবে আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মলরাও তাহার কথা অযৌক্তিক বিবেচনা করিল না। ভবিষ্যতে যে তাহার ভগ্নী সর্ব্ব সুখের অধিকারিণী হইবে,—সুখে কালাতিপাত করিবে এই বিশ্বাসের জোরে তাহারা অন্য কোন বিষয় ভাবিতেও পারিল না।

*　　*　　*　　*　　*　　*

যথাকালে শুভদিন-ক্ষণ দেখিয়া পরিণয় কার্য্য সমাধা হইল। অতি সামান্য ভাবেই কার্য্য হইল। অনেকের আশা রহিল যেরূপ ধনী জামাতা হইল, পাকস্পর্শে অনেকেই নিমন্ত্রিত হইবেন।

বিবাহের পরও সপ্তাহকাল আমোদ প্রমোদে কাটিল। সুধীন্দ্র মুক্ত বিহঙ্গ আকাশে মুক্ত পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়াইয়া আবার পৃথিবীতে নামিয়া আসিল।

সে পিতাকে পত্র লিখিল।

৩

পত্র হস্তে অবনীনাথ অন্দর বাটীতে প্রবেশ করিয়া গৃহিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গৃহিণী প্রবেশ করিয়া তাঁহার গম্ভীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "কি বলছো?"

"তোমার ছেলে বিয়ে কোরেছ!"

"বিয়ে?"

"বিয়ে। এখন বউ নিয়ে বাটী আসছে। এই চিঠি লিখেছে শোন—

শ্রীচরণেষু—

অবোধ সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হইবেক। আমার বন্ধু নির্ম্মল কুমার মিত্রের ভগ্নীকে আমি স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়াছি। এক্ষণে আমি এখানেই আছি। অনুমতি করিলে সস্ত্রীক বাটী যাইব। ভয়ে পূর্ব্বে সংবাদ দিই নাই। মাতাঠাকুরাণীকে বলিবেন। আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন। সত্বর পত্রের উত্তর দিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন মিতি।

বিজন পুর, } সেবক
১৩ আষাঢ়। } শ্রীসুধীন্দ্র

"শুনলে ?"

"তা'ত শুনলুম,—এঁ্যা হো'ল কি ?"

"এখন কি কর্ত্তে চাও ?"

"আসুক ত দেখি শুনি। ছেলে মানুষ করে ফেলেছে।"

"বেশ, লিখে দিই—এসো।"

কর্ত্তা বাহির হইয়া গেলেন গৃহিণী ভাবিতে লাগিলেন—কি জানি কেমন বউ হলো। কি দিলে থুলে। সব যদি মনের মত হয়—আহা ! ছেলেমানুস, একটা কাজ কোরে ফেলেছে; বউ বরণ করে তুলবো।"

কথাটা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। সুধীন্দ্র পিতামাতার অজ্ঞাতে বিবাহ করিয়াছে এক্ষণে বউ লইয়া আসিতেছে, ইহাতে গ্রামময় একটা প্রবল আন্দোলন চলিতে লাগিল।

সুধীন্দ্রের পিতা অবনীনাথ বাবু কুঁড়ি খানা গ্রামের জমিদার, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, অগাধ ঐশ্বর্য্য, অসংখ্য লোকজন, তাঁহার পুত্রের বিবাহে বরযাত্র যাওয়া হইল না বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিতে লাগিল।

অনেকের আক্ষেপ হইল গ্রামে কত বাজী বাজনা হইত, সে সব কিছুই হইল না। আবার কাহারও আক্ষেপ রহিল—সামাজিকতা বিতরিত হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহাও হইল না। ভিন্ন রুচির লোক—অনেকের অনেক আক্ষেপ রহিয়া গেল। আবার কেহ বা বুদ্ধিমানের মত 'বউ ভাতের' খাওয়ান দাওয়ানের আশায় অশান্ত আত্মাকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিল।

* * * * * *

কিন্তু যখন সুধীন্দ্র সুধাকে লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিল, তখন হঠাৎ অনেক সুখ কল্পনা ভস্মীভূত হইয়া গেল। গৃহিণী বিরক্ত হইলেন। পাড়া প্রতিবাসীরা নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। সুধার রূপ যে চন্দ্রের অনুরূপ নহে, এমন কি পুকুরের

পণের মতও নহে ইহা সহ্য করিতে তাঁহারা একান্ত নারাজ। উপরন্তু যখন সকলেই শুনিল—বিনা কপর্দ্দকে তাহার জননী কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়াছে, তখন গৃহিণীর আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সুতরাং সুধার সাদর সম্ভাষণ হইল না। অতি অনাদরে অতি তাচ্ছিল্যের সহিত সে গৃহে প্রবিষ্ট হইল। যে দেখে যে শোনে—সেই ছিঃ ছিঃ করে।

সুধাও সব বুঝিতে পারিল। তবু সে বিচলিত হইল না। ভাবিল—কি কর্ব্ব আমার রূপ নেই, তবু আমার দেবতার পছন্দ হইয়াছে, ইহাদের পছন্দ অপছন্দে কি যায় আসে! কি কর্ব্ব আমার টাকা নেই, তবুও আমার স্বামী সাদরে আমায় গ্রহণ করিয়াছেন; ইহাদের ঘৃণা ভক্তিতে আমার কি?

অবনীনাথ বাবু সহসা কোন কথা কহিবার লোক নহেন। তিনি চুপ করিয়া সব দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের মাতব্বরগণ তাঁহাকে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "এ বিয়ে বিয়েই নয়। সুধীন্দ্রকে ছেলে মানুষ পেয়ে ভোগা দিয়েছে! ফের বিয়ে দাও। আর হ্যাঁ—বুঝতুম, সুন্দরী, সুশ্রী, না হয় আদর করে নিতুম, কিন্তু 'ওদের' (অর্থে স্ব স্ব অর্দ্ধাঙ্গিণীগণের) মুখে যে রকম শুনলুম—রূপের বা পাশ দিয়েও নাকি তিনি যান নি।" অবনীনাথ বাবু তখনও বধূ দর্শন করেন নাই। কাজেই বলিলেন, "দেখি কি হয়।"

এই 'দেখি কি হয়'—ভিতরে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইল। তাঁহার গৃহিণী কহিলেন, "ডাকিনী মাগী কোথাকার, আমার ছেলেকে পেয়ে এই একটা ধাড়ী মেয়ে গছিয়ে দিয়েছে। ও আমার ছেলের বৌ নয়। যাদের মেয়ে তাদের পাঠিয়ে দাও বল্‌ছি। গ্রামময় ঢি ঢি পড়ে গেছে। লোকে ছিঃ ছিঃ কর্চ্চে। যদি ভালো চাও ও গেরো বিদেয় করো। আমি ছেলেকে জানি, ওর ভয় কোরো না—বিদেয় করো—ফের বে দেব। সোণার চাঁদ বৌ নিয়ে আসবো।"

কর্ত্তা আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। সুধা এ সকল কথা শুনিতে পাইল। এবার অশ্রুরোধ করা কঠিন হইল। বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কর্ত্তা বসিয়াছিলেন, গৃহিণী পুত্রকে তলব দিয়া আনাইলেন। অপরাধীর মত নতনেত্রে সুধীন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইল। কণ্ঠস্বর উচ্চ ও কঠিন করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তুই যে আমাদের মুখে চুণ কালি দিলি। লোকে কি এই জন্য ছেলে মানুষ করে, লেখা পড়া শেখায়? বংশ মর্য্যাদা, মান সম্ভ্রম যে সব ডুবুলি।" কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন, "যা হোয়ে গেছে তার আর চারা নেই।

এ বিয়ের নামও উচ্চারণ কর্ত্তে পার্ব্বি না। আমি ও সব সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বো না। ফের বিয়ে দেব। এ যাদের মেয়ে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। স্পর্দ্ধা তাদের—শৃগাল হোয়ে সিংহ ছানার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে আসে।" বলিয়া তিনি পুত্রের মুখের পানে চাহিলেন। সে তেমনি আনতনেত্রে নীরবে দণ্ডায়মান।

জননী পুনরায় বলিলেন, "যা বল্লুম শুন্তে পেলি ত?"

পুত্র ঘাড় নাড়িল।

"হ্যাঁ, আমরা এই চাই। ছেলে বাপ মার অবাধ্য হয় না। ও বিয়ের নামও যেন আর কখনো শুন্তে না পাই।"

সুধীন্দ্র একবার মাথাটা উঁচু করিল। কি যেন একটা কথা ঠেলিয়া গলার কাছে আসিল। বলি—বলি করিয়াও কথা বাহির হইল না। সে আবার মাথা নীচু করিল।

"ও বৌয়ের মুখ দেখ্‌তে চাই না। তুইও ওদিকে যাবি না। যা—"

সুধীন্দ্র বাহিরে গেল। শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়াছে। মাথাটা চাপিয়া মাতালের মত অসংলগ্ন চরণ বিক্ষেপে বৈঠকখানায় গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। আয়নার তাকে কাঁচের শিশিতে অডিকলোন ছিল—মাথায় ঢালিয়া দিয়া সোফায় শুইয়া পড়িল।

সুধীন্দ্র প্রস্থান করিলে অবনীনাথ বলিলেন, "কাজটা কি ভাল হ'লো? ছেলের মনে হয়ত কষ্ট হচ্ছে।"

গৃহিণী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কষ্ট! তোমাদের যেমন বুদ্ধি! কষ্ট! কিসের কষ্ট? কষ্ট আমাদের হয় না? ছেলে পেটে ধরলুম, মানুষ করলুম, লেখাপড়া শেখালুম, তার ফল বুঝি এই।"

কর্ত্তা আর কোন কথা বলিলেন না।

* * * * * *

এদিকে সুধা কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিল। সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে; উঠিতে বসিতে গঞ্জনা দেয়—তাও সে সহ্য করিতে পারে যদি দেবতা তাহার, স্বামী তাহার—তাহার থাকেন। সে অসীম সাহসে ভর করিয়া ঝিকে দিয়া স্বামীকে নিভৃতে ডাকিতে পাঠাইল। দুরদৃষ্ট তাহার। মধ্যপথে ঝি গৃহিণী কর্ত্তৃক ধৃত হইল। সে বলিল যে, বৌ একবার দাদাবাবুকে ডাকছেন। গৃহিণীর ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তখনি সুধাকে পিতৃগৃহে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল। সুধা কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কীতে গিয়া উঠিল। গৃহিণী বলিয়া দিলেন, "বাপু, এ

ঘরে যে বৌ আসবে সে সোণার প্রতিমা। তোমার মা জুচ্চুরি কোরেছেন, কিন্তু আমরা ত কাণা নই, কচি ছেলেও নই। তাঁকে বোলো। গৃহিণীর ভক্ত একটি প্রতিবাসিনী কহিলেন—"এ ঘর দ্বার রাজার ঐশ্বর্য্য, রাজার মত স্বামী তাহার মত কুরূপা ও কপর্দ্দকহীনার জন্য হয় নাই।"

সুধা কাঁদিল—কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কীতে উঠিল। একবার চারিদিকে চাহিল; কিন্তু কোথায় কিছু দেখিবার মত পাইল না। প্রবলবেগে অশ্রু কপোলে ছাপাইয়া পড়িতে লাগিল। এই সময় বৈঠকখানায় পড়িয়া সুধীন্দ্র পুনঃ পুনঃ কপাল টিপিয়া ধরিল।

৪

যতদূর সম্ভব আপনাকে গোপন করিবার জন্য সুধীন্দ্র নূতন কলেজে নাম লেখাইল। নূতন মেশে বাসা লইল। আজ সমস্ত পৃথিবী যেন কি এক বিকট অট্টহাসিপূর্ণ বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। সে যে দিকে চায়, সব যেন তাহার চক্ষে অসামঞ্জস্য ঠেকিতে লাগিল। চিরদিনের অভ্যাসমত সে আর পড়িতে পারে না। আর কিছুতেই মনঃসংযোগ করিতে পারে না। তাহার মনের মধ্যে দুইটা স্থান স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করিতেছিল। একটিতে ক্ষুদ্র তৃপ্তি, অপরটিতে অসীম হাহাকার। এ দুইটির সংঘর্ষণে সে পীড়িত হইতে লাগিল। যখন সে একলা থাকিত, কেবলই ভাবিত, কি একটা বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে, কি একটা আবর্ত্তনে পড়িয়া জীবনটা ফাঁকা ফাঁকা করিয়া দিয়াছে। জীবনের শূন্য স্থানটা যেন একটা আর্ত্তনাদে ভরিয়া উঠিয়াছে; আর সে আর্ত্তস্বরের স্রষ্টা সে—এ সকল কথা মনে পড়িলে সে ছট ফট করিত। তাহার অশ্রান্ত মনটিকে সে কিছুতেই চাপিয়া ধরিতে পারিত না। কখনো সে একটুকু শান্তি পাইত, যখন ভাবিত সে পিতামাতার আজ্ঞামত কার্য্য করিয়াছে। পিতামাতার আদেশ প্রতিপালনই কর্ত্তব্য! তখনই আবার অন্য সুর বাজিয়া উঠিত—কিন্তু যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার প্রতি কি উচিত কর্ত্তব্য সাধিত হইয়াছে? সেও কি একটা অত্যাচার নয়? সেখানে কি অন্যায় অত্যাচার কর্ত্তব্যকে ছাপাইয়া উঠে নাই? সুধীন্দ্রের বুকের মধ্যে আগুণ জ্বলিয়া উঠিত।

অনেকদিন এমনই অবস্থায় কাটিয়াছে। এ সময় তাহার শুধু 'কাটিয়াছে।' একদিন সে অন্যমনস্কভাবে বাসার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে—সম্মুখস্থ রাজপথের অগণ্য লোকচলাচল কচিৎ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ছিল, কিন্তু একবার নীচের দিকে চাহিয়াই—সে জড় পুত্তলিবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

"সুধীন,—এই বাসা তোমার ?" বলিয়াই নির্ম্মল সরাসর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে বারান্দায় উপস্থিত হইল। সুধীন্দ্র তাহার সহিত অনেকক্ষণ কোনো কথা কহিতে পারিল না। নির্ম্মল সান্ত্বনা দিয়া কহিল—"ভাই, এদিন যাইবে। তোমার পিতা মাতার ক্রোধ শান্তি হইলেই আবার যে সেই হইবে। তখন কি আর তাঁহারা পুত্রবধুকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন ? আহা, ভাই, সুধাকে দেখে চোখে জল চাপা দায়। ভেবে ভেবে বেচারা বড় রোগা হোয়ে গেছে। তবে আমরা তাকে রোজ বোঝাই, তোর সব আছে, সব পাবি। তুমিও ত কাহিল হোয়ে গেছ—দেখছি।"

সুধীন্দ্র প্রলাপ বাক্যের মত বলিল, "সে হ'বে না—হ'তে পারে না।—যাও তুমি—ভেবে দেখব।"

নির্ম্মল চলিয়া গেল। যাইবার সময় বাসার নম্বরটা দেখিয়া টুকিয়া লইল।

এই নির্ম্মলের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে সুধীন্দ্র যেন আরো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে যে নিজে কত দুর্ব্বল তাহা বুঝিয়া সে হতাশ হইল। সে যে বীতস্পৃহ জীবনটাকে ভারবাহী গর্দ্দভের ভারের ন্যায় উদাসভাবে বহিয়া চলিল।

* * * * * *

সময় এ রকমেও কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই বিবাহের পর দীর্ঘ এক বৎসরকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আগত পরীক্ষা, সুধীন্দ্রের কোনো চেষ্টা নাই। সে পরীক্ষা দিবে না,—ঠিক করিয়াছে, প্রয়োজনও নাই—"

এই সময়ে সে একদিন একখানা চিঠি পাইল। অন্যমনস্কভাবে চিঠি খুলিল। পড়িল। মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। হাত কাঁপিতে লাগিল। চক্ষের চশমা পুনঃ সংযুক্ত করিয়া আবার পড়িল :—

শ্রীচরণেষু—

তুমি কি আমার চিঠি পাইয়া রাগ করিবে ? আগে হইলে করিতে না, সেই আশায় লিখিলাম। বিধাতার কঠোর বিধানে আমরা পরস্পরের দর্শনে বঞ্চিতা ; তবু আমি তোমার মোহন মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া কাটাইতে পারি—কাটাইতেছি। কিন্তু তুমি! তুমি বোধ হয় দাসীকে ভুলিয়া গিয়াছ। আজ এ সংসারে আমি মাতৃহীনা, পতি পরিত্যক্তা, আশ্রয়হীনা—এ সময় আমার অবলম্বন যে কিছুই নাই, তাই তোমায় দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল। যদি উচিত বিবেচনা কর—দাসীকে একবারমাত্র দর্শন দিয়া সকল সাধ তৃপ্ত করাইবে। দাসী

চরণে— "সুধা"

সুধীন্দ্র বলিয়া উঠিল, "আর না—আর না। পিতামাতার আজ্ঞা পালিয়াছি, স্ত্রীর ইচ্ছাও পূর্ণ করিব, ইহাতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন, বিরক্ত হন—কি করিব—উপায় নাই।" সংকল্প স্থির হইল। সুধীন্দ্র উত্তেজিত ভাবে কক্ষে পদচারণ করিতে লাগিল। যতই সে চিঠির কথা ভাবিতে লাগিল, ততই যেন তাহার মনের মধ্যে জলদ মন্দ্রে বাজিতে লাগিল—কি অবিচারই সে করিয়াছে—সুধার প্রতি! তাহার ত কোন অপরাধই ছিল না—সে বেচারা তবে কেন এত অন্যায় সহিল? তাহাকে বিবাহ করার জন্য ত সুধীন্দ্রই দায়ী! উঃ কি অত্যাচারই সে করিয়াছে। এক্ষণে তাহার প্রতিকার চেষ্টায় সুধীন্দ্র এতই উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, চিন্তান্বিত মনে সে ছাদে বসিয়া একটা রাত বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া দিল। ভোরের বেলা যখন শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল নামিয়া আপন কক্ষে আসিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন সে প্রবল জ্বরাক্রান্ত।

উত্তরোত্তর সুধীন্দ্রের পীড়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। জনক জননী সাতিশয় ভীত হইলেন। বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ সর্ব্বদা রোগীর নিকট থাকিয়া চিকিৎসা চালাইতে লাগিলেন;—কিন্তু বাহিরের এই পীড়ার অপেক্ষা অন্তরে যেন পীড়া গুরুতর, তাহার চিকিৎসা কেহই করিলেন না! আন্তরিক যে পীড়ার সামান্য অভিব্যক্তি এই বাহিরে তাহার সে প্রবল পীড়া কেহই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। সুধীন্দ্র যখন চৈতন্য ফিরিয়া পাইত, ব্যাকুলভাবে সে ইতঃস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। তাহার এ আকুল ও চঞ্চল দৃষ্টির অর্থ তাহার পিতা মাতা বুঝিতে পারিতেন না। সেও ইপ্সিত বস্তুর অদর্শনে হতাশ হইলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না। তাহার পিতা মাতার ইচ্ছামতই যে, সে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে তাঁহাদের সম্মুখে সে আবার কি করিয়া স্মরণ করিবে? অজ্ঞান অবস্থাতেও সে যেন কাহার অন্বেষণ করে।

জননী তাহার শয্যাপার্শ্বে দিবারাত্রি উপস্থিত থাকিয়া সেবা করিতেন, তবু এ ক্ষুদ্র কথাটি বুঝিতে পারিতেন না। বুঝি তাঁহার সে জ্ঞানও ছিল না। পুত্রের জন্যই সমস্ত চিন্তা যাঁহার নিয়োজিত তিনি অন্য ভাবনা ভাবিতে পারেন না। একদিন অবনী নাথ গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বৌমার সেই লাঞ্ছনার পর হইতেই ছেলেটা কেমন কেমন হইয়া ছিল; আমাদের ভয়ে কিছু বলতে পার্ত্ত না, কিন্তু আমার মনে হয়—সেই কথা ভেবে২ ওর মন খারাপ হোয়েছে। আর

অসুখের সে'ও একটা কারণ হোতে পারে। এ সময় একবার বৌমাকে আন্‌লে হয়তো ভালো ফল হতে পারে—কি বল?"

"আমার মতি স্থির নেই। বাছার অসুখে আমার হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে; যা ভালো বোঝ করো।"

অবনীনাথ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিজনপুর গ্রামে পাল্কী ও লোক-জন পাঠাইলেন।

* * * * * *

তাহার সংসারে শ্রেষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ অবলম্বন মাতার স্নেহঅঙ্কচ্যুত হইয়া সুধা একান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িল। এতদিন শত অশান্তি, ও মনের জ্বালার মধ্যেও যে অবলম্বনটিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া সে শান্তি পাইত, যখন সে সেই আশ্রয়হীনা হইল, তখন তাহার জীবন একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল। শ্বশ্রূগৃহে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা যেন শত মূর্ত্তিতে তাহাকে গ্রাসিতে আসিল। এত অনাদর হতাদর সব সে মা'র মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল, এখন আর সে আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। তাহার জীবনসর্ব্বস্ব, অল্পদিনমধ্যে যাহাকে, সমস্ত প্রাণকে বাহু করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া ভালো বাসিয়াছিল, তাহার সেই স্বামীকেও সে দেখিতে পায় না। তাহার কোনো সংবাদ পায় না। তখন—! তখন সে জীবনের আর মূল্য খুঁজিয়া পাইল না। জীবন ধারণের উদ্দেশ্যও খুঁজিয়া পাইল না। এই হেয় জীবনভার বহন করা যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। এই সময়ে নির্ম্মলের নিকট সুধীন্দ্রের ঠিকানা লইয়া সে তাহাকে এক পত্র লিখিল। কিন্তু, বহু আশা, বহু সাধনা ব্যর্থ হইল, তাহার উত্তর আসিল না। আর সে উঠিল না। পৃথিবীর আলোক ঘন মসীলিপ্ত বোধ হইল। সে মৃত্যুর দিকে স্বেচ্ছায় আপনাকে টানিয়া লইয়া চলিল। অভাগিনী! এত ভালোবাসা কেন বাসিয়াছিলে?

* * * * * *

জমিদারের লোকজন পাল্কী বেহারা বিশুষ্ক মুখে ফিরিয়া গিয়া চুপে চুপে কর্ত্তার নিকট সংবাদ কহিল। বৃদ্ধ একবার আকাশের পানে চাহিয়া চক্ষু মুছিলেন। নিভৃতে গৃহিনীর নিকট সে সংবাদ কহিলেন। গৃহিণী আজ বহুদিন পরে এই একবার—বুঝি জন্মের মত একবার আহা, বাছারে—বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। অবোধ আঁখি কয়েক ফোঁটা অশ্রু আপনি বিসর্জ্জন করিল!

পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "মা দাদাবাবুর জ্ঞান হোয়েছে, এখন—।"

অশ্রুমোচন করিতে করিতে গৃহিণী পুত্রের কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, করুণকণ্ঠে সুধীন্দ্র বলিয়া উঠিল—আসেনি মা, আসেনি? জানি আমি, বড় অভিমানিনী সে, আসবে না।"

গৃহিণী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আসিয়া সুধীন্দ্রের মস্তকে বরফের থলে চাপিয়া ধরিল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

আমার ওকালতী।

নিম্ন লিখিত ঘটনা যে সময় ঘটে, তখন আমার পূর্ণ যৌবন—বয়স ২৫ বৎসর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বরকম পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া আমি সম্প্রতি মাত্র ওকালতী আরম্ভ করিয়াছি। কতক জেদে, কতক উৎসাহে, কতক কৌতূহলে আমি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া গত আইন পরীক্ষায় প্রথম পদ অধিকার করি। আমার অধ্যাপক মহাশয় আমাকে বড় ভালবাসিতেন—পুত্রাধিক যত্ন, স্নেহ করিতেন। তাঁহারই অনুরোধে, একরূপ ভবিষ্যৎ গণনায়, অনিচ্ছাসত্বেও আমি এই ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইলাম। নামজাদা বড় বড় উকীল মোক্তার থাকিতে আমাকে যে কেহ সহজে ডাকিবে, সেটা দুরাশা,—আত্ম গরিমা মাত্র।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতীতে প্রবৃত্ত হইলেও আমার পাঠ প্রবৃত্তির অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই, বরং কোন কোন রকমে বিশেষভাবে বৃদ্ধি হইয়া ছিল। আগে সংবাদপত্র তেমন রীতিমত পড়িতাম না; হাতে পাইলেও যে বিষয়টা যতটুকু পড়িতে ভাল লাগিত, পড়িতাম মাত্র; একবার ফেলিয়া রাখিলে হয়তো সে কাগজখানা আর স্পর্শ করিতাম না। এখন কিন্তু পড়ার ঝোঁকটা সংবাদ পত্রের উপর বেশী দাঁড়াইয়া ছিল। প্রাত্যহিক পত্র পাঠ প্রাতঃকালীন চা পানের সঙ্গে হইলেই সুখী হইতাম।

২

মাঘ মাসের প্রাত:কাল—বেলা ৮টা। এই সময়ে সমাগত এক বন্ধুর সহিত কথা কহিতে কহিতে সে দিনকার প্রকাশিত সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলাম। বন্ধুর কথার উত্তর দিতে দিতে পড়া তেমন ভাল হইতেছিল না। কিন্তু নিম্ন লিখিত অংশ একটুখানি পড়িয়া আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, বন্ধুকেও শুনাইতে হইল :—

"অদ্ভুত চুরি—আশ্চর্য্য হত্যা!"

"গত রাত্রে অত্র সহরের বিখ্যাত ব্যাঙ্কে আশ্চর্য্যরকম চুরি ও রক্ষক হত্যা-রূপ বিষম কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। আফিসের ভিতরকার এক ছোট ঘরে খাজাঞ্জী বা ধন রক্ষককে মৃতপ্রায় অবস্থায় অদ্য প্রত্যূষে পাওয়া গিয়াছে। তাহার ভাল রকম সংজ্ঞা ছিল না এবং প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। হত্যাকারী তাঁহাকে কেন যে, গলা টিপিয়া মারে নাই এইটাই আশ্চর্য্য। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পুলিস তদারকের ভার গ্রহণ করিয়াছে। আপাততঃ যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে নোটে ও নগদে ব্যাঙ্কের কিঞ্চিন্ন্যূন লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে এরূপ অনুমান। তাছাড়া বিশেষ ক্ষতি এই যে, দুইজন প্রাচীন বিশ্বাসী দক্ষ কর্ম্মচারী প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে। রক্ষককে ছোরার আঘাতে বধ করিয়া চোর বা চোরেরা পশ্চাৎদিকের দ্বার দিয়া পালাইয়াছে।"

এই রকমের ঘটনায় আমি বরাবর যেরূপ ঔৎসুক্য ও যত্ন দেখাইয়া থাকি বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, এ চুরি ও হত্যা যে, কত গোপনভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কেহই বুঝিতে পারিবেন না। তাড়াতাড়ি পালাইবার সময় একটা মুখোস, একখানা ছোরা আর একটা নূতন পিস্তল ফেলিয়া যাওয়া ভিন্ন চোরেরা আর কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। মৃত রক্ষক সচরাচর ব্যাঙ্কের নীচের তলার একটা ঘরে থাকিত; কিন্তু ঘটনার রাত্রে তাহার মৃতদেহ উপরতলার একটা ঘরে পাওয়া যায়। এ ঘরটা ধন ভাণ্ডারের বাহিরে; ইহারই পাশে বসিয়া খাজাঞ্জী রাত্রে খাতাপত্র মিলাইতে-ছিল। মৃতদেহ পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইল যে, ছোরার সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াও রক্ষক নিদেন ১০।১৫ মিনিট জীবিত ছিল। সে যে নিজ প্রাণরক্ষার জন্য ঘাত-কের সঙ্গে খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট অকাট্য প্রমাণ অনেক বিদ্যমান; তাহার মাথার আঘাতের চিহ্ন দেখিলেই বুঝা যায় যে, পিস্তলের গোড়া

দিয়া মাথাটা কাটাইবার চেষ্টা প্রথমে হইয়াছিল; বেচারা নিতান্ত দুর্ভাগা বলিয়া সেরূপ প্রচণ্ড আঘাতেও প্রাণত্যাগ করে নাই।

কিন্তু খাজাঞ্চীর পাশের ঘরে এমন একটা ঘটনা হইয়া গেল, তাহারই ঘর হইতে অত টাকা চুরি গেল, অথচ সে ব্যক্তি কিছুই জানিতে পারিল না বা সতর্ক হইল না, সম্ভবতঃ আঘাত পাইল, মর মর হইয়া বাঁচিয়া উঠিল; অথচ চোরকে চিনিতে বা ধরিতে চেষ্টা করিল না, এ সব কি রকম? ইহাতে যে, অনেকেই খাজাঞ্চীর উপর সন্দেহ করিলেন এবং তাঁহার পূর্ণ সহায়তায় এ ঘটনা ঘটিয়াছিল বিশ্বাস করিলেন—আশ্চর্য্য কি? সরকারী প্রথানুসারে, পরীক্ষা অন্তে রক্ষকের মৃত দেহের দাহাদি কার্য্য শেষ হইয়া গেল; সাধ্যমত অবস্থানুযায়ী তদারক চলিতে লাগিল; অথচ হাঁসপাতালের যে ঘরে খাজাঞ্চী প্রায় মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তাহার চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী দিবানিশি চৌকী দিতে নিযুক্ত রহিল।

৩

হাঁসপাতালের সুচিকিৎসার গুণে, অথবা নিজের যৌবন সুলভ স্বাস্থ্যের বলে, কিম্বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, একপক্ষকাল মধ্যে খাজাঞ্চী সুন্দররূপ আরোগ্যলাভ করিলেন। তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব সুদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন; এজন্য ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা তাঁহার হাঁসপাতালে থাকার সময়ে ঘরের ও আহারাদির ভিন্ন উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। একটু সুস্থ হইবার পর সর্ব্বসমক্ষে তিনি যে এজেহার দিলেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ;—

"ঘটনার দিন ব্যাঙ্কে বিস্তর টাকার আমদানী হয়। আর ঐ দিন মাসের ২য় তারিখ বলিয়া অনেক টাকাকড়ির লেন দেন ঘটে। একজন নিকট আত্মীয়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে আমার নিম্নস্থ প্রথম কর্ম্মচারী সে দিন সকাল সকাল চলিয়া যান। দ্বিতীয় কর্ম্মচারী কয়দিন হইতেই পীড়াবশতঃ অনুপস্থিত ছিলেন; সুতরাং ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার পর ক্যাস ঘরে আমি একাকী ছিলাম। একবার ভাবিয়া ছিলাম যে, পোদ্দারের সাহায্যে হিসাব মিলাইব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার একটী শিশুপুত্র হঠাৎ বারাণ্ডা হইতে পড়িয়া বেশী রকম আঘাত পাইয়াছে সংবাদ পাইয়া, সে বেচারা প্রায় রোদনবদনে বাড়ী যাইতে চাহিল। এরূপ বিপদের অবস্থায় জেদ করিয়া তাহাকে রাখিতেও প্রবৃত্তি হইল না। সকলে এইরূপে চলিয়া গেলে ব্যাঙ্কেই মুখ হাত পা ধুইয়া কিছু জলযোগান্তে আমি আবার

কাজে বসিলাম এবং বাধ্য হইয়া একাকীই সমস্ত কাজ করিতে নিযুক্ত রহিলাম।"

"নিকটস্থ গির্জ্জার ঘড়ীতে টং টং করিয়া রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। এমন কি, একটী সূচিকাপতন শব্দ পর্য্যন্ত বেশ শুনা যায়। নীচে কোন গোলযোগ নাই, দরোয়ান রামপ্রতাপ সিং নিজের ঘরে বসিয়া দৈনিক রন্ধন করিতেছে ও অনুচ্চ মিষ্টস্বরে তুলসীদাসের একটা ভজন গীত গাহিতে ছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রথমত তাহার দুই তিনজন দেশওয়ালি ভেইয়া দেখা করিতে আসিয়া আবার নিজেদের বাসায় চলিয়া গিয়াছিল। তাহাদের দুজনের নাম জানা আছে। একজন বিষণ দয়াল পাঁড়ে, যাহাকে বৃহৎ আকৃতি জন্য সকলে 'ভীষণ পাড়ে' বলে। আর একজন শিউশঙ্কর রাউৎ, সে পাশের এক বাড়ীতে বেহারার কাজ করে। নীচে হইতে উপরে আসা সময়ে আমি এই দুজনকেও সে দিন দেখিয়াছিলাম। দারোয়ান সে সময়ে আমার জন্ত জলখাবার আনিতে নিকটস্থ দোকানে গিয়াছিল এই সকল লোক বাহির হইয়া গেলে দরোয়ান যে হড়্ হড়্ শব্দে ফটক ও দুদফা তালা বন্ধ করিয়া ছিল, তাহার শব্দ আমি যেন শুনিয়া ছিলাম, খুব মনে পড়ে। আমি সে সময় তহবিল মিলান শেষ করিয়া ক্যাসঘরের বাহিরের বারাণ্ডার টেবিলে বসিয়া হিসাব পত্র লিখিতে ছিলাম। মাঘ মাসের শীতের হাওয়া লাগিলে অসুখ হইতে পারে এবং সম্মুখস্থ দীপ নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে এই দুই ভয়ে গৃহের প্রবেশ দ্বার প্রায় বন্ধ করা ছিল।"

"কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইলে আমার পিছন দিকে একটা সামান্ত রকম শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। কে যেন চাপা স্বরে আমায় বলিল, "যেখানে বসিয়া আছ ওই রকমই ঠিক থাক। পশ্চাৎ বা অন্তদিকে ফিরিলে বা সামান্ত শব্দমাত্র করিলে নিজের আয়ুশেষ জানিবে। খবরদার—সাবধান।" দারুণ ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। লোকটা যেই হউক, কখন ও কিরূপে যে, গৃহে প্রবেশ করিয়া ছিল, আমি তাহা কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই। প্রাণভয়ে কোনদিকে দেখিতে চেষ্টা করিতেও পারিলাম না! কিন্তু ভগবানের কৃপায় জানিতে বাকী রহিল না। কেননা, ক্যাস ঘরের ঠিক বাহিরে যে ছোটঘরে বসিয়া আমি খাতা লিখিতে ছিলাম, সে ঘরে আমার টেবিলের উপর একখানা বড় আয়না স্থাপিত ছিল। সেই দর্পনে চোরের প্রতিমূর্ত্তি বেশ দেখিতে পাইলাম। বোধ হয়, এটা চোরের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হয় নাই, হইলে নিশ্চয়ই সাবধান হইত; সম্ভবতঃ

আমায় অন্যদিকে চাহিতে বলিত বা চক্ষু বাঁধিয়া ফেলিত। কেন যে প্রাণবধ করে নাই, সে কথা ঈশ্বর ভিন্ন কে বলিবে?"

"অন্য কোন দিকে না চাহিয়া সম্মুখস্থ দর্পণে চোরের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল তাহাতে দেখিলাম যে, লোকটা খুব দীর্ঘাকার, উচ্চে প্রায় ৪ হাত, বেশ সবলকায়; মুখে একটা কাল মুখোস, শুধু চোক দুটী ফাক; ডান হাতে একটা পিস্তল, বাম হস্তের কনুই হইতে নিম্নভাগ ছিন্ন; গায়ে একটা কাল রঙের মোটা জামা, মাথায় টুপি, মালকোচ্ছা ধরণে কাপড় পরা; আমার ঠিক মাথার উপর পিস্তলটা ঈষৎ বক্রভাবে রাখিয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে। বেশীক্ষণ দেখিতে না দেখিতে সেই সবলকায় দস্যু আমায় উঠিয়া দাঁড়াইতে বলিল এবং 'অন্য কোন দিকে খবরদার চাহিও না' এই ভয় দেখান কথাটা পুনরাবৃত্তি করিতে ভুলিল না। তারপর গম্ভীরস্বরে কহিল 'কি করিতে এ সময়ে এখানে এসেছি তোমার মতন চতুর লোককে সেটা বুঝাইয়া বলা বাহুল্য মাত্র। চুম্বক পাথর যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তোমার পাশের ঘরের লৌহ সিন্ধুক সেইমত আমায় আজ এখানে টানিয়া আনিয়াছে। আস্তে আস্তে লক্ষী ছেলেটীর মতন সিন্ধুকের চাবিটা খুলে নোটে নগদে যা কিছু আছে সব আমায় দাও দেখি। কোনরকম গোলযোগ কি অবাধ্যতা করিলে ফল ভাল হইবে না। আমার কথাও যা, কাজও তা। সেইটা ভালরকম দেখাবার জন্য তোমাদের বীরপুরুষ দরোয়ানের মৃতদেহটা উপরে এনেছি—ঐ বারান্দার পাশের ঘরে দেখ। অকারণ নরহত্যা আমার অভ্যাস নয়। এজন্য উহাকে প্রথমেই এই রকম স্থিরভাবে থাকিতে বলিয়া ছিলাম। ডাল রুটি খোর ভোজপুরীর প্রাণে সেটা বোধ হয় ভাল লাগিল না, তার ফল এই। তোমাকেও অকারণ বধ করার লেশমাত্র ইচ্ছা আমার মনে নাই। তবে যে রকম বলিলাম, যদি সিন্ধুক খুলিয়া সেই রকম টাকাকড়ি না দাও, বা চীৎকার কর, কি পালাইবার চেষ্টা কর এই পিস্তলের এক গুলিতেই কাজ সাবাড় করিব। আর, কোথা দিয়াই বা পলাইবে, বাহিরে যাইবার সব দরজা তালা বন্ধ এটা জানান ভাল '' বারাণ্ডায় উঁকি মারিয়া দেখিলাম, দস্যু যাহা, যাহা বলিয়াছে তাহার একবর্ণও মিথ্যা নহে। কাজেই মনে মনে একটা মতলব আটিয়া ক্যাস ঘরে ঢুকিলাম এবং লৌহ সিন্ধুকের চাবি খুলিয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইলাম।"

"মনে মনে এই মতলব করিয়াছিলাম যে, দস্যু যে সময়ে টাকা কড়ি সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত থাকিবে, সে সময় তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া হয় নিজে শীঘ্র

ঘর হইতে বাহির হইয়া ক্যাস ঘরটা বন্ধ করিব; আর না হয়, অতর্কিতভাবে তাহার উপর চড়াও হইয়া আমার মাথায় বাঁধা উড়ানিখানা দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিব। যদি তাহার অন্য কোন সহকারী লুকাইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে যাহা হয় উপস্থিত মত ব্যবস্থা করিতে পারিব। আমার অনুমান হয়, আমার এই রকম মনের ভাব আকার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়াই দস্যু জিজ্ঞাসা করিল "কি ভাবিতেছ? মনে যা কিছু মতলব আছে সে সব এখন তুলে রাখ। ঘরের দরজাটা চাবি বন্ধ কর। তোমার হাত পা বাঁধিলাম না বটে, কিন্তু বিশ্বাস নাই।' এই বলিয়া চকিতের মতন তীব্র গন্ধযুক্ত একখানা সাদা রুমাল আমার নাকের কাছে ঢুচারিবার নাড়িল। আর কিছু দেখিতে বা শুনিতে না পাইয়া আমি তৎক্ষণাৎ মুচ্ছিতাবস্থায় ভূতলে পড়িয়া গেলাম। এই ভাবে কতক্ষণ যে সেখানে ছিলাম তাহার কিছুই মনে নাই। তবে এইটুকু মনে পড়ে যে চারিদিকে রুদ্ধ বায়ুশূন্য ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ থাকায় প্রাণটা যেন বাহির হইবার জন্য ধড় ফড় করিতে ছিল। যখন চৈতন্য হইল, তখনও হাত পা কিছুই নাড়িবার যো ছিল না।

৪

খাজাঞ্চী মনোরঞ্জন বাবুর বিবৃত এই বৃত্তান্ত শ্রবণে সহরে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। টাকা চুরির বা খুনের জন্য যত না হউক চোরের চেহারার সঙ্গে ব্যাঙ্কের প্রধান একজন অংশিদার রমানাথ বাবুর খুব সাদৃশ্য লক্ষিত হইল এজন্য সকলে অতীব বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। কেননা, রমানাথ বাবু দীর্ঘকায় ও সবল শরীর অথচ তাঁহার বাম হাতের অর্দ্ধেক ভাগ কাটা। কয় বৎসর অগ্রে এক ঘোড় দৌড়ের বাজিতে বেগগামী অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার বাম হস্তের নিম্নভাগ একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় এবং এই হাত কাটার পর তিন চার মাস হাঁসপাতালে থাকিয়া বহু কষ্টে তিনি আরাম হন। আবার, পূর্ব্ববর্ণিত মৃত দ্বারবানের দুইজন বন্ধু বিষণপাড়ে ও শিউশঙ্কর রাউৎ—একবাক্যে সাক্ষ্য দিল, যে, ঘটনার দিন রাত্রি নয়টার সময় তাহারা ব্যাঙ্কের বাহিরে আসিয়া রমানাথ বাবুকে ঐ রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিয়াছে। তাঁহার গায়ে সবুজ রংয়ের শাল ও কাল বৃহৎ কোট, মাথায় টুপি আর হাতে মোটা রকমের ছড়ি ছিল। রমানাথ বাবুকে সত্যতা সম্বন্ধে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিছুই অস্বীকার করিলেন না। কাজে কাজেই এই সকল কথা পুলিসের কর্ণগোচর হইবামাত্র রমানাথ বাবু তৎক্ষণাৎ কারাগারে বন্ধ হইলেন।

এই চৌর্য্যসম্বলিত খুনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ও খাতাঞ্জী মনোরঞ্জনের মুখে সকল কথা উত্তমরূপে জানিয়া লইয়া আমি স্থির করিলাম, যেরূপে হউক রমানাথ বাবুকে আপতিত বিপদ হইতে রক্ষা করিব। কারণ আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, রমানাথ বাবু নিতান্ত নির্দ্দোষী। যে যা বলে বলুক, বোঝে বুঝুক. দিগন্তব্যাপী কুজ্ঝটীকারাশি ভেদ করিয়া প্রাতঃসূর্য্য যেমন উদিত হন, আপাত কলঙ্করাশি হইতে সত্য সূর্য্যকে উদ্ভাসিত করিয়া আমিও তাঁহাকে সেইরূপ খালাস করিতে পারিব।

৫

পরদিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমধা অন্তে একখানা ঠিকা গাড়ী করিয়া জেলখানায় উপস্থিত হইলাম। আসামী রমানাথ বাবুর নাম করিবা মাত্র জেলার বাবুর ইঙ্গিতে একজন রক্ষী বিনাবাক্যব্যয়ে আমাকে ভিতরে লইয়া গেল। রমানাথ বাবুর কারাগৃহের নিকটে গিয়া দেখি, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, সহরের প্রায় সমস্ত বড় বড় দেশী বিলাতী উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টার প্রভৃতিতে গৃহের সম্মুখভাগ পরিপূর্ণ,—আমি অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। যতটুকু শুনিলাম তাহাতে বুঝিলাম কেহই এই মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে সামান্য মাত্রও আশা ভরসা দিতে পারিলেন না। এইটুকু বুঝিতে পারিয়া আমার মনে আনন্দ বই বিষাদের ভাব অনুমাত্র উদিত হইল না। সকলে চলিয়া গেলে আমি অগ্রসর হইয়া রমানাথ বাবুকে নমস্কার করিলাম। তিনি যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া আমার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন শুনিলেন আমি তাঁহাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছি, তখন অবিশ্বাসের আর বিষাদের হাসি হাসিয়া দুচার কথায় নিজের নৈরাশ্য ও অন্যের হতাশাপূর্ণ যুক্তি পরম্পরা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। আর আমার অপেক্ষা অনেক বহুদর্শী, বিজ্ঞ অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা যে, তাঁহার এই মোকদ্দমায় নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহাও বলিতে ভুলিলেন না। মনোযোগ সহকারে সকল কথা শুনিয়া আমি উত্তর করিলাম, "রমানাথ বাবু, আপনি যে সব যুক্তি ও প্রমাণের কথা বলিলেন. সব সত্য। আপনার বিজ্ঞ প্রাচীন উকীল ব্যারিষ্টারেরা কি এই রকম ভাবের কথা বলেন যে, এই মোকদ্দমায় আপনার স্বাপক্ষে কোন রকম সামান্য আশাও নাই?" রমানাথ বাবুর ধৈর্য্য এবার তাঁহার নম্র প্রকৃতিকে অতিক্রম করিল। তিনি ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন, "আশা! একথা তাঁহাদের কাহারও অভিধানে খুঁজিয়া পান না। তাঁরা খুব চতুর, বুদ্ধিমান, বিদ্বান হইলেও তাঁহাদিগকে সাধারণ মনুষ্যশ্রেণী নিবিষ্ট

দেখিলাম। আমি যে নির্দ্দোষী এটা বুঝিয়াও তাঁহারা এমন কোন উপায় দেখিতেছেন না, যাহার বলে আমাকে খালাস করিতে পারেন। অথচ সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর জানেন আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। হত দ্বারবানকে আমি কত যত্ন করিতাম; মনোরঞ্জনের পদ প্রাপ্তির একমাত্র মূলাধার আমি—আমারই উদ্যোগে—" তাঁহার কথায় বাধা দিয়া আমি উত্তর করিলাম, "আমি সে সব জানি। জানি বলিয়াই—আপনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বুঝিতে পারিয়াই এত সাহসের সহিত আমি একাকে অগ্রসর হইয়াছি। নচেৎ আপনি বা অন্য কেহ তো আমায় এ মোকর্দ্দমায় নিযুক্ত করেন নাই। আপনি তিলমাত্র হতাশ হইবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করিবই করিব। আপনাকে কেবল এই মাত্র কড়ারে আবদ্ধ হইতে হইবে যে, এ মোকর্দ্দমার ভার একমাত্র আমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও দিবেন না। যিনি যত বড় আইনজ্ঞ হউন না কেন, আমি কাহারও সঙ্গে কাজ করিব না।" একটুখানি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া রমানাথ বাবু বলিলেন আপনার সদিচ্ছায় ধন্যবাদ! কিন্তু এত বড় বড় নামজাদা লোকে যে, বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইতেছেন, সে বিষয়ে আপনি কিরূপে কি সূত্রে সফল কাম হইবেন, না বুঝাইয়া বলিলে আমি কিরূপে এরূপ কড়ার করি? আগা গোড়া সমস্ত অবস্থাই যে আমার বিরুদ্ধে, তাতো বুঝিতেছেন।" অনন্যোপায় হইয়া আমি তখন চুপে চুপে তাঁহাকে মোটামুটি গোটাকতক কথায় সব বলিলাম। রমানাথ বাবু হর্ষে লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "যুবা হইলে কি হয়, আমি দেখিতেছি নবীন বাবু আপনিই সকলের অগ্রগণ্য।"

৬

আজ রমানাথ বাবুর মোকর্দ্দমা শুনানির দিন। খুন, ডাকাতি সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া টাকা চুরি, বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগে খাতাঞ্চীকে অচেতন করণ প্রভৃতি নানা বিষয়ের অভিযোগে তিনি আজ আদালতে আসামীরূপে দণ্ডায়মান। "পিনাল কোড" নামক বিচারালয়ের অমোঘ আইনের প্রধান প্রধান ধারায় তিনি অভিযুক্ত;—সুতরাং মুক্তি তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। প্রথমত নিম্ন আদালতের বিচার শেষ হইয়াছে। জজ সাহেবের বিচারে তিনি কি দণ্ড পান, এইটি দেখার অপেক্ষামাত্র। রীতিমত সেসন খোলা হইলে আমার বিশেষ অনুরোধে, গবর্ণমেণ্টের সম্মতি মতে, জজ সাহেব সেসনের অন্য সকল মোকর্দ্দমা ফেলিয়া রাখিয়া অগ্রে রমানাথ বাবুর মোকর্দ্দমা শেষ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য নিম্ন আদলতে রমানাথ বাবুর পক্ষ সমর্থন আমি আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।

বেলা ১১টার সময় আমি যখন আদলত গৃহে প্রবেশ করিলাম, উপস্থিত দর্শক সকলেই যে, আমার দিকে চাহিলেন, অঙ্গুলি সঞ্চালনে বা মাথা নাড়িয়া যে আমায় বিদ্রূপ করিলেন, আমি যেন সেটা দেখিয়াও দেখিলাম না। মোকর্দ্দমার ডাক হইবা মাত্র সরকারী উকীল দীনবন্ধু বাবু বিচারক, জুরি, দর্শক প্রভৃতি সকলকে মোকর্দ্দমার অবস্থা সবিশেষ বুঝাইয়া দিলেন। প্রথমেই সরকার পক্ষ হইতে মানিত দুইজন সাক্ষীর তলপ ও সাক্ষ্য গৃহীত হইল। সে দুইজন আর কেউ নহে—বিষণ পাড়ে আর শিউশঙ্কর রাউৎ, যাহারা ঘটনার দিন রাত্রি নয় ঘটিকার সময় রমানাথ বাবুকে ব্যাঙ্কের পাশের গলি দিয়া যাইতে ও একবার ফটকের কাছে দাঁড়াইতে দেখিয়া ছিল। তৃতীয় সাক্ষী, ব্যাঙ্কের অন্য একজন প্রধান অংশিদার গোবিনচাঁদ বাবু। ইঁহাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইল যে, রমানাথ বাবু ধনী হইলেও ঐ সময়ে কয়েক সহস্র মুদ্রার জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন; হাতে নগদ টাকা না থাকায় ব্যাঙ্ক হইতে অধিক সুদে টাকাকর্জ্জ লইতে প্রস্তুত ছিলেন। এমন কি ঘটনার দিন অপরাহ্নে ব্যাঙ্কের খাতায় কত টাকা মজুত সে সংবাদ লইতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি একজন অংশিদার, সুতরাং এ সংবাদ জানার অধিকার তাঁহার ছিল বলিয়া কেহই সে সম্বন্ধে কোন আপত্তি বা সন্দেহ করে নাই। চতুর্থ সাক্ষী, রমানাথ বাবুর নিজের কর্ম্মচারী প্রমথনাথ, ইনি বাবুর স্বাক্ষরিত একখানা পত্র দেখাইলেন। উহা ঘটনার পূর্ব্ব দিনে লিখিত। এই পত্রে বাবু নিজের একজন মহাজনের নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, যেরূপে হউক, তিন দিনের মধ্যে তাঁহার মহাজনেরা প্রাপ্ত সমস্ত টাকা সুদে আসলে চুকাইয়া পাইবেন। ঐ সময়ে রমানাথ বাবুর তহবিলে যে, সামান্য কয়শত টাকা মাত্র মজুত ছিল, খাতাপত্র আনিয়া তাহাও প্রমথনাথকে আদালতে দেখাইতে হইল। সর্ব্বশেষে প্রধান সাক্ষী মনোরঞ্জন বাবু আগে নিম্ন আদালতে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, এখনও তাহাই আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। বাড়ার ভাগ আদালতের হুকুমে আসামীর দিকে উত্তমরূপে দেখিয়া শপথ করিয়া বলিলেন যে, রমানাথ বাবুর চেহারা অবিকল সেই দস্যুটার মতন; তবে উপরে মুখস থাকায় ঠিক মুখখানার কথা তিনি বলিতে পারেন না। রমানাথ বাবুর মতন চোরেরও বাম হাতের নিম্নার্দ্ধ কাটা, গায়ের জামাও তদনুরূপ প্রস্তুত। নিম্ন আদালতের দরুণ অন্যান্য দুএকটা সামান্য সাক্ষী থাকিলেও অনা-

বশুক বোধে আর তাহাদিগকে ডাকা হইল না। যতদূর সাক্ষ্য গৃহীত হইল, তাহাই যথেষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত সকলেরই ধ্রুব ধারণা জন্মিল। অতএব সকলেই জজ সাহেবের শেষ হুকুম শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলেন। বাকী থাকিল আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থন।

৭

মাধ্যাহ্নিক জল যোগান্তে জজ সাহেব এজলাসে বসিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সরকার পক্ষের সকল কথাই অবশ্য আপনি শুনিয়াছেন। আপনার সাফাই বা সাক্ষী কে কে?" আমি বলিলাম, "হুজুর আমার মক্কেল নির্দ্দোষ। ইহা প্রমাণ করার জন্য কোন সাফাই সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। সরকার পক্ষীয় একজনের সাক্ষ্যই সকল কথা খণ্ডিত ও নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হইবে।" এই বলিয়া আমি খাতাঞ্জী মনোরঞ্জন বাবুকে সাক্ষ্যস্থলে দাঁড় করাইলাম। সাক্ষীরূপে তাঁহার নাম ডাক হইবামাত্র আদালতে একটা উচ্চহাস্যের টিটকারি শব্দ উত্থিত হইল। গম্ভীর প্রকৃতি বিচারক পর্য্যন্ত মৃদুহাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যে খাতাঞ্জী ঘণ্টা দুই আগে আসামীকে অকাট্যরূপে খুনী ও চোর প্রমাণিত করিয়াছেন, তিনি নিজে তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য সাক্ষীরূপে আহূত হইয়া যেরূপ বিস্মিত ও স্তম্ভীত হইলেন, বোধ হয়, সেস্থলে অন্য কেহ সেরূপ হন নাই। যেন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ হতভম্ব হইয়া তিনি সাক্ষীস্থলে দাঁড়াইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার তো খুব ঠিক মনে পড়ে যে, হত্যাকারী নিজের ডান হাতে পিস্তল ধরিয়াছিল?"

খাতাঞ্জী। আমার বিশেষ মনে আছে, এ বিষয়ে কোনরূপ সামান্য সন্দেহও নাই।

আমি। কিন্তু বাম হাতে পিস্তল ধরিয়া ভয় দেখাইয়াছিল, এটাও তো হইতে পারে?

খাতাঞ্জী। না তা হইতে পারে না। কেননা, সে লোকটার বামহাতের নিম্নার্দ্ধভাগ ছিল না।

আমি। বেশ, তা যেন হ'লো,—কিন্তু কোন্ হাতটা দেখিয়াছেন এ সম্বন্ধে আপনার ভ্রমও তো সম্ভব?

খাতাঞ্জী। না মহাশয়, তা নয়। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, লোকটা তাহার দক্ষিণ হস্তে পিস্তল উঠাইয়া ভয় দেখাইয়াছিল,—আর তার বাম হাত কাটা।

এই সব প্রশ্ন উত্তর শুনিয়া আদালতের সকলেই ভাবিলেন যে, আসামীকে রক্ষা করার অন্য কোন রকম পন্থা না দেখিতে পাইয়া আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। এজন্য মাতব্বর সাক্ষীকে যে কোন রকমে হউক, হটাইবার জন্য উকীলী ফন্দীতে আমি এটা ওটা সেটা নানান্ বাজে কথা আনিতেছি। অধিক কি, আদালতের সময় অনর্থক নষ্ট করার জন্য বিচারক পর্য্যন্ত যেন একটু অসন্তুষ্ট হইলেন, ভাবে এরূপ বোধও হইতে লাগিল। আর বিলম্ব উচিত নয় বুঝিয়া আমি পার্শ্বস্থ আমার সহকারীকে চুপি চুপি দুচারটা কথা বলিলাম। তিনি তৎ-ক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া বস্ত্রাবৃত একটা জিনিষ আনিয়া সাক্ষীর সম্মুখে রাখিলেন। সেই বস্ত্রাবৃত বস্তু তখনই উন্মুক্ত না করিয়া খাতাঞ্চীকে বলিলাম, "মনোরঞ্জন বাবু, আপ-নাকে এই একটী অনুরোধ করিব যে, যতক্ষণ আপনাকে না বলি, ততক্ষণ আপনি ঘাড় না ফিরাইয়া এই বস্ত্রখানার দিকে চাহিয়া থাকুন।" মনোরঞ্জন বাবু তাহাই করিলেন।

এই সময় আমার ইঙ্গিতে পূর্ব্ব শিক্ষামত রমানাথ বাবু আসামীর কাটগড়া হইতে নামিয়া বিচারকের সম্মুখে টেবিলের উপর রক্ষিত একটী মুখোস পরিলেন এবং তাঁহার একমাত্র সম্বল দক্ষিণ হস্তে পিস্তল লইয়া খাতাঞ্চীর ঠিক পশ্চাৎভাগে দাঁড়াইয়া পিস্তলটা সাক্ষীর মস্তকের উপর এমনভাবে ধরিলেন, যেন তখনই গুলি করিবেন। ঠিক এই সময় আমি খাতাঞ্চীর সম্মুখস্থিত দর্পণের আবরণবস্ত্র উঠাইয়া লইলাম। পূর্ব্বের ঘটনা আবার অবিকল অনুকৃত হইতে দেখিয়া খাতাঞ্চী চমকিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া বসাইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, "মনোরঞ্জন বাবু, এখন বলুন দেখি, এই চেহারা সেদিন-কার দস্যুর আকৃতির মতন কিনা?"

খাতাঞ্চী। (ভয় চকিতস্বরে) অঁ্যা—হাঁ—ঠিক—ঠিক—ঠিক সেই রকম। এইতো সেই বটে—তাই তো—

আমি। আপনি কোন ভয় করিবেন না। খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করুণ ও বলুন কোন প্রভেদ আছে কিনা?

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া খাতাঞ্চী বলিলেন, "হাঁ প্রভেদ আছে। এখন সেটা বেশ বুঝিতেছি। প্রভেদ বড় বেশী নয়; শুধু এইমাত্র যে, দস্যু সেদিন রাত্রে দক্ষিণ হস্তে পিস্তল ধরিয়া ছিল, আর আজিকার এই মূর্ত্তি নিজের বাম হাতে ধরিয়াছে—"

এই কথায় আদালতে একটা মৃদু মর্ম্মরধ্বনি উঠিল। হস্ত সঞ্চালনে তাহা নিবারণ করিয়া আমি বলিলাম, "আচ্ছা, তবে কি আপনার এমন বোধ হয় এখন যে ব্যক্তি আপনার মাথার উপর পিস্তল ধরিয়াছে, যাহার ছবি সম্মুখস্থ দর্পণে সুস্পষ্ট দেখিতেছেন, এই ব্যক্তিই ঘটনার রাত্রে ব্যাঙ্কে আপনার মাথার উপর এই রকম ভাবে পিস্তল ধরিয়াছিল ?"

খাতাঞ্চী। না, আমার এখন বেশ বোধ হইতেছে যে, সে রাত্রের লোক আর আজিকার ইনি একই নন। কারণ এর দক্ষিণ হস্তের অর্দ্ধেক নাই, সুতরাং বামহস্তে পিস্তল ধরিয়াছেন, কিন্তু ব্যাঙ্কে সেদিন সে লোকটা নিজের ডান হাতে পিস্তল ধরিয়াছিল, একথা আমি নিশ্চিত জানিয়া আগাগোড়া বলিয়া আসিতেছি।

আমি। আচ্ছা বেশ। তবে আপনি এখন একটু ফিরিয়া দেখুন দেখি, এ লোকটা কে এবং ইনিই সেই হত্যাকারী দস্যু কিনা ?

খাতাঞ্চী ঘাড় ফিরাইয়া যেই দেখিলেন যে, রমানাথ বাবুই মুখস খুলিয়া নিজের দক্ষিণ হস্তে পিস্তল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন অমনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "তাইত একি অদ্ভুত কাণ্ড ! এখন এ যে ঠিক বিপরীত দেখিতেছি ? কিন্তু ইহা প্রকৃত পক্ষে ঠিকই ঘটনা। কেননা দর্পণে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা বিপরীত ভাবেই চক্ষুতে লক্ষিত হয় বটে। কি আশ্চয্য, এই সামান্য কথাটা আমার মনে এতদিন কিছুতেই উদয় হয় নাই।

খাতাঞ্চীকে আর বেশী বলিতে হইল না। জয় জয় রবে, আমার সুখ্যাতিতে আদালত ঘর যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যাঁহারা একটু পূর্ব্বে আমাকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে ও করুণ দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই কেহ আমার কর মর্দ্দনা, কেহ সুখ্যাতি ঘোষণা, কেহ স্বদেশী ধরণে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। গম্ভীর প্রকৃতি বিচারক জুরিগণকে সম্বোধন করিয়া এবং তাঁহাদের সম্মতি লইয়া আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া তৎক্ষণাৎ খালাস দিলেন এবং কেবল মাত্র আমার বুদ্ধি কৌশলে ও প্রত্যুৎপন্ন মতিতে রমানাথ বাবু যে এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন ইহা উল্লেখ করিয়া আমাদের দুজনকেই গৌরবান্বিত করিলেন।

এই ঘটনার পর হইতেই সহরে আমি অদ্বিতীয় উকীলরূপে গণ্য হইলাম এবং আমার পসার রীতিমত জমিয়া গেল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু।

আলোকে ও আঁধারে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

কৃষ্ণলালের বসিবার গৃহ।

ফরাসে গড়গড়াসহ কৃষ্ণলাল আসীন।

গান।

(রাম প্রসাদী সুর)

হায়রে কাল মন্দ কিসে ?
(একটু) হিসেব করে দ্যাখ সবাই,
কালই ভাল বলবে শেষে।
মহেশ্বর ত গউর বরণ
বুকে দেখ কালীর চরণ,
(আবার) সোনার বরণ লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ
বিষ্ণুর চরণ টিপছেন ব'সে।
নন্দ ঘোষের কাল ছেলে,
মজাল সে গোপী কুলে,
যমুনার সেই কাল জলে
কুলমান সব গেল ভেসে।
রাধা একবার বলেছিল,
হেরবে নাকো চোকে কাল,
সে মান শ্রীমতীর কোথা রইল
কালতেই ত মজালো শেষে।
কাল জলে পদ্ম ফোটে,
কাল ভোমরাই মধু লোটে,

(আবার) কাল কোকিল কুহুতানে
মাতায় যে প্রাণ নবীন রসে।
কাল চুলে শোভে নারী,
সাদা চুলে হয় সে বুড়ী,
(দেখ) দোজব'রে সব রসের বুড়ো
সাদা মাথায় কলপ ঘসে।
কাল পাঁঠার মাংস ভাল,
দুধ ভাল গাই হ'লে কাল,
(আবার) বাবুরা সব মিহি ধুতির
পাড়টি কালই ভালবাসে।
দেখ্‌তে কাল জুতোই ভালো,
গায়ে ভাল কোটটি কাল,
(আবার) ধুতি চাদর কাল হ'লেই
ঘুচ্‌ত ধোপার দুঃখু দেশে।
ভাল লেখার কাল মসী
আমরা যে তা কালই বেশী
(আবার) মরি কাল মুখের হাসি
দাঁত বেরুলে কি শোভা সে।
মুখে কাল নয়ন ভাল
সে নয়নের কাজল কাল,
(আবার) কাল গোঁপ আর দাড়ী বিনে
পোড়া চোপা হয় পুরুষে।
ঘর বাহিরের যতই জ্বালা
করবো না ভাই ঝালা পালা
কাল হুঁকোয় মুখটি দিলেই
ভুলবে সবই রসাবেশে
কাল যদি ভালই হ'লো,
যত কাল ততই ভাল,
(তবে) প্রেয়সী মোর সবসে ভাল,
দুটো মুখ নাড়া কই দিক্‌না এসে?

(বগলার প্রবেশ)

বগ—আ মরণ ! এম্‌নি করে ব'সে আমার ব্যাখ্যানা হচ্চে ! আমি কি এম্‌নিই কাল ? আমার চাইতে কাল কি আর নেই ?

কৃষ্ণ—থাক্‌বে না কেন ? তোমার মাথার চুলই র'য়েছে,—তাও যেন দেখা যায় যায় ঠেকে।

বগ—পোড়া কপাল আর কি ! না হয় কালই আছি। তাই বলে অত ঠাট্টা কেন ! নিজের সোয়ামী,—তার মুখেই এই ব্যাখ্যানা। ছি ! ছি ! এর চেয়ে আমি মলুম না কেন ? পোড়া যমও আমায় ভুলে রয়েছে।

কৃষ্ণ—কালিন্দীর খাতিরে। পাছে কাল জলে তাকেও কেউ ছাপিয়ে ওঠে।

বগ—বলি কাল ব'লে যদি এতই ঘেন্না, তবে বিয়ে করেছিলে কেন ? আমি ত আর সেধে এসে পায় গড়িয়ে পড়িনি !

কৃষ্ণ—হায় হায় ! বে কি আর আমি করে ছিলুম ? আমরা ত আর হাল ফ্যাসানের নই, যে বেছে বাজিয়ে নিয়ে বে করব ? বাপ মা যা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন, ফেল্‌বার ত যো নেই, ব'য়ে নিয়েই বেড়াতে হ'চ্চে।

বগ—তা বই কি ! আমি এখন ভার বোঝা। তা এমন ভার বোঝাই যদি হ'য়ে থাকি, ফেলে দিয়ে, হাল ফ্যাসান ধ'রে, নতুন একটা সুন্দর বৌ কেন বে কর না ?

কৃষ্ণ—আঃ। এখন কি আর নতুন ক'রে জীবন পাতা যায় ! তোমার কালরূপেই যে মন ব'সে গ্যাছে। আর চটই বা কেন ? আমিত কাল রূপের সুখ্যাতই কচ্চিলুম।

বগ—কাল কাল কাল ! কাল যেন আর কেউ নেই ! আর যে হালে রেখেছ, এতে সুন্দর মানুষও কাল হ'য়ে যায়। সংসারে পা দিয়ে অবধি কেবল হেঁসেলেই হাঁড়ী ঠেল্‌ছি। সোনার বরণ হ'লেও এত দিন পুড়ে পুড়ে ছুটে হয়ে যেত।

কৃষ্ণ—(সুরে)

আহা প্রিয়ার আমার সোনার বরণ
কালী হ'ল, হায় হেঁসেলে।
এবার রাঁধবে বামুন, মাখবে সাবান,
যদি আবার রঙটা ফলে।

বগ—নেও আর ঠাট্টায় কাজ নেই। সত্যি যদি রাঁধতে না হ'ত, আর সাবান মেখে সেজে গুজে বিবিটি হ'য়ে ব'সে থাকতুম, তবে আর এত কাল বলতে হ'ত

না। ও বাড়ীর দিদিই বা কি এমন রূপসী, তবে ভাসুর ঠাকুরের সঙ্গে বিদেশে থাকে, বামুনে রাঁধে, কাজকর্ম্ম এমন কিছু কত্তে হয় না,—কাজেই ওই এক রকম দেখা যায়। অমনি আরামে কটা মাস থাকতে দেও,—দেখবে আমিও এমন কাল আর থাকব না।

কৃষ্ণ—তবে দেখছি আমারও বিদেশে চাকরী নিতে হ'ল। একটা পেয়েছিও,—ভাবছিলুম নিই কি না নিই। তা দেখছি নিতেই হল।

বগ—কোথায় আবার তোমার চাকরী হ'ল? লেখাপড়া শিখেছিলে,—চাকরী যদি কত্তে, তবে দিব্যি এদ্দিন সুখে আরামে আর পাঁচজনের মত থাকতে পাত্তে না? তা নয়, কেবল বাড়ীতে ব'সে নারকেল, কলা, সুপুরী, আম, কাঁটাল ধান, কলাই এই সব নিয়েই আছ। এত যে লেখা পড়া,-- তাও সব মাটি কল্লে। আর আমারও খেটে খেটে হাড় কালী হল।

কৃষ্ণ—হাড়ও কালী! তাই বল! আমি বলি সুধু চামড়া এত কাল কি ক'রে হল?

বগ—নেও আর ঠাট্টায় কাজ নেই। বলি চাকরীটা কোথায় হল?

কৃষ্ণ—সে অনেক দূরে। জলপাইগুড়ির উত্তরে পাহাড়জঙ্গলের দেশে। খুব শীত সেখানে। জ্বরজারিও খুব হয়।

বগ—তা আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে ত?

কৃষ্ণ—ও বাবা! অমন জায়গায় কি আর তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়? গোষ্ঠী সুদ্ধ একেবারে ম্যালেরিয়ায় মারা পড়বে? নিজে কোনও মতে কুইনাইন টাইন খেয়ে কাটিয়ে আসতে পাল্লে বাঁচি। আর শরীরটাও ত নেহাৎ রোগা নয়। জ্বরে আর কত কাবু করবে?

বগ—ওমা, তবে এমন চাকরীতে কাজ নেই! এই আমরা বেশ আছি।

কৃষ্ণ—নাগো না, ভয় নেই। একটা বছর মোটে সেখানে থাকতে হবে। তারপরেই কলকেতায় এসে বসব। তখন তোমাদের নেব।

বগ—একটা বছর একা সেখানে থাকতে হবে?

কৃষ্ণ—হাঁ তা ত হবেই। কি করি বল?

বগ—তবে ও চাকরী নিও না। কি এমন দুঃখে পড়েছ যে অমন যায়গায় একা গে চাকরী না কল্লেই নয়!

কৃষ্ণ—ওগো তুমি বুঝছ না; একটা বছর কোনও মতে কাটিয়ে দিতে

পাল্লেই যে একেবারে কল্‌কাতায় থকবে। খাস কলের জল, ড্রেনের পাইখানা—আহা!

বগ—ও মাগো, আমার কল্‌কাতায় কাজ নেই। একটা বছর প্রাণটা থাকলে ত। ও ছেড়ে দেও গে।

কৃষ্ণ—যাইগে না? কি হবে? একটা বছর কি আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে না? গিন্নী বান্নী হয়ে উঠলে,—এখন আর অত কেন!

বগ—আ মরণ! যেন তোমার জন্যেই আমি মচ্চি। দশ বছর তুমি গিয়ে কোন ভাল যায়গায় থাক না,—আমি মরে যাব না।

কৃষ্ণ—আচ্ছা তবে না হয়—কাশীবাসে যাই।

বগ—আবার রঙ্গ দেখ! যেন কাশীবাসেরই বয়েস হয়ে গ্যাছে। তা বাস টাস যখন সময় হয়, হবে,—চলনা কাশী-গয়াই করে আসিগে? তীর্থও ত কিছু হয়নি। কল্‌কাতা বেশী দূরে নয়,—কালী-গঙ্গাদর্শনও এ পর্য্যন্ত হল না।

কৃষ্ণ—সঙ্গে গেলে আর হ'ল কি? তুমি বল্লে না যে দশবছরও আমায় না দেখলে তুমি মরবে না। তাই না মনের খেদে কাশীবাসী হতে চাইলুম।

বগ—স্যাও, আর অতয় কাজ নেই। কাশী-গয়া না হয় এখন থাক। একবার কল্‌কাতায় কেন নিয়ে চল না? গঙ্গাস্নানও হবে, মার দর্শনও হবে। আর তোমার মামীও ছেলে দেখা দেখা করে ভারি অস্থির হ'য়েছেন, একবার দেখে আসবেন।

কৃষ্ণ—মামীও যেমন—সে মূর্ত্তি দেখলে চক্ষু জুড়াবে আর কি? অমন গেঁয়ে বুড়ি মাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেবে কি না?

বগ—ও মা, তা একবার গিয়ে উঠলে কি আর গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে? তাও কি হয়? সেখানে থাকতে দিক না দিক, দেখে ত একবার আসবেন? আহা মার প্রাণ—কত দিন দেখেনি,—একবার কি দেখতেও ইচ্ছে হবে না?

কৃষ্ণ—তা এখন কি করে হয় বল? চাকরীতে যে আজ কালই যেতে হবে। বছর খানেক পরেই ত কল্‌কাতায় আবার আসব। তখন যাবে।

বগ—আবার চাকরী। যদি যাও, আমি তক্ষুনি তোমার ঘর সংসার সব চুলোয় দিয়ে—বাপের বাড়ী চলে যাব।

কৃষ্ণ—তবে এইখানেই একটা বামুন রাখি!

বগ—নাগো, আর বামুন টামুনে কাজ নেই। কেন আমরা কি রাঁধতে জানিনে। বামুন যা রাঁধে—রামঃ! ও বাড়ীর দিদি সেদিন নেমন্তন্ন করেছিল, কোনও ছাই যদি মুখে দেওয়া গেল। দিদিরই বা কি আক্কেল। বসেইত আছ,—ভদ্দরলোক খেটেপিটে রোজগার করে এনে দিচ্চে, ঘরে বসে দুটি রেঁধেই না হয় দেও! এই খাটুনী, তার উপর এই ছাই খেয়ে কি আর প্রাণটা বাঁচে! সে দিন বলছিলুম,—তা বলে, অ-সু-খ,—পারিনে। আহা! কি অসুখ গো? বসে বসে খাচ্চেন, মোটা হচ্চেন, আর চেকনাই বেরুচ্ছে—আর বলেন কিনা অ-সু-খ,—পা-রি—নে!

কৃষ্ণ—বামুন তবে রাখব না?

বগ—নাগো, না। এতকাল রেঁধেছি এখন আর পারব না?

কৃষ্ণ—তবে রংটা ফলাবার কি হবে!

বগ—ন্যাও, আর রঙে কাজ নেই। আমার যা রঙ আছে সেই ভাল। রঙ ধুয়ে ত আর জল খাব না!

কৃষ্ণ—তোমরা না খাও,—আমাদের প্রাণটা যে রঙের জন্য একটু খাই খাই করে।

বগ—খাই খাই করে পিটুলির জলে গা ধুয়ে দেব,—তাই খেও। সেটা ও আর নেহাৎ অখাদ্যি নয়! যাক, তবে চাকরী ছেড়ে দেবে ত!

কৃষ্ণ—তা, কাজেই।

বগ—কল্‌কাতায় নিয়ে যাবে? গঙ্গাস্নান করাবে! মাকে দর্শন করাবে!

কৃষ্ণ—আচ্ছা।

বগ—তবে একটা ভাল দিন টিন দেখ। সদু দিদিদের বাড়ীতে উঠব। সিধুবাবুকে একটা চিঠি লিখে দাও। শেষে বেশী দেরী হয়, আলাদা একটা বাসা ভাড়া করা যাবে। ভাল কথা, ভানুরঝিকেও সঙ্গে নিয়ে যাব কিন্তু।

কৃষ্ণ—আচ্ছা বেশ।

বগ—সবাই ত যাচ্ছি,—ধরে পাক্‌ড়ে এবার মনুকে স্থিতি করিয়ে দেবে। না হয়, তাদের দলের মধ্যেই একটা ভাল মেয়ে দেখে তার সঙ্গেই বিয়ে দিও। সদু দিদির মেয়ে যে রমা আছে,—বড় বেশ মেয়ে। গেল বছর বাপের বাড়ী যখন যাই, সদু দিদিও এসেছিল। লেখাপড়া শিখেও মেয়েটার মাথা বিগড়োয়নি। আমাদের ঘরের সব মেয়ের মতই লক্ষ্মী।

কৃষ্ণ—আচ্ছা দেখা যাবে। তাইত—তাইত—তাইত! সাধে কি কালশশী তোমায় এত ভালবাসি? চাকরী ক'ত্তেও বিদেশে যেতে দিতে চাও না, পাছে চোকের আড়াল হই। শরীর কালী ক'রে রেঁধে দিচ্ছ। রান্নার দোষ দেখিয়ে একটা বামুন পর্য্যন্ত রাখতে দিতে চাও না। মনের খেদে কাশীবাসী হ'তে চাইলুম, অম্‌নি তীর্থের ছলে সঙ্গিনী হতে চাইলে। সাধে কি এত ভালবাসি, কালশশী তোমায়?

গান।

সাধে এত ভালবাসি?
ওলো কালশশী, প্রেয়সী মোর!
তোরে সাধে এত ভালবাসি?
(আমার) সাধা চাকরী ছাড়িয়ে দিলি
(পাছে) চোখের আড়াল হই,
(আবার) তীর্থে যাওয়ার ছল উঠালি
(যখন) হ'তে চাইলুম কাশীবাসী!
রেঁধে হ'ল বরণ কাল
আমি বামুন রাখ্‌তে চাই,
(ছলে) তাও দিলিনে পাছে আপন
ঘরে বসে হই প্রবাসী।

[বগলার প্রস্থানোদ্যম ও পুনঃ পুনঃ পলায়নের চেষ্টা—কৃষ্ণলাল বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিয়া গান করিতে লাগিলেন। বগলা অগত্যা কৃষ্ণলালের মুখ চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে বলপূর্ব্বক হাত ছাড়াইয়া নিয়া প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণলাল তাকে আবার ধরিতে পশ্চাতে ছুটিলেন।]

(মনুর প্রবেশ)

মনু—আরে বাঃ—বাঃ! দাদা দিদিতে ত মজাটা বেশ হ'চ্চে! এযে খাসা রগড়! দাদা ত বেড়ে রসিক! তা দুটিতে আছে বেশ। বে থা ক'রে একটি বউ ঘরে এলে—জীবনটা কি এমনই রসে ভরপুর হয়েই থাকে? তাইত, তাইত! বাইরের যত রাজ্যের বাজে কাজে কি শুক্‌নো শুক্‌নোই দিন গুলো কাটিয়ে

দিচ্ছি গো! তা এখন যাওয়া যাক্, দাদার এখন ভরপুর নেশা—ভেঙ্গে কাজ নেই। এর পর যখন হয় দেখা করা যাবে।

[প্রস্থান

২য় দৃশ্য।

নির্জ্জন নদী-তীর।

(মনুর প্রবেশ)

মনু—(স্বগত) তাইত! তাইত! তাইত! দাদা দিদিতে বেশ মজায় আছে বটে—বে থা হ'লে বউ একটা ঘরে এলে, দিন গুলো বেশ একটা রসে—বেড়ে মজায়—কেটে যায় বটে! হায়, হায়! আর আমি হতভাগা—বয়সও কম হয় নি—শুধু একটা নীরস বোঝা ব'য়েই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি,—যেন বাড়ী ফেলে বাসায় বামুনের রাঁধা খেয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছি, যেন ঘর ফেলে সারাটী রাত বাইরে ব'সে মশা তাড়াচ্ছি।

গান।

বিয়েটা মন্দ নয় ত, দিন গুলো যায় বেড়ে মজায়!
বিয়ে ছাড়া জীবন যেন বাসার বামুন রেধে খাওয়ায়।
একটু বয়েস টয়েস হ'লে পরে,
বউটি যদি থাক্‌লো ঘরে,—
(তবেই) ভরা ঘরে ভরা প্রাণটা শুড়ে যেন মাছি লোটায়।
বউ ছাড়া সে ঘরটী কেমন,
যেন রোদে ঘুরে রোদে জিরোন,
(যেন) কোনও মতে গলায় ঢালা রোদে তাতা জল পিপাসায়।
বিয়েটা যার হ'য়ে গ্যাছে,
ঘরে সে বেশ শুয়ে আছে,
(আর) যে শালার জোটেনি সে বাইরে বসে মশা তাড়ায়!
(বুঝি) বউ নেই তাই জীবনটাতে,
পাচ্ছি না ছাই আরাম মোটে,
(যেন) লেপ্‌টি বিনে শুয়ে আছি শীতের ঠাণ্ডা বিছানায়!

(কৃষ্ণলালের প্রবেশ)

কৃষ্ণ—কিরে মনু? কি গাচ্ছিস?

মনু—এই যে দাদা! তা দাদা মনে কত কথাই উঠে! আর একা একা মনের কথা গানেই বেরোয় ভাল।

কৃষ্ণ—তা বে থা কর না? কত কাল আর ঘর ছেড়ে বাইরে ব'সে মশা তাড়াবি। কত কাল আর লেপ বিনে শীতের বিছানায় বে-আরামে গুড়িশুড়ি দিয়ে থাকৃবি?

মনু—কথা গুলো তবে দাদা, কাণে গ্যাছেই। তা বে টা করি করি ভেবেও যে হয়ে উঠছে না, দাদা?

কৃষ্ণ—কেন রে?

মনু—আমি যে ভবতারণের চরণ তলে প্রাণনাথের শরণ নিয়েছি, প্রাণাখাঁর খাতায় নাম লিখেছি, বাল্যবিবাহের ফাঁস কি আর গলায় পরতে পারি, দাদা?

কৃষ্ণ—দূর হতভাগা! বলে কি? এখনও কি তোর বাল্য কাল বসে রয়েছে?

মনু—সত্যি দাদা—যৌবনে তবে পা দিইছি!

কৃষ্ণ—পা দিইছিস্ কিরে? পেরিয়ে চল্লি যে?

মনু—বটে! যৌবন পেরিয়ে চল্লুম! কই, কেউ ত আমায় এটা মনে ক দেয় নি?

কৃষ্ণ—ওরে গাধা! যৌবন এলে কি আর কাউকে তা মনে করে দিতে যখন আসে, তার পুলকে প্রাণটা আপনিই যে নেচে উঠে।

মনু—এই ত—দাদা—বড় ভুল কল্লে। নাচে ছেলে পিলেরাই ন্দ নয়। বরং ভারিক্কিই হয়। প্রাণটা দাদা বড় বেশী নাচে,—তাই ত ভাবি তের ঠাণ্ডা কেঁচে আবার ছেলে মানুষই বুঝি হচ্ছি।

কৃষ্ণ—হচ্চিস যে তা এক রকম ঠিক। তুই বুড়ো কখনও হবি? তে হয়—কি বছরেও এম্নি ঠিক খোকাটি থাকবি।

মনু—আশী বছরে ত সবাই খোকা, দাদা? শাস্ত্রেও আ র্ষের চেষ্টা দেখ। নিত্যশঃ বালে বুদ্ধে বিশেষতঃ,' কথায়ও লোকে বলে, আবাল বৃ ক মেয়ের বাপ না বাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই সমান। তবে একটু ভুল বোধ হয় শুনতে পাই বনিতা—বালাও নয়, বৃদ্ধাও নয়, নিত্যই যুবতী য আমাদের গোছতা

কৃষ্ণ—ওরে শোন, আর মিছে বকাসনি। তে আরসিতে কখনও মুখ খানা দেখিসনি?

মনু—তা দেখি বই কি দাদা? কেই বা না দেখে? আরসির টানে চোক না টানে, এমন যোগী ঋষি সন্ন্যাসীও বোধ হয় নেই; তারাও আরসি ধ'রেই মুখে ছাই মাখে। তা দাদা, দেখি বই কি। সকলের আগে মস্ত এক জোড়া গোঁফই চোখে পড়ে। দেখি আর ভাবি,—এই কি আমি সেই মনু—স্যাংটা ছেলে মার কোলে খেলা কত্তুম,—মাঠে মাঠে গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াতুম।

কৃষ্ণ—সবাই, সেই মণু এই হয়ে থাকে। সেই মনু যদি আর দেখতে চাস ত, বে কর। দলে দলে আবার কত ন্যাংটা মনু এসে মার কোলে খেলা করবে, শেষে বাঁদরের মত গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াবে।

মনু—আমাদের যে বাল্য বিবাহ নিষেধ, দাদা।

কৃষ্ণ—এই দ্যাখ! আবার কি বলে, ওরে গাধা। তুই আর এখন কচি খোকাটি নস। বে কল্লে কতটি এমন খোকা তোরই হ'ত।

মনু—দাদা তুমি এত বুদ্ধি রাখ,—আর আজ তোমাকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে? বাল্য কেবল বয়সেই হয় না। বয়স যতই হোক না, বালকের মত শক্তি হীন যে, তাকেই বালক বলে ধরে নিতে হবে। তারপর আমাদের নিয়ম হচ্চে বাল্যে বিবাহ করবে না, আর অর্থ উপার্জ্জন না কত্তে পাল্লেও বিবাহ করবে '। জ্যামিতি ত পড়েছ দাদা,—তাতে আছে, 'যে সব বস্তু এক বস্তুর সমান, । পরস্পর সমান।' বালক বিবাহের অযোগ্য। উপার্জ্জনে অক্ষম যে, সেও র অযোগ্য। অতএব উপার্জ্জনে অক্ষম যে সেও বালক!

—তা উপার্জ্জন কর না কেন? ক বছর হল বি, এ, পাশ করেছিস, তা (তজ কাজেই ঘুরে বেড়াচ্চিস।

াজ কি আর কিছু বাজে হয়, দাদা? যেটা কাজ, সেটা বাজে নয়। যাতে হল না, তাই যদি বাজে হয়, তবে এ দুনিয়াটা দাদা, বাজেতেই (যেন) ে আর কি যে কাজের, কি যে বাজে, তা ঠিক হিসেব করে ও ত বড় দেখতে পাইনে দাদা? তুমি ভাবছ, সবাই ক্ষেত ভরে জন্মাক, বাগান ভরে আম কাঁঠাল ফলাক—পুকুর ভরে সবার (আর) যে শই বাছুরে সবার গোয়াল ভরে উঠুক - যত পারে সবাই থাক (বুদ্ধিয় পুরিয়ে চাঁদ পানা করে ওঠাক—আর যা বেশী হয়, বেচে । খুব কাজের কাজ হবে। আবার একজন সাধু সন্ন্যাসী (যেন) লেপ্‌টি কিন মায়া কাঞ্চন, কায়া ত রবে না!'

কৃষ্ণ—তা তুইত আর সন্ন্যাসী হ'স্‌নি ?

মনু—না হ'য়ে ফকির শীঘ্রই হব। বড় সন্ন্যাসীর চেলা ত হ'য়েছি।

কৃষ্ণ—কে, তোদের ভবতারণ ? সে হ'ল সন্ন্যাসী।

মনু—যিনি সম্যক ন্যাস করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, এই ত অভিধানে লেখে ? তা ভবতারণ বাবু দেশ হিতার্থে, সমাজ সংস্কারার্থে বহু চাঁদা সংগ্রহ করে—সব তা ব্যাঙ্কে ন্যাস করেন। আর সে ন্যাস কি দাদা যেমন তেমন ন্যাস। এক পয়সাও আর সেখানথেকে বেরোবে সাধ্য কি।

কৃষ্ণ—তা তুইও বুঝি এর পর দেশের লোকের টাকা কড়ি সব নিয়ে ব্যাঙ্কে সম্যক ন্যাস ক'রে সন্ন্যাসী হবি, সেই আশায় আছিস ?

মনু—না দাদা অত বড় আশা আমার নেই। চেলা গিরি ক'রে কেবল টাকা চেলেই আন্‌ছি,—ন্যাস ক'রে কখনও সন্ন্যাসী হব, এত বড় সাধনা আমার নেই। দশের টাকা অমন ন্যাস ক'রে নেওয়া দাদা—বড় বুকের পাটা, বড় মাথা চাই। আমরা চুনো পুটী,—আমাদের কি আর ও সব কখনও হবে ? আমরা চেলা—টাকা সুধু চেলে এনেই দিচ্চি।

কৃষ্ণ—শোন মনু,—বড় লোকদের সম্যক ন্যাসের জন্য দেশের টাকা আর ফাঁকি দিয়ে চেলে আনিস্‌নি। নিজে কিছু রোজগার টোজগারের চেষ্টা এখন ত্যাখ। টাকা রোজগার করাটা নেহাৎ বাজে কাজ নয়। পেটেও ত দুটি দিতে হবে ?

মনু—উপোস ক'রেও ত নেই দাদা।

কৃষ্ণ—ওরে নিজে কেবল দুটি পেটে খাওয়া, সেই কি যথেষ্ট হ'ল ?

মনু—কমই বা হ'ল কি ! শরীরটাত বেশ আছে। দিনও যাচ্চে মন্দ নয়।

কৃষ্ণ—সেত নিজেই ব'ল্‌ছিস, 'যেন লেপটি বিনে শুয়ে আছিস, শীতের ঠাণ্ডা বিছানায়।' বে থা না ক'রেত জীবনটায় একটা আরাম পাচ্ছিস্‌ না ?

মনু—লেপের পয়সা না থাকলে দাদা, খালি বিছানায়ই শুতে হয়—কি ক'রব ?

কৃষ্ণ—পয়সা রোজগার কর না ? না হয় বে ক'রে কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখ্‌। বি, এ পাস ত ক'রেছিস,—কম সম ক'রে নিলেও খুসী হ'য়ে মেয়ের বাপ যা দেবে, তাতেই ইতি মধ্যে বেশ চলে যাবে।

মনু—সর্ব্বনাশ দাদা ! বে ক'রে টাকা নেব ? ওযে আমাদের গোহত্যা ব্রহ্ম হত্যা—ও যে আমাদের ভাদ্দর বউ ভায়ের বউ।

কৃষ্ণ—বরের পণ বলে নেই নিলি, কন্যার যৌতুক বলে বাপ কন্যাকে যা দেবে, তা নিতে দোষ কি? তোদের মাথা যারা, তারাত তাইই করে।

মনু—দাদা, তারা হ'ল নেতা—আমাদের চালাবে। নিজেরাও চলবে এমন কথাত নেই! ঐটুকু গা ঢেকে যে চলে, সেই ঢের।

কৃষ্ণ—তা সে টাকা, না নিস্ না নিবি। তোর যা সম্পত্তি আছে,—তাতেই মোটা ভাত কাপড়ে আপাততঃ বেশ চলে যাবে। এর পর কাজ কর্ম্ম কিছু দেখে নিবি। তুই বল্, আমি মেয়ে দেখি।

মনু—তোমার দেখা মেয়ে ত দাদা, আমার বে করা হ'তে পারে না। বে ক'রব আমি, আর কনে দেখবে তুমি,—এমন বদ নিয়ম ত আমাদের সমাজে নেই। তার পর আমরা হ'চ্চি সভ্য, কোন সভ্যা ছাড়া আর কাউকে বে করা আমাদের মানা আছে।

কৃষ্ণ—ওরে গাধা, আমি কি তোকে কোন অসভ্যাকে বে কত্তে বল্‌ছি!

মনু—অসভ্য না হ'ক, আমাদের নববিভাকরী সভ্যা ত আর হবে না? আমাদের নববিভাকর সভার খাতায় নাম লেখান ছাড়া আমরা যে কাউকে আর সভ্যা বলে ধরি না।

কৃষ্ণ—তবে তোদের নাম লেখান নব বিভাকরী একটা সভ্যাকেই নিদেন বে কর্।

মনু—ও বাবাঃ—তুমি ত সে সব সভ্যাদের দেখনি, দাদা,—তাই অমন কথা বল্‌ছ। মাসে নিদেন পাঁচশ টাকা না হইলে আমাদের কোন স-স্বামিকা সপরি-বারিকা সভ্যার চ'লতে পারে না। সে দিন আমাদের কাগজে একটা হিসেব বেরিয়েছিল, বর্ত্তমান সভ্যধরণে কোন সভ্য সভ্যা দম্পতি ক'ল্‌কাতায় কততে কোনও মতে থাকতে পারে। সেই হিসাবে নিতান্ত সুগৃহিণী কোন সভ্যাও টায় টায় কোনও মতে শ পাঁচেক টাকায় মাস চালাতে পারে। তাও নিজের অনেক আরাম, স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বলি দিয়ে।

কৃষ্ণ—ও বাবা এযে বেজায় দামী সভ্যতা রে।

মনু—দাদা, অর্থনীতি শাস্ত্র পড়নি? সংসার যাত্রার মাত্রা যত উঁচু হবে, তত দেশের সভ্যতার মাত্রা বাড়বে,—তত সম্পদ বৃদ্ধি হবে। সংসার যাত্রার মাত্রা চড়িয়ে, এরা যে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করচ্চেন, দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি আন্‌ছেন।

কৃষ্ণ—খরচ বাড়িয়ে টাকা বাড়ান এ যুক্তি দাদা, আমার মাথায় ঢুকছে না। অর্থনৈতিক যুক্তি না হ'ক, অর্থের মুক্তি এতে শীঘ্রই হবে, সন্দেহ নাই। একেবারে নিছাক মুক্তি, কিছুই আর থাকচে না। তা তোদের সভ্যাদের গতি তবে কি হবে। মাসে পাচশ টাকা রোজগার করে এমন লোক দেশেইবা কটা আছে।

মনু—তা দরিদ্রের সঙ্গে দারিদ্র্য বিবাহ করার অপেক্ষা চির কৌমার্য্য মন্দ কি?

কৃষ্ণ—হুঁঃ। একদল চিরকুমারী সভ্যা, আর একদল চির কুমার সভ্য। তা এমন মন্দই বা কি!

মনু—দাদা। তুমি লোক ভাল নও।

(সুরে)

কুলোকে কুভাবে কত, কতকি কুকথা কয়।
(মোদের) সরল মনে নেই ক গরল প্রাণে মোদের সবই সয়।
যার যা খুসী বলুক না সে—
মোদের কি তায় যায় বা আসে,
(যার) কাণে তুলো পিঠে কুলো বকো মারো তার কিবা হয়!

কৃষ্ণ—তুই দেখছি ভারি ব'কে গেছিস। আঃ। একটু মাপ্তি করে কথা বল্‌তে হয় না।

মনু—দাদা, মাপ্তি কখনও করালে না, আজ কি করে করি বল। তবে দাদা, আমার সাদা মনের সাদা কথা,—তোমারও মনটি সাদা; সাদায় সাদায় কি আর কাদা ওঠে দাদা।

(সুরে)

আমি সাদা মনে সাদা কথা কই,—
তোমারও মনটি সাদা, কাদা ওঠে কই।
তুমি রামচন্দ্র দাদা, আমি হনুমান।
তুমি যদি সুগ্রীব দাদা, আমি জাম্বুবান
স্বভাবে যা লাফাই ঝাঁফাই, তোমার পায়েই রই!

কৃষ্ণ—আচ্ছা যদি হনুমানই হস,—আমার পায়েই রস, তবে আমি বল্‌ছি বে কর্।

মনু—(সুরে)

হনুমান্ কারে ক'রে ছিল বিয়ে
বল দাদা বল, বল।

তার লেজটা ছিল কহাত লম্বা

তার মুখখানাও কি পোড়া ছিল।

সেও কি দাদা মুখ খিচোত,

লাফিয়ে সাগর পাড়ি দিত,

আর কাঁদি কাঁদি কলা খেত,

তার দাদা শ্বশুর, তুমিই বল।

কৃষ্ণ—ওরে হত ভাগা বকামো এখন রাখ। আমি বল্‌ছি, তুই বে কর।

মনু—দাদা তুমি এই মুখপোড়া হনুমানের মত একটি আস্ত মুখপুড়ী হনুমতী বেছে আন, তবে ত বে হবে।

কৃষ্ণ—আচ্ছা, তা দেখব। তুই বে কর্‌বি ত।

মনু—তুমি একটা হনুমতী ত দেখ, আমি এর মধ্যে এখন আসি। আজই কলকাতায় যাব। প্রণাম কত্তে তোমার বাড়ী গেছলুম তা হইল না। দাদা দিদিতে তোমাদের কিছু বেশী রগড় হচ্ছিল,—তাই লজ্জাপেয়ে ফিরে আসতে হল। তবে প্রণামটা এখন নেও দাদা। (প্রণাম করিয়া) দিদিকেও দিও তবে। আসি এখন। রাগ টাগ করো না। বেয়াড়া বাঁদর হই যাই হই দাদা—তোমার পায়েই রই।

কৃষ্ণ। আরে না না, তুই আমার চিরকালের পাগ্‌লা; আজ রাগ কর্‌বো? তবে যদি বাড়াবাড়ি পাগলামি করে বে থা সত্যিই না করিস্, তবে ঠিক বল্‌ছি, রাগ কর্‌ব।

মনু। দাদা, এম্‌নিই প্রাণটা নাচে, তুমি আর তাল দিও না। তবে আসি এখন।

কৃষ্ণ। তা আয়তো! আর শোন্ তোর দিদিকে নিয়ে, ক'ল্‌কাতায় যাচ্ছি। একটা বাড়ী টাড়ী দেখিস্। সিধু বাবুর ওখানেই উঠব,—তাকে বলিস্।

মনু। আচ্ছা, দাদা আসি তবে।

[প্রস্থান।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত

গল্পলহরী

২য় বর্ষ | বৈশাখ, ১৩২১। | ১০ম সংখ্যা

অপহৃত !

হেমলতার আজ সমস্ত দিন রোদনের বিরাম নাই ;—পঞ্চম বর্ষীয় শিশুটি কলেরায় আজ প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে ; পুত্র শোকে স্নেহময়ী জননী উন্মত্তের ন্যায় করুণ-স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। বাড়ীতে পরিচারিকা ভিন্ন আর কেহ নাই,—সে সেই শিশুটীকে জন্মাবধি প্রতিপালন করিয়াছে, সুতরাং তাহারও হৃদয়ে দারুণ শেলাঘাত হইয়াছে। হেমলতার স্বামী সুশীলসুন্দর একাকী মৃত পুত্রকে বক্ষে লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্মশানে গিয়াছেন ; এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর ; পরিচারিকা উদ্বিগ্ন হইয়া কেবল পথের পানে চাহিয়া আছে। তাহার সন্দেহ হইতেছিল ; আত্মহারা পুত্রবৎসল পিতা দারুণ শোকে আত্মহত্যাও করিতে পারেন। এমন সময়ে সে সভয়ে দেখিল সুশীলসুন্দর একটী শিশু বক্ষে করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। সে মনে করিল বাবু হয় উন্মাদ গ্রস্থ হইয়াছেন, নয় ছেলে বাঁচিয়াছে। সে সত্বরপদে হেমলতাকে সংবাদ দিল উভয়ে আসিয়া দেখিল, সুশীলসুন্দরের ক্রোড়ে একটী সুন্দর শিশু সতৃষ্ণ নয়নে সকলকে দেখিতেছে। সে চাউনিতে যুগপৎ বিস্ময়, ভয়, আনন্দ ও বিষাদ খেলা করিতেছে ; কিন্তু শিশুর মুখখানি বড় সুন্দর। হেম সত্বর স্বামীর কোল হইতে শিশুটীকে আপনকোলে লইয়া সহস্র চুম্বন করিল, তখন তাহার নয়ন ফাটিয়া দরদরধারে অশ্রু বহিতেছিল। তাহার প্রথম শোকের বেগ একটু উপশম হইলে, সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাকে

কোথায় পাইলে, ভগবান কি একটী অপহরণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আর একটী দিয়াছেন ?"

সুশীলসুন্দর অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, "পথে ইহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছি। অসহায় অবস্থায় রাস্তার ধারে একটী বারাণ্ডায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম,—বাপ মা কে কোথায় আছে কিছুই জানে না, আমার সহিত আসিতে চাওয়ায় ভগবানের দান ভাবিয়া আমি বক্ষে করিয়া আনিয়াছি।"

হেমলতা সন্তপ্তহৃদয়ে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা তুমি কে ?"

শিশু হাসিয়া বলিল, "কেন ? আমি অরুণ।"

হেমলতা আবার সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "বাবা তোমার মা বাপ কোথায়, তোমার কি কেউ নাই ?"

শিশু সেইরূপ মধুর হাসিয়া বলিল, "ছেলেবেলায় আমার এক মা ছিল সে আমায় ঠিক তোমার মত ভাল বাস্‌তো। তার পর আর এক মা হ'লো সে আমায় কেবল মার্‌তো, সে দিনের বেলায় আমায় ঘরের ভিতর চাবি দিয়ে রেখে কোথায় চলে যেত; কেবল রাত্রিতে আস্‌তো। সে আজ চাবি দিতে ভুলে গেছ্‌লো তাই আমি চলে এসেছি। তার কাছে আর যাব না, সে আমায় বড় মারে। হ্যাঁ মা তুমি কি সত্যিই আমার মা ?"

"হ্যাঁ বাবা আমিই তোমার মা", "বলিয়া হেমলতা তাহাকে আরও হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলেন। শিশুর কোমল স্পর্শে তাহার হৃদয়নিহিত দারুণ দাবাগ্নির ভিতরে যেন শীতল বারি প্রবাহিত হইল, অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে যেন স্নিগ্ধ অনুপম জ্যোতিঃ বিকাশিত হইল।

২

এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে—আমাদের ক্ষুদ্র শিশুটি ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সযত্নে লালিত পালিত হওয়ায় তাহার অতুলনীয় রূপরাশি তাহার সমস্ত অঙ্গ বেষ্টন করিয়া সহস্র ভাবে বিকসিত হইয়াছে। এই নয়নানন্দ রূপ-রাশি তাহার পিতামাতার হৃদয়ে পুত্র শোকের দারুণ আঘাতকেও লাঘব করিয়াছে। কিন্তু কমলের ন্যায় চক্ষু দুইটি মেলিয়া সে মুখখানি যখন কাহারও দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিত, তখন দর্শকের মনে হইত সুরমন্দাকিনী স্বর্গ হইতে এই দেব শিশুটিকে সদ্যনীর-স্নাত করাইয়া এখানে রাখিয়া গিয়াছে; আবার উষার প্রাকালে কুসুমশয্যানিভ দেবযানে আরোহণ করাইয়া ত্রিদীবপথে

লইয়া যাইবেন। পিতামাতা একদণ্ডের তরেও তাহাকে নেত্রান্তরাল করিতেন না, শিশুর সরল মুখখানি তাহাদের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছে। কাঙ্গালের ধন হারানিধি, আবার হারাইলে বুঝি ভগবান আর দিবেন না।

এক দিন শীতকালের অপরাহ্নে ঝি'র সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া অরুণ একটী চিত্র শিল্পীর বাটীর পার্শ্ব দিয়া যাইতে ছিল,—অস্তাচলোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত আভা তাহার মুখমণ্ডলে পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। শিল্পী তাহার বন্ধুর সহিত তাহার বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত ছিল; সে এই শোভা দেখিয়া মোহিত হইল; বালকের সুন্দর মুখমণ্ডল তাহার কাছে অনৈসর্গিক বলিয়া বোধ হইল। সে ঝিকে ডাকিয়া বলিল, "ঝি এই বালক-টীকে রোজ এই সময় একবার করিয়া আমার বাটীতে লইয়া আসিতে পারিবে? আমি ইহার একখানি চিত্র আলেখ্য প্রস্তুত করিতে চাই, তোমাকেও তাহার জন্য যথোচিত পুরস্কৃত করিব।"

পুরস্কারের লোভে ঝি সহজেই স্বীকৃত হইল। পরদিন হইতে সে সেই সময় শিশুকে লইয়া শিল্পীরবাটীতে প্রত্যহ উপস্থিত হইত। কথায় কথায় শিল্পী পরিচারীকার নিকট হইতে শিশুর সব কথাই জানিয়া লইল।

৩

রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা সৌধ-ধবলকিরীট মালায় সুশোভিত। দ্বারে দ্বারে অগণ্য শান্ত্রীদল আদেশ প্রতীক্ষায় চিত্রপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে মার্ব্বেল নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি গুলি জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় দাণ্ডায়মান। উন্মত্ত প্রায় প্রস্রবণগুলি তাহাদের মস্তকভেদ করিয়া অজস্রধারে শীতল জল ঢালিতেছে। খণ্ড খণ্ড উপবনে সদ্য প্রস্ফুটিত অগণ্য পুষ্পরাশি হাসিতেছে, দুলিতেছে, খেলিতেছে।

সহসা একখানি বহু মূল্য মোটরগাড়ী তীরবেগে ফটক দিয়া প্রবেশ করিল, দ্বারবানেরা সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল। গাড়ী একেবারে অন্দর মহলের দ্বারে উপনীত হইল। একটী সুন্দর যুবক তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া একেবারে ত্রিতল শয্যাগৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহের ভিতরে একটী অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী পালঙ্কের একপার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া উন্মুক্ত জানলার দিকে চাহিয়া-ছিলেন। সে সুন্দর কান্তিতে ভীষণ মলিনতার ছায়া পড়িয়াছে ও স্বর্ণনির্ম্মিত দেহখানি যেন অস্থিপঞ্জর সার হইয়াছে। যুবতী স্বামীর আগমনে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এত শীঘ্র ফিরিলে যে? তোমার হাতে ওটা কি?"

যুবক যুবতীর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন;—বলিলেন, "তাই বলিবার জন্যই এত শীঘ্র ফিরিয়াছি,—এক চিত্রশিল্পীর দোকানের সম্মুখে দেখিলাম একখানি ওয়েল পেন্টিং টাঙ্গান রহিয়াছে, সেই ছবিখানি অসংখ্যলোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, তাই—"

স্বামীর কথায় বাধা দিয়া যুবতী বলিলেন, "তাই বুঝি সেখানি কিনিয়া আনিলে? জীবনের যখন সবই ফুরাইয়াছে তখন আর ছবিতে আকর্ষণ কেন?'

"তাহা সত্য, কিন্তু কমলা এ ছবিখানি দেখিলে আজ তুমিও শান্তি পাইবে," এই বলিয়া যুবক তাহার হস্তস্থিত ছবিখানি তাঁহার স্ত্রীর সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন।

ছবিখানি দেখিবামাত্র কমলার সমস্ত শরীর মুহূর্ত্তে কম্পিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষীণদেহ পালঙ্কের উপর মূর্চ্ছিতাবস্থায় পতিত হইল। হৃদয়ের সেই পুরাতন তন্ত্রী, যেটি দিনের পর দিন মাতৃহৃদয়ে করুণস্বরে প্রতিনিয়ত বাজিতেছে, সেই তন্ত্রীতে সজোরে আঘাত লাগিল। সেই মুখ—সেই—চক্ষু,—সেই তরঙ্গায়িত কেশগুচ্ছ। শিশুটী সন্ধ্যার পূর্ব্বে দোলনা আলো করিয়া পরিচারিকার নিকট ঘুমাইতেছিল; সন্ধ্যার পর আর তাহাকে পাওয়া গেল না। শিশুর অঙ্গবেষ্টিত মণিমুক্তাখচিত সামান্য অলঙ্কারের লোভে পরিচারিকা শিশুকে লইয়া পলায়ন করিল, সে আজ তিন বৎসরের কথা; তদবধি আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনুসন্ধান হইয়াছে; কিন্তু কোথাও তাহাদের পাওয়া যায় নাই। বুদ্ধিহীনা এইটুকু বুঝিল না, সে যে সামান্য অলঙ্কারের লোভে শিশুকে অপহরণ করিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে তাহার সহস্র গুণ অধিক পাইত। কিয়ৎক্ষণ পরেই কমলার সংজ্ঞালাভ হইল; সে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া অজস্রধারে নয়নঅশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। কমলার অষ্টাদশবৎসর বয়সে শিশুটির জন্ম হয়; অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তাহারা অনেকদিন যাবৎ পুত্রসুখে বঞ্চিত ছিলেন; কিন্তু ভগবান ক্ষণকালের জন্য সেই সুখের অধিকারী করিয়া পুনরায় আবার তাহাদের গাঢ়তম অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করিলেন! তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ দাওয়ানকে কমলা সেই চিত্রকরকে আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন; তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, "যে উপায়েই হউক তাহাকে এখনি আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিতে হইবে।"

চিত্রকর অবিলম্বে আসিয়া অতি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন?"

কমলার স্বামী তাহাকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসাইলেন; কমলা দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন। যুবক বলিলেন, "আপনি যে এই চিত্রখানি আঁকিয়াছেন, ইহা কি আপনার কল্পিত,—না কোন জীবিত শিশুর নিখুঁত প্রতিমূর্ত্তি ?" চিত্রকর অতি বিনয়ে কহিল, "এ চিত্র আমার কল্পিত নয়; ইহা একটী জীবিত শিশুর, আমার সাধ্যানুযায়ী নিখুঁত প্রতিমূর্ত্তি।"

"এ শিশুটী কি এখনও জীবিত আছে ?" কমলা দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিলেন

"হ্যাঁ সে জীবিত আছে; একটী ঝির সহিত সে বেড়াইতে ছিল; তাহার মুখখানি দেখিয়া আমার মনে হইল, এমন সুন্দর মুখ পূর্ব্বে আর কখনও আমি দেখি নাই; তাই শিশুটীর একখানি চিত্র প্রস্তুত, করিতে জানি না কেন আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। পরিচারিকাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করায় সে প্রত্যহই শিশুটীকে আমার দোকানে লইয়া আসিত। সেই পরিচারিকার নিকট কথায় কথায় আমি শিশুটী কোথায় থাকে,জানিয়া লইয়া ছিলাম।"

"আপনি সেই বাটীর ঠিকানাটি অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন, আমাকে এখনি সেখানে যাইতে হইবে।"

চিত্রকর ঠিকানা বলিয়া দিল। যুবক তাহার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আজ আপনি আমাদের যে উপকার করিলেন ইহা আমরা জীবনে বিস্মৃত হইব না। কাল আসিলে ইহার জন্য আপনাকে যথোচিত পুরস্কৃত করিব।" চিত্রকর বিদায় হইল।

৪

হেমলতা সস্নেহে ডাকিলেন, "বাবা অরুণ, কতক্ষণ নীচে থাকিবে, তোমার খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

"যাই মা" বলিয়া অরুণ উপরে আসিল। সযত্নে স্নেহময়ী পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইতে যাইতেছিলেন, এই সময় একখানি বহুমূল্য সুসজ্জিত অশ্বযান আসিয়া দরজায় থামিল। একটী পরিচারিকা গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতপদে একেবারে হেমলতার শয়ন গৃহে উপস্থিত হইল। হেমলতা সেই অপরিচিতা পরিচারিকার ব্যস্ততা দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইলেন। সে গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিল, "আমাদের গৃহিণী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, গাড়ীতে আছেন। আপনি দয়া করিয়া অনুমতি দিলে উপরে আসিতে পারেন।"

"তা'র আবার অনুমতি কি, আমি যাইতেছি, বলিয়া হেমলতা তাড়াতাড়ী নীচে গমন করিলেন। নীচে আসিয়া হেমলতা দেখিলেন, উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভগবতীর ন্যায় একটী যুবতী রমণী চকিতা হরিণীর ন্যায় চতুর্দ্দিক দেখিতেছেন। যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া হেম সভয়ে দেখিল, এ মুখখানি ঠিক তাহার অরুণের মত, সেই নাসিকা, সেই কটাক্ষ, সেই ঢেউ খেলান নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সেই ওষ্ঠদ্বয়, সেই সব। তবে কি—, হেমলতার বক্ষঃ বড় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। কমলা সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "ভগিনী আমি আপনার অপরিচিতা হইয়াও আপনাকে কষ্ট দিতে আসিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করিবেন। পুত্রশোকাতুরা, পুত্র-স্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া আপনার চরণে দয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

হেমলতা সকাতরে বলিলেন, "আমি ক্ষুদ্র রমণী, আমার নিকট দয়া ভিক্ষা চাহিবেন না, বলুন আপনার কি প্রয়োজন?"

কমলা সেই ছবিখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "ইহাতে যাহার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, এই শিশু কি আপনার কাছে আছে?"

হেমলতা শিহরীয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আছে, অরুণ উপরে আছে।"

"অরুণ" তবে তো আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কমলা হেমলতার হাত দুইখানি ধরিয়া গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন, "ভগিনী একবার দেখাও, আমি জন্মের মত তোমার কাছে বিক্রীত হইয়া থাকিব।"

এমন সময় অরুণ সেই স্থানে আসিয়া হেমলতার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "হা মা এমন ভাল গাড়ী কার এসেছে;— এরা কে মা?"

অরুণকে দেখিয়া কমলা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার অধরে, ওষ্ঠে কপোলে শত সহস্র চুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন আর একখানি মুখ হতাশব্যঞ্জক ও অশ্রুসিক্ত দেখিয়া অরুণ কমলার কোল হইতে তাড়াতাড়ী নামিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা—মা তুমি কাঁদছ? কেন, তোমার কি হয়েছে মা?"

হেমলতা সজোরে বালককে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমি অরুণকে দিব না, স্বেচ্ছায় কে কবে হৃদপিণ্ড ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে। তাহার মুখ হইতে আর বাক্য নিঃসৃত হইল না; সমস্ত পৃথিবী তাহার সম্মুখে যেন ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।

শ্রীঅনন্তমোহন রায়।

দুই ভাই।

সেদিন পূর্ণিমা তিথি। সন্ধ্যার প্রাকালে মধুমতী তীরে উপবিষ্টা একটী কিশোরী নদীর দিকে চাহিয়া হতাশজনিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে; তার মুখ খানি দেখিলেই স্পষ্টতঃ অনুমান হইতেছে যেন বহুক্ষণ ধরিয়া সে কাহারও আগমন প্রতীক্ষায় সেই স্থানে বসিয়া আছে ও নিশা গমন দেখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন হেতু ক্রমশঃ অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেছে, মুখখানি চিন্তাক্লিষ্ট হইলেও অস্তমিত রবিকিরণে সুবর্ণ প্রভামণ্ডিত হইয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে। কিশোরী একবার নদীর দিকে চায় আর একবার আকাশের দিকে চায়। সন্ধ্যাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল; আকাশ, প্রান্তর, নদী সর্ব্বত্র নীরব; কেবল অবিরল কল্লোলিত স্রোতগর্জ্জন শোনা যাইতেছিল। নদীর জল সদ্যোত্থিত পূর্ণচন্দ্র কিরণোদ্ভাষিত হইয়া ঝিক্ মিক্ করিয়া জলিতে লাগিল; মৎস্য ব্যবসায়ী ধীবরগণের নৌকা সকল ক্রমশঃ তীরে আসিতেছে ও রমণী উৎকণ্ঠিত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে; কিছুক্ষণ পরে যেন তাহার আকাঙ্ক্ষিত নৌকা দূরে দৃষ্ট হইল, ও কিশোরীর বদনচন্দ্রিমা পূর্ণচন্দ্রকে পরাজিত করিয়া আনন্দ বিচ্ছুরিত হইল।

নৌকা তীরে সংলগ্ন হইবামাত্র রমণী দৌড়িয়া গিয়া বয়ঃজ্যেষ্ঠ যুবকের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আবদুল, আজ তোমাদের এত বিলম্ব হইল কেন? তুমি যাবার সময় বলে গিয়েছিলে যে, আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিবে ও আমায় বাজারে নিয়ে গিয়ে আমার পছন্দমত কাপড় কিনে দিবে; কিন্তু তোমার এই অসম্ভব বিলম্ব দেখিয়া আমার মনে কত যে অমূলক আশঙ্কার উদয় হইতেছিল তা তোমায় কেমন করিয়া বুঝাইব বা বলিব।" যুবক বলিল, "সাকিনা, আজ কাছে মাছ না পাওয়ায় আমরা প্রায় সমুদ্র বক্ষে গিয়া পড়িয়া ছিলাম তাই আসিতে দেরী হইয়াছে; তা চল শীঘ্র গেলে আমরা বাজারে সময়ে পৌছিতে পারিব।" এই বলিয়া, সাকিনার হাত ধরিয়া আবদুল গমনোদ্যত হইল ও ছোট ভাই হামিদকে বলিল, "মাছগুলি যেন সে খরিদদার বাড়ী দিয়া দাম লইয়া সত্বরে গৃহে ফিরিয়া যায়।" তাহারা চলিয়া গেলে, হামিদ চন্দ্রকিরণে যতদূর সম্ভব একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল ও মনে মনে বলিল, "দাদা বড় সুখী ও ভাগ্যবান; নহিলে সাকিনা তাকে এত ভালবাসে কেন।" মাছ লইয়া সে

তীরে উঠিতে গিয়া দেখে যে নৌকার কাছে কি একটী জিনিষ চন্দ্রকিরণে ঝিক্ মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে; উঠাইয়া দেখে যে, একটী স্বর্ণ মাদুলী; হামিদ বুঝিল যে সেটী সাকিনার, দৈবশতঃ তার গলা হইতে খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে। হামিদ মাদুলীটী উঠাইয়া সহস্রবার সেটীকে সাদরে চুম্বন করিয়া অতিযত্নে রাখিয়া দিল।

উপরোক্ত ঘটনার দুইমাস পরে সাকিনা ও আবদুলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে ও নবদম্পতী নিশিদিন ভুলিয়া প্রেমের কথা বলে ও সুখস্বপ্ন দেখে। মধুমতী-তীরে কতদিন সন্ধ্যাকালে বসিয়া সাকিনা কি উদ্বিগ্ন চিত্তে প্রতিসন্ধ্যায় আবদুলের আগমন প্রতীক্ষা করিত, তাহার বর্ণনা করিত ও আবদুল সাকিনার প্রেমপূর্ণ বিম্বাধর চুম্বন করিয়া তাহার সেই কষ্টের জন্য পুরস্কার দিত। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, ইহাই জগতের নিয়ম। সুতরাং নবদম্পতীর এই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিতে বেশী বিলম্ব হইল না। নদীতে আর ভাল মাছ পাওয়া যায় না, যাও পাওয়া যায় তার বাজারে তেমন দাম হয় না; সুতরাং আবদুলের আর্থিক অবস্থার দিন দিন অবনতি হইতে লাগিল। পূর্ব্বাপেক্ষা খরচ নানা কারণে বাড়িয়াছে; অথচ আয় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে। শেষে দুইসন্ধ্যা পত্নীর ও ভ্রাতার উদরপূর্ণ করিয়া আহার যোগাইবার সঙ্গতি আবদুল হারাইতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে রিক্তহস্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পত্নীর বিষাদ ও অনশনক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিলে আবদুলের প্রাণ মর্ম্মপীড়ায় ভাঙ্গিয়া যাইত, ক্রমশঃ এই দারিদ্র্যজনিতকষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল। সাকিনা স্বামীকে প্রবোধ দিত যে, এমনদিন চিরকাল থাকিবে না; আবার অচিরে তাদের সুখসূর্য্যের উদয় হইবে; কিন্তু যখন উপর্য্যুপরি অর্দ্ধাশন ও অনশনকষ্টে সাকিনার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, তখন একদিন আবদুল, পত্নীর ও ভ্রাতার অজ্ঞাতসারে নৌকা লইয়া অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশে সুদূর রেঙ্গুণে চলিয়া গেল। যাইবার সময় নিদ্রিত পত্নীর মুখ চুম্বন করিতে গিয়া আবদুল নেত্রজল সম্বরণ করিতে পারে নাই। আবদুলের তপ্তঅশ্রু সাকিনার গণ্ডে পড়ায় সে নিদ্রাঘোরে কি এক অজানিত বিপদের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

আবদুলের নিরুদ্দেশের কারণ বুঝিতে সাকিনার কষ্ট পাইতে হইল না; কারণ সে জানিত তার অনশনজনিতকষ্টে স্বামী তার সর্ব্বদা ম্রিয়মান থাকিত। হায়, যদি সে একবার আবদুলকে কাছে পায় ত বলিবে যে

নদীতীরে বসিয়া সাকিনা নৌকা দেখিতেছে

The Cherry Press Ltd., Cal.

তাহার বিরহপ্রসূত কষ্টের নিকট তাঁর অনশন জনিত পীড়া অতি সামান্য। হামিদ ভ্রাতৃজায়ার জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল; ঋণ করিয়া, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া তাহার ভরণপোষণের উপায় করিতে লাগিল; নিজে অর্দ্ধ-ভোজন করিয়া সাকিনার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে প্রয়াস পাইত। সাকিনা নিবারণ করিলে বলিত, "তুমি আমার দাদার বড় আদরের সম্পত্তি, আমারও বড় প্রিয়, তোমার কষ্ট দেখে কি ক'রে জীবন ধারণ করিব, তুমি আমার এ সদনুষ্ঠানে বাধা দিও না।"

সাকিনা প্রতিদিন প্রাতেঃ ও সন্ধ্যায় মধুমতী তীরে বসিয়া আবার পূর্ব্বেরমত কাহার আগমন প্রতীক্ষায় থাকিত ও ভাবিত যে, জ্যোৎস্না-কিরণে আবদুলের হাত ধরিয়া মধুমতী তীরে বেড়াইয়া সে কত সুখ উপভোগ করিয়াছে, সেই জ্যোৎস্না এখন অত্যন্ত কর্কশ, দৃষ্ট-পদার্থমাত্রই যেন তার চক্ষুশূল। পৃথিবী অত্যন্ত নৃশংস, কারণ সুখের দিনে যে শোভা ধারণ ক'রে তার মনোহরণ করেছিল আজ আর পৃথিবী সে শোভা বিকাশ করে না। যে নদীবক্ষে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হইলে তাহাদের হৃদয় প্রেমপূর্ণ ও শীতল হইত, আজ তাহা দেখিয়া হৃদয়ে বাড়বানল জ্বলিতেছে; আজিও আকাশ তেমনি নীল, নক্ষত্র তেমনি উজ্জ্বল, বায়ু তেমনি ক্রীড়াশীল; কিন্তু কৈ কিছুতেই ত আনন্দ নাই। মনুষ্য তেমনি হাস্যপরিহাসে রত সংসারস্রোত তেমনি অপ্রতিহত; কিন্তু সাকিনার চক্ষে যেন জগতটাই দয়ামায়াশূন্য। সাকিনা ভাবিল, তা'র কি দোষে, সে এতসুখ এত অল্পদিনে হারাইল। যখন এমনি তন্ময় হইয়া নদীতীরে বসিয়া বসিয়া সাকিনা ভাবিত ও এক একদিন গভীর রজনী হইয়া গেলেও বাটী ফিরিত না তখন হামিদ আসিয়া সাকিনাকে বুঝাইয়া গৃহে ফিরাইত। সাকিনা প্রত্যহই লক্ষ্য করে যে, হামিদ একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে থাকে ও তার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরে। অনেকদিন এইরূপ লক্ষ্য করিয়া একদিন সাকিনা হামিদকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। দুইটী বিভিন্নপথগামিনী বেগবতীনদী পরস্পর প্রতিহত হইলে যেমন তাহাদের স্রোতবেগ বাড়িয়া উঠে, হামিদের হৃদয়ে তাহাই হইল। একদিকে নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতার জন্য মর্ম্মান্তিক যাতনা, অপরদিকে বহুদিনের সঞ্চিত প্রণয়স্রোত। পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রণয় প্রবাহেরই জয় হইল; বড়নদীতে ছোটনদী ভাসিয়া গেল, ভ্রাতৃস্নেহ প্রণয়ের কাছে পরাজিত হইল। হামিদ বলিল,

"সাকিনা, দাদা আজ প্রায় ছয় বৎসরকাল নিরুদ্দেশ, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি নিশ্চয় সংবাদ দিতেন, বিশেষতঃ তোমার বিরহে যাঁর একমুহূর্ত্ত কাটিত না, কোনপ্রাণে আজ ছয় বৎসর তোমায় দূরে রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন; তা'ই আমার প্রাণে আশঙ্কা হইতেছে যে, তিনি আর ইহজগতে নাই।" সাকিনা বলিল, "হামিদ তোমারই কথা স্থির, নহিলে, সে যেখানেই যেমন অবস্থায় থাকুক না কেন, হয় সংবাদ দিত, না হ'লে এতদিন ফিরিয়া আসিত। আমি অনেকদিন তার আশা ত্যাগ করেছি। হামিদ তা'র ভালবাসা যে ভুলবার নয়, তা'ই প্রত্যহ আমাদের এই লীলাভূমিতে এসে সেই সব পূর্ব্বস্মৃতি মনে ক'রে সুখী হই ও কাঁদি। ভাই হামিদ, তুমি কেন অভাগিনীর জন্য রোজ এখানে এসে বসে থাক ও কাঁদ; কেন এই রাক্ষসীর জন্য তুমি এত কষ্ট করে আহার সঞ্চয় কর, তোমার এ ঋণ কেমন ক'রে শোধ করবো' ভাই?" হামিদ একটী সযত্নে রক্ষিত মাদুলী বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "সাকিনা, বল্‌তে পার, মাদুলীটী কার?" সাকিনা ঈষৎ চমকিয়া বলিল, "হামিদ, ভাই, এ মাদুলী তুমি কোথায় পাইলে? আমার বিবাহের পূর্ব্বে ইহা একদিন হারাইয়া যায়। আমি ও তোমার দাদা এটীর জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমরা ব্যর্থ মনোরথ হই; তুমি যদি পাইয়াছিলে, কেন আমায় ফিরাইয়া দাও নাই, কেন ইহাকে এতদিন এত সযত্নে রক্ষা করিয়াছ?" হামিদের চক্ষু দুটী তখন প্রেমাশ্রুপূর্ণ হইয়া ছলছল করিতেছে। সে মাদুলীটীকে চুম্বন করিয়া বলিল, "সাকিনা, আমার নৈরাশময় জীবনাকাশের এটী ধ্রুবতারা, তা'ই বড়যত্নে সংরক্ষিত; এতদিন বলি নাই, আজিও প্রকাশ করিতাম না; কিন্তু তোমার কষ্ট আর সহ্য হয় না; আমি নিজের হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি; আর বেশীদিন এমন ভাবে নীরবযুদ্ধের ফল মৃত্যু তা'ই আজ জীবনের সবকথা তোমায় বল্‌বো। বাল্যকাল হ'তে আমরা দুই ভায়ে তোমায় ভালবাসতুম; কে বেশী ভালবাস্‌তো তা আমি বল্লে তোমার ত বিশ্বাস হ'বে না। তবে তুমি যে, দাদাকে বেশী ভালবাস্‌তে তাকি আর বল্‌তে হবে। তুমি দাদার হ'লে আমার হৃদয় ভেঙ্গে গেলেও আমি তাতে সুখী হলুম; কারণ নিশিদিন তোমায় দেখ্‌তে পেতুম, তোমাদের সুখী দেখে আমার শূন্য-প্রাণে আনন্দের ঢেউ বয়ে যেত, তারপর কেন দাদা চলে গেল, চলে যদি গেল, কেন, সে এতদিনে ফিরলে না, কেন তুমি রোজ রোজ এমন করে কাঁদবে

আমার যে বড় কষ্ট হয় তাই তোমায় দেখ্‌তে আসি ;—তাই তোমার অলক্ষিতে তোমার কাছে ঘুরে বেড়াই। সাকিনা, যদি রাগ না কর, ঘৃণা না কর, তবে বলি দাদা যখন নাই ; তখন তুমি যদি আমার হও। আমি তোমায় দাদারই মত সুখে রাখবার চেষ্টা করবো। বল, তুমি আমার হ'বে।

সাকিনা বিমুগ্ধচিত্তে অনিমিষনেত্রে উৎকর্ণ হইয়া হামিদের সব কথা শুনিল ও তার হাত দুখানি ধরিয়া আদর করিয়া বলিল, "হামিদ, তুমি আমায় এত ভালবাস ? ভাই, দেখ তোমার মুখে, তোমার কথায়, যেন আজ তোমার দাদার প্রতিবিম্ব দেখ্‌তে পাচ্ছি। হামিদ ভাই, তুমি কি আমায় পেলে সুখী হ'বে ? তা যদি হও, আমি তোমার হ'ব। হামিদ আনন্দ বিহ্বল চিত্তে সাকিনাকে বুকে টানিয়া চুম্বন করিল।

সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে সাকিনাদের অবস্থাও ফিরিয়াছে। এখন তাহারা বেশ একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। মাছের ব্যবসায়ে দু পয়সা লাভ হ'তেছে ; তা ছাড়া সাকিনা মোজা বোনা ইত্যাদি শিল্পকর্ম্ম করিয়া উপায় করে ; আজ দেড়বৎসর হইল তাহাদের একটী পুত্র সন্তানও হইয়াছে।

আবদুলের নিরুদ্দেশের ঠিক সাত বৎসর পরে আবদুলের ঘাটে একদিন সন্ধ্যায় একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল ও আরোহী নৌকাখানি বাঁধিয়া অতি সন্তর্পণে আবদুলের গৃহাভিমুখে চলিল। অপরিচিত আরোহীর দীর্ঘশ্মশ্রু ও দীর্ঘকেশ এবং পোষাক পরিচ্ছদ ব্রহ্মদেশীয় লোকের ন্যায়, তাহার হস্তে একটী সুন্দর চর্ম্মনির্ম্মিত ব্যাগ। আবদুলের বাড়ীর নিকট আসিয়াই অপরিচিত আরোহী যেন স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান হইতেছিল যে, তাহার হৃদয়ে সন্দেহের প্রবল ঝটিকা বহিতেছে। এক একবার মুখখানি যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। আবার ক্ষণিকপরেই অজানাবিপদের আশঙ্কাজনিত বেদনায় সঙ্কুচিত হইতেছিল। দ্বারের নিকট আসিয়া দ্বার খুলিবারজন্য সঙ্কেত করিবার সাহস হইয়া উঠিল না। গৃহাভ্যন্তরে শিশুর আনন্দকোলাহল শুনিয়া গবাক্ষছিদ্র দিয়া অপরিচিত আরোহী দেখিল যে, একটী যুবতী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটী বালককে ঘনঘন চুম্বন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে ও বালককে মাঝে মাঝে পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবকের ক্রোড়ে দিতেছে ও কাড়িয়া লইতেছে ; বালক ইহা একটী বেশ খেলা মনে করিয়া আহ্লাদে চীৎকার করিতেছে। আরোহী এ দৃশ্য দেখিয়া মর্ম্মস্পর্শী একটী

অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। যুবকযুবতী যেন সে মর্ম্মবেদনা সম্বলিতধ্বনি শুনিতে পাইল ও বাহিরে কে জিজ্ঞাসা করিলে, কোন একটী প্রাণীর স্থানান্তরিত হওয়ার শব্দ তাহাদের শ্রুতিগোচর হইল।

হামিদ বাহির হইয়া দেখে যে একটী অপরিচিত লোক তাহার দিকে আসিতেছে। নিকটে আসিয়া সে আবদুলের স্ত্রী সাকিনার সঙ্গে দেখা করিতে চায় বলিলে, হামিদ তা'হাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। অপরিচিত ব্যক্তি আনত-মুখে ও বিকৃতস্বরে বলিতে লাগিল যে, দুইবৎসর পূর্ব্বে রেঙ্গুনসহরে আবদুল নামে একটী লোকের সহিত তাহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। আবদুল তাহার প্রিয়তমা পত্নীর অনশনজনিত কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশে তার পত্নীর অজ্ঞাতসারে একদিন রাত্রে পলাইয়া রেঙ্গুন যায় ও চার বৎসর যাবত কোনরূপ অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা করিতে না পারায়, সে স্ত্রীকে বা তার ভ্রাতাকে কোন সংবাদ দেয় নাই। পঞ্চম বৎসরে ভাগ্যলক্ষ্মী তা'র প্রতি সদয়া হন ও সেই বৎসর সে প্রায় ২০০০০৲ টাকা ব্যবসায়ে লাভ করে। সেই অর্থ লইয়া সে দেশে আসিতেছিল। কিন্তু পথিমধ্যে কলেরা হইয়া সে মারা যায়; মৃত্যুকালে সে আমায় সেই সমস্ত অর্থ দিয়া এই প্রতিশ্রুত করায় যে, আমি যেন তা'র পত্নীর অনুসন্ধান করিয়া অতিকষ্টে উপার্জ্জিত তা'র এই ধন তাহাকে দিয়া, কেন সে তা'কে দীর্ঘকাল কোন সংবাদ দেয় নাই তা' যেন বলি। এবং সাকিনাকে অনুরোধ করি যে, সে যেন আবদুলের দরিদ্রতার জন্য তা'র স্মৃতি হৃদয় হ'তে মুছে না ফেলে। তোমাদের দেশ খুঁজিতে আমার কিছু বিলম্ব হইয়াছে; আর আমারও নিজ কার্য্য বশতঃ রেঙ্গুন আমি শীঘ্র ছাড়িতেও পারি নাই। এই বলিয়া পথিক গলদাশ্রুনেত্রে ব্যাগ হইতে দুইটী মোহরের থলে বাহির করিল এবং সাকিনার হাতে দিয়া তাহার মুখের দিকে একবার নিমিষের জন্য কাতরব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিল। পরে অপরিচিত পথিক একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইল।

তখন সাকিনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হামিদ অপরিচিতব্যক্তির আকৃতি ও গলা তোমার দাদার মত বোধ হইল না কি? সে যেন চেষ্টা করিয়া ভাঙ্গা গলায় কথা কহিতেছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

জাপানী ফুল।

জাপানে সানো সহরে আন্দামায়ার চায়ের দোকানে প্রত্যহই সন্ধ্যার পর একটা বিরাট আড্ডা বসিত। সে আড্ডায় যোগদান করিত না, সানো সহরে এরূপ লোক অতি অল্পই ছিল। সেদিনও আড্ডা খুব জমিয়াছিল। বৃদ্ধা আন্দামায়া দোকানের ঠিক মধ্যস্থলে একটা বেতের মোড়ায় উপবেশন করিয়া তাহার খোদ্দেরগণকে এরূপ মধুরভাবে আপ্যায়িত করিতেছিল যে, চায়ের পেয়ালার পর পেয়ালা নীরবে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, সেদিকে বড় কাহার হুঁস ছিল না। হাসি ও গল্পের তুফান বহিতেছিল। সহসা খোদ্দেরগণের দিকে ফিরিয়া আন্দামায়া বলিল, "আচ্ছা আজ ওকুকে দেখিতে পাইতেছি না কেন?"

আন্দামায়ার মুখে ওকুর নাম শুনিবামাত্র দোকান শুদ্ধ সকলেই একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এক পার্শ্ব হইতে এক যুবক বলিল, "আইবুড়ী, ওকুর দফা এইবার রফা; প্রেম প্রেম ক'রে একেবারে হেদিয়ে পড়েছিল; এইবার তা'রপ্রেমে গাছ বেরিয়েছে। কাল লইয়ের বাড়ী থেকে বাছাধনকে অর্দ্ধচন্দ্র খেয়ে বেরুতে হয়েছে।"

যুবকের কথায় আন্দামায়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে যুবকেরদিকে চাহিয়া বলিল, "সেকি! লইয়ের বাড়ীতে ওকু অর্দ্ধ-চন্দ্র খেলে?" যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল, "এতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে, আই? সকলই ত জান ওকুর অধঃপতন দেখে তা'র বাপ তা'কে লইকে ত্যাগ করবার জন্য কতক'রে বুঝিয়েছিল; কিন্তু ওকু তখন প্রেমে ভোর;—বাপের মুখের উপরেই বল্লে আমি কিছুতেই লইকে ত্যাগ করতে পারবো না। তা'ই শেষ ও'র বাপ লইকে গিয়ে বুঝিয়ে বলায়, লই নাকি ওকে ত্যাগ করেছে।"

সানোর কাউণ্টের পুত্র কামাকুরা একটু বেশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "ও সব বাজে কথা রেখে দাও না;—থিয়েটারের অভিনেত্রী তার আবার প্রেম। বাপের কথা ছেলে রাখলে না, আর রাখলে কিনা পথের একটা বেশ্যা। আমরা সব বুঝি, কোথায় আবার একটা দাঁও মারবার চেষ্টায় আছে তা'ই ওকুকে ভাবাচ্ছে, ওদের প্রেম,—পয়সার প্রেম।" প্রথমোক্ত যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল, "পয়সায় সব জিনিষ হয় না ভাই, তা' যদি হ'তো তা হ'লে অনেকদিন আগেই লই তোমার হ'তো। পয়সা ও চেষ্টা এ দুটোইতো তোমার কম ছিল না।"

কাউণ্ট উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "পয়সায় হয় কিনা, দুদিন বাদেই দেখতে পাবে। একটু আগেই লই আমায় ডাকতে লোক পাঠিয়েছিল।"

আন্দামায়া কামকুরার কথায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না;—বলিলেন, "না—না, তোমরা জান না, লই ওকুকে যথার্থই ভালবাসে।"

আন্দামায়ার কথা শেষ হইতে না হইতে ওকু দোকানে প্রবেশ করিল, তাহার মুখে কালিমা লিপ্ত, চুল উস্কোখুস্কো। আন্দামায়া ওকুকে দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে ওকু! তোমার যে আজ এত দেরী,—তোমাকে আজ বড় বিষণ্ণ বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।"

কামাকুরা বলিল, "প্রেমিক লোক ওদের ভাব বোঝা মানুষের অসাধ্য।"

আবার একটা হাসির হররা উঠিল, ওকু কোন কথা না বলিয়া একখানি চেয়ার দখল করিল,—চিরহাস্যময়ী স্যায়েসা বালিকা এক পাত্র চা আনিয়া সম্মুখে রাখিল। ওকু নীরবে তাহাই পান করিতে লাগিল!

২

সানো সহরের বিখ্যাত ষোড়শী-রূপসী অভিনেত্রী লই তাহার সুন্দর সুসজ্জিত গৃহের উন্মুক্ত জানালার নিকট দাঁড়াইয়া তাহার স্বহস্তরচিত ক্ষুদ্র পুষ্প উদ্যানের দিকে চাহিয়াছিল। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু তাহার গোলাপীগণ্ড সিক্ত করিতেছিল। তাহার মনে ওকুর পিতার কয়েকটী কথা কেবল তোলপাড় করিতেছিল। "আত্মবিসর্জ্জন না দিলে ভালবাসা হয় না;—ভালবাসার অপর নাম আত্মত্যাগ।" আজ ওকুর ভালর জন্যই সে ওকুকে ত্যাগ করিতেছে—তবে কেন চক্ষে জল আসে। পাছে সে অশ্রু কেহ দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় সে তাহার হস্তস্থিত রুমালে সত্বর তাহা মুছিয়া ফেলিতেছিল, এই সময় কে তাহার পশ্চাৎ হইতে পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিল, লই চমকিত হইয়া ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে গৃহমধ্যস্থিত বৈদ্যুতিক আলোগুলি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সম্মুখে ওকু; নয়নে নয়নে মিলিত হইল! উভয় উভয়কে দেখিয়া যেন বিভোর হইয়া গেল,—তাই পলকশূন্যনয়নে উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে লইয়ের চমক ভাঙ্গিল; সে অতি মধুর মিষ্ট হাসি হাসিয়া ওকুর হস্ত ধরিয়া বলিল, "চল গৃহের ভিতর বসিবে চল।" যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় ওকু তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সুন্দর গৃহ;—বহুমূল্য আসবাবে গৃহ অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত! মধ্যস্থলে একটী সোফার উপর তাহারা নীরবে আসিয়া বসিল; বহুক্ষণ কাহারও মুখে

কথা নাই। সহসা লই ওকুর হস্ত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "এ্যাঃ; তুমি আবার এসেছ। যাও, যাও তুমি এখনি আমার গৃহ হইতে চলিয়া যাও। না—না তুমি আর এখানে এসো না, তোমার এখানে আসা কিছুতেই হইবে না।"

ওকু লইয়ের মুখের প্রতি কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া অতি বিষাদে বলিল, "তুমি আমাকে তাড়াইয়া দিতেছ?

লই কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু বলিতে পারিল না। ওকুর বক্ষে মস্তক রাখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। একটু প্রকৃতস্থ হইয়া সে আবার উঠিয়া বসিয়া বলিল, "হাঁ্যা আমি তোমায় তাড়াইয়া দিতেছি,—তুমি এখনি আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাও।" ওকু লইকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"না,—আমায় তাড়াইয়া দিলেও আমি যাইব না। তোমায় ছাড়িয়া আমার বাঁচা অসম্ভব। আমায় সহস্র অপমান করিলেও আমি এখান হইতে নড়িব না।"

লই ক্রমেই বিচলিত হইয়া পড়িতেছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "তবে তুমি থাক আমি চলিলাম; আর আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে না,—এ বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই তুমি নিশ্চয় জানিও আমি অপরের উপপত্নী হইব।"

ওকু কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, লই তাহার মুখের দিকে একবার মাত্র সজলনেত্রে চাহিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। একবার বিদ্যুৎ চমকাইয়া ওকুর অন্ধকার হৃদয় গাঢ় অন্ধকারে পরিণত করিল। ওকু বহুক্ষণ লইয়ের আশায় তথায় বসিয়া রহিল, কিন্তু রাত্রি গভীর হইতে গভীরতম হইল, তথাপি লইয়ের সাক্ষাৎ নাই। শেষে সে উন্মত্তের ন্যায় দারুণ জ্বালা লইয়া লইয়ের বাটী ত্যাগ করিল।

যাহার জন্য সে পিতার স্নেহ, নিজের কারবার সমস্তই মাটি করিতে বসিয়াছে, তাহার এই ব্যবহার, সেই প্রেমের এই বিনিময়। তাহার প্রাণে বার বার উদিত হইতেছিল বারবনিতার নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি প্রত্যাশা করা যায়। ওকু স্থির করিয়াছিল লইয়ের নাম পর্য্যন্ত আর মুখে আনিবে না, কিন্তু প্রভাত হইতে না হইতে আর একবার শেষ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কেন সে তাহাকে এরূপ জ্বালা দিতেছে জিজ্ঞাসা করিতে প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে প্রাণের সহিত যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শেষ আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া লইয়ের বাটীর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছিল কিন্তু দরজার নিকটেই এক চীনে ভৃত্য

দাঁড়াইয়াছিল সে তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "কোথায় যাইতেছেন, আপনার বাটী প্রবেশের হুকুম নাই, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।" যদি সে সময় ওকুর মস্তকে বজ্রপাত হইত তাহা হইলে বোধ হয় তাহার এত যন্ত্রণা বোধ হইত না, যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিল, যে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিল।

সমস্ত দিন যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া সে তাহার মস্তিষ্ক কিয়ৎপরিমাণে সমুদ্রের শীতল হাওয়ায় শীতল করিবার জন্য সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল কিন্তু সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে তাহার প্রাণের আগুন সহস্রগুণ অধিক জ্বলিয়া উঠিল। তাহারি সম্মুখে কিয়ৎদূরে একশীলাখণ্ডে উপবিষ্ট কাউণ্টপুত্র কামাকুরার পার্শ্বে তাহারই লই। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার মনে হইল সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার পদনিম্ন হইতে সরিয়া যাইতেছে, সে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে বরাবর তাহার কারখানায় যাইয়া উপস্থিত হইল। কারখানায় উপস্থিত হইয়া ওকু শুনিল কারখানায় কলেরা উগ্রমূর্ত্তিতে সমস্ত কারখানা গ্রাস করিবার জন্য ছুটিতেছে। কারখানার সমস্ত লোকই পলাইয়াছে, কেবল যাহারা রোগে আক্রান্ত তাহারাই কেবল ভুষিতেছে। ওকু মুহূর্ত্তে সমস্ত ভুলিল যে জগৎ ভুলিল, লইকে ভুলিল, সে তৎক্ষণাৎ পীড়িতবর্গের সেবার জন্য কারখানার ভিতর ছুটিল।

* * * * *

শেষরাত্রে সেই সংক্রামক কালরোগ তাহাকে আক্রমণ করিল। এমন একজন লোক নাই যে মুখে জল দেয়,—বাটীতে সংবাদ দেয়। সমস্তদিন তাহার সংজ্ঞা ছিল না রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহার সংজ্ঞালাভ হইল, সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল পার্শ্বে বসিয়া লই। সেই শব ও মুমূর্ষের মাঝে জাগিয়া আছে কেবল তাহার প্রাণের প্রাণ লই। ওকু ভীত ও দুঃখিতভাবে বলিয়া উঠিল, "একি তুমি এখানে, যাও যাও তুমি এস্থান ত্যাগ কর এ বড় সংক্রামক রোগ।"

লই ওকুর মুখের নিকট মুখ আনিল, তাহার আলুলায়িত প্রচুর কেশদাম ওকুর মুখের উপর বিলুণ্ঠিত হইল, তাহার ওষ্ঠ তাহার ওষ্ঠে স্পর্শ করিল, সে কাতর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "জীবনে মরণে আমি যে তোমার!" তাহার বসিবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল সে যুগলবাহুর দ্বারা ওকুর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহারই পার্শ্বে শয়ন করিল।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার।

লই ও কামাকুরা সমুদ্র তীরে বসিয়া আছে। দূরে ওকু দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতেছে।

The Cherry Press Ltd., Cal.

নবাশ্রম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মৃত কি জীবিত ?

কাওেরাও বড় ব্যয়ভূষণ করিতে ভাল বাসিতেন না ;—তবে আজ একখানি গাড়ী ভাড়া না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি অগ্রে বাপুকে গাড়ীতে উঠাইয়া পরে নিজে সেই ছিন্নহস্ত যুক্ত বোতলসহ গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়োয়ানকে বলিলেন, "যত শীঘ্র হয়, থানায় চল।"

শীঘ্রই গাড়ী থানায় উপস্থিত হইল ; তিনি সমস্ত কথা ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন। তখন হাকিম বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছিলেন,—সুতরাং ইন্‌স্পেক্টর তাঁহাদের লইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাড়ী চলিলেন, বলিলেন, "এ বিষয় বিলম্ব করিলে আসামী পলাইতে পারে।"

হাকিমকে সেলাম দিয়া ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "একটা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া এ সময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।"

হাকিম গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সরকারী কাজ, বিরক্ত হইলে চলে না। বল, কি হইয়াছে।" "আপনি একজন গাড়ীওয়ালার বাড়ী খানাতল্লাসীর হুকুম দিয়াছিলেন।" "হ'তে পারে—মনে নাই।"

"আমরা এক ব্যক্তির জামা ও জুতা পাই। এই জামা ও জুতা নরোত্তম দাসের। তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, এইজন্য দামোদর বলিয়া এক গাড়ীওয়ালার নামে আপনি ওয়ারেণ্টের হুকুম দেন।"

"হাঁ মনে পড়িয়াছে—তাহার পর কি হইয়াছে ? সেই লোকটা ধরা পড়িয়াছে ?"

"না—এই খানাতল্লাসিতে আর এক বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে। এই যে ইনি আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, ইহার নাম কাওেরাও।"

কাওেরাও অগ্রবর্ত্তী হইয়া সেলাম দিলেন। হাকিম বলিলেন, "আমি কি ইহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "দেখিয়া থাকিতে পারেন। নরোত্তমদাসের ভাই, ইহাকে তাহার অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। ইনি ইহার অনুসন্ধান করিতে করিতে একটা বিষয় জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, আরও একটা খুন হইয়াছে।"

"আবার খুন হইয়াছে ! কে খুন হইল ?"

"ক্যাণ্ডেরাও আপনাকে সকল বলিতেছেন।" হাকিম তাহার দিকে চাহিলেন। তখন ক্যাণ্ডেরাও বলিলেন, "দামোদর গাড়োওয়ালার বাড়ীখানা তল্লাসী করিবার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম, তাহার স্ত্রী এই দাঁড়াইয়া আছে।"

হাকিম মস্তক নাড়িয়া তাহাকে বসিয়া যাইতে বলিলেন।

ক্যাণ্ডেরাও বলিলেন, "আমরা সেই খানা তল্লাসীতে জানিলাম যে, এই দামোদর নরোত্তম দাসের নিরুদ্দেশ বিষয় কোনরূপে না কোনরূপে জড়িত আছে।"

"হাঁ, এই দামোদরের নামেই আমি ওয়ারেণ্ট দিয়াছিলাম।"

"হাঁ—সে ধরা পড়ে নাই—সেও নিরুদ্দেশ হইয়াছে—তাহার স্ত্রীর বিশ্বাস; আমারও নানাকারণে বিশ্বাস হইয়াছে যে সে খুন্ হইয়াছে।"

"কিসে জানলে?"

"আজ আমি ও এই স্ত্রীলোক এক ডাক্তারের বাড়ী প্রবেশ করিয়াছিলাম।"

"ডাক্তারের বাটী—এইমাত্র আমি এক ডাক্তারের কথা শুনিতেছিলাম—

"এই স্ত্রীলোকের স্বামী এই ডাক্তারের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু আর বাহির হইয়া আসে নাই—তাহার সঙ্গী তাহার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল কিন্তু সেও তাহাকে সে বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখে নাই,—তাহার এই সঙ্গীর মৃতদেহ এই ডাক্তারের বাড়ীর জানালার নিম্নে পাওয়া গিয়াছে,—"

"হাঁ আমি ইহার কথাও শুনিয়াছি।"

"এই লোকটার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, দামোদরকে ডাক্তার নিজের বাটীতে আটক করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই সে দামোদরের স্ত্রীকে লইয়া ডাক্তারের বাটীতে যায়, যে ঘরে তাহার বন্ধু বদ্ধ আছে ভাবিয়াছিল, তাহার জানালায় উঠিতে গিয়া পড়িয়াগিয়াছিল—"

"তাহার পর—?"

"এই দামোদর লোকটার একটী অঙ্গুলি ছিলনা,—একটা হাতে কেবল চারটা অঙ্গুলিছিল।"

"হাঁ তাহার বর্ণনা-পত্রে এইরূপ আছে বটে।"

"ইহা ছাড়াও একবার গাড়ীর নীচে পড়িয়া যাইবার জন্য তাহার হাতে আর একটা দাগও ছিল—"

"বেশ—তাহার পর কি হইল তাই বল,—সংক্ষেপে—অনর্থক সময় নষ্ট করিও না।"

"আমরা এই ডাক্তারের বাটীতে গিয়া তাহার সমস্ত ঘর দেখিয়াছি—তখন ডাক্তার বাটীতে ছিলনা, একটা ঘরে এই ঘুসী পাইয়াছি,—দামোদরের স্ত্রী বলিতেছে,—ইহা তাহার স্বামীর,—সে নিজে এ ঘুসী তাহার জন্য কিনিয়া ছিল।"

"তাহা হইলে সে লোকটা এই বাটীতে গিয়াছিল।"

"কেবল ইহাই নহে,—আমরা এই একটা বোতল পাইয়াছি,—ইহার ভিতর দেখুন একখানা হাত আছে—এই হাতের চারিটী অঙ্গুলি, একটী নাই—হাতে একটা দাগও আছে। এই স্ত্রীলোক বলিতেছে এ হাত তাহার স্বামীর।"

"কি ভয়ানক ?—এ ডাক্তার কে ?"

"এই ডাক্তারের নাম গোকুলদাস।

"গোকুল দাস !"

বলিয়া হাকিম চেয়ার ছাড়িয়া প্রায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "গোকুলদাস,—ডাক্তার গোকুলদাস;—এইমাত্র আর একজন তাহার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্টের আবেদন করিতেছিল !"

ইনেস্পক্টর ও ক্সাওেরাও উভয়েই বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে সে ?"

"সেও একটা খুন করিবার চেষ্টার জন্য। এই ডাক্তার গোকুলদাস কে ?"

ক্সাওেরাও ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে—"

"না—একটী ভদ্রলোক এইমাত্র এখানে আসিয়া বলিতেছিলেন যে, এই ডাক্তার তাহার গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা পাইয়াছিল;—তিনি অতিকষ্টে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।"

"ইহাঁর নাম কি ?"

"হাঁ,—ইহার নামই নরোত্তমদাস,—ইনিই নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন।"

"তিনি এখানে আসিয়াছিলেন ?"

"হাঁ—এখনও ঐ পাশের ঘরে তিনি বসিয়া আছেন—তাহার কথা আমার বিশ্বাস না হওয়ায় তাহাকে সকল কথা লিখিয়া আমার কাছে দরখাস্ত করিতে বলিয়াছি। তিনি ঐ ঘরে বসিয়া লিখিতেছেন।"

ক্সাওেরাও মহাবিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"নরোত্তমদাস ঐ ঘরে আছেন।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—হাঁ—কতবার বলিব—তিনি এই ডাক্তার

গোকুলদাসের নামে ওয়ারেন্টের আবেদন করেন, বলেন বিলম্ব করিলে তাহাকে ধরিতে পারা যাইবে না।"

"আমরাও ঠিক তাহাই বলি,—সেইজন্ত এ সময়ে আপনার নিকট আসিয়াছি। আজ ডাক্তার বাড়ীতে নাই, কাল প্রাতেই আসিবে। যদি কোন গতিকে জানিতে পারে যে, তাহার কীর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইলে সে পলাইবে—আর তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারা যাইবে না।"

হাকিম ঘণ্টাধ্বনি করিলে তাহার কেরাণী ছুটিয়া আসিলেন,—হাকিম বলিলেন, "সেই ভদ্রলোক এখনও ঐ ঘরে আছেন?"

"হাঁ—তাহার লেখা প্রায় শেষ হইল।"

"তাঁহাকে একবার এখানে ডাকিয়া আন।"

নরোত্তম আসিয়া দাঁড়াইলেন,—তিনি এখনও অতি দুর্ব্বল, ক্ষীণ, পাণ্ডাস-বর্ণ রহিয়াছেন, তবে জীবিত আছেন, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

হাকিম বলিলেন, "আপনার কথা আমি প্রথম বিশ্বাস করি নাই—তাহাই আপনাকে সকল কথা লিখিয়া দরখাস্ত করিতে বলিয়াছিলাম। এখন ইহাঁরাও এই ডাক্তার গোকুলদাসের নামে ওয়ারেন্টের আবেদন করিতেছেন,—স্পষ্টতঃ এই গোকুলদাস এই স্ত্রীলোকের স্বামীকে খুন করিয়াছে,—অথচ আপনাকে খুন করিবার জন্ত তাহার নামে ওয়ারেন্ট বাহির হইয়াছে।"

"সে লোক সব করিতে পারে?"

"আমি তাহার নামে ওয়ারেন্টের হুকুম দিলাম,—ইনেস্পক্টর, তুমিই এ ওয়ারেন্টে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।"

"ক্যাণ্ডেরাও বলিলেন, "হুজুর, আমিও সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করি।"

"কেন?"

"যদি কোন গোলযোগ ঘটে, আমি তাহাকে চিনাইয়া দিতে পারিব,—আমি তাহাকে ভালরকম জানি।"

"হাঁ, ইহাতে আপত্তি হইবার কোন কারণ নাই।"

তখন সকলে হাকিমের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

ক্যাণ্ডেরাও নরোত্তমদাসের পার্শ্বে আসিয়া বলিলেন, "আপনি জানেন না,—আমার নিকটে আপনার দাম হাজার টাকা।

"সে কি!"

"আপনার ভাই আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, আপনাকে বাহির করিতে পারিলে তিনি আমাকে হাজার টাকা দিবেন, বলিয়াছিলেন—"

"আপনি সেই দুরাত্মা ডাক্তার-রূপী নরপিশাচকে ধরুন,—আমি আপনাকে তাহার উপর আরও দুই হাজার টাকা দিব।

"আর সে যায় কোথা?—কাল যেমন সে বাড়ী ফিরিবে, অমনি আমরা তাহাকে ধরিব। আজ রাত্রেই তাহার বাটীতে আমরা তাহার শুভাগমনের জন্য অপেক্ষা করিব।"

"না পালায়?"

"আর পলাইতে হইবে না।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দশটার পর আহারাদি করিয়া দুইজন সার্জেণ্ট লইয়া ইনেস্পক্টর ও ক্ষাণ্ডেরাও ডাক্তারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

দ্বারে আঘাত করিলে ভৃত্য দরজা খুলিল, ইন্‌স্পেক্টর বলিলেম, "ডাক্তার বাটীতে আছেন?"

"না—তিনি অন্যত্র গিয়াছেন, কাল ভোরে আসিবেন।"

"বটে! আমরা রাত হইতেই তাহার অপেক্ষায় এইখানে থাকিব।"

এই বলিয়া ইনস্পেক্টর, তাহার সঙ্গী দুইজন সারজেণ্ট ও ক্ষাণ্ডেরাও ভৃত্যকে দ্বার হইতে সরাইয়া দিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তৎপরে তাহারা নিজেই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন—

ইনেস্পেক্টর ভৃত্যকে বলিলেন, "আর কোন চাকর আছে?"

"আছে—হুজুর—"

"তাহারা কোথায়?"

"তাহারা রাত্রে বাড়ী যায়—রাত্রে আমিই থাকি।"

"ভাল তাহা হইলে আর এ বাড়ীতে কেহ নাই?"

"না,—আর কেহ নাই।"

"বেশ—তাহা হইলে বাপু তুমি আমাদের কাছেই ঘুমাইয়া থাক, এখান

হইতে নড়িও না, আমরা যে এখানে আসিয়াছি, তাহা কাহাকে যদি বলিতে চেষ্টা পাও, তাহা হইলে বড় মুস্কিলে পড়িবে—চুপচাপ্ ঐখানে শুইয়া থাক।"

সকলে ডাক্তারের বাড়ীতে সে রাত্রিটা জাগিয়া কাটাইতে লাগিল।

রাত্রি কাটিল। কে আসিয়া দরজায় আঘাত করিল। ভৃত্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন।"

ইনেস্পেক্টর সাহেব উঠিয়া বলিলেন, "তুমি থাক, আমরাই দরজা খুলিয়া দিতেছি।"

একজন গিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন, ডাক্তার কোন সন্দেহ না করিয়া কয়েক পদ গৃহ মধ্যে আসিল, তৎপর সম্মুখস্থ লোকদিগকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। এ দিকে ইনেস্পেক্টরের লোক পশ্চাৎ হইতে দ্বার পৃষ্ঠে অর্গল সংলগ্ন করিল, গোকুলদাস দেখিল সম্মুখে পুলিশ, তাহাদের সঙ্গে কাণ্ডেরাও—যাহাকে একদিন এই বাড়ী হতেই শৃগাল কুক্কুরের মত দূরীভূত করিয়াছিল। তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, তবুও তাহার মত লোক সহজে দমিবার পাত্র নহে; বিরক্তভাবে ভ্রুকুটী করিয়া বলিল, "এ সব কি?"

ইনেস্পেক্টর সঙ্গীদের বলিলেন, "গ্রেপ্তার কর—শীঘ্র।" অমনই তাহার সঙ্গিদ্বয় মুহূর্ত্ত মধ্যে ডাক্তারের পার্শ্বে আসিয়া তাহার দুই হাত ধরিল।

ডাক্তার বলিয়া উঠিল, "গ্রেপ্তার।"

ইনেস্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ,—খুনের জন্য।"

"খুন!"

"হাঁ, খুন।"

ডাক্তারের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল। সে নিজ পকেটে হাত দিল।

ইনেস্পেক্টর অমনি বলিলেন, "পকেট হইতে হাত উঠাইয়া লও—হাত ঠিক সিদে বাহিরে রাখ, তুমি ভদ্র লোক! হাত কৌড়ি পরাইতে আমার ইচ্ছা নাই।"

ডাক্তার জড়িত কণ্ঠে বলিল, "তাহা হইলে—তাহা হইলে তোমরা যথার্থই আমাকে ধৃত করিতেছ?"

"হাঁ,—এই তোমার নামে ওয়ারেণ্ট রহিয়াছে, দামোদর গাড়ীওয়ালাকে খুন করিবার জন্য তোমাকে ধৃত করিতেছি।"

"আমি তাহার নাম কখনও শুনি নাই; এ দেখিতেছি একটা মহা ভ্রম ঘটিয়াছে—"

ক্যাণ্ডেরাও বলিলেন, "ভ্রম হয় নাই, সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাক।"

ডাক্তার কিন্তু ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার দিকে ফিরিল,—কোন কথা কহিল না।

ক্যাণ্ডেরাও বলিল, "তুমি লোকটাকে কশায়ের মত কাটিয়াছ—তুমি তাহার দেহের অন্যান্য অংশ কি করিয়াছ তাহা জানি না, তবে তাহার হাত খানা পাওয়া গিয়াছে—মহাশয় সে খানিকে যত্নে বোতলে রাখিয়াছিলেন। পাপী বদমাইস যতই বুদ্ধিমান চতুর শঠ হউক না কেন, ঈশ্বরানুগ্রহে সময় সময় এইরূপ গাধার ন্যায় ভুল করে বসে, তাহাদের পাপের কোন না কোন চিহ্ন রাখিয়া দেয়, তুমি এই লোকটাকে হত্যা করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পার নাই—মধ্যে মধ্যে এই সুখ জনক কার্য্য লক্ষ্য করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য, তাহার হাত খানিকে আরকে রাখিয়া দিয়াছিলে—"

ডাক্তার কথা কহিল না, তাহার পদতল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল, সে যেন সেখান হইতে বিচ্যুত হইয়া গভীর—গভীর—গভীরতর নরকের এক অন্ধকারময় গহ্বরে পড়িতে লাগিল—সে সেই অন্ধকার মধ্যে চারি দিকে নরকের বিভীষিকাপূর্ণ নানা দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

উপসংহার।

ডাক্তার যথা সময়ে বিচারের জন্য হাকিমের সম্মুখে নীত হইল।

তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ :—

প্রথম :—নরোত্তমদাসকে খুন করিবার চেষ্টা—

দ্বিতীয়—দামোদরকে হত্যা করা।

নরোত্তমদাস যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সকলই বলিলেন। তখন জীনা বাঈর সন্ধান পড়িল। হত্যাপরাধে ধৃত হইয়া ডাক্তার গকুলদাম এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে জীনা বাঈএর কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল, সে যে তাহার গুপ্ত গৃহে বন্দিনী আছে, তাহা সে কাহাকেও বলিল না।

ভৃত্যও এ কথা কাহাকে ভয়ে বলিল না, তখন তাহার খোঁজ পড়িল। পুলিশ ডাক্তারের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

অতি কষ্টে তাহারা গুপ্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল, দেখিল দ্বারের নিকট জিনা বাঈ পড়িয়া আছে বোধ হয় তিন চার দিন তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

দারুণ রোগ ভোগের পর জিনাবাঈ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

অনাহারে—তৃষ্ণায়—যন্ত্রণায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে, বোধ হয় সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাহাকে ডাকিবার জন্ত দরজা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, সেই খানে অসহনীয় যন্ত্রণায় তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।

পাপীয়সীর যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে। ভগবান্ পাপীর দণ্ড এই পৃথিবীতেই দিয়া থাকেন।

ডাক্তারের প্রচুর অর্থ ছিল, সে তখনও জীবনের আশা ছাড়িল না, তাহার পক্ষে সমর্থনের জন্ত বড় বড় উকীল কৌন্সলী নিযুক্ত করিল। প্রায় এক সপ্তাহ তাহার বিচার চলিল। তাহার কৌনসিলি অতি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তখন জজ উভয় পক্ষের সাক্ষীর বিশ্লেষণ করিয়া জুরিদিগকে তাহাদের মতামত স্থির করিবার জন্য পরামর্শ করিতে পাঠাইলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা পরে জুরিগণ ফিরিয়া আসিল। আদালত গৃহে লোকে লোকারণ্য, সকলেই উৎসুক—উদ্‌গ্রিব।

বিচারপতি জুরিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের অভিমত"!

জুরীগণ বলিলেন "দোষী।"

জজ রায় দিতে আরম্ভ করিলেন :—

গোকুলদাস, তুমি ভয়াবহ কার্য্য করিয়াছ, সংসারে এরূপ নর রাক্ষস থাকিতে পারে, মানুষে সহজে তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। তোমার প্রাণদণ্ড ব্যতীত আর উপযুক্ত দণ্ড নাই—বোধ হয় ইহাও তোমার উপযুক্ত দণ্ড নহে—আমি তোমার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলাম।

জনতা হুড় হুড় করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া গেল। জজও উঠিয়া চলিয়া গেলেন, প্রহরিগণ গোকুলদাসকে জেলে লইয়া গেল।

পনর দিন পরে এক দিন প্রাতে গোকুলদাসের ফাঁসি হইয়া গেল।

দামোদরের স্ত্রী ও কাণ্ডেরাও উভয়ে তাহাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিতে দেখিয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিল, ইহাই তাহাদের সন্তোষ; ইহাপেক্ষা সুখের দিন বোধ হয় তাহাদের জীবনে আর কখনও হয় নাই।

বলাবাহুল্য নরোত্তমদাস্ কাণ্ডেরাওকে বঞ্চিত করিলেন না, তাহাকে দুই হাজার টাকা দিলেন।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

সম্পূর্ণ।

লক্ষ্মী নারায়ণ।

সে আজ অনেক দিনের কথা। কলিকাতার এক ধনাঢ্যের বাটীতে দুর্গা পূজার মহোৎসব—আনন্দের আর বিরাম নাই। বাটীর কর্ত্তা দুর্গোৎসব উপলক্ষে খরচ পত্র করিতে আদৌ পশ্চৎপদ হন না। দুর্গাপূজাটা তাঁহার একটা সখ। অন্য সময়ে খরচপত্র করুণ বা না করুণ এ সময়ে তিনি কিন্তু মুক্ত হস্ত। তবে পূজাটা সাত্ত্বিকভাবে হয় কি না সে কথা বলা একটু কঠিন; কিন্তু এ কথা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারা যায় যে পূজাটা তাঁহার বাটীতে বিলক্ষণ জাঁক জমকে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাহেবী খানা, বারাঙ্গনার নৃত্য গীত, যাত্রা থিয়েটারের ছড়াছড়ি, মো সাহেবের হুড়াহুড়ি, বাদ্য ভাণ্ডের তীব্র ধ্বনি, লুচি মোণ্ডার কাড়াকাড়ি, পাকশালায় বেমালুম চুরী—এ সকল দেখিলে মনে হয়, বাবুর বাটী পূজা বটে! কিন্তু প্রতিমার নিকট ভক্ত নাই, পূজাসনে ব্রাহ্মণ নাই, চণ্ডী পাঠের গম্ভীর ধ্বনি নাই—তথায় আছে কেবল তাণ্ডব নৃত্য, আর ভীম ভীষণ গর্জ্জন। বাবু অনেকের গলায় ছুরী চালাইয়া, অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারকে পথের পথিক করিয়া, অনেক স্ত্রীলোকে কলুষ-কল্মষে নিমজ্জিত করিয়া, তিনি সাধু সাজিয়াছেন। বাবু সাধু, বার্দ্ধক্যবশতঃ পরকালের ভয়ে ভীত হইয়া পূজাদিতে এখন একটু আস্থাবান হইয়াছেন, ঠাকুর দেবতার প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয়াছেন—তাঁহার বিশ্বাস, তাহাই যথেষ্ট হইল। বাবু সাধু, বন্ধু বান্ধবের নিকট বলিয়াও থাকেন—"ধর্ম্ম আবার কি, পূজা আবার কি, পয়সা খরচ করিলেই সব হয়।"

যাহা হোক—বাবুর বাটীতে পূজা—একমাত্র পুত্র—বংশদুলাল তখন বন্ধুবান্ধব সঙ্গে সুধাপান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছে; এমন সময়ে আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। আগন্তুক ভক্তবৃন্দ করযোড়ে প্রতিমা দর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু পূজা বাটীর কর্ত্তাদের তথায় দর্শন নাই। আরতি শেষ হইলে উপস্থিত ভক্ত মণ্ডলী ভক্তিভাবে প্রতিমার উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বাবুর পুত্র সে দৃশ্য দেখিয়া সহসা যেন ভক্তিমান হইয়া পড়িল। সে বন্ধু বান্ধব সঙ্গে দ্বিতলের বৈঠকখানা হইতে নিম্নতলে নামিয়া আসিল এবং প্রতিমা দর্শন ও প্রতিমাকে প্রণাম করিবার জন্য একটা উৎকট ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সাঙ্গোপাঙ্গগণ বলিল—

"সে কি হুজুর, আপনি দণ্ডবৎ হইবেন কি? তাহা হইলে যে লোকে হাসিবে।"

টলটলায়মান বাবুপুত্র তখন আঁকিয়া বাঁকিয়া টলিয়া টলিয়া বলিল—

"আল্‌বৎ, ঠাকুর দেখেঙ্গা, প্রণাম করেঙ্গা। কে কি বোলেঙ্গা ত আমার কেয়া হ্যায়।"

সাঙ্গোপাঙ্গগণ অমনি বলিল—"হুজুর said all right নিশ্চয় ঠাকুর দেখেঙ্গা—ঠাকুরের বাপ্‌কে দেখেঙ্গা। ঠাকুর ত লেড়কা হ্যায়।"

বাবু সাধুর, বাবু পুত্র টলিতে টলিতে ঠাকুর দালানে উঠিল, চরণের লপেটা জুতা যোড়াটী একজন সঙ্গী খুলিয়া লইয়া ঠাকুর দালানেরই এক পার্শ্বে রাখিল।

"হুজুর" প্রতিমা নিরীক্ষণ করিতে করিতে একেবারে ভাবে বিভোর হইয়া গেল। সে বলিতে লাগিল "কি সাজে সেজেছ মা তুমি রাধারাণি? রাবণ যদি জান্‌তে পারে, তা'হলে, ধিনিকেষ্টকে তিনিকেষ্ট ক'রে দিয়ে, তোমায় ষোড়শোপচারে পুজা দেয় মা। যাই হোক্, তোমার ঐ অসুর বেটাকে বলে দাও মা, যেন ও বেটা আমার মদ চুরী করে না খায়।"

"হুজুরের" কথা শুনিয়া অনেকেই মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। "হুজুরের" দৃষ্টি সে দিকে পড়ে নাই। তাহা হইলে সে হাসিতে একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া যাইত।

"হুজুরের" বয়স বৎসর ত্রিশ হইবে। দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ: "হুজুরের বর্ণ দেখিয়া একজন সুপুরুষ মত্তপ কলহ কালে বলিয়াছিল—

"তুই বেটা আবার চালাকী করিস কি? বেটা তোকে গুণে গুণে পঞ্চাশ ঘা পয়জার মারলে তোর রং বদ্‌লায় না, আর তুই আসিস্ আমার সঙ্গে চালাকি কর্‌তে?" সেই গালি বর্ষণে স্নাত হইয়া "হুজুর" দিনে তিনবার করিয়া সাবান ঘষিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও "হুজুরের" রং বদ্‌লাইয়াছে কি না—তাহা সুপুরুষ মত্তপ সমলোচকই বলিতে পারে।

"হুজুর" প্রতিমার সন্নিকটে যাইয়া বলিল—"আচ্ছা, কার্ত্তিক চাঁদ, তুমি বল দেখি বাবা, তোমার বয়স আর রংটা এমন ঠিক্ রেখেছ কেমন ক'রে? কোন্ গোলার চাল খাও বাবা। আচ্ছা দাঁড়াও সরকারকে ডেকে জিজ্ঞেস কর্‌ছি। এই সরকার—সরকার—

বাটীতে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। "হুজুরের" সাঙ্গোপাঙ্গগণ "সরকার—

সরকার" করিয়া তুমুল আন্দোলন করিতে লাগিল। সরকার তখন বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনিতে গিয়াছিল। কাজেই সে হুজুরে হাজির হইতে পারিল না। সুতরাং "হুজুর" ও সাঙ্গোপাঙ্গগণ ভীষণ হইতে ভীষণতর চীৎকার করিতে লাগিল। সে চীৎকার শ্রবণ করিয়া বাটীর কর্ত্তা "হল্‌ঘরের" মজলিস ছাড়িয়া উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। কর্ত্তা আসিতেছেন শুনিয়া সাধু পুত্রের একটু লজ্জাভাব আসিল। সে তাড়াতাড়ি যেমন ঠাকুরদালান হইতে নামিয়া আসিবার চেষ্টা করিবে, তেমনি "ঘটে" তাহার শ্রীচরণ লাগিয়া ঘট উল্টাইয়া গেল। ভীত, চকিত ছোট হুজুর, বড় হুজুরের ভয়ে তখন প্রায় মুক্ত কচ্ছ। সে তাড়াতাড়ি গণেশের শুড়টী টানিয়া ধরিল—মৃত্তিকার শুড় ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর কার্ত্তিকের হাত, লক্ষীর চরণ, সরস্বতীর বীণা, অসুরের মুণ্ড সিংহের ল্যাজ সব খসিয়া পড়িল। বড় হুজুর তখন ঠাকুর দালানের সিঁড়িতে উঠিতেছেন। পুত্র দেখিল বিষম প্রমাদ। অদ্য বুঝি আর লজ্জা নিবারণ হয় না। কারণ, তাহার টলাটা না থামিলে লজ্জা নিবারণ হয় কেমন করিয়া, কিন্তু টলমলানি ত থামিতেছে না। সে যাহাকে আশ্রয় রূপে আকর্ষণ করে, সেইটাই ত ভাঙ্গিয়া পড়ে—অতএব উপায়!

উপায়ন্তর না দেখিয়া "হুজুর" আসনোপবিষ্ট পুরোহিতের শিখাগুচ্ছ আকর্ষণ করিল। পুরোহিত ঠাকুর মুখ ব্যাদন করিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিলেন। তিনি যত বলেন—"ওরে বাবা, টিকি ছাড়, টিকি ছাড়, মরে গেলেম, মরে গেলেম,—"হুজুর" তত প্রবল শক্তিতে পুরোহিত প্রবরের চৈতন চুটকি টানিয়া ধরে। অবশেষে টানের চোটে দরিদ্র ব্রাহ্মণের শিখাগুচ্ছ ছিঁড়িয়া গেল। ব্রহ্মরক্তে পূজা বাটী কলুষিত হইল।

বাটীতে তখন হৈ হৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। কর্ত্তা, পুত্রের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—"তুই দূর হ, পাষণ্ড নরাধম। পুত্র টলিতে টলিতে বলিল—তা' যাচ্ছি বাবা, কিন্তু ভারি সামলে গেছি।" পিতা তখন ক্রোধে আত্মহারা। তিনি আদরের পুত্রকেও দুই একটা কথা না বলিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। পুরোহিত ঠাকুর তখন আর্ত্তনাদ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া কর্ত্তার চিত্তও একটু করুণরসে বিগলিত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পুত্রের উদ্দেশে বলিলেন—

"তুই এমন কুলাঙ্গার, আজকের দিনে ব্রাহ্মণের রক্তপাত করলি! এখন দে বেটা, দে-পুরোহিত ঠাকুরকে দুইটা টাকা দে। তিনি তুষ্ট হয়ে তোকে আশীর্ব্বাদ করুন।

পুত্র সে কথার উত্তরে মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—ছ টাকা কেন পুরুতকে আজ দশ টাকা দিব। কারণ পুরুত ঠাকুরের জন্মে আজ ভারী সাম্‌লে গেছি। নইলে বাবা তুমি আমার বিদ্যে ধ'রে ফেলেছিলে আর কি? যা' হক বাবা, এখন দশ টাকা দাও; পুরুত ঠাকুরকে দিতে হবে ত।"

পিতা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন। সাঙ্গোপাঙ্গগণ ছোট হুজুরকে ধরাধরি করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেল। শুনা যায়, দশটা টাকা পুরোহিত ঠাকুর, তাঁহার শিখাগুচ্ছের খেসারত স্বরূপ পাইয়াছিলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া যজমানকে আশীর্ব্বাদও করিয়া ছিলেন।

২

পুরোহিত ঠাকুর অর্থ পাইয়া শিখাগুচ্ছ উৎপাটনের কথা ভুলিয়া যাইলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণী তাহা ভুলিতে পারিলেন না। যজমান গৃহে, যজমান হস্তে যে তাঁহার স্বামী নির্য্যাতিত ও দারুণ অপমানিত হইয়া আসিয়াছেন, পতিব্রতা পত্নী তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। তিনি কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে যজমান বাটীতে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সে নিষেধ, সে সাধ্য সাধনা অনুরোধে কর্ণপাতও করেন নাই। ব্রাহ্মণের উত্তর,—মাতালের কি জ্ঞান আছে; ও কথা কি আবার ধর্ত্তব্য?

পতি যদি "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং সেই ধর্ম্মে আস্থাবন হইতেন,তাহা হইলে হয় ত পত্নীর ক্ষোভ করিবার বিশেষ কারণ থাকিত না। কিন্তু পত্নী পতি দেবতাকে চিনিতেন, অর্থলোলুপ পতির চরিত্রের বিষয় অবগত ছিলেন।—সেই জন্য তিনি স্বামীর উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তবে ভর্ত্তাকেও তিনি আর কিছু বলিলেন না। যজমানের প্রতি তাঁহার একটা বিজাতীয় ঘৃণা আসিয়াছিল। ভগবানকে স্মরণ করিয়া তিনি অহো-রাত্র যজমানের দণ্ড বিধান কামনা করিতে লাগিলেন। বাবু সাধুর পুত্র-বধূর কর্ণে সে সংবাদ পৌছিল।

বাবু সাধুর পুত্র,—ছোট হুজুর যদিও পশু প্রকৃতির লোক, কিন্তু পুত্রবধূ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বধূ সাধ্বী, পতিগতাপ্রাণা। পতির নিকট উপেক্ষিতা, উৎপীড়িতা হইলেও তাহার পতিভক্তির হ্রাস হয় নাই। পতিই তাহার ধ্যান, পতিই তাহার জ্ঞান। পতিপদ চিন্তা ব্যতীত তাহার কার্য্য নাই, পতির সুখ চিন্তা ভিন্ন তাহার অন্য কামনা নাই। কিন্তু পশু রত্ন চিনিবে কেন? অনিন্দ্য-

সুন্দরী, অনন্ত গুণশালিনী নারী শিরোমণি বধূরাণী মদ্যপ চরিত্রহীন স্বামীর মনমোহিনী হইতে পারিল না। চক্ষুষ্মান ব্যতীত চন্দ্রিকা শোভা কি চক্ষুহীন লোকে উপলব্ধি করিতে পারে ? ভীরুস্বভাবা বধূরাণীর অপরাধ,—সে কুল কামিনী, অনুচিত বেশভূষা করিতে আদৌ পটু নহে, আন্তরিকতায় তাহার অন্তর পূর্ণ—মৌখিক মিষ্টালাপ করিতে, মনের মত কথাটী বলিতে সে আদৌ শিক্ষা করে নাই, সে সকল বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র, তাই সারল্যময়ী, মাধুর্য্যময়ী দেবী প্রতিমার দিকে ফিরিয়াও চাহে না। সাঙ্গোপাঙ্গগণের কূট বুদ্ধিতে সে মদ্যপায়ী ও বিলাস পরায়ণ। দেবী প্রকৃতি পত্নীর তাহাতে বিষাদের কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু বিরক্তির কারণ নাই। সেবাধিকারিণী মনে মনে পতি পদ চিন্তা করে, পতি পদ সেবা করে, পতির সহিত কথোপকথন করে। বধূ অলোক সামান্যা—স্বামী ভক্তিতে সে সাবিত্রী রূপিণী।

বধূ যখন শুনিল,—ব্রাহ্মণ পত্নী নিদারুণ মর্ম্ম যাতনায়, অরুন্তুদ রোদনে ভগবানকে ডাকিতেছে, আর যজমানের দণ্ড বিধান প্রার্থনা করিতেছে, তখন একটা অমানুষিক ভয়ে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে দিবারাত্রি ভাবিতে লাগিল কেমন করিয়া ব্রাহ্মণপত্নীর তুষ্টি সাধন করা যায়। কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বধূ স্বয়ং পুরোহিত ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাতাভিলাষিণী হইয়া যাত্রা করিল। সে দিন দশমী—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়া বিষাদিনী বধূরাণী পুরোহিতের গৃহে উপস্থিত হইল। পুরোহিত পত্নী তখন মিষ্টান্ন পূর্ণ পাত্র হস্তে সমাগত আত্মীয় কুটুম্বগণকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেছেন।

বধূরাণী ঘোমটায় মুক ঢাকিয়া গৃহের দাওয়ার একটী কোণে সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অপরিচিত জনগণের সম্মুখে সে উপস্থিত হয় কেমন করিয়া ? ব্রাহ্মণী তাহা লক্ষ্য করতঃ বধূরাণীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে গা ?"

নবাগতা প্রশ্নের উত্তর না দিয়া গললগ্নীকৃতবাসে ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া গৃহান্তরে লইয়া গেলেন। তখনও পর্য্যন্ত নবাগতার মুখাবরণ উন্মোচিত হয় নাই।

ব্রাহ্মণী গৃহান্তরে যাইয়া পুনরায় নবাগতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে বাছা,আমি ত চিনতে পারছি না।" এইবার নবাগতা মুখ হইতে ঘোমটা সরাইয়া অতি ধীর, অতি কোমল, অতি করুণভাবে কহিল—"আমি মা, আপনার কন্যা।

নবাগতার মুখ দেখিয়া ব্রাহ্মণী ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন—তিনি অসন্তুষ্টা হইলেন বধূরাণী তাহা বিলক্ষণ বুঝিল। বুঝিল কি—পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়াইত সে এস্থানে আসিয়াছে। সে ব্রাহ্মণীর পদস্পর্শ করিয়া বলিল—"মা, কন্যা আমি, তুমি রাগ করলে, তুমি বিরূপ হ'লে আমি দাঁড়াই কোথা মা?"

ব্রাহ্মণীর অভিমানস্রোত প্রবল হইল। তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে, কম্পিত দেহে, কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—"সে দিনত পুরুষে পুরুষকে প্রহার করেছিল; আজ কি স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে প্রহার করতে এসেছে? তা' কর বাপু—কর, তোমরা বড়লোক--সবই করতে পার। কিন্তু ভগবান আছেন, ভগবান আছেন; তিনি এর বিচার করবেন।"

বধূ-রাণী, ব্রাহ্মণপত্নীর চরণপ্রান্তে পড়িয়া গেল। সে বলিতে লাগিল অভিশাপ দিওনা মা, অভিশাপ দিওনা। সে তোমার অবোধ ছেলে, কি করতে কি ক'রে ফেলেছে। আমি তোমার দুঃখিনী কন্যা, তাঁ'র হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, পদপ্রান্তে পড়ে ক্ষমাভিক্ষা করছি—ভিক্ষা কি দিবেনা মা? অভিমানবশে ব্রাহ্মণী বধূর সে কাতরতা, সে করুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। ব্রাহ্মণী বলিল—গরুমেরে জুতাদানে ফল কি? তোমরা বড়লোক গরীবের প্রতি অত্যাচার কর। ভাল দেখি, এখন গরীব আমরা ভগবানকে ডেকে তা'র কোন প্রতীকার করতে পারি কি না?"

"মাগো দয়া কর মা। আমি বড় অভাগিনী, বড় কাঙ্গাল। আমার অবোধস্বামীর অজ্ঞানকৃত দোষ ক্ষমা কর মা। প্রসন্না হও মা। অভিশাপ হ'তে মুক্ত কর মা।"

"দরিদ্র আমরা, আমাদের অভিশাপের আবার ক্ষমতা কি? 'যার' ভাত্ নাই, তা'র জাত্ নাই।' জাত্ যদি থাকত, তা' হ'লে কি পুরোহিত, যজমানের বাড়ীতে অপমানিত হয়, মার খায়!

"অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করবে না মা?"

"অসম্ভব—কিছুতেই নয়। যে ব্রহ্মরক্তপাত্ করে, তা'র আবার ক্ষমা কি?"

"কিন্তু সে রক্তপাত ত ইচ্ছা ক'রে কেউ করে নাই মা?"

"ভাল—না হয়, অনিচ্ছাতেই হ'ল। কিন্তু তা'র ফল একই?"

"তবে কি ক্ষমা পাব না মা?"

"না—কিছুতেই না। রক্তপাতে ক্ষমা কি সম্ভব?"

"আর যদি রক্তপাতের পরিবর্ত্তে রক্তপাত হয়?—"

"তা' হ'লে কতকটা শান্তি পাই।"

"তা হ'লে তোমার ক্ষমা করা উচিত মা। প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি শীতল হ'লে তোমার ক্ষমাকরা উচিত মা।"

"কেন, সে নিষ্ঠুর পশুর রক্তপাত হ'য়েছে নাকি? ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েছেন নাকি।"

বধূরাণী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া গৃহের বাহিরে ছুটিয়া আসিল। সম্মুখেই একখানা তীক্ষ্ণধার কুঠার পড়িয়াছিল। কুঠারখানা তুলিয়া লইয়া সে গৃহাভ্যন্তরে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। তাহার হস্তে কুঠার দেখিয়া ব্রাহ্মণী সাতিশয় শঙ্কিতা হইলেন। ব্রাহ্মণী গলদঘর্ম্ম হইয়া কহিলেন—"ও কি?"

বধূরাণী নিরুদ্বেগ চিত্তে কহিল—এই নাও মা নারীরক্ত তোমার চরণে উপহার দিতেছি। এখন ক্ষমা করিবে কি মা?"

ব্রাহ্মণী কুঠারখানা ক্ষিপ্রহস্তে ধরিতে গেলেন। কিন্তু ধরিবার পূর্ব্বে সে কুঠার বধূরাণীর বক্ষের উপর পতিত হইল। রক্তধারা ছুটিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের বাটীতে একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল পড়িয়া গেল।

৩

ছোট হুজুর একপাত্র মদ্য টানিয়া সাজসজ্জা করিতে করিতে একজন মো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল—"আজ কোনদিকে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করা যাবে হে?

মোসাহেব কহিল—"হুজুরের যে দিকে অভিরুচি।"

"দশমীর দিনটা একবার গঙ্গার ধারে গেলে মন্দ হয় না, কি বল?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

"নাঃ—আর যা'ব না।"

"না সেখানে গিয়ে আর কি হবে? সেখানে বড় ভীড়।"

"ভিড়ে আর আমার কি হ'বে। চল সেই দিকেই একবার যাওয়া যাক্।' সেখানে অনেক মজা আছে হে।"

"বটেই ত, বটেই ত, সে দিকে যেতে হবেই ত।"

হুজুর গাড়ী আনিবার জন্য হুকুম দিলেন। দ্বারবান আসিয়া কহিল—"ঘর্‌ওয়ালী গাড়ী ত মায়জী লেগিয়ে। হুকুম্ হোয় ত কেরায় মাঙ্গাই।" হুজুর আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"গাড়ী লে গেয়ি! কোন্ মায়জী লে গেয়ি?"

"ঘর্‌কা মায়জী হুজুর। বেরাহ্মণ ঠাকুর কো কোঠি মায়জী গিহিন্ হোগো।

"আচ্ছা যাও—বলিয়া হুজুর শশব্যস্তে বেশভূষা করিয়া লইল। তাহার স্ত্রী সন্ধ্যারপর কাহাকেও কিছু না বলিয়া, না কহিয়া বাটী ছাড়িয়া পুরোহিত ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়াছে শুনিয়া কি যেন একটা সংশয়ঘোরে আচ্ছন্ন হইল। যাহার যেমন প্রকৃতি, সে তদ্রূপ চিন্তাই করিয়া থাকে। তেমন ক্ষেত্রে আর হুজুরকে দোষ দেওয়া যায় কেমন করিয়া?

"হুজুর পদব্রজেই পুরোহিত গৃহে উপস্থিত হইল। পুরোহিত ঠাকুরও ইতিমধ্যে হুজুরদের বাটীতে আসিয়া বধূরাণীর "আত্মহত্যার" কথা জানাইয়া গিয়াছেন। ছোটহুজুর সে কথা শুনিবার পূর্ব্বেই বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিল। বড় হুজুর লোকলস্কর সঙ্গে করিয়া পুরোহিত গৃহে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের বাটীতে তখন ভারী গোলমাল। বড় হুজুর ও ছোট হুজুর সেই স্থানেই সাক্ষাৎ হইল।

ডাক্তার ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বধূরাণীর নাড়ী ও ক্ষত পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—"আঘাত সাংঘাতিক নহে, আর নাড়ীর অবস্থাও তাদৃশ মন্দ নহে। অতএব জীবনের আশা করিতে পারা যায়। তবে আরোগ্য হইতে সময় লাগিবে।"

রোগিনী ব্রাহ্মণের গৃহেই রহিলেন। ডাক্তারের নিষেধ তাহাকে স্থানান্তরিতা না করা হয়—স্থানান্তরিতা করিলে জীবনের আশঙ্কা আছে।

বড়হুজুর ও ছোটহুজুর তখন এতটুকু হইয়া পড়িয়াছেন। বধূরাণীর স্বামীভক্তি ও স্বামীকে ব্রহ্মশাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত পুলকিত হইলেন। কেবল সঙ্কুচিত হইলেন—বধূরাণীর স্বামী আর বধূরাণীর শ্বশুর। কারণ তাহারা যে পাপী। পুণ্যালোকে পাপী ত সঙ্কুচিতই হইয়া থাকে।

কিন্তু এই অবসরে, এই সুযোগে একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। লজ্জার খাতিরেই হৌক্, আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্তই হৌক, পশুস্বামী. দেবী পত্নীর রোগশয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিতে লাগিল, রোগিণীর একটু আধটু সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। মোসাহেবগণের ডাকাডাকিতে সে আর সহজে রোগিনীর শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া আসিতে চাহে না। অভ্যাস দোষে সে একটু আধটু মদ্যসেবন করে বটে—কিন্তু মাত্‌লিমিটা আদৌ নাই।

রোগিনী আরোগ্যপথে পা বাড়াইতেই তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইল। সে যখন আপনার বাটীতে ফিরিয়া আসে, তখন ব্রাহ্মণপত্নীকে ডাকিয়া তাঁহার

হস্ত দুইখানি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা তুমি আমার স্বামীকে প্রাণের সহিত ক্ষমা করেছ ?" ব্রাহ্মণী কহিলেন, "তুমি চিরায়ুষ্মতী হও মা ;—কলিকালে তুমি সাক্ষাৎ সাবিত্রী।"

বধূরাণীর হৃদয় হইতে দুশ্চিন্তার ভারী বোঝাটা নামিয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণীর স্কন্ধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া পাল্কীতে উঠিল। পাল্কী ধীরে ধীরে চলিল। ডাক্তারের আদেশ সেইরূপই।

বাড়ী আসিয়া বধূরাণী পাঁচ সাত দিনের ভিতর সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল। তখন তাঁহার স্বামীর অনুতাপানল জ্বলিয়াছে। অনুতাপের জ্বালায় সে অস্থির হইল। সে এখন পত্নীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেও লজ্জাবোধ করে। সে ভাবে—সে পশু ; পশু, দেবীর সম্মুখীন হইবে কিরূপে ?"

বধূরাণী সে ভাব লক্ষ্য করিয়া একদিন সুযোগমত স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যা গা তুমি অত ভাব কেন ?"

"অনুতাপের জ্বালায়। তুমি দেবী, পূর্ব্বে আমি তোমায় চিনিতে পারি নাই। এখন যত চিনিতেছি, তত যন্ত্রণা বাড়িতেছে।"

যদি চিনেছ, যদি আবার আমায় মনে ধরেছে, তবে তোমার চরণে আমায় আশ্রয় দাও। আমি তোমার আশ্রিতা লতিকা! তুমি অমন দূরে দূরে থাক্‌লে আমি বাঁচি কেমন করে ?"

"অনুতাপ—অনুতাপ !"

"কিসের—অনুতাপ !, এ রক্ত পাত না হ'লে কি তোমায় আবার আমি ফিরে পেতেম! এ রক্তপাত, রক্তপাত নয়—দেবতার আশীর্ব্বাদ ; এ রক্ত পাত আমাদের মিলনের বন্ধন। এ রক্ত পাত আমাদের সুখ শান্তির উপায়।"

বধূরাণী ও তাহার স্বামী নূতন সংসারে সংসারী হইল। তাহাদের সুখ শান্তিতে সংসারের অনেকেই সুখী হইল। বধূরাণী একদিন স্বামীকে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সে সব পুরাতন বন্ধু কোথায় গেল, তারা আর আসে না যে ?"

স্বামী হাসিতে হাসিতে কহিল, "যখন লক্ষীছাড়া ছিলেম্‌, তখন আমার উপর তাদের প্রকোপ ছিল, এখন লক্ষী পেয়েছি, লক্ষী চিনেছি, ভূতের দল গুলো অম্‌নি সরে পড়েছে।"

পত্নী জিজ্ঞাসা করিল—

"আমি তবে—"

পতি সহাস্যে কহিল—"লক্ষ্মী"।

গম্ভীরভাবে পত্নি কহিল—

"আর তুমি নারায়ণ—আমার সর্ব্বস্ব।"

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

আলোকে ও আঁধারে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য।

[কলিকাতা—ভবতারণের বসিবার ঘর।

ভবতারণ ও সিদ্ধেশ্বর।]

ভব। ওহে সিধু, ছোঁড়াদের একটু ভাল ক'রে তাড়াটাড়া দেও। চাঁদা আর আজ কাল তেমন আদায় হ'চ্চে না যে।

সিদ্ধে। তারা ত ঘুরছেই। লোকে গোড়ায় যেমন দিত,—এখন আর তেমন দিতে চায় না।

ভব। আঃ! কি সব দেশের লোক! যে দেশে চাঁদাই উঠে না, সে দেশ কি আর সহজে উঠ্‌বে? এইতে বড় একটা সমাজ গ'ড়ে তুলবার খরচ, কাজে প্রচার কার্য্যের খরচ,—এতে কি কম টাকা লাগ্‌ছে? এদের দুদিনও কোন উৎসাহ গরম থাকে না। নূতন নূতন যা একটু সব লাফালাফি করে, দু'দিন যেতে না যেতেই সব ঠাণ্ডা, যেন মেরুর জমাট তুষার! এমন হ'লে কি আর কোন দেশহিতকর কাজ চলে?

সিদ্ধে। টাকা ত আসছেই, তবে আগেকার মত অত বেশী নয়।

ভব। যা আস্‌ছে, তাতে চল্‌ছে কই হে? এই হতভাগা দেশের জন্যে খাটাই ঝক্‌মারী। এক একটা বক্তৃতা হবে, আর চারিদিক থেকে টাকার বৃষ্টি হবে,—তবে ত কাজে উৎসাহ হয়! এখন খালি কত আর চেঁচিয়ে বেড়ান চলে?

সিদ্ধে। কেউ কেউ বল্‌ছে,'ফাণ্ড' যা হলো,তার হিসেব ত এখনও বেরুল না!

ভব। এই ভাখ, কি নীচ সন্দেহ! ফাণ্ড ত র'য়েছেই। খেয়েছে কে?

তবে যারা খাটছে, তাদের খরচটা ত চালান চাই? সেই খরচ নিয়ে টাকা এখন বাঁচ্‌ছে কই? কিছু বাঁচলে ত তার হিসেব, নইলে হিসেব দেব কিসের ছাই? নাঃ! এ সব কাজে সাধারণের উপর নির্ভর করাটা কিছু নয়। গোটা কত বড় বড় লোক বাগান যেত—

সিদ্ধে। জগদীশ রায় কি দলে আস্‌বে?

ভব। বোঝা যাচ্ছে না, লোকটা নিজে মন্দ নয়, মতটাও মোটের উপর উদারই বলা যেতে পারে। তবে তার মা বেটী বড় পাজি—বেজায় গোঁড়া! জমিদারীটা সব আবার মাগীর নামে, মাগীর হাতেই রয়েছে। কাজেই তার অমতে চ'ল্‌তে সাহস পায় না।

সিদ্ধে। আমার মনে হয়, আর সাধারণের চাঁদার উপর নির্ভর না করে, সভ্যদের মাসিক চাঁদার উপরই ভর দেওয়া ভাল।

ভব। আমিও ত তাই বলি। এই বালক আর যুবকগণই হ'চ্চে দেশের আশা। এদের মন সরল, উদার ও উৎসাহের অগ্নিময়। মনে কোন নীচ সন্দেহও এদের আসে না। কাজ যা হবে এদের দিয়েই হবে। ছোঁড়াদের ব'লে দিচ্চি, সব দলে দলে কলেজে কলেজে ঘুরে নূতন নূতন সভ্য করে, আর কড়া ভাবে চাঁদা আদায় করে। ধর এই কলকেতায় ত ছাত্রসংখ্যা কম নয়। যদি চার হাজর সভ্যও হয়, মাসে চার হাজার টাকা ক'রে চাঁদা আস্‌বে।

সিদ্ধ। আহা তাহ'লে ত একটা জমিদারীর মত হয়। এর উপর বাইরের চাঁদা যা উঠে, আর মফঃস্বলে সভ্য করে বেড়িয়ে যা পাওয়া যায়,—তাতে সভাটা বেশ চলে যাবে। এ রকম একটা বাঁধা আয় হ'লে বিলাতে আর আমেরিকায়ও ছেলে মেয়েদের বছর বছর পাঠান যেতে পারে।

ভব। সেটা কি আর এ থেকে হবে সিধু? তার জন্যে আলাদা ফাণ্ড্ চাই। এ টাকা ত আমাদের সমাজটা গড়তে আর তার জন্যে প্রচার কার্য্যেই খরচ হ'য়ে যাবে। যত কাজ বাড়্‌বে,—সভ্য বাড়্‌বে ততই খরচ বাড়্‌বে। আবার এই কাগজটা রয়েছে,—সেটাকেও ত আরও ভাল করে চালাতে হবে? ওঃ খরচ কি কম?

সিদ্ধে। হাঁ, তা ত বটেই! তা ত বটেই! তবে এই বিনোদকে পাঠান গেল কিনা, তাই সবাই বলে, এই ফাণ্ড থেকে বৃত্তি দিয়েই বুঝি বিলেতে ছেলে পাঠান আপনার মতলব।

ভব। আঃ! বিনোদকে পাঠিয়ে ছিলুম, সে ত এই কাজটা চালাবে বলে।

একটা লোক তৈরী হ'য়ে এলে সভার লাভ কত! ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান এই সব জায়গা ঘুরেছে, কত অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে, তার দাম কত! এ ত কাচের দামে হীরে কেনা হয়েছে! ব্যারিষ্টারীও করবে, তাতে একটা কত বড় পদ গৌরব হবে, আর অবসর সময়টা ত সব আমাদের কাজেই দেবে,—একটা লেখাপড়াও ক'রে নিয়েছি। আমায় কি কচি ছেলে পেয়েছ সিধু?

সিদ্ধে। হাঁ, ভাল কথা মনে হ'লো;—বিনোদের বে থা দেবেন না?

ভব। এই ত্থাখ সিধু,—কি ব'ল্‌ছ! বে কি আমি দেব? সে নিজে দেখে শুনে করবে। আমার তাতে হস্তক্ষেপ করা যে আমাদের নীতির বিরুদ্ধ কাজ করা হবে। আমাদের এ সমাজের নেতা আমি, আমি কি নিজের বেলায় এই নির্দ্দিষ্ট নীতির বিরুদ্ধ কোন কাজ ক'ত্তে পারি?

সিদ্ধে। না, তা কেন করবেন? তা ত হতেই পারে না। তবে কিনা আপনি পিতা, আপনার একটা প্রভাব আর অধিকার ত আছে? তারপরে আমাদের সভ্যদের মধ্যে কারও মেয়ে ত সে বে করবে?

ভব। সে ত নিশ্চয়ই। সে যখন সভ্য,তাই তাকে তাই ক'ত্তে হবে বই কি? আবার এই সভারই সেবা করবে ব'লেই এগ্রিমেণ্ট পর্য্যন্ত লিখে দিয়েছে।

সিদ্ধে। দেখুন, আমি ত আপনারই অনুগত। গুরুর মত সব বিষয়ে আপনারই মতানুসরণ করে আস্‌ছি। আমার একটা মেয়ে আছে, তা আপনি একটু ব'লে ট'লে দিলেই—

ভব। তাকি আমি ক'ত্তে পারি সিধু? বিবেকের কাছে কি ব'লে জবাব দেব? অবশ্য আমাদের সভার মধ্যেই তাকে বে কত্তে হবে, এই পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে পারি। তবে ব্যক্তি সম্বন্ধে, আমার ত সবাই সমান সিধু? আমি মাথায় র'য়েছি, তোমাকে যতই কেন না ভালবাসি সিধু—কোনও রূপ ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব কি আমার দেখান উচিত? তবে তোমার মেয়েকে যদি বিনোদ পছন্দ করে, আমি খুব সুখী হব,সন্দেহ নাই। এই ত সেদিন ডাক্তার ভ্যাটাভেল এসেও তার মেয়ে চামেলীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। তাকেও আমি ঠিক এই কথাই বলে দিইছি। সেদিন লীলার ওখানে চামেলী যখন গান গেয়ে বিনোদকে মালাটি দিলে, সকলেই তখন মনে ক'রেছিলেন, এদের দুটিতে বিয়ে হ'লেই বেশ হয়। ডাক্তার ভ্যাটাভেল সে কথারও উল্লেখ ক'রেই বিবাহের প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধে। (স্বগতঃ) ইস্‌! সদুর গোঁড়ামিতে কি সুযোগটাই গেল? হায়,

হায়! সেদিন ওই মালাটা যদি রমা দিত? দেখি যদি বাড়ীতে নিয়ে টিয়ে মনটি আটকান যায়।

ভব। সিধু, তা তোমার স্কুলে কি ক'চ্চ? কই তেমন কিছু হ'চ্চে ব'লে ত মনে হচ্চে না।

সিদ্ধে। উপরের দিকের প্রায় সব ছেলেইত খাতায় নাম লিখিয়েছে। সভায় টভায় সবার আগে দল বেঁধে নিশেন নিয়ে আসে।

ভব। চাঁদা ত ২০।২৫ টাকার বেশী হয় না।

ভব। ছেলে ত তেমন বেশী নেই? অভিভাবকেরা অনেকেই ছেলে তুলে নিচ্চেন। তাঁরা বলেন, এখানে ছেলেরা কেবল হুজুগ করে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে সবার হাত পা ধরে তবে কতক ছেলে রেখেছি। ভালছেলেও বড় পাই না, পরীক্ষার ফল ভাল হয় না, তাতেও বড় টান পড়ে যাচ্চে।

ভব। হায়, হায়! কি সব হীনচেতা দেশের লোক! এই সব মহৎ-কার্য্যে যোগ দিয়ে ভবিষ্যতে দেশের মঙ্গল সাধন কর্‌বে,—তার চেয়ে ছাই লেখাপড়া আর পাশকরাই কি বড় হ'লো? তাতে কি হবে? টাকা! হায় দুর্ভাগ্যদেশের লোক! হায় অধঃপতিত সমাজ! কেবল দুর্গন্ধ অর্থই চিনেছ? ত্যাগ শেখনি, কেবল ভোগই শিখেছ? হায়! হায়! ভগবান্! কবে এ মোহাবেশ দূর হবে? কবে অন্ধকারে আলো আস্‌বে? কবে পাখীর মত পাখা তুলে দেশ এই হীন পার্থিব ধূলি ছেড়ে উজ্জল নিরমল উচল নভে উড্ডীয়মান হবে? সেখান থেকে যেন কুবেরের ভাণ্ডার খুলে অকাতরে এই মহদনুষ্ঠানে অর্থবৃষ্টি কর্‌বে! সিধু বল, বল! কবে সে দিন হবে?

মনু। (প্রবেশ করিয়া সুরে)

সেদিন কবে বা হবে?
বল বন্ধো! বল বল—
সেদিন কবে বা হবে?
তবে বলি শোন,—প্রভোগো, তবে বলি শোন!
(যেদিন) মাথারা সব মাথা দেবে,—
সেদিন সুধুই সেদিন হবে—
(নইলে) সভাই কর বাক্যি ছাড়,
দিন যে দূরে দূরেই রবে!

ভব। মাথাদিতে কি বাকী রেখেছি মনু?

মনু। কই, কাঁধেই ত দিব্বি র'য়েছে।

ভব। আর কি কর্‌ব মনু? আর কি চাও? সমস্ত জীবনটাই এই ব্রতে উৎসর্গ ক'রেছি,—নিজের জন্য একটুও ত রাখি নাই?

মনু। রাখ্‌বার প্রয়োজনও ত কিছু দেখ্‌তে পাইনে, দেব? ব্রতেই ত জীবনটা বেশ চলে যাচ্চে।

ভব। সর্ব্বস্ব সঁপেছি মনু, সর্ব্বস্ব সঁপেছি!

মনু। তা, একেবারে সর্ব্বস্বই না সঁপে, কিছুও যদি রাখ্‌তেন, গুরুদেব, তবে এই দীন চেলা ফেলা গুলোকে একেবারে উপোস ক'ত্তে হ'ত না।

ভব। উপোস ক'চ্চ মনু সে কি?

মনু। আজ্ঞে, একেবারে উপোস ক'চ্চিনি ঠিক্, তবে তার চেয়েও খারাপ কিছু ক'চ্চি,—দেনা ক'রে খাচ্চি। তাই ব'লছিলুম, একেবারে সর্ব্বস্ব না সঁপে কিছুও যদি রাখ্‌তেন তবে এতটা বিড়ম্বনা হ'ত না।

ভব। মনু, ত্যাগ শেখ! ত্যাগ শেখ! ত্যাগ বিনা কি মহৎকার্য্য কিছু হয়? দেশে ত্যাগের অভাবই বড় অভাব মনু! নইলে দেশ এত অধঃপতিত!

মনু। ত্যাগ আপনারা শেখালে ত শিখ্‌ব।

ভব। কত বক্তৃতা দিচ্চি,—জলন্ত ভাষায় কত ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাচ্চি—এতেও তোমরা শিখ্‌বে না? আর কি ক'র্‌ব মনু?

মনু। তা ত বটেই; আর কর্‌বেনই বা কি? বক্তৃতা ছাড়া এদেশের আর ক'রবারই বা কি আছে? বক্তৃতাই সাধনা, বক্তৃতাই সিদ্ধি, বক্তৃতাই মুক্তি;—সেই বক্তৃতা ত অবিরতই অগ্নিধারায় দেশময় বর্ষিত হ'চ্চে! নিতান্ত হতভাগ্য মূঢ় আমরা—তাই একটা কণাও গিয়ে প্রাণ স্পর্শ ক'চ্চে না।

সিদ্ধে। মনু বড় কষ্ট পাচ্চে। খাট্‌ছেও খুব। ওকে কিছু খরচপত্র দিয়ে দেওয়া দরকার। দেনা করে কদিন চালাতে পারে?

ভব। (আদর করিয়া মনুর পিঠ চাপড়াইয়া) বড় ভাল ছেলে মনু। তা এবার যা চাঁদা তুল্‌বে—তা থেকে খরচ কিছু নিও। সব তোমাদেরই ত—নিলেই হ'লো। তবে কি জান মনু, তোমাদের ত্যাগ শেখা বড় দরকার। একেবারে নিষ্কাম নিঃস্বার্থ সমাজ সেবাই হচ্চে প্রকৃত সেবা। নিজেরা কিছু উপার্জ্জন করে যদি নিজেদের খরচটা চালিয়ে নিতে পার, তবে তোমাদেরই এই

সমাজ সেবা একেবারে নিষ্কাম নিঃস্বার্থ হয়। আমি তাই তোমাদের শেখাতে চাই,—তাই খরচটরচ দিতে একটু টানাটানি করি। তা, সিধু, তোমার স্কুলে একটা কাজ ওকে দেও না?

মনু। সেও কি নিষ্কাম নিঃস্বার্থ হ'য়ে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা ক'ত্তে হবে সিধুবাবু?

সিদ্ধে। আরে না না, পাগল তা নয়। মাইনে পাবে বই কি! কাজও একটা খালি আছে। তা, আমার সঙ্গে স্কুলে গে দেখা করো। তুমি কাজটা নিলে ভালই হয়। ছেলে পিলেরা সব তোমায় এমন ভালবাসে। ছেলেদের মধ্যে আমাদের সভার কাজটা বেশ চল্‌বে।

মনু। দোহাই সিধু বাবু, ওইটি হবে না। ওই সব ছোট কচি মাথায় এ সব বড় বড় শক্ত কথা ঢোকাতে পার্‌ব না। এখন খেলাক, বেড়াক, পড়ুক শুনুক;—তারপর বড় সড় হ'য়ে যে যে পথ ভাল দেখ্‌বে যাবে। ছেলে ভজান ও সব সিধু বাবু আমাকে দিয়ে হবে না। বুড়োদের ভজাতে বলেন, চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।

ভব। সে কি মনু? ছেলেবেলা থেকেই মন তৈরী হওয়া চাই। ছেলেদের কাদার মত মনইত গড়ে নিতে হবে। বুড়োরা ত সব শক্ত মাটি,— তাদের কি আর সহজে এদিক ওদিক করা যায়।

মনু। এইখানে গুরুদেব, আমার হালকা বুদ্ধিটা কিছু আলাদা রকম যাচ্চে। ছেলেদের মোটামুটি ভালর মধ্যে থেকে আপনারাই গড়ে উঠে ভাল; একটা মতলব ধ'রে ছেলে গড়তে চেষ্টা কল্লে মানুষ গড়া হয় না, এক ছাঁচে ঢালা সব পুতুল গড়া হয়।

ভব। তবেইত মুস্কিল কল্লে মনু! তুমি ত ছেলেদের সব তবে নষ্ট কর্‌বে, দেখছি। স্কুলের কাজ তোমার না করাই ভাল। তা আমাদের ছাপা-খানায় কম্পোজিটারের কাজ একটা খালি আছে। সেইটেই কর না?

মনু। আজ্ঞে সেটা ত শিখিনি? দুই এক কলম (column) কলমে কম্পোজ ক'ত্তে পারি, কিন্তু টাইপ বেছে কম্পোজটা ত অভ্যাস হয়নি!

ভব। তাইত, তাইত! তবে শিক্ষানবিশীই কর না? কাজটা শিখলে, তখন কিছু মাইনে ধরে দেওয়া যাবে। তোমার ত আর বেশী কিছু খরচ নেই? নিজের খাওয়া পরা আর ঘর ভাড়াটা হ'লেই হ'লো তা না হয় আমা-দের ছাপাখানাতেই থাকবে। ঘর ভাড়া বলে সামান্য কিছু ধ'রে দিও।

মন্থ। আজ্ঞে, এর জন্যে আর এত মাথা, এত কথা, কেন বৃথা খরচ কচ্চেন? আমার পথ আমি নিজেই দেখে নেব।

ভব। আহা তা নিজে ত পারবেই। এমন চতুর উদ্যমশীল যুবক তুমি, তুমি কি আর নিজেকে নিজে প্রতিপালন কর্ত্তে পারবে না? তবে কি জান মন্থ, তোমাদের মত শিক্ষিত কম্পোজিটার হ'লে বড় কাজ হয়। ভুল হয় না, প্রুফ দেখার খরচটা অনেক বাঁচে। তাই বল্‌ছিলুম, তোমার কর্ম্ম শক্তিটা বরং এতেই দেও। এও ত এক রকম প্রচার কার্য্যেরই সহায়তা করা। তোমার মত ত্যাগী যুবকের কর্ম্মশক্তি কোথায় আর এমন সদ্ব্যবহৃত হবে?

মন্থ। আজ্ঞে, সেটা বোধ হয় সুবিধা হ'বে না।

ভব। আহা, একেবারে ঝাঁ করে জবাবটা নাই দিলে। একটু ভেবে টেবে দেখ।

মন্থ। আজ্ঞে, ভাবাটাবা সব হয়ে গেছে। এ সব ঠিক কর্ত্তে বেশী ভাবনা লাগে না। তবে খরচটরচ কিছু পাওয়া যাবে না আজ?

ভব। হাতের তফিলে টাকা ত আজ কিছু নেই মন্থ। সব ব্যাঙ্কে চলে গ্যাছে। এরপর যা চাঁদা আদায় কর্‌বে, তাই থেকে কিছু দিয়ে দেওয়া যাবে।

মন্থ। আচ্ছা, তবে আসি আজ।

ভব। এস বাবা।

[মন্থর প্রস্থান।

সিদ্ধে। টাকার ত আমারও কিছু বড় দরকার। ২।৩ মাসের মাইনে পাইনি, বড় টানাটানি যাচ্চে।

ভব। এক রকম করে চালিয়ে নেও না সিধু? মাইনে ত পাবেই। হাতে কিছু টাকা আসুক। তোমার ত স্কুল থেকেও দু পয়সা হ'চ্চে।

সিদ্ধে। আজ্ঞে আজ কাল আর হ'চ্চে কই? মাষ্টারদের মাইনেই দিয়ে উঠতে পারি না। তারা ত মাথা খেলে। কিছু কি দিতে পারেন না আজ?

ভব। কোত্থেকে দিই বল? এই ত মন্থ এত কষ্ট পাচ্চে,—আহা, তাকেও ত কিছু দিতে পাল্লুম না।

সিদ্ধে। তা—ব্যাঙ্ক থেকে কিছু তুলে হ'ত না?

ভব। সর্ব্বনাশ! এই সব খুচ্‌রো খরচের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুল্‌ব? তাও কি হয় সিধু? তা হ'লে ত দুদিনেই সব ফুরিয়ে যাবে? নতুন টাকা তুল্‌বার কোন চাড়ই থাক্‌বে না। এ সব সাধারণের টাকা সিধু, খুব

কড়াভাবে রক্ষা ক'র্ত্তে হয়। নিজের যদি হ'ত, তা হ'লে কোম্পানীর কাগজ বিক্রী ক'রেও তোমায় চালিয়ে দিতুম।

সিদ্ধে। আচ্ছা, তবে আসি আজ, হাত একেবারে খালি,—কোথাও কিছু হাওলাতও পেলুম না।

ভব। চালিয়ে নেওগে—চালিয়ে নেওগে না একরকম ক'রে! ও কি আর ঠেকে থাকবে? আচ্ছা—দেখি (পকেটে হাত দিয়া) এই নেও এই দুটো টাকা আজকে নিয়ে যাও। নিজের খরচা থেকেই দিয়ে দিলুম একটু কষ্ট হবে—তা হ'কগে। তোমাদের জন্যে কোন কষ্টই আমি গায় তুলিনে।

সিদ্ধে। আচ্ছা আসি তবে।

ভব। এস আমাকেও বেরোতে হবে। জগদীশ্বর বাবুর ওখানে একবার যেতে হবে। [উভয়ের প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

মিলন।

লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনের বৃহৎ মোসাফেরখানা—জনপূর্ণ। এত অধিক জনসমাগম হইয়াছে যে, দেখিলে বোধ হয় ভূতলে আর একটি তিল রক্ষার স্থান নাই। কাল প্রহরাধিক রাত্রি। ষ্টেশনে অপ্ এবং ডাউন ট্রেন দুই খানিই রাত্রি তৃতীয় প্রহরে প্রায় এক সময়ে উপস্থিত হইবে, সুতরাং এখনও অনেক দেরী ছিল। যাহারা পূর্ব্বাহ্নে স্থান সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহারা নিজ নিজ পোঁটলা পুটলির উপর কোন গতিকে শ্রান্ত ও ক্লান্ত তনু ঢালিয়া দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে। আর অদৃষ্ট ক্রমে যাহারা পরে আসিয়াছে তাহারা পূর্ব্বোক্ত মহাশয়গণের চরণ তলে কৃপা ভিখারী কুকুরের মত বসিয়া অবসন্ন ভাবে ঢুলিতেছে; আর যাহারা সবেমাত্র আসিতেছে, তাহাদের অবস্থা সম্যকরূপে ব্যক্ত করিতে পারিব না। তবে কতকটা আভাস দিতে পারি।

যাহারা শয়নের এবং উপবেশনের স্থান সংগ্রহ করিয়াছে তাহাদের চিত্তের

প্রসন্নতা যুদ্ধজয়ী কোন বীরের অপেক্ষা কম নহে। নবাগত দেখিলেই শরীর বিস্তৃত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতেছে; আর মধ্যে মধ্যে ঈষন্মুক্ত বঙ্কিম দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে। নবাগত দলের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট স্থান প্রার্থনা করিয়া অল্পবুদ্ধির পরিচয় দিতে ছিল, তাহাদের অধিকাংশই সুদীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা প্রবোধিত হইত; এইরূপ যে, গাড়ী আগতপ্রায়, নবাগতগণ কিছুক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিলেও পারিবে। ইহার উপর কোন নবাগত কোন কথা কহিলে তাহার অদৃষ্টে প্রহারের সম্ভাবনা ও লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছিল।

এইরূপ একটি বিশ্রামভোগী দলের নিকট কয়েকটী রমণী কাতরভাবে একটু খানি স্থান প্রার্থনা করিতেছিল। তাহাদের কাতরতা হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা এবং বালিকাগণের ক্রন্দন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দলের কাহারও করুণা উদ্রেক করিতে পারে নাই—রমণীগণ জানু পাতিয়া করযোড়ে—চাহিল, কাঁদিল কত আশীর্ব্বাদ করিল, কিন্তু হায়! ষ্টেশনের মোসাফের সুবিশাল খানারূপ রাজত্বে স্থান প্রাপ্ত মহাত্মগণ এতই মদগর্ব্বিত যে, দুর্ব্বলা, শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন রমনীগণের আকুল প্রার্থনার উত্তরে নানারূপ ভঙ্গী সহকারে হাস্য তামাসায় নিযুক্ত হইলেন।

হয়ত ঐ দলের কাহারো কাহারো ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার কোন ক্ষমতা নাই;—কেন না, যখন যে দলে থাকিতে হইবে তাহার নিয়ম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং সকলেই সমভাবাপন্ন। ঐ বিপন্না রমণীগণ স্বতন্ত্রভাবে সকলের নিকট ভিক্ষা চাহিল কিন্তু কোন ফল ফলিল না, অবশেষে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া হাস্য পরিহাস এতই প্রবল হইয়া উঠিল, যে লজ্জাশীলা মহিলাগণ হতাশভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রমণীগণের অধিকাংশই যুবতী, সুন্দরী ও বিচিত্র বেশ ভূষিতা। এরূপ স্থানে স্থানীয় লম্পট ও কুচরিত্র যুবকগণ যে তাহাদের অতি সন্নিকটে স্থান সংগ্রহ করিবে ও বঙ্কিম কটাক্ষ দৃষ্টি সঞ্চালন করিবে এবং স্ব স্ব মূর্ত্তি স্বয়ং কার্ত্তিকের অনুরূপ ভাবিয়া স্ত্রীলোকদিগের নয়ন সমক্ষে ধরিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে বৈচিত্র কিছুই নাই, এক্ষেত্রে উক্তরূপ কার্য্যে প্রতিযোগীতা এতই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল যে, অত্যল্প কাল পরে, তথাকার উজ্জল গ্যাসালোকে সুতীক্ষ্ণ ও বৃহৎ ছুরিকা সকল ঝলসিয়া উঠিতে লাগিল। তর্ক বিতর্ক,—উচ্চ চীৎকার শব্দে সে স্থান বিভীষিকাময়ী হইয়া উঠিল। ছোরা ছুরীর আবির্ভাব দেখিয়া

নিরীহ ব্যক্তিগণ প্রাণপণে দৌড়িয়া পলায়ণ করিতে লাগিল। সহসা সেই বৃহৎ বাস মণ্ডপ বিকট আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

এদিকে দুইদল যখন সম্মুখীন হইয়া প্রতিযোগী-যুদ্ধে অগ্রসর হইল, অপরাপর দল, সুযোগ বুঝিয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকটস্থ হইয়া তাহাদের অবরুদ্ধ করিল। স্ত্রীলোকদিগের শেষ অবলম্বন—ক্রন্দন। ক্রন্দন ধ্বনিতে দিগ্‌মণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠিল।

লিখিতে যে সময় গেল, ঘটনা ঘটিতে তাহার শতাংশের এক অংশও লাগে নাই—এত অল্প সময় যে, অদূরস্থিত রেলওয়ে কর্ম্মচারীবৃন্দ অথবা পুলিশ কর্ম্মচারী কেহই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে পারিল না।

আক্রমণকারিগণ নিরুদ্বেগে অগ্রসর হইল, রমণীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল, বয়স্থাগণ ভগবান স্মরণ করিতে লাগিল। কিন্তু কোন ফলই ফলিল না। রমণীগণের পশ্চাতে একটি মধ্যবয়স্কা সুন্দরী যুবতী দাঁড়াইয়া বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতেছিল। রমণীর-সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। সুন্দর মুখশ্রী কাতরতায় এক অলৌকিক সৌন্দর্য্য উৎপাদন করিতেছিল। হঠাৎ এক নরপিশাচ তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল। ক্রন্দনরতা, আকুলা কামিনী এক মুহূর্ত্ত পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাব ধারণ করিল। তৎক্ষণাৎ বামহস্তদ্বারা নিজ বসনমধ্য হইতে সূক্ষ্ম ফলক বিশিষ্ট এক ছুরীকা বাহির করিয়া আক্রমণ-কারীর বক্ষপরি স্থাপন করিল। এক মুহূর্ত্ত; একটু চঞ্চলতা প্রকাশ করিলেই সেই ছুরিকা তাহার বক্ষমধ্যে আমূল প্রবেশ করিবে!

সে ব্যক্তি সভয়ে, তাহার হস্ত পরিত্যাগ করিল।

ঠিক এই সময়ে, এক দীর্ঘ শশ্রু ও গুম্ফ জটাধারী সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী সঞ্চালন করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কোন কথা নাই। অতি ধীর ও মন্থর গতিতে তিনি ঘটনা স্থলের নিকটবর্ত্তী হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি এক যাদুমন্ত্র বলে, হঠাৎ যেন সেই পৈশাচিক অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। যে যেমন অবস্থায় ছিল, ঠিক তদবস্থায় স্থির, নিশ্চল হইল।

সন্ন্যাসী কোন কথা কহিলেন না। ধীরে ধীরে রমণীগণের সন্নিকটস্থ হইয়া ইঙ্গিতে তাহাদের একজনকে ডাকিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে লইয়া জিজ্ঞাসিলেন—

"তোমরা কোথা যাইবে?'

রমণী উত্তর দিল, "আমরা এলাহাবাদ যাইব। প্রয়াগে কুম্ভমেলা দর্শনই ইচ্ছা আছে।"

"সকলেই ?"

"হাঁ। কেবল আমাদের একটি অল্প বয়স্কা বাঙ্গালী সঙ্গিনী আছে তাহার যাওয়ার কোন স্থিরতা নাই।"

সন্ন্যাসী একটু বিচলিত ভাবে বলিলেন, "বাঙ্গালী সে কোথায় ? তোমাদের সঙ্গে আছে ?"

"হাঁ। যে মূর্চ্ছা গিয়াছিল, সেই বাঙ্গালী। যাহাকে দস্যুরা ধরিয়াছিল।"

সন্ন্যাসী যেন আরো অধিক বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কিয়ংক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে বলিলেন, "সে বাঙ্গালী ?"

"হাঁ।"

"সে কেন তোমাদের সঙ্গে হিন্দুস্থানী সাজে, বলিতে পার ?"

"পারি। যতটা জানি। সে এক খুব ধনী লোকের মেয়ে ছিল ; বাল্যকালে সে তাহার পিত্রালয়ের নিকটেই—এক প্রতিবাসী বালককে খুব ভালোবাসিত। ক্রমে সে বিবাহের যোগ্য বয়সে উপস্থিত হইলে, ভাগ্য ক্রমে সেই যুবকের সহিত তাহার সম্বন্ধ হয়। বালিকা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কত সুখের কল্পনা করে কিন্তু তাহার সহিত তাহার বিবাহ হইল না। সেই যুবকের অন্য সকল গুণ ও মোহন সৌন্দর্য্য থাকিলেও সে মন্তপ ছিল—কাজেই বালিকার পিতা-মাতার মত হইল না। ঐ বালিকা এবং যুবক উভয়েই এ কথা শুনিল। গোপনে উভয়ে গৃহত্যাগ কল্পনা করিল,—সব স্থির। হঠাৎ বালিকার মতি পরিবর্ত্তিত হইল। সে তাহার পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। মাতাকে ছাড়িয়া সে প্রেমের অন্বেষণে যাইতে স্বীকৃতা হইল না। হতাশ প্রেমিক যুবক সংসার পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। বালিকা অনন্তমনে তাহাকেই চিন্তা করিত। সে তাহার সঙ্গিনী হইতে পারিল না বলিয়া, তাহার প্রেমে জলাঞ্জলি দিতে পারে নাই। হঠাৎ সে শুনিল—তাহার বিবাহ অন্যত্র স্থির হইয়া গিয়াছে। প্রথামত কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল। বালিকা নিরুপায়! সে কি করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। কাঁদিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ের বুক ফাটে ত, মুখ ফোটে না——সে কাহাকেও কিছু বলিতে পারে না। একদিন গভীর রাত্রে সে নিজ প্রকোষ্ঠে চিন্তামগ্ন অব-

স্থায় শুইয়া ছিল, এমন সময়ে, উজ্জ্বল আলোকের সঙ্গে তাহার চিন্তার মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে প্রকটিত হইল। সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাহাকে বলিয়া দিল— সে যাহাকে ভালোবাসে, যে তাহারই জন্য কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছে দুর্ব্বল বিধি-লিপি যদি অদৃষ্টে তাহাদের মিলন না লিখিয়া থাকেন—পুরুষকারের বলে সে তাহাকে লাভ করিবার অধিকারী হইবেই। সে সেই প্রতীক্ষায় দেশ-বিদেশে ঘুরিতেছে। পুরুষকার বা বিধি-লিপি গৃহাগত ঐশ্বর্য্য নয়। তাহা চেষ্টা, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ও প্রযত্ন লভ্য। এই কথা শুনিয়াই বালিকা বিবাহের পূর্ব্বরাত্রে সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করে। সে আজ সাত বৎসরের কথা। আমরা তা'কে কাশী মণিকর্ণিকার ঘাটের সোপানে ক্রন্দনরতা দেখিয়া সঙ্গে লইয়া আসি। তদবধি সে আমাদের সঙ্গিনী।" এতদূর বলিয়াই রমণী সন্ন্যাসীর মুখেরদিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিল। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, সন্ন্যাসী রমণীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "তাহার বয়স ?"

'টং—টং—টং—ঠং—ঠং—ঠং।'

"এই যে গাড়ীর ঘণ্টা, আপনি কি আমাদের কয়খানা টিকিট করিয়া দিবেন ?"

"দিতেছি"—বলিয়া সন্ন্যাসী টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

যথা সময়ে এই দল প্রয়াগে উপনীত হইল। সন্ন্যাসী আর তাহাদের নিকট আসেন নাই। আসিলে ভালো হইত। তাহাদের বাঙ্গালি-সঙ্গিনীটি সেই দিনের ঘটনার পর হইতে পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছিত হইতেছে ও অচৈতন্য অবস্থায় কত কি বলিতেছে। কত টোট্‌কা, টাট্‌কা, মুষ্টি-যোগ দেওয়া হইল, কিছুতেই তাহার উপশম হইতেছে না; এ সময়ে মন্ত্রবল-সম্পন্ন-সন্ন্যাসী একবার দর্শন দিয়া প্রশমনের উপায় করিলে ভালোই হইত।

রমণী (নবীনা) চৈতন্যহীনা। তাহার নবনীত, কোমল, দেহ পল্লব, শুষ্ক ও বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গাঢ়বর্ণের উপর একখানি মসীচিত্র লেপিয়া গিয়াছে। চক্ষু কোটরাগত তাহাকে লইয়া তাহার সঙ্গিনীগণ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

একদিন সন্ধ্যাকালে যখন ঐ নবীনা বঙ্গীয় যুবতীর অবস্থা অতি শোচনীয়। প্রয়াগে সম্মিলন সমীপবর্ত্তী একটি গৃহে তাহার শয্যাপার্শ্বে হিন্দুস্থানী রমণীগণ উদ্বেগ-ব্যাকুল -হৃদয়ে উপবিষ্ট—হঠাৎ গৃহদ্বার খুলিয়া

গেল। তাহাদের পরিচিত সেই সন্ন্যাসী শান্ত, মধুর-হাস্যমুখে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রোগিণীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ডাকিলেন, "শৈ! শৈ শৈবলিনী, তুমি রোগমুক্তা। দেখ আমি নরেন্দ্রভূষণ!—শৈ!"

"তুমি! তুমি! এত নির্দ্দয়, তুমি! সে দিন দেখা দিয়া আবার লুকা-ইয়াছিলে কেন?"

"লুকাই নাই। তেমায় পেয়ে, তোমার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ চিন্তায় নিযুক্ত ছিলাম।"

"কি স্থির কল্লে—নরেন্দ্র?"

"শৈ! আমরা অভেদাত্মা—একই হৃদয়। নতুবা এরূপ সম্মিলন-অসম্ভব। তুমি আমি এক,—সব এক। এসো, প্রয়াগের এই মহামিলনক্ষেত্রে, এই পবিত্র সঙ্গমে উভয়ে মিলিত হই। এস স্নান কোরে আসি। অরুণোদয়ে যোগ আরম্ভ।" উভয়ে স্নান করিয়া দিব্য বসন পরিধান করিল। তারপর!—

কুম্ভমেলায় অগণ্য যাত্রী সমাগমে, পীড়িত, আতুর ও নিরাশ্রয় ব্যক্তির ভার বহন করিয়া দুইটি দিব্যকান্তি নরনারী পুণ্য ও শান্তি বিতরণ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছিল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

রঙ্গ বারিধি।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

কাজের চরম।

(১)

নিম্নে একখানি প্রকোষ্ঠে বাইসখানি কুশাসন পড়িয়াছে, বাইসখানি থালা তাহাদের সম্মুখে স্থাপিত;—তাহাতে ভাত ও আলুর দম দেওয়া হইয়াছে। দুইটা করিয়া আলুর দম প্রত্যেকের বরাদ্দ। দেখিতে দেখিতে কুশাসনে মনুষ্য উপবিষ্ট হইল, তৎপরে অন্ন ক্রমেই অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিল। বিজয়চন্দ্র এক পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতে ছিলেন, তিনি চাহিলেন "ঠাকুর আর গোটা কতক আলুর দম দাও।"

ঠাকুরের স্কন্ধে একখানি মলিন গামছা, গলায় একটী হৃষ্টপুষ্ট পইতা। বিজয়চন্দ্র দম চাহিলে সে বলিল, "আলুর দম আর নাই।"

বিজয়চন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কেন।"

ঠাকুর উত্তর দিল, "দুটো করেই তো বরাদ্দ।"

বিজয়চন্দ্র সহসা চটিয়া যাইতেন, বলিলেন, "তোর বরার্দ্দের না কিছু করেছে; এই দিকে নিয়ে এস দেখি।"

গোলমাল শুনিয়া অপর পার্শ্ব হইতে একজন বলিলেন, "বিজয় বাবু ব্যাপার কি?"

বিজয়চন্দ্র করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "দেখুন না মশায় অত্যাচার, দুটো আলু দিয়েছে তার আবার কড়তা বাদ!" তিনি একটা আলুর অর্দ্ধভাগ উত্তোলন করিয়া ধরিলেন। কয়েক জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজয়, কড়তা বাদ কি হে?"

বিজয়চন্দ্র বিকৃতস্বরে কহিলেন, "দেখ্‌ছ না আলুর আধখানা নেই, ওজনে ভারি হয়েছিল বলে, ঠাকুর এর আধখানা কড়তায় কেটে নিয়েছেন।"

গৃহের ভিতর একটা মহা হাসির রোল পড়িয়া গেল। ঠাকুর বেগতিক দেখিয়া বলিল, "আলু আর নেই আপনাকে আর একখানা মাছ বেশি দিচ্ছি।"

বিজয়চন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এইতো বাবা লক্ষ্মী ছেলের মত কথা" তৎপরে মৎস্যের ঝোল দেখিয়া বলিলেন, "বাপু তোমার একি ঝোল! এ যে বাপ ধাপার বিল। কলে যত জল পেয়েছ সবই কি ঝোল বানিয়ে রেখেছ?"

আবার একটা হাস্যের তরঙ্গ উঠিল। অনেকেই আহার নাম মাত্র করেন, সেরূপ চমৎকার রন্ধন প্রস্তুত দ্রব্য আহার করাও অসাধ্য। অনেকেই বৈকালে খাবারওয়ালা আসিলে দুই একটা করিয়া চারি পাঁচ আনার জল খাবার খাইয়া ফেলেন; সুতরাং আহারের সময় ক্ষুধার আর তত তীক্ষ্ণতা থাকে না। প্রায় আহার শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, "বিজয় বাবুর সম্বন্ধী বাবু এসেছেন।"

ঝি, মেসের ঝি; সুতরাং বয়স অল্প তবে নিতান্ত যুবতী বলিতেও পারা যায় না। হাতে চুড়ি আছে, পেড়ে কাপড়ও পরা হইয়া থাকে কেশেরও বেশ পারিপাট্য আছে, বাবুদের সম্মুখে প্রায়ই মাথার কাপড় সরিয়া যায়, পান দিবার সময় অনেকের মুখের উপরই হাসিয়া ফেলে। সে বালবিধবা, উৎপীড়তা হিন্দু বিধবা বলিয়া বাসার আনন্দ বাবু তাহাকে

বড় দয়াদ্র চিত্তে দেখিতেন,—দুই একখানি বস্ত্রও তিনি তাহাকে দিয়াছিলেন। তাঁহার সময় সময় এমন ইচ্ছাও হইত যে, তিনি অভাগিনীকে বিবাহ করিয়া একটা প্রকৃত সমাজের সদনুষ্ঠান করিয়া ফেলেন। বিজয়চন্দ্র প্রায়ই বলিতেন, ঝি বাজারের পয়সা ভয়ানক চুরি করে, কিন্তু আনন্দ বাবু কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। অন্য কাহাকে জল খাবার আনিতে দিলে, সে তিন পয়সায় ছয়খানি কচুরী আনে কিন্তু ঝিকে দিলে কেবল চারিখানি মাত্র আসে, ইহাতে আনন্দ বাবু ভাবিতেন, অবোধ বালিকা দেখিয়া দোকানদারগণ তাহাকে ঠকায়। ৩০।৩৫ বৎসর বয়স্ক ঝিকে বালিকা বলা ব্যাকরণ শুদ্ধ কিনা এ বিষয় লইয়া বহুদিন বিজয়চন্দ্রের সহিত তাঁহার মহা বাকবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে, তিনি বলেন, দেহতত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্বের দ্বারা অতি সহজে তিনি ইহা প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন। বিজয়চন্দ্র আহার হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "এ নিশিতে,—কি উদ্দেশ্য ?"

ঝি একটু মৃদু হাসিয়া মস্তকের কাপড় একটু টানিয়া বলিল, "অত জানিনা বাপু, তাঁকে আনন্দ বাবুর ঘরে বসিয়ে এসেছি, তিনি আপনাকে খবর দিতে বল্লেন।"

বাবুদের মধ্যে অনেকেই বলিয়া উঠিলেন, "আরে যাও যাও, খাওয়া রাখ, বড় কুটুম্ব বিশেষ খাতির প্রয়োজন। একেইতো তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কন না,—তার উপর ভায়ের অখাতির হ'লে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন।"

বিজয়চন্দ্র আহার শেষ করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "সকলি বরাতে করে, কে রোধিবে তায়।" দেখিতে দেখিতে এক এক করিয়া ক্রমেই সমস্ত কুশাসন শূন্য হইতে লাগিল।

(২)

বিজয়চন্দ্রের ছোট শ্যালক আনন্দ বাবুর গৃহে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আরো দুই চারি জন বাবু এত রাত্রে বিজয়চন্দ্রের সম্বন্ধীর আগমনের কারণ জানিবার জন্য সেই গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, "কি খোকা খবর কি ? জামাই বাবুকে নিতে এসেছ নাকি ?"

বালক অবনত মস্তকে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "কাল জামাই ষষ্ঠি তাই জামাই বাবুকে বল্‌তে এসেছি। কাল আমাদের বাড়ী খেতে হবে।"

বাবুদের মধ্যে একজন গৃহের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওহে বিজয় শুভ সংবাদ! কাল জামাই ষষ্টি তোমার চোব্য চোশ্য লেহ্য পেয়র বন্দোবস্ত।"

"তাই নাকি" বলিয়া ঠিক সেই সময় বিজয়চন্দ্র আনন্দ বাবুর গৃহে প্রবেশ করিলেন;—গম্ভীর ভাবে একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "তারপর খবর কি, সব ভালোত?" বালক সেইরূপ অবনত মস্তকে বলিল, "হাঁ আমাদের বাড়ীর সব ভালো, আপনি ভাল আছেন তো?"

বিজয়চন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "অসুখে অশান্তিতে বেশ এক রকম আনন্দেই কেটে যাচ্ছে।"

আনন্দবাবু একপার্শ্বে বসিয়া ছিলেন;—বলিলেন, "বিজয়বাবু অসুখে অশান্তিতে আনন্দে কেটে যাওয়া কথাটা কিরূপ যুক্তি সঙ্গত হ'লো?"

বিজয়চন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "যুক্তি সঙ্গত না হ'তে পারে, কিন্তু ন্যায় সঙ্গত হয়েছে।"

আনন্দবাবু বিজয়চন্দ্রের দিকে বিস্ফারিতভাবে চাহিয়া বলিলেন, "যুক্তি সঙ্গত ও ন্যায় সঙ্গত এ দুটো কি ভিন্ন পদার্থ?"

বিজয়চন্দ্র আবার সেইরূপ ভাবেই বলিলেন, "ভিন্ন পদার্থ না হ'তে পারে, কিন্তু ভিন্ন জিনিষ বটে।"

আনন্দবাবু বিরক্ত হইয়া চুপ করিলেন। বালক বলিল, "জামাইবাবু কাল আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতে হবে।"

বিজয়চন্দ্র বলিলেন, "তাই নাকি?"

বালক বিজয়চন্দ্রের হস্ত ধরিয়া বলিল, "ও তাই নাকিতে চল্‌বে না, কাল যেতেই হবে;—না গেলে মা বড় দুঃখীত হবেন।"

বিজয়চন্দ্র একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মাতো দুঃখীত হবেন, কিন্তু তোমার ভগ্নী যে বিশেষ সুখীত হবেন এমনত্তো বলে বোধ হয় না।"

বালক উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, "ওসব কোন কথা শুন্‌ছিনে, বলুন যাবেন।"

বিজয়চন্দ্র বলিলেন, "কাজে কাজেই!"

"তা হ'লে নিশ্চয় যাবেন, কাল যেন না আমায় আবার আসতে হয়";—এই বলিয়া বালক বিদায় হইল। বালকের যাইবার পর আনন্দবাবুর গৃহে এক

বিরাট তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইল। তর্কের বিষয় বিজয়চন্দ্রের কাল শ্বশুরালয়ে যাওয়া উচিত কি না? সকলেরই মত যাওয়া উচিত কেবল আনন্দবাবুর ঘোরতর আপত্তি। তিনি বলিলেন, "একেতো ওরূপ দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করাই যাইতে পারে না, তাহার উপর যখন সেই বালিকার বিজয়বাবুকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি আছে; তখন কেবল পিতামাতার কথায় শিক্ষিত হইয়া বিজয়বাবু কখনই তাহার স্বামীত্বের দাবী করিয়া, সরলা বালিকার উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে পারেন না।"

গোবিন্দ বলিল, "আনন্দ তুমি কিসে জানিলে বালিকার বিজয়কে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি আছে?"

হরিশ অতি তাচ্ছিল্যস্বরে বলিল, "আরে তুমি কার সঙ্গে তর্ক ক'চ্ছ! ওর ব্রেমি ভণ্ডামি যাবে কোথায়?"

আনন্দবাবু বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন, "হরিশের যে এতদূর অধঃপতন হইয়াছে তাহা জানিতাম না। লেখাপড়া শিখে মানুষের যে এতদূর কুসংস্কার থাক্‌তে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় না।" অপর পার্শ্ব হইতে একজন বলিল, "ওরকম প্রথম প্রথম অনেকেরই হয়ে থাকে; দু'দিন বাদে দেখ্‌বেন আনন্দবাবু, ঐ বালিকার ভালবাসায় বিজয়চন্দ্রকে হাবুডুবু খেতে হবে।"

"ভালবাসা!" বলিয়া চক্ষু বিপজ্জয় বিস্ফারিত করিয়া আনন্দবাবু বলিলেন, "তের বৎসরের শিশু ভালবাসার কি জানে?"

গোবিন্দ বলিল, "আনন্দ তোমরা ভালবাসাও মান না নাকি, সেও কি একটা কুসংস্কার?"

হরিশ এতক্ষণ নীরব ছিল, সে আনন্দবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "বাবা তের বছরে শিশু, তাহ'লে পাঁচ ছয় বছরে তারা কি প্র—শিশু? একটু চেপে যাও, তোমার পাগলামি সব সময় আর ভাল লাগে না।"

"এদের সহিত কথা কওয়াই মূর্খতা," বলিয়া ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া আনন্দবাবু গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে ছিলেন, গোবিন্দ বাধা দিয়া বলিল, "আরে ছি! তুমি হরিশের কথায় রাগ কর, ওকি একটা মানুষ।"

ক্রোধে আনন্দবাবুর বাক্যরোধ হইয়াছিল, তিনি নীরবে নিজের শয্যার উপর উপবেশন করিলেন।

যথা সময়ে বিজয়চন্দ্র শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। একে শ্বশুরবাড়ী তা'হে জামাই ষষ্ঠী, আহারের ব্যবস্থা গুরুতরই হইল। শ্বশুরবাড়ীর সুসজ্জিত গৃহের সুপরিষ্কৃত শয্যার উপর অঙ্গ ঢালিয়া বিজয়চন্দ্র আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে ছিলেন। আজ এক বৎসরের অধিক হইল তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, নীহার ত্রয়োদশ উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দশে পদার্পণ করিয়াছে অদ্যাবধি তিনি তাহাকে বশে আনিতে পারেন নাই। বিবাহ তাহার নিকট এক্ষণে কেবল বিড়ম্বনায় পরিণত হইয়াছে। শ্বশুরের আদর, শশ্রূর স্নেহ, শ্যালকশ্যালিকার যত্ন, কিছুরই অভাব ছিল না; কিন্তু একের জন্য ক্রমেই তাঁহার বিবাহের উপর মর্ম্মান্তিক ঘৃণা হইয়া যাইতে ছিল। স্ত্রী কথা কহিবে না, অঙ্গস্পর্শ করিলে দশহস্ত দূরে সরিয়া যাইবে, ইহা অপেক্ষা জীবনে আর অধিক যন্ত্রণা কি হইতে পারে? তথাপি বিজয়চন্দ্র হাল ছাড়েন নাই, তিনি শুনিয়াছিলেন, পোষা শান্ত ঘোড়ায় চড়া অপেক্ষা ক্ষিপ্ত দুষ্ট ঘোড়ায় চড়াই অধিক আনন্দদায়ক। তিনি এই সকল কথাই ভাবিতে ছিলেন, এমন সময় নীহারসুন্দরী গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া সেই শয্যার একপার্শ্বে অতি সঙ্কোচিতভাবে শয়ন করিল। বহুক্ষণ নীরবে থাকিবার পর বিজয়চন্দ্র একটা প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভাসুরের পাশে কি শুতে এলে,—না মামাশ্বশুরের বিছানায় শুয়েছ? ঘোমটা খোল—ভয় নেই, প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে না।"

উত্তরের জন্য কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিজয়চন্দ্র নীহারের নিকট একটু সরিয়া যাইয়া ধীরে ধীরে তাহার অবগুণ্ঠন মোচন করিবার জন্য যেমনি হস্ত তুলিয়াছেন, অমনি একখানি টুকটুকে রাঙ্গা হস্তের প্রবল তাড়নে তাঁহার হস্ত আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে এক হস্ত পরিমাণ অবগুণ্ঠন বৃদ্ধির সহিত সেই টুকটুকে হাত দুইখানির দ্বারা তাহা অতি দৃঢ়ভাবে ধৃত হইল। বিজয়চন্দ্র হতাশভাবে যথাস্থানে শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "বিষম রোগ, এলাপ্যাথিক ওষুধের প্রয়োজন। ঝাঁজওয়লা ওষুধ ভিন্ন এ রোগ যাবার নয়।" কিছুক্ষণ গত হইবার পর তিনি আবার একটু একটু সরিয়া একেবারে নীহারের কর্ণের অতি সন্নিকটে মুখ আনিয়া বলিলেন, "কৃপাময়ী ঘোমটা খোল, ভয়ের তো বিশেষ

কোন কারণ দেখিনে। আমি মানুষ, অন্ত জীব নই। একবার নয়ন মেলে দেখ,—দেখ্‌তেও নেহাত ফেলনা নই।"

উত্তর নাই। বিজয়চন্দ্র যত নীহারের নিকট সরিয়া যাইতে ছিলেন, সেও তত সরিয়া যাইতেছিল,—ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইল, যে আর এক চুল সরিলে তাহার মেঝের সহিত আলিঙ্গনের সম্ভবনা। দুই ঘণ্টাকাল অনুনয় বিনয় তিরস্কার প্রভৃতি কিছুতেই কিছু না হওয়ায় বিজয়চন্দ্র ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতে ছিলেন, তাহার ধৈর্য্যও সীমার বাহিরে গিয়াছিল। তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বিরক্তিস্বরে বলিলেন, "বোবার কাছে শোওয়া আমার সাধ্য নয়, ঘোমটা খোলতো খোল নইলে আমি চল্লুম।" তাঁহার বিশ্বাস ছিল এই কথায় অন্ততঃ ভয়েও নীহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবে কিন্তু নীহারের বিশেষ কোন চাঞ্চল্য তিনি লক্ষ করিলেন না, সে যে ভাবে শুইয়াছিল ঠিক সেই ভাবেই শুইয়া রহিল। তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে দ্বারের অর্গল খুলিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৪

বাটীর দরওয়ান ভজন সিং সবে মাত্র তুলসী দাস বন্ধ করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতে যাইতেছিল, ঠিক সেই সময় বাহির হইতে দ্বারে তিন চারিটা উপর্য্যুপরি ধাক্কা পড়ায় সে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ী গৃহের কোণ হইতে তাহার বহুযত্নের তৈল মর্দ্দিত চারিহস্ত পরিমাণ লম্বা লাঠিটা লইয়া দরজা খুলিয়া দিল। সম্মুখেই জামাইবাবু। সে বিস্ফারিত নয়নে আড়াই হস্ত পরিমাণ বদন বিস্তার করিয়া একটা বিরাট রকম হাই তুলিতে তুলিতে বলিল, "কেয়া হায় মহারাজ জি?"

বিজয়চন্দ্র বিশেষ ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "জোলদি—জোলদি। তেতলায় আমি যে ঘরে শুয়েছিলেম, সেই ঘরে চোর ঢুকেছে।"

প্রভুভক্ত, অশেষ বুদ্ধিমান ছাতুখোর ভজন সিং বিজয়চন্দ্রের বাক্য শেষ হইতে না হইতে একেবারে তিন লম্ফে একতল ও দ্বিতলের সিঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া বিজয়চন্দ্র যে গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। বিজয়চন্দ্রও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিয়া ছিলেন, যেমন ভজন সিং গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, তিনিও তৎক্ষণাৎ গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া বাহির

হইতে শিকল আঁটিয়া দিলেন। ভজন সিং গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল সমস্ত দেহ বস্ত্রে আচ্ছাদিত খাটের উপর কে শুইয়া রহিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইল সেই চোর। সে মহা হুঙ্কারে তাহার সেই চারিহস্ত পরিমাণ লাঠি দুই হস্তে তুলিয়া খাটের দিকে অগ্রসর হইল। ভজন সিংহের হুঙ্কারে নীহার ভয়ে তাড়াতাড়ী শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এই অদ্ভুত ব্যাপারে তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল ;—ভয়ে তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। আর একটু হইলে সেই প্রকাণ্ড লাঠি নীহারের ঘাড়ে পড়িত ; কিন্তু সহসা ভজনসিংহের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়ায়, "আরে রাম ! এ কেয়া দিদি বাবু—" বলিয়া সে একেবারে স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইল। হতবুদ্ধির স্থায় একবার চারিদিকে চাহিয়া সে অবনত মস্তকে গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিল, দরজা বাহির হইতে বন্ধ। সে তখন মহা বেয়াকুব হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া অতি কাতরকণ্ঠে, "এ জামাই বাবু, দরজা খুলিয়ে, এ জামাই বাবু, দরজা খুলিয়ে", বলিয়া ক্রমাগত দরজায় ভিতর হইতে ধাক্কা দিতে লাগিল।

গোলমালে বাটির অনেকেরই নিদ্রা ভগ্ন হইয়া গেল। বাড়ীতে চোর ঢুকিয়াছে ভাবিয়া প্রায় সকলেই সেই গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজয়চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ শ্যালক গৃহের দরজায় বাহির হইতে শিকল দেওয়া দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইয়া তাড়াতাড়ী দরজার শিকল খুলিয়া দিলেন। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তখন প্রায় সকলেই মহাব্যস্ত হইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। দরজার সম্মুখেই ভজনসিং ;—বস্ত্রে আপাদমস্তক আবোরিত মহা সঙ্কোচিত ভাবে খাটের এক পার্শ্বে নীহার দণ্ডায়মান। বিজয়চন্দ্রের বড় শ্যালক গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি, এত গোলমাল কিসের ?"

ভজনসিং ক্রন্দনস্বরে বলিল, "হুজুর জামাইবাবু ঝুটমুট এয়া হাল বানায়া।"

ভজনসিংহের কথার বিশেষ কোন অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তিনি পুনঃরায় ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "কি হয়েছে, তুই এখানে, বিজয় কোথায় ?"

বাহির হইতে একজন বলিল, "ওই যে জামাই বাবু ছাদের উপর বেড়াচ্ছেন ” সকলেই চাহিয়া দেখিল,—সম্মুখের ছাদের আলিসার একধারে নীরবে দাঁড়াইয়া বিজয়চন্দ্র সিগারেট টানিতেছেন।

ছোট শ্যালক যাইয়া অবিলম্বে তাঁহার হস্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে তথায় আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, "ব্যাপার কি, এতরাত্রে তোমার ঘরে দরওয়ান কেন ?"

বিজয়চন্দ্র প্রবল ভাবে মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে নীহারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "উনি কিছুতেই আমার কাছে শুতে রাজি নন, কাজেই দরওয়ানকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। আপনাদের সমস্ত মেয়ে একলা কি করে রেখে যাই বলুন ?"

জ্যেষ্ঠ শ্যালক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বাবা তোমাকে এঁটে ওঠা মানুষের সাধ্য নয়। তুমি একেবারে কাজের চরম করলে—যাও যাও শোওগে।" তিনি সকলকে ডাকিয়া লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নীহার তখন পর্য্যন্ত সেই ভাবেই দাঁড়াইয়াছিল, বিজয়চন্দ্র শয্যায়উ পবেশন করিয়া বলিলেন, "কিগো বিছানায় শোবে, না দরওয়ান নিয়ে থাকবে।"

নীহার নীরবে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিল। তখনও ভয়ে তাহার সমস্ত শরীর স্পন্দিত হইতেছিল, লজ্জায় তাহার মাটীর সহিত মিশিতে ইচ্ছে হইতেছিল। বিজয়চন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিলেন, সে কোন আপত্তি করিল না। তখন অতি সোহাগে,—মহা আদরে তিনি তাঁহার পত্নির অধরে প্রণয়ের শ্রেষ্ঠচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিলেন। নীহারের সমস্ত গণ্ড রক্তিমাভ হইয়া গেল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

অবতার।

আমরা পাগল, তোমরা পাগল,
কর্চ্ছি পাগল জড় ;
ভয় কি হবে, এর পরেতে,
পাগলা গারদ বড়।
লেখক কবি, সবাই মোরা,
বাতিক মোদের কলম ধরা,
বিশ্ব দেখি তাইতে সরা,
ভরিয়ে মাসিক সবে ;
কর্চ্ছি জাহির নিজের পসার,
নিজেই মধুর রবে।

মাইনে করা, আমরা সবাই,
ঢোল বাজান কাজ;
হুকুম মত, বাজাই মোরা,
নাইকো সরম লাজ।
সুর বেসুরের ধার ধারিনা,
কারুর কাজেই হার মানিনা,
বড় যে তার নাম জানিনা;
বাজিয়ে গলা বলি;
বেজায় রকম গম্ভীর হয়ে,
বুক ফুলিয়ে চলি।

* * *

যদি একটা লেখা বেরোয়,
কভু মাসিক পত্রে;
শিরায় শিরায় পুলক ছোটে,
প্রতি তাহার ছত্রে।
প্রাণটা যে, তায় করে নৃত্য,
সম্পাদকের হইগো ভৃত্য,
কিন্তু মোরা হইনা লিপ্ত,
মোদের চেনা ভার;
আমরা লেখক, আমরা কবি,
আমরা অবতার।

প্রচার।

(গল্প নয় সত্য কথা।)

সে আজ বহুদিনের কথা, প্রায় চল্লিস বৎসর হইবে তখন ১৮৭৫ সাল বিলাতী ঔষধের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের মূল্যাধিক্য বশতঃ দিন দিন অবনতি দেখিয়া চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদক ও চিকিৎসা সম্মিলনী নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় অদম্য উদ্যমে প্রাণপাত পরিশ্রমে ও বহু অর্থব্যয়ে ২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে এক সুলভ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় স্থাপন করেন ও তিনিই সর্ব্ব প্রথম সুলভ অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রচার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন;—এবং কি উপায়ে ঐ সকল ঔষধ এত সুলভ মূল্যে দেওয়া যাইতে পারে তাহারই জন্য অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী সম্বলিত এক বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বিনামূল্যে সাধারণে বিতরণ করিতে থাকেন। অদ্যাবধি ঐ পুস্তক, উক্ত ঔষধালয় (২০০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে) পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে পাওয়া যায়। অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ এত সুলভ মূল্যে কিরূপে প্রস্তুত হইতে পারে তাহা জানা সকলেরই উচিত;—অদ্যই ঐ পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন, আদ্যপান্ত পড়িলে সমস্তই জানিতে পারিবেন।
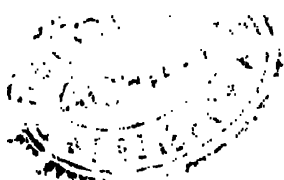
গল্পলহরী

২য় বর্ষ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।	১১শ সংখ্যা

কৌতুহলের পরিণাম।

১

এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন বি, এ, পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, তখন পিতা আমার বিবাহ দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ব্যস্ত হওয়ার কারণও ছিল; বিবাহ দিয়া কিছু টাকা না পাইলে আমার আর পড়ার খরচ চলিবার সম্ভাবনা ছিল না, তাই আমি সহজেই সম্মতি দান করিলাম। বৈশাখ মাসের ২৬শে তারিখে, শুভদিনে কিনা বলিতে পারি না, আমার বিবাহ হইয়া গেল। এ বিবাহ বিষয়ে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই, দশ জনের যেমন হয়, আমারও তেমনই বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহ হইয়া গেল, আমোদ আহ্লাদ যেরূপ হইতে হয় সবই হইল; আবার কিছুদিন পরে সে আনন্দ-উৎসব যেরূপ মন্দীভূত হইয়া আসিতে হয়, তাহাও হইল, বিশেষত্ব কিছুই হইল না। বিবাহের গোলমালে পত্নীকে ভালরূপে দেখিতে পাই নাই—পরে দেখিলাম। তাহার মুখখানি আমার কাছে যেন বড় সুন্দর লাগিল,—শুধু আমার কাছে কেন, শুনিলাম তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা অনেকেই করিতেছেন। ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার সরল মুখ খানিতে যেন স্বর্গীয় মাধুরী বিরাজমানা। বিবাহের পনর দিন পরেই যখন বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলাম, তখন, কেন বলিতে পারি না,—শূন্য হৃদয়ের এক নিভৃততম প্রদেশে কাহার লাবণ্যময় মুখের চল চল প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত দেখিতে পাইলাম। হায়, সে ছবি যে আমারই কমলার!

কলিকাতায়—কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। কমলার কাছে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কমলা রঙ্গের খামে, কমলা রঙ্গের চিঠির কাগজে পত্র লিখিতাম। আর সেই উপলক্ষে কমলার সহিত চিঠির কাগজ ও খামের রঙ্গের সাদৃশ্য দেখাইয়া তাহাকে মৃদু মধুর উপহাস করিতেও ছাড়িতাম না। সেও অতি বিনীত ভাষায়, অতি সঙ্কুচিত ভাবে, আধ ফোটা যুঁই ফুলের স্নিগ্ধ সুবাসের মত প্রাণারাম ও অর্দ্ধপরিস্ফুট প্রত্যুত্তর দিত। বালক মিষ্টান্নবাহী ভৃত্যের প্রত্যাশায় যেরূপ আগ্রহে পথপানে চাহিয়া থাকে, পত্রোত্তর আসিবার সময় হইলে আমিও তেমনি লোলুপ দৃষ্টিতে পিয়নের আগমন পথের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। পিয়ন চিঠিগুলি দিয়া গেলে আমার চকিতদৃষ্টি "গোটা গোটা" হস্তাক্ষরে শিরোনামা লেখা একখানি সমচতুষ্কোণ খামের অনুসন্ধানে ধাবিত হইত। দেখিতে না পাইলে প্রাণটা যেন দমিয়া যাইত। সে দিন প্রত্যূষে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে কাহার মুখ দেখিয়াছিলাম তাই চিন্তা করিতাম, এবং তাহার মুখ দেখিলে অকুশল হয় মনে করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া যাইতাম। আর যদি সেইরূপ চিঠি পাইতাম, তবে দ্রুত নিজের কক্ষে যাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া পড়িতে বসিতাম; চিঠিখানি একবার পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম না, বহুবার পাঠ করিতাম। আর প্রতি অক্ষরে কমলার চম্পকাঙ্গুলীর চিহ্ন দেখিয়া আনন্দে রোমাঞ্চ হইয়া উঠিতাম। কল্পনা নেত্রে কমলার মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতাম; কোন্ স্থানে লিখিবার সময় তাহার মুখের ভাব কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, স্ফোটনোন্মুখ প্রভাত-কমলে উদীয়মান রবির তরুণ কিরণ তপনের ন্যায় কমলার সুন্দর মুখখানি কিরূপ লজ্জা-রাগ-রঞ্জিত হইয়াছিল, কিরূপে কোন্ দিকে তাহার বেণীবদ্ধ সুগঠিত মস্তক হেলিয়াছিল, তাহার সুচিক্কণ রক্তাধর ঈষৎ কম্পিত হইয়াছিল,—কল্পনাচক্ষে সবই যেন দেখিতে পাইতাম।

২

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। এই দুই বৎসরের মধ্যে যে কয়েক বার বাড়ী গিয়াছি, প্রায় প্রত্যেক বারই কমলার সহিত দেখা হইয়াছে; এবং কমলারও সে সলজ্জভাব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে।

আমাদের বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া যমুনা নদী অশ্রান্ত কুলুকুলু রবে প্রবাহিতা। প্রমত্ত বারিরাশি লইয়া সে আপন মনে ছুটিয়া চলিয়াছে; জগদ্বাসীকে পবিত্র প্রেমের নিদর্শন দেখাইয়া, মহান্ ত্যাগীর ন্যায় আপন নির্ম্মলতোয়রাশি

বিলাইয়া, উভয়তীরস্থ জীবগণ ও উদ্ভিদগণের জীবন দান করিয়া অবশেষে সমুদ্রে যাইয়া আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছে। আমরা অনেক সময়েই যমুনার দিকে চাহিয়া থাকিতাম ও সেই নিষ্কাম স্বার্থত্যাগ ও পবিত্র প্রেমের কথা লইয়া কত কি আলোচনা করিতাম। হায়! সে আলোচনায় কত সুখ!

যখন মুক্ত বাতায়ন-পথে শুভ্র জ্যোৎস্না আমাদের শয্যাখানিকে রৌপ্য-মণ্ডিত করিত, যখন যমুনার কাল জলে ক্ষুদ্র বীচিমালার সঙ্গে জোছনা-তরঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিত, আমরা তখন নির্নিমেষনেত্রে প্রকৃতির এই অপরিমেয় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতাম। নিবিড় নীলগগণে ঢল ঢল শশী কি মাধুর্য্যময়ী হাসিই হাসিত; নিবিড় কৃষ্ণ-কুঞ্চিত অলকদাম-মাঝে অকলঙ্ক শশীর ন্যায় সুন্দর মুখে কমলা সেই মধুর হাসির সহিত হাসি মিশাইয়া সমস্ত জগতে যেন হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া দিত। আমি ও হাসিতাম, আবার আমাদের এই হাসি দেখিয়া, বুঝি কোন্ এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় যমুনাও কল্ কল্ স্বরে হাসিত, আমি ও কমলা পরস্পরকে চন্দ্রের সহিত তুলনা করিতাম; আবার ইহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে মান অভিমানের সৃষ্টি হইত; শেষে আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া আমরা ঘুমাইয়া পড়িতাম।

এইরূপে ছুটীগুলি অতিবাহিত হইত। কলেজ খুলিলে লোকলজ্জাভয়ে বেশীদিন থাকিতে পারিতাম না; নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কলিকাতা চলিয়া যাইতাম। কিন্তু সেখানে যাইয়া পড়াশুনা কিছুই হইত না। পাঠ্য পুস্তকের ভাষা যেন নীরস বোধ হইত। কচিৎ দুই একখানি উপন্যাস পাঠ করিতাম। কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের দুই চারি লাইন পড়িলে অবশিষ্ট অক্ষরগুলি যেন নিশ্চল কাল পিপীলিকার মত শ্বেত-পত্রের উপর সাজান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইত, আর কমলার মুখখানি বায়ুর তরঙ্গে তরঙ্গে যেন চ'খের সামনে ভাসিয়া বেড়াইত; সুতরাং পড়াশুনা হইত না; আমিও সেবার পরীক্ষা দিলাম না। পরীক্ষার সময় ফাল্গুন মাসে বাড়ী চলিয়া গেলাম।

৩

বাড়ী আসিয়াছি। সুখের দিনগুলা জলের মত চলিয়া যাইতেছে। এবার পরীক্ষা দিলাম না বলিয়া আমার মনে একটুকুও দুঃখ হয় নাই। পিতা মাতা বা বাড়ীর অন্য কাহারও মনে হইয়াছে কি না তাহাও আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখি নাই, দেখিবার অবসরও আমার ছিল না। আমি আমার নিজের আনন্দে নিজেই মত্ত। পড়া শুনার চিন্তা ছাড়িয়া, কমলাকে

ঠকাইবার ও তাহার সহিত পরিহাস করিবার নিত্য নূতন কৌশল আবিষ্কার করিতেছি।

সেদিন শনিবার। চারিদণ্ড বেলা থাকিতেই আকাশ ভয়ানক রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যমুনার পরপারস্থ বৃক্ষগুলির পত্রসমূহ লোহিত কিরণে ঝলসিয়া উঠিয়াছে; সে দৃশ্য দেখিলে প্রাণে শান্তি আসে না, প্রাণটা যেন চম্‌কিয়া উঠে। আমি এক প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে দ্বিপ্রহরে তাসখেলা শেষ করিয়া বাড়ী আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম আমার বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা মহাশয় বৈকালিক-কৃত্য মটর প্রমাণ এক বড়ী আহিফেণ সেবন শেষ করিয়া আজ যে রক্ত-সন্ধ্যা বড় অমঙ্গল জনক, এ সম্বন্ধে বিবিধ গুরুগম্ভীর প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। আমি সে দিকে লক্ষ্য করিলাম না। অনেকক্ষণ কমলাকে দেখি নাই, আমার শয়নকক্ষে চলিয়া গেলাম। দেখিলাম কমলা উপাধান বক্ষে নিম্নাভিমুখে অর্দ্ধাশায়িতাবস্থায় মহাভারত পড়িতেছে। পশ্চিমপার্শ্বস্থ উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে লোহিত সূর্য্যরশ্মি আসিয়া তাহার মুখে পড়িয়াছে। সমস্ত মুখখানি দিয়া যেন একটা জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। কুঞ্চিত কেশদামের কতকাংশ প্রকোষ্ঠে, কতকাংশ উপাধানে ও কতক মহাভারতের খোলা পাতার উপর পড়িয়া অল্প অল্প বাতাসে উড়িতে ছিল। আমি ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পদশব্দে কমলা উঠিয়া বসিল। আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। আমিও একটু হাসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, " কি পড়িতেছিলে ? "

"মহাভারত।"

"কোথায় পড়িতেছিলে ?"

"পাণ্ডুরাজার পত্নী মাদ্রী সহমরণে যাইতেছেন তাই পড়িতেছিলাম। আহা কি পতিভক্তি !"

আমার মনটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। একটু কৌতূহল হইল, তাহা দমন করিয়া রাখিতে পারিলাম না; বলিলাম, "আচ্ছা, আমি যদি এখন মরি তুমি কি কর ?"

"ছি ! ওকথা বল্‌তে নাই। এই বল্‌তে বুঝি তুমি আসিয়াছ ?"

কমলা একটু রাগিল, মুখ ফিরাইল; কাণের ইয়ারিং দুলিল। মরাল গ্রীবার সে অপরূপ ভঙ্গিমার দিকে আমি অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করিব ?— আমি পুরুষ সিংহ। বলিলাম,—"না, না,

তাই কি বল্ ছি। আর আমার এখন মরবারও ত কোনই প্রয়োজন হয় নাই, আর আয়ুও ঘনাইয়া আসে নাই। তবে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম এই জন্য যে এখন ত আর লোকে সহমরণ যাইতে পারে না, তবে তুমি কি কর?" কমলা এবার উত্তর দিল, "বিষ খাইয়া মরি।" আমি একটু শিহরিলাম। কিন্তু তখনই আত্ম-সংবরণ করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিলাম,—"বিষ খাওয়টা এত সোজা নয়।" জানিনা একথা কমলা শুনিতে পাইয়াছিল কি না।

৪

দুই বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। আমি এ পর্য্যন্ত কমলাকে কোন রূঢ় কথা বলি নাই। আজিও যে বলিয়াছি এরূপ আমার মনে হইল না। তখন জানিতাম না যে, আমার মৃত্যুর কথা লইয়া আন্দোলন করিতে আমার আমোদ হইতে পারে কিন্তু যে আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে ও আমাগত প্রাণ তাহার তাহাতে আমোদ হইতে পারে না। তারপর আর অল্পদিন বাড়ী ছিলাম, এ কয়েক দিনের মধ্যে কমলার সঙ্গে একথা লইয়া আর কোনরূপ উচ্চবাচ্য হয় নাই।

যথাসময়ে কলিকাতায় আসিলাম। প্রায় এক মাসের মধ্যে এ কথা আর আমার স্মরণ হয় নাই। একদিন আমার এক সহপাঠির সহিত আত্মহত্যা বিষয় লইয়া তর্ক হইল। আমার সহপাঠিটি প্রমাণ করিল যে যাহাদের হৃদয় দুর্ব্বল তাহারা আত্মহত্যা করিতে পারে না। আত্মহত্যা করিতে হইলে অন্তঃকরণ দৃঢ় হওয়া চাই। এই বন্ধুটী আমার স্বগ্রামবাসী ও আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাহার কাছে আমার এই ঘটনাটী বলিলাম। সে বলিল, স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহারা আত্মহত্যা করিতে কিছুতেই পারে না। বিশেষতঃ কত স্ত্রীলোক বিধবা হইতেছে, কই কেহই ত আত্মহত্যা করে না! সে বড়াই করিয়া কহিল, "ইহা হইতেই পারে না।" তখন দুই বন্ধুতে এক পরামর্শ আঁটিলাম। সে সময় তখন কলিকাতায় বড় প্লেগের ধুম। ঠিক হইল, সে বাবার কাছে টেলিগ্রাম করিবে,—'সতীশ দুই ঘণ্টার প্লেগে মারা গিয়াছে।' সে লিখিলে সকলেই বিশ্বাস করিবে। আমি তৎপূর্ব্বেই এখান হইতে রওনা হইব। টেলিগ্রাম পৌঁছিবার সময় সময় বা দুই এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী পৌঁছিব। যখন সকলে শোকে মুহমান, তখন আমি গিয়া হঠাৎ উপস্থিত হইব, সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইবেন। পিতা মাতার তিরস্কার ভাজন হইতে হইবে বটে কিন্তু আমোদটা বড় চমৎকার

হইবে। বিশেষতঃ দেখা যাইবে কমলা শোকে কিরূপ কাতর হয়। পরামর্শ মত কার্য্য করিতে ক্রটী হইল না। আমিও বাড়ী রওনা হইলাম। কমলা যে সত্য সত্যই আত্মহত্যা করিতে পারে ইহা কল্পনাই করিতে পারিলাম না।

ট্রেণে রওনা হইলাম। গোয়ালন্দ ঘাট পর্য্যন্ত ট্রেণে যাইব, তথা হইতে ষ্টীমারে যাইতে হইবে। যতক্ষণ গাড়ীতে ছিলাম কেবল সুখ-স্বপনেরই চিন্তা করিতেছিলাম; কিন্তু যখন গোয়ালন্দ ঘাটে পৌছিলাম তখন দেখিলাম সর্ব্বনাশ! আমি যে ষ্টীমারে যাইব সেখানা ছাড়িয়া গিয়াছে। আমার পদতল হইতে পৃথিবীটা যেন সরিয়া গেল; চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম; মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। নৌকা করিয়া বাড়ী রওনা হইতে সাহস হইল না;—পদ্মা বড় ভীষণা। বিশেষতঃ পরের ষ্টীমারে রওনা হইলেও নৌকা অপেক্ষা অল্প সময়ে পৌঁছান যায়; সুতরাং পরের ষ্টীমারেই রওনা হইলাম। একদিন বিলম্ব হওয়ায় যে দিন পৌঁছিবার কথা ছিল তাহার পর দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী পৌঁছিলাম। সে দিনও শনিবার, এবং তেমনই রক্ত সন্ধ্যা। বাড়ীর নিকটে আসিয়াই নিদারুণ ক্রন্দন কোলাহল শ্রুত হইল; প্রাণটা এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। জড়িত পদে বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু কি দেখিলাম? আমার সাধের কমলা প্রাঙ্গণে শায়িতা রহিয়াছে। সে স্বর্ণকান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে। অর্দ্ধ বিকশিত নীল পদ্মের উপর সান্ধ্য-রবি-রশ্মি-পতনের ন্যায় তাহার ম্লান মুখের উপর লোহিত-কিরণ জাল পড়িয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের বিকাশ করিয়াছে। আমি নিমেষহীন নেত্রে ক্ষণকাল সে দৃশ্য দেখিলাম,—তার পর মূর্চ্ছিত হইয়া শব দেহের উপর পড়িয়া গেলাম।

শ্রীঅমূল্যনারায়ণ সেনগুপ্ত।

ভক্তি ও শক্তি।

একটী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা যমুনাতীরে আঁচল দিয়া মাছ ধরিতে ছিল। বালিকার আলু-লায়িত কেশদাম অৰ্দ্ধসিক্ত, কৰ্দ্দমে জটা বাঁধিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমে আবরিত। সেই কর্দ্দমান্তরাল হইতে মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় বালিকার রূপ প্রতিভাসিত হইতেছিল। বালিকার অঞ্চল প্রায়ই শূন্য উড়িতেছিল। প্রতিবারে সে মৎস্যের অভাবে শামুক, গুগ্‌লি ডাল্‌পালা তুলিয়া হতাশ ও ক্ষুণ্ণ হইতে ছিল; এইরূপে সে অতি প্রত্যুষ হইতে মৎস্য আহরণে নিযুক্ত হইয়াছে; এক্ষণে দ্বিপ্রহর অতীত, সূর্য্যদেব নিজ প্রখর উত্তাপে চারিদিক বিদগ্ধ করিতেছেন; যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, কোনদিকেই কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃক্ষাদির পত্র নিস্পন্দ, পক্ষিগণ প্রখর সূর্য্যোত্তাপে বিদগ্ধ হইয়া বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু বালিকার রৌদ্রে দৃক্‌পাত নাই, প্রত্যুষ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্য্যন্ত সে এক কপর্দ্দকের মৎস্য সঞ্চয় করিতে পারে নাই। যখন রৌদ্রে তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া উঠিতেছে, অমনি সে মস্তকে জলদিয়া মস্তকস্থ আলু-লায়িত কেশদাম সিক্ত করিতেছে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে প্রখর উত্তাপে আবার কেশপাশ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, সে আবার মস্তক ভিজাইতেছে।

এইরূপে তীরে তীরে মাছ ধরিতে ধরিতে সে প্রায় অৰ্দ্ধক্রোশ চলিয়া আসিল। নূতনদিকে গেলে অধিক মাছ ধরিতে পারিবে, এই আশায় সে অজ্ঞাতদিকে সাহসে ভর করিয়া চলিল। সে মৎস্য আহরণে এতই ব্যগ্র হইয়াছিল যে, নদীর দিকে, জলের খর প্রবাহের দিকে, চারিপার্শ্বস্থ দ্রব্যাদির দিকে তাহার বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি ছিল না। সহসা সে নদীগর্ভস্থ একটী গভীর গর্ত্তে পতিত হইল; মুহূর্ত্ত মধ্যে খরস্রোতে গভীরতম জলে নীত হইল। সে সন্তরণ একটু একটু জানিত, দুই তিনবার তীরের দিকে আসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেইখানে নদীগর্ভে গভীর "দহ" থাকায় তথাকার স্রোত এতই প্রবল হইয়াছিল যে, তাহার ন্যায় দুর্ব্বল বালিকার সাধ্য নাই যে, সেই খরস্রোত ভেদ করিয়া

তীরে উপস্থিত হইতে পারে। সে দুই তিনবার প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করিল, দুই তিনবার প্রাণপণে তীরে আসিবার জন্য যত্ন করিল, তৎপরে হতাশ হইয়া, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, জলখাইয়া ক্রমে নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল, চারিদিকে যেন কি এক অনৈসর্গিক আলোক জলিয়া উঠিল, তাহার কর্ণে যেন জগতের সমস্ত বাদ্যধ্বনি প্রবিষ্ট হইল, সে চীৎকার করিয়া জলমগ্ন হইল।

তাহার ব্যাকুল চীৎকারধ্বনি দূরস্থ এক ব্যক্তির কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি বন্দুক স্কন্ধে সেই দিকে শিকার করিতে আসিয়াছিলেন ; বৃক্ষশাখা উপরি উপবিষ্ট পক্ষী লক্ষ্য করিয়া তিনি বন্দুক তুলিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বালিকার চীৎকারে তাঁহার হস্ত কম্পিত হইল, লক্ষ্যচ্যুত হইল, পক্ষীও সভয়ে আকাশে উড়িল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে সেইখানে বন্দুক রাখিয়া নদীতটাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

দেখিলেন, খরস্রোতে জল ঘুরিতেছে, যমুনা কলকল নিনাদে যেন আনন্দ কোলাহল করিতেছে। সিংহিনী শিকার লাভে যেরূপ গভীর গর্জ্জন করিতে থাকে, যমুনাও আজ ঠিক সেইরূপ গভীর গর্জ্জনে ক্রীড়া করিতেছে। যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, কোনদিকেই কিছু দেখিতে পাওয়া গেল না। হতাশ হইয়া তিনি ফিরিতে ছিলেন, সহসা নদীবক্ষে জলপ্রবাহের মধ্যে কতকগুলি ঘন কেশদাম তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল : অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি ঝম্পপ্রদানে সেই ঘূর্ণীয়মান জলস্রোতে পতিত হইলেন, তৎপরে দক্ষিণ হস্তে সেই কেশগুচ্ছ ধারণ করিলেন।

তিনি সেই কেশদাম টানিয়া দেখিলেন, একটি বালিকা—মূর্চ্ছিতা বা মৃতা বালিকা। তিনি সযতনে সেই অবশ বালিকাদেহ নিজ দেহোপরি উত্তোলিত করিয়া লইলেন, তৎপরে সন্তরণে তীরে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেম ; কিন্তু ঘূর্ণায়মান জল তাঁহাকে সবেগে ঘুরাইতে আরম্ভ করিল।

২

সেই সময়ে সেই স্থান দিয়া একখানি সুন্দর বজরা যাইতেছিল। ষোল জন সুসজ্জিত ব্যক্তি ক্ষেপণী সঞ্চালন করিতেছিল। তরণীর পশ্চাতে নানারঙ্গে বিভূষিত বৃহৎ পতাকা বায়ুভরে উড়িতেছিল, চারিজন সজ্জিত যোদ্ধা উন্মুক্ত অসি হস্তে তরণী উপরে পাহারায় নিযুক্ত ছিল।

বজরার একটী কক্ষমধ্যে চারিজনে বসিয়া তাস খেলিতে ছিলেন। চারিজনই রমণী, চারিজনই যুবতী, চারিজনই রাজবেশভূষায় সজ্জিতা, তবে একটু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ইঁহাদের মধ্যে একজন কর্ত্রী—অপরা সহচরী।

একজন বলিলেন, "ললিতে, তুই ফাঁকি দিচ্চিস্।"

ললিতা কহিল, "দেখ্, মিছে কথা ক'স্‌নে। দেখ ভাই ইন্দু, ও সব হাতের কাগজ দেখালে, আবার আমাকে চোক্ রাঙ্গান হচ্ছে!"

ইন্দুই কর্ত্রী, তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোরা সকলেই সমান, যখন তখন আর আমার কাছে নালিশ করিলে কি হবে—ও কি!" সকলে চমকিত হইয়া তাস বন্ধ করিলেন। এই সময়ে বালিকার ব্যাকুল চীৎকারধ্বনি ইন্দুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সকলে ব্যগ্রতাসহকারে তরণীর গবাক্ষ দিয়া চারিদিকে চাহিলেন, কিন্তু কোনদিকেই কিছু দেখিতে পাইলেন না।

উপর হইতে মাঝি বলিয়া উঠিল, "সামাল্, সামাল্।" দাঁড়িগণও "সামাল্, সামাল্" বলিয়া সবলে দাঁড় ফেলিল। নৌকা নড়িয়া উঠিল, ইন্দু সভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া সখীদিগকে বলিল, "একি ভাই,—মাঝিকে জিজ্ঞাসা কর নৌকা এমন করে কেন?"

সখীগণও ভীতা হইয়াছিল, সকলে ব্যাকুলনয়নে এ উঁহার দিকে চাহিতেছিল।

মাঝি আবার ডাক ছাড়িল, "সামাল্—সামাল্;" সঙ্গে সঙ্গে নৌকাও টলিয়া উঠিল। ইন্দু সভয়ে অর্দ্ধ চীৎকার স্বরে বলিল, "যাও না ভাই জিজ্ঞাসা কর।" অগত্যা বাধ্য হইয়া একজন সখী চলিলেন,—মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, এখানে একটা পাক আছে, তাই মাঝি নৌকা সাবধানে নিয়ে যাচ্চে"

পাক আছে শুনিয়া সকলে পাক দেখিবার জন্য গবাক্ষে গেলেন,—এক দৃষ্টে পাকের দিকে সকলে চাহিলেন। তখন সেই পাকমধ্যে বালিকাসহ যুবক ঘূর্ণিত হইতেছিলেন। যুবতীচতুষ্টয়ের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িবামাত্র তাঁহারা সকলে কোলাহল করিয়া উঠিলেন। কেহ বলিলেন, "আহা, ঐ ডুব্‌লো যে,—ওগো কি হবে? কেহ বলিলেন "ইন্দু, ভাই—বল, নৌকায় নিয়ে ওদের বাঁচাক।"

আর একজন বলিয়া উঠিল "ঐ গেল,—ঐ গেল!'

তখন ইন্দু ব্যাকুলভাবে নৌকার বাহিরে আসিলেন. নিজ ভৃত্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা যেমন করিয়া পার উহাদের বাঁচাও,—আমি তোমাদের খুসি করিব। আমি বাবাকে বলিয়া তোমাদেব বড় লোক করিয়া দিব, তোমরা শীঘ্র শীঘ্র ঐ দিকে নৌকা লইয়া চল।"

মাঝি বলিল, "রাজকুমারি. ঐ দিকে নৌকা নিয়ে যাবার যো নেই. তা হলে আমাদের নৌকা রক্ষা করা দায় হবে। আপনি স্থির হউন, আমরা চেষ্টা করে দেখ্‌চি।"

ইন্দু উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল. "মাঝি. আমি তোমাকে আমার এই গলার হার দিচ্ছি, তুমি ওদের বাঁচাও।"

মাঝি বলিল, "আপনি একটু স্থির হউন. আমি চেষ্টা দেখ্‌চি।"

তখনও নৌকা 'পাক" হইতে বহুদূরে ছিল। দাঁড়ী ও মাঝিগণ চেষ্টা করিয়া নৌকাকে যথাসম্ভব সন্নিকটবর্ত্তী করিল। একজন একটা লম্বা দড়ী লইয়া প্রস্তুত থাকিল যে, যেই নৌকা নিকটস্থ হইবে, অমনি দড়ী জলমগ্ন ব্যক্তির দিকে ফেলিয়া দিবে। দাঁড়িগণ পুরস্কারের লোভে প্রাণপণে দাঁড় টানিতেছে, নৌকা পাক হইতে প্রায় শত হস্ত দূরে আছে, এই সময়ে সহসা বিকট চীৎকারে চারিদিক আলোড়িত হইয়া উঠিল,—পর মুহূর্ত্তেই ইন্দু ঝম্প প্রদান করিয়া যমুনা বক্ষে পতিত হইল।

সখীগণ চিৎকার করিয়া উঠিল, দাঁড়িগণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড় ছাড়িয়া দিল মাঝি পাগলের ন্যায় গর্জ্জিল, প্রহরীগণের মধ্যে দুইজন, "রাজকুমারি. এ কেয়া হায় বলিয়া জলে ঝাঁপ দিল। দাঁড় ছাড়িয়া দেওয়ায় নৌকা তীরবেগে তিনবার ঘুরিল।

প্রথম ঝম্প প্রদানে ইন্দু জলমগ্না হইয়াছিলেন কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি ভাসিলেন ও সবলে সন্তরণ দিয়া জলমগ্ন ব্যক্তির দিকে ধাবিত হইলেন।

৩

যুবক কুমার অজয়েন্দু, উদয়পুরের মহারাণার একমাত্র পুত্র; আর ইন্দু বিকানির মহারাজার আদরের দুহিতা। বাল্যকাল হইতেই অজয়েন্দু ও ইন্দুতে পরিচয়, আলাপ, ভালবাসা ও প্রণয়। উভয়ের সহিত উভয়ের বিবাহ হইবে, উভয়ের পিতা উভয়ের নিকট বাগ্দত্ত,—কেবল রাজনৈতিক নানা গোলযোগের জন্যই বিবাহে বিলম্ব হইতেছিল উভয় রাজাই উভয়কে

নিজ নিজ রাজধানী হইতে দূরে রাখিবার জন্য দিল্লী রাখিয়াছিলেন। উভয়ে দিল্লী বাস করিতেন, তবে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত কেহই বাস করিতেন না, বিশেষতঃ রাজকুমার অজয়েন্দু সর্ব্বদা পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন, পড়া পাইলে তিনি আর কিছুই চাহিতেন না; তিনি লোক জনের সহিত বড় মেশামিশি ভালবাসিতেন না,—যখন সুবিধা পাইতেন একটা বন্দুক লইয়া একাকী শিকারে বহির্গত হইতেন।

একদিন এইরূপ নির্জ্জনভ্রমণকালে এক বালিকাকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া তাহার প্রাণরক্ষার জন্য আপনার প্রাণকে খরস্রোতে বিপদস্থ করিয়াছিলেন। রাজকুমারী ইন্দু সেই সময়ে তথায় উপস্থিত না হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই জলমগ্ন হইতে হইত।

রাজকুমারী ইন্দু বৃন্দাবন দর্শনে গিয়াছিলেন! তিনি নৌকাযোগে দিল্লী প্রত্যাগমনকালে কুমার অজয়েন্দুকে জলমগ্ন হইতে দেখিতে পান। অজয়েন্দু অপেক্ষায়ও তিনি অধিক সন্তরণপটু ছিলেন। অজয়েন্দুকে জলমগ্ন হইতে রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অধিক ক্লেশকর হইল না। ইন্দু অনতিবিলম্বে আসিয়া অজয়েন্দুকে আশ্রয় দান করিলেন,—ইতিমধ্যে মাঝি, দাঁড়িগণের সাহায্যে নৌকা বাঁচাইয়া নৌকাকে নঙ্গর করিল। তখন দাঁড় ফেলিয়া দিয়া দাঁড়ীদিগের কেহ কেহ সন্তরণ দিয়া সকলকে নৌকায় তুলিল।

বলা বহুল্য সকলে নিরাপদে দিল্লী উপস্থিত হইলেন। কুমার অজয়েন্দু ধীবরকন্যাকে নিজ আলয়ে আনিয়া বহু যত্নে শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

যখন এই সকল সম্বাদ বিকানির ও উদয়পুরে নীত হইল, তখন উভয় মহারাজাই বিবাহ আর অধিক দিন স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য নহে বিবেচনা করিয়া সত্বর দিল্লী আসিলেন। মহা সমারোহে কুমার অজেয়ন্দুর সহিত রাজকুমারী ইন্দুর বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের দিন কেবল একজনকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না,—সে সেই বালিকা। অজয়েন্দু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে পাইলেন না।

৪

রাজকুমার ও রাজকুমারীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের আর সুখের সীমা নাই, তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ দিবারাত্রি তরঙ্গায়িত হইতেছে। ইন্দুর সুখের আকাশে এক খানিও মেঘ নাই, কিন্তু

অজয়েন্দুর তাহা নহে, তাঁহার সুখের মাত্রা পূর্ণ হইয়াও পূর্ণ হয় নাই, হৃদয়ের জ্যোৎস্না পরিস্ফুট হয় নাই, কি যেন কেমন কেমন বোধ হয়, সুখের মধ্যে যেন কি এক দুঃখের মেঘ খেলিয়া বেড়ায়। যখন ইন্দুর হাসি মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় সুখে আপ্লুত হইয়া পড়ে, মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে ধীবর কন্যার বিষাদমাখা মুখখানি প্রতিভাসিত হয়।

উভয়ে আনন্দভরে কত কথা কহিতেছিলেন, কত সুখে ভাসিতেছিলেন। সে প্রেমের কথা, সে ভালবাসার কথা, সে কথার শেষ নাই অর্থ নাই, ভাব নাই,, কেবল মাত্র অনুভূতি আছে। উভয়ে উভয়ের প্রেমে আত্মবিস্মৃত, জগতসংসার যে আছে, তাহা আর জ্ঞান নাই। সহসা সুখের ঘোর ভাঙ্গিল, বিদ্যুতের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য বালিকার মলিনতাময় মুখ অজয়েন্দুর হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইল, তাঁহার হৃদয়ে কি যেন এক বৃশ্চিক দংশন করিল, তিনি বলিলেন, "ইন্দু, হঠাৎ আমার মাথা ধরিল, তুমি যাও, শোওগে, আমি একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়াই।"

"এস আমি তোমার মাথা টিপে দি, এস আমার কোলে মাথা দিয়া শোও।"

"না ইন্দু, তুমি যাও শোওগে, আমি একটু বেড়াই।" এই বলিয়া অজয়েন্দু সত্বরপদে ইন্দুকে ত্যাগ করিয়া উদ্যানের অপরাংশে চলিয়া গেলেন। এরূপ ভাবে কখন ইন্দু স্বামী কর্ত্তৃক হতাদৃত হয় নাই; চুম্বন না করিয়া তাঁহার অজয়েন্দু তাঁহাকে কখন পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। ইন্দু কাঁদিয়া ফেলিল।

ধীবর বালিকা প্রকৃত পক্ষে ধীবর বালিকা নহে। সে ক্ষত্রিয় কন্যা—তাহার পিতা উদয়পুর রাজসরকারে সামান্য সৈনিকের কাজ করিতেন অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় যমুনার তীরে একখানি ক্ষুদ্র কুটিরে বালিকা নিজ দুঃখিনী মাতার সহিত বাস করিতছিল; তাহার মা তাহাকে আদর করিয়া "ফুল" বলিয়া ডাকিতেন। যেখানে বালিকা মায়ের সহিত বাস করিত, তাহার নিকটে আর কেহ বাস করিত না, সুতরাং তাহাদের প্রতিবেশী কেহই ছিল না।

যখন যমুনাবক্ষে আমরা ফুলকে দেখিলাম, তখন ফুলের বয়স দ্বাদশ মাত্র পূর্ণ হইয়াছে।

এতদিন তাহার মা তাহার ভরণপোষণ একরূপ দুঃখে সুখে চালাইতে ছিলেন ; সুতা কাটিয়া, পাট বুনিয়া ও নানাবিধ উপায়ে তিনি কন্যার অন্ন-ক্লেশ দূর করিতেছিলেন কিন্তু অত্যাধিক পরিশ্রমে শীঘ্রই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল,—তিনি পীড়িতা হইলেন। ফুল দেখিল তাহাদের সম্মুখে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী মুখব্যাদন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। পূর্ব্বে তাহাদের যাহাতে চলিত, এক্ষণে মায়ের পীড়ায় তাহাদের তাহাপেক্ষা অধিক অর্থের আবশ্যক। যাহা ছিল, তাহাতেই সে দুই চারি দিন অতি কষ্টে চালাইল, তৎপরে মায়ের মতন সুতা পাট কাটিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

এখন উপায়! ফুল নিজের ভাবনা ভাবে না, অর্থাভাবে মা কি অনাহারে মরিবে! সে সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি ভাবিল, কিন্তু কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। সে অস্থির হইয়া উঠিল, এখনই যে মা আহার চাহিবেন, সে কি করিবে! সে কোথায় যাইবে? কাহার চরণে যাইয়া কাঁদিয়া পড়িবে?

ভাবিতে ভাবিতে সে যমুনাতীরে আসিল। সম্মুখে খর-প্রবাহে কলকল নিনাদে যমুনা প্রধাবিত হইতেছে, তরঙ্গের উপর গড়াইয়া পড়িয়া কত খেলা খেলিতেছে। ফুল ভাবিল, "ডুবি না কেন! এই জলে তো সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়। তা হলে তো আর আমাকে মায়ের যন্ত্রণা দেখিতে হয় না। না, ডুবি,—আর যে আমার সয় না!" এই ভাবিয়া সে জলে নামিল. তাহার পায়ের শব্দে চারি পাঁচটী মাছ লাফাইয়া উঠিয়া দূরে যাইয়া পড়িল। অমনি হৃদয়ের বালসুলভ চপলতায় ফুলের মাছ ধরিতে ইচ্ছা হইল,—ছেলেবেলায় সে কত আঁচল দিয়া মাছ ধরিয়াছে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, "কেন? এই রকমে মাছ ধরিয়া বেচিলে তো পয়সা হয়। সকাল হইতে ধরিতে আরম্ভ করিলে অনেক ধরিতে পারিব, তারপর বাজারে বেচিলে পয়সা হবে, পয়সা হ'লে মার যাহা দরকার সব কিনিবো ; কেন মরিব, মাছ ধরি না।"

ফুল জলে নামিয়া আঁচল দিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহা পাঠক অবগত আছেন।

রাজকুমারের সহিত সাক্ষাতে ফুলের অর্থাভাব ঘুচিল বটে, মায়ের আহারের জন্য আর ফুলকে ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতে হইল না বটে, ফুলের নানাবিধ সুখের আয়োজন হইল সত্য, কিন্তু ফুল সুখী হইল না ; কেন হইল না, তাহা সে নিজেও জানিত না।

ক্রমে রাজকুমার রাজকুমারীর বিবাহ সম্বাদ রটিল,—ফুলও শুনিল। সে ভাবিয়াছিল, যাঁহারা তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের সুখের সম্বাদ শুনিলে সে সুখী হইবে, কিন্তু সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা হইল না। তাহার শূন্য হৃদয়ে যেন কোথা হইতে এক আগুন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

এই সময়ে তাহার দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্যই যেন তাহার মাতার পীড়া বৃদ্ধি হইল। রাজকুমারের বহু চেষ্টায়ও তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল না। ফুলের শোকোচ্ছ্বাস কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইবে এই আশায়ই রাজকুমার বিবাহ একমাস স্থগিত রাখিলেন।

অবশেষে তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে ফুলও অন্তর্হিত হইল। রাজকুমার কত অনুসন্ধান করিলেন, কতদিকে কত লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কোনরূপেই ফুলের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।

৫

যে দিন ইন্দু কাঁদিল, সেই দিন হইতে অবিরতধারে তাহার নয়নাশ্রু বহিতে আরম্ভ হইল, তাহার বদনের সে চিরহাসি বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহার হৃদয়ের চাপল্যভাব তিরোহিত হইল, আজয়েন্দু পূর্ব্বে তাহার সহিত বসবাসে যে সুখ উপলব্ধি করিতেন, এক্ষণে তাহাও আর পান না। তিনি দেখেন, তাঁহার ইন্দু সে পূর্ব্বের হাস্যময়ী, প্রেমময়ী ইন্দু নাই। যখন তিনি হৃদয়ভারে প্রপীড়িত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে শান্তির জন্য ইন্দুর পার্শ্বে আসিতেন, তখন তিনি যে আশা করিয়া ইন্দুর পার্শ্বে আসিতেন, সে আশা পূর্ণ হইত না।

ক্রমে তাঁহার এমনই হইল যে, আর গৃহে থাকা যায় না, তাঁহার হৃদয় সদাই উদাস, তাঁহার প্রাণ সদাই ব্যাকুল, তিনি দেশভ্রমণের ইচ্ছা করিলেন; নানাদেশ ও নানাতীর্থ পর্য্যটন করিলে হৃদয়ে শান্তিলাভ হইবে ভাবিয়া তিনি দেশভ্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

একদিন রাত্রে অজয়েন্দু ইন্দুর হাত দুখানি আদরে ধরিয়া বলিলেন, "ইন্দু, আমি দেশভ্রমণে যাইব মনে করিতেছি, তুমি বলিলেই যাই।"

"অজয়, আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? তোমার যাহাতে আনন্দ হইবে তাহাতে কবে আমি প্রতিবন্ধক দিয়াছি?"

"তা নয়, তবু যদি তুমি মনে কষ্ট পাও, তবে আমি যাইব না।

"কেন যাবে না? যাও, গেলে তোমার মন স্থির হবে।"

"ইন্দু,—তুমি দেবী অপেক্ষাও দেবী,—তোমার ভালবাসার সীমা নাই,

আমি তোমার উপযুক্ত নই। প্রাণে এই দুঃখ থাকিল যে, আমি তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না।"

"কে বলিল, আমি সুখী নই? আমার মত সুখী কে? অজয়,—এ সব কথা কেন বল্‌চ?"

"তুমি মনকে প্রবোধ দিতে পার, কিন্তু আমি যে পারি না। ইন্দু, ইন্দু,—আমাদের কেন এমন হ'ল!"

"কি হয়েছে, নাথ,—কিছুই তো হয় নি, আমরা তো খুব সুখেই আছি।"

"তুমি কি আমায় তেমনিই ভালবাস ইন্দু?"

ইন্দুর দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—সে স্বামীর গলা দুই হস্তে জড়াইয়া তাঁহার মুখে মুখ লুকাইল। অজয়েন্দু জগত সংসার বিস্মৃত হইলেন, তিনি আত্মপর ভুলিয়া গেলেন। সাদরে সপ্রেমে ইন্দুর সজল নয়ন, শোভায় সুশোভিত মুখখানি দুই হস্তে তুলিয়া লইয়া শত সহস্র চুম্বন করিলেন,—পাগলের ন্যায় ব্যাকুলভাবে তাহার প্রেমময় মুখ প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন,—তাঁহার হৃদয়ে, তাঁহার জীবনে ইন্দু ভিন্ন যে আর কিছুই নাই।

সাহসা একি হইল! মুহূর্ত্তের জন্য পলকের নিমিত্ত ফুলের সেই কর্দ্দমাক্ত মলিন বদন তাঁহার হৃদয়পটে চমকিল। অজয়েন্দু ইন্দুকে সাদরে ঘুম পাড়াইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

ইন্দু ভাবিল, অজয় আর তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না,—কিন্তু তাহা হইল না। পরদিবস অজয়েন্দু তীর্থভ্রমণে প্রস্থান করিলেন।

নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অজয়েন্দু আরবলি পর্ব্বত পরিদর্শনে আসিলেন। আবার তাঁহার পূর্ব্বভাব দেখা গিয়াছে; তিনি নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন'—নির্জ্জনে একমনে বসিয়া ভাবনাই এক্ষণে তাঁহার নিকট প্রিয়। পূর্ব্বের ন্যায় তিনি বন্দুক স্কন্ধে জঙ্গলে জঙ্গলে পরিভ্রমণে বিশেষ সুখ উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

একদিন তিনি একাকী এইরূপ শিকারে বহির্গত হইয়াছেন, একাকী বনে বনে ঘুরিতেছেন, পক্ষীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই,' প্রত্যহই শিকারে বহির্গত হয়েন, অথচ কোনদিনই একটি পক্ষীও শীকার করেন না। অদ্য তিন চারি ঘণ্টা ঘুরিতেছেন, কিন্তু একটি পাখীও শিকার করেন নাই।

সহসা তিনি চমকিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন, অদূরে একটী বালিকা কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে। সে কাষ্ঠ আহরণে এতই ব্যাকুল যে, বৃক্ষের অতি

ক্ষীণ শাখায়ও সে অবাধে গমন করিতেছে। বহুদিবস পূর্ব্বে এইরূপ ব্যগ্রভাবে আর একটী বালিকাকে তিনি মাছ ধরিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বালিকাকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য সেই বৃক্ষের নিকটস্থ হইলেন, অমনি এক বিকট চিৎকারে সমস্ত পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, দূরে দূরে বহুদূরে সেই চীৎকারধ্বনি প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে রাজকুমার বৃক্ষনিম্নে আসিয়া সেই পতনোন্মুখী বালিকাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। বালিকার পদনিম্নস্থ শাখা ভাঙ্গিয়াছিল, নিকটে কেহ না থাকিলে নিম্নস্থ প্রস্তরখণ্ডে পতিত হইয়া বালিকা নিশ্চয়ই চূর্ণ বিচূর্ণ হইত।

কিন্তু একি! যে বালিকার মলিন মুখ সময় সময় তাঁহার হৃদয়পটে চমকিত হইতেছিল,—এ যে সেই ফুল!

ফুল মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল। অজয়েন্দু অতি যত্নে অতি আদরে তাহাকে সেই বৃক্ষনিম্নে শয়ন করাইলেন, তৎপরে নিকটস্থ ঝরণা হইতে জল আনিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথা ও মুখে সিঞ্চিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে বালিকা সত্বর সজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু মেলিল, কিন্তু অমনি চক্ষু মুদিল। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট অজয়েন্দু অপেক্ষা করিলেন, তবু ফুল চক্ষু মেলিল না; তখন রাজকুমার অতি আদরে ডাকিলেন, "ফুল!" "ফুল, চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিল; অজয়েন্দু বলিলেন, "ফুল, তোমায় লাগেনি তো?" এবার ফুল কথা কহিল, বলিল, "আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি?"

"কেন ফুল, স্বপ্ন কি? তুমি কি আমাকে চিন্‌তে পারচো না?

"আমি যে এই রকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখি! কতদিন দেখছি'—তার পর সব কিছুই নয়।"

"তুমি কি আমার কথা ভাবতে?"

"না!"

"তবে সপ্নে দেখ্‌তে কি?"

"আপনাকে!"

"কেন?"

"আপনি যে আমায় কত আদর কর্ত্তেন।"

"আমি তোমাকে চিরকালই আদর কর্ব্বো। তুমি আমাকে না বলিয়া কেন চলে এসেছিলে? কেন ফুল, আমি কি তোমাকে অযত্ন করিতাম?"

মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজকুমার বৃক্ষ নিম্নে আসিয়া পতনোন্মুখী বালিকাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। —ভক্তি ও শক্তি—৬১১ পৃষ্ঠা।

ফুলের লোচনদ্বয় ধীরে ধীরে জলপূর্ণ হইল, সে মস্তক অবনত করিয়া প্রস্তরে নানা চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। অজয়েন্দু বলিলেন, "তুমি যদি আমায় একটুও ভালবাসিতে, তাহা হইলে আমাকে না বলিয়া আসিতে না। জান কি, আমি তোমাকে কত খুঁজেছি!"

ফুলের চক্ষু হইতে দুই চারি ফোঁটা জল পড়িল, অজয়েন্দু তাহা দেখিতে পাইলেন না; তিনি বলিলেন, "ইন্দু তোমার জন্য কত কেঁদেছে।"

এবারে আবেগে ফুলের চক্ষু হইতে জল ছুটিল, সে হৃদয়বেগ আর দমন করিতে পারিল না। তাহার ক্রন্দনে অজয়েন্দু আত্মবিস্মৃত হইলেন, তাহাকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া তাহার চক্ষুজল মুছিয়া দিলেন, তাহার গোলাপ-বিনিন্দিত ওষ্ঠে শত সহস্র চুম্বন করিলেন। ফুলের বোধ হইল যেন তাহার পদনিম্ন হইতে ধরণী সরিয়া যাইতেছে, সে ভয়ে চক্ষু মুদিল, অজয়েন্দুর হৃদয়ে মুখ লুকাইল। অজয় বলিলেন, "ফুল, আমরা কি তোমাকে অযত্ন করিয়াছিলাম? আমাদের উপর নির্দ্দয় হইয়া কেন চলিয়া আসিলে?"

এবার ফুল কথা কহিল, বলিল, "আমাকে আপনারা কেন এত যত্ন কর্ত্তেন?"

অজয় হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের এই কি অপরাধ?"

ফুল কথা কহিল না। অজয় আবার বলিলেন, "এবার যখন তোমাকে পাইয়াছি তখন আর ছাড়িব না। এখন বল, তুমি এখানে কোথায় আছ, আর এতদিন কোথায়ই বা ছিলে?"

ফুল বলিল, "আপনাদের বাড়ী হইতে কেন পালিয়েছিলাম জানি না। পালিয়ে যে কোথায় যাব, তাহাও ভাবি নাই—যে দিকে দৃষ্টি চলিল, সেই-দিকেই ছুটিতে লাগিলাম। এইরূপে দুইদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ছুটিলাম। তিন দিনের পর আর পা চলে না, আমি ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষের নিম্নে বসিলাম। তারপর জানি না কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দেখি যে, আমার মাথার নিকট একজন সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। তিনি বলিলেন, "মা তুমি যেই হও,—আমার সঙ্গে চল,—তুমি রাজার মা হইবে।" আমার যাইবার স্থান ছিল না, আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিলাম। তিনি আমাকে খুব যত্নে রেখেছেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই এই পাহাড়ে আসিয়াছি তাঁহার জন্য আজ কাট কুড়াইতে আসিয়াছিলাম।"

"তা বেশ করিয়াছ এখন আমার সঙ্গে দেশে চল।"

"না।"

"না কি ফুল? তোমাকে যাইতেই হইবে।"

"না।"

"না যাওতো জোর করিয়া লইয়া যাইব।"

"আমি কাঁদিব।"

"শ্বশুরবাড়ী যাইতে সব মেয়েই কাঁদে। আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইব। ফুল, আমায় বিবাহ করিবে না?"

"না।"

"তোমার কথা আমি শুনিব না। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। চল, তোমার সন্ন্যাসীর কাছে যাই, তিনি আমাদের বিবাহ দিবেন।

দুইজনে নীরবে আশ্রমে আসিলেন। সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুমার অজয়েন্দু নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! আমি এই বালিকাকে বিবাহ করিব—আমাদের আজিই বিবাহ দিন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন খুব উত্তম প্রস্তাব। আমি জানি এই বালিকা রাজ-জননী হইবে, তবে রাজমহিষী হইবে না, সুতরাং আপনার সহিত ইহার বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু এ বালিকার কি এই বিবাহে মত আছে? বৎসে! তুমি কি বল?"

"না।"

"ও!—তোমাদের উভয়ের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল দেখিতেছি।"

"গুরুদেব, ফুলকে আমরা সকলেই বড় ভালবাসি।"

"তা তো দেখিতেছি।"

"তবে ফুল যে 'না' বলিতেছে সে কেবল লজ্জায়।"

"রাজকুমার,—আমরা সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু মনুষ্য চরিত্র বুঝিবার ক্ষমতা একেবারে নাই এরূপ নয়।"

ফুলের আপত্তি টিকিল না; ফুল আর কোন কথা কহিবার অবসরই পাইল না। সন্ন্যাসী উভয়ের বিবাহ দিলেন।

অজয়েন্দু ফুলকে লইয়া দেশে প্রত্যাগমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় হইবার সময় তাঁহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে বলিয়াছেন ফুল রাজমহিষী হইবে না, রাজ-জননী হইবে, ইহার অর্থ কি?"

"অর্থ যে কি, তাহা আমি চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারি নাই। রাজ-জননী হইবার চিহ্ন সকল ফুলের অঙ্গে আছে, কিন্তু রাজমহিষী হইবার চিহ্ন একটিও নাই, অথচ দেখিতেছি ফুল রাজ-মহিষী হইতে চলিল।"

অজয়েন্দু মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন এই সন্ন্যাসী নিতান্তই বাতুল।

৬

অজয়েন্দুর বিবাহের সম্বাদ ইন্দু পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। তিনি যখন প্রথম এই সম্বাদ পাইলেন, তখন সহসা তাঁহার হৃদয়ে বজ্রাঘাতের ন্যায় দারুণ বেদনা অনুভূত হইল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ক্রীড়া করিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, এত দিনে তাঁহার স্বামী সুখী হইবেন; স্বামীর সুখ ভিন্ন ইন্দু আর এ সংসারে কি জানে?

এত দিন তাহার হৃদয়ে যে শোকের মেঘ বিরাজ করিতেছিল, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে দূরীভূত হইল,—কোথা হইতে আনন্দের স্রোত আসিয়া যেন তাঁহার হৃদয় ভাসাইয়া দিল, তিনি তাঁহার সতিনীকে সাদরে মহাসমারোহে গৃহে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আয়োজন আরম্ভ করিলেন।

প্রাসাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকোষ্ঠ ফুলের জন্য সজ্জিত হইল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল ফুলের জন্য সজ্জিত রহিল,—অতি সুন্দর বহু মূল্যবান বস্ত্রাদি তাহার জন্য ক্রয় করা হইল। ফুল আসিতেছে,—ফুল রাণী হইয়া আসিতেছে,—মহা আয়োজন, মহা সমারোহ,—দেশের লোক ইন্দুর ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইল,—ইন্দুর সখীগণ ইন্দুকে কখনও এত আনন্দে বিভোর হইতে দেখে নাই,—তাহারা সকলে অবাক হইল।

অজয়েন্দু ও ফুল আসিলেন। মহা আদরে ইন্দু ফুলকে গৃহে লইলেন, বলিলেন, "বোন্, এমন করিয়া আমাদের ফেলিয়া যাইতে হয়?" ফুলের আর সহিল না, সে ইন্দুর গলা জড়াইয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এত আদর যে তাহার সহে না। ইন্দুর এত আদরে যে তাহার হৃদয় ভাসিয়া যায়,—ইহাপেক্ষা ইন্দু যদি তাহাকে অনাদর করিতেন, তবে তাহার হইত ভাল।

ফুলের হৃদয়ে ইন্দুর আদর সহে না। কেমন তাহার মনে আপনাপনি হয় যে, সে পরের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে,—অজয়েন্দুকে তাহার কোনই অধিকার নাই। তাহার সে বন ও কাষ্ঠ আহরণ এ রাজসুখ অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। সে বনের বিহঙ্গিনী, এ স্বর্ণপিঞ্জর তাহার ভাল লাগিবে

কেন? তাহার হৃদয়ে ক্রমেই উদাসভাব দেখা দিল, সে পরকে দুঃখিনী করিতেছে। ইন্দু দুঃখিনী নহেন, অন্ততঃ বাহিরে তাঁহাকে বড়ই সুখী বলিয়া প্রতীয়মান হয়; তবুও কেন ফুলের হৃদয়ে এ বিশ্বাস? ক্রমে এই বিশ্বাসে ফুল দিন দিন অসুখী হইতে আরম্ভ করিল। অজয়কে দেখিলে সে আত্মবিস্মৃত হয়, দিনরাত্রি অবিরত তাঁহার মুখ দেখিলে তাহার প্রাণে কত আনন্দ হয়, তাঁহাকে যে মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করিতে তাহার প্রাণ চাহে না, নতুবা সে কখনই ইন্দুর সুখের পথে কণ্টক হইত না। ইন্দু, যে ইন্দু তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, যে ইন্দু তাহাকে অবিরত ভগ্নী অপেক্ষাও যত্ন করে, তাহাকে সে কোন্ প্রাণে নিজের স্বার্থের জন্য অসুখী করিতেছে! না, আর সে পরকে অসুখী করিবে না, পরকে দুঃখিনী করা অপেক্ষা নিজের দুঃখিনী হওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়; কিন্তু হায়, প্রাণ যে অজয়েন্দুকে ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে না!

একদিন গভীর রাত্রে ফুল ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্ব হইতে উঠিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নিজ বেশভূষা একে একে সকল খুলিয়া ফেলিল, তৎপরে সামান্য একখানি বস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া সে শয্যাপার্শ্বে আসিয়া অনিমিষ-নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে তাহার নয়ন জলে পূর্ণ হইল, সে নিজ আলুলায়িত সুচিক্কণ কেশদাম দিয়া নয়নাশ্রু মুছিয়া আবার অনিমিষ-নয়নে স্বামীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে ধীরে ধীরে মস্তক অবনত করিয়া স্বামীর ওষ্ঠপ্রান্তে নীরবে চুম্বন করিল। আবার নয়ন জলে পূরিল,—আবার অশ্রুজল মুছিয়া ফুল ধীরে ধীরে সে প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিল।

নীরবে নিঃশব্দে সে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া কোথায় যাইবে ভাবিতেছে,—সম্মুখে দেখিল—সন্ন্যাসী। তিনি ফুলকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি জানিতাম তোমার অদৃষ্টে রাজমহিষী হওয়া নাই। এখন এস যেমন ছিলে তেমনই থাকিবে।"

ফুল কাঁদিয়া বলিল, "পিতঃ! আমাকে জুড়াইবার একটু স্থান দিন।"

(আগামী বারে সমাপ্য।)

স্নান-মাহাত্ম্য।

সে দিন উল্টা রথ, মাহেশে রথতলায় এত লোক জমিয়াছে, যে নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। নড়িবার চড়িবার উপায় নাই, কেবল ধাক্কায় ধাক্কায় সেই জনপ্রবাহ একবার কিয়ৎদূর অগ্রসর হইতেছে আবার ধাক্কায় ধাক্কায় কতকটা পিছাইয়া যাইতেছে।লোকের ভীড় ক্রমেই বাড়িতেছে, রথ টানিতে আর বিলম্ব নাই, সকলেই কোন ক্রমে বহুকষ্টে দণ্ডায়মান থাকিয়া উদ্‌গ্রীভ চিত্তে রথের দিকে চাহিয়া আছে। প্রায় সহস্রের অধিক লোক রথের দড়ি ধরিয়া হুকুমের অপেক্ষা করিতেছে। রথের দড়ির সম্মুখে শ্রীরামপুরের সবডিভিসন অফিসার ও পুলিস সাহেব দণ্ডায়মান, তাহাদের হুকুম ব্যতীত রথ টানিবার উপায় নাই। সহসা রথ টানিবার ইঙ্গিত স্বরূপ দুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে সেই সহস্র ব্যক্তি এক সঙ্গে দড়িতে টান দিল। ঠিক সেই সময় "গেল গেল" শব্দে সমস্ত রথ-তলা প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। পরেশনাথ তাহার কয়েক জন বন্ধুর সহিত মাহেশে উল্টা রথ দেখিতে গিয়াছিল; কিন্তু ভীড়ের মধ্যে তাহার বন্ধুগণ যে কে কোথায় হারাইয়া গিয়াছিল, তাহার কোনই সন্ধান ছিল না। সে ধাক্কায় ধাক্কায় রথের অতি সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার লক্ষ রথের প্রতি ছিল না; যতদূর দৃষ্টি চলে সে চারিদিকে তাহার হারান বন্ধুগণের অনুসন্ধানে ব্যাকুল ভাবে চাহিতেছিল। এমন সময় সেই ভয়াবহ "গেল গেল" শব্দে সে চমকিত হইয়া সম্মুখে চাহিল,— যাহা দেখিল তাহাতে তাহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ঠিক তাহারি সম্মুখে, অতি নিকটে এক বালিকা সেই অসহ্য ভীড়ের ধাক্কা সহ্য করিতে না পারিয়া রথের চাকার সম্মুখে গিয়া পড়িয়াছে। রথের লৌহ চক্র পৈশাচিক শব্দে সেই বালিকার ক্ষুদ্র দেহ অবিলম্বে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সে দৃশ্যে মুহূর্ত্তে সমস্ত জগৎ যেন পরেশনাথের চক্ষের সম্মুখে ঘূরনিয়মান হইল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, মহাবলে চারি-দিকের ভীড় দুই হস্তে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বালিকাকে রক্ষা করিতে ছুটিল। পরেশনাথ যখন বালিকার নিকট উপস্থিত হইল,তখন রথ প্রায় বালিকার উপর আসিয়া পরিয়াছে, সে এক লম্ফে সেই লুপ্ত চৈতন্য বালিকাকে কোলে

তুলিয়া লইয়া ভীড় হইতে বাহির হইবার জন্য অগ্রসর হইল কিন্তু নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া বালিকা সহ তথা হইতে দুই চারি হাত তফাতে যাইয়া উবুড় হইয়া পড়িল। পর মুহূর্তেই রথ তাহার পার্শ্ব দিয়া মহা শব্দে চলিয়া গেল; রথের চাকায় তাহার পাঞ্জাবী বাধিয়া তাহার কিয়দাংশ চাকার সহিত চলিয়া গেল। আর এক চুল হইলে তাহারা উভয়েই রথের তলায় পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত।

পরেশনাথ তখনই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বালিকাকে তুলিয়া লইয়া সেই জনপ্রবাহ ভেদ করিয়া অতি কষ্টে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকার দেহের নানা স্থান ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তবে আঘাৎ কোনটাই গুরু-তর হয় নাই, বাহিরে ফাকা হওয়ায় সে অনেটা প্রকৃতিস্থ হইল। তখন তাহার ঢল ঢলে চক্ষু দুইটী হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া তাহার গোলাপি গণ্ড সিক্ত করিতে ছিল। পরেশনাথ বাহিরে আসিয়া বিষন্ন বদনে একবার নিজের দেহের দিকে চাহিল, দেখিল তাহার বস্ত্র ও পঞ্জাবী অধিকাংশ স্থানই ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে, রথতলার লক্ষ লোকের পদধূলি তাহার সমস্ত অঙ্গে যেন ছাপ মারিয়া দিয়াছে। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বালিকার সেই সরল সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিল। তাহাদের চাকিদিকে তখন শত শত লোক দাঁড়াইয়া ভীড় বাড়াইতে ছিল, কেহ বলিল খুব বাঁচিয়া গিয়াছে, কেহ বলিল, ছোঁড়ার সাহস খুব,—আবার কেহ কেহ বলিল, ছোঁড়াটা কি গোয়ার, আর একটু হইলেই জন্মের মত রথ দেখেছিল আর কি! "সেই অদ্ভুত-মূর্ত্তি লইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পরেশনাথের লজ্জা হইতে ছিল, সে বালিকার দিকে ফিরিয়া বলিল, "চল তোমায় বাড়ী রাখিয়া আসি!"

বালিকা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, পরেশনাথ বালিকার হস্ত ধরিয়া ষ্টেসনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। রাস্তায় আসিতে আসিতে পরেশনাথ বালিকার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়য়া জানিল, তাহা-দের বাটী কলিকাতায়, সে তাহার মা ও কয়েকজন আত্মীয়ের সহিত রথ দেখিতে আসিয়াছিল কিন্তু ভীড়ে সে তাহাদের নিকট হইতে হারাইয়া গিয়াছে। পরেশনাথ ষ্টেসনে আসিয়া দুইখানি কলিকাতার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন। গাড়ী যথা সময়ে শ্রীরাম-পুর ষ্টেসন হইতে রওনা হইল।

সে কামরায় অন্যকোন আরোহী ছিল না। পরেশনাথ এতক্ষণে

একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বালিকাকে একবার ভাল করিয়া দেখিল ;—দেখিল বালিকা ঠিক বালিকা নহে, কিশোর যৌবনের মধ্যে পড়িয়া বালিকার অঙ্গ ঢল ঢল করিতেছে। কোন সুনিপুণ চিত্রকর যেন তাহার মুখখানি অতি যত্নে সূক্ষ্ম তুলি দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে। তাহার কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ-রাশি তাহার মুখে চোখে আসিয়া পড়িয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিতেছিল। পরেশনাথ বিভোর হইয়া তাহাই দেখিতে ছিল, সেই সময় বালিকা সহসা চক্ষু তুলিল, চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। বালিকা লজ্জায় ঈষৎ হাসিয়া মস্তক অবনত করিল। পরেশনাথের হৃদয়ের ভিতর দিয়া কি যেন কিসের এক বিদ্যুত প্রবাহ খেলিয়া গেল।

কলিকাতায় নামিয়া পরেশনাথ একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন,। গাড়ী প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা চলিবার পর একটা ছোট গলির ভিতর প্রবেশ করিল। গাড়ীখানি গলির ভিতর একখানি ছোট দ্বিতল বাটীর সম্মুখে আসিলে, বালিকা বলিল, "এই আমাদের বাড়ী।" পরেশনাথ গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিল। গাড়ী থামিলে বালিকা গাড়ী হইতে অবতীর্ণা হইয়া বলিল, "ওপরে আসবেন না ?"

পরেশনাথ পল্লী দেখিয়াই বুঝিয়াছিল এ ভদ্রপল্লী নহে ; ইহা কলিকাতার বিখ্যাত বারবণিতাগণের আবাসস্থান। লজ্জায় তাঁহার চক্ষু নিমিলিত হইয়া আসিতেছিল, সে অতি কষ্টে জড়িত কণ্ঠে কেবল মাত্র 'না' বলিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ী হাকাইতে বলিল।

২

আজ চারি দিন হইল পরেশনাথ বালিকাকে তাহার বাটীতে পৌঁছিয়া আসিয়াছে। এই চারি দিন দিনরাত্রি সে সেই বালিকার কথাই ভাবিয়াছে। বালিকার স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য সে বহু চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু জীবনযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কিছুতেই সেই বালিকাকে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। দিবারাত্র বালিকার সরল মুখখানি তাহার চক্ষুর উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, বালিকার ভবিষ্যত ভাবিয়া সে মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিতেছিল। পরেশনাথ ভাবিয়াছিল আর এ জীবনে কখনও বালিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না ; কিন্তু সেই দিন বৈকালে বাটী হইতে বাহির হইয়া নানা রাস্তা ঘুরিয়া সন্ধ্যার পুর্ব্বে সশঙ্কিত হৃদয়ে সে সেই গলির ভিতর প্রবেশ করিল। গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া পরেশনাথ দেখিল, বালিকা

তাহাদের বাটীর দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া একটী বৃদ্ধার সহিত কি কথোপ-কথন করিতেছে। পরেশনাথকে দেখিয়া সে ঈষৎ হাসিয়া মস্তক অবনত করিল। বালিকাকে সম্মুখে দেখিয়া পরেশনাথের বক্ষ স্পন্দন আরও বৃদ্ধি পাইল, সে দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিতেছিল কিন্তু বালিকা তাহাকে হাত ছানি দিয়া ডাকিল। পরেশনাথ আর অগ্রসর হইতে পারিল না ধীরে ধীরে যাইয়া বালিকার সম্মুখে দাঁড়াইল। বালিকা তাহার মধুর হাসিতে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আজকে আর আপনাকে ছাড়িব না, আজ আপনাকে আমাদের বাড়ী আসিতেই হইবে।"

পরেশনাথ জড়িতকণ্ঠে বলিল, "না,—না, আজ থাক আমার আজ একটু কাজ আছে।"

পরেশনাথের কথায় বালিকা ছলছল নেত্রে বলিল, "আপনি সেদিন চলে গিয়েছিলেন বলে মা আমায় কত বকলেন। আপনি না এলে আজও আমাকে বকুনি খেতে হবে; মার সঙ্গে একবার দেখা ক'রেই চলে যাবেন।"

পরেশনাথ একবার বালিকার মুখের দিকে চাহিল,—পরে ধীরে ধীরে বলিল, "চল তোমার মায়ের সহিত দেখা করিয়া আসি।"

বালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরেশ নাথ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। বাটীর নীচের তলাটী অতিশয় দুর্গন্ধময় অপরিস্কার ও ঘোরতর অন্ধকার। সিঁড়িগুলি অতিক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কিন্তু উপরের ঘরগুলি বেশ সুসজ্জিত। বালিকা পরেশনাথকে যে গৃহে লইয়া যাইয়া বসিতে বলিল, সে ঘরটী রাস্তার ধারে। মেজের উপর মোটা গদী পাতা, তাহার উপর ফরাস করা; ফরাসের চারিধারে অনেকগুলি মোটা মোটা তাকিয়া। গৃহের প্রাচীরের চারিদিকে চারিখানি আয়না, অনেকগুলি নগ্ন বিদেশীয় সৌন্দর্য্যের প্রতিকৃতি। গৃহের মধ্যস্থলে একটা বেল-ওয়ারীর ঝাড় ঝুলিতেছে। পরেশনাথ ধীরে ধীরে যাইয়া সেই ফরাসের এক প্রান্তে অতি সঙ্কোচিত ভাবে উপবিষ্ট হইল। ঠিক সেই সময় উপরের ছাদ হইতে কে ডাকিল, "ও নেড়া—ও নেড়ি, কোন চুলোয় গেলি?"

বালিকা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আপনি বসুন আমি মাকে ডেকে আনি।"

পরেশনাথ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—এমন সরলা বালিকা কি কদর্য্য স্থানেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ভগবানের কি বিচিত্র লীলা।

অতি অল্পক্ষণ পরেই বালিকা তাহার মাতার সহিত গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। পরেশনাথ বিস্মিত হইয়া নবাগতা রমণীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। রমণী প্রায় বিগত যৌবনা, সময়ে বোধ হয় কন্যার মতই সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে যৌবন সময় বুঝিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছে। যৌবনকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এখন পর্য্যন্ত চেষ্টার বিন্দু-মাত্র ক্রটী হইতেছে না। অঙ্গে চারি ইঞ্চি লাল পাড়ে অতি সুচিক্কণ সাড়ী; মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই। তিনি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনি ভাল হয়ে উঠে বসুন না; অমন করে বসতে কষ্ট হচ্ছে যে আপনার।"

পরেশনাথ লজ্জায় আরও জড়সড় হইয়া বলিলেন, "না—না আমি বেশ আছি।"

রমণী তখন মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তামাক খান কি?"

পরেশনাথের লজ্জায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল, সে অতি কষ্টে বলিল, "না।"

রমণী তখন কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিল, "যা না, বাবুর কাছে বসে একটু হাওয়া করগে না—যা না।" তারপর পরেশনাথের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তবে এখন আমি আসি বাবু, তোমরা দু'জনে বসে গল্পসল্প ক'র। মাঝে মাঝে এস।" রমণী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বালিকা ধীরে ধীরে অতি সলজ্জভাবে আসিয়া পরেশনাথের পার্শ্বে বসিল। পরেশনাথ কোন কথা কহিতে পারিল না, লজ্জা যেন তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। বালিকাও নীরবে অবনত মস্তকে পরেশনাথের পার্শ্বে বসিয়া মাঝে মাঝে বঙ্কিম-দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিতেছিল, বহুক্ষণ পরে পরেশনাথ বহু চেষ্টায় হৃদয়ের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রিভূত করিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "তোমার নামটী কি?" এই কয়টী কথা বলিতেই পরেশনাথের মুখ চোখ লাল হইয়া গেল। বালিকা মধুর কণ্ঠে বলিল, "আমার নাম লীলাবতী।" আবার কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার পর পরেশনাথ বলিল, "তবে আজকে এখন আমি যাই, আবার একদিন আসবো।"

লীলা কোন কথা কহিল না, পরেশনাথের সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিল। দরজার নিকট আসিয়া সে পরেশনাথের হাতখানি ধরিয়া বলিল, "তবে শীঘ্র একদিন আসবেন।"

পরেশনাথ "আসবো" বলিয়া ধীরে ধীরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল।

৬

ইহার পর হইতে প্রায়ই পরেশনাথ লীলাদের বাটী যাইতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার পরই তাহার প্রাণ যেন লীলার নিকট যাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিত। সেও তাড়াতাড়ী সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অতি পরিপাটিরূপে আপনাকে সজ্জিত করিয়া লীলাদের বাটীর দিকে ছুটিত। সুবিধা মত পমেটম, সাবান, সেণ্ট, জামা প্রভৃতি লীলার জন্য লইয়া যাইত। লীলাও প্রত্যহঃসন্ধ্যার পর তাহার অপেক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিত। তাহাদের কত কথা হইত; প্রত্যহই মান, অভিমান, আদর সোহাগে রাত্রি বারটা বাজিয়া যাইত। অনিচ্ছা সত্বেও বহু রাত্রে শূন্য প্রাণে আকাশ কুসুম গড়িতে গড়িতে পরেশনাথ বাড়ী ফিরিত। এই প্রণয় স্রোতের মাঝখান দিয়া পরেশনাথের মহাসুখে ছয় মাস কাটিয়া গেল।

এক দিন সন্ধ্যার সময় পরেশনাথ লীলার বাটীর দ্বারে আসিয়া দেখিল একখানি অতি সুন্দর জুড়ী তাহাদের বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। সে পূর্ব্বে আর কখনও তাহাদের বাটীর দ্বারে ওরূপ জুড়ী দেখে নাই। সহসা আজ জুড়ী দেখিয়া সে বিশেষ বিস্মিত হইল, কিন্তু তখন তাহার অন্য কোন বিষয় ভাবিবার অবসর ছিল না, লীলার সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে অবিলম্বে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। অন্য দিন লীলা তাহার অপেক্ষায় দরজার নিকটেই দাঁড়াইয়া থাকে, আজ তাহাকে না দেখিতে পাইয়া কি যেন একটা অজানিত আশঙ্কায় তাহার হৃদয় দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে সত্বর উপরে উঠিয়া লীলার গৃহের দিকে চলিল। দ্বারের নিকট আসিয়া সে শুনিতে পাইল, পার্শ্বের ঘরে লীলার মাতা কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। এরূপ কাতর ভাবে তাহাকে কথা কহিতে সে আর পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই। সে স্তম্ভিত হইয়া দ্বারের পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। একজন পুরুষ ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে বলিতেছে, "তোমার মেয়ে বড় বেয়াড়া, ওকে বেশ কড়া রকম শাসন করা প্রয়োজন।"

লীলার মাতা অতি কাতর কণ্ঠে বলিল, "সে আপনাকে বল্‌তে হবে না। একটা ছোড়ার পাল্লায় পড়ে বয়ে যেতে বসেছে। আজ আমায় মাপ করুন, কিছু মনে করবেন না, আপনি কষ্ট করে একবার কাল আসবেন, কাল আর ফিরতে হবে না।"

"না না আমি কিছু মনে করি নাই, আমি কাল ঠিক এমনি সময় আবার আসবো—দেখবেন যেন ফিরতে না হয়।"

কিসের কথা হইতেছিল তাহা বুঝিতে পরেশনাথের বিলম্ব হইল না, তাহার সম্মুখে যেন সমস্ত জগৎ অন্ধকার হইয়া আসিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না তাড়াতাড়ি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল গৃহের এক কোণে বালিসে মুখ গুজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া লীলা কাঁদিতেছে। সে তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে উঠাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না,—সে আরও কাঁদিতে লাগিল। পরেশনাথ অবাক হইয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। একটু পরেই সেই গৃহের দ্বারের সম্মুখ দিয়া এক প্রকাণ্ড মুরাটা মস্তকে, আড়াইমোনী ভূড়ি সুশোভিত কৃষ্ণবর্ণ কদাকার মাড়ওয়াড়ী নীচে নামিয়া গেল। পরেশনাথ বুঝিল ইহারই সহিত পার্শ্বের গৃহে লীলার মাতা কথা কহিতেছিলেন। লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে সে একেবারে মরমে মরিয়া গেল। সেই সময় আলুথালু বেশে ঝড়ের মত লীলার মাতা সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। এরূপ পৈশাচিক ভাবাপন্ন নারী-মূর্ত্তি পরেশনাথ আর পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। সে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আতঙ্কে তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। রমণী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিকট স্বরে বলিল, "হ্যাঁলা তোর যে বড় বুদ্ধি বেড়েছে, ভদ্রলোককে অপমান করা, আজ দেখি তোর কোন বাবা রক্ষে করে? শয্যাপার্শ্বে পরেশনাথকে উপবিষ্ট দেখিয়া, তাহার সেই পৈশাচিক মূর্ত্তি আরও যেন পৈশাচিক ভাব ধারণ করিল, সে ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে বলিল, "তুমি যদি ভদ্রলোকের ছেলে হও তো, খবরদার আর আমার বাড়ী ঢুকো না।" তাহার পর আবার কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিল, "যত কিছু বলি না তত বাড় বেড়ে উঠেছে, না? যদি ঝেঁটিয়ে না তোর পিরীত বার করি তবে আমার নামই মিথ্যে। ও আমার সতী হয়েছেন।" ক্রোধে বোধ হয় তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, সে নানারূপ অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। পরেশনাথের আর এক মুহূর্ত্তও তথায় বসিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু লীলার সেই অশ্রুপূর্ণ কাতর মুখখানির প্রতি চাহিয়া তাহার পা নড়িতে চাহিল না। সে নীরবে অবনত মস্তকে পাষাণের ন্যায় তথায় বসিয়া রহিল। তখনও পাশের গৃহ হইতে অকথ্য ভাষায় অজস্র গালাগালি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল।

গভীর রাত্রে যখন সমস্ত জগৎ সুষুপ্তির কোলে নিমগ্ন হইল, তখন লীলা ধীরে ধীরে উঠিয়া পরেশনাথের পার্শ্বে আসিয়া বসিল ;—অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমি আর এখানে থাকিব না, তুমি এখনই আমায় এখান হইতে লইয়া চল।" পরেশনাথ নীরবে বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছিল লীলার কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সেই নরক হইতে তখনই লীলাকে লইয়া যায়, কিন্তু এ রাত্রে কোথায় তাহাকে লইয়া যাইবে? সে কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল, "কাল প্রত্যুষেই তোমার জন্য বাটী ঠিক করিয়া বেলা বারটার মধ্যেই আমি তোমাকে লইয়া যাইব, প্রস্তুত হইয়া থাকিও।"

লীলা ছল ছল নেত্রে বলিল, "কাল কি তুমি আর আমায় লইয়া যাইতে পারিবে?"

পরেশনাথ উদ্‌গ্রীব ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন—কেন?"

লীলা একবার কাতর দৃষ্টিতে পরেশনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "তাই ভালো, আমি প্রস্তুত হইয়া থাকিব, কাল তুমি অতি অবশ্য আমায় লইয়া যাইও।"

পরেশনাথ চিন্তার বোঝা হৃদয়ে লইয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত লীলাদের বাটী পরিত্যাগ করিল। সমস্ত কলিকাতা তন্ন তন্ন করিয়া পরদিন প্রত্যুষে বহু কষ্টে সে লীলার জন্য একখানি বাটী ভাড়া করিতে সক্ষম হইল। সে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া লীলাকে সেই নরক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য লীলাদের বাটীর দিকে ছুটিল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া উঠানেই তাহার সহিত লীলার মাতার সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে উপরে যাইতে দেখিয়া সে বাধা দিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ, লীলার সঙ্গে দেখা হ'বে না।"

পরেশনাথ স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন?"

রমণী একটু ভ্রুকুটী করিয়া বলিল, "তুমি কেমন ধারা ভদ্রলোক গা, তোমায় না আস্‌তে বারণ করে দিয়েছি। অপমান না হ'লে বুঝি আর 'হায়া' হবে না?

পরেশনাথের হৃদয়ের ভিতর প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতে ছিল, মান অপমানের জ্ঞান তখন তাহার হৃদয় হইতে একেবারেই লুপ্ত হইয়াছিল

আর অত সোহাগে কাজ নেই!- স্নান মাহাত্ম্য- ৬২৫

সে কাতর কণ্ঠে বলিল, "তাহার সহিত আমার একটু বিশেষ দরকার আছে, একবার মাত্র দেখা করিয়াই চলিয়া যাইব।"

রমণী তাহার দক্ষিণ হস্ত পরেশনাথের মুখের সম্মুখে নাড়িয়া বিকৃত মুখে বলিল, "আর অত সোহাগে কাজ নেই, ভালোয় ভালোয় বিদেয় হও, নইলে চাকর দিয়ে বের করে দিব।"

রমণীর ভাবে পরেশনাথ স্পষ্টই বুঝিল আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইলে সত্যই চাকর দ্বারা অপমানিত হইবার সম্ভাবনা। সে উন্মত্তের ন্যায় টলিতে টলিতে ধীরে ধীরে সে বাটী পরিত্যাগ করিল। যদি লীলার সহিত সাক্ষাৎ হয় এই আশায় সে সমস্ত দিন সেই বাটীর চারিদিকে পাগলের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু দিন যাইয়া রাত্রি আসিল তথাপি সে একবারও লীলাকে দেখিতে পাইল না। বহু রাত্রে হতাশ হৃদয়ে সে বাড়ী ফিরিল।

এক মাস কাল দিন রাত্রি লীলাদের বাটীর চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া বহু চেষ্টা সত্বেও পরেশনাথ মুহূর্ত্তের জন্যও লীলার সাক্ষাৎ পাইল না। শেষে তাহার এরূপ ভাবে কলিকাতায় থাকা অসহ্য হওয়ায় সে তাহার দাদার নিকট রেঙ্গুনে চলিয়া গেল। সে বেশ বুঝিয়াছিল এরূপ ভাবে আর অধিক দিন কলিকাতায় থাকিলে সত্যই সে পাগল হইয়া যাইবে।

* * * * * *

দুই বৎসর পরে পরেশনাথ কলিকাতায় ফিরিল, তখন পর্য্যন্তও সে লীলাকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। দুই বৎসর রেঙ্গুনে প্রাণের অসহ্য জ্বালা লইয়া সে দিনরাত্রি কেবল তাহারই চিন্তা করিয়াছে। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া লীলা কোথায়,—এখন তাহার অবস্থা কিরূপ,—তাহার কথা তাহার মনে আছে কি না? এই সকল জানিবার জন্য ও কেবল মাত্র তাহাকে আর একবার দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ এরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, বহু চেষ্টায়ও সে তাহার হৃদয়ের বেগ কিছুতেই দমন করিতে পারিল না। দুই বৎসর পরে আবার একদিন সন্ধ্যার পর সে লীলাদের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইল। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, লীলার গৃহ হইতে হাসির তরঙ্গ উঠিতেছে,—গানের ফুয়ারা ছুটিতেছে। পরেশনাথ ব্যাপার কি দেখিবার জন্য নিঃশব্দে সেই গৃহের দ্বারের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল; কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় সে ভিতরে কি হইতেছে কিছুই দেখিতে পাইল না। সে ফিরিতে ছিল ঠিক সেই সময় একটা দমকা

বাতাস আসিয়া সহসা দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিল,—পরেশনাথ দেখিল চারি পাঁচ জন লোক ফরাসের উপর উপবিষ্ট,—সকলেরই চক্ষু সুরায় ঢুলু ঢুলু করিতেছে, তাহাদের মধ্যস্থলে লীলা। তাহার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু—তাহারই সেই লীলা। তাহার এক হস্ত এক ব্যক্তির কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে, অপর হস্তে সুরার গেলাস। সহসা দরজা উন্মুক্ত হওয়ায় সকলে দ্বারের দিকে চাহিল, লীলার দৃষ্টি পরেশনাথের উপর পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হস্তস্থিত মদের গেলাস মেঝেতে পড়িয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের সেই শ্রেষ্ঠ তন্ত্রী, যে তন্ত্রী বহুদিন ছিন্ন হইয়াছিল, সহসা তাহাতে আঘাত লাগায় মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। পরেশনাথ তথায় আর দাঁড়াইতে পারিল না, সেই বাটী হইতে দূরে বহু দূরে পলাইবার জন্য দ্রুতপদে সেস্থান পরিত্যাগ করিল। তখন তাহার প্রাণের ভিতর বার বার উদিত হইতেছিল, 'স্থানের কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য।'

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার।

বাল্মীকির ভুল।

নলিনীকান্ত শৈশবে মাতৃহীন হইলেও সে সময় জননীর অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্নের তাদৃশ অভাব অনুভব করে নাই। পিতা ঈশানচন্দ্র, তাহার অপগণ্ড শিশু সন্তানগুলি প্রতিপালনের জন্য, আশু পত্নী-বিয়োগ-যন্ত্রণা প্রশমিত হইবার পূর্ব্বেই, পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কিশোরী বিরজা সুন্দরীকে দ্বিতীয় পত্নীরূপে বিবাহ করিয়া আনিল।

শৈশবে ও কৈশোরে বিরজা সুন্দরী পিতৃগৃহে শিশু ভ্রাতা ও ভগ্নীগুলিকে আন্তরিক যত্ন ও স্নেহসহকারে নিয়তই পর্য্যবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিয়া মাতার কার্য্যে সহায়তা করিত; এখন স্বয়ং মাতৃ-পদে অধিষ্ঠিতা হইয়া তাহার শৈশবোদ্বোধিত শিশু-প্রীতি, সপত্নী সন্তানগণের পক্ষে, জননী-হৃদয়-নিঃসৃত স্নেহ-সিঞ্চিতের ন্যায় অমৃতায়মান হইয়া উঠিল। সুতরাং, নলিনীকান্ত অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে নিপতিত হইয়াও যথাযোগ্য আদর ও যত্নের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইবার কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হইল না।

বিমাতার বিদ্বেষ-প্রভাবে শিশু সন্তানগুলি, তাপদগ্ধ কুসুমের ন্যায়

ম্লান ও বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া যাহারা ঈশানচন্দ্রকে দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে কথা প্রসঙ্গে সে এখন কত উৎসাহ ও গৌরবের সহিত বিরজা সুন্দরীর সপত্নী পুত্রগণের প্রতি অসামান্য স্নেহ মমতার কথা বিবৃত করিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। এদিকে বিরজা সুন্দরী, গৃহিনীজনোচিত যাবতীয় গৃহকর্ম্মে লিপ্ত রহিয়া শিশু সন্তানগুলির প্রতিপালন ব্যাপদেশে নারীহৃদয়ের স্নেহামৃতধারা উৎসারিত করিয়া এবং তৎপরিবর্ত্তে, ঈশানচন্দ্রের বয়োনুপাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু প্রেম ও ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া তাহার সময় এক প্রকার বেশ সুখ-শান্তির মধ্যেই অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এই সদ্য-প্রস্ফুটিত নারী হৃদয়, স্বর্গীয় সুষমার চির-নিকেতন রূপে বিরাজ করিয়া ঈশানচন্দ্রের ছিন্ন ও বিধ্বস্ত সাধের 'সাজান বাগান', আবার ফুলে-ফলে-সৌরভে অত্যধিক মহিমান্বিত করিয়া তুলিবে, কেহ কেহ বা তাহার প্ররোচনায় একথা বিশ্বাস করিতে ইতঃস্তত করিল না। বস্তুতঃ বিরজা সুন্দরী, সপত্নী সন্তানদিগকে যেরূপ অগণ্য সাধারণ স্নেহ অনুরাগের সহিত প্রতিপালন করিয়া তাহার স্বামীকে শিশুগণের সর্ব্ববিধ দায় হইতে অব্যাহিত প্রদান করিয়াছিল এবং শিশুগণ ও গর্ভধারিণী জননী অপেক্ষা বিমাতার যেরূপ অধিকতর অনুরক্ত হইয়া পিতাকে তাহাদের দারুণ দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তিদান করিয়াছিল, তাহাতে অনেকেই মনে মনে ঈশানচন্দ্রের পত্নীভাগ্যের প্রশংসা এবং উৎপীড়িত দ্বি-পত্নীকগণ অত্যধিক ঈর্ষা করিতে লাগিল।

ঈশানচন্দ্র এখন তাহার সংসারে ভবিষ্যতে কোনরূপে দ্বন্দ্ব-কলহের আবির্ভাব একবারে অসম্ভব স্থির করিয়া সুখ-শান্তির লুব্ধ-আশায় বিরজা সুন্দরীর উপর গৃহস্থের যাবতীয় ভার অর্পণ করিল এবং উপার্জ্জনের শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া কতকটা নির্লিপ্ত ভাবে কালযাপন করিতে লাগিল।

২

নলিনীকান্ত কলেজের গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে বাটী আসিয়াছে। একদিন কয়েকটি সতীর্থ বন্ধুসহ সান্ধ্য-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া দূর প্রান্তরস্থিত একটি তটিনী-বক্ষোবদ্ধ সেতুর উপর উপবেশনান্তর স্নিগ্ধ-সমীর সেবন করিতে করিতে নানাবিধ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। যুবক-বৃন্দ, তাহাদের আপনাপন কলেজ সম্পর্কীয় কথা, ক্রীড়া-কৌতুকাদির পরিচয়, সংবাদ-

পত্রে প্রচারিত সাময়িক ঘটনাবলীর উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা ইত্যাদি পরস্পরে সম্পর্কশূন্য বিবিধ বিষয়ের অবতারণা ও তৎসমুদয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া পরিশেষে নিজ নিজ ব্যক্তিগত সাংসারিক অবস্থালোচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। নলিনীকান্ত বলিল, তা "ভাই নরেন তুমি যে অন্যায় অত্যাচারের কথা বলছ, আমার ধারণা, তার অধিকাংশই তোমার মনঃ কল্পিত এবং অবশিষ্ট নিজের স্বভাবদোষে সৃষ্ট। মানুষ, বিশেষতঃ কোমল-স্বভাবা স্নেহ-পরায়ণা জননীর জাতি, কখন অত কঠিন, অত নির্দ্দয় হতেই পারে না।

নরেন হাসিয়া বলিল তুমি মাত্র নিজের অবস্থা দেখে একথা সাধারণ নিয়ম খাড়া করতে যাচ্ছ এটা তোমার মহা ভুল। তোমার বিমাতা এখন পর্য্যন্ত তোমায় নিজের সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন, তাই বলে যে সকলেরই এরূপ হবে, তার কথা কি? শুদ্ধ আমার কেন,- প্রায় অধিকাংশ স্থলেই ত বিমাতার অযথা অত্যাচারের কথা শুনতে পাই।"

"অধিকাংশ স্থলেই যে এরূপ অত্যাচারের কথা শুনতে পাও তার জন্য বিমাতা অপেক্ষা অপরেই অধিকতর দায়ী। বিমাতাকে নূতন সংসারে একক এসে কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করতে হয়। নবাগতের কর্ত্তৃত্বে, গৃহস্থ কাহারও কাহারও মনে বিদ্রোহ-ভাব অঙ্কুরিত এবং ক্রমে তাহা সংক্রামক হয়ে সকলেরই মনোমধ্যে অলক্ষ্যে বর্দ্ধিত হ'তে থাকে। কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখবার জন্য, এই বিদ্রোহভাব প্রকাশিত হবা মাত্রই, বিমাতাকে কঠোর হস্তে তাহা নিবারণ করতে হয়। ফলে, দ্বন্দ-কলহলের সৃষ্টি; কিন্তু আগে দোষ কার?"

"তবে কি তুমি বলতে চাও যে, যে স্থানে আমরা সে দিন সুখসচ্ছন্দে যথেচ্ছ আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াতুম, সেস্থানে একজন নবাগতের খেয়ালের বশবর্ত্তী হ'য়ে চোরের মত পদানত হ'য়ে থাকব—তুমি কি এরূপ ভাবে থেকে বিমাতার স্নেহাদরে মুগ্ধ হয়েছ? এ যে বালির বাঁধ—একটা আগন্তুক তরঙ্গের অপেক্ষা; সামান্য আঘাতেই যে চূর্ণ হয়ে যাবে। এরূপ যোড়া-তাড়া দিয়ে কতদিন চালাবে?"

"কেন?—চিরকালই চলবে। ভদ্রভাবে পরস্পরে র'য়ে স'য়ে থাকলে কি পদানত হয়ে থাকা হয়? তোমাদের মনে, বিমাতার প্রতি কি এক চিরাগত বিদ্বেষ-ভাব দৃঢ়রূপে আশ্রয় করে আছে তার আর ক্ষয় নাই উপরন্তু বৃদ্ধিই যথেষ্ট। রামায়ণের গ্রন্থকার আমাদের দেশময় কি অশান্তির বীজই বপন করে গেছেন।"

বল কি হে? "তোমার ধৃষ্টতা ত কম নয়! দুই চারিখানি বই পড়ে, এই অল্প বয়সে এত অকাল পক্ক হয়ে পড়েছ যে, একবারে রামায়ণে হাত! লম্ফটার পাল্লা যে বড় বেশী হয়ে পড়লো। যে 'রামায়ণ' জগতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে আসছে, তাকে তুমি কোন সাহসে, কি দেখে দুষ্ট বলে দোষারোপ করলে?"

"দোষারোপ করবো না?—শত সহস্রবার উচ্চকণ্ঠে তীব্রভাবে দোষারোপ করবো। যা' আমি নিজে মিথ্যা বলে জানতে বা বুঝতে পেরেছি তা দৃঢ়ভাবে বলতে সঙ্কুচিত হব কেন? রামায়ণের কবি যে, অতি শক্তিশালী, একথা আমি অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু, তাঁহার এই অসাধারণ শক্তিই যত অনিষ্টের মূল কারণ। তিনি অপর যে সমুদয় নরনারীর চরিত্র অঙ্কিত করেছেন, তা অতিমাত্রায় সমুজ্জ্বল। কিন্তু তাহারি পার্শ্বে বিমাতা কৈকেয়ীর চিত্র কত মসি-মলিন, কত ভীষণ! উজ্জ্বলের পাশে মলিন—শুভ্রবস্ত্রে মসি বিন্দুর ন্যায় অত্যাধিক ও অযথা কলঙ্ক বলে মনে হয়। যাঁর অঙ্কিত রাম লক্ষ্মণ সীতা প্রভৃতি মহান্ চিত্র, লোকে যথেষ্ট সমাদরের সহিত গ্রহণ করেছে, তাঁদের পার্শ্বে কৈকেয়ীর চিত্র, তারা কখন একবারে উপেক্ষা করতে পারে নাই—পরন্তু, যথাযোগ্য ভাবেই গ্রহণ করেছে। তারা একেই বিমাতা-প্রকৃতির ধ্রুব-নির্দ্দেশ বুঝে, বিনা বিচার ও পরীক্ষায় অন্তরের সহিত বিমাতা মাত্রকেই কৈকেয়ীর অনুরূপ মেনে নিয়েছে। এখন কি বল, এই ভ্রমাত্মক ধারণা প্রচারের যিনি আদি গুরু, তিনি এই দেশময় ঘরে ঘরে অশান্তির জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী নন?

"না—নিশ্চিতই না। তুমি যত দৃঢ়তার সহিত এই ভ্রম আবিষ্কারের ঘোষণা করতে অতি দুঃসাহসিকের মত অগ্রসর হয়েছ, আমি ততোধিক দৃঢ়তার সহিত তারস্বরে বলছি, সে রামায়ণের ত্রিকালদর্শী গ্রন্থকার, মাত্র দু' একটি বিশেষ উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে উপন্যাস রচনা করেন নাই। তিনি ঋষি—তিনি দ্রষ্টা; অসামান্য জ্ঞানার্জ্জনের পর, সুদীর্ঘকাল-কঠোর তপস্যা ও বহু সাধনা বলে দিব্য দৃষ্টি লাভ করে যা জ্ঞানগম্য বা ধারণাগম্য করতে পেরেছিলেন, জনসমাজের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পর্য্যবেক্ষণ করে যা স্বাভাবিক বলে অনুভব করেছিলেন, জগতের হিতার্থে তাই চিরস্থায়ীরূপে সমুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করে গেছেন। তাঁর ভুল!—একথা স্বপ্নেও ভেবনা তিনি ইচ্ছা করলে, বিমাতা চিত্র স্নিগ্ধ মধুর রূপে আঁকতে পারতেন। কিন্তু

তিনি যে কেন করেন নাই, তা বুঝবার সময় হয়ত এখনও তোমার আসে নাই।"

"না যাই বল নরেন, আমি তোমার দীর্ঘ বক্তৃতা ও বৃথা যুক্তি তর্ক কোন মতেই গ্রাহ্য করতে প্রস্তুত নই। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় যখন ইহার ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি তখন কিছুতেই রামায়ণের গ্রন্থকারকে অভ্রান্ত বলে মনে করতে পারবো না। বরং মনে মনে সংকল্প করেছি, আমি এর প্রতিবাদছলে এমন একটি গার্হস্থ উপন্যাস রচনা করবো যাতে জীবন্তভাবে দেখাবো বিমাতা মাত্রই কৈকেয়ী নয়। দেবী জননী প্রকৃতি বিমাতার অভাব নাই, প্রত্যুত প্রচুর পরিমাণে হওয়া অসম্ভব নয়।

উত্তেজনার সহিত যুবকগণ যখন কথা-প্রসঙ্গে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, সেই সময় দক্ষিণ দিক্ হইতে একটা ভয়ঙ্কর কালো মেঘ, ঝটিকা তাড়িত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সমগ্র আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যুবকগণ আশু বৃষ্টি-পাতে সিক্ত হইবার আশঙ্কায়, তৎক্ষণাৎ গৃহাভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতে না হইতে, পর্জ্জন্য-দেব কৃপাপূর্ব্বক মুষল-ধারা বর্ষণে তাহাদের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক যথেষ্টরূপ শীতল করিয়া দিলেন।

৩

ষষ্ঠী-দেবীর কল্যাণে, অচিরকাল মধ্যেই পাঁচ ছয়টি সন্তানের জননী হইয়া বিরজা সুন্দরী, ঈশানচন্দ্রের পরিবার সংখ্যা এবং সাংসারিক ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করিলেও তাহার আয় বৃদ্ধি করিবার মত সৌভাগ্যবতী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই।

সামান্য চাকুরী-জীবি ঈশানচন্দ্র, বৃদ্ধ বয়সে উপার্জ্জন বৃদ্ধির কোনরূপ সদুপায় উদ্ভাবন করিতে পারিল না; অথচ ব্যয়-রাক্ষসী বিকট বদন-ব্যাদন করিয়া নিয়তই তাহাকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া দিন দিন ম্রিয়মান, সঙ্কুচিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। স্বামীর সমগ্র উপার্জ্জন হস্তগত করিতেছে বলিয়া বিরজাসুন্দরী তাহাকে সাংসারিক ব্যয়ের অনাটন সম্বন্ধে, প্রবল ইচ্ছা সত্বেও বেশী কিছু বলিতে পারিতেছে না। এমতাবস্থায়, ঈশানচন্দ্রের স্ফূর্ত্তীহীনতার কারণ, বিরজাসুন্দরীর নিকট আর অধিকদিন অজ্ঞাত রহিল না। এখন হইতে তাহার একান্ত গৃহ-নিষ্ঠ সুস্থির মানসে চঞ্চলতার ক্রম বর্দ্ধিষ্ণু আন্দোলনের সূচনা হইল।

এতদিন ধরিয়া বিরজাসুন্দরী সর্ব্বদা নিজ সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত রহিয়া অপর কোন রমণীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্টরূপ সংসৃষ্ট হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এখন সে সুবিধা সহজেই ঘটিয়া গেল। একদিন কথা-প্রসঙ্গে স্নান-ঘাটে সমবেতা রমণী-মণ্ডলী-মধ্যে স্ত্রী-সুলভ বাচালতা বশতঃ সে আপন সাংসারিক অসচ্ছলতার কথা প্রকাশ করিয়া আসন্ন মনোকষ্ট লাঘবের চেষ্টা করিল।

চতুরা রমণীগণ এই সুযোগে তাহার প্রতি বাহ্য সহানুভূতি দেখাইয়া ক্রমে তাহার এতদিনের সযত্ন-রক্ষিত যাবতীয় গুপ্তকথা বাহির করিয়া লইল। যে সকল ঈর্ষাপরায়ণা রমণী বিরজাসুন্দরীর গৃহে চিরচঞ্চল-প্রকৃতি সুখ-শান্তির নিত্য লীলা এবং দ্বন্দ্ব-কলহের নিতান্ত অভাব দেখিয়া মনে মনে নিয়ত তীব্র জ্বালা অনুভব করিত, তাহারা এখন শুভ অবসর বুঝিয়া বিরজাসুন্দরীর প্রতি তাহাদের চির-পরিচিত অব্যর্থ ঔষধ প্রয়োগ করিল। তাহারা বিরজাসুন্দরীকে দিব্য করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তাহার বৃদ্ধ স্বামী এখন সুপক্ক ফল, অচিরেই স্থান-চ্যুত হইয়া তাহাকে শিশু সন্তানগুলি লইয়া একেবারে পথের ভিখারী করিয়া যাইবে—এখন হইতে এ বিষয়ে বিশেষরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আর তাহার যে সপত্নীপুত্র, কলিকাতায় অধ্যয়ন জন্য ঈশানচন্দ্রের আয়ের তৃতীয়াংশ এখন একক গ্রাস করিতেছে, সে-ই যে ভবিষ্যতে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে এবং সমর্থ হইলেই যে বিরজাসুন্দরীর অনূঢ়া কন্যার বিবাহ ও শিশু সন্তানগুলির উপযুক্ত শিক্ষা প্রভৃতির সমগ্র ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় বহন করিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ?"

বিরজাসুন্দরীর পক্ষে এরূপ ভাবের কথা একবারে নূতন হইলেও তাহাকে তাদৃশ অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হইল না। পরন্তু, তৎসমুদয় যেন তাহার অন্তরের গুহ্যতম ভাবনিচয়ের প্রতিধ্বনি মাত্র বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং প্রবল ঝটিকা ও তরঙ্গ-তাড়িত কাণ্ডারীহীন তরণীর ন্যায় সে এখন একটা আশ্রয়ের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া কথঞ্চিত আশ্বস্ত হইল এবং বহু আলোচনা আন্দোলনের পর ভবিষ্যতের মনোমত সুখময় কল্পনায় অনুৎসাহিত হইয়া তাহা অবলম্বন করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

বিরজাসুন্দরীর পিতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। সুতরাং তাহার মৃত্যুর পর তাহার শোক-সন্তপ্ত মাতা একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিরজাসুন্দরী এ জন্য এখন তাহার শিশু সন্তানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ পটু লোকের একান্ত অভাব অনুভব করিল এবং একমাত্র তাহার মাতা ভিন্ন অপর কেহই এই অভাব যথাযোগ্যরূপে পূরণ করিতে সমর্থ নহে, এ কথা সুন্দর রূপে বুঝাইয়া ঈশানচন্দ্রকে তাহার মতানুগামী করিয়া লইল।

বিরজাসুন্দরীর মাতা আসিয়া তাহার গৃহ-কর্ম্মে যথোচিত সহায়তা করিতে না পারিলেও, তাহাকে আপাত মধুর বিবিধ মন্ত্রণা দানে এবং স্বকার্য্যোদ্ধারের বিচিত্র কল্পনা উদ্ভাবনে আশাতিরিক্ত পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

৪

নলিনীকান্তের বিবাহ হইয়াছে। যথাসময়ে সদ্য-প্রস্ফুটিত কুসুমের মত একটি নবজাত শিশু, বধুর অঞ্চল আলোকিত করিল। ইহাতে আনন্দ উল্লাসের পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর পরিবার বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিরজাসুন্দরীর মনে নানারূপ আতঙ্ক ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিল। হায়! এই স্বর্গীয় দৃশ্য উপভোগের একমাত্র অধিকারিণী নলিনীকান্তের গর্ভধারিণী আজ কোথায়!

একে নলিনীকান্তর কলিকাতায় অধ্যয়নের ব্যয়ভার বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে; তদুপরি এই নবজাত শিশুর আবির্ভাব, গণ্ডোপরি বিস্ফোটকের ন্যায়, বিরজাসুন্দরীর পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইল।

জননী-হৃদয়ের যে অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে এই সমুদয় ব্যয়ভার উৎপীড়ক না হইয়া অভাবনীয় সুখকর বলিয়া মনে হয়, বিরজাসুন্দরী অলক্ষ্যে কখন সেই অমূল্য ধন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এখন তাহার দুর্ব্বল মনশ্চক্ষুর সমক্ষে, পাণ্ডুগ্রস্থ রোগীর ন্যায়, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতার মোহময় আবরণ বিলম্বিত রহিয়া তাহার স্বচ্ছ ও সরল দৃষ্টি বিকৃত করিয়া দিয়াছে। দেব-দিগ্ধা বিরজাসুন্দরীর নিকট জগত এখন বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইল এবং সে ইহার একনিষ্ঠা সেবিকারূপে আত্মোৎসর্গ করিয়া শান্তি-প্রয়াসী হইল।

এখন বিরজাসুন্দরী, তাহার মাতার সাহায্যে সপত্নী পুত্রগণের প্রতি

পদেই দোষোদ্‌ঘাটন করিতে অভ্যস্থ হইয়াছে। নলিনীকান্তের, বধূ, সন্ত প্রসূতি হইয়া সর্ব্বদা গৃহ কর্ম্মে রত রহিলেও, কেবলমাত্র আপন শিশু-সন্তান লইয়াই ব্যস্ত—কোনরূপ কার্য্য করিয়া তাহার সহায়তা করে না—ইত্যাদিরূপ অযথা অভিযোগ সে নিয়ত উচ্চরবে ঘোষণা করিত। কখন কখন, সুর সপ্তমে চড়াইয়া সপত্নী-সম্পর্কীয় শত্রুগণের দ্বারা সে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হইতেছে—আর সহ্য করিবার শক্তি নাই—একক তাহাদের সকলের সেবা করিতে সে নিতান্তই অসমর্থা—স্পষ্ট ভাষায় এরূপ জবাব প্রায়ই ঈষানচন্দ্রের কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

ঈশানচন্দ্র, প্রথমাপত্নীজাত শিশুগণের সেবা যত্ন করিবার জন্য দ্বিতীয় দার-গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যে নানারূপ ঝঞ্জাট দৌরাত্ম্য উৎপন্ন হইয়া তাহার শান্তিময় গৃহখানি কণ্টকময় হইয়া উঠিবে, এরূপ অপ্রীতিকর কল্পনা, তাহার মনোমধ্যে কখনও উদিত হয় নাই। সুতরাং, এখন সে তাহার গৃহমধ্যে আশু বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। লজ্জা ও ঘৃণায় বিরজাসুন্দরীর সক্রোধ আস্ফালনে বাধা দিতে বা তাহার শ্রুতিকঠোর ও মর্ম্ম-বিদারক মন্তব্য-নিচয়ের প্রতিবাদ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। নিজের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির একান্ত অভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার বাক্ রুদ্ধ হইয়া গেল। গৃহ-লক্ষ্মী প্রথমা পত্নীর পবিত্র স্মৃতি-উদ্দেশে তাহার নয়ন যুগল অশ্রু-প্লাবিত হইয়া গেল।

বিরজাসুন্দরী কত ভাবে, কত অছিলায় সদাসর্ব্বদা তাহার বিরক্তির কথা পরিব্যক্ত করিতেছে, অথবা ঈশানচন্দ্র তৎসম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছুই বলিতেছে না, বা তাহার অভিযোগাদির কোনরূপ প্রতিকার ব্যবস্থা করিতেছে না; ইহা তাহার পক্ষে ক্রমেই একান্ত অসহনীয় হইয়া পড়িল। এই মৌনভাব, অবজ্ঞা ও অপমানের প্রত্যক্ষ নিদর্শন ভাবিয়া সে তাহার জিঘাংসা-বৃত্তিকে উত্তরোত্তর প্রবুদ্ধ ও জাগ্রত করিয়া তুলিল। পতনোন্মুখ দ্রব্য গতি প্রাপ্ত হইলে তাহা যেমন ক্রমেই বিবর্দ্ধমান গতি-সঞ্চয় দ্বারা নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হয়, বিরজাসুন্দরী এখন তদ্রূপ বর্দ্ধিষ্ণু ঈর্ষায় সমধিক উত্তেজিত হইয়া অশান্তির কণ্টকিত ক্ষেত্রের প্রতি অধোমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময়ে গৃহে আসিয়া ঈশানচন্দ্র যখন একান্তমনে অবসন্ন দেহে নিভৃতে বিশ্রাম জন্য লালায়িত

হইত, কলহোন্মত্তা বিরজাসুন্দরী সেই সময়, উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া সপত্নী-পুত্রগণের বিরুদ্ধে অভিযোগাদি উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ ঈশানচন্দ্রের হৃদয় ও মনের বল ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং এখন প্রবলা বিরজাসুন্দরীর নিকট পরাজয় স্বীকার ভিন্ন তাহার উপায়ান্তর রহিল না।

বাঁধ যখন ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া বাধা দিতে পারিলেই সকল দিক্ রক্ষা হয়; নচেৎ সুস্থির বারি আলোড়িত ও স্রোতমুখী হইলে তাহার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য?—সে সম্মুখে বাধাবিঘ্ন যাহা কিছু পাইবে, ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিগ্দিগন্ত প্লাবিত করিয়া আপন মনে ছুটিয়া যাইবে। ঈশানচন্দ্র, দ্বন্দ্ব-কলহের সূচনা কালে অনবহিত রহিয়া প্রশ্রয় দান করিয়াছে—এখন বিরজাসুন্দরীর কুল-প্লাবী ঈর্ষা-স্রোত-মুখে নিঃসহায় ক্ষুদ্র তৃণ-শীর্ষের ন্যায় ভাসিয়া যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর কি?

৫

কলেজের বেতন ও মেসের প্রাপ্য তাগাদায় অস্থির হইয়া নলিনী-কান্ত যখন পিতাকে অর্থের জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াও কোন উত্তর পাইল না, তখন অগত্যাই বাটী চলিয়া আসিল। ঈশানচন্দ্রকে তাহার মাসিক-বৃত্তি পাঠাইতে অযথা বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার বিমাতার নিকট বিস্তারিত অবগত হইবার জন্য কহিয়া দিল।

বিরজাসুন্দরী, নলিনীকান্তকে সুমিষ্ট কথায়, সামান্য আয়ে বৃহৎ-পরিবার প্রতিপালনের সমগ্র ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া প্রতিমাসে কেবল মাত্র তাহারই জন্য কুড়ি পঁচিশ টাকা উদ্বৃত্ত রাখা কিরূপ অসম্ভব, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। অধিকন্তু বলিয়া দিলেন যে পরিবার-সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে অবিলম্বে কোন চাকরী সংগ্রহ করিয়া তাহার বৃদ্ধ পিতাকে সাহায্য না করিলে সংসার-ব্যয় নির্ব্বাহ একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। নলিনীকান্ত কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া অধোবদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সরলমতি নব্য যুবক নলিনীকান্তের বিমাতার জটিল মন্ত্রণা-ব্যূহ ভেদ করিবার শক্তি না রহিলেও, তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বিমাতা বিরজাসুন্দরীই তাহার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ রুদ্ধ করিয়া

দিয়াছে—বৃদ্ধ পিতা এখন তাহার করচালিত ক্রীড়া-পুত্তলি মাত্র—গৃহ-স্বামী হইয়াও স্বামীত্বের গৌরবজনক অধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত সুতরাং অনন্যোপায় বশতঃ প্রবল ইচ্ছা এবং উপযুক্ত মেধা সত্বেও নলিনীকান্তকে উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্তির চিরপোষিত সুখময় আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল।

নলিনীকান্ত, স্ব-গ্রামের স্কুলে পনর টাকা বেতনে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেতনের সমস্ত টাকাই গৃহ-কর্ত্রী বিমাতার হস্তে দিয়া যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে সমর্থ হইল বুঝিয়া সে কতকটা আশ্বস্ত হইল।

গ্রাম্য-শিক্ষকের দ্রুত বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। নলিনীকান্ত, তাহার স্ত্রীপুত্র এবং সহোদর ভাই ভগ্নীর সমবেত ব্যয়, তাহার সামান্য বেতনে সঙ্কুলান হইতে পারে না—উদ্বৃত্ত থাকা ত দূরের কথা। বিরজা-সুন্দরী সত্বর বুঝিতে পারিল যে এখনও নলিনীকান্তের জন্য অনর্থক প্রতিমাসেই তাহাকে ক্ষতি সহ্য হইতে হইতেছে।

অধুনা তাহার চিন্তা, সঙ্কল্প ও কার্য্য মধ্যে ব্যবধান একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সে কাহারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তাহার ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্যে পরিণত করিল—সে নলিনীকান্তর স্ত্রীপুত্র সহোদর ভ্রাতাভগ্নী সহ পৃথকান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

একই গৃহ-চত্বরে রহিয়া পিতার সহিত পৃথকান্নে বাস—এ কল্পনা নলিনীকান্তের হৃদয়ে শাণিত বিষবাণের মত বিদ্ধ হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা দিতে লাগিল। সে বিধাতাকে বলিল—

'মা, পিতার সহিত পৃথকান্নে বাস' ইহা অপেক্ষা সন্তান-জীবনে কলঙ্ক ও দুর্ভাগ্যের কথা কি হতে পারে?—আমার নিজের ও আমার প্রতিপাল্যগণের ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া আমার বেতন হতে একটি পয়সাও যদি উদ্বৃত্ত থাকতো তা হলে আমার জীবন ব্যাপী এ ঘোরতর লজ্জা ও কলঙ্কের মধ্যে নিক্ষেপ করতে আপনার পায়ে ধরে নিষেধ প্রার্থনা করতাম। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যখন প্রতি মাসেই অতিরিক্ত ব্যয়, আমার পিতার অর্জ্জিত আপনাদের আয়কে অযথা ভারাক্রান্ত করে তুলছে, তখন আপনি দয়া করে আমাদিগকে স্থান না দিলে আমার তৎসম্বন্ধে অনুরোধ করবার কি অধিকার আছে?—আমার ঘৃণা লজ্জা বিলুপ্ত হোক্ আমি আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করলাম।'

নলিনীকান্ত অতিকষ্টেই দিন যাপন করিতে লাগিল। ভাই ভগ্নীগুলিকে উদর-পূর্ণ করিয়া আহার করাইয়া, শিশু পুত্রের দুগ্ধের সংস্থাপন করিয়া সব দিন দুইবেলা নলিনীকান্ত ও তাহার পত্নীর আহার জুটিত না। একই অঙ্গনের পার্শ্বে একগৃহে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে সপত্নীপুত্র পত্নীসহ ক্ষুধিত শরীরে শয্যায় ছট্ ফট্ করিতেছে আর অপর এক গৃহে বিমাতা উজ্জ্বল আলোকে পতি পুত্র প্রভৃতি যাবতীয় পরিবারবর্গকে চব্য-চুষ্য আদি বিবিধ ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট স্তুপাকারে পালিত গাভীর জন্য ঠেলিয়া রাখিতেছে—নরকের এরূপ পাপময় ভীষণ-দৃশ্য দেখিবার জন্য, নলিনীকান্ত ভগবানকে আহ্বান করিতে সাহসী হইল না!

অনশনে বা অর্দ্ধশনে যখন নলিনীকান্ত তাহার দুঃসহ কষ্টের দীর্ঘ দিনগুলি কায়ক্লেশে অতিক্রম করিতেছিল, সেই সময় বিরজাসুন্দরীর পুত্রের অন্নাশন উপলক্ষে তাহার ভ্রাতা সস্ত্রীক আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিল গৃহের অনাটন দেখিয়া সে নলিনীকান্তকে ডাকিয়া বলিল—

দেখ নলিনী, আমি মনে করেছিলাম, তুমি বুদ্ধিমান—আপন মনে বুঝে এর মধ্যে স্থানান্তরে গৃহের চেষ্টা করবে। দেখ, ভগবানের কৃপায় আমার ষষ্টীর দাস অনেকগুলি—কালে সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ গৃহ আবশ্যক, এমত ক্ষেত্রে একা ঘরগুলি জুড়ে রাখলে আমার চল্‌বে কেমন করে? বহু অর্থ জলের মত ব্যয় করে তোমায় লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দিয়েছি এখন তুমি নিজের ঘর দোর দেখে শুনে করে নাও। তা না করে আমার উপর আর অত্যাচার করাটা কি তোমার ভাল হচ্ছে?

নলিনীকান্ত নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ! বসুন্ধরা যেন তার ভার বহনে অসক্তা হইয়া দ্রুত অপসৃত হইল—সে আপনাকে শূন্যে বিলম্বিত ভাবিয়া কিছু-ক্ষণের জন্য আত্মহারা হইয়া গেল। পল্লীগ্রামে গৃহশূন্য সপরিবার ভদ্রসন্তানকে আশ্রয়দান করিবার মত উদ্বৃত্ত ঘর সদ্য কোথায় মিলিবে?

প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্তরের সহিত ভগবানকে হৃদয়ে বলসঞ্চার করিবার জন্য প্রার্থনা করিল, দয়ালু ভগবান তাহা পূরণ করিতে কৃপণতা করিলেন না যে গৃহ, তাহার গর্ভধারিণী জননী তাহারই জন্য একসময় মনোমত ভাবে প্রস্তুত করিয়া কালে বধূ ও পৌত্রদ্বারা সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবার আশায় প্রফুল্ল হইতেন, স্নেহ মমতায় পুণ্যময় মূর্ত্ত-নিকেতন, সেই চিরনিবিড় আশ্রয়

হইতে হঠাৎ এরূপ নির্ম্মমভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া, বিনাবাক্যব্যয়ে নলিনীকান্ত শিশুগুলির হস্ত ধরিয়া সপরিবারে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

গ্রামের শ্রীহরি ভট্টাচার্য্য প্রত্যুষে এই হৃদয় বিদারক করুণ দৃশ্য দেখিয়া একবারে হতবুদ্ধি ও স্তম্ভীত হইয়া গেলেন। বিমাতা-রাক্ষসীগণের কোন কর্ম্মই অসাধ্য বা অকরণীয় নহে! এমন ধীর-নম্র শান্ত-শিষ্ট নলিনীকান্তের উপর এরূপ পৈশাচিক অত্যাচার দেখিবামাত্রই ব্রাহ্মণ সমধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—বিপর্য্যয় ক্রোধের জ্বালায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল।

কিন্তু এরূপ ক্রোধ করিয়া এখন সময় নষ্ট করা চলিবে না বুঝিয়া তিনি তাহাদিগকে সাগ্রহে আহ্বান করিয়া স্কুল সংলগ্ন তাঁহারই চণ্ডীমণ্ডপ গৃহে যত দিন পর্য্যন্ত নলিনীকান্ত নিজগৃহ নির্ম্মাণে সমর্থ না হয়, ততদিন স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসার-সাগরে ভাসমান এই নিরাশ্রয় বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন পরিবারকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন।

৬

উপর্য্যুপরি দুঃখের পর দুঃখ পুঞ্জীভূত হইয়া মানুষকে যখন অতিমাত্রায় বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে, তখন সেই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের বোঝা বহিয়া তাহার অন্তরে কি এক অননুভূতপূর্ব্ব বিচিত্র আনন্দরসের সঞ্চার হয়, যাহার সঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা সঞ্জিবীত হইয়া মানুষ তখন প্রাণকে পরিত্যজ্য না করিয়া রক্ষা করিতে যত্নপর হয়। দুঃসহ দুঃখ-সহন-জনিত এই আনন্দ-মদিরার প্রমত্তাবস্থায় দুঃখানুভূতি বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং ঈশ্বরাভিমুখী হইবার উপক্রম করে। নলিনীকান্ত এখন দুঃখের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়া ভগবানের করুণা কীর্ত্তনের শুভ অবসরের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে।

উপবাস, জাগরণ ও মর্ম্মন্তুদ চিন্তাক্লিষ্ট নলিনীকান্ত, একদিন চণ্ডীমণ্ডপের অলিন্দে বসিয়া অনন্য মনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছে—অদূরে তাহার শিশুপুত্রটি একটি কাষ্ঠ পুত্তলি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। এমন সময়, হঠাৎ একটি অশ্বযান চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোচ-ম্যানের পার্শ্বে একজন বিরাটবপু, দ্বিধা-বিভক্ত কর্ণযুগ-বিলম্বী দীর্ঘ-শ্মশ্রু কনৌজী চাপরাসী উপবিষ্ট, তাহার বুকে রৌপ্য-ফলকে Executive Engineer শব্দ খোদিত চাপ্‌রাস বিলম্বিত।

নলিনীকান্ত ত্রস্তে গাত্রোত্থান করিয়া অগ্রসর হইবে এমন সময় নরেন্দ্র গাড়ী হইতে বাহির হইয়া একবারে নলিনীকান্তকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া উভয়ে উভয়ের বক্ষে মস্তক রাখিয়া অশ্রুজলে পরস্পরের শরীর প্লাবিত করিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পর নরেন্দ্র বলিল—

"ভাই বাবার পত্রে আজ কয়েক দিন হলো তোমার বিপত্তির কথা শুনে যে কি পর্য্যন্ত চঞ্চল ও ক্ষুণ্ণ হয়েছি, তা বলতে পারি না। তবে তিনি যে তোমায় প্রথমেই দেখতে পেয়ে, আমাদের 'মণ্ডপে' তোমায় আপততঃ থাকবার মত স্থান করে দিয়েছেন, ইহা তাঁর স্বভাব-জাত কার্য্য হ'লেও, যারপর নাই পরিতৃপ্ত হয়েছি। আমার অবসর মোটেই নাই, আমি এই মুহূর্ত্তেই ফিরে যাব। কেবল, দেখা দিয়ে তোমায় কতকটা প্রবোধ দিব এবং নিজেও কতকটা আশ্বস্ত হব, এরই জন্য তাড়াতাড়ি এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছি।"

"করুণাময় ভগবান তোমার এরূপ কষ্টের দিন কখনই স্থায়ী করবেন না ইহা আমার ধ্রুবধারণা, তুমি আদৌ-ম্রিয়মান হইও না। বিমাতার বিজয় ঘোষণা করে উপন্যাস রচনা কল্পনাটা এখন থাক্—এই নাও, আপাততঃ এই চারি শত টাকায় গ্রাম মধ্যে কোন উপযুক্ত স্থানে গৃহ-নির্ম্মাণ কর। বাবা এ বিষয়ে তোমার যথেষ্ট সহায়তা কর্ব্বেন। আবশ্যক হ'লে, আমার আরও অর্থ তোমার কার্য্যে নিয়োজিত করতে ত্রুটি করব না। এ বিষয়ে তোমার সঙ্কুচিত হবার ত কোন কারণ দেখি না—ভগবান কৃপা করলে, তুমি এই অর্থ প্রত্যর্পণ করতে পার। আমি সেই অর্থে তোমার সেই পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট আদর্শ বিমাতার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়ে দিব—আর, জগতে বিমাতা-মাহাত্ম্য ঘোষণা করবার জন্য, তাহার *নিম্নদেশে সুবৃহৎ অক্ষরে খোদিত করাইয়া দিব—*

" বাল্মীকির ভুল "

কঠোর দুঃখ প্রপীড়িত নলিনীকান্তের চক্ষে অশ্রু কয়দিন বিলুপ্ত হইয়াছিল। এখন নরেন ও তাহার পিতার অপূর্ব্ব মহত্ত্ব ও অমানুষিক দয়া ও উদারতা দেখিয়া তাহার রুদ্ধ অশ্রু, প্রবলবেগে উছলিয়া উঠিল। সে তাহার প্রবহমান অশ্রু-উৎস নিরুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই নরেন পিতার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে, নির্ব্বাক্ নলিনীকান্তের অন্তরে নরেনের কথার—প্রতিধ্বনি হইল—

" ছি! বাল্মীকির ভুল!"

শ্রীশিবরতন মিত্র।

আলোকে-আঁধারে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪র্থ দৃশ্য।

কলিকাতা—সিধু বাবুর স্কুলের সম্মুখ।

দারোয়ান দণ্ডায়মান, গ্রাজুয়েটগণের প্রবেশ।

১ম গ্রাজুয়েট।—সেলাম পাঁড়েজি।

দারোয়ান।—হামি পাঁড়ে নেহি বাবু সাব,—দোবে আছি।

২য় গ্রা। সেলাম তবে দোবে ঠাকুর! বাবু আফিসে আছেন?

দারো। হাঁ বাবু সাব। ফুরসুৎ নেহি, আপ কা কার্ড হ্যায়?

৩য় গ্রা। এই নেওনা ভাইয়া কার্ড, বাবুকে দেওগে।

দারো। আপকা কোন কাম হ্যায়?

৪র্থ গ্রা। সে বাবুকা সাথ দেখা হোলে ব'লব। তোম কার্ড দে কে এস।

দারো। হামি কহি, আঁপলোক ত' চাকরী কা ওয়াস্তে আয়া? বাবু বোলেছে চাকরী কা ওয়াস্তে যো বাবুলোক আবে,—কার্ড রাখকে যানে বোলো।

৫ম গ্রা। দেখা হবে না?

দারো। নেহি বাবু সাব, বাবুকা ফুরসুৎ নেহি। কার্ড রাখকে যাও।

৬ষ্ঠ গ্রা। কার্ড রেখে যাব, বাবুকে দেবে ত'?

দারো। দেবে না ত হামি কার্ড খাবে? কার্ড ত খানেকা চিজ্ নেহি বাবু সাব।

১ম গ্রা। তবে আর কি করা যাবে? কার্ড রেখেই চলে যাওয়া যাক্। যা অদেষ্টে থাকে হবে।

[সকলের কার্ড প্রদান]

দারো। উসকো পর সবকো নাম, ঠিকানা লিখ্‌না পড়্‌না কা খবর সব লিখ্ দিয়া ত?

২য় গ্রা। সব ঠিক আছে বাবা, সব ঠিক আছে। চল ভায়ারা চল, আর দাঁড়িয়ে থেকে ফল কি? বাপের পয়সা খরচ ক'রে আচ্ছা ডিগ্রি নিয়েছিলুম বাবা, খেতেও এখন মাসে কুড়ি টাকা মেলে না।

৩য়। তাই ত দাদা, এর চাইতে বেশী যে মাসে মাসে পড়্‌তেই খরচ হয়েছে। সুদ থাক্‌, আসলই যে ওঠে না। তারপর এই ঝকুমারী।

৪র্থ। আরে ছ্যা! এর চাইতে একবছরের টাকাটা জমিয়ে যদি একটা ব্যবসাও করা যেত, তাও এর চাইতে ভাল ছিল। পেটের ভাত জুটতই।

৫ম। দাদা, বি,এ, না হ'লে এত দরে বিয়ে যে হ'ত না, সেটা হিসেব ক'চ্চ না।

৪র্থ। আর রেখে দাও, রেখে দাও, দরের বিয়ে। টাকা ত বাবা কবে খরচ ক'রে ফেলেছেন। এখন বড় মানুষের মেয়ের সাবান, এসেন্স, সিল্ক-লেস্ আর নতুন নতুন নভেল কিন্‌তেই দফা সারা।

১ম। যা হক, তবু একটুখানি বিদ্যে ত লাভ করা গ্যাছে। সেটার হিসেব ক'রবে না? গোড়া থেকে ব্যবসা ধ'রলে যে মুখ্যু হ'য়ে থাকৃতে হ'ত।

৪র্থ। বিদ্যে ত রাশি রাশি নোট্ মুখস্থ করা—তা কি আর কেউ হজম ক'রেছ দাদা? লাভের মধ্যে অজীর্ণ অতিসারে মাথার ঘিলু, হাড়ের মজ্জা সব বেরিয়ে গ্যাছে। খালি এক রাশি শুক্‌নো কঙ্কালসার দেহ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি।

২য়। ওই মোড়ে ট্রাম এসেছে চল দাদা, চল, চল! আর মিছে ব'কে ফল কি? ল' ক্লাসের সময় হ'ল।

(সকলের প্রস্থান)

(মন্থর প্রবেশ)

গান।

(জুটিয়ে) দাও মা চাকরী।
কতকাল আর উমেদারী কর্‌ব শঙ্করী॥
হ'য়ে অবধি গ্রাজুয়েট,—(মা গো—মা, মা)
দেখলে কাগজ খুঁজে কোথায় আছে Wanted।
দরখাস্তেই পয়সা মাগো কম কি মাসে খরচ করি?
তবু জুটল না ত কোথাও একটু নিদেন মাষ্টারী॥

শিখিছি কর্ত্তে সেলাম (এম্‌নি করে) (তারা তারা গো)
সাহেব কারো শরণ পেলে হব ঠিক গোলাম !
ড্যাম শুয়োরে ও মাথা নুয়ে ব'ল্‌তে পারি "Yes sir"ই !
তবু মিল্‌বে নাকি ভাগ্যে মা গো একটু 'বাবু' গিরি !

মেম সাহেবের সকের কুকুর (ও মা, মা গো)
ব'লব তারে তোম্‌ বি মেরা দোসরা হুজুর,
চাই কি একটা ডেপুটী তায়, হ'য়েও যে মা যেতে পারি !
সন্তানে এ শুভ সুযোগ ঘটাও শঙ্করী !

(কৃষ্ণলালের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কিরে মনু, চাকরীর জন্যে এত ব্যস্ত কবে হ'লি। আজ হঠাৎ এ কাতর প্রার্থনা কেন ?

মনু। দাদা, আমি নিজে না হ'য়ে থাকি, দেশ শুদ্ধ লোক ত হ'চ্চে। প্রার্থনাটাও ঠিক এমনি ক'রেই তারা ক'চ্চে। তা দাদা, আমরা ত সবাই ভাই ভাই, সবাই সমান, আবার দর্শন শাস্ত্রও ব'ল্‌ছেন সবার মধ্যেই এক আত্মা বিরাজ করেন। 'একমেবদ্বিতীয়ম্‌' হচ্চে দর্শন-সার বেদান্তের মূল। সব আমরা এক ঢালা জল, এক জায়গায় নাড়া পেলে সব জায়গাতেই ন'ড়ে ওঠে। এ সব নড়ছে, একটা জায়গা কি শুধু ঠাণ্ডা থাকবে ? সুতরাং সবাই যা ভাবছে, যা কচ্চে, আমরও তা ভাবা আর করা হ'চ্চে। কেবল মোহ বশতঃই বুঝ্‌তে পারিনে। আজ বুঝি মোহটা একটুখানি কেটে গেল, তাই আর সবার সঙ্গে সমবেদনাটা বেশী অনুভব ক'চ্চি।

কৃষ্ণ। তোরও মনে যেন ভাবগুলো একটু ঝিকিমিকি দিচ্চে। নইলে কি কেবল দার্শনিক সমবেদনায় এতটা হয় ?

মনু। দিচ্চে বই কি দাদা, নইলে সমবেদনা হবে কি ক'রে ? সকলের যদি সমান বেদনা হলো, তবেই না সমবেদনা ?

কৃষ্ণ। তবে সত্যিই এখন চাকরী ক'র্‌বি.?

মনু। নইলে খাব কি দাদা ? এমন দস্তিপণা হুমড়ো চেহারা নিয়ে ভিক্ষে ক'ত্তে কোথায় যাব ? বিধাতা টাকা দেননি ব'লে দেহটা ত খাট করেন নি, পেটটাও ছোট করেন নি।

কৃষ্ণ। এদ্দিন খেয়েছিস কি ভবে ?

মন্টু। ভাত।

কৃষ্ণ। কোথায় জুট্‌ল।

মন্টু। রান্নাঘরে, বামুনের হাতে।

কৃষ্ণ। বলি সে কি মাগনা দিয়েছে ?

মন্টু। সে ত দাদা হোটেলের বামুন নয়, যে পয়সা নিয়ে ভাত বেচবে। সে যে মেসের বামুন, যে চাইবে তাকে বেড়ে দেবে।

কৃষ্ণ। বলি মেসেও ত আর পয়সা ছাড়া ভাত মেলে না ?

মন্টু। কতক মতক মেলে বই কি দাদা। আমার যে 'বসুধৈব কুটুম্ব-কম !' পাঁচ জায়গায় ঘুরি, গান করি, চাঁদা তুলি। যেখানে ক্ষিদে পায় খাই, রাত হয় ঘুমুই।

কৃষ্ণ। বলিস্ কি রে ! এমনি ক'রে কটা বছর কাটিয়ে দিলি ?

মন্টু। অনেকটা এম্‌নিই কেটেছে বই কি দাদা ? তবে কখনও কখনও খরচাও পেয়েছি,—আবার হাওলাতও ক'রেছি।

কৃষ্ণ। খরচা কে দিয়েছে ?

মন্টু। অধিকারী, যাঁর পালা গেয়ে বেড়াচ্চি, যাঁর জন্যে চাঁদা আন্‌ছি।

কৃষ্ণ। কে সে ? তোদের ভবতারণ ?

মন্টু। হাঁ দাদা ! তবে আজকাল কিছু ঠেকে যাচ্চি। তিনিও তাঁহার সর্ব্বস্ব সঁপে দিয়েছেন কি না, আমাদের জন্যে কাণা কড়িটাও রাখেন নি ?

কৃষ্ণ। কোথায় সঁপেছেন ?

মন্টু। মুখের কথা দেশের কাজে, আর টাকাগুলি তাঁর ব্যাঙ্কে।

কৃষ্ণ। দ্যাখ্ মন্টু, আমার কথা শোন্। তোদের এই যে অধিকারী ভবতারণ—ও একটা প্রকাণ্ড ভণ্ড।

মন্টু। (দুই হাতে কাণ চাপিয়া)

গুরোযত্র পরিবাদো নিন্দাবাপি প্রকীর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ॥

কৃষ্ণ। ইস্ ! ভায়ার গুরুভক্তি দ্যাখ ! দ্যাখ্ আর ন্যাকামো করিস্ নি, কাজের কথা শোন।

মন্টু। কাজের কথা ! বল দাদা বল, বাজে কথা শুন্‌তে শুন্‌তেই প্রাণটা গেল। কাজের কথা আর বড় শুন্‌তে পাইনে। বল দাদা, একটু কাজের কথাই বল। কাণটা একটু জুড়োক্।

কৃষ্ণ। এই এসব করে বেড়াচ্চিস কেন ? নিজের পরকালটা ত একেবারে খেলি ?

মন্থ। ইহকালটা প্রায় খেয়ে ফেলেছি ঠিক ; কিন্তু পরকালও কি খাচ্চি দাদা ?

কৃষ্ণ। তুইই খাচ্চিস্। এই যে নিজের কোন কাজ না ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চিস, আর দেশের লোকের টাকা আনছিস—কেন ? কোন কাজে ?

মন্থ। দেশের কাজে, সমাজের কাজে।

কৃষ্ণ। হাঁ, ভবতারণবাবুর নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমা হ'চ্চে, তার ছেলে বিলেত যাচ্চে,—ব্যারিষ্টারীর অভিনয় ক'চ্চে, খুব দেশের কাজ হ'চ্চে।

মন্থ। দাদা, টাকা যার নামেই ব্যাঙ্কে জমুক, জমলেই দেশের কাজ হ'লো। এটা হচ্চে Political Economy'র কথা। দেশের লোক কেউ বিলেত গেলেই দেশের কাজ হ'ল,—এটা হ'ল Social advancement-এর কথা। আর ব্যারিষ্টার হ'তে হ'লে গোড়ায় একটু অভিনয় সবারই কর্ত্তে হয়। আর বিনোদ ত এর পর বাপের আসন দখল ক'র্‌বে বলেই তৈরী হ'চ্চে।

কৃষ্ণ। দ্যাখ্ ওসব বাজে কথা ঢের শুনেছি। আর শুনিতে চাইনে। এখন এ সব ছেড়ে ছুড়ে কাজকর্ম্ম ক'র্‌বি কি না তাই বল।

মন্থ। ছাড়ি কি ক'রে দাদা ? ছেলেবেলায় বুদ্ধির ভুলেই বল, আর যাতেই বল, একটা প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে ফেলেছিলুম। এখন সেইটেই ভূতের মত কাঁধে চ'ড়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে।

কৃষ্ণ। বলি, প্রতিজ্ঞা করেছিলি কি ভবতারণবাবুর সেবা ক'ত্তে, না দেশের, সমাজের সেবা ক'ত্তে ?

মন্থ। কথাটা যে প্রায় একই দাঁড়ায় দাদা ! সেনাকে লড়াই ক'ত্তে হ'লে, সেনাপতি ছাড়া ত আর চলে না।

কৃষ্ণ। ইস্ ! ভারি সেনাপতি পেয়েছে ! শোন্ গাধা ! আর নিজেকে এমন করে গোল্লায় দিস নি। কাজকর্ম্ম কর্, মানুষের মত হ। নিজের বুদ্ধিতে চল, নিজের শক্তিতে দাঁড়া। দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি ক'ত্তে চাস, নিজে যা পারিস কর। অমন ভণ্ডের ল্যাজ ধরে বেড়াস্ নি। ক্ষমতা আছে, নিজের সেনাপতি নিজে হ'য়ে লড়াই কর্। দেখ্‌বি সত্যিই কত কাজ ক'ত্তে পার্‌বি।

মন্থ। দাদা, কথাগুলো যা ব'লছ ঠিক। কিন্তু অভ্যাসটা বড় খারাপ

হয়ে গ্যাছে। ল্যাজ ধরে ছাড়া চল্‌তে শিখিনি যে। তা আপাততঃ যদি তোমার ল্যাজটা ধরে চ'লতে দেও, তবে ভবতারণবাবুর ল্যাজটা ছেড়ে দিই।

কৃষ্ণ। আমার যে ল্যাজ নেই রে, ধ'র্‌বি কি?

মনু। ধ'র্‌বার মত একটুখানি বের ক'রে দেওনা দাদা? তার পর টান্‌তে টান্‌তে বেড়ে যাবে। কত লোক এসে ধর্‌বে। দেখাদেখি শেষে আমিও একটা ল্যাজ বার ক'রে দেব।

কৃষ্ণ। আচ্ছা চ'লবি তবে আমার কথামত?

মনু। চ'লব দাদা?

কৃষ্ণ। আমার সঙ্গে দেশে যাবি?

মনু। দেশে কি চাকরী মিল্‌বে দাদা?

কৃষ্ণ। তোকে চাকরী কত্তে হবে না।

মনু। চাক্‌রী কত্তে হবেনা? যদি ধাঁজ্‌ই বদ্‌লালুম দাদা, কারো ঘাড়ে ব'সে আর খাব না।

কৃষ্ণ। ঘাড়ে বসে খেতে হবে না। আমি ত চাকরী করি না;—কার ঘাড়ে ব'সে খাচ্চ?

মনু। তুমি ত চাষবাস করে খাও। আছ বেশ।

কৃষ্ণ। তুইও তাই ক'রবি?

মনু। জমিজমা কে দেবে দাদা?

কৃষ্ণ। সে সব আমি ঠিক করে দেব। আমার সঙ্গে কাজকর্ম্ম শিখ্‌বি। তারপর তোর বেশ চ'লে যেতে পারে, এমন জমাজমি আমি করে দেব। পাড়াগাঁয়ে থাক্‌বি, গরীব গ্রাম্য লোকদের ভাল করে কাজ কর্ম্ম কর্ত্তে শেখাবি, পাঁচ জনে মিলে পাঁচজনের কাজ কত্তে, দেশের রোগ পীড়া দলাদলি, ঝগড়া ঝাটি সব দূর কর্ত্তে শেখাবি। দেশের কাজ, সমাজের উন্নতি, এতে যা হবে, তোদের সভার বক্তিতেয় তা হবে না। আর নিজেও ভবঘুরের মত বেড়াচ্ছিস্‌,—রাজার মত গৌরবে থাকবি। কেমন রাজি ত?

মনু। রাজি দাদা! বাজে কাজে ঘুরচি, এখন পথ পেলেই বাঁচি।

কৃষ্ণ। আচ্ছা তবে আর কিছু দিন এমনি ঘোর। ২।১ মাস আরও আমাকে এখানে থাকতে হবে। তারপর আমার সঙ্গে যাবি। চল তবে, আজ আমাদের ওখানে খাবি। [উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

রঙ্গ-বারিধি।

সপ্তম তরঙ্গ।

সুদর্শনের স্বপ্ন।

১

প্রসূতির নিকট 'কষিত কাঞ্চন' হইলেও সুদর্শনবাবু সাধারণের নিকট কাল,—অন্তত অসাক্ষাতে এবম্বিধ দোষিত হইয়া থাকেন। সুদর্শনবাবুর কাণে সে কথা প্রবেশ করিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেন—তিনি 'পদ্যপাঠে' পড়িয়াছেন, "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" এ উপদেশ তিনি ভুলেন নাই। মনকেও তিনি সান্ত্বনা দিতেন—'রাজার মাকে' অসাক্ষাতে ডাইনী বলিলেও রাজ-জননী যে কোন সুকুমার শিশুর মস্তক ভক্ষণে লোভ পরায়ণা নহেন এবং সেরূপ উক্তিতে তাঁহার কোন কলঙ্ক হয় না ইহা ত ধ্রুব সত্য। এ সব ছাড়িয়া দিলেও,—সব স্বীকার করিলেও, মহাজনকৃত সেই পদ "কাল কি হয় না ভাল" কখনই ব্যর্থ হয় না বরং গৌর কাল হইবে, অসম্ভব সম্ভব হইবে,—তথাপি—তথাপি কাল মন্দ হইবে না। বৃন্দাবনের শ্যামচাঁদ কাল, যমুনার জলও কাল; নয়নের তারা কাল—কালই ভাল, মাথার যে কেশ কাল—কাল'ই প্রশংসনীয়।

লোকে বলিত কালও না হয় ভাল হইত, সুদর্শন বাবুকেও না হয় সুদর্শন বলা যাইত, যদি—। যদি কি? যদি তাঁহার অস্থিমাত্র সার, অতি বিলম্বিত মুখমণ্ডলে মক্ষিকাপরিবৃত মধুচক্রের ন্যায় বসন্তের ভূতপূর্ব্ব অধিষ্ঠানের চিহ্নগুলি না থাকিত; যদি—তাঁহার কিছু অঙ্গ সৌষ্ঠব থাকিত; যদি তাঁহার হস্তপদদ্বয় গোলাল হইত, যদি তাঁহার বক্ষের পঞ্জরগুলি বাহির হইয়া না পড়িত। এত গুলি যদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড় সহজ কথা ত নয়—তবে তাহার পরিবর্ত্তে কৃত্রিম উপায়ে লোকের চক্ষু রঞ্জন করিতে সুদর্শনবাবু অকাতরে অর্থব্যয়.ও অবিশ্রান্ত পুরুষকার অবলম্বন করিতে ক্ষান্ত ছিলেন না। কিন্তু "নিয়তি কেন বাধ্যতে?" বরং তাঁহার সেই সব প্রসাধনেই তাঁহাকে আরও কুৎসিত দেখাইত। ক্বচিৎশুভ্র কচিদ্‌বহুল কেশ রাখিয়া তিনি ঘোড়াগাড়ীর গাড়োয়ানের সহিত উপস্থিত হইতেন, মুহুর্মুহুঃ তাম্বুলরাগরঞ্জিত দন্তপাতি কারণাকারণে 'মুচকি' হাসির

উপলক্ষে ঘন ঘন বিকশিত হইয়া দর্শকগণের মনস্তুষ্টির পরিবর্ত্তে বিরক্ত বা অবজ্ঞা উৎপন্ন করিত; সুতারাং অবিলম্বেই ফলবিশেষের বা কোন ভৌতিক পদার্থবিশেষের সহিত তাঁহার বদনমণ্ডলের সাদৃশ্য ঘোষিত হইত। চক্ষুর পলক, পদের চলন,—অঙ্গের আবরণ, কেশের প্রসাধন, সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার লোকরঞ্জন প্রযত্ন ব্যর্থ হইত। ঘরের পয়সা খরচ করিয়া তিনি পরের বিরক্তি 'খরিদ' করিতেন। তাঁহার ধুয়া (Motto) ছিল "উদ্‌যোগিনং পুরুষ-সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ—," যদি তাঁহার ভাগ্য দোষে লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে অলক্ষ্মী আসিয়া তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করেন, করুন—তাঁহাকে লইয়াই তিনি তাঁহার প্রেমোজ্জ্বল কুসুমাকীর্ণ মনোময় রথে ভ্রমণ করিবেন।

সুদর্শনবাবুর আশৈশব এক আকাঙ্ক্ষা ছিল,—কোনও পরম লাবণ্যময়ী, প্রতিভাময়ী সুশিক্ষিতা, সুরসিকা মহিলা তাঁহার বামপার্শ্ব শোভিত করিবেন, —তাঁহারা উভয়ে রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তিতে জগৎকে মোহিত করিবেন,—পৃথিবীবাসীর জন্ম সার্থক করিবেন; বোধ হয় সেই জন্যই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ধরণীতলে কৃষ্ণবর্ণ সুদর্শনবাবু রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই তাঁহার ধারণা।

কিন্তু সেই দিন,—সেই শুভদৃষ্টির সময় যখন তিনি তাঁহার বহুকাল কল্পিত বৃকভাণুসুতার বদনদর্শন করিলেন, সেই রাত্রি হইতেই তাঁহার মনোবিকার উপস্থিত হইল। তাহা হইলে কি তাঁহার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য, সমস্ত কর্ত্তব্য বিফল হইবে? তাঁহার যে বড় সাধ ছিল, জীবকে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখাইয়া মোক্ষফল বিতরণ করিবেন। হায়, অদৃষ্ট!

২

সুদর্শনবাবু একদিন প্রাতে বিছানায় শুইয়া কাঁদিতেছিলেন; আমার পত্নী আসিয়া বলিল বা বলিলেন, "তুমি যাও, দেখ গিয়া—তোমার বন্ধুর কি হইয়াছে, প্রাতঃকাল হইতে কেবল কাঁদিতেছেন, চক্ষুর জলে সমস্ত বিছানা না কি ভিজিয়া গিয়াছে।" বন্ধুর বাড়ী আমার বাড়ীর নিকটেই ছিল, দৌড়াইয়া গিয়া বন্ধুবরকে সেই অকাল জলদবর্ষণের নিদান জিজ্ঞাসা করিলাম। "বন্ধু আমার"—"মিতে আমার"—কত সোহাগ করিলাম; বন্ধুর সে শ্রাবণের বারিধারা, আমার ভাঙ্গা ছাতায় কি করিবে? ছিদ্র পাইয়া 'দরদর' শব্দে পড়িতে লাগিল। অনেক সান্ত্বনার পরে, অনেক কাকুতি মিনতির পরে, সুদর্শনবাবু,— আমার প্রাণের বন্ধু—বলিলেন, " ভাই আমার এ রোদনের কারণ শুনিয়া অবশ্যই তুমি হাসিবে না?" আমি 'যাবজ্জীবো

স্থিতা গঙ্গা' ইত্যাদি শপথ করিয়া শ্রীকথা আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিলাম। বন্ধু বলিলেন, "বন্ধু আমার,—আমার এ রোদনের,—এ ব্যাকুল প্রাণের দারুণ বেদনার কারণ,—গত রাত্রির বিচিত্র স্বপ্ন!" বহু কষ্টে, বহুদিন মৃত আত্মীয়ের স্মৃতি অবলম্বনে শোক প্রকাশ করিলাম। তাহা না করিলে কি আর রক্ষা থাকিত? আমি উৎসুক হইয়া বলিলাম, "স্বপ্ন? কি স্বপ্ন? বাঘ ভালুকের? বাপরে, ভাগ্যক্রমে তোমার শ্বাসরোধ হয় নাই,—Heart fail করে নাই!" বিরক্তির স্বরে বন্ধুবর বলিলেন, "তোমরা বুঝি বাঘ ভালুককেই ভয়ের কারণ মনে কর? মনুষ্যের তারা কি ক্ষতি করে? কি ক্ষতি করতে শক্তি আছে তাদের?" আমি বলিলাম, "সত্যই ত, বৈয়াকরণিকের ব্যাঘ্র কেবল বিশেষরূপে আঘ্রাণ করিয়া যায়, আর ঈশপ সাহেবের ভালুক বন্ধুর কাণে সতর্ক হইবার উপদেশ দিয়া যায়—তাহার আবার ভয় কি?

আমার বাক্য লহরী বন্ধ করিয়া বন্ধু আমার,—এইবার একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভাই! তুমি জান কি শেষ রাত্রির স্বপ্ন, বিশেষতঃ নিদ্রাশেষে স্বপ্ন কি কখন বিফল হইয়াছে?" আমার তৎসম্বন্ধে অজ্ঞতা স্বীকারান্তে বন্ধু একটু ভূমিকা করিয়া বলিলেন, "শেষ রাত্রির স্বপ্ন সাক্ষাৎ কালপুরুষ বর্ণিত—তাহা অদ্যাপি কখনও ব্যর্থ হয় নাই,—ভবিষ্যতেও কখনও হইবার সম্ভবনা নাই।" আমি সংক্ষেপে "তা হইতে পারে" বলিয়া 'ততঃ কিং' 'ততঃ কিং' করিতে লাগিলাম। বন্ধু আমার আবার কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, আবার তাঁহার নয়নে জলধারা বহিল, আমি রুমালে মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলাম, "শীঘ্র বল, শ্রোতৃ-কর্ণ সমুৎসুক।" ভূমিকার শেষে সুদর্শনবাবু স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতেছেন, আপনারা সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করুন।

"রাত্রি ২টা ৫৫ মিনিটের সময় আমার গায়ে হাত দিয়া কে যেন বলিল, "ঘুমাইও না, শুনছ? জাগ, জেগে দেখ,—জেগে জেগে শোন।"

"আমি জাগিলাম; নিদ্রা হইতে নয়, সুষুপ্তি হইতে জাগিলাম; স্বপ্নে দেখিলাম; কি দেখিলাম! মরি, মরি, কি সুন্দর! আহা, কি মনোহর কি অপূর্ব্ব, কি অদ্ভুত!!! ভাই, তিলোত্তমাও তাহার নিকট কুৎসিতা, গোলাপও তাহার নিকট কঠিন! আহা সুষমা কেবল স্বপ্নেরই সম্পত্তি, বাস্তবের কৃষ্ণছায়া তাহাকে কলুষিত করে না। আকাশ-কুসুমেই সেই

ভুবনমোহিনীর বরবপু সুসজ্জিত হইতে পারে, পৃথিবীর মৃত্তিকাজাতপুষ্পে সে অঙ্গে বেদনা সঞ্চারিত করে! তিলফুলে তাহার নাসিকাসৌন্দর্য্য ব্যক্ত হয় না; চম্পক লইয়া তাহার লাবণ্যের পরিমাণ করা চলে না, শফরী তাহার চক্ষুর তারকা জ্যোতিঃ দেখিয়া জলমধ্যে লুকাইয়া যায়! সেই রূপবতী, গুণবতী—সেই আয়ুষ্মতী—সেই সুবর্ণহারবিলম্বিত বক্ষঃস্থলা, পীনপয়োধরা—হাস্যমুখী—মরি, মরি! সেই স্বর্গের দেবাঙ্গনা আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী! কি ভাগ্য আমার!—উজ্জ্বল সে বিবাহ-সভা!—কি মধুর সে বেদমন্ত্র! আনন্দের নিক্কণে যেন ত্রিলোক শব্দায়মান, সালঙ্কারার হিরক মাণিক্যের প্রভায় যেন সভাস্থল—ততোধিক আমার অন্তস্তল—আলোকিত,—পুলকিত! মহাসমারোহে সেই রমণী—কোনও ধনীর একমাত্র প্রাণাধিকা দুহিতা—হাসিতে হাসিতে আমার গলদেশে বরমালা পরাইয়া দিলেন; না, না প্রেমের শৃঙ্খলে, অচ্ছেদ্য বন্ধনে বরমাল্যে আমাকে আবেগের সহিত বাঁধিলেন! সখা হে, 'কি আর বলিব আমি'।

"তার পর কি হইল, কতদিন কত সুখে গেল, কিছুই মনে নাই। মনে না থাকিবারই কথা—আনন্দের দিন কোথায় কোন দিক দিয়া যায় কেহ বুঝিতে পারে কি? এমন ঘটিকাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই;—এমন দিগ্‌দর্শন যন্ত্র সৃষ্ট হয় নাই যাহা সুখের দিনের গতি নির্দ্দেশ করে! আমারও সে সব কিছুই স্মরণ হয় না। "একদিন—কেবল তাহাই মনে আছে; যদি এত ভুলিলাম, সে দুর্দ্দিনের কথা কেন স্মৃতি জড়াইয়া রহিয়াছে—একদিন আমার সেই কুবেরকল্প শ্বশুর, দেবোপম মূর্ত্তি তাঁর, শিবের ন্যায় গাম্ভীর্য্য তাঁর—তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বাবাজি, একটী সৎপরামর্শ শুনিবে?" আমি বহুবিধ উপায়ে সম্মতি ও কৃতার্থতাসূচক ভঙ্গীসহকারে তদীয় পরামর্শ শুনিতে উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম;—দেখিলাম আমার প্রাণাধিকা, সুশিক্ষিতা অর্দ্ধাঙ্গিনীও মৃদু মৃদু হাসি লইয়া তথায় উপবিষ্টা আছেন। শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "আমি এবং আমার কন্যা তোমার উপর স্নেহ-বান্ ও স্নেহবতী। তোমার রূপহীনত্ব, গুণহীনত্ব ও ধনহীনত্বে আমা-দের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে—তজ্জন্য আমরা নিশ্চয়ই তোমার ধন্যবাদের যোগ্য। তুমি পত্নী প্রতিপালনে, পত্নীর সন্তোষ বিধানে, তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অনুপযুক্ত। আমার মত শ্বশুরের সম্ভ্রম রক্ষায়ও তুমি যে অসমর্থ তাহা প্রত্যক্ষ। আমরা জানি তুমি

অবশ্য ইহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও কাতর। তোমার সেই দুঃখ আমাদের হৃদয়-মন্দিরে অঙ্কুশের ন্যায় বিদ্ধ করিতেছে—আমরা তোমার হিতৈষী না হইলে কি এরূপ হইত?" শ্বশুরকুলচূড়ামণি কিছুক্ষণ মৌন অবলম্বন করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "শোন, বিশেষ মনোযোগ দিয়া শোন, আমি তোমার পিতৃ-তুল্য, আমার পরামর্শ তোমার পক্ষে অশেষ কল্যাণপ্রদ তাহাতে সন্দেহ করিও না। আমার পরামর্শ এই :— আমার কন্যার,—তোমার পত্নীর—কোনও এক রূপগুণ বিত্তবশালী যুবকের সহিত দ্বিতীয়বার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে; এক্ষণে তোমার মত হইলেই হয়—অবশ্য মত না হইলে যে ঘটনা বন্ধ থাকিবে এমন নহে, তবে তোমাকে দুঃখিত করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, যেহেতু তোমার উপর আমার ও আমার কন্যার স্নেহের সীমা নাই, দেখ, ইহাতে তোমার লাভও অনেক। এরূপ রূপ-গুণবতী মহিলার স্বামী বলিয়া তোমার যে গৌরব তাহা ত কোথাও যাইতেছে না; অথচ আরও কত লাভ। তোমার পত্নী তোমার রূপগুণ হীনত্বে, তথা তোমার দারিদ্র দর্শনে ম্রিয়মানা—তাহার দুঃখ দূর হইবে, তাহার মুখে বহুদিন বিশুষ্ক হাসির লতা আবার মঞ্জরিত হইয়া উঠিবে। কোন্ পত্নীপ্রিয় পতি স্বীয় প্রণয়িনীর দুঃখ দূরীকরণে প্রাণ সমর্পণ না করে? তাহার পর—আমার নব জামাতাবাবু সময়ে সময়ে তোমাকে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্যও করিবেন বলিয়াছেন, তাহাতে তোমার অনেক অভাব দূর হইবে। আমার বাড়ীতেও তুমি আসিতে পাইবে; অবশ্য অন্দরে যাইতে পাইবে না; কিন্তু বহির্ব্বাটীতে থাকিয়া রীতিমত আহারাদি করিতে পাইবে পূজার সময় ধুতি চাদরও পাইবে। তোমার এই পত্নী দ্বিতীয় বিবাহের পর তোমার সহিত কোন কথাবার্ত্তা কহিতে পাইবেন কি না তাহা অবশ্য নবজামাতার ইচ্ছাধীন, কিন্তু তুমি পত্রাদি যাহাতে লিখিতে পাও তাহার জন্য আমি নব জামাতা বাবাজীবনকে অনুরোধ করিব। তবে তোমার মত কি?" শ্বশুরকুলধুরন্ধর নিস্তব্ধ হইলে আমি শ্বশুর-ভাষিত অমৃত বা বাক্যামৃত হজম করিতে উদ্যত হইতেছি এমন সময়ে আমার পতিব্রতা, সোহাগিনী পত্নী বচন-সন্নিবেশে নিযুক্ত হইলেন তিনি বলিলেন, "দেখ, সুদর্শন, তোমাকে আমি ভালবাসি না এমন নহে, তবে পত্নীর কর্ত্তব্যই পতির দুঃখ দূর করিতে যত্ন করা, যত্ন

সফল হউক আর না হউক,—তোমার দুঃখ দূর হওয়া না হওয়া অবশ্যই তোমার অদৃষ্ট সাপেক্ষ—আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়া যাইব; আমাদের কর্ম্মেই অধিকার, মনে আছে—'কর্ম্মণ্যেব্যাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' বুঝিলে? তা তুমি মত দাও, আমি বাবাকে বলিয়া তোমাকে ভাল ধুতি-চাদর দেওয়াইব, আর আমার নব-প্রাণবল্লভের নিকট তোমার একটী চাকুরীর জন্যও বলিব। দেখ, আমি তোমার জন্য তোমারই উপকারের জন্য, এত কঠিন কার্য্য—সধবা অবস্থায় স্ত্রীলোকের পত্যন্তর গ্রহণ—তাহাও করিতে প্রস্তুত; আর তুমি আমার দুঃখ দূর করিবার জন্য,—তোমার দুঃখদূরীকরণ কার্য্যে আমাকে একটু সহায়তা করিতেও পারিবে না? ছি! এই কি তোমার আমার উপর ভালবাসা,—পুরুষ এমনই বটে।"

"আমি স্বীকৃত হইলাম,—নিজ পত্নীর পুনর্ব্বার স্বামী পরিগ্রহণে মত দিলাম। কেন যে স্বীকৃত হইলাম, কেন যে শ্বশুর ও তস্য দুহিতা রত্নের স্নেহপূর্ণ উপদেশে বশীভুত হইয়া তাঁহাদের পরামর্শকে বহুকল্যাণপ্রদ মনে হইল জানি না। বেশ মনে পড়ে, মুখে একটু চুরী করা হাসি মাখিয়া বলিলাম, "বেশ ত! আমাকে যেন বিবাহে নিমন্ত্রণ করিবেন,—আমি খুব পরিবেশন করিতে পারি।" আমার যেন তখন আনন্দে হৃদয়পূর্ণ হইয়া উঠিল,—পত্নীর আনন্দময় উদ্বাহ-উপলক্ষে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া—মাথার ঘাম পায়ে ছুটাইয়া—অনাহারে অনিদ্রায় রন্ধন, পরিবেশন প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী হইয়া আমার জীবন ধন্য হইবে। মহাদেব সতীদেহ মস্তকে লইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রেমিক উপাধি পাইয়াছিলেন, আমি কি অপ্রেমিক নামের কলঙ্ক বহিব, তা কখনই নহে। জগতে দেখুক পত্নীকে পতীর কতদূর ভালবাসা উচিত। আমি পত্নীর নিকট কতই কৃতজ্ঞতা দেখাইলাম, তিনি আমাকে জীবনে এত বড় একটি কর্ত্তব্য সম্পাদনের অবসর দিয়া আমার আধ্যাত্মিক, আধি দৈবিক ও আধি ভৌতিক উন্নতিলাভে সহায়তা করিয়াছেন বুঝাইয়া দিলাম। তিনি সন্তোষ লাভ করিলেন। শ্বশুর মহাশয় আনন্দে আমার পৃষ্ঠদেশে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "বাহবা বীর—এইত বীরত্বের লক্ষণ—এইত সৎসাহসের পরিচয়।"

"যথা সময়ে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের রাত্রিতে আমি অন্দর প্রবেশের অনুমতি লইয়াছিলাম, কারণ দ্রব্যাদি আনায়ন ও বহিষ্করণ কার্য্য-

দিতে আমার সহায়তার আবশ্যক ছিল; এক একবার সুসজ্জিতা মহিমময়ী, সুশিক্ষিতা সুহাসিনী—আমার ভূতপূর্ব্ব গরবিনী সহধর্ম্মিনীকে দেখিয়া কতই আনন্দ ও গৌরব বোধ করিতেছিলাম। তিনিও মাঝে মাঝে একটু মুচকি হাসি দেখাইয়া এ দাসকে অনুগৃহীত করিতেছিলেন, মনে পড়ে, বেশ মনে পড়ে—একবার তিনি অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ সুদর্শন, যার তার কাছে যেন বলিও না যে, আমি তোমার পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রী। আর এক কথা,—তুমি আমাকে যে পত্র লিখিবে তাহাতে যেন প্রাণেশ্বরী," "জীবিতেশ্বরী" ইত্যাদি পাঠ লিখিও না, কারণ আমার বাবু শুনিলে রাগ করিবেন। তুমি যখন আমাকে এত ভালবাস তখন আমার প্রিয়জনকে অবশ্যই তুমি ভালবাসিবে—আর তুমি অবশ্য আমার কথায় বিশ্বাস করিবে যে, আমি কখনই তোমাকে ভালবাসি নাই—তবে যদি তোমাকে ভালবাসি বলিয়া থাকি তাহা যেন কাহাকেও বলিও না। আর তোমার পায়ে জুতা নাই, আমাদের নবীন নাপিত আমার স্বামীর পুরাতন জুতা জোড়াটি পুরস্কার পাইয়াছিল; আমি একটাকা দিয়া তোমার জন্য তাহা কিনিয়া রাখিয়াছি, যাইবার সময় নবীনের নিকট হইতে লইয়া যাইও; আর আমার যখন পুত্র হইবে, তাহার যখন অন্নপ্রাশন হইবে, সেই সময়ে আসিও, এইরূপ পরিশ্রম করিয়া কাজকর্ম্ম করিয়া দিয়া যাইও, আমি তাঁহাকে বলিয়া তোমাকে ভাল শিরোপা দেওয়াইব।" প্রিয়তমার ভূতপূর্ব্বা প্রাণাধিকার দয়া ও দাক্ষিণ্যে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তাহার পর দেখিলাম আমার সেই তিলোত্তমার নয়ন প্রান্তে একবিন্দু সহানুভূতির অশ্রু। কবি বলিয়াছেন, পরদুঃখহেতু অশ্রুজল মুক্তাফল অপেক্ষাও সুন্দর, ধন্য প্রেমিক কবি তিনি। প্রিয়া আমার, না, না, অতীতের প্রেয়সী আমার; আমার হাত ধরিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, "দেখ সুদর্শন, আমার মাথা খাও যেন দুঃখ করিও না, কেমন? ছি! এর জন্য আর দুঃখ কি! দেখদেখি আমার কেমন স্বামী। সব স্নেহ সব মায়া বিসর্জ্জন দিও।" এইবার সত্য সত্য কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি তোমাকে ভালবাসি না, তুমি আমাকে কেন ভালবাস? যে তোমার জন্য পাগলিনী, যে তোমার দাসী হইতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, যাহার হৃদয়ে তোমার দিব্য-মূর্ত্তি অনুরাগের আলোকে আলোকিত, যাও সুদর্শন, তাকে গিয়া ভাল

বাস; তার কাছে প্রাণ দিও, যত্নে থাকিবে—তার প্রেমে সুশীতল হইবে।"

৪

বন্ধুপ্রবর স্বপ্নবৃত্তান্ত শেষ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল, এ স্বপ্নের কোন তাৎপর্য্য নাই?" আমি বলিলাম, "অবশ্যই আছে, এ স্বপ্ন সত্যে পরিণত হউক।" এইবার সুদর্শন অত্যন্ত বিরক্ত ও ব্যথিত হইল; আমার বন্ধুত্বের উপর সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কথার অর্থ কি?" আমি বলিলাম, "ভাই, এ স্বপ্ন সত্যই কালপুরুষ প্রদর্শিত। তুমি মনে মনে যে আকাশকুসুমময়ী, অশরীরিণী কল্পনাপ্রসূতা প্রিয়তমাকে আশ্রয় করিয়া আছ, তাহার অস্তিত্ব নাই তাহার চিন্তায় তোমার প্রকৃত শান্তিলাভ হয় না। কেবল মোহ, মোহের ঘনীভূত অতৃপ্তিকর, আকাঙ্ক্ষবর্দ্ধক চিত্তোন্মাদ তোমাকে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে—তাহা হইতে তোমার কিছুমাত্র আনন্দ হয় না, সে তোমাকে ভালবাসে না। এ দিকে তোমার পতিব্রতা, সাবিত্রীতুল্য সাবিত্রীসুন্দরী, তোমার অনাদরে ছিন্ন ভিন্ন কুসুমদলের ন্যায় ম্রিয়মাণা। কালপুরুষ তাই তাঁহার যন্ত্রণা দেখিয়া,—তাঁহার কাতর আহ্বানে করুণার্দ্র হইয়া তোমার ও তাহার মঙ্গলের জন্য আজ তোমার সেই স্বপ্নময়ী প্রেমহীনা প্রেয়সীকে বিদায় করিয়া দিলেন। সে যাহার আশ্রয় লইতে চলিল সে ধনীযুবক নিশ্চয়। ধনীর আলস্যই ত মনোহর আকাশকুসুমের বৈচিত্র প্রসাধক। সে দেবাঙ্গনা তোমাকে ভাল বাসে নাই তাহাও সত্য। প্রভাতের স্বপ্ন নিষ্ফল হয় না—তোমার ভূতপূর্ব্বা প্রণয়িনীর শেষকথা স্মরণ রাখিও, যে তোমার জন্য পাগলিনী তাহাকে প্রাণ দিও;—নিদ্রান্তে অশরীরী কালপুরুষ প্রদর্শিত এই স্বপ্ন তোমার সত্য হউক।"

শ্রীম——পাকড়াসী
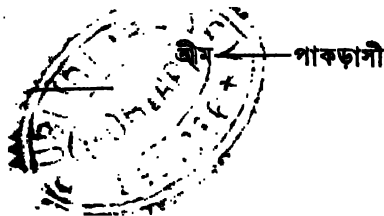
গল্পলহরী

২য় বর্ষ } আষাঢ়, ১৩২১। { ১২শ সংখ্যা

অপহরণ।

নদীটি ঠিক গ্রামের উত্তর দিয়া বহিয়া আসিয়াছে, নদী ক্ষুদ্র, কিন্তু বেগ প্রখর; তাহাতে আশ্বিনের পূর্ণ-উচ্ছ্বাস নদীর কূলে কূলে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। সে উচ্ছ্বাসে তীরের লম্বা ঘাসগুলাতো গা ভাসাইয়া দিবেই, অধিকন্তু যে দুই একটা অবাধ্য গাছের ডাল গুচ্ছ ছাড়িয়া, দল ছাড়িয়া, সীমা ছাড়িয়া নদীর জলে মুখ দেখিবার জন্য অত্যাধিক পরিমাণে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের মুখ চুম্বনের জন্য অত্যন্ত দুঃসাহসের সহিত এবং ততোধিক অভদ্রের মত ছল ছলাৎ, ছল ছলাৎ শব্দে লাফাইয়া উঠিতেছিল।

গ্রামখানি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত;—সুতরাং নদীটাও পূর্ব্ব পশ্চিমে। তবে কতক দূর পশ্চিমে গিয়া নদীর গতি দক্ষিণে ফিরিয়া বড় নদীর সহিত মিশিয়াছে; সুতরাং গ্রামের পশ্চিম দিকের কতকটা স্থল নদীর বক্র রেখায় বেষ্টিত হইয়া এক সুন্দর প্রকৃতি-চিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছিল;—তাহার উপর ঝাউ গাছের বন, অশ্বত্থ গাছের বন এবং বন্য ফুলের ঝোপ সেই স্থানটাকে রম্য উপবন হইতেও রম্য করিয়া তুলিয়াছিল।

ঠিক এই স্থানটায় বসিয়া অনুকূল দিবাভাগের অনেকটা সময় অতিবাহিত করিত। সকাল বেলায় মুখ ধুইতে আসিয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া দন্ত পরিষ্কার ছলে নদীর ধারে বসিয়া থাকিত। দুই একখানা জেলে নৌকা তাহার সম্মুখ দিয়া ছল ছল শব্দে দাঁড় বাহিয়া চলিয়া যাইত এবং দুই একখানা বড় সওদাগরী নৌকা বড় নদীর উপর দিয়া তাহাদের বড় বড় পাল ফুলাইয়া অতি ধীর গতিতে চলিয়া যাইত। দূর হইতে নৌকাগুলি ঠিক দেখিতে পাওয়া যাইত না, কেবল তাহাদের বড় বড় ফুলা ফুলা পাল গুলা যেন অনন্ত জলরাশি ভেদ

করিয়া আপনাদের পথ করিয়া চলিয়া যাইতেছে বোধ হইত। এই সকল দেখিতে দেখিতে দাঁত মাজা শেষ হইতে অনুকূলের অনেক বেলা হইয়া যাইত। আবার মধ্যাহ্নের আহার শেষ করিয়া এক গাছা ছিপ হাতে করিয়া অনুকূল এই নদীর ধারে আসিয়া বসিত। মাছ ধরা ঠিক তাহার উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ ছিপ ফেলিবার কিছুক্ষণ পরেই তাহার ফাৎনা কোথায় ভাসিয়া যাইত তাহার কিছু মাত্র সংবাদ রাখিত না। হয়তো কখন অন্য মনস্কে তরঙ্গ ক্রীড়া দেখিত, কখন বা পাখীর গান শুনিত, কখন বা সুদূর বিস্তৃত প্রসস্ত জলরাশি চক্ররেখার যেখানে আকাশ ও জল একত্রে মিশিয়াছে সেই দিকে বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। তাহার মনে হইত ঐ যে মিলন রেখা, ঠিক উহার অপর পার্শ্বে যে জগতের আরম্ভ, জানি না সে জগতের উপাদান কি এবং সে জগৎ কত বৈচিত্রময়,—কত রহস্যময়। কিন্তু সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব জগতের অপেক্ষা অধিকতর রহস্যময়ী একটী বালিকা প্রত্যহ দ্বিপ্রহর কালে তাহার চক্ষের উপর দিয়া দাঁড় বাহিয়া যাইত আবার কিছুক্ষণ পরে সেইরূপ ভাবেই ফিরিয়া আসিত। তরঙ্গায়িত নদী বক্ষে তাহার নৌকাখানা ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার সাহস অদ্ভুত। তাহার বদন মলিন, কেশ রুক্ষ কিন্তু চক্ষু উজ্জল, মুখশ্রী সুন্দর। অনুকূল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত, আর বালিকা অবহেলায় তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইত।

একদিন দ্বিপ্রহর কালে,—সে দিন আকাশ কিছু অপরিষ্কার ছিল, বায়ু কিছু প্রবল বহিতেছিল এবং তরঙ্গায়িত নদীবক্ষ মত্ত তরঙ্গাভিঘাতে অধিকতর বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছিল;—বালিকা সেই সময় বাহির নদী হইতে ফিরিতেছিল। যাইবার সময় বায়ু অনুকূল থাকায় কোন কষ্ট হয় নাই কিন্তু ফিরিবার সময় বায়ু প্রতিকূল। বালিকা ক্ষণে ক্ষণে দুই হস্তে বোটে চালাইতেছিল কিন্তু নৌকা অল্পই অগ্রসর হইতেছিল। তরঙ্গের তাড়নে মাঝে মাঝে নৌকা দুলিয়া উঠিতেছিল। প্রতিক্ষণেই দমকা বাতাস আসিয়া নৌকাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল; প্রতি মুহূর্ত্তেই নৌকাখানি ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কায় অনুকূল ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়াছিল।

অনুকূল যাহা ভয় করিতেছিল তাহাই হইল। একটা দমকা বাতাস আসিয়া নৌকাকে এমনি একটা প্রবল আঘাৎ করিল যে, বালিকা দুই হস্তে তাহার প্রাণপণ শক্তিতে বোটে চাপিয়া ধরিয়াও কিছু করিতে পারিল না; নৌকা উলটাইয়া গেল,—সঙ্গে সঙ্গে বালিকাও জলমগ্ন হইল। অনুকূল এ দৃশ্যে

প্রথমে কিছু ভীত হইল কিন্তু যখন দেখিল বালিকা স্রোতের মুখে হুহু করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে তখন আর তাহার ভয় রহিল না। সে অবিলম্বে ছিপ ফেলিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল।

খ

অনুকূল পূজার ছুটিতে দিদির বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। প্রথমে সে এ মুল্লুকে আসিতেই চায় নাই। তাহার পর দিদি যখন নিতান্ত অনুনয় বিনয় করিয়া চিঠি লিখিলেন এবং মা যখন পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন তখন অনুকূল কিছুতেই আর না বলিতে পারিল না। যে দিন সে দিদিকে বাধিত করিতে ও মাকে সন্তুষ্ট করিতে দধির ফোটা কাটিয়া যাত্রা করিল;—সে দিন তাহার মনে হইল বুঝি সে দ্বিতীয় কলম্বাস, পৃথিবীর এক অগম্য স্থানোদ্দেশে যাত্রা করিতেছে। যে দেশ বৎসরের ত্রিচতুর্থাংশ কাল জলে ডুবিয়া থাকে এবং যে দেশের লোক ভুতের মত কুৎসিত—দৈত্যের মত ভীষণ ও রাক্ষসের মত নিষ্ঠুর; সে দেশে প্রত্যেকে প্রত্যহ অর্দ্ধসের লঙ্কা পরিপাক করে সে দেশে অভিযান সত্যই অনুকূলের পক্ষে একটা দুঃসাহসের কার্য্য। তারপর যে দিন সে তাহার দিদিরবাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল, সে দিন লোকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কি বলিত বলা যায় না, কিন্তু মনে মনে জলবহুল প্রকৃতির নগ্নসৌন্দর্য্যে প্রকৃতই সে বিস্মিত হইয়া গেল। আর এখানে আসিবার পর কচিৎ দুই একজন দৈত্যের মতন ভীষণ নিম্নশ্রেণীর লোক দেখিয়াছিল কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের নিষ্ঠুরতার কিছুমাত্র পরিচয় পায় নাই; ইহা ব্যতীত সে ভুতের মত আকৃতির একটাও লোক দেখিতে পাইল না বরং যে একজনকে সে দেখিয়াছিল তাহার সৌন্দর্য্যেই তাহার দৃষ্টি মুগ্ধ করিয়াছিল—সে কে? সে আমাদের পূর্ব্বলিখিত বালিকা।

*　　*　　*　　*　　*

অনুকূল অনেক কষ্টে বালিকাকে লইয়া তীরে উঠিল। স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার হস্তপদ অত্যন্ত, ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বালিকাও সন্তরণপটু ছিল, সেইজন্য সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে নাই বা অধিক পরিমাণে জল উদরস্থ হয় নাই। তাহারা যখন সিক্ত বস্ত্রে হাত ধরাধরি করিয়া তীরে উঠিল তখন তাহাদের সেই রমণীয় আর্দ্র সৌন্দর্য্য তাহাদিগকে জলদেবতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। উর্দ্ধে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের উজ্জলজ্বালা, নিম্নে

বিপুল জলরাশির স্নিগ্ধ করুণার ধারা; পার্শ্বে শোভনা প্রকৃতির সুচারু হাস্য; আকাশের শূন্য বক্ষে কুলয়াশ্রিত বিহঙ্গের আলস্যজড়িত কাকলি,—ইহারই মধ্যে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া দুইটী নরনারী,—যুবক যুবতী। তাহাদের আর্দ্র বস্ত্র দেহের সহিত অনুলিপ্ত হইয়াছে; সিক্ত কেশ বহিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে এবং ক্লান্ত ধমনীরক্ত অতিক্রতবেগে চলিতেছে। বালিকা প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "আর একটু হ'লেই আমি ডুবে যেতুম?"

কথাটা ঠিক, সুতরাং ইহার সপক্ষে অথবা বিপক্ষে অনুকূল কিছুই বলিতে পারিল না। বালিকা আবার বলিল, "ভাগ্যে তুমি ছিলে তাই রক্ষে।"

এ কথাটাও ঠিক। অনুকূল না থাকিলে বালিকার রক্ষা ছিল না; সুতরাং এবারও অনুকূল কোন কথা কহিতে পারিল না। অনুকূলের যেন কি হইয়াছে। বালিকার সহিত কথা কহিবার একটা সঙ্গত সূত্র সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। অনুকূলকে নীরব দেখিয়া বালিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে রোজ বোসে কি কর?"

এতক্ষণে অনুকূলের মুখে কথা ফুটিল; কিন্তু সেও অতি সামান্য, দুটী কথা মাত্র, "মাছ ধরি।"

বালিকা কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "এখন কি মাছে খায়? এটা কি মাছ ধরিবার জায়গা? তুমি বুঝি এখানকার লোক নও?"

"আমার বাড়ী কলিকাতা, আমি এখানে নূতন এসেছি?"

"ওঃ—তুমি বুঝি রায়েদের বাড়ী এসেছ।"

এতক্ষণে অনুকূলের অনেকটা সঙ্কোচ কাটিয়া আসিয়াছিল, সে বলিল, "হাঁ, তুমি রোজ রোজ এখান দিয়া কোথায় যাও?"

"আমার দাদা বাতানে থাকে, আমি সেখানে তার ভাত নিয়ে যাই।"

অনুকূল বুঝিল ইহারা দরিদ্র শ্রমজীবি, জিজ্ঞাসা করিল,"তোমার নাম কি?"

বালিকা উত্তর দিল, "মোহিনী।"

অনুকূল আবার চুপ করিয়া রহিল। আজ ক্ষণে ক্ষণে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ তাহার বুকের মধ্যে ঢেউ খেলাইয়া মুখের কথাকে বন্ধ করিয়া দিতেছিল। মোহিনী আবার নীরবতা ভঙ্গ করিল, বলিল, "তুমি ভিজা কাপড়ে অনেকক্ষণ রহিয়াছ, বাড়ী যাও কাপড় ছাড় গিয়া;—আমিও বাড়ী যাই।'

মোহিনী অনুকূলের ছিপের কাঁটায় টোপ গাঁথিয়া দিতেছে— অপহরণ

৬৫৭ পৃঃ

The Cherry Press Ltd., Cal.

অনুকূল এ কথার উত্তরে, "হাঁ—না" কিছুই বলিল না, কেবল সেই আর্দ্র-আলুলায়িত-কেশা সিক্ত বস্ত্রা মন্থরগমনা বালিকার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল।

গ

মানুষের মন যে কি উপাদানে গঠিত তাহা একাল পর্য্যন্ত কেহ সত্যরূপে আবিষ্কার করিতে পারিল না। কারণ মনের গায়ে কাঁটা ফুটিলে কাঁটাটা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না, বা ধরিতে পারা যায় না কিন্তু একটু নাড়াচাড়া পাইলেই সমস্ত মনটা আড়ষ্ট বেদনায় একেবারে টন টন করিয়া উঠে। আজ অনুকূলের অবস্থাও সেইরূপ। বাস্তান হইতে ফিরিবার মুখে মোহিনী অনুকূলের কাছে আসিয়া বসিত, তাহার ছিপের কাঁটায় টোপ গাঁথিয়া দিত, চার মাখিয়া দিত, ছিপ রাখিবার জন্য দাঁড়া-কাটি খুঁজিয়া আনিত; অনুকূলকে গল্প শুনাইত। সে সমস্ত তাহাদের দেশের গল্প, নদীর গল্প, মাছের গল্প, বৃষ্টির গল্প। অনুকূল একদৃষ্টে মোহিনীর মুখের দিকে চাহিয়া সেই সমস্ত গল্প গলাধঃকরণ করিত। মোহিনীর গল্পে যে কোন মনোহারিত্ব ছিল তাহা নহে—কিন্তু মনোহারিত্ব ছিল তাহার নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রসদৃশ মুখে।

মোহিনী যতক্ষণ অনুকূলের কাছে থাকিত ততক্ষণ অনুকূল বেশ থাকিত। কিন্তু মোহিনী চলিয়া গেলে তাহার মনের লুকাইত বেদনাটা অত্যন্ত সবল হইয়া উঠিত। মোহিনী প্রত্যহ আসিত, ঘড়ির কাঁটা যেরূপ নিয়মিতভাবে চলে এবং সূর্য্যের উদয়াস্তের যেরূপ কখন ব্যতিক্রম হয় না অনুকূলের নিকট মোহিনীর আগমনও সেইরূপ নিয়মিত এবং সেইরূপ অবধারিত ছিল। সূর্য্য যখন ঠিক মাথার উপর উঠিত এবং পাখীর ডাক যখন নীরব হইয়া আসিত, বায়ু যখন অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হইয়া উঠিত এবং ছায়া যখন অত্যাধিক কমিয়া যাইত, ঠিক তখনই দূরে মোহিনীর নৌকা দেখা যাইত এবং দেখিতে দেখিতে নৌকা তীরে আসিয়া লাগিত। অনুকূল উঠিয়া নৌকাখানা ধরিত,—মোহিনী লাফাইয়া তীরে নামিত। তাহার পর সমস্ত দ্বিপ্রহরকাল মাছ ধরিয়া, গল্প করিয়া, ফুল তুলিয়া দুজনে সুখে অতিবাহিত করিত।

এইরূপ ভাবে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, আর দুজনে দুইজনকে ভাল করিয়া ধরা দিতে লাগিল। একদিন মোহিনী আসিয়া

অনুকূলকে বলিল, "তাহার বাপ কোন ভিন্ন গ্রামে গিয়াছে, কাল অনেক সকালে সকালে সে আসিতে পারিবে এবং দেরী করিয়া বাড়ী গেলেও তাহাকে তিরস্কার করিবার কেহ নাই।" সেই কথামত অনুকূল পরদিন অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বাহ্নে ছিপ লইয়া মাছ ধরিতে আসিল। রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিতেছে, বায়ু তপ্ত হইয়া উঠিতেছে মোহিনী আসিল না। অনুকূল ভাবিল গ্রাম্য বালিকার সময় জ্ঞান আদৌ নাই, সুতরাং তাহার "সকালে আসিব" কথার কোন মূল্যই নাই। ক্রমে সূর্য্য মাথায় উঠিল এইরূপ সময় মোহিনী প্রত্যহ আসে, আজ কিন্তু সে এখনও বাতানে যায় নাই। অনুকূল চঞ্চল হইয়া উঠিল, তৃষিত চক্ষে সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল নদীবক্ষে একখানিও নৌকা নাই। কেবল অগাধ বিস্তৃত জলরাশি কেবল তরঙ্গের পর তরঙ্গ। তাহার মনে হইল হয়তো অন্যপথে মোহিনী বাতানে গিয়াছে এখনি ফিরিবে; ক্ষুধিত দৃষ্টি নদীর দিকে চাহিয়া দেখিল নৌকা নাই, মোহিনী নাই। অপেক্ষায় অপেক্ষায় অনুকূলের সে দিন বাটী ফিরিতে রাত্রি হইল।

ঘ

পরদিন অনুকূল আহার করিয়াই নদীর ধারে যাইয়া বসিল। এই আসে এই আসে করিয়া সে দিনও মোহিনী আসিল না। অনুকূলের মোহিনীর উপর রাগ হইল; কিন্তু যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার উপর রাগ করিলে নিজেকেই কাঁদিতে হয়, সুতরাং অনুকূল কাঁদিল। রাত্রে বাটী আসিয়া একবার মনে করিল দিদিকে মোহিনীর বাটীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার সময় কে যেন তাহার গলাটা চাপিয়া ধরিল।

সকালে উঠিয়া বড় আশায় আবার নদীর ধারে গিয়া বসিল। প্রভাতের শীতল বায়ু তাহার মর্ম্মাহত প্রাণের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া যাইতে ছিল, পাখীর মিষ্ট গান কাণের ভিতর দিয়া তাহার শ্রবণের জড়তা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু অনুকূল আকুল দৃষ্টিতে নদীর দিকে চাহিয়া আছে, কেবল একখানি নৌকা দেখিবার জন্য। সহসা অনুকূল এক বিচিত্র গ্রাম্যবাদ্য শুনিতে পাইল। দূরে একখানি ছইওয়ালা নৌকা আসিতেছে। নৌকার বাহিরে বসিয়া দুইজন দাঁড় টানিতেছে একজন ঢুলি ঢোল বাজাইতেছে, একজন কাঁসিদার কাঁসি বাজাইতেছে, দুইজন বসিয়া তামাক খাইতেছে এবং আর একজন লালচেলীর কাপড় পরিয়া

মাথায় শোলার টোপর আঁটিয়া হাতে হলুদরংয়ের সূতা বাঁধিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। নৌকাখানি অনুকূলের নিকট দিয়া বাহিয়া আসিল। অনুকূল দেখিল ছয়ের মধ্যে একটী বালিকা বসিয়া, তাহারও সর্ব্বাঙ্গ চেলীর কাপড়ে আবৃত। কেবল অনাবৃত মুখখানি মুক্ত বাতায়নে উদিত হইয়াছে। মুহূর্ত্তে সে মুখখানি চিনিল—এ যে মোহিনী।

দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। অনুকূল সজ্ঞাশূন্য হইয়া আকুল দৃষ্টিতে নৌকার দিকে চাহিয়া ছিল। নৌকা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল—মোহিনী মোহিনী! নদীর দুকূল ছাপাইয়া শূন্য প্রতিধ্বনি হাস্য করিয়া উঠিল,—হাঃ হাঃ। সে উপহাস কত কঠোর—কত নির্ম্মম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

হীরক-হার।

মুঙ্গের সহরের নিকটবর্ত্তী একটী পল্লীগ্রামে ঠিক জাহ্নবীর উপরে একখানি সুন্দর অট্টালিকা। অট্টালিকা সাদা ধপ ধপ্ করিতেছে, এবং সোপানশ্রেণী গঙ্গার জল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। দ্বিতলের উপর মাত্র চারিটি কুঠারী, জাহ্নবীর উপরের কুঠারীটি বেশ প্রশস্ত এবং চারিদিকে সবুজবর্ণের গবাক্ষ। অমন ধবল চাঁদের কিরণে অট্টালিকাটি বড় সুন্দর দেখাইতেছে। জাহ্নবীর জল তরতর করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

সম্মুখের কুঠারীতে একজন বৃদ্ধ ও একটি যুবতী বসিয়া আছে। যুবতী হার্ম্মনিয়মে সুর দিতেছে। বৃদ্ধ বলিল, "মা! একটি ভাল গান বাজাও।" যুবতী বৃদ্ধের কন্যা। বৃদ্ধ হরলাল মুখোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্টের পেন্সন্ ভোগী, তিনি তাহার এক মাত্র মেহের কন্যাকে লইয়া ঐ বাটীতে বাস করিতেছেন। হরলালবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী, তাই তনয়ার অষ্টাদশ বৎসর বয়সেও বিবাহ দেন নাই। স্নেহলতা পরমাসুন্দরী, কুঞ্চিত দীর্ঘকেশ পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। চক্ষু দুইটি বেশ পদ্মকোরকের ন্যায় ঢল্ ঢলে, রংটি গোলাপাভ, তাহাতে ওষ্ঠ দুইখানি রক্তবর্ণ হওয়াতে আরও

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। যুবতী স্নেহলতা পিতার বড় আদরের মেয়ে, অথচ অত্যন্ত নম্র। পিতার আদেশ শুনিয়াই কন্যা হার্ম্মনিয়মের সহিত গান ধরিল, সে সঙ্গীত সুধা জাহ্নবী বহিয়া দূর প্রদেশে নীত হইল।

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না;
কেন সে আশে, হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না।
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে, তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা ভয় হয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে,
কি করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে,
আর কারো পানে চাহিব না, করিব হে আমি প্রাণপণ,
তুমি যদি বল এখনি করিব, বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন।"

সঙ্গীত বড়ই মধুর হইতেছিল। এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইলেন। হরলাল বাবু বলিলেন, "আসুন ডাক্তার বাবু বসুন।" ডাক্তার বাবু একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "এমন সঙ্গীত অনেক কাল শুনি নাই।" লজ্জায় স্নেহলতার মুখ রক্তবর্ণ হইল, হার্ম্মনিয়ামও বন্ধ হইল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন "স্নেহ! তোমার সঙ্গীতের অপূর্ব্ব আকর্ষণশক্তি।" হরলাল বাবু বলিলেন, "মা আমার দিবারাত্রি সঙ্গীতচর্চ্চায় আছে।" প্রসন্ন ডাক্তার মুঙ্গেরে ব্যবসা করেন, তিনি মধ্যে মধ্যে এই বাড়ীতে আসেন এবং ইহাদের চিকিৎসা করেন। প্রসন্ন বাবু বড় চতুর লোক, সকলের সঙ্গেই মিশিতে পারেন। হরলাল বাবু ইঁহাকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু স্নেহলতা ইঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। প্রসন্ন বাবু বলিলেন, "হরলাল বাবু! খবরের কাগজে এক অদ্ভুত সংবাদ দেখেছেন?" হরলাল বাবু উত্তর করিলেন, "কি সংবাদ?" তখন প্রসন্নবাবু পকেট হইতে "ষ্টেটস্‌ম্যান" বাহির করিয়া বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখাইলেন।

"পুরস্কার! পুরস্কার! দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার!

বিষ্ণুমন্দিরের লক্ষ্মীর গলার হীরকহার হইতে একখণ্ড হীরক কে অপহরণ করিয়াছে, যে কেহ ইহার সংবাদ দিতে পারিবে বা অপহৃত দ্রব্য আনিয়া দিতে পারিবে, সে উপরোক্ত পুরস্কার পাইবে।"

প্রধান মন্ত্রী ব্রহ্মরাজ্য,

হরলাল বাবু চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার একটী আত্মীয় ব্রহ্ম রাজধানীতে জহরতের কারবার করেন, সন্দেহ তাহার উপর না হয়, এই ভয়। তিনি প্রসন্ন বাবুকে সব পরিষ্কার করিয়া বলিলেন। এমন সময়ে রেঙ্গুন সহর হইতে একখানি টেলিগ্রাম হরলাল বাবুর নিকট পৌছিল—

"শীঘ্র এস, বড় বিপদ

নিমাই।

হরলাল বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "প্রসন্ন বাবু, নিমাই স্নেহলতার মাতুল, বড় বিপদে পড়িয়াছে, আপনি ব্যতীত উপায় নাই। আমি অদ্যই কন্যার সঙ্গে তথায় রওনা হ'ব, আপনাকে সঙ্গে যাইতে হবে। প্রসন্ন বাবু বলিলেন, "আপনার বিপদে আমার বিপদ, আমি আপনার আদেশে পৃথিবীর সর্ব্বত্র যেতে প্রস্তুত,— চলুন।" প্রসন্ন বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া হরলাল বাবু উঠিলেন, প্রসন্ন বাবুও উপযুক্তরূপ বস্ত্রাদি আনিতে মুঙ্গের চলিয়া গেলেন। স্নেহ বলিল, "বাবা! আবার প্রসন্ন ডাক্তার কেন?" পিতা বলিলেন, "এত দূরে একজন বিশ্বাসী লোক সঙ্গে চাই"। স্নেহ আর কিছু বলিল না। রাত্রের ট্রেণে সকলে কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলেন।

বঙ্গোপসাগরে হেলিয়া দুলিয়া একখানি ষ্টিমার ব্রহ্মদেশাভিমুখে চলিয়াছে। ষ্টিমারের উপর বহু আরোহী, আমাদের পরিচিত হরলালবাবু, তাঁহার কন্যা ও প্রসন্ন ডাক্তার তিনজনে একটি প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন ভাড়া করিয়াছেন। স্নেহলতা বাহিরে রেলিং'এ ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সমুদ্রের সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। বড় বড় ঢেউগুলি হেলিয়া দুলিয়া অর্ণবযানের গাত্রে লাগিতেছে, সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত উর্ম্মিমালা হীরকহার পরিশোভিতা নবযৌবনা রমণীর ন্যায় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ঢল ঢল করিতেছে। স্নেহলতা এ দৃশ্যে আত্মহারা হইল। তাহার তখন কালিদাসের রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের কথা মনে হইল, মনে মনে অমর কবিকে ধন্যবাদ দিল। এমন সময়ে কে ডাকিল, "স্নেহ!" হঠাৎ এরূপ আহ্বানে স্নেহলতা চমকিয়া উঠিল, দেখিল প্রসন্ন ডাক্তার অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন। স্নেহ মনে মনে বিরক্ত হইল। ডাক্তারবাবু বলিলেন, "স্নেহ! তুমি আমাকে দেখিলে বিরক্ত হও কেন? আমি'ত তোমাদের ইষ্ট বই অনিষ্ট করি না।" স্নেহ ইহার উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, কারণ এ পর্য্যন্ত ডাক্তারবাবু তাহাদের প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার করেন নাই। তথাপি তাহার হৃদয় যেন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল না। ডাক্তারবাবু বলিলেন, "দেখ, তোমাদের জন্ত

আমি আমার রোজগার ছেড়ে এত দূরদেশে যাচ্ছি। তোমার পিতা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, আশা করি তুমিও সময়ে আমাকে স্নেহ ক'রে তোমার স্নেহ নামের স্বার্থকতা করবে।" এবার আর স্নেহলতা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি আমার পিতার পরম বন্ধু সেই জন্য তিনি আপনার নিকট ঋণী। "ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি কি আর তোমার বন্ধু নই?" স্নেহ আর উত্তর করিল না, নীরবে সমুদ্রের অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। ডাক্তারবাবু একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর স্নেহলতার নিকট আসিয়া বলিলেন, "স্নেহ! আমি কেন কষ্ট সহ্য ক'রে এসেছি জান?" স্নেহ বলিল, "আমার পিতার অনুরোধে।" ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা নয়, তুমি কি এখনও বুঝ্‌তে পার নাই? শুধু তোমাকে সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাবো বলে এসেছি।" এই কথা বলিয়াই ডাক্তার-বাবু স্নেহের হাত ধরিতে গেলেন, স্নেহলতা একবার তাঁহার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিল ও পরক্ষণেই অপর দিকে চলিয়া গেল, ডাক্তারবাবুর নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইল। এ দৃশ্য কেবল একজন লক্ষ্য করিল।

৩

যে ব্যক্তি এই দৃশ্য দেখিল তাঁহার নাম পরমেশ প্রসন্ন রায়। তিনি এই ষ্টিমারের ডাক্তার। পরমেশবাবু যুবক, তিনি কলিকাতা ক্যাম্বেল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ। পরমেশ বাবুকে ষ্টিমারের সকলেই ভালবাসে। তাঁহার সৌজন্য প্রশান্ত মূর্ত্তি, পবিত্র স্বভাব, সকলকেই আকৃষ্ট করে।

পরমেশবাবু দেখিলেন যে প্রসন্নবাবু এক অপূর্ব্ব চাহনীতে স্নেহলতাকে দেখিলেন, তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, তিনি উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। স্নেহলতার সরলতামাখা মুখখানি তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন এই দুষ্ট ডাক্তারের হস্ত হইতে বালিকাকে উদ্ধার করিতে হইবে। স্নেহলতার পিতার সঙ্গে তিনি আলাপ করিলেন, এই সূত্রে স্নেহলতার সহিতও তাঁহার আলাপ হইল। তিনি দেখিলেন প্রসন্ন ডাক্তারের উপর স্নেহর পিতার অগাধ বিশ্বাস। তিনি আর কোন কথা প্রকাশ করিলেন না, গোপনে সব দেখিবেন স্থির করিলেন।

ক্রমে ষ্টিমারখানি রেঙ্গুন যাইয়া পৌঁছিল, ইহার মধ্যে আর কোন ঘটনা ঘটিল না। স্নেহ, তাহার পিতা ও প্রসন্ন ডাক্তার এক সঙ্গে অবতরণ করিলেন, পরমেশবাবু নামিয়া উঁহাদের অনুসরণ করিলেন। একবার ভাবিলেন

অপরের বিষয়ে তাঁহার লিপ্ত হওয়া কি প্রয়োজন, কিন্তু স্নেহলতার কোন বিপদ হইবে ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না। এই দুই দিনই তিনি স্নেহলতার রূপে ও গুণে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার প্রাণ সর্ব্বদাই স্নেহের নিকট থাকিতে চাহিত। নানারাস্তা ঘুরিয়া উঁহারা এক বাঙ্গালী বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, তিনি, ডাক্তার বাবুর বন্ধু, তাঁহার নাম রাখালদাস মুখোপাধ্যায়। তিনি রেঙ্গুনে ব্যবসা করেন। স্নেহলতার এই স্থানে আসা মোটেই পছন্দ হইল না। কিন্তু পিতার সঙ্গে আসিয়াছে, বিশেষ ভাবনার বিষয় কিছুই ছিল না। পরমেশ বাবু ষ্টিমারে ফিরিয়া আসিলেন।

ক্রমে দুই তিন দিন গত হইল, পরমেশ বাবু ডেকে বসিয়া একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছেন, এক একবার স্নেহলতার মুখখানি মনে পড়ায় তিনি অন্যমনস্ক হইতেছেন। এমন সময়ে একটি বালক ডাকিল, "বাবু" বাবু চমকিয়া উঠিলেন, তিনি দেখিলেন, একটি বালক একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া তাঁহার ষ্টিমারের গাত্রে লাগাইয়াছে ও তাঁহাকে ডাকিতেছে। তিনি বলিলেন, "কি চাও ?" বালক একখানি পত্র তাঁহার হস্তে দিল। তিনি স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর দেখিলেন ও তাড়াতাড়ি খুলিয়া পাঠ করিলেন—

"মহাশয়!

অত্য বাধ্য হইয়া আপনাকে এই পত্রখানি লিখিতেছি। আমার পিতা কোথায় গিয়াছেন বলিতে পারি না। তিনি ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। এস্থানে আমার সহায় কেহ নাই। আমারও কখন কি হয় বলিতে পারি না। আমি বহু কষ্টে এই পত্রখানি পাঠাইলাম, আপনি অবিলম্বে আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিবেন।"

পত্রে কোন নাম নাই, কিন্তু পরমেশ বাবু বুঝিতে পারিলেন কে পত্র লিখিয়াছে। তিনি বালকের হস্তে একটি টাকা প্রদান করিয়া বলিলেন, "তুই আমাকে সেই বাড়ী নিয়ে যেতে পারবি ?" বালক বলিল "চলুন"। পরমেশ বাবু তখন একটি পিস্তল পকেটে লইয়া পূর্ব্বে রাখাল বাবুর বাটীর দিকে চলিলেন, বালক সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাঁহারা উভয়ে রাখাল বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন বাড়ীর বাহিরে তালাবদ্ধ। অনেক ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। পরমেশ বাবু বিস্মিত হইয়া তখন বালককে বলিলেন, "এ বাড়ীর বাবু কোথায় ?" বালক উত্তর করিল, "এই বাড়ীতেই সকলে ছিল, কোথায় গিয়াছে জানি না।" পরমেশবাবু একটু

চিন্তিত হইলেন, তিনি বালককে বলিলেন, "তুই যদি খোঁজ করতে পারিস, তবে পাঁচ টাকা বক্সিস পাবি"। বালকের চক্ষু উজ্জ্বল হইল, সে বলিল, "আপনি এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবো, কোন চিন্তা করবেন না, এই বলিয়া বালক অন্তর্হিত হইল। পরমেশবাবু রাখালদাসের বাটীর সম্মুখে ঘুরিতে লাগিলেন।

স্নেহলতা পিতার অদর্শনে বড় কাতর হইল। সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। প্রসন্ন বাবু কত বুঝাইলেন, কিছুতেই কোন ফল হইল না, অবশেষে প্রসন্নবাবু স্বয়ং হরলালবাবুর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। বেল' তৃতীয় প্রহরের সময়ে রাখাল বাবু বলিলেন, "আমিত পূর্ব্বেই বলেছি কোন চিন্তার কারণ নাই। তিনি তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাড়ী গিয়াছেন। এইমাত্র সংবাদ পেলেম তিনি তথায় থাক্‌বেন;—আমার এখানে যে তাহার কি অসুবিধা তিনিই জানেন। এই একজন লোক এসেছে সে বল্‌ছে তোমার পিতার জিনিষ পত্র সহ তোমাকে তথায় পাঠাতে হবে। চল; আমি তোমাকে দিয়ে আসি।" স্নেহলতা এই কথায় আশ্বস্ত হইল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বস্ত্রাদি একত্রিত করিল। তারপর জিনিষপত্রসহ একখানি গাড়ীতে রাখাল বাবুর সহিত রওনা হইল।

সহরের এক নিভৃত গলিতে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন বাটী, সেই বাটীর দ্বারদেশে গাড়ী থামিল। রাখাল বাবু অগ্রে নামিলেন, তারপর স্নেহলতা নামিল, গাড়ীর চালক জিনিষগুলি নামাইয়া, তারপর গাড়ী লইয়া প্রস্থান করিল। বাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রাখাল বাবু বলিবেন, "স্নেহ তোমার পিতার জন্য চিন্তা করো না, তিনি এই বাড়ীতেই আছেন। স্নেহের মনে সন্দেহ হইল, তথাপি পিতাকে পাইবে এই আনন্দে সে রাখালবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ত্রিতলে চলিল। ঘরগুলি ভয়ানক অন্ধকার, গবাক্ষের সংখ্যা বড় কম, সেই সব গবাক্ষেও মোটা মোটা লোহার সিক দেওয়া। স্নেহলতার মনে ভয় হইল, সে পশ্চাতে ফিরিয়া বলিল, "কই আমার বাবা?" কেহই উত্তর করিল না। স্নেহলতা দেখিল তাহার সঙ্গে কেহই নাই। সে তখন ফিরিবার চেষ্টা করিল কিন্তু দেখিল সিঁড়ির দ্বার বাহির হইতে বন্ধ, বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না যে সে এখন বন্দিনী। স্নেহ সেইস্থানে বসিয়া পড়িল, ভয়ে তাহার কণ্ঠরোধ হইল, সে নিরুপায় হইয়া ভগবানের উপর আত্ম নির্ভর করিল।

এই সময়ে স্নেহলতার পরমেশবাবুর কথা স্মরণ হইল, তিনি ষ্টীমারে

নিতান্ত ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং বিপদে পতিত হইলে তাহাকে সংবাদ দিতে বলিয়াছিলেন। কি উপায়ে পরমেশ বাবুকে এই সংবাদ দেওয়া যায় সে তখন তাহাই ভাবিতে লাগিল। স্নেহলতার সহিত লিখিবার সরঞ্জাম ছিল, সে একখানি পত্র লিখিল এবং কোন লোক জানালার নীচ দিয়া যায় কি না লক্ষ্য করিতে লাগিল। হঠাৎ শুনিতে পাইল, একটি বালক গান করিতে করিতে যাইতেছে, তখনই সে চিঠিখানি জানালা দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল। বালক বড় ধূর্ত্ত, সে দেখিল একখানি পত্র তাহার নিকট পতিত হইল, সে কুড়াইয়া লইল এবং এক জন লোকের দ্বারা ঠিকানা পড়াইয়া পরমেশ বাবুকে পত্র দিল। পরমেশ বাবু রাখাল বাবুর বাড়ী চিনিতেন, তাই সংবাদ পাইবা মাত্র বরাবর সেই স্থানে গেলেন, কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তথায় কেহই নাই।

৫

একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া প্রসন্নবাবু ও রাখালবাবু কথোপকথন করিতেছেন। প্রসন্নবাবু বলিলেন, "রাখাল! বিহঙ্গিনী পিঞ্জরে, তাহার পিতাকেও আবদ্ধ করা হ'য়েছে। নতুবা আমাদের ভয়ানক বিপদ হ'ত। বুড়ো যে ভাবে এদেশে এসেছে, নিশ্চয়ই কোন ডিটেক্টিভ্ নিযুক্ত না ক'রে ছাড়ত না, তা হ'লেই সব ফাঁক হ'য়ে যেত। এখন কি উপায় বল? জিনিষটা সরিয়ে ফেল, তার পর বুঝা যাবে। আর স্নেহলতাকে আমাকে দেও, আমি তাকে বিবাহ করিতে রাজি আছি! স্নেহ অপূর্ব্ব সামগ্রী, যদি তাকে পাই তবে আমার কোন চিন্তা নাই, তার পিতাও তখন আমার পক্ষে আস্‌বেন। আর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারবেন না। তোমার মত কি?" রাখালবাবু হাসিয়া বলিলেন, "সবই ভাল, একটি শুধু মন্দ, মেয়েটিকে বশ করতে পারবে? মেয়েকে আমি ভয়ানক তেজস্বিনী দেখলেম, বুদ্ধিমতীও বটে। সাবধানে চল্‌বে, নতুবা বিপদ হ'তে পারে। বর্ত্তমান কি কর্ত্তব্য স্থির কর।" প্রসন্নবাবু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তোমার এখনও জ্ঞান জন্মে নাই। স্ত্রীলোকের একবার বিবাহ হ'লেই সব চুকে গেল, আর সে স্বামী ছাড়া জান্‌বে না। তবে আপাততঃ বিহঙ্গিনীকে ছাড়ছি না। কিছু দিন পিঞ্জরে আবদ্ধ থাক্‌লেই পোষ মান্‌বে! বিবাহের পর ওর পিতাকেও ছেড়ে দেওয়া যাবে।" রাখালবাবু উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি এখনও লোক চেন নাই। শেষে টের পাবে।

এ মেয়ে পোষ মান্‌বে না, বনের পাখী।" প্রসন্ন ডাক্তার বড় বড় দন্ত বাহির করিয়া খুব হাসিলেন। তিনি রাখাল বাবুর অভিজ্ঞতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। স্ত্রীলোক আর পোষ মনে না? স্ত্রীলোক বিলাসের সামগ্রী, গহনা আর কাপড় পাইলেই সব ভুলে যায়। ডাক্তার বাবু বলিলেন, "রাখাল! তুমি কিন্তু লোভ কর্‌তে পার্‌বে না, আমি এ দিকে নজর দিয়েছি, সাবধান!" রাখালবাবু বলিলেন, "না সে বিষয় চিন্তা নাই, আমি অর্থের কাঙ্গাল, কামিনীর চিন্তা আমার হৃদয়ে আসে না, কাঞ্চন পাইলেই আমি খুসী"। তখন উভয়ে ধীরে ধীরে রওনা হইলেন।

এদিকে পরমেশ বাবু বালকের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ এদিক ওদিক বেড়াইলেন প্রায় দুই ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইল তবুও বালক ফিরিয়া আসিল না, তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। এমন সময় বালক হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া আসিল ও পরমেশ বাবুকে বলিল শীঘ্র আসুন—ভয়ানক কাণ্ড। আমি তাহাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছি এই বলিয়া বালক ভাঙ্গাবাড়ীর কথা, স্নেহলতার কথা, প্রসন্ন ডাক্তার ও রাখাল বাবুর কথা, সমস্ত বলিল। সে গোপনে তাহাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছে।

পরমেশ বাবু তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আলক্ষ্যে তিনি বালকের কথার সত্যতার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ থানার দিকে অগ্রসর হইলেন।

৬

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, জানালা দিয়া চাঁদের মৃদুমধুর আলোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। স্নেহলতা গৃহের মেঝেতে শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতেছে। একবার ভগবানকে ডাকিতেছে, একবার পিতার বিষয় মনে হইতেছে, আবার নিজের কি হইবে তাহাই ভাবিতেছে। স্নেহ এমন বিপদে পূর্ব্বে কখনও পতিত হয় নাই। স্নেহ মনে করিল তাহার পত্র কোন লোকের হস্তে পড়িলে পরমেশ বাবু নিশ্চয়ই পাবেন, তিনি কি এর উপায় কর্‌তে পার্‌বেন? তিনি কি এখন এ সহরে আছেন? নানা প্রশ্ন তাহার হৃদয়ে উত্থিত হইতেছিল।

এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল, রাখালবাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাখাল-বাবু বলিলেন, "ব্যস্ত হইও না, তোমার পিতা ভাল আছেন। তুমি ত এই গৃহের কর্ত্রী, তোমার ভাবনা কি? গহনা, বস্ত্র, টাকা যাহা প্রয়োজন সব পাবে। এই নাও, ডাক্তার বাবু তোমাকে এক ছড়া মুক্তার মালা দিলেন,

এতে তোমার সৌন্দর্য্য বেড়ে যাবে।" এই বলিয়া মুক্তার হার তাহার নিকট দিলেন। স্নেহ একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিল, তার পর মুক্তার হারের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিল, "রাখাল বাবু! আমি কি বন্দিনী?" রাখাল বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "বন্দিনী! তা কেন? তুমি এ গৃহের কর্ত্রী।" স্নেহ উঠিয়া বসিল, তার পর ধীরে ধীরে বলিল, "তা হ'লে আমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি?" এবার রাখাল বাবুর বড় বিপদ হইল, তিনি বলিলেন "তা—তা—তা—কি জন্য এত চঞ্চল হও, কোথায় হারায়ে যাবে বা কোন লোক অনিষ্ট কর্‌বে। তা হবে না, আমরা তোমার পিতার অনুপস্থিতে তোমার মুরুব্বি, তোমাকে রক্ষা কর্‌বো।" স্নেহ সব বুঝিল, রাখাল বাবুকে পুনরায় বলিল "আমাকে বন্দি করিয়া আপনাদের লাভ কি?" এবার রাখালবাবু মনের কথা বলিতে সাহসী হইলেন। রাখালবাবু বলিলেন, "দেখ তুমি একটী অপূর্ব্ব রত্ন, এ রত্ন অনেকে চায়। প্রসন্ন বাবু তোমার রূপে ও গুণে উন্মত্ত। তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিতে চান। এতে তোমার আপত্তি কি? ডাক্তার বাবু লোক ভাল, অর্থশালী, রূপবান পুরুষ। আমি তোমার মত জান্‌তে এসেছি?" স্নেহ কি ভাবিল, তার পর বলিল, "ডাক্তার বাবুর কথায় সন্তুষ্ট হ'লেম, তাঁকে একবার পাঠায়ে দিন।" রাখালবাবু হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন, তার পরই প্রসন্ন ডাক্তার গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার বাবু বলিলেন, "স্নেহ তুমি যথার্থই স্নেহের পাত্রী, তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি তোমার সহায় হ'ব, কার সাধ্য তোমার বা তোমার পিতার অনিষ্ট করে। এখন রাজীত?" স্নেহ মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিসের রাজী?" ডাক্তার বাবু দেখিলেন স্নেহলতা অর্থের লোভে ও তাহার রূপে ভুলিয়াছে, মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমাকে সুখী কর। আমাকে বিবাহ কর, দুজনেই জীবনটা সুখে কাটাই"। স্নেহ আবার ভাবিল, তার পর বলিল, "আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে। আমি ও আমার পিতা সেই হীরক অন্বেষণে বাহির হয়েছি, সেই হীরক আমি না পেলে বিবাহ কর্‌বো না। যদি কেহ তাহা আমাকে দিতে পারে, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে বিবাহ কর্‌বো।"

প্রসন্ন ডাক্তারের নয়ন দুটি জ্বলিয়া উঠিল।.. কি বলিতে যাইতেছিলেন, আবার ক্ষান্ত হইলেন। তার পর উত্তর করিলেন, "তোমার মত রত্ন পেতে সমুদ্রে ডুব দেওয়া চাই। আমি সে হীরক হারের বৃত্তান্ত শুনেছি। এখন প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও যদি পাই তার চেষ্টা কর্‌বো। কিন্তু সেজন্য বিবাহটা

বন্ধ থাকে কেন?" স্নেহ বলিল, "তা হবে না, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে পূর্ণ করুন।" ডাক্তার বাবু আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন, স্নেহলতা মনে মনে হাসিল।

৭

রজনী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, পাখীকুল কলরব করিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় স্নেহলতা মৃত্তিকা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। দ্বার খুলিয়া গেল, প্রসন্ন ডাক্তার, রাখাল বাবু ও আর একটি ভদ্রলোক গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রসন্ন বাবু বলিলেন, "স্নেহ! বহুকষ্টে তোমার হীরক সংগ্রহ করিয়াছি, এই লও।" এই বলিয়া পকেট হইতে বহুমূল্য হীরক বাহির করিয়া ধরিলেন। হীরকের উজ্জ্বল দীপ্তিতে গৃহ আলোকিত হইল। তার পর পুনরায় হীরকখণ্ড পকেটে রাখিয়া বলিলেন, "তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'ল, এখন আমার অভিলাষ পূর্ণ কর" স্নেহলতা বুঝিল এবার আর উপায় নাই। সে বলিল "এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি ত স্বীকৃত আছি। আমার পিতা আসুন; তিনি তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করবেন।" ডাক্তার বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তিনি অপর কক্ষে অপেক্ষা কচ্ছেন আর এই যে অপরিচিত ভদ্রলোকটীকে দেখিতেছ, ইনি বিবাহের রেজিষ্টার, বিবাহ এখনি হবে। বিবাহ হওয়া মাত্র এই হীরক ও আমার সর্ব্বস্ব তোমার হবে।" স্নেহলতার চক্ষে জল আসিল, মনে মনে ভগবান্‌কে স্মরণ করিল। সে উত্তর করিল "আমি যদি এখন অস্বীকার করি?" ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'তা হতে পারে না। তোমাকে জোর করে সুখী করব।" স্নেহলতা আর কোন কথা বলিল না।

রাখাল বাবু বলিলেন, "আশ্চর্য্য আপনার কার্য্য করুন"। রেজিষ্ট্রার বাবু অর্থ পাইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি অগ্রসর হইলেন। রাখাল বাবু একবার বাহিরে গেলেন, এবং হরলাল বাবুকে সঙ্গে ল'য়া সেই কক্ষে পুনরায় আসিলেন। স্নেহলতা পিতাকে দেখিয়া পা জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "বাবা! তুমি রক্ষা কর, এ পাষণ্ডের হস্তে আমাকে দিও না"। বৃদ্ধ হরলাল বাবু কন্যার মস্তকে হস্ত বুলাইয়া বলিলেন, "মা! ডাক্তারবাবুর ন্যায় সৎ লোক আর নাই। এই স্থানের দুষ্ট বদমাসেরা আমাকে স্বর্ণের জন্য বন্দী করেছিল, অনেক অনুসন্ধান করে ও অর্থ ব্যয় করে ইনি আমাকে উদ্ধার করেছেন। আমি এই জন্য ইহার নিকট কৃতজ্ঞ। এ ঋণ কি দিয়ে পরিশোধ

কর্‌ব ? বিশেষতঃ ইনি সেই হীরার হার পেয়েছেন, তাহাতে যথেষ্ট পুরস্কার পাবেন। তা হলে তুমিও সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থের মালিক হবে"। স্নেহলতা এই কথা শুনিয়াই বুঝিল ধূর্ত্তরা তাহার পিতাকে বাধ্য করিয়াছে। আর কোন আপত্তির কারণ রহিল না,কিন্তু মনে মনে বুঝিল, প্রসন্ন ডাক্তার একজন ভয়ানক লোক। এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

বিবাহ প্রায় আরম্ভ হইতেছে, প্রসন্ন ডাক্তার আনন্দে আত্মহারা। সহসা সিঁড়িতে বহুলোকের পদশব্দ শ্রুত হইল। সকলে চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় পরমেশবাবু কয়েকজন পুলিশ প্রহরী ও সেই বালক সহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পুলিশেরা তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন ডাক্তার ও রাখাল বাবুকে হাতকড়ি লাগাইল। হরলাল বাবু বলিলেন "এ কি ?" পরমেশ বাবু বলিলেন, "আপনি সোজা লোক, এদের চক্রান্ত জান্‌লেন কেমন করে ? এখন আপনার কন্যাকে লইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন। পরে সব বল্‌ব।"

ডেকের উপর তিনখানি চেয়ারে তিন জন বসিয়া গল্প করিতেছেন। ষ্টিমার বঙ্গোপসাগর ভেদ করিয়া দ্রুতগতিতে কলিকাতা অভিমুখে ছুটিতেছে, সমুদ্রের অপূর্ব্ব শোভায় তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ হইতেছে না। পরমেশবাবু সংক্ষেপে সব বলিলেন। প্রসন্ন ডাক্তারের একটী দল আছে, তাহারা নানা স্থানে চুরি ও ডাকাতি করিয়া বেড়ায়। ব্রহ্মরাজের এই হীরক উহারাই চুরি করিয়াছিল। তার পর প্রসন্ন স্নেহলতার সৌন্দর্য্যে মোহিত হয় এবং হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া হীরক-হার বাহির করে। রাখাল বাবু তাঁহার এজেন্ট। রাখাল বাবু প্রথমতঃ হার বাহির করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু প্রসন্ন ডাক্তার তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। ব্রহ্মরাজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে জানান ও বহু পুরস্কারের লোভ দেখান। তাহাতে পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে এই ভগ্ন বাড়ী বাহির করে। দল না পাইলে সুবিধা হয় না, তাই তাহারা অপেক্ষা করিতেছিল। হরলালবাবু বলিলেন, "পরমেশবাবু, আপনার নিকট আমরা চির-ঋণী রহিলাম। স্নেহকে আপনিই রক্ষা করেছেন, আমার বড় আদরের কন্যাকে আমি আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম।" পরমেশ বাবুর চক্ষু দুইটী স্নেহের চক্ষের উপর পতিত হইল, নয়নে নয়ন মিলিল। উভয়েই মস্তক অবনত করিল। দুইটী প্রাণ দুইটী প্রাণকে ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি, এ,

ভক্তি ও শক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কুমার অজয়েন্দু মহারাজা হইয়াছেন। কিন্তু হায়, তিনি আর সেই পূর্ব্বের সর্ব্বগুণে গুণান্বিত অজয়েন্দু নাই। ফুলকে হারাইয়া তাঁহার চরিত্রের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

টলিতে টলিতে নিশীথ রাত্রে মহারাজা অজয়েন্দু গৃহের বাহিরে আসিতেছেন,—সুরায় তাঁহার চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু তাই বলিয়া শরীরে বল কমে নাই। দুই বাহুনিম্নে দুইটী অর্দ্ধ উলঙ্গ যুবতীকে ধারণ করিয়া মহারাজ গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন। সেইরূপ আজও চাঁদ আকাশে হাসিতেছে,—সেইরূপ আজও জ্যোৎস্নালোকে বৃক্ষলতা নাচিতেছে,—সেইরূপ আজও ধীর-পবন-সঞ্চালনে ডালে ডালে ফুল ফুটিতেছে। একদিন এইরূপ সময়ে অজয় ইন্দু সহ বন-বাসে সুখে, ইন্দুর মুখচুম্বনে আত্মবিহ্বল হইয়াছিলেন,—একদিন ঠিক এইরূপ সময়ে ফুলের সহিত বন-বাসে, ফুলের মুখচুম্বনে রাজকুমার সুখের স্বর্গে বিচরণ করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাঁহার হৃদয় তাহাতে তৃপ্ত হয় নাই। বড় সুখের সময় তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। যখন তিনি মনে মনে সুখের স্বর্গ গড়িয়াছিলেন, সেই সুখের স্বর্গ বালকনির্ম্মিত তাসের অট্টালিকার ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ইন্দুর নিকট সুখের আশায় বঞ্চিত হইয়া তিনি দেশত্যাগী হইয়াছিলেন; ফুলের নিকট বঞ্চিত হইয়া যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একেবারে নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

তিনি সুখের জন্য বারবনিতাসম্মিলনে সুরার আশ্রয় লইয়াছেন। সেইরূপ জ্যোৎস্নালোকে প্রমোদ-উদ্যানে বারবনিতাগণের বিকসিত কপোলে উষ্ণ চুম্বন করিতেছেন,—কিন্তু কই, তাঁহার আশা কি মিটিয়াছে?

এই সময়ে কে এক দেবীমূর্ত্তি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। চমকিত হইয়া যুবতীদ্বয় তাঁহার হস্ত-মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল,—কিন্তু পারিল না। তিনি অসুরবলে তাহাদিগকে ধারণ করিয়াছিলেন।

তখন সেই দেবী বলিলেন, "নাথ,—গৃহে এস, অনেক রাত্রি হইয়াছে।

দেখ, তোমার দেরী হইতেছে দেখিয়া, আমি নিজে তোমাকে দেখিতে আসিলাম।"

রাজা সুরাজড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "এ সময় আবার তুমি কে বাবা?"

ইন্দু স্বামীর হাত ধরিলেন,—বলিলেন, "নাথ, আমি তোমার দাসী ইন্দু; এস, শোবে চল; তোমার অসুখ হয়েছে।"

"তুমি মেয়েমানুষ!—তা আগে বলনি,—এস সুন্দরী, এস বুকে করে রাখি।" এই বলিয়া অজয়েন্দু যুবতীদ্বয়কে সবলে দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন,—তাহারা দূরে যাইয়া ভূপতিতা হইল। অজয়েন্দু লম্ফ দিয়া ইন্দুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখচুম্বনে উদ্যত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন,—তখন অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "তু—মি—কে?"

"দাসী—চরণে।"

"তুমি ইন্দু,—তুমি আমার ইন্দু, তুমিও আমার অধঃপতন দেখলে!—দেখ; আর সেই তাকেও ডেকে এনে দেখাও। যাও, ঘরে যাও, অজয়েন্দু মরেছে। আমি দানব, আমি রাক্ষস! ইন্দু, আমি আর তোমার স্বামী হবার উপযুক্ত নই—আমাকে আর ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। পালাও—পালাও—পালাও।"

ইন্দু সাদরে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দাসী চরণে।"

৮

রাজা মাতাল, রাজা রাজকার্য্য দর্শনে সম্পূর্ণ অক্ষম। পূর্ব্বের বিচক্ষণ মন্ত্রিবর্গ একে একে দূরীভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের স্থলে রাজার আধুনিক পারিষদগণ নিযুক্ত হইয়াছেন,—রাজ্যমধ্যে হাহাকারধ্বনি উঠিয়াছে। ইন্দু প্রাণপণে রাজ্যরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইল। প্রজাগণের আর সহ্য হয় না,—অত্যাচারের অনাচারের সীমা নাই। রাজা কিছুই দেখেন না, তাঁহার সহচরবর্গ যাহা অভিরুচি তাহাই করিতেছে, রাজ্যে সতীর সতীত্ব আর থাকে না, ধনীর ধন প্রতিদিন রাজসখাগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতেছে।

অত্যাচার আর কত দিন সহ্য হয়? রাণী ইন্দুমতীর মুখ চাহিয়াই প্রজাগণ এতদিন নিরস্ত ছিল। সহসা একদিন নগরে প্রচার হইল যে, রাজাজ্ঞায় মন্ত্রী মহারাণীকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। নগরের চারিদিকে এক মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, প্রজাগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল।

মহারাজ অজয়েন্দুর ইহার কিছুতেই লক্ষ্য নাই, তিনি সুরা ও বারঙ্গনা লইয়াই উদ্যানে মত্ত। তাঁহাকে নগরের এ ভীষণ অবস্থা কেহ জ্ঞাপন করে নাই,—করিবার আবশ্যকতাও হয় নাই।

নিশীথ রাত্রে ঝড় উঠিল। প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া জয় জয় ধ্বনি করিয়া উঠিল। মন্ত্রিগণের প্রাসাদ একে একে লুণ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল, স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, চারিদিক্ হাহাকার শব্দে পূরিয়া গেল।

ক্রমে বিদ্রোহিগণ প্রমোদ-উদ্যান বেষ্টন করিল; তাহারা উন্মত্তের ন্যায় মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। তাহাদের চীৎকারে রাজার সহচর ও সহচরীগণ একে একে প্রাণভয়ে পলাইল। ঘোর কোলাহল শুনিয়া রাজা দুই একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বাবা—সুখের সময় এ কেন?"

কেহ তাঁহার কথায় উত্তর দিল না, তিনিও ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে শক্তি তাঁহার আর নাই। নগরে একটা বিপর্য্যায় ঘটিয়াছে কতক বুঝিয়া, চিরস্বভাবসুলভ হৃদয়াবেগে অসির অনুসন্ধানে হস্ত বিস্তৃত করিলেন, কিন্তু হস্তে অসি উঠিল না, উঠিল সেতার।

ক্রমে কোলাহল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, দ্বার ভগ্ন করিয়া বিদ্রোহীগণ উদ্যানে প্রবিষ্ট হইল, উদ্যানের নানা স্থানে তাহারা অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল; তাহারা অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আজ উন্মত্ত হইয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে আজ দয়ামায়া কিছুই নাই, তাহারা এক্ষণে রাজাকে সম্মুখে পাইলে শতছিন্ন করিতেও সক্ষম।

বিকট কোলাহলে অজয়েন্দুর নেশা ক্রমে ছুটিয়া আসিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ তিনি স্বয়ংই পরিষ্কার করিয়াছেন; তবে তাঁহার প্রজাগণ যে বিদ্রোহী হইয়া উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিতেছে, ইহা তাঁহার মনে একবারও হইল না। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার রাজ্য অরক্ষিত দেখিয়া কোন শত্রুরাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতেছেন। তাঁহার প্রাণে মায়া জন্মিল, মুহূর্ত্তের জন্য রাজপুতবীর্য্য হৃদয়ে উত্তেজিত হইল, তিনি লম্ফ দিয়া উঠিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিলেন না।

এই সময়ে জলস্রোতের ন্যায় বিদ্রোহিগণ প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

রাজার অবস্থা দর্শনে তাহারা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। কাহারও মুখে বাক্য স্ফুরণ হইল না। অবশেষে একজন বলিল, "মহারাজ, আমাদের মহারাণী কোথায় ?"

প্রজা মহারাজকে প্রশ্ন করিবে ? মহারাজ অজয়েন্দু ক্রোধে বলিলেন, "আমি কি মহারাণীর প্রহরী ?"

"তুমি রাক্ষস, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছ!" এই বলিয়া একজন রাজার মস্তক লক্ষ্য করিয়া শাণিত কুঠার তুলিল। রাজসখা ইহার স্ত্রী-পরিবার সকলের শিরশ্ছেদ করিয়াছেন ; সুতরাং সে ব্যক্তি ক্রোধ উপশমিত করিতে পারিল না,—কুঠার তুলিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে রাজশোণিতে ধরা প্লাবিত হইত, কিন্তু কে এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে সেই ব্যক্তির হাত ধরিল,—ক্রুদ্ধ বিদ্রোহী সিংহের ন্যায় তাহার দিকে ফিরিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তৎপরে চারিদিকে, "জয় মহারাণীকি জয়" শব্দে সমস্ত সহর প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

৯

যখন ইন্দু দেখিলেন যে, স্বামীর চরিত্র পরিবর্ত্তন করিবার আশা তাঁহার বিন্দুমাত্রও নাই,—তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও স্বামীকে সুপথে আনিতে পারিলেন না,—বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, কত দিন স্বামীর পা ধরিয়া কাঁদিলেন,—স্বামীর হৃদয় নিজ চক্ষুজলে ভাসাইয়া দিলেন, তবুও তাঁহার দয়া হইল না—তবুও তাঁহার মন গলিল না—তবুও তিনি কুপথ পরিত্যাগ করিলেন না, তখন তিনি হতাশ হইয়া ভাবিলেন,—আমি হতভাগিণী, আমার দ্বারা তো কিছুই হইল না, হয়তো ফুল আসিলে অজয় ভাল হইবেন, ফুলকে হারাইয়াই তো তাঁহার এই দশা হইয়াছে—ফুল আসিলে নিশ্চয়ই তিনি এ সকল কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন ; আমি ফুলকে খুঁজিব ; যেখানে পাই, সেইখান হইতে ফুলকে আনিব।

রাজা সুরায় মত্ত, তাঁহার তত্ত্ব এখন আর কেহ লইত না। ইন্দু দুই জন বিশ্বস্ত সখী সমভিব্যাহারে ফুলের অনুসন্ধানে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ইন্দুর অন্তর্দ্ধান-সংবাদ নগরে প্রচারিত হইল। কেহ বলিল —"মহারাজের আজ্ঞায় মহারাণী কারারুদ্ধা হইয়াছেন," কেহ বলিল,—"ধূর্ত্ত রাজপারিষদগণ পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে", কেহ কেহ বলিল,—"কুচক্রিগণ তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছে।" উৎপীড়িত নগরবাসিগণ এ সংবাদ পাইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ইন্দুর নগর পরিত্যাগের ঠিক একমাস পরে

নগরে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই অগ্নিতে রাজা ও রাজ-পারিষদগণ সকলেই ভস্মীভূত হইতেন, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই ভীষণ ভয়াবহ সময়ে ফুল আসিয়া দর্শন দিল। তাহাকে প্রজাগণ সকলেই চিনিত; বিদ্রোহিগণ প্রমোদউদ্যানে তাহাকে দেখিবামাত্র জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বাহিরে যাহারা ছিল, তাহারা এই জয়ধ্বনির কারণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াও জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল; দূরে দূরে যাহারা অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারাও স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আকাশ বিকম্পিত করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ফুলের বিকাশে সহসা নগরে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল।

যাহারা মহারাজকে বেষ্টন করিয়াছিল, তাহারা মহারাণীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। তখন স্বর্গের দেবীর ন্যায়, পর্ব্বতের অপ্সরীর ন্যায় ফুল বাহু আন্দোলিত করিয়া তাহাদিগকে উদ্যান পরিত্যাগের ইঙ্গিত করিল। অলক্ষিত বায়ুপ্রবাহে শ্যামল ধান্য যেরূপ অবনত হইয়া পড়ে, বাজীকরের মায়াময় দণ্ড হেলনে যেমন দ্রব্যাদি দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যায়, ঠিক তেমনই বিদ্রোহী নগরবাসিগণ নিমেষমধ্যে উদ্যান হইতে অন্তর্হিত হইল।

ইন্দু ফুলের অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন, কেহ তাঁহার অনুসন্ধান করে নাই; করিলে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া ক্লেশকর হইত না,—করিলে হয়তো নগরে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিত না, ফুলও আসিত না।

১০

সখীসঙ্গে ইন্দু নৌকাযোগে ফুলের অনুসন্ধানে চলিয়াছেন; গাছে গাছে ডালে ডালে কতই ফুল ফুটিয়াছে, কিন্তু কই—সে ফুল কই? তবে কি সত্য সত্যই এই সকল ফুলের ন্যায় সেই আদরের ও স্নেহের ফুল প্রকৃতই ঝরিয়া গিয়াছে? যাইতে যাইতে কতবার ইন্দুর মনে এই কথা উদিত হইয়াছে, তিনি কতবার ভাবিয়াছেন,—হয়ত ফুল আত্মহত্যা করিয়াছে; আবার ভাবিয়াছেন—কেন করিবে? না, সে মরে নাই, অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

পাঁচ বৎসর হইতে ফুল অন্তর্হিতা; পাঁচ বৎসরে কতই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! ইন্দু আর সে ইন্দু নাই, অজয়েন্দু আর সে অজয়েন্দু নাই, রাজধানীও আর সে রাজধানী নাই। যে ইন্দুর প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় বদনে হাসি সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিত, যাহার প্রফুল্ল নয়নে সর্ব্বদাই হাসির তরঙ্গ তরঙ্গায়িত হইত,

তাহার নয়নে অবিরত অশ্রু বহিতেছে, তাহার হাস্যময় বদনে শোকের কালিমা পড়িয়াছে। যে অজয়েন্দুর গুণে সকলেই মুগ্ধ ছিল, যিনি প্রেমের পূর্ণ উৎস ছিলেন, যাঁহার সচ্চরিত্রতা ও গুণের কথা শুনিয়া দেশদেশান্তরের লোক বিমুগ্ধ হইত, সেই অজয়েন্দু এক্ষণে নর-রাক্ষস! যে রাজধানী দুই বৎসর পূর্ব্বে শোভায় অতুলনীয় ছিল,যে নগরবাসিগণ ধন,মান, যশে সর্ব্বদা সুখী থাকিত,সেই নগরেই আজ সর্ব্বদা দুঃখের রোল উঠিতেছে,—অত্যাচারের ঝটিকা ছুটিতেছে।

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে ইন্দু চলিয়াছেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি নদীর পরপারস্থ দুইটী লোকের প্রতি আকৃষ্ট হইল। নৌকা নদীর এক কূল ঘেঁসিয়া যাইতেছিল, সুতরাং অপরপারস্থ দ্রব্যাদি বিশেষ স্পষ্ট দেখা যায় না; তবে ইন্দু এইমাত্র দেখিলেন যে, নদীতীরে একটী বালক একটী রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। বালক ছুটিয়া যাইয়া তাহাকে একবার ধরিতেছে, রমণী আবার তাহার হস্তমুক্ত হইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। দুইটী ক্ষুদ্র মেষশাবক নাচিতে নাচিতে এই ক্রীড়ায় যোগ দিতেছে, কখন কখন বা তাহারা বালকের পশ্চাদনুসরণ করিতেছে, কখনও বা আবার রমণীর অনুসরণ করিতেছে।

এই রমণী ও বালককে দেখিবার জন্য ইন্দু ব্যাকুলা হইলেন। নৌকা তৎক্ষণাৎ পরপারে লইয়া যাইবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। যখন নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল, তখন ইন্দু দেখিলেন, বালকের সহিত রমণী আর নাই। বালক মেষশাবকদ্বয় লইয়া ক্রীড়া করিতেছে।

বালকের মুখ দেখিয়া ইন্দুর প্রাণ আরও ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই বালককে নৌকায় আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন, কিন্তু বালক আসিল না। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "মহারাণী, ও আসে না, বলিল—যার তাকে দেখ্‌বার ইচ্ছা, সে এসে দেখে যাক্।"

ক্ষুদ্র বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া ইন্দুর কৌতূহল চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল,—বালককে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল,—তিনি কাহারও নিষেধ না মানিয়া স্বয়ংই বালককে দেখিতে চলিলেন।

তিনি বালকের নিকট আসিয়া বলিলেন, "এস, আমি তোমায় ভেড়া ধ'রে দি।" বালক মেষশাবকের পশ্চাদনুসরণ করিতেছিল, ইন্দুর কথায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; বহুক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল,—তৎপরে বলিল, "তুমি পার্ব্বে কেন? ওরা ভারি দুষ্ট।"

"তা ওরা না হ'ক খেলা করুক;—তুমি আমার নৌকায় এস, আমি তোমায় অনেক জিনিষ দেখাব এখন।"

"আমি কেন যাব ?"

"আমি তোমায় ডাক্‌চি ব'লে।"

"মা যদি বকেন ?"

"কেন ব'ক্‌বেন ? ব'ক্‌বেন না। এখনই তোমায় আবার রেখে যাব।"

"তবে চল।"

"এস, তোমায় আমি কোলে ক'রে নিয়ে যাই।"

বালক আবার বহুক্ষণ ইন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইন্দু বলিলেন, "এস, না হলে তোমার পায়ে কাদা লাগ্‌বে।"

বালক নীরবে কোলে উঠিল। ইন্দুও বালককে সস্নেহে কোলে করিয়া নৌকার দিকে ফিরিলেন। অমনি কে মধুরস্বরে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ হইতে বলিল, "দুষ্ট ছেলে,—লোক চেন না ? ইনি যে তোমায় চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্চেন।" ইন্দু চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন,—ফুল।

১১

ইন্দু সস্নেহে ফুলের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "ফুল,—এ ধনে কি আমার অর্দ্ধেক ভাগ নাই ?" ফুল হাসিল, বলিল, "দিদি, আমায় ক্ষমা কর, আমার শরৎ তো তোমারই।"

"ছি! এমন করে ভুলে থাক্‌তে হয় ? এমন কোরে না বলে আস্‌তে হয় ? চিরকালই কি পাগল ?"

ফুলের চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। ফুল বলিল, "দিদি, তোমাদের সুখের পথে কণ্টক হইব না ভাবিয়া পলাইয়াছিলাম,—কিন্তু দেখ, বেশী দূর পলাইতে পারি নাই।"

এবার ইন্দুর চক্ষে জল আসিল; ইন্দু বলিলেন,—"ফুল, তুমি থাকিলে আমরা সুখী হইতাম; তুমি চলিয়া আসিয়া আমাদের সুখের সংসার শ্মশান হইয়াছে। তোমারই অনুসন্ধানে আমি ঘুরিতেছি,—এত শীঘ্র যে তোমায় পাইব, তাহা ভাবি নাই,—সে অনেক কথা; নৌকায় চল, সব বলিতেছি।"

উভয়ে নৌকার দিকে চলিলেন; তখন বালক মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, মা,—ইনি কে ?"

"উনি তোমার মা।"

দুষ্ট ছেলে লোক চেন না—ভক্তি ও শক্তি—৮৭৬ পৃঃ

Cherry Press Ltd., Cal.

"তুমি যে আমার মা।"

"উনিও তোমার মা। তোমার দুই মা।"

"তবে আমি কার কোলে চড়বো ?"

ইন্দু সস্নেহে বালককে চুম্বন করিয়া বলিল, তোমার কার কোলে থাক্‌তে ইচ্ছা করে ?"

"মা আমায় মোটে কোলে করে না, কাছে গেলে মারতে আসে।"

ইন্দু সাদরে বালকের গণ্ডে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন।

ফুল হাসিল। ইন্দু ফুলকে অজয়েন্দুর বিবরণ সমস্ত বলিলেন,—রাজ্যের অবস্থাও জ্ঞাপন করিলেন; তখন দুই সতীনে, দুই ভগিনীর ন্যায় পরস্পরে পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উভয়ে কথঞ্চিৎ প্রকৃতস্থ হইলে ফুল কাতরে ইন্দুর হাত ধরিয়া বলিল, "দিদি,—এখন উপায় !

"আমার দ্বারা যাহা সম্ভব, তার সবই করেছি। ফুল,···আমিতো তাঁকে ভাল কর্ত্তে পারি নাই,—আমি জানি, তুমি পার্ব্বে।"

"দিদি, তিনি কি আমাকে মনে করেন ? হয়তো তিনি আমাকে চিন্‌তেও পার্ব্বেন না।"

"ফুল, তুমি ত ভালবাসা কাকে বলে জান। যে যাকে একবার ভাল-বেসেছে, সে কখনই কি তাকে আর ভুল্‌তে পেরেছে ?"

"তাঁর জন্যে আমি প্রাণ দেব; তাতেও কি তিনি ভাল হবেন না ? আমরা দুজনে তাঁর দুপা ধরে কাঁদব; যতক্ষণ না তিনি ভাল হয়েন, ততক্ষণ ছাড়ব না,—তারপর আমরা প্রাণ দেব, তা হলেও কি তিনি ভাল হবেন না ? দিদি, চল, চল,—আমি কেন তাঁকে ফেলে এসেছিলাম !"

ফুলও নিজ বৃত্তান্ত ইন্দুকে বলিল। যে সন্ন্যাসী তাহাকে এক সময়ে আশ্রয় দিয়া আরাবলী পর্ব্বত উপরে রাখিয়াছিলেন যিনি তাহার বিবাহ দেন, যে দিন সে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া আইসে, সেইদিন তাঁহার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এবার তাহাকে আরাবলী পর্ব্বতে লইয়া যাইতে অসম্মত হইলেন। ফুল বলিল, "আমি তাঁহার কত সাধ্যসাধনা করিলাম, রাজপ্রাসাদ হইতে দূরে বহু দূরে যাইবার জন্য আমার হৃদয় পাগল হইয়াছিল, কিন্তু তিনি আমার অনুনয় বিনয় শুনিলেন না; বলিলেন "না, নিকটে থাকিতেই হইবে। তুমি অন্তঃস্বত্বা, বেশী দূর গেলে চলিবে না। বিশেষতঃ পাঁচ বৎসর

বয়সে তোমার ছেলে রাজা হবে। তিনি অনেক সময় অনেক কথা বলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার কথার অবাধ্য হওয়াও যায় না। সেই পর্য্যন্ত এইখানে আছি।" দিদি,—"তিনি ছেলেটার মাথাও খেয়েছেন। ওকে দিনরাত বলেন তুই রাজার ছেলে,—রাজা হবি।"

"ফুল, তোমার একটা কথায় আমার মন যে আরও চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। পাঁচ বৎসরে আমাদের শরৎ রাজা হবে! তবে কি, তবে কি,—আমার—আমাদের অজয়েন্দুর কোন বিপদ ঘটেছে!"

"দিদি,—চল আমরা শিগ্‌গির তাঁর কাছে যাই।"

সন্ন্যাসীকে সম্বাদ দেওয়া হইল। সন্ন্যাসী আসিলেন, ফুল পুত্র শরদিন্দুকে সন্ন্যাসীর নিকটই রাখিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ইন্দুর সহিত রাজধানী অভিমুখে রওনা হইলেন।

যখন ইন্দু ও ফুল নগরে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইন্দু কাঁপিয়া ব্যাকুলা'—কিন্তু ফুল কাঁপিল না। বলিল, "দিদি তিনি কোথায় আছেন বলে বোধ হয়?"

"বাগানে,—হয়তো এতক্ষণে—"

"একবার আমি দেখিব,—তুমি এইখানেই থাক।,

"না না—তা হলে তোমাকে কেটে ফেল্‌বে!"

"না হয় স্বামীর জন্য মরিলাম।"

"তবে আমিও যাব।"

"তা হ'লে দুজনেই মরিব, কোনই কাজ হ'বে না।"

ফুল অনেক কষ্টে ইন্দুকে বুঝাইয়া একাকি প্রমোদউদ্যানে প্রবিষ্ট হইল।

যখন বিদ্রোহিগণ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিল, তখন অজয়েন্দু ফুলের দিকে ফিরিলেন,—তিনি ফুলকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

ফুল ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত দিল; সহসা সর্পে দংশন করিলে মানুষ যেমন লম্ফ দিয়া উঠে, মহারাজ অজয়েন্দু তেমনই লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তৎপরে উন্মাদের ন্যায় ফুলকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। ফুল সরিয়া দাঁড়াইলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে অতি গম্ভীরে কহিল, "অজয়, তুমি ত আর সে অজয় নাই! আমাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিবার ক্ষমতা অজয়ের ছিল, তুমি সে অজয়েন্দু থাকিলে তোমারই থাকিত, তাহাতো আর নাই!"

অজয়েন্দু দাঁড়াইয়া ছিলেন, বসিয়া পড়িলেন; তৎপরে বলিলেন, "ফুল, সত্যই বলিয়াছ, আমি আর তোমার উপযুক্ত নহি। আমি পশু হইতেও অধম! যদি কখনও তোমার উপযুক্ত হই, তবে তোমাকে স্পর্শ করিব।"

এই বলিয়া অজয়েন্দু উঠিলেন। ফুল বলিল, "এইতো অজয়েন্দুর ন্যায় কথা! রাজ্য অরাজকতায় পূর্ণ, নগরে বিদ্রোহ, আর মহারাজা অজয়েন্দু আমোদে মত্ত!"

"ক্ষান্ত হও ফুল, ক্ষান্ত হও, আমার চৈতন্য হইয়াছে।" এই বলিয়া অজয়েন্দু প্রহরীকে ডাকিলেন।

কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। তখন ফুল বলিল, "মহারাজ সকলেই আপনাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে!"

তা আমি জানি, যখন সকলে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন তুমিই কেবল আমার পার্শ্বে আছ; ফুল আমি তোমার উপযুক্ত হইব।"

এই বলিয়া অজয়েন্দু উঠিলেন, পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ মধ্য হইতে যুদ্ধবেশ আনিয়া পরিধান করিলেন; তৎপরে উন্মুক্ত অসি হস্তে বহির্গত হইলেন, বলিলেন, "অশ্বশালায় অশ্ব আছে, লইব,—আমি এখনও মরি নাই।"

নীরবে ফুল রাজার পশ্চাদনুসরণ করিল। সে যে নিঃশব্দে পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে, রাজা তাহা লক্ষ্য করেন নাই; তিনি নিজ মনে অশ্বে আরোহণ করিয়া নগরাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্য অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া ফুল তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল; তৎপরে বায়ুবেগে মহারাজার পশ্চাদানুসরণ করিল।

চারিদিকে নাগরীকগণ তখনও চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে, তখনও তাঁহাদের ক্রোধ উপশমিত হয় নাই। নিশীথ রাত্রে অশ্বারোহী পুরুষ দেখিয়া তাহারা আসিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। রাজা গর্জ্জিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে চিনিতেছ না? ভাবিয়াছ আমি মরিয়াছি—আমি মরি নাই। যাও, যে যাহার গৃহে যাও, নতুবা আমি এখনই বিদ্রোহিগণের শিরঃশ্চেদ করিব।"

"জয় মহারাজা অজয়েন্দু কি জয়" বলিয়া অপর আর একজন অশ্বারোহী আসিয়া রাজার পার্শ্বে অশ্ব সংযোজিত করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নগরবাসিগণ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল, "জয় মহারাণীর জয়।" অজয়েন্দু ফিরিয়া দেখিলেন,—ফুল।

যাহার অভাব মিটাইবার অন্য উপায় না পাইয়া অজয়েন্দু সুরা ও বারাঙ্গনা-সঙ্গ লাভ করিয়া দুঃখ মিটাইতেছিলেন, তাহার উপস্থিতিতে সুরা ও বারাঙ্গনা পরিত্যাগ তাঁহার পক্ষে কঠিন কার্য্য হইল না।

অজয়েন্দু ঠিক পূর্ব্বের অজয়েন্দু হইলেন; কিন্তু লোকালয়ে তাঁহার মুখ দেখান ভার হইল,—কোন্ মুখে তিনি আবার সিংহাসনে বসিবেন? কি বলিয়া তিনি প্রজার নিকট মুখ দেখাইবেন?

তাঁহার আবির্ভাবে রাজধানীর বিদ্রোহানল নিবিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার আর হৃদয়ে সে বল ও সে উৎসাহ নাই; রাজ্যশাসনের আর সে ইচ্ছাও নাই,—সে সকল মন্ত্রীও নাই যে রাজ্য সুশাসিত হইবে। প্রজার সন্তোষের জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত পারিষদমণ্ডলীকে রাজকার্য্য হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন, রাজসভা হইতেও তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছেন। প্রজারা সন্তুষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজ্যে সুশাসন প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

স্বয়ং রাজকার্য্য না দেখিলে নয়। ইন্দু ও কুল প্রত্যহই তাঁহাকে দরবারে বসিতে বিশেষ অনুনয় বিনয় সহকারে অনুরোধ করিতেছেন। তাহারাও বুঝিয়াছে যে অজয়েন্দুর আর রাজ্যশাসন করিবার ক্ষমতা নাই।

ইন্দু ও কুল উভয়ের অনুরোধে মহারাজা অজয়েন্দু দরবারে উপবিষ্ট হইতে সম্মত হইলেন। রাজ্যের সর্ব্বপ্রদেশে এ শুভবার্ত্তা ঘোষিত হইল। ইহার জন্য নানাবিধ আয়োজনও হইতে লাগিল,—চারিদিক হইতে এই ব্যাপার দেখিবার জন্য লোক আসিতে লাগিল,—বিশেষ এই দরবারে এক নূতন কাণ্ড হইবে। রাজার সহিত দুই রাণীও সিংহাসনে বসিবেন। এই নূতন ও অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রজাগণ সকলে ব্যাগ্রচিত্তে দরবারের দিন গণনা করিতে লাগিল।

অবশেষে দরবারের দিন আসিল। মহারাণীদ্বয় সমভিব্যাহারে মহারাজা অজয়েন্দু সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রজাগণ একে একে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া নজর প্রদান করিতে লাগিল। যে যাহার সামর্থ্যানুসারে নানাবিধ দ্রব্যাদি উপঢৌকন প্রদান করিল।

সহসা সভামধ্যে একটা গোল উঠিল। সম্মুখস্থ ব্যক্তিগণ কাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল, সকলে দেখিলেন একজন সন্ন্যাসী একটী সুন্দর বালকের হস্ত ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। দুই পার্শ্বস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ সন্ন্যাসীর সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী ধীরপাদক্ষেপে বালকের হস্ত ধারণ করিয়া সিংহাসনের পদপ্রান্তে আসিলেন। মহারাজা অধীর হইলেন,—সকলেই স্পষ্ট তাঁহার হৃদয়ের চাঞ্চল্য-ভাব লক্ষ্য করিল।

সন্ন্যাসী সিংহাসনের সন্নিকটে আসিয়া করপুটে বলিলেন, "রাজন্, আমি দরিদ্র সন্ন্যাসী,—আপনাকে কি নজর আর দিব! রাজপুত্র শরদেন্দুকে উপঢৌকন প্রদান করিলাম।"

রাজা অজয়েন্দু চমকিত হইয়া একবার ইন্দুর দিকে অন্যবার ফুলের দিকে চাহিলেন। তখন ফুল মৃদুস্বরে কহিল, "মহারাজ, শরদেন্দুকে আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছি মাত্র, শরতেন্দুর জননী দিদি।"

অজয়েন্দু লম্ফ দিয়া সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন। একেবারে বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, শত শতবার তাহার মুখচুম্বন করিলেন, তৎপরে সভাসদগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজ হইতে শরদেন্দুই আপনাদের রাজা হইল, আমি আর রাজা থাকিবার উপযুক্ত নহি, ইহাকে আপনারা রাজা বলিয়া অভিবাদন করুন।"

এই বলিয়া মহারাজা বালককে সিংহাসনে বসাইয়া নিজ মস্তক হইতে রাজমুকুট উত্তোলন করিয়া বালকের মস্তকে পরাইয়া দিলেন। সভাসদগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, দ্বারে নহবত বাজিল, দুর্গে তোপধ্বনি হইল, নগরে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল।

ব্যর্থ প্রেম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিতান্ত অনিচ্ছায়, নিতান্ত অনুরোধ উপরোধে শ্যামাধব, পিতৃব্যের একটা বিশেষ কার্য্যে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিল। শ্যামাধবের পত্নী নীহারশশী তখন তাহার পিত্রালয়ে। আবাস ছাড়িয়া প্রবাসে যাইবার কালে পত্নীর সহিত পতির সাক্ষাৎ হইল না। সে কারণে প্রবাস যাত্রা কালীন বিনিদ্র রজনীর চিন্তা ক্লেশ শ্যামাধবের পক্ষে দুর্ব্বিসহ হইয়া পড়িল। আবাসের সুখ শান্তি ছাড়িয়া প্রবাস যাত্রার দুঃখ কষ্ট শ্যামাধবের ভাগ্যে ইতঃপূর্ব্বে ঘটে নাই। এই যাত্রাই তাহার প্রথম যাত্রা। প্রবাসযাত্রানভিজ্ঞ শ্যামাধব উদভ্রান্ত চিত্তে

বাটীর কথাই ভাবিতে লাগিল, বিশেষ নীহারশশীর চিন্তাই তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল—নীহারশশী তাহার প্রাণাধিকা শান্তিসুখ সাধিকা।

নিরতিশয় মনকষ্টে শ্যামাধব গন্তব্য স্থানে পরদিবস অপরাহ্নে পৌঁছাইয়া, তাহার নিরাপদ পৌঁছান সংবাদ বাটীতে পাঠাইল এবং পথে যে তাহার শারীরিক কিম্বা মানসিক কোনরূপ কষ্ট হয় নাই সে কথাও তাহার প্রিয়জন দিগকে বিজ্ঞাপিত করিতে ভুলিল না! তবে নীহারশশীকে যে পত্রখানা লিখিয়াছিল, তাহার ভাষা ও ভাব অন্যরূপ। যাত্রাকালে যে শ্যামাধব, সুহাসিনী, মধুরভাষিণী জীবনসর্ব্বস্ব ভার্য্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবার অবসর ও সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার জন্য যে সে অশেষ মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত এবং বিরহ জনিত চিন্তানলে যে সে অহরহ দগ্ধ হইতেছে—সেই সকল কথা কষ্টের ভাষায় সবিস্তারে শ্যামাধব প্রেয়সীর নিকট লিখিয়া পাঠাইল। পথে আসিতে আসিতে প্রাকৃতিক দৃশ্য তাহার ভাল লাগে নাই, নীহারশশীর চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা তাহার মনে স্থান পায় নাই, সে কথা ভার্য্যাকে জানাইতেও শ্যামাধব বিস্মৃত হইল না। তবে বরুণা অসির সম্মিলন ক্ষেত্র—বারানসীধামের নিকটবর্ত্তী হইলে অজ্ঞাতভাবে অনির্ব্বচনীয় পুলকানন্দ যে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, সে কথা সে অস্বীকার করিতে পারে নাই। ইহা বোধ হয় বারাণসীর মাহাত্ম্য।

পত্রাদি পোষ্ট আফিসের ডাকবাক্সে ফেলিয়া শ্যামাধব অনুচর সঙ্গে কেশর বাগের একটি সুবৃহৎ ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সে ভবন রাজপ্রাসাদ তুল্য।

প্রাসাদস্বামী আগন্তুকের আগমন সংবাদ শুনিয়া স্বয়ং বাটীর বহির্দ্দেশে আসিয়া হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে প্রাসাদ মধ্যে লইয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

প্রাসাদস্বামী শ্যামাধবের পিতৃব্য বন্ধু। তিনি জাতিতে মুসলমান—তাহা হইলে কি হয়, বন্ধুত্বে জাতি ভেদ নাই, থাকাও উচিত নহে।

পিতৃব্য বন্ধু তাহের সাহেব শ্যামাধবকে বাটীর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সহসা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সকল কথা আদ্যোপান্ত শ্যামাধব তাহের সাহেবকে বলিল। সকল কথা শ্রবণান্তর তাহের সাহেব গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"বটে তোমার চাচা সাহেব পূর্ব্বে আমায় এ সকল কথা লিখিয়া পাঠান নাই কেন, তাহা হইলে যে আমি অনেক সুবিধা করিয়া

দিতে পারিতাম।" যাহা হউক, যখন আসিয়াছ, তখন দুই এক মাস কাল থাক; বোধ হয় একটা সুবিধা হইয়া যাইতে পারে।"

দুই এক মাস কাল থাকিবার কথায় শ্যামাধবের মস্তক ঘুরিয়া গেল। সে দুই পাঁচ দিন বাটী ছাড়িয়া থাকিতে পারে কি না সন্দেহ, দুই এক মাস থাকিবে কি প্রকারে!

তাহের সাহেব "দোস্তের" ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিকটে পাইয়া তাহাকে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাহার বসবাসের আহারাদির সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে চাহিলেন। শ্যামাধব বিনয় সহকারে কহিল—তাহার জন্য তাঁহার ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই। সে সকল ব্যবস্থা তাহার বাস ভবনেই হইয়াছে। তাহার বাস ভবন অর্থে তাহার পিতৃব্যের বাটী। পিতৃব্য অবশ্য এখন সে স্থানে নাই। তবে তাঁহার লোক জন আসবাব পত্র সেখানে সমস্তই আছে।

তাহের সাহেব শ্যামাধবের কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন—তাহা জানি বাপ্‌জী। কিন্তু আমার যে অতিথী তুমি।

সে কথায় শ্যামাধব আর কোন কথা কহিতে পারিল না—চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহের সাহেব হাসিয়া বলিলেন—আমার বাড়ীতে থাকলে তোমার জাতি যাইবে বুঝি? তবে, তুমি থাকিলে হিন্দুর দ্বারা আমি তোমার খাদ্যাদির ব্যবস্থা করাইতে পারিতাম।

শ্যামাধব অপ্রতিভ হইয়া অশেষ বিনয় সহকারে অশেষ ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহার বিনয় ও সৌজন্য দেখিয়া তাহের সাহেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কহিলেন—ভাল, না খাও ক্ষতি নাই, কিন্তু আজ তুমি বাসায় যাইতে পারিবে না। আজ আমার বাটীতে মুন্নাবাই মজুরা করিবে, আজ তোমার এখানে নিমন্ত্রণ।

শ্যামাধব সে নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিল এবং তাহের সাহেবের অনুমতি লইয়া বাসায় যাইয়া আহারাদি করিয়া ও বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া নৃত্য-গীতের বৈঠকে আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লাক্ষ্ণৌ পৌঁছিবার পর প্রথম প্রথম দুই দশদিন শ্যামাধবের নিকট হইতে তাহার আত্মীয় স্বজনগণ এবং নীহারশশী নিত্য পত্র পাইত; কিন্তু তাহার পরে তাহারা সপ্তাহে এক খানা পত্রও পাইত না। সকলে ভাবিল বিষয় কার্য্যে

শ্যামাধব বোধ হয় বিশেষ ব্যস্ত আছে। সেই কারণে নিয়মিত রূপে পত্র লিখিবার সে অবসর পায় না।

শ্যামাধবের পত্র ক্রমে দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল। দুই তিন সপ্তাহ পরে কদিচ কখনও সে এক আধ ছত্র লিখিয়া পাঠায়—সে দুই এক ছত্রও অর্থশূন্য। নীহারশশী আর বড় পত্র পায় না। সে অপরের পত্রেই স্বামীর কুশল সংবাদ অবগত হইত।

এই রূপে প্রায় দুই মাস কাল অতীত হইল। এতদিন সে লাক্ষ্ণৌ সহরে বসিয়া দগ্ধ কদলী যে কেন ভক্ষণ করিতেছে, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া শ্যামাধবের জরাগ্রস্ত পিতৃব্য কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শ্যামাধবের পিতা শ্যামাধবকে ভৎর্সনা করিয়া পত্র লিখিয়াও সন্তোষ জনক উত্তর পাইলেন না। আর শ্যামাধবের বড় আদরের বড় সোহাগের নীহারশশী পত্রের পর পত্র লিখিয়াও প্রবাসবাসী পতীর নিকট হইতে কোন সংবাদই পাইল না। অশ্রুজলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয়ই হইল না। শ্যামাধবের তত্ত্ব লইতে যায় কে? তাহার পিতা ব্যাধিগ্রস্ত, পিতৃব্য জরাভারগ্রস্ত, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালক মাত্র। তাহের সাহেবকে পত্র লিখিয়াও তাহার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। পরে শুনিতে পাওয়া গেল বৃদ্ধ তাহের সাহেব ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতেই নানা গণ্ডগোল বাধিয়াছে। বৃদ্ধের মৃত্যুতে শ্যামাধবের পিতৃব্য বালকের মত ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

তাহের সাহেবের মৃত্যু কথা শুনিয়া শ্যামাধবের পিতা ও পিতৃব্য প্রভৃতি শ্যামাধবের বাটী ফিরিতে বিলম্বের কারণ কতকটা অনুমান করিতে সমর্থ হইলেন। তাহাদের পীড়ার সংবাদ শ্যামাধব পূর্ব্বেই দিয়াছিল। সকলের মনে হইল রোগীর রোগশয্যা পার্শ্বে হয়ত শ্যামাধবকে অনেক সময় বসিয়া থাকিতে হইত—সেই কারণেই হয়ত শ্যামাধবের বিলম্ব ঘটিয়াছে। ব্রীড়াশীল শ্যামাধব কোন সৎকার্য্য করিয়া সে আপন মুখে তাহা ব্যক্ত করে না। এই কারণে তাহের সাহেব সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই হয়ত শ্যামাধব পত্রে-উল্লেখ করে নাই। এই বিশ্বাসের বশেই শ্যামাধবের পিতৃদেব ও পিতৃব্য অবাধ্য সন্তানকে মনে প্রাণে ক্ষমা করিলেন। তবে সে সংবাদ শ্যামাধবের নিকট পৌঁছিল না।

শ্যামাধবের সম্বন্ধে অন্যান্য সকলে যাহাই বলুক নীহারশশী কিন্তু কোন

অভিমতই প্রকাশ করিল না। সে শ্বশুর মহাশয়ের অনুমতি লইয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার সঙ্গে যাইবে তাহার ভ্রাতা উমাপতি। উমাপতি একাই যাইবে মনস্থ করিয়াছিল; কিন্তু নীহারশশী অতি ব্যাকুল ভাবে কহিল, "দাদা আমাকে সঙ্গে লও, নতুবা আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়িয়া মরিব।" ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে উমাপতি প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিল। নীহারশশীর আগ্রহাতিশয্যে উমাপতির যে আপত্তি তাহা খণ্ডন হইয়া গিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্যামাধব যে সেই নৃত্যগীতের মজলিসে বসিয়াছিল, তাহার পক্ষে তাহাই কাল হইল। ধনকুবের তাহের সাহেব "দোস্তের" ভ্রাতুষ্পুত্রকে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া মুন্নাবিবির "মুজুরা"র সুখ্যাতি করিতেছিলেন। শ্যামাধব সে সুখ্যাতিতে যোগদান না করিয়া অব্যাহতি পায় নাই। শ্যামাধবের সুখ্যাতির উত্তরে মুন্নাবিবি ঈষৎ হাসিয়া, ঈষৎ গ্রীবা বক্র করিয়া, কজ্জল রঞ্জিত আঁখিযুগল ঈষৎ কাঁপাইয়া কহিল, "আপিকা বান্দী" বিবি তাহার পরেই "পুরিয়া" গাহিল, বেহাগ গাইল, মুলতান গাহিল, মল্লার গাহিল, ভেঁরো গাহিল, ললিত গাহিল। ভৈরবী গাহিয়া রাত্রি ভোর করিয়া দিল। তাহার পর সে ও তাহার এক সঙ্গিনী স্ত্রী ও পুরুষ বেশে "কাহারোয়া" গাহিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল। মুন্না বিবি জাতিতে হিন্দু। তাহার নিবাস বাঁকিপুর। শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হইয়া সে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। তবে সে স্বৈরিণী নহে। পশ্চিমের চাল চলন সেরূপ নহে। স্বামী স্ত্রীতে নৃত্যগীত দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। মুন্নাবিবিও সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোক। নৃত্য কলা ও সঙ্গীত শাস্ত্রে তাহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। "সমজদার" তাহের সাহেব তাহার নাম শুনিয়া তাহাকে বাটীতে আনাইয়া ছিলেন। বাঙ্গালী যুবকের রূপ দেখিয়া, তাহার মিষ্টালাপ শুনিয়া এবং তাহার নিকট হইতে আশাতীত পুরস্কার পাইয়া মুন্নাবিবি আপনাকে সংযমের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। সে শ্যামাধবের পদে আত্ম সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। শ্যামাধব অবশ্য তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

তাহার পর মুন্নাবিবি সন্ধান করিয়া শ্যামাধবের বাটীর পার্শ্বে একটা

বাড়ী ভাড়া লইল—এবং সুবিধা সুযোগ পাইলে, "বাবুজীকে" নিমন্ত্রণ করিয়া একটু গীত বাদ্যও শুনাইয়া দেয়, আর শ্যামাধব তাহার তারিফ করিলে মুন্না বিবি সৌখন্তের অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া বলিয়া থাকে, "আপিকা বান্দী"।

এ কথা ক্রমে তাহের সাহেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি শ্যামাধবকে ডাকাইয়া ইঙ্গিতে কহিলেন, "এ স্থানটা ভাল নয় তুমি একটু সাবধানে থাকিবে।" সাবধানতার কারণ শ্যামাধব কিছুই দেখিতে পাইল না। কারণ তাহার মনে তখন পাপ নাই। বৃদ্ধ তাহের সাহেবের ইঙ্গিতের সাবধানতা বুঝিবে কেন ?

যে কার্য্যে শ্যামাধব লাক্ষ্ণৌ আসিয়াছিল,তাহার বিশেষ কিছুই হইতেছিল না দেখিয়া সে একটু নিরাশ হইয়া পড়িতেছিল। তাহের সাহেব তাহাকে আশ্বাস বাণীতে কহিলেন, "ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন ? আমি লোক নিযুক্ত করিয়াছি, চেষ্টার ক্রটী হইতেছে না।" সুতরাং শ্যামাধবকে আবার কিছু দিন তথায় থাকিতে হইল, আবার তাহাদের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এই সময় তাহের সাহেব রোগ শয্যায় শয়ন করিলেন। শ্যামাধব প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিতে যায় আর প্রতিদিনই ভারযুক্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। বৃদ্ধের রোগ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। হকিম ও অন্যান্য চিকিৎসকগণ বলিলেন, "রোগ বড় কঠিন ; বৃদ্ধ এ যাত্রা রক্ষা পাইবে কিনা সন্দেহ।

শ্যামাধবের কার্য্য অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। তাহের সাহেবের সংসারে এক কুমারী কন্যা ভিন্ন আর কেহই নাই। সুতরাং শ্যামাধবকে রোগীর সেবায় শুশ্রূষায় অধিকতর বিব্রত হইয়া পড়িতে হইল। তাহের সাহেবের সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা ফতেমা শ্যামাধবের সম্মুখে পূর্ব্বে বাহির হইত না বটে, কিন্তু পিত্রাদেশে এবং শ্যামাধবের গুণে আকৃষ্টা হইয়া শ্যামাধবের সহিত একাসনে বসিয়া পিতৃ সেবা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না। কিশোরী ফতেমা কৃতজ্ঞতা সূত্রে শ্যামাধবকে ক্রমে অতি আপনার জন বলিয়া স্থির করিয়া লইল। শ্যামাধব ভাবিল—তাহের সাহেবের কন্যা তাহার পর হইতে পারে না।

ক্রমেই তাহাদের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমেই তাহারা বুঝিল, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে না দেখিয়া, পরস্পর পরস্পরের সহিত কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ফতেমার সহিত শ্যামাধবের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধির সংবাদ শুনিয়া মুন্নাবিবি বিদ্বেষ পরায়ণা হইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা শ্যামাধব আর তাহের সাহেবের বাটিতে না যায়। কিন্তু শ্যামাধবকে সে কথা বলিতে ত মুন্নার সাহসে কুলাইল না। সে নানা কথার ছলে একদিন শ্যামাধবকে কহিল, সে শুনিয়াছে শ্যামাধবের চাচা সাহেব তাঁহার ঘেষেড়া মণ্ডির বাটী বিক্রয় করিবেন। যদি বাটী বিক্রয় করা মত হয়, তবে সে বাটীর খরিদ্দার মুন্নাবিবি যোগাড় করিতে পারে।

শ্যামাধব বাটীর ক্রেতার সন্ধান লাভে জিজ্ঞাসা করিল, "বাটী কিনিবে কে? মুন্নাবিবি দীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিল, "আপিকা বান্দী"।

শ্যামাধব সে কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না। তবে তাহার পিতৃব্যের তখন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। বাটী বিক্রয় তাহাকে করিতেই হইবে। সেই কারণেই তাহাকে লাক্ষ্ণৌ সহরে এযাবৎ কাল থাকিতে হইয়াছে। তাহের সাহেব ইচ্ছা করিলে অবশ্য ক্রয় করিতে পারিতেন। কিন্তু বন্ধুর সম্পত্তি তিনি খরিদ করিতে চাহেন না। যতটা অর্থের প্রয়োজন, তাহের সাহেব তাহা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু শ্যামাধব সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই। শ্যামাধবের পিতৃব্যই বা তাহা স্বীকার করিবেন কেন?

যাহা হউক, শ্যামাধবের বিশ্বাস হউক বা না হউক, বাটী বিক্রয়ের আশায় তাহাকে অবিশ্বাস্য কথাও বিশ্বাস করিতে হইল। অভাব জিনিষটা এমনই ভীষণ।

শ্যামাধব উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবি সাহেব বাটীর মূল্য স্বরূপ কতটাকা দিতে পারেন।" তাহার উত্তরে মুন্না কহিল, "লাখো রুপেয়া"। শ্যামাধব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল, "মূল্য ত অত নয়। তবে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা হতে পারে বটে।"

গদ্ গদ কণ্ঠে মুন্না বলিল, আপনার জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত—টাকা ত সামান্য কথা।"

মুন্নার কথায় শ্যামাধবের আর আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না।

সে ভাবিতে লাগিল, মুন্নাবিবি এমন কথা বলে কেন; এমন কথা বলিবার ত মুন্নার অধিকার নাই, পর ক্ষণেই মুন্নার কথায় শ্যামাধব বুঝিল,

নীহারশশী যে রূপ-গৌরবে গরবিনী, মুন্না বিবিও সেই রূপচ্ছটায় মুগ্ধা—মোহিতা। ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায় শ্যামাধবের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। মনে মনে ভবিতে লাগিল, "মজ্‌রাওয়ালির এত বড় স্পর্দ্ধা।"

বিরক্ত হইয়া শ্যামাধব তাহের সাহেবের বাটীতে চলিয়া গেল। সে দিন তাহেরের পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়াছে। ফতেমা শ্যামাধবের অন্বেষণে লোক পাঠাইয়াছিল। শ্যামাধব তখন মুন্নাবিবির বাটীতে, সেই জন্য ফতেমা প্রেরিত লোকের সহিত শ্যামাধবের দেখা হয় নাই। শ্যামাধব যখন ফতেমার নিকট উপস্থিত হইল, তখন তাহের সাহেবের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত প্রায়। মুমূর্ষুর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া শ্যামাধব যখন ফতেমার ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল, তখন মুমূর্ষু ইঙ্গিতে তাহার স্নেহের কন্যাকে নিকটে ডাকিয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া ইঙ্গিতেই তাহার ভার শ্যামাধবের উপর অর্পণ করিলেন। ফতেমা পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। বিষয়াদির সুব্যবস্থা বৃদ্ধ পূর্ব্বেই করিয়া ছিলেন। আসন্ন কালে তাঁহাকে আর সে সকল ব্যবস্থার জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হয় নাই। খোদাতাল্লার নাম স্মরণ করিয়া তিনি চির তরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তখন তাঁহার এক হস্ত ফতেমার মস্তক দেশে আর এক হস্ত শ্যামাধবের হস্ত মুষ্টিতে আবদ্ধ। ফতেমা ক্রন্দন করিয়া উঠিল, শ্যামাধবের অশ্রুজল ফতেমার অশ্রুজলের সহিত মিলিয়া অশ্রুর প্রপাত সৃষ্টি করিল।

কিছু কাল পরে পিতৃ বিয়োগ ব্যথা কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে ফতেমা ও শ্যামাধব পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, অচিরে তাহাদের সে স্থান পরিত্যাগ করা উচিৎ, নানা লোকে তাহাদের বিরুদ্ধে তখন নানা কথা কহিতেছে। সে সকলের মূলে কোন সত্য না থাকিলেও তাহা জনরবের লক্ষজিহ্বায় নানা রূপ আকার ধারণ করিল। মুন্নাবিবি এই সকল অনিষ্টের মূল। সে কখনও শ্যামাধবকে বিনয় বচনে নানাবিধ লোভ প্রদর্শন করিল, কখনও বা নানা মতে তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। মুন্নার লোকবল তখন বিলক্ষণ, আর অর্থ বলও সামান্য নহে। তাহার চেষ্টা ও অর্থ ব্যয়ে ফতেমা মুসলমান সমাজে হীনা বলিয়া প্রতিপন্না হইল। নিরপরাধিনী মুসলমান বালিকা শ্যামাধবের উদারতার উপর আপন জীবন নির্ভর করিয়া মুন্নাবিবির সহস্র অত্যাচার অনায়াসে সহ্য করিতে লাগিল। ফতেমা জানিত শ্যামাধব অকৃতদার,—শ্যামাধব তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসে, তাহার পিতা

অন্তিমকালে তাহাকে শ্যামাধবের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে উদার হৃদয় শ্যামাধব তাহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। সামাজিক ব্যাপারে বালিকার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। তাহাতেই শ্যামাধবকে পতিত্বেবরণ করিতে সে দ্বিধা বোধ করে নাই।

সরলা বালিকার অভিপ্রায় যে শ্যামাধব না বুঝিয়াছিল তাহা নহে। তবে যে দৌর্ব্বল্যে মনুষ্য মাত্রই দুর্ব্বল, সেই দুর্ব্বলতা হইতে শ্যামাধব পরিত্রাণ পায় নাই।

শ্যামাধব ভাবিল, সে তাহাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করে, তাহার হিত চেষ্টায় সে সততই যত্নবান। তাহাদের ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধ চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তবে সে কথা ফতেমাকে বলিয়া কাজ নাই। এখন কোন কথা বলিলে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে। বালিকা ফতেমা আরও একটু বড় হইলে, অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভ করিলে সে স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে এবং বুঝিয়া সেইমত কার্য্য করিবে, এমন বিশ্বাস শ্যামাধব মনের মধ্যে পোষণ করিল। অনভিজ্ঞ যুবক তখন বুঝিল না বা বুঝিতে পারিল না, যে অগ্নি লইয়া ক্রীড়া করিলে তাহাতে দারুণ বিপদ উৎপাতের সম্ভাবনা আছে। ঘটনা স্রোতে বিপদ অবশ্যম্ভাবি হইল। মুন্নাবিবির বিদ্বেষ বহ্নি শ্যামাধবকে অধিকতর বিপন্ন করিয়া তুলিল, আর ফতেমার কলঙ্ক কালিমা তাহাতে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃ সঙ্গে নীহারশশী যখন লাক্ষ্ণৌয়ের বাসা বাটীতে উপস্থিত হইল, তখন শ্যামাধব দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ কপোল রক্ষা করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে একখানি আরাম কেদারার উপর বসিয়া আছে, আর মুন্নাবিবি তাহার পদতলে পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। স্বামীর পদতলে অপরিচিতা সুন্দরী স্ত্রীলোককে সেরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নীহারশশীর বুঝিতে বাকি রহিল না, কেন তাহার জীবনাধিকের স্বদেশে ফিরিতে অযথা বিলম্ব ঘটিয়াছে।

উমাপতি ও নীহারশশীকে দেখিয়া শ্যামাধব বিস্মিত নেত্রে উঠিয়া দাঁড়াইল, মুন্না বিবি তাহার পদত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল। উমাপতি হাসিয়া কহিল, "ভায়া অপ্রস্তুত হ'লে ?

শ্যামাধবের মুখ চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে আর কোন কথাবার্ত্তা কহিল না—কহিতে পারিল না। অবসন্ন ভাবে আরাম কেদারার উপর নত-হইয়া পড়িয়া হস্তে মুখ চাপিয়া সে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এ ক্রন্দন অভিমানের—এ ক্রন্দন চরিত্রবানের, এ ক্রন্দন ভালবাসার স্মৃতি বিজড়িত। ক্রন্দন করিয়া শ্যামাধব, উমাপতি ও নীহারশশীকে বুঝাইতে চাহিল—নীহার শশীর নিকটে সে বিশ্বাসঘাতক নহে। নীহারশশী তাহা বুঝিল, কিন্তু উমাপতি সে কথা বুঝিতে চাহিল না।

অবসর মত শ্যামাধব সকল কথা নীহারশশীকে বুঝাইয়া বলিল। নীহার সমস্ত কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "তোমার প্রতি বিশ্বাস হারাইবার পূর্ব্বেই আমার যেন মৃত্যু হয়।"

শ্যামাধব কৌতুক করিয়া কহিল, "তবে এতটা পথ, এত কষ্ট করিয়া আসিলে কেন? যদি জানিতে আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই, তবে ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া আমার সন্ধানে আসিলে কেন?" গর্ব্বিতা ফনিণীর মত মস্তক উত্তোলিত করিয়া নীহারশশী কহিল, "আসিয়াছি দেবতা সন্দর্শনে, আর আসিয়াছি আমার হৃদয় দেবতাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে। চির-বাঞ্ছিতের অদর্শনে পতিপ্রাণা আর কতদিন থাকিতে পারে?"

পতিপ্রাণা পত্নীকে বাহু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া শ্যামাধব জ্বালা যন্ত্রণা, ব্যথা বেদনা সমস্ত ভুলিয়া গেল, কলঙ্ক কালিমা হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিল; আর সাধ্বী নীহারশশী বহুকাল পরে স্বামী সেবার অধিকারিণী হইয়া স্বর্গ সুখ অনু-ভব করিতে লাগিল। ইহাই দাম্পত্য প্রেম। এ প্রেমে যাহাদের অধিকার জন্মে, ঈর্ষা, ঘৃণা, দ্বেষ তাহাদের হৃদয়ে আর স্থান পায় না।

নীহারশশীর সহিত শ্যামাধবের যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা জনশ্রুতিতে মুন্না-বিবিও শুনিল, আর ফতেমাও শুনিল। সে কথা শুনিয়া মুন্নাবিবি একবার দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিল, একবার নীহারশশীকে অকথ্য ভাষায় গালি দিল, তাহার পরে স্থির হইয়া বসিয়া কি একটা চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মুখ ও চক্ষের ভাবে এবং অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল, সয়তান তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে।

ফতেমা সকল কথা শ্রবণান্তর খুব খানিকটা কাঁদিল। তাহার পর সে শ্যামাধব ও নীহারশশী প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনিয়া তাহাদের যথা বিধি সম্বর্দ্ধনা করিল। সে রাত্রে ফতেমা, শ্যামাধব, নীহারশশী ও

উমাপতিকে তাহাদের ঘেসেড়া মণ্ডির বাসায় যাইতে দিল না। একাসনে শ্যামাধব ও নীহারশশীকে বসাইয়া, ফতেমা অনিমেষ লোচনে যুগলরূপ সুধা পান করিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিয়া উমাপতি কহিল, "আমি জানিতাম, প্রেম একটা কথার কথা, কিন্তু আজ বুঝিতেছি প্রেম সংসারে দুর্লভ নহে।

অতিথি সৎকারের পর ফতেমা গৃহান্তরে চলিয়া গেল। এক গৃহে শ্যামাধব ও নীহারশশীর শয্যা রচনা করা হইয়াছিল, অন্য গৃহে উমাপতির শয্যা মন্দির বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। সকলেই সুনিদ্রায় সে রাত্রি যাপন করিল। প্রাতে উঠিয়া ফতেমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার মানসে তাহার সন্ধান করিয়া জানিতে পারিল, ফতেমা গৃহত্যাগ করিয়াছে তাহার সমস্ত সম্পত্তি সে নীহার-শশীর নামে দানপত্র করিয়া গিয়াছে। সে কথা শুনিয়া শ্যামাধব উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল। নীহারশশী পতির হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কিন্তু তখন সান্ত্বনা মানিবে কে?

রোরুদ্যমান শ্যামাধব এবং অশ্রুসিক্তা নীহারশশীকে গাড়িতে তুলিয়া উমাপতি যখন ঘেসেড়া মণ্ডির বাসায় উপস্থিত হইল, তখন সে স্থানে বহুলোক সমবেত হইয়াছে। পূর্ব্ব রাত্রে শ্যামাধবের বাসা অগ্নি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতেই সে স্থানে এত লোকের সমাগম।

অগ্নি দগ্ধ গৃহে একটী সুন্দরী স্ত্রীলোকের অর্দ্ধ দগ্ধ দেহ পাওয়া গিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া শ্যামাধব ভীষণ চীৎকার করিয়া কহিল, "এ যে মুন্না!" প্রতিধ্বনি দূর দূরান্তরে ঘোষণা করিল—"মুন্না"।

মুন্না এখন মৃতা—আর ফতেমা এখন দেওনা। শ্যামাধব কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দিনই লাক্ষৌয়ের বাস তুলিল। সেই অবধি লাক্ষৌয়ের নাম হইলেই শ্যামাধব ও নীহারশশী কাঁদিয়া আকুল হয়।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

নূতন সংসার।

"ও ছাই ভস্ম নাটক-নভেলগুলো আর পড়ো না। সেই সময়টা যদি সংসারের কাজে দাও, অনেক ভাল হয়। আমার ছেলে দুটী সময়ে খেতে পায় না, সময়ে মাথায় একটু তেল পায় না। যদি মা বলে তোমার কাছে যায়, বিরক্ত হয়ো না।"

এই বলিয়া নির্ম্মলার স্বামী গিরীশবাবু বাহিরের ঘরে চলিয়া গেলেন। নির্ম্মলার হাতের বই হাতে রহিল। এই কি অনুরাগ, এই কি ভালবাসা! নির্ম্মলা পুস্তকে পড়িয়াছে, প্রৌঢ় স্বামী যুবতী ভার্য্যার নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে। আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া সে মনে মনে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। হইবারই কথা!

ঝি আসিয়া বলিল, "ছেলেদের স্কুলের ভাত হয় নাই। বামুন ঠাকুর তর-কারী কোটা হয় নাই বলিয়া বসিয়া আছে।"

ইহার উত্তরে "আচ্ছা" এই কথা শুনিয়া ঝি চলিয়া গেল। ক্রমে দশটা বাজিল, ছেলে দুটী সেদিনকার মত না খাইয়াই স্কুলে গেল! গিরীশবাবু চোকের জল ফেলিলেন।

পতি সোহাগিনী নির্ম্মলা সেই দিন স্বহস্তে হবিষ্যি রাঁধিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। গিরীশবাবু সেই দিন কিছুই খাইলেন না, সুতরাং স্বামীর প্রসাদ লাভ আর ঘটিল না। ঝি ও বামুন ঠাকুর চারি আনা হিসাবে পয়সা পাইয়া সেদিনকার মত বিদায় হইল।

একটা অভাব এই সংসারের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে তাহা এ যাবৎ পূর্ণ হয় নাই। ধনবল, লোকবল, তাহার উপর দ্বিতীয় পক্ষের শিক্ষিতা স্ত্রী সে অভাব পূর্ণ করিতে পারে নাই। গিরীশবাবুর হৃদয় হইতে যে চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য অনেক অশ্রু জল ঝরিয়াছে, অনেক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িয়াছে, অনেক কাতর ব্যথা ভগবানের নিকট পৌছিয়াছে, তথাপি সে একটী বার আসিয়া দেখে নাই, তাহার অভাব এ জগতে পূর্ণ হইবার নহে।

গিরীশবাবুর বৃদ্ধা মাতা তাঁহার প্রথমা স্ত্রী কমলার মৃত্যুর পর দেখিলেন, সংসার আর চলে না, ছেলে দুটী সময়ে খাইতে পায় না, ছেলে দুটীর চ'খের জল আর শুকায় না, তাহার একমাত্র পুত্র গিরীশচন্দ্র পত্নীবিরহকাতরতা

ঘোচে না। তিনি অনেক ভাবিয়া পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, দ্বিতীয়বার সংসার কর।" একান্ত বাধ্য পুত্র গিরীশচন্দ্র মাতার আদেশ মস্তক পাতিয়া লইলেন।

তাঁহার জীবদ্দশাতেই দ্বিতীয় স্ত্রী নির্ম্মলা সুন্দরী গৃহ প্রবেশ করিয়াছিলেন। লজ্জাশীলা বধূ প্রথমে লজ্জার আড়ালে থাকিয়া মনের ভাব মনে রাখিলেন। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন: সে মূর্ত্তির হৃদয়ে ভোগ বিলাস,—মস্তকে সুগন্ধি তৈলের মৃদু গন্ধ,—অঙ্গে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার, সংসার তাহার নিকট নীচে পড়িয়া রহিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশৃঙ্খলতা আসিয়া সংসারে ঢুকিল। আজ ছেলেরা সময়ে খাইতে পাইল না, কাল ঝি বামুন পলায়ন করিল, তার পরদিন উনুনে হাঁড়ী চড়িল না। এইরূপ ঘোর বিশৃঙ্খলতার মধ্যে কতক দিন গেল। তারপর নির্ম্মলাসুন্দরী নাটক নভেল লইয়া পড়িল, সংসারের কোন খবর রাখিল না। গিরীশচন্দ্র ঘাড় পাতিয়া সেই ভার লই-লেন, কেবল ছেলে দুটীর জন্য। তাহারা দুটী ভাত যাহাতে সময়ে পায়, তাহা-দের পড়াশুনা যাহাতে ভাল করিয়া হয়, সেই জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার যে দিন শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, সে দিন নির্ম্মলাসুন্দরী পুস্তক হইতে জ্ঞানরত্ন আহরণে ব্যস্ত হ'ন। সে দিন ছেলে দুইটী টিফিনের পয়সায় উদর পূরণ করে। ক্রমে হিস্‌টিরিয়া আসিয়া নির্ম্মলাসুন্দরীকে আশ্রয় করিল। ডাক্তারের ভিজিটে ও পরিচর্য্যার খরচে গিরীশচন্দ্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বের চাকুরী করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে গিরীশচন্দ্র একখানি বাড়ী, প্রথমা পত্নীর জড়োয়া অলঙ্কার, বাড়ীর আসবাব পত্র ইত্যাদি খরচেই ফুরাইয়া যায়, তারপর পেন্‌সনের টাকা হইতেই সংসার চলিতেছে। এই সংসার পূর্ব্বে অতি সুশৃঙ্খলার সহিত চলিয়া উদ্বৃত্ত হইত, তাহা হইতে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী ছেলে দুইটীর নামে পোষ্ট আফিসে টাকা জমা রাখিয়াছিলেন। নির্ম্মলা-সুন্দরীর ব্যবস্থার গুণে ক্রমশঃ সংসারে দেনা ঢুকিবার উপক্রম হইল। সেই দিন গিরীশচন্দ্র মাথায় হাত দিলেন। এমন সোণার সংসারে কে এই অভি-সম্পাত প্রদান করিল! তিনি মনে মনে ভাবিতেন, মাতৃ আজ্ঞা পালন করিয়া-ছেন;—কিন্তু তিনি তো চলিয়া গিয়াছেন, তিনি আর দেখিতে আসেন না। তাহার পুত্র গিরীশচন্দ্র চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া দেয়, তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া কত দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে থাকে! কেহ দেখিবার লোক নাই, গিরীশচন্দ্রের আজ কি দশা হইয়াছে!

৩

একটী দুষ্কর্ম্মের ফল জীবনে কতদূর বিস্তার লাভ করে, তাহার প্রমাণ গিরীশচন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহ। তথাপি তিনি মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই এই ভাবিয়া এই দারিদ্র দুঃখকে অম্লান বদনে আলিঙ্গন করিলেন। সেভিংস-ব্যাঙ্কের টাকা খরচ হইয়া গেল, পেনসিয়ানের টাকায় আর সঙ্কুলন হয় না। ক্রমে নির্ম্মলাসুন্দরীর অলঙ্কারে হাত পড়িবার উপক্রম হইল। তিনি ফনিণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন!

আজ গিরীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবেশচন্দ্র রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে,—ডাক্তার ভিজিটের টাকা পায় নাই। গহনা বন্ধক ভিন্ন কোন উপায় নাই ভাবিয়া তিনি পত্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সহৃদয়া পত্নী উত্তর করিলেন, "পুত্রের ব্যায়রামে যদি আমার গহনা বাঁধা পড়ে, আমার রোগের সময় কি হইবে?" গিরীশচন্দ্র কোন উত্তর করিলেন না। তাঁহার একটী স্বর্ণ মেডেল ছিল, সেটী বিক্রয় করিয়া সেদিনকার মত ডাক্তারের দেনা পরিশোধ করিলেন;—কিন্তু এরূপে কত দিন চলিবে? পরদিন ডাক্তার এই কথা জানিতে পারিয়া সমস্ত টাকা প্রত্যর্পণ করিলেন এবং স্বর্ণ মেডেলটী নিজের টাকা দিয়া আনাইয়া দিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, এটী আপনার মহানুভতার চিহ্ন, জল মগ্ন ব্যক্তিকে আপনি মৃত্যু মুখ হইতে বাঁচাইয়াছেন, সে চিহ্ন আমি লোপ করিতে চাই না। আপনার পুত্রের রক্ষাভার আমার উপর। গিরীশচন্দ্র মনে করিলেন, ভগবান ঘোর দারিদ্রদুঃখের মধ্যে দুঃখীকে পরিত্যাগ করেন না।

ডাক্তারের কৃপায় ভবেশচন্দ্র পুনর্জীবন লাভ করিল! ডাক্তারের সহৃদয়তা গিরিশচন্দ্র ভুলিলেন না। তাঁহার দৈনিক প্রার্থনার মধ্যে ডাক্তারের দীর্ঘ জীবন ও যশোলাভ গ্রথিত রহিল।

নির্ম্মলাসুন্দরীর হিস্‌টিরিয়া সত্য সত্যই পালে বাঘ আসার ন্যায় দেখা দিল। সেই জন্য দু'চার দিন ভবেশের স্কুল যাওয়া হইল না। সে দিন রাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিমাতার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। গিরীশচন্দ্র ডাক্তার সহ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নির্ম্মলা মূর্চ্ছিতা, বাড়ীর ঝি মাথায় পাখা করিতেছে, ভবেশচন্দ্র বিমাতার চরণে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছে। সে তাহার পিতাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া আকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "বাবা—বাবা! মা বুঝি আর বাঁচে না।"

ডাক্তার সাময়িক ঔষধ প্রয়োগে নির্ম্মলার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। সে চক্ষু চাহিয়া দেখে, গৃহে ডাক্তার, স্বামী বিমর্ষ, ভবেশচন্দ্রের নয়ন অশ্রুসিক্ত। সে তাহার পুস্তকের মধ্যে এমন ভালবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কোথাও দেখে নাই। তাহার পুস্তকের জ্ঞানে এই ভালবাসার নিকট অনেক হালকা বলিয়া বোধ হইল। যাহারা জ্ঞানের পোষক, তাহাদের পক্ষে ভক্তি মহৌষধি।

ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভবেশ নীচে নামিয়া গেল। গিরীশবাবু পত্নীর পরিচর্য্যার জন্য উপরেই রহিলেন।

গিরীশবাবু কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ, নির্ম্মলা?"

নির্ম্মলা কি যেন ভাবিল। ভাবিয়া বুঝিতে পারিল, তাহার স্বামী দেবতা। ভবেশচন্দ্র সেই দেবতার ঔরসজাত। এই স্থানে জ্ঞানের উপরে গীতা প্রমাণ হইল। নির্ম্মলা উঠিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "ভবেশ কোথায়?"

"ভবেশ ডাক্তারবাবুকে গাড়ীতে পৌঁছিতে গিয়েছে। তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইব কি?"

নির্ম্মলা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "সে কেন কাঁদিতেছিল জান?" গিরীশবাবু কোন উত্তর দিলেন না, নির্ম্মলা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার বলিল, "সে মনে করিয়াছিল, আমি যদি চলিয়া যাই, তাহার গর্ভধারিণী মা কমলার দৃষ্টান্ত লোপ হইবে। সে তাহার মাতৃপ্রদত্ত সৎ শিক্ষাগুলি হৃদয়ে রাখিয়া জলসেক করিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছে, আমি যদি মরিতাম, তাহার আশা পূর্ণ হইত না।"

গিরীশচন্দ্র ভাবিলেন, নির্ম্মলার হৃদয়ে এক্ষণে ভক্তির ছায়াপাত হইয়াছে, জ্ঞান তাহার সাহায্য করিবে।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ, বি, এ,।

মেলুসিনা।

পয়টোর কাউণ্ট ইমারিক খুব ধনী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল; পুত্রটির নাম বার্টাম, কন্যাটির নাম ব্লানিকোর্ট। পয়টোর চারিধারে খুব ঘণ জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ধারে ইমারিকের আত্মীয় ফরেটের কাউণ্ট বাস করিত। সে বড়ই গরীব, কিন্তু তাহার অনেক পরিবার-বর্গ। ইমারিক দয়া করিয়া তাহার ছোট ছেলে রেমণ্ডকে পোষ্যপুত্র লইয়া ছিলেন। ছেলেটি বেশ সুশ্রী ও নম্র ছিল। ক্রমে ক্রমে সে ইমারিকের খুব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল; ইমারিক সর্ব্বদাই তাহাকে কাছে কাছে রাখিতেন। একদিন ইমারিক তাঁহার দলবল সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে যাইলেন; বলা বাহুল্য, রেমণ্ডও তাঁহার সঙ্গে যাইল। জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটি বরাহ দেখিতে পাইয়া, তাহাকে মারিবার জন্য তাঁহারা উহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। বরাহের পিছু পিছু ছুটিতে ছুটিতে ইমারিক ও রেমণ্ড তাঁহাদের সঙ্গীদের নিকট হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িলেন। এদিকে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তবুও বরাহ ধরা গেল না। তাঁহারা নিরুপায় দেখিয়া সেইখানেই রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। রেমণ্ড ইতঃস্তত কতকগুলি শুষ্ক কাঠ জোগাড় করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। সেই গভীর বন মধ্যে দারুণশীতে অগ্নির উষ্ণত্ব তাঁহাদের বড়ই আরাম দিতেছিল। তাঁহারা মনের সুখে অগ্নি উপভোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই বরাহটি বন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একেবারে ইমারিকের উপর ভীমবেগে লাফাইয়া পড়িল। রেমণ্ড তৎক্ষণাৎ তরবারি বাহির করিয়া বরাহ মারিতে উদ্যত হইল। কিন্তু দৈব আনুকুল্যে অসি বরাহকে আঘাত না করিয়া ইমারিকের হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ হইল; ও সঙ্গে সঙ্গে ইমারিকের মৃত্যু হইল। বরাহও অবসর পাইয়া পলায়ন করিল। এই আকস্মিক ঘটনায় রেমণ্ড ভয়ে ঘোড়ায় চড়িয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিল। সে অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই দেখিল সেই নিবীড় জঙ্গল ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। একটু পরেই সে একটা বেশ মনোরম সমতল ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বরফ পড়িয়া সেই স্থানটি একেবারে শাদা দেখাইতে ছিল। তাহার উপর পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ অনলজ্যোতিঃ পড়িয়া দিগ্‌দিগন্ত হাস্যময়

করিয়া তুলিয়াছিল! মাঝখানে একটি ফোয়ারা হইতে নির্ম্মল জল বাহির হইয়া অতি সুমিষ্ট শব্দ করিতে করিতে ছোট ছোট শিলাখণ্ডের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে ছিল। তাহার সন্নিকটে তিনটি পরম সুন্দরী কন্যা বসিয়া গল্প করিতেছিল। তাহাদের ঢেউ খেলান সুন্দর সুবর্ণময় কেশদাম ভূমির উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছিল।

রেমণ্ড এত সৌন্দর্য্য সমাবেশ দেখিয়া একেবারে স্তম্ভীত হইয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যেন এক অদৃষ্ট পূর্ব্ব স্বর্গপুরীর দেববালাগণকে স্বচক্ষে দেখিতেছে। সে ভক্তিভরে তাহাদের পদতলে লুটাইয়া পড়িতে যাইতেছিল, এমন সময়ে তাহাদের মধ্য হইতে একজন অগ্রসর হইয়া তাহাকে বাধা দিল। রেমণ্ডের ভয় চকিত দৃষ্টি দেখিয়া সে তাহার ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রেমণ্ড তাহার নিকটে সমস্ত অকপটে বলিল। সুন্দরী মনোযোগের সহিত সব কথা শুনিয়া তাহাকে অভয় দিয়া বিদায় দিল। সে ঘোড়ার উপর চড়িয়া একেবারে পয়টোতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা ঘটিয়াছে সে যেন তাহার কিছুই জানে না, এইরূপ ভাব দেখাইল। ইমারিকের সহিত যে, সব শিকারীরা গিয়াছিল সকলেই বনমধ্যে হারাইয়া গিয়াছিল, এবং একে একে সকলেই একাকী ফিরিয়া আসিতেছিল;—সুতরাং রেমণ্ডকে একেলা আসিতে দেখিয়া তাহার উপর কেহই কিছুমাত্র সন্দেহ করিল না। এইরূপে বিপদ কাটিয়া গেলে রেমণ্ড সেই সুন্দরীর অলৌকিক রূপরাশি একমনে ধ্যান করিতে লাগিল। অতখানি রূপ সে বোধ হয় কোন মানবীতে দেখে নাই। সেই অপরিচিত সুন্দরী ক্রমে ক্রমে রেমণ্ডের তরুণ হৃদয়খানি অধিকার করিয়া ফেলিল। তাহার গৃহে থাকা অসম্ভব হইল, একদিন নিশীথ রাত্রে সে সেই জঙ্গলে আবার প্রবেশ করিল। সে অক্লেশেই সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল, সে তাহাদের নিকট অকপট হৃদয়ে তাহার প্রেমের কথা ব্যক্ত করিল। তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর নাম—মেলুসিনা। সে বলিল, "যদি তুমি একটি অঙ্গিকার কর, যে কেবল শনিবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না এবং আর সে দিন কি করি জানিতে চেষ্টা করিবে না, তাহা হইলে আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি? কিন্তু সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিলে চির বিচ্ছেদে পরিণত হইবে।" প্রেমমুগ্ধ রেমণ্ড তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল, "সে কখনো ঐ দিন তাহার সহিত দেখা করিবে না। বা সে ঐ দিন কি করে তাহা জানিতেও চেষ্টা করিবে না।"

তাহার পর রেমণ্ড বার্টামকে তাহার বিবাহে নিমন্ত্রণ করিলেন। মেলুসিনার কৃত প্রকাণ্ড প্রাসাদে তাহাদের শুভ বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল।

মেলুসিনা ক্রমে ক্রমে প্রাসাদটি বাড়াইতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে অতবড় বাড়ী আর কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না। বাড়ী তৈয়ারি হইলে সে তাহার নাম রাখিল—"লুসিনা"।

তাহারা সেখানে মহাসুখে কাল কাটাইতে লাগিল। কালক্রমে মেলুসিনা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল। তাহার আকৃতি বড় আশ্চর্য্য রকমের ছিল। মুখখানা প্রকাণ্ড, কান দুটি খুব লম্বা; এক চক্ষু ঘোর লাল ও আর এক চক্ষু সবুজ রঙের।

বার মাস পরে তাহার আর একটি পুত্র হইল। সে তাহার নাম রাখিল "গিভিস্"। তাহার মুখমণ্ডল ঘোর রক্তবর্ণ। তাহার জন্মের প্রীতিচিহ্নস্বরূপ মেলুসিনা মালিয়ার্সে একটি মঠ প্রস্তুত করিয়া দিল; এবং তাহার পুত্রের জন্য ফাভেণ্টনগরে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিল।

তাহার পর তাহার তৃতীয় পুত্র গিয়াট জন্মগ্রহণ করিল। সে পরে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। সে দেখিতে বেশ সুশ্রী ও সুন্দর ছিল, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডলে একটি চক্ষু অপরটি অপেক্ষা কিছু উচ্চে অবস্থিত ছিল। তাহার জন্য তাহার মাতা "লারকেলি" নামক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

তাহার পরবর্ত্তী পুত্র এণ্টনির হাতে ও পায়ে নখের পরিবর্ত্তে 'থাবা' ছিল। তাহার পরে যে, ছেলেটি হইয়াছিল তাহার একটি মাত্র চক্ষু ছিল। ষষ্ঠ পুত্র জিয়ফ্রিক হাতির মত দাঁত ছিল। এইরূপে মেলুসিনার অন্যান্য পুত্রগণের আকৃতি বিকৃতও রাক্ষসের মত ছিল।

বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তথাপি রেমণ্ডের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা একটুও কমিল না। প্রত্যেক শনিবার সে তাহাকে ছাড়িয়া দিত এবং সে ঐ দিন কি করে তাহা দেখিতে কখনো চেষ্টাও করিত না। ছেলেরা বড় হইয়া খুব বড় বড় যোদ্ধা বীরপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইল। তাহাদের মধ্যে ফ্রেমিয়াণ্ড নামে একজন ধর্ম্মযাজকের পদ গ্রহণ করিয়া মালিয়ার্সের মঠে ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিল। রেমণ্ডের বৃদ্ধ পিতা, ভাই ভগিনী সকলে এক সঙ্গে সেই প্রাসাদে বাস করিতে লাগিল।

একদিন শনিবার রেমণ্ডের পিতা তাহাকে তাহার স্ত্রী কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। রেমণ্ড বলিল, "তাহাকে শনিবার দেখা যায় না। এই কথা শুনিয়া

রেমণ্ডের এক ভাই তাহাকে বলিল,"দেখ, শনিবার দিন মেলুসিনাকে দেখা যায় না বলিয়া নানাপ্রকার সন্দেহ হয়। তোমার উচিত সে ঐ দিন কি করে তাহার বিশেষ খোঁজ লওয়া।" রেমণ্ডের মুগ্ধ হৃদয়ে সেরূপ কোন প্রকার সন্দেহ কখনো উদিত হয় নাই। সে সেই সব সন্দেহের বশীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ মেলুসিনা গুপ্তগৃহে কি করিতেছে দেখিবার জন্য তথায় যাইল। কিন্তু তাহাকে কোথাও দেখিতে পাইল না। অবশেষে দেখিল কেবলমাত্র একটি ঘর বন্ধ আছে। দুয়ারের ফাঁক দিয়া সে দেখিল মেলুসিনা জলের ভিতর বসিয়া আছে; আর তাহার শরীরের নিম্নাংশ সাপের লেজের মত দেখাইতেছে। ইহা দেখিয়া রেমণ্ড একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সে নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। তাহার মুখ দিয়া একটুও কথা সরিল না। সে মেলুসিনার বিকৃতি আকৃতি দেখিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হয় নাই; কিন্তু তাহার প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইতে হইবে এই ভাবিয়া সে আকুল হইল। কিছুদিন বেশ চলিয়া গেল; মেলুসিনার কিছুই ভাবান্তর দেখা গেল না; অবশেষে এক সংবাদ আসিল, প্রকাণ্ড দন্তবিশিষ্ট জিয়ফ্রি পবিত্র মালিয়াস মঠ আক্রমণ করিয়া উহা আগুনে পুড়াইয়া ধ্বংস করিয়াছে। সেই অগ্নিতে মন্দিরের সাধুপুরুষগণ ও ফ্রেমিয়াও সকলেই পুড়িয়া মরিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া রেমণ্ড অত্যন্ত দুঃখিত হইল। মেলুসিনা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিলে সে বলিয়া উঠিল, দূর হ, ঘৃণিত সাপ; তুই আমার এত বড় দেশপূজ্য কুলে কালি দিয়াছিস; আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে যা।"

এই কথা শুনিয়া মেলুসিনা মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। এইরূপ অসংযত ভাবে কঠিন কথা বলিয়া রেমণ্ড অতিশয় দুঃখিত হইল এবং তাহার জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেক কষ্টে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সে সাশ্রুনয়নে রেমণ্ডকে শেষ চুম্বন দিল ও সারা জীবনের মত একবার তাহাকে শেষ আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বলিল, "প্রিয়তম, এখনো আমার দুটি ছেলে নিতান্ত শিশু; মা-হারা [illegible]দের স্নেহচক্ষে দেখ। তবে এখন আসি প্রিয়তম বিদায়।" *

শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ।

* মেলুসিনা সম্বন্ধে ইউরোপে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই গল্পটি তন্মধ্যে একটি। S Barnig Gould তাঁহার Curious Mytus of the Middle Ages" নামক পুস্তকে মেলুসিনা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, ইহা তাহারই অবলম্বনে লিখিত।

মায়ের ডাক !

—:*:—

রইবো না আর পিছেয় পড়ে,
এবার মোরা উঠবো ;
মায়ের আশীষ মাথায় নিয়ে,
চরণে মার লুটবো।
নূতন সাজে সাজিয়ে মাকে,
রাখবো তুলে মাথায় তাকে,
বিশ্ব ভুলে হৃদয় খুলে,
মায়ের কাছে ছুটবো ;
মা আমা'দর ডাক দিয়েছে,
এবার মোরা উঠ্‌বো।

* * *

স্তব্ধ হবে বিশ্ব দেখে,
ফুলের মত ফুটবো ;
ভয় করিনে মায়ের বলে,
বিঘ্ন বাধা টুটবো।
রোজই নূতন রোজই খাসা,
শুনবো মায়ের নূতন ভাষা,
ঢালতে প্রীতি প্রাণে গীতি,—
সবাই মিলে জুটবো ;
মা আমাদের ডাক দিয়েছে ;
এবার মোরা উঠ্‌বো।

————